শাহজাদা দারাশুকো

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়



দ্বিতীয় খণ্ড

শাহজাদা দারাশুকো

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়



অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

শাহজাদা দারাশুকো

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SAHJADA DARASHUKO VOL. II
A Historical Novel in Bengali
by SHYAMAL GANGOPADHYAYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

ISBN-81-7079-015-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার বড় মেয়ে
মল্লিকা চৌধুরীকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

কামিনীকাঞ্চন

তারসানাই

গল্পসমগ্র

সিদ্ধকামিনী

ভাস্কো-দা-গামার ভাইপো

মানুষের রহস্য

শাহজাদা দারাশুকো (প্রথম খণ্ড)

" " (দ্বিতীয় খণ্ড)

" " (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হচ্ছে

মহা বিশ্বের মহা কলরোল

আকবরের দেহত্যাগের পর তাঁর উদার আদর্শ—কাজকর্ম অতীতের বস্তু হয়ে রইল। মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুস্থানে মুসলমানদের বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। তার সঙ্গে ধর্ম হিসেবে ইসলাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের শক্তির প্রতীক—ইসলাম অনেকটা দাঁড়িয়ে যায়। আকবরের উদার আদর্শ হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান—সব ধর্মের ঊর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করত। সেই আদর্শ রক্ষা করার গরজ জাহাঙ্গীর বা শাহজাহানের মত সাধারণবুদ্ধির মানুষের পক্ষে আর রইল না। কিন্তু আকবরের ভাবশিষ্য একজন দেখা দিলেন তাঁরই বংশে, তাঁর প্রপৌত্র—শাহজাহান-পুত্র শাহজাদা দারাশুকো।

তাঁর জীবন যেমন রোমান্টিক, তেমনই ট্র্যাজিক। রসময় আবার জ্বালাময়ও বটে। এমন ঐতিহাসিক চরিত্র দুর্লভ। তাঁর ছিল রূপ, চরিত্র—কৈশোর থেকেই পরমার্থে আকর্ষণ। কিন্তু ভাবাবেগ বোধকরি তাঁর জীবনের অন্তিমদশা টেনে এনেছে। দারাশুকো প্রেমের ভেতর, দ্বন্দ্বের ভেতর, ষড়যন্ত্রের ভেতর ভাসতে ভাসতেও মানুষের ধর্ম খুঁজে বেড়িয়েছেন।

তিনি সমগ্র মানবসমাজকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে এক করে দেবার স্বপ্ন

দেখতেন। কিন্তু পাটোয়ারী বুদ্ধির অভাবে তিনি জাগতিক বিষয়ে পরাস্ত হন। তাই তাঁর দিকেই আমাদের সহানুভূতি—শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

প্রাচীন ইতিহাসে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান মোটেই দেওয়া হয়নি। সেকালের পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছে। অজ্ঞ জনসাধারণের ভেতর—পুরোহিতদের ভেতর প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে যুক্তি আর উদারতার আদৌ স্থান নেই। ওরা অন্যের ধর্মমতকে ঘৃণা করতে শেখায়। মহাত্মা দারাশুকো সেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রচলিত ধর্মমতকেই শুধু বিশ্বাস করতেন না।

দারাশুকো বিশ্বাস করতেন সব ধর্ম মূলত এক। যথাযথ সাধনায় সব ধর্মেই মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তির জন্যে শুধু চাই সত্য নিষ্ঠা, চিত্তশুদ্ধি আর জনসেবা।

আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার চাপে লোকে দারাশুকোকে ভুলতে বসেছিল। অথচ কুরুক্ষেত্রের পর তাঁকে নিয়েই তো হিন্দুস্থানের মহাকাব্য, ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গৃহযুদ্ধ, ভ্রাতৃসংহার। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু হতভাগ্য দারা এই সব ঘটনা থেকে নেপথ্যে সরে গিয়েছেন। ইতিহাস বড় বড় ঘটনা লিখে রাখে। সংস্কৃতি সাধনায় দারার নীরব, অসামান্য সব কাজ আর তার ফলাফল নিয়ে চির মুখর ইতিহাস যেন একেবারেই বোবা।

দৈবী অতৃপ্তিতে দীর্ণ দারাকে সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা বুঝতে না পেরেই বলেছেন অস্থির চিত্ত। ধর্মের ব্যাপারে দারার উদার মতবাদ হিন্দুস্থানে একেবারে নতুন ব্যাপারও নয়। তাঁর আগে সুফীরা অনেকেই এমন সব কথা বলেছেন। কিন্তু সমসাময়িক মুসলমানদের যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল হতভাগ্য দারাশুকোর ওপর। শেষ অব্দি তারা একজন নিরীহ, উদার মানুষের মাথাটি না নিয়ে ছাড়লো না।

অসাধারণ মন-মেজাজের মানুষ এই মুঘল শাহজাদাকে মুঘল হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিকরা সহানুভূতি নিয়ে বিচার করেন নি বলেই আসল ছবিও রাজনৈতিক বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণীতে পড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। সত্যের সন্ধানে শাহজাদা দারা যেমন সহজে মসজিদে যেতে পারতেন—তেমনই অসংকোচে মন্দিরেও যেতে পারতেন। ঈশ্বরে মিশে যাবার জন্যে প্রেমিক-সাধক মন্দির-মসজিদের তফাত মানেন না। আমি সেই আসল ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছি মাত্র। সেসব আঁকতে গিয়ে সেদিনকার হিন্দুস্থানকে দেখতে পাই। সেই সময়—সেইসব মানুষজন তাদের কলরোল নিয়ে কয়েক শতাব্দী পেছনে সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে আছে। সেই ধুলো সরিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান, ভালবাসা, ঘৃণা—সবই দেখতে পাই। সাধ্যমত তা আঁকার চেষ্টা করেছি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শাহী খানদানে অল্পস্বল্প চিকিৎসা করে বেশ সুনাম জুটেছে ইংলিশস্তানের হেকিম গোব্রিয়েল ব্রাউটনের। তাঁর নিজের দেশ ইংলিশস্তানে চার্লস যেমন তাজা টগবগে শাহেনশা—তেমনি এই বিরাট হিন্দুস্থানের শাহেনশা শাহজাহানও তাজা এক বাদশা। বাদশার শাহজাদা-শাহজাদীরাও তাঁর চোখে রীতিমত জিন্দা। বাদশা-বেগম মরহুম মমতাজমহলের ছোট বোন মেহর্জাবিন বেগমকে সামান্য ওষুধপত্রে সারিয়ে তোলার পর থেকে শাহজাদী জাহানারার চোখে তিনি এখন একজন ধন্বন্তরী বৈদ্য। কথায় কথায় শাহজাদী তাঁকে ডেকে পাঠান। কিছুকাল আগে জাহানারার ইচ্ছাতেই ব্রাউটন সাহেব রাজধানী আগ্রার ঠিক বাইরে বিয়ানায় শাহী এতিমখানায় বাপ-মা হারানো অনাথদের চিকিৎসার ভার পেয়েছেন। এজন্যে ব্রাউটন সাহেবের মাসোহারা সামান্য কিছু আশরফি, সেটা এমন কিছু নয়—কিন্তু শাহী দরবারে ভিনদেশী বৈদ্য হিসেবে তকমাটা পেয়ে যাওয়ায় তাঁর নিজের পক্ষে তো বটেই—ইংলিশস্তানের পক্ষেও বর হয়ে উঠেছে।

যমুনার তীরে হাভেলিতে বসে ইংলিশস্তানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর বরাবরে লণ্ডনে চিঠি লিখতে লিখতে একথাই ভাবছিলেন ডক্টর গোব্রিয়েল ব্রাউটন। তাঁর সামনে পাখির পালকের বিশাল কলম। এই পাখিগুলো শীতের মুখে মুখেই হিমালয় টপকে সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে। পাখিগুলোও বেশ বড় হয়। লাল ঠোঁট। ছাই ছাই গলা। পাখি না বলে হাঁস বলাই ভালো। রাজধানীর লালচকে শীতের মরসুমে এসব পাখি ওঠে। দানা খেতে মাঠে নেমে পড়ে শেষে বন্দী।

ব্রাউটন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাজিকর আলী মর্দান খাঁ দেওয়ান-ই-আমে আলো দিয়ে সাজিয়েছে। আগ্রার অন্ধকার আকাশে তা ভারি সুন্দর লাগলো ব্রাউটনের। বাদশা শাহজাহানের হুকুমে সারা হিন্দুস্থানে আজ মহা ধুমধামে হজরত মহম্মদের জন্মতিথি মানানো হচ্ছে। গোলাপজল, আতর, মিঠাই, হালুয়ার ছড়াছড়ি। এই মিলাদ শরিফে গোব্রিয়েল ব্রাউটনের দাওয়াত ছিল। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কাল সকালেই ইংলিশস্তানের ব্যাপারীদের হাত দিয়ে কোম্পানি বাহাদুর বরাবরে চিঠিখানা পাঠাতে হবে লণ্ডনে। তাছাড়া হালুয়া জিনিসটা ব্রাউটনের বরদাস্ত হয় না। দেখেছেন—খেলেই পেটটা গড়বড় করে।

আজ ১২ই রবিউল আওয়াল—অল হিজরি ১০৪৩।

তার মানে আজ ইন দি ইয়ার অফ দি লর্ড সিক্সটিন থার্টিফোর টোয়েণ্টি-ফার্স্ট অক্টোবর। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন ডক্টর গোব্রিয়েল ব্রাউটন। হজরত মহম্মদ আর যিশুখৃস্টের দুই সনের মাঝখানে ৫৯১টি বছরের ফারাক।

আবার তিনি চিঠিখানা নিয়ে বসলেন। অভ্রের পাত জ্বলে জ্বলে আলো। বেশ উজ্জ্বল।

ইংলিশস্তানের ইলচি স্যার টমাস রো লণ্ডনে ফিরে গেছেন বারো বছর হয়ে গেল। তিনিই আমাকে আগ্রায় এনেছিলেন। হিন্দুস্থানের রাজধানী আগ্রায় এখন আমার ভূমিকাটাই গুলিয়ে গেছে। আমি কি একজন ডাক্তার? না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের কোনো কর্মচারি? কোম্পানির স্বার্থ—ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ—রাজা চার্লসের স্বার্থ সবই এখানে এখন আমার কাছে এক হয়ে গেছে। অথচ আমার ভূমিকাটি লণ্ডনে কোম্পানির সদর দপ্তরে এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।—কোম্পানির সদর অফিসেও আমার পদমর্যাদা আজও স্থির হয়নি।

এশিয়ায় কোনো মানী মানুষের কাছে খালি হাতে যাওয়া যায় না। মুঘল বাদশার চুনোটি আঙরাখা ছোঁয়ার প্রথম সুযোগ যখন আমার হলো তখন তাঁর সম্মানে আমাকে নগদ আটটি আশরফি গুনে নিতে হলো। তাছাড়াও একটি ছোরার খাপ, একটি চামড়া বাঁধানো ছুরি দিতে হয়েছে একজন ওমরাহকে। শাহী খানদানের হেকিম হিসেবে আমার মাসোহারা তিনিই ঠিক করে দেন।

এশিয়ার মানচিত্রে তাকালে মুঘল শাহী কত বিরাট তা সহজেই বোঝা যায়। আশ্চর্য! এত বড় হিন্দুস্থানের বেশির ভাগ জায়গাই খুব উর্বর। তার ভেতর সবচেয়ে উর্বর বাংলাদেশ। এমন উর্বর জায়গা দুনিয়ায় খুব অল্পই দেখা যায়। মিশরের চেয়েও বাংলাদেশ উর্বর। বাংলাদেশে যত রকম ফসল হয়—মিশরে তা হয় না। —যেমন রেশম, নীল। হিন্দুস্থানের বেশির ভাগ সুবায় চাষ আবাদ বেশ ভালোই হয়। কারিগররা নানারকমের কার্পেট, ব্রকেড, সোনারুপোর কারুকাজ করা দামি কাপড় তৈরি করে দুনিয়ার বাজারে চালান দেয়।

দুনিয়ার সোনারুপো নানা জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এসে পৌঁছয়। তারপর তা এই বিরাট দেশের কোন্ গোপন গুহায় চলে যায়। সোনার গয়না এদেশের মেয়েদের বড় প্রিয়। আমেরিকা থেকে যে সোনা বাইরে বেরিয়ে এসে ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে—তার একটা বড় অংশ নানাপথ ঘুরে শেষে তুরস্কে জমা হয়—অবশ্যই কেনাবেচার দরুন। ওই সোনার আরও একটা ভাগ রেশমের দরুন ইস্পাহানে চলে যায়। হিন্দুস্থানের জিনিসপত্র ইস্পাহান, তুরস্ক সবারই দরকার। ফলে ওদের সোনা বসরা আর বন্দর আব্বাসি হয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসে। মনে রাখা দরকার—ওলন্দাজ, ইংরেজ, পর্তুগিজ জাহাজ যারাই হিন্দুস্থানে ব্যবসা করতে আসে—তারাই হিন্দুস্থানে সোনারুপো ঢেলে তবে দরকারি মালপত্র কেনে। ওলন্দাজরা জাপানে ব্যবসা করে যা সোনা পায়—তাও তারা হিন্দুস্থানে ঢেলে দিয়ে যায়। হিন্দুস্থান শুধু সোনার বদলেই রপ্তানি করে।

আমি যতদূর জানি হিন্দুস্থানের দরকার—তামা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, হাতি। এসব ওলন্দাজরা জাপান, সিংহল, ইয়োরোপ থেকে যোগায়। সীসা আসে ইয়োরোপ থেকে। বনাত ফ্রান্স থেকে। শুধু উজবেকিস্তান থেকেই বছরে পঁচিশ হাজার ঘোড়া আসে হিন্দুস্থানে। ইস্পাহান থেকেও জাহাজে করে এদেশে আরবি আর হাবসি ঘোড়া আসে। সমরখন্দ, বোখারা, বলক্ পাঠায় টাটকা

ফল। আপেল, আঙুর, নাশপাতি সারা শীতকাল ধরে আগ্রায় বিক্রি হয়। বাদাম, পেস্তাও বাইরে থেকে আসে। মালদ্বীপ পাঠায় অম্বরী তামাকু—হাবসিরা পাঠায় গণ্ডারের শিং, হাতির দাঁত, গোলাম-বাঁদি। হিন্দুস্থান কিন্তু এত সব জিনিস সোনা দিয়ে কেনে না। কেনে বদলি জিনিসপত্তর দিয়ে। কিন্তু হিন্দুস্থান তার জিনিসপত্র বিক্রিবাটার সময় শুধুই সোনা নেবে। এই বিষয়টির ওপর আমি কোম্পানি বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবারের চিঠি কিছু বড় হয়ে গেল। একটি বিষয়ে কোম্পানিকে সজাগ করতেই এই চিঠি। যে-ব্যবসাই ইংল্যাণ্ড আজ হিন্দুস্থানের সঙ্গে করুক না কেন কোম্পানিকে এদেশে সেই সোনা-ই ঢালতে হবে। এরকম অবস্থায় আমি এমন একটি ব্যবসার প্রস্তাব দিতে চাই যেখানে কোম্পানি হিন্দুস্থান থেকে সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারে।

আকবর বাদশা দিশি লাল পাথর দিয়ে সমাধি, মহল, কেল্লা, বাগ, ফোয়ারা বানিয়ে গেছেন। কিন্তু বাদশা শাহজাহান শুধু দিশি পাথরে সন্তুষ্ট নন। তিনি নানান দেশ থেকে পাথর এনে বিশাল বিশাল মসজিদ, সমাধি, মহল, কেল্লা বানিয়ে চলেছেন। এজন্যে তিনি খাজানাখানা থেকে সোনা ঢালতেও পিছপাও নন। শুধু কয়েকজন তুর্কি ওমরাহ বাদশার এই পাথর প্রেমের সুযোগ নিয়ে বেনামায় মধ্য এশিয়া, ইয়োরোপ থেকে নানান রংয়ের মর্মর আমদানি করে প্রচুর সোনা লুটে নিচ্ছে। কোম্পানি বাহাদুর কি একাজে নামতে পারেন না?

নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। দিল্লির গায়ে যমুনার তীরে সেখানে পাথর আসছে দেশ-বিদেশ থেকে। লালকেল্লায় দেওয়ান-ই-আমের চাঁদোয়ায় বিদেশি পাথরের ওপর সোনার কারুকাজ চলছে। আগ্রা দুর্গে মোতি মসজিদের তোরণ, যমুনার দক্ষিণ তীরে বাদশা-বেগম মমতাজ মহলের সমাধি মহলের গম্বুজের খিলান, দিল্লির জামা মসজিদের এবাদত-চাতাল—সর্বত্র যা পাথর, আসছে বাইরে থেকে—যে-সোনায় হিন্দুস্থান এসব কিনছে—তার পাশে এদেশের সঙ্গে আমাদের কাপড়ের ব্যবসায় দশ বছরের মূলধনও দাঁড়ায় না। দুনিয়ার দরিয়ায় আমাদের জাহাজ তো কারও চেয়ে কম নয়।

এই অব্দি লিখে গোব্রিয়েল ব্রাউটন আবার উঠে দাঁড়ালেন। সারা রাজধানী এখন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আগ্রা দুর্গে মিলাদ শরিফের মজলিশ এখনো ভাঙেনি। এই হাভেলির অলিন্দে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আসমান দেখা যায় না। সারাটা বর্ষা জুড়ে তিনি আগ্রার আকাশে মেঘ দেখেছেন। মেঘে তাকিয়ে আগামী দিনের আগ্রাকে আগাম দেখা যায় না।

এইভাবেই আগ্রা চলছে। এইভাবেই হিন্দুস্থান চলছে। মরহুম মমতাজমহল মানুষের মুখে মুখে এখন তাজবিবি। উস্তাদ ইশার হাতে তৈরি সমাধিমহল যমুনার দক্ষিণ তীরে একটু একটু করে মাথা তুলছে। বিশ হাজার কারিগর দিনরাত ধরেই খেটেই চলেছে—কোনো থামা নেই। এই সমাধির নাম এখন

লোকের মুখে তাজমহল। বাদশা শাহজাহান হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতে চান যেন সবসময়—। তাই যেন তিনি এটা বানাচ্ছেন। ওটা—ভাঙছেন। নিজেকেই নিজে উপাধি দিচ্ছেন। সেরকমই ব্যক্তিকে তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন।

গওহরআরাকে জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজমহলের এন্তেকাল। তখন মুরাদ মাত্র সাত বছরের। এই ক'বছরে শাহজাদী জাহানারা যেন প্রায় মা হয়ে ছোট ভাই-বোনেদের ঘিরে রেখেছেন। তবু ওরই ভেতর দারার দিকেই যেন তাঁর বেশি টান। দু'জনে মেশামিশিও বেশি। বাদশা জানেন—দু'জনে দেখা হলে সময়ে সময়ে দিওয়ান আউড়ে ওদের কথাবার্তা শুরু হয়।

কিন্তু মুঘল খানদানে যৌবনে পা দিলেই ভাই বোন দূরে দূরে সরে যায়। ওঁদের মেলামেশা সহজ করে দিতেই বাদশা শাহজাহান দু'জনকেই একদিন দুপুরে শাহজাহানী মহলে ডেকে পাঠালেন। শীত যাবার বেলায় তখন তাঁর শেষ কামড় দিচ্ছে।

বাদশা বললেন, দারা। ক'দিন হলো তুমি বাবা হয়েছো। এখন তোমাকে সংসারের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে—যুগের রীত-রিসালার বাইরে তুমি নও।

তসলিম জানিয়ে শাহজাদা দারা বাদশার চোখে তাকালেন। ওখানে তাঁর আশ্রয়। ওখানেই তাঁর ভয়। না-জানি আব্বা হুজুর আবার কী করতে চলেছেন।

এবার বাদশা শাহজাহান শাহজাদী জাহানারার চোখে চোখ রাখলেন। তুমি শাহী হিন্দুস্থানে আমার শাহজাদী হয়েও তামাম শাহীর চোখে বাদশা-বেগমের জায়গা নিয়ে আছো। তোমার ওপর আমি অনেক ব্যাপারে চোখ বুজে নির্ভর করি জাহানারা—

জাহানারা তসলিম জানিয়ে বললেন, জাঁহাপনা!

—তোমরা বড় হয়েছো। তোমরা দুজন তোমাদের না দেখে থাকতে পারো না। তুমিও শাহী-রীত-রিসালার ওপরে নও। তোমাদের এই মেলামেশা সহজ করতেই—

জাহানারা বললেন, আলা হজরত! আপনি বাদশা হলেও আমাদের আব্বা হুজুর। আপনার কথাই শেষ কথা।

—আজ থেকে তুমি শাহজাদা দারার ধর্ম-মা।

—জাঁহাপনা?

বাদশা শাহজাহান শাহজাদা দারার মুখে তাকালেন। শাহজাদা দারা—

—আলমপনা। আব্বা হুজুর—

—আজ থেকে তুমি শাহজাদী জাহানারার ধর্ম-ছেলে—

—আব্বা হুজুর—

বাদশা যেমন জোর দিয়ে কথা বলছিলেন—যেন সেই জোর দিয়েই পা ফেলতে ফেলতে শাহজাহানী মহল থেকে বেরিয়ে গেলেন। জাহানারা দারার মুখে তাকালেন। মুঘল খানদানে এই রীত-রিসালা—প্রথার কথা শাহজাদী

জাহানারার অজানা নয়।

দেখতে দেখতে শাহজাহানী মহলের দু'দিক থেকে ও'দের দুই মাসি—মেহজাবিন বেগম আর সিতারা বেগম ঢুকলেন। দু'জনের মুখেই হাসি। পাশে পাশে অন্দরমহলের এক তাতার বাঁদির হাতে গোলমুখ সরোঠা জলের এক হাঁড়ি।

মেহজাবিন বেগম শাহজাদী জাহানারাকে বললেন, আজ থেকে তুমি শাহজাদা দারার ধর্ম-মা। ভালোই হলো। আজ থেকে তুমি মরহুম বাজির জায়গা নিলে।

শাহজাদী জাহানারা আকবরি ডোরিয়ার ওপর মসলিনের কামিজ পরে থাকেন। তার ওপর মসলিনের রংদার বাদলাকিনারি ওড়না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাতার বাঁদি হাঁড়ি প্রায় উপুড় করে জাহানারার দুই কাঁধে সেই জল ঢেলে দিলো।

—ভীষণ বিরক্ত হয়ে শাহজাদী বলে উঠলেন, এ কী বেতমিজি?

তাতার বাঁদি ভীষণ ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। মেহজাবিন বেগম হেসে বললেন, এটাই তো নিয়ম। ধর্ম-ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াবার কথা শাহজাদী। অভাবে এই ভিজে ওড়না নিংড়ে নেবো। সেই জল খাবেন শাহজাদা দারা। ভাই হলেও তিনি এখন থেকে ধর্ম-ছেলে।

শীতে সরোঠার জল আরও ঠাণ্ডা হয়। কাঁপতে কাঁপতে শাহজাদী দেখলেন, মাসি সিতারা বেগম তাঁর বুকের ওপরকার ওড়নাটা নিয়ে একটা শাহী গ্লাসের মুখে ভালো করে নিংড়ে তাঁর বুক ভেজানো জলটুকু সাবধানে ধরে রাখছেন। এ ছবি দেখে জাহানারা দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর ভেতরকার কাঁপুনি থামালেন। ততক্ষণে তাতার বাঁদি আগে থেকেই সঙ্গে করে আনা নতুন একখানা ওড়না শাহজাদীর কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে ফেলে দিলো।

শাহজাদা দারা তখন গ্লাসের জলটা খুব সাবধানে খাচ্ছিলেন। যেন এক ফোঁটাও না গড়িয়ে পড়ে। শাহজাদী জাহানারা বুঝতে পেরেছেন—তাঁর আব্বা হুজুর লড়াইতে যেমন—তেমনই জীবনেও সব কিছু আটঘাট বেঁধে এগোন। এই যে আজ শাহজাদা দারাকে তার স্তনধোয়ানি জল খাইয়ে ধর্ম-ছেলের রিস্তাটি পাতানো—এও আগাগোড়াই বাদশা শাহজাহান কিসের পর কী হবে—তা সাজিয়ে রেখেছিলেন। নয়তো কথাটি বলেই তাঁর চলে যাওয়া—আর সঙ্গে সঙ্গে সরোঠার জলের ঘড়া হাতে তাতার বাঁদিকে নিয়ে দুই মাসির এখানে হাজির হওয়া এতটা অঙ্কের মতো হতে পারতো না।

দারার হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে জাহানারা ভালো করে ভাইয়ের মুখে তাকালেন। এই ভাই তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি ডাগরটি হয়ে উঠেছে। বালক, কিশোর থেকে এখন আস্ত একজন মানুষ। নাদিরার খসম। একটি মেয়ের আব্বা হুজুর। শাহজাদা সুজা নারোয়া কিংবা বাগোয়ানের জঙ্গলে শিকারে যায়। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ফরজ থেকে এসার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। আজি নিজে পাকা নমাজি। দারা ভাইয়া জুম্মার নমাজ আদায় করেই নিজের খেয়ালে সেতার, রুমি আর জামির কবিতায় মেতে থাকে।

দারার মাথায় আলতো করে আদর মাখানো হাত রাখলেন জাহানারা।—আজ থেকে আমি তোমার আম্মিজান।

—সে তুমি অনেকদিনই বাজি।

একথায় সিতারা বেগম আর মেহজবিন বেগম একই সঙ্গে হেসে উঠলেন। সে কি শাহজাদা ? একই সঙ্গে বাজি—আবার আম্মিজানও ?

কথাটি বললেন মেহজবিন। নিজের মাসি। তবু ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলেন জাহানারা। এই আওরত বড় বেশি কথা বলে। সব সময় তো কথা বলার নয়। কিছু সময় আছে চুপ করে থাকার। তখন তাকিয়ে থেকে এই দুনিয়ার সুষমা, সৌরভ চোখ ভরে—মন ভরে নিয়ে নিতে হয়। জাহানারার এক এক সময় মনে হয়—মেহজবিনের মতো আওরত আম্মিজানের বোন হয় কী করে ?

শাহজাদা দারা খুব লজ্জা পেলেন। তিনি দৌড়ে শাহজাহানী মহল থেকে বেরিয়ে গেলেন। জাহানারার খুব কষ্ট হলো। তাঁর ইচ্ছে ছিল—আর একবার নিজের হাতখানি দারার মাথা, দুই চওড়া কাঁধ আর বুকের ওপর দিয়ে স্নেহভরে বুলিয়ে দেন। এতদিন আমি ওর বাজি ছিলাম। এবার থেকে পাতানো আম্মিজান।

মেহজবিন বেগম আবার কলকল করে কী যেন বলে উঠছিলেন। তাঁর মুখে কঠিন করে তাকালেন জাহানারা। সঙ্গে সঙ্গে মেহজবিন বেগম থেমে গেলেন। একজন কলকলানো খুবসুরত আওরত যদি ভয়ে আচমকা চুপ করে যান—তাঁর চোখের চাউনি যদি ভীরু হয়ে পড়ে—তবে তা দেখতে বড় করুণ লাগে।

মেহজবিনের সঙ্গে সঙ্গে সিতারা বেগমও শাহজাহানী মহল থেকে প্রায় মাথা নিচু করে নিমেষে বেরিয়ে গেলেন। এখন এখানে শাহজাদী জাহানারা একদম একা। শীতের আগ্রার দুপুর বড় মনোহারী। সুখের। মান্ডিতে মান্ডিতে নানান দেশের পসরায় মানুষ-জনের ভিড়। সারা রাজধানীর আলাদা একটা কলতান আছে। তার ভেতরে মানুষের হাসি, ঘোড়ার পায়ের টগাবগ, হাতির বুকভরা ডাক, পোষা ময়ূরের গলা চিরে ফেলা আওয়াজ সবই মিশে থাকে। সেই কলতান যেন সুর হয়ে সব সময় রাজধানীর আকাশে উঠে যাচ্ছে। এর ভেতর জাহানারা একাকী বিশাল শাহজাহানী মহলের চাঁদোয়ার নিচে একটি স্তম্ভে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। অলিন্দের বাইরেই ঝকঝকে রোদ। ভেতরের আবছা ভাবকে স্তম্ভের গায়ে আলো ঠিকরে পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল।

শাহজাদী জাহানারা তাঁর মাসি কলকলানো মেহজবিন বেগমের আচমকা চুপ হয়ে যাওয়া—ভীরু চাউনি নিয়ে এখান থেকে নিমেষে সরে যাওয়া কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তাগদ বড় সুখের। তাগদ বড় দুঃখের। শিশুবেলায়—ওসবের বালাই থাকে না বলেই তখনকার স্নেহ ভালোবাসা বড় স্বচ্ছ—সহজ। কিন্তু ক্ষমতার চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে তাকে ঘিরে প্রার্থীর ভিড়। তাকে দেখেই ভয়। তাকে দেখেই বা তার কঠিন চাউনিতে অন্য মানুষ ভীরু হয়ে পড়ে। এ যে কী যন্ত্রণার—যে জানে সে জানে।

আজ তামাম হিন্দুস্থান জানে বাদশা শাহজাহানের মেজাজ-মর্জির চাবিকাঠি

—কোনো হুকুমে গিয়ে পেঁীছনোর ইচ্ছাশক্তি উজির সাদুল্লা খাঁয়ের হাতে নয়। তা যদি থেকে থাকে কারও হাতে—তিনি শাহজাদী জাহানারা—তিনি খানিক হলেও কিছু বটে—শাহজাদা দারা।

জাহানারা এখন একা বুঝতে পারেন—তাবত তাগদের ফোয়ারা বাদশাকে ঘিরে যারা থাকে—তাদের অনেকেরই থাকার আশ্রয়, খিদের রুটি, জীবন চালানোর মোহর—আশরফি বাদশার খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে।

দুনিয়ার সব যুগের তাবত বাদশা যে চালে চলে আসছেন—বাদশা শাহজাহান তার চেয়ে ভিন্ন কোনো চালে চলছেন না। রোজ ভোরে ঘুম ভাঙলে তিনিই ইচ্ছা—তিনিই হিন্দুস্থানের সূর্য। বিচার, শিকার, শাস্তি, দয়া, প্রার্থনা সবই চলে সমান শাহী চালে। এমনকি খোয়াব, রাগ, অনুরাগেরও সেই সমান বাদশাহী কেতা।

রমজানের তিরিশ দিনের রোজার মাসের ভেতরেই তিনি নিরম্বু, নির্জলা দশায় আগ্রা থেকে পাড়ি জমিয়েছেন। যাবেন লাহোর। গতরাতে থানেশ্বর ছাড়ার সময় ঈদের চাঁদ দেখে তিনি তাঁর হাতি ফিল-ই-ফতের পিঠে গাদেলায় বসে মোহর মিঠাই ছড়িয়েছেন। পাশেই ফতে-জং-এর পিঠে দারা, নাদিরা। নাদিরার কোলে দু'মাসের মেয়ে। হিন্দুস্থানের বাদশার পয়লা নাতনি।

তিন রিসালা ঘোড়সওয়ার, বারোটি বেহেদর জাতের বিশাল উঁচু উঁচু হাতি আর গুচ্ছের বন্দুকচী নিয়ে বাদশার এই বিরাট কাফেলা সন্ধের আগে ফতেগড় পেঁীছতে চায়। কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি এগোনো যাচ্ছে না। বাদশা দেখলেন শাহজাদা দারার ফতে-জং পিছিয়ে পড়ছে! শাহজাহানের কপালে ভাঁজ পড়লো। তিনি আসমানে তাকিয়ে দেখলেন, কোনো মেঘ নেই। রমজান মাসের এই ভোর ভোর শাহী সড়কের দু'ধারের গাছপালার একটি পাতাও নড়ছে না। যেন বাতাস নেই। ফতে-জং-এর পিঠে গাদেলার ওপর ঝালরদার ছাতাটি কি রোদ আটকাতে পারছে? আগ্রা ছাড়ার পর থেকেই দারার মেয়েটি অসুখে ভুগছে। সন্ধের দিকে গা জুড়িয়ে আসে। কিন্তু শেষরাত থেকে অতটুকু বাচ্চার গা-পিঠ—সব যেন আগুনে তেতে ওঠে। সবচেয়ে কষ্ট হয় বাদশার—তিনি গাদেলায় বসে ক'দিন ধরেই দেখতে পাচ্ছেন—কিছু করতে না পেরে শাহজাদা দারা মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। নতুন বাবা।

ফতেগড়-সিরহিন্দ সড়কের পাশে কাফেলা থামল। দাখিলা—হাজিরা, তাম্বু-বরদারের দল আগাম এসে সড়কের গায়ে বিরাট বিরাট পিপুল গাছের ছায়া তালাও দেখে ডোরাসানা তাবুর উদু গেড়েছে।

সূর্য উঠি উঠি। খোদ বাদশা শাহজাহান হাতি থেকে নেমে মাটিতে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর খানিকটা জল নিয়ে মাথায়, দু'চোখে, কনুইতে দিলেন। আজ ভোরে ঈদের নমাজে হিন্দুস্থানের এক ফাঁকা মাঠে তিনিই আলেম। এই ঈদের সকালে ফরজের নমাজে তাঁর একটাই ইবাদত—খোদা! দারার মেয়েকে ভালো করে দাও। আজ এই ঈদের ভোরে সারা জাহান হাসছে। হাসছে না শুধু আমার ছেলে—দারা। তার মুখে তুমি হাসি ফোটাও।

বাদশার পেছনেই নমাজের সামিল হলেন শাহজাদা দারা। দূরে আবদার-খানার লাচ্ছা সিমাই রান্না হচ্ছে। বাতাসে তার মশলাদার খুশবু। নাদিরা বেগম মেয়ের আরোগ্য কামনা করে দুধে খুরমা ভিজিয়েছেন। ফেতরায় গরিব-দুঃখীদের বিলোবার জন্য আশরফি, দাম-দামড়ি বোঝাই দু'টি থেরিয়ার মুখ খুলেছেন তিনি।

বাদশার কাফেলা এসে থেমেছে জেনে দেহাতি মানুষজন দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

বাদশা শাহজাহান বলতে শুরু করলেন—

আসসামে আল্লা হোলেমান হামিদা।

সোবান রব্বের আলামিন

সোবান কুদ্দু সোবান কুদ্দু

সঙ্গে সঙ্গে সারা কাফেলার মানুষজন একই সুরে সুর মেলালো। ভোরবেলার মাঠঘাট ঈদের খুশিতে ঝলমল করে উঠছে। বিশাল তালাও থেকে শুঁড়ে জল তুলে ফিল-ই-ফতে শূন্যে ফোয়ারার মতো ছেটাচ্ছিল। তাই দেখে নাদিরার মনে হলো—এ'বুঝি কোনো ভালো কিছুর লক্ষণ। তিনি নিজের গাল নামিয়ে মেয়ের মুখে রাখলেন।

নাঃ! সেই একরকমই। পুড়ে যাচ্ছে। এখনো মেয়ের চোখের দৃষ্টি ঠিক হয়নি। অসুখে না পড়লে এতদিনে ঠিক হয়ে যেতো। জন্মে ইস্তক কেন যে এত ভুগছে। নাদিরা এবার তাঁর মেয়েকে নিজের কোলে তুলে নিলেন।

। পঁয়তাল্লিশ ।

রজবের মাস থেকেই দুনিয়াটা জ্বলতে থাকে। রোদ রাগে রাগে তেতে ওঠে। তারপর রমজান মাসভর রোজা রেখে কাল সন্ধ্যায় ফিল-ই-ফতের পিঠে গাদেলায় বসে ঈদের দ্বিতীয়ার ফালি চাঁদ দেখছেন বাদশা শাহজাহান।

আজ সেই ঈদ। দিন শুরুর নমাজে আলেম হয়ে খোদ বাদশা দোয়া করেছেন। শাহজাদা দারার মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠুক।

আল্লাতালা কী চান তা বোঝা যায় না। রোদে সারা হিন্দুস্থান যেন জ্বলে যাচ্ছে। দূর-দূরান্ত অব্দি ফাঁকা মাঠে বাদশার কাফেলার হাতি ঘোড়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাঁড়ানো। এমন খুশির দিনে কারও মুখে হাসি নেই। মাত্র দু'মাসের মেয়েটি যেমন ছিল তেমনই আছে। দুপুরের পর একবার চোখ উল্টে গেল। এই বুঝি যায় যায়। শাহজাদা দারার দিকে তাকাতে পারছেন না বাদশা। অস্থির শাহজাদা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে কঠিন রোদে একা একা হাঁটছেন। এগিয়ে গেলেন। আবার ফিরে এলেন।

এমন সময় দারার তাঁবুর ভেতর থেকে শাহজাদী জাহানারা বেরিয়ে এলেন।

বাদশা শাহজাহান খানিক দূর থেকে শাহজাদীকে দেখেই তাঁর নিজের তাঁবুর হাতায় রওয়ান-তখত থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

শাহজাদী কাছে এসে দাঁড়াতেই বাদশা সামান্য ঝঁুকে কিছু বলতে গেলেন। তার আগেই জাহানারা বললেন, একই রকম আব্বা হুজুর।

—একটুও কমেনি ?

—না হজরত।

—এখন সে কোথায় ?

—নাদিরা বেগমের কোলে।

বাদশা শাহজাহান আকাশের দিকে তাকালেন। কোথাও কোনো মেঘের ছায়া নেই। সূর্য পশ্চিমে কিছু ঢলে পড়ে থানেশ্বর-ফতেগড়-সিরহিন্দ শাহী সড়কের দিক থেকে তরল জলের মতোই আলো আর তাপ ঢেলে চলেছে।

বাদশা বললেন, সবাইকে ডাকো। আজ আমি নফলের নমাজ আদায় করবো।

—আসরের নমাজের সময় যে হয়ে এলো আব্বা হুজুর। এখনই নফল পড়বেন ?

—হ্যাঁ জাহানারা। দিন পড়ে এলো। নফলের নমাজে আমি আল্লাতালার কাছে ফের দোয়া জানাবো। আমার দারার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন খোদাতালা।

কাবা শরীফের দিকে মুখ করে বাদশা শাহজাহান দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে শাহজাদা দারা। সামনে পশ্চিমের আকাশে পড়ন্ত সূর্য। বাদশা নিয়েত দিয়ে শুরু করলেন—

নয়তোয়ান উসালিয়া লিল্লাহে তা আলা

শাহজাদা দারা তাঁর আব্বা হুজুরের গলার সঙ্গে নিজের গলা মেলালেন। দু'জনের হাত কোমরের কাছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে আসমানের দিকে তোলা।

রাকাতে সালাতে নফল

মাতোয়া জাহান ইলা জেহেতেল

শাহজাদা দারা কিছুতেই চোখ বন্ধ করবেন না। সোজা সূর্যের দিকে তিনি তাকিয়ে। দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এ চোখ যদি দগ্ধ হয় তো হোক।

কাওবাতে সারিফাতে।

আল্লা হু আকবর—

সারা দিগন্ত লাল করে দিয়ে সূর্য যখন সারাদিন পর ডোবে ডোবে—ঠিক তখন নাদিরা বেগম তাঁর তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটি কোলে। সারাদিন পর ঈদের সন্ধ্যার প্রথম হালকা বাতাসে নাদিরার এলো চুল তাঁর মুখের দু'পাশে কালো কেশর হয়ে উড়ছে। দূরে ফাঁকা মাঠে শাহজাদা দারা একা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নাদিরাকে দেখে খুব আস্তে তাঁর দিকে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলেন। যেন সবই জানা হয়ে গেছে।

নাদিরা মেয়েটিকে দারার দিকে তুলে ধরে কেঁদে উঠলেন। নেই—হিন্দুস্থানের বাদশা লালে লাল আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সূর্য খসে পড়ার আগে, নাদিরার মুখের ছোট্ট 'নেই' কথাটা যেন বা খুদে এক পাখি হয়ে সূর্যের দিকে ছুটে চলেছে। আর নিচে তাঁরই শাহজাদা—দারার মুখখানি কান্নায়—কষ্টে

ভেঙেচুরে যাচ্ছে। এখুনি আকাশ অন্ধকার করে সূর্য ডুবে যাবে। দারা তাঁর মেয়ের মুন্দত নাদিরা বেগমের হাত থেকে নিজের দু'হাতের ভেতর নিলেন। শাহী হাতির ভৈ, মেঠের দল, ঘোড়ার ভিস্তিরা, উটের সারবানরা যে-যার মতো রান্না চাপাবে বলে আসমানের নিচে দূরে এখানে-ওখানে আগুন জ্বালছে।

শাহজাদা দারাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাদশা শাহজাহান এবার চোখ বুজে বলতে লাগলেন—

ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাহে রাজেউন্—

তুমি গেছো—পরে আমিও যাচ্ছি—পরে আমিও যাচ্ছি—

বাদশা চোখ খুলে চমকে উঠলেন। তাঁর সামনে শাহজাদী জাহানারা দাঁড়িয়ে। হাতে তাঁর অভ্রের স্বচ্ছ বাতিদান।—তুমি?

—হ্যাঁ আলমপনা—

—বাতি-বরদার তো রয়েছে। তুমি কেন?

—আব্বা হুজুর। আম্মিজান থাকলে তো দেখতেন—আপনার তাঁবুতে সব ঠিকঠাক আছে কিনা—

বাদশা কোনো কথা বললেন না খানিকক্ষণ। তারপর খুবই আস্তে বললেন, তুমি কি জানো জাহানারা—তোমারও আগে আমার আরও একটি মেয়ে হয়েছিল। আমারও পহেলা আওলাদ একটি মেয়ে।

—হ্যাঁ হজরত। তার নামে ছিল হুরউন্নিসা—আজমিরে এন্তেকাল হয়েছিল তার—শুনেছি, আমার তখন দু'বছর বয়স—

—হুরউন্নিসার এন্তেকালে আমার তো এমন হয়নি জাহানারা?

শাহজাদী জাহানারা তখন তখনই কিছু বলতে পারলেন না। একটু পরে বললেন, হাজার হোক পহেলা আওলাদ। দারা খুবই ভেঙে পড়েছে। ভেবেছিলাম—শাহজাদার কাছাকাছি থাকি। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলাম, এখন শুধু দারা-নাদিরারই কাছাকাছি থাকা দরকার। ওরা দুজন নিজেদের ভেতর কেঁদে কেটে কিছুটা হালকা হোক আগে।

বাদশা যেন জাহানারার কোনো কথাই শুনতে পাননি। তিনি তাঁর আগের কথার ঘোরের ভেতরেই বললেন, আমি কি তাহলে ইনসান নই?

—জাহাপনা! একথা বলছেন কেন? —জাহানারা তখনো বাদশার কথার কোনো কূলকিনারা করতে পারেননি।

—দারার এই আওলাদের মতো সেও তো ছিল আমার পহেলা আওলাদ! সেও ছিল এমনই একটি মেয়ে!

শাহজাদী জাহানারা ইঙ্গিতে কাছাকাছি দাঁড়ানো একজন দাখিলাকে ডেকে তার হাতে বাতিদানটি ধরিয়ে দিলেন। সে বাতিদান নিয়ে বাদশার তাঁবুর ভেতর রাখতে চলে গেল। অন্ধকারে এখন বাদশার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝা যায়—তাঁর ভেতর ঝড় বইছে।

জাহানারা মনে মনে হিসেব কষে বললেন, তখন আপনার বয়স ছাব্বিশ। আর দারার এখন মোটে উনিশ! তাছাড়া আম্মিজানের কোলে পরপর আমরা

তিন ভাইবোন এসে গেছি আব্বা হুজুর।

—তবু তোমাদের আম্মিজান তো সেই পহেলা চোট কোনোদিন ভুলতে পারেননি জাহানারা। কিন্তু আমি ? আমি কি পাথর ছিলাম জাহানারা ? আমার তখন কিছু হয়নি কেন ? আমি কি ইনসান নই ?

জাহানারা বাদশার বুকের কাছে এগিয়ে দাঁড়ালেন। আপনি হিন্দুস্থানের সেরা ইনসান হজরত। আপনি সবচেয়ে জবরদস্ত ইনসান। তখন তো আপনি শাহজাদা খুর্‌রম—বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে মুঘল ফৌজের সিপাহ্‌-সালার হয়ে মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে দক্ষিণে গেছেন। আপনার কি তখন শোকের সময় ছিল আব্বা হুজুর। আপনি তখন জান নিয়ে খেলছেন। সেসব কথা এখন ইতিহাস।

বাদশার মনে হলো আমি কি ইনসানিয়াত হারিয়ে ইতিহাস হয়ে বসে আছি ! দুনিয়ার কোনো মেয়েই তার আব্বা হুজুরকে ছোট করে দেখতে চায় না। আর জাহানারা তো দেখবেই না। শাহজাহান তাঁর মুখ দেখার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল না। মাঠের ভেতর এখানে-ওখানে রান্না-বান্নার আগুন। আসমানে এতক্ষণে চাঁদ দেখা দিলো। বাদশার বিশাল কাফেলা অন্ধকারে বিলকুল হারিয়ে গেছে। কে বলবে আজ ঈদ ! শাহজাহান বললেন, জাহানারা—

—জাঁহাপনা—

—তোমার তাঁবু তুলে শাহজাদা দারার তাঁবুর পাশেই বসাবে ওরা। আজ রাতটা তুমি নজর রাখবে।

শাহজাদী মাথা নাড়লেন।

—নাদিরা সামলে উঠলেও দারার সময় লাগবে।

—শাহজাদার ধাত অনেকটা আম্মিজানের মতো—

বাদশা কোনো কথা বললেন না। পরপর তাঁবুর সারি। তারপরই হাতি, ঘোড়া, উটের দল। এখানে ওখানে পদাতীরা শুয়ে বসে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকাঠুকি। উটের পা বদলানোর আওয়াজ। অন্যদিন হলে এতক্ষণে ফৌজি ফুর্তিবাজরা যে-যার দেশোয়ালি গানবাজনা জুড়ে দিতো। নিদেন পক্ষে বদকশানি বন্দুকবাজদের সন্তুরের পিড়িং পিড়িং।

নাদিরা বেগম কথা বলতে পারছিলেন না। শাহজাদার তাঁবুর হাতায় এইমাত্র বড় একখানা কাঠের ঢাল নামালো দু'জন সেপাই। কান্নায় ফুলে উঠতে উঠতে নাদিরা দেখলেন, শাহজাদার দু'খানা হাত বুকের ওপর মেয়ের মুদ্দত চেপে ধরে আছে। চাঁদের সামান্য আলোয় সবই খুব আবছা।

শাহজাদা এবার সেই কাঠের ওপর মেয়েকে শুইয়ে দিলেন।

নাদিরা চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে—

—আর লাগবে না। কোনোদিনই লাগবে না।—বলতে বলতে অন্ধকারের ভেতর বেগমকে বললেন, মুলতানি মাটি কোথায় ?

নাদিরা নিঃশব্দে হু হু করে কেঁদে পড়লেন। ওইটুকু শরীরে কোথায় মাখাবেন শাহজাদা !

—তাই বলে সারা গা সাফসুতরো না হয়েই চলে যাবে ? নিয়ে এসো।

কিছুই নিয়ে আসার দরকার ছিল না নাদিরা বেগমের। মুলতানি মাটি, রানীপসন্দ সুরমা, ফতেহাবাদি কর্পূর, ইস্পাহানি আতর নিয়ে হাজিরা একটি বাঁদি দাঁড়িয়েই ছিল। তার চোখ দিয়েও অন্ধকারে জল গড়াচ্ছিল।

মুলতানি মাটি মাখাতে গিয়ে শাহজাদার আঙুল টের পেল—দু'মাসের মেয়ের বুক কতটুকু চওড়া হতে পারে—হাতের কবজিই বা কেমন। তবু জেদের বশে মাটি মাখাতে মাখাতে দারা নিজেকেই শুনিয়ে বললেন, না সাজিয়ে মেয়েকে অলবিদা জানাই কী করে নাদিরা !

বাঁদি একবার সাজাবার পাত্রটি হাতে ধরে তসলিম জানিয়ে খুকে বললো, যদি হুকুম করেন শাহজাদা—

—না। আমার মেয়েকে আমি নিজেই আজ সাজাবো—

একে একে শাহজাদা সুগন্ধী আতর মাখালেন। কর্পূরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন সারা গায়ে। টেরও পেলেন না,—কখন শাহজাদী জাহানারা আলো হাতে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বুজে আসা চোখে সুরমা কাঠি টানতে গিয়ে খেয়াল হলো।—আরে! মুখখানি যেন হেসে উঠেছে। কী সুন্দর মুখ। দ্যাখো—দ্যাখো নাদিরা—

নাদিরা বেগম কোনো কথা বলতে পারলেন না। শাহজাদার পেছন থেকে শাহজাদী জাহানারা বললেন, হ্যাঁ। খুব সুন্দর মুখ।

—তুমি কখন এলে বাজি ?

—আমি তো সবসময় তোমার পাশে পাশে আছি ভাইয়া—এই নাও।

দারা জাহানারার হাত থেকে ঘিয়ে রঙের মসলিনখানি নিলেন।

—এবারে ওকে ভালো করে ঢেকে নাও।

উত্তর শিয়র করে নিজেই দারা মেয়েকে মাটির নিচে শুইয়ে দিলেন। ছোট্ট মাথাটি অতি সাবধানে পশ্চিমমুখো করা হলো। হিন্দুস্থানের এক অজানা প্রান্তরে মাটির নিচে মেয়েটি শুয়ে থাকলো। কাবা শরীফের দিকে মুখ করে। নিশুতি এই রাতে। অন্ধকারে। নিজের হাতেই শাহজাদা দারা সব ঝুরোমাটি নিচে নামিয়ে দিতে থাকলেন। কোনোরকম খন্তা ছাড়াই। দুই হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে।

মাথার ওপর ঈদের চাঁদ ক্ষয় হয়ে আসছিল। শাহজাদা দারা এবার মেয়েকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে তৈরি হলেন। ঝুরো মাটি থেকে তিনটে টুকরো হাতে তুলে নিলেন। অতটুকু এক ইনসানকে এমন বিশাল প্রান্তরে ফেলে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। একবার মনে হলো—মাটি সরিয়ে ফের ওকে বুকে করে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এন্তেকালের পর ইনসান শুধুই মুন্দত। সে বাদশাই হোন—আর মিশকিনই হোক। এন্তেকালের পর সবাই সমান।

এবার শাহজাদার সুরেলা গলা সারা চরাচরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি হাতের মাটির ঢেলা তিনটি একে একে মেয়ের কবরে ছুঁড়ে দিলেন।

মিনহা খালাক না কুম ।
অফিহা নইদকুম
অফিহা নোখ্রেজো কুম
তারাতান নোখরা—
বলতে বলতে দারার গলা বুজে এলো। তিনি বারবার বলতে লাগলেন—
তারাতান নোখরা
তারাতান নোখরা
তখন তার ভেতর থেকে এই কথাগুলোই উঠে আসছিল—বারবার—একই কথা—
তোমাকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছিল
মাগো ! তোমাকে সেই মাটিতেই দেওয়া হলো
তোমাকে এখান থেকেই আবার জীবিত করা হবে
তারাতান নোখরা—তারাতান নোখরা
মা আমার ! এখান থেকেই তোমাকে আবার জীবিত করা হবে—

ভোররাতে নাদিরা বেগম ভয় পেলেন। শাহজাদা ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে নড়ে উঠছেন। সারা গা পুড়ে যাচ্ছে তাঁর। নিজের কথা ভুলে যেতে হলো নাদিরাকে। সবে মেয়েকে হারিয়েছেন। এরপর কী ? এরপরে কী আছে নসিবে ?

নাদিরা বেগম ছুটতে ছুটতে পাশের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। জাহানারা ঘুমোচ্ছিলেন অঘোরে। ঈদের সারাটা দিন এমনই গেছে কাল। সারা হিন্দুস্থানে এমনভাবে কেউ শাহজাদীর ঘুম ভাঙাতে সাহস করবে না। নাদিরার হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠে বসলেন জাহানারা।

—বাজি ! একবার আসুন। আপনার ভাইয়া কেমন করছেন—

—তুমি যাও। আমি এখুনি আসছি।

খানিক বাদে জাহানারা নিজের তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। রাতের শেষ অন্ধকার। এবার আকাশ লাল হয়ে উঠবে। বাদশার বিশাল কাফেলা ভোর হলেই রওনা দেবে বলে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। হাতির দল তাদের বরাদ্দ আখ চিবোনো এই শুরু করলো বোধহয়। তারই একটা একঘেয়ে শব্দ কানে এলো শাহজাদীর।

জাহানারা গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই দারা তাঁর তাঁবুর ভেতরকার সুখদোলায় উঠে বসলেন। বাজি এসেছে ?

—উঠো না। শুয়ে থাকো ভাইয়া। আমরা এবার ফতেগড় রওনা হবো। কালই তো সন্ধে সন্ধে পৌঁছে তাঁবু ফেলার কথা ছিল। তাই না ?

শাহজাদা গোড়ায় কোনো কথা বললেন না।

জাহানারা বললেন, হেকিম-বৈদ যা-ই বলো—ফতেগড়ের আগে তো পাওয়া যাবে না নাদিরা। ফতে-জং-এর পিঠে ভাইয়াকে নিয়ে গাদেলায় বসতে পারবে না ?

নাদিরা বেগম মাথা নেড়ে বোঝালেন—তিনি পারবেন। পারতেই হবে তাঁকে। শাহজাদার গা পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠছেন।

হঠাৎ শাহজাদা বলে উঠলেন, এখন থেকে আমি কোথাও যাবো না বাজি।

—কেন? তা কী করে হয়! আমরা সবাই যে আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের সঙ্গে লাহোর চলেছি ভাইয়া—

ঝাঁকুনি দিয়ে ফের কেঁপে উঠলেন শাহজাদা। কাঁপতে কাঁপতেই বললেন, লাহোর যাবার রাস্তাটাই বদনসিবিতে ভর্তি বাজি—

—তা কখনো হয় ভাইয়া! তুমি হিন্দুস্থানের মুঘল শাহীর পহেলা শাহজাদা। তোমার পায়ের নিচে সব রাস্তাই সমান, সরল। তা যদি না হয় তো মুঘল শাহজাদা কি তা সহজ করে নিতে পারবে না?

—সেবারে লাহোর থেকে কাবুল যাবার পথে নাদিরা ভারি বিমারিতে পড়ে গেল। আমি আর যাবো না এ-পথে। আমি এখানেই থেকে যাবো বাজি।

—অবুঝ হয়ো না ভাইয়া। বলতে বলতে ভাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন জাহানারা। ফের বললেন, খানিকবাদেই আমরা সবাই রওনা হয়ে যাবো।

—তোমরা যাও। আমি এখান থেকে আর কোথাও যাবো না।

—এখানেই থেকে যাবে! এই ফাঁকা মাঠে? কেন দারা?

শাহজাদা চোখ বুজে ফেললেন। চোখের দু'কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো। শাহজাদার ঠোঁট কেঁপে গেল। এখানে আমার ছোট্ট মেয়েটা শুয়ে আছে। একা—

জাহানারা কোনো কথা বলতে পারলেন না। চোখ নামিয়ে নিলেন। তখন শাহজাদা একা একা বলেই চলেছেন—

তোমাকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছিল
সেই মাটিতেই তোমাকে দেওয়া হলো
তোমাকে এখান থেকেই আবার জীবিত করা হবে
তারাতান নোখরা—তারাতান নোখরা

শাহজাদার একা একা কথা বলে যাওয়ার ভেতর ভোরের একটা পাখি এসে তাঁবুর চিলমন-অলিন্দে বসলো।

তাকে দেখেই দারা থেমে গেলেন। একদৃষ্টিতে পাখিটাকে দেখতে দেখতে বললেন, ও এইমাত্র এলো। চিনতে পেরেছো?

জাহানারা বা নাদিরা কেউই কোনো কথা বললেন না।

দারা ডাকলেন। আয়—এখানে আয়—!

শাহজাদার হাত নাড়ায় পাখিটা উড়ে গেল।

দারা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ওই যায়—ওই—এবার সুর্বে গিয়ে থামবে। ওখান থেকেই ওকে আবার জীবিত করা হবে—

এদিন রাতটা ফতেগড়ে একরকম কাটলো। বাদশার হুকুমে চারজন

ঘোড়সওয়ার সেখান থেকে ভোর ভোর লাহোর রওনা হয়ে গেল। লাহোর দুর্গের হেকিম উজির খাঁকে বাদশা জরুরি এত্তেলা দিয়েছেন। যে করেই হোক আসতে হবে। শাহজাদা দারা অসুস্থ।

পরদিন ভোর ভোর বাদশার কাফেলা ফতেগড় ছাড়লো। সন্ধের ভেতর সিরহিন্দ পৌঁছে সেখানে রাতটার জন্যে তাঁবু ফেলা হবে। ঘন, ঘিঞ্জি বসতির ফতেগড়কে এড়িয়ে বাদশার তাঁবু পড়েছিল ফতেগড় ঢোকার মুখে।—ত্রিকূট পাহাড়ের পায়ে। সারাটা দিন রোদে পুড়ে দীঘির জল, ঘোড়ার রেকাবের পেতল, রাস্তার পাথর গরম হয়ে থাকে। বিকেল হলে তবে ওরাও ঠাণ্ডা হয়। সারাটা পথ নাদিরা বেগম শাহজাদাকে নিয়ে ফতে-জং-এর পিঠে গাদেলার ভেতর শাহী ছত্রের ছায়ার নিচে কাটান। দুধে ভেজানো খোবানি ছাড়া কিছুই দেওয়া যাচ্ছে না শাহজাদাকে। তাও মাঝে মাঝে উগরে দিচ্ছেন দারা।

দুপুরের দিকে বাদশার হাতি এসে শাহজাদার হাতির কাছাকাছি দাঁড়ালো। শাহজাহান দারার মুখে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এ কী চেহারা শাহজাদা! শাহজাদা বাদশার মুখে তাকিয়ে। বাদশা দেখলেন, দারা যেন ভেঙেচুরে গেছে। চোখে সেই আলো কোথায়?

শাহজাহান চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কাফেলার যেদিকটায় বন্দুকচীদের দঙ্গল—সেখানে নিজের হাতির পিঠে বসে জাহানারা। হঠাৎ তিনি দেখলেন, বাদশার হাতি তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে।—এই দিনদুপুরে বাদশার উষ্ণীষে বসানো নীলাটা জ্বলজ্বল করছে।

বাদশাকে পিঠে নিয়ে ফিল-ই-ফতে শাহজাদীর হাতির কাছাকাছি হতেই শাহজাহান গাদেলার ভেতর উঠে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি জাহানারাও। দাঁড়িয়েই শাহজাদী তসলিম জানালেন বাদশাকে। জাঁহাপনা! আমাকে ডাকলেই পারতেন—

বাদশা সোজা বললেন, দারার কাছে যাও তুমি। নাদিরা পারবে বলে আমার মনে হয় না। তুমি একবারটি যাও জাহানারা—

শাহজাদী কোনো কথা বললেন না। পায়ের নিচের ডোরিতে টান দিতেই হাতির ভৈ ফিরে তাকালো।

সরোঠার জল কালো রংয়ের মাটির হাঁড়িতে রেখে লতাপাতা দিয়ে হাঁড়ির চারদিক ঢাকা। সে-হাঁড়ি হিসারের দিককার বড় বড় বলদে টানা গাড়িতে ছইয়ের ভেতর পরপর সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লাহোর অব্দি এই ব্যবস্থা। গরমের দিনে শাহী কাফেলায় এই নিয়মেই খাবার জল ঠাণ্ডা রাখা হয়।

সেই জল দিয়ে বারবার কপাল মুখ মুছিয়ে দিয়েও নাদিরা বেগম শাহজাদার তাপ কমাতে পারছিলেন না। জাহানারা এসে ওঁদের গাদেলায় বসেই দারার গায়ের নাদিরি জামাটা একদম খুলে দিলেন। জামার দু'একটা চুনি বসানো ঘর জাহানারার হাতের টানে ছিঁড়েই গেল।

শাহজাদীর সেসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নিজের ওড়না আগা-গোড়া সরোঠার ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে নিয়ে বারবার শাহজাদার বুকে—ঘাড়ে—

পেটে দিতে লাগলেন।

ফতে-জংয়ের পিঠের ওপরকার শাহী ছাতার বাইরেই কঠিন ঝাঁঝালো রোদে দুনিয়া পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। হাতির পথ ভাঙায় গাদেলার ভেতরে কয়েকটা নাশপাতি আঙুরের থাক থেকে গড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক করছে। তারই একটা হাতে তুলে নিয়ে নাদিরা বেগম বললেন, শীতের সময় হলে আরও ঘন ঘন ঠাণ্ডা জল দেওয়া যেতো বাজি—

জাহানারা হেসে ফেললেন। এখনো তো ঠাণ্ডা জলের অভাব নেই নাদিরা।

নাদিরা তখন তখনই গুছিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ছিল, কাবুল যাবার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে শাহজাদা দারা আঁজলা করে তুষার নিয়ে তাঁর কপালে—পুড়ে যাওয়া ঘাড়ে গলায় মাখিয়ে দিয়েছিলেন। সময়টা ছিল শীতের।

জাহানারাই বললেন, শীতে যেমন সুবিধে—অসুবিধেও অনেক। একটু এদিক ওদিক হলেই বুকে ঠাণ্ডা বসে যায়।

বিকেল পড়ে আসার মুখে শাহজাদার গায়ের তাপ কমে এলো। খবরটা পেয়েই বাদশা তাঁর তখত্-রওয়ানের নিচে রাখা আশরফি নিয়ে মুঠো করে রাস্তায় ফেলতে লাগলেন। শাহী কাফেলা তখন সিরহিন্দের বসতি এলাকায় ঢুকে পড়েছে। সে কাফেলার জৌলুস দেখতে রাস্তার দু'দিকেই ভিড়।

অন্য সময় হলে বাদশার এগোনোর পথ সাফ রাখতে ঘোড়সওয়াররা সপাং সপাং কোড়া মেরে আগাম রাস্তা ফাঁক করে দেয়। লোকজন পড়িমরি করে দৌড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। শাহজাদা দারার খবর সামান্য ভালো হওয়ায় শাহজাহানের হুকুমেই ঘোড়সওয়াররা আজ সেসব কিছুই করেনি। সন্ধ্যার মুখে মুখে সিরহিন্দের রাস্তায় মিঠে শব্দ তুলে শাহী আশরফি হাজারে হাজারে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। আর আমজনতা সেই শব্দ শুনে শুনে রাস্তার ধুলোয় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বাদশা দু'হাত তুলে আসমানের দিকে তাকালেন। সেখানে ডুবন্ত সূর্যের লাল আলোয় কী লেখা আছে তাই যেন তিনি পড়ে নেবার চেষ্টা করছেন। শাহজাদার মাথাটি নিজের কোলে নিয়ে জাহানারা বললেন, ওই দ্যাখো ভাইয়া—তোমার জন্যে আব্বা হুজুর দোয়া জানাচ্ছেন। আল্লার সামনে হিন্দুস্থানের বাদশার অবস্থাও একজন সামান্য ইনসানের চেয়ে বেশি কিছু নয়—

একটানা দু'দিন ধরে গুমটের পর সিরহিন্দে কিছু হাওয়ার আভাস পাওয়া গেল। জায়গাটা ছোট। কিন্তু সুন্দর। এমন জায়গায় হিন্দুস্থানের বাদশার তাঁবু পড়া মানে বিরাট ব্যাপার। দূর দূর দেহাত থেকে মানুষজন এসে ভিড় করছে। তারা বাদশার কথা শুধু শুনেই এসেছে। দেখেনি কোনোদিন। বাদশা একজন মানুষ? না, মানুষের চেয়েও বড় কিছু? তা জানার জন্যে সবাই একবার বাদশাকে নিজের চোখে দেখতে চায়।

তাই জায়গায় জায়গায় ভিড় হচ্ছে। সরকার সিরহিন্দের সেপাইরা এক জায়গায় সে [illegible] আবার তা আরেক জায়গায় গজিয়ে উঠছে। কাফেলার

ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া দাবড়ে সে ভিড় ভেঙে দেবে কিনা তা ঠিক করতে পারছিল না। বাদশার কানে যেতে তিনি বললেন, ভিড় হোক। ভাঙবার দরকার নেই। আমি তাঁবুর সামনে উঁচু দাঁবানে গিয়ে বসবো। ওরা আমায় চোখের দেখা দেখে ঠিক ঘরে ফিরে যাবে।

শাহজাদার তাঁবুতে বসে খবরটা জাহানারার কানেও গেল। তিনি বুঝলেন, বাদশার কেন এই খুশমেজাজি। দারার গায়ের তাপ কমে এসেছে। নাদিরা শাহজাদার বুকের ভিজে জায়গাগুলো মখমল দিয়ে শুষে নিচ্ছিলেন। তাঁবুর ফাঁকা জানালা দিয়ে দেখা যায়—দূরে সিরহিন্দের বড়া মকবরার মিনারে একটি ভোঁ-কাটা ঘুড়ি লটকে গিয়ে চাঁদের আলোয় একা একা উড়ছে—ভাসছে—আবার পড়েও যাচ্ছে।

—ভাইয়া! আমাদের পরেও তো কয়েক ভাইবোন হয়েছিল আমাদের। তাদের কয়েকজনকে হারিয়েও তো আম্মিজান আমাদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। আব্বা হুজুর পুবে কোচবিহার থেকে পশ্চিমে নাসিক অব্দি দৌড়ে বেড়িয়েছেন। একজন বাগী শাহজাদার নসিব তো সবসময় হাসে না। মনে করে দ্যাখো—তার ভেতরেও আমাদের ভাই হয়েছে—বোন হয়েছে—তারা তো সবাই বেঁচে নেই—

দারা চোখ তুলে তাঁর বাজির মুখে তাকালেন।

—সেদিন একে একে ওদের এন্তেকালে আম্মিজান যদি তোমার মতো ভেঙে পড়তেন? তাহলে আজ আমরা কোথায়! আব্বা হুজুরই বা কোথায় দাঁড়াতেন! নাদিরার কথা ভাবো তো ভাইয়া। তার বড় হয়ে বেড়ে ওঠার সময়টা কী খারাপই না কেটেছে! এরপর যদি তুমিই ভেঙে পড়ো তো ও কার কাছে যাবে?

শাহজাদা দারা কিছু না বলে নাদিরার দিকে তাকালেন। শান্ত, করুণ একখানি মুখ—কোনো দাবি নেই—চাহিদা নেই—শুধু পাশে থাকার সময়ে কাছে আসার ডাক পেলেই বর্তে যাওয়া একজন মানুষ—যে কিনা কোনো কিছুই জোর দিয়ে বলে না—অথচ ভেতরে ভেতরে নিজের জায়গায় শক্ত—সরল আর তা নিতান্ত সহজভাবেই। এই সব নিয়েই নাদিরা। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার বেগম। এইসব ভাবতে ভাবতেই দারার বুকের ভেতরটা নাদিরার জন্যে কী এক মধুর ব্যথায় ভরে উঠলো। আপনা আপনি চোখ ভরে গেল জলে।

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে জাহানারা নাদিরাকে বললেন, এই ওড়নাটাই নিংড়ে দাও তো।

শাহজাদা-বেগম হবার পর সারা হিন্দুস্থানে কেউ তাকে এভাবে হুকুম করতে পারে না। কিন্তু শাহজাদী জাহানারা পারেন। তাঁর হুকুম নাদিরার কাছে বড় আনন্দের হুকুম। তিনিও তাঁর মনের মানুষটির বড় বোনকে চোখ ভরে দেখছিলেন। তিশ বছরের একজন দুর্বল কুমারী। বাজির খুনে মিশে আছে সারা এশিয়ার প্রাণ। চাঘতাই, ইস্পাহানি, রাজপুত—সব রকমের তেজ, রং ওই

শরীরে। অথচ কোনোদিন তার বিয়ে হবে না!

—তাকিয়ে দেখছো কি? নিয়ে এসো—

ছুটে তাঁবুর খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাজির ভিজে ওড়না নিংড়ে নিলেন নাদিরা। জাহানারার হাতে তা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, বাজি, আপনি খুব সুন্দরী।

দারার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে জাহানারা বললেন, তোমার চেয়ে?

—আমি তো মামুলি—

দারা সব দেখছিলেন। সব কথাই তাঁর কানে যাচ্ছিল। দিনের সেই তাপ এখন নেই। বরং সিরহিন্দের রাতের বাতাস বেশ আরামের। তিনি একবার নিজের বাজি—আরেকবার নিজের বেগম—দু'জনেরই মুখ দেখলেন। দু'খানা মুখই আলাদা করে বড় সুন্দর। তবু ওরই ভেতর শাহজাদা বলে উঠলেন, অত ছোট্ট শরীর আমার মেয়েটার—একা একা কোন অজানা মাঠে শুয়ে আছে বাজি—

—তুমি না আফলাতুনের দর্শনে বিশ্বাসী? তুমি না অ্যারিস্টটুর ভক্ত? তুমিই তো বলতে—এই যে জগৎ দেখছি—এটাই আসল নয়—বরং এর যে ছায়া পড়ে মনে—সেটাই আসল?

শাহজাদা কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

—তুমি—আমি—আমরা সবাই এই মাটি থেকে এসেছি। এই মাটিতেই ফিরে যাবো। আবার ওখান থেকেই ফের জীবন্ত হয়ে উঠবো।—বলতে বলতে জাহানারা দারার বুকে নরম করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

শাহজাদার তাঁবুর বাইরে সিরহিন্দের পক্ষে আজকের রাতটি মনে করে রাখার মতো। সরকার সিরহিন্দের ফৌজদার তো অবাক। হিন্দুস্থানের বাদশার মতো মানুষ এই ছোট্ট সিরহিন্দে দেহাতি মানুষজনকে নিজের চোখে দর্শন দিলেন—তাও এই রাতের বেলায়? হোক না ঈদের খুশিতে? নিজের নসিবকে নিজেই মুবারকবাদ দিলেন তিনি মনে মনে। এমন তো কখনো ঘটে না। সন্ধেরাত থেকে এক ঘড়ির ভেতর বাদশা দু'দুবার খেরিয়া উজাড় করে সিরহিন্দের পথের ধুলোয় মোহর—আশরফি ছড়িয়েছেন। খোদাকে হাজার সুক্রিয়া! জায়গাটার আলাদা গুণ আছে। এখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই শাহজাদা দারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বাছা বাছা শিশোদিয়া রাজপুত সেপাই বাদশার কাফেলা ঘিরে পাহারায় দাঁড়িয়ে। সেসব পাহারার থোড়াই পরোয়া! সিরহিন্দ আর তার চার পাশের দেহাতি বাজনদাররা ঈদের খুশিতে—দিলদারিয়া বাদশার শরিফ মেজাজ বুঝে মহানন্দে নাকাড়া, সানাই আর ট্যাটরা বাজিয়ে চলেছে। একই তালে—ফূর্তিতে মাতোয়ারা। কোনো কিছুতেই বাদশার বিরক্তি নেই—আপত্তি নেই।

নিজের তাঁবুর হাতায় রওয়ান-তখতে বসে বাদশা শাহজাহান ভাবছিলেন, হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়া কী আনন্দের। সব জায়গায় আমার জন্যে আলো, আনন্দ অপেক্ষা করে থাকে। সিরহিন্দের বাতাসে সুখ আছে। শাহজাদা দারা

সুস্থ হয়ে ওঠায় সে সুখে সব কিছু যেন ফুল হয়ে ফুটছে। বাদশার চোখের সামনে আবছা আলোয় মানুষের মাথার পর মাথা। কালো। ওরা কত পথ ভেঙে দেহাত থেকে এসেছে। আমায় দেখতে।

॥ ছেচল্লিশ ॥

ও গুলো খাও কী করে ভাইয়া ?

—আমার কোনো বোধ নেই বাজি। সব কিছু খেতে যেমন বাজে লাগে—

— হেকিম উজির খাঁয়ের এই পাঁচন গিলতেও সমান খারাপ লাগে—

শাহজাদী জাহানারা এগিয়ে এসে ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, ওগুলো আমার হাতে দাও। আমি ব্যবস্থা করছি—

—কী করবে ?—বলতে বলতে শাহজাদা দারা হেকিম উজির খাঁয়ের তৈরি পাঁচনের সবটাই শাহজাদী জাহানারার হাতে দিলেন। হাতে নিয়ে জাহানারা সবটাই বহু নিচে রাভির জলে ফেলে দিলেন।

আঁতকে উঠলেন দারা। করলে কী বাজি ! আব্বা হুজুর জানলে ভয়ঙ্কর—

—শুধু শুধু লতাপাতা, শেকড়বাকড়ের তেতো রস গিলবে কোন দুঃখে ? তুমি তো কবেই সেরে উঠেছো। দ্যাখো তো কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে—

দারা চাঁদ দেখার চেষ্টা করলেন না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন—তেমনই রইলেন। জাহানারা এগিয়ে এসে বললেন, ওই দ্যাখো—বুরুজের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে চাঁদ। এখুনি বেরিয়ে আসবে।

রমজানের পর এখন সেবল মাস পড়েছে। ভাই বোন অনেক উঁচুতে লাহোর দুর্গের সামান বুরুজের সামনে দাঁড়িয়ে। অনেক নিচে দুর্গের চাতাল ঘিরে তৈরি পরিখাকে অবিরাম জলের যোগান দিয়ে রাভি নদী বয়ে চলেছে।

দুর্গের দিকে মুখ করে লাহোরের বসতি এলাকা। সামান বুরুজের সামনে দাঁড়ালে সবটাই ছবির মতো চোখে পড়ে। সেই সব ছড়ানো ছড়ানো বসতির ভেতর দিয়ে শাহী সড়ক রাওয়ালপিণ্ডি ছুঁয়ে পেশাওয়ার চলে গেছে।

শাহজাদী জাহানারার সবই ভালো লাগছিল। সারাদিনের গরমের পর লাহোরের আসমান হলুদ করে দিয়ে চাঁদ উঠছে। সঙ্গে গা জুড়িয়ে দেওয়া বাতাস। তাঁর মনে পড়লো, এই দুনিয়ায় এমন একজন মানুষ আছেন—যাঁর দুই চোখ সমুদ্রের মতোই গভীর—সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। তিনিই আমার গুরু। তিনি আমাকে সব কিছু শোনাতে পারেন। তাঁকে দেখে দেখে চিরকাল আমি চলতে পারি। তোমারই ডাকে আমি জেগে উঠবো। সরু কোমর—চওড়া কাঁধ, ঘোড়ার পিঠে বর্শা হাতে ছুটে যাওয়া বুন্দেলরাজ ছত্রশালের মুখখানি ভেসে উঠলো শাহজাদীর মনে।

—ও কি শাহাজাদা ? তুমি তো কিছুই দেখছো না—বলতে বলতে জাহানারা দারার কাছে এগিয়ে গেলেন। দারা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। বললেন, না তো বাজি। আমি সবই দেখছি—

—উঁহু। তুমি খোলা চোখে তাকিয়ে আছো শুধু। এত বড় দুনিয়া। ওই দ্যাখো বান্দা সিং শিখ বেরিয়েছেন জাঠা নিয়ে—সামনেই ওঁদের বৈশাখী পার্বণ। কত কী দেখার আছে ভাইয়া—

—কিছুই দেখার নেই বাজি। আমার জীবন তো শেষ হয়ে এলো।

—এরই ভেতর!

—আমি দেখবো। আমি শুনবো। আমি খাবো। আমি বেড়াবো। আর আমার অতটুকু মেয়েটা অজানা মাঠের ভেতর—একা শুয়ে থাকবে?

—দারা! তুমি মুঘল রিয়াসতের পহেলা শাহজাদা। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

—বাজি! তুমিও এই ভুল করলে!

শাহজাদী বুঝতে না পেরে ভাইয়ের মুখে তাকালেন।

—রিয়াসতেরও আগে আমি সেই গোলাপকুঁড়ির বাবা।—দারা আর কথা বলতে পারলেন না। কান্নায় তাঁর গলা বুজে এলো।

জাহানারা ফের এগিয়ে এলেন। ভাইয়া! জীবনের কোথায় কী আছে আমরা জানি না। আজ যে জীবনকে ফুরিয়ে এলো মনে হচ্ছে—কাল তা আবার শুরু করার ইচ্ছেও তো জাগতে পারে। ইনসান কোনো দিন এক জায়গায় থাকে না। তোমায় কী আর আমি শেখাবো। —বলতে বলতে জাহানারা দেখলেন—মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দ তুলে পাহাড়ি মিমহান পাখি নিচের সমতলের দিকে চলেছে।

এমন সময় একজন দাখিলা এসে দাঁড়ালো। বাদশার মবারকে তলব হয়েছে।

হিন্দুস্থানের বাদশার সামনে এলোমেলোভাবে যাওয়া যায় না। শাহজাহানের সবদিকে নজর। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেন। আগ্রা দুর্গের মতো লাহোর দুর্গের সবকিছু শাহী হুকুমে অঙ্কের মতো না চললেও—শাহজাদা-শাহজাদীদের কখন কী পোশাক দরকার হতে পারে—সেসব আগাম ভেবে নিয়ে দুর্গের জামদারখানা তৈরি হয়েই থাকে। শাহজাদা দারার প্রিয় রং বাসন্তী। তিনি জামদারখানা থেকে সেই রংয়ের নাদিরি জামা চাপিয়ে নিলেন গায়ে। জাহানারা পরে নিলেন গাঢ় কমলা রংয়ের ডোরিয়া।

ভাই বোন দুর্গের লালী দরওয়াজায় এসে অবাক হলেন। এ কী পোশাক বাদশার? শাহজাহান সাধারণত রং ভালোবাসেন। গাঢ় রং। কিন্তু আজ পরেছেন আগাগোড়া সাদা। তাতে কোথাও কোনো রঙিন সুতো বা চুনি বসানো নেই। নেই কোনো রেশমি বুটি।

ছেলে-মেয়ের মুখে তাকিয়ে বাদশা বললেন, আজ আমরা মিঞা মীরের আস্তানায় যাবো।

নামটা যেন চেনা চেনা। ওই নামে এক সাধুর কথা শুনেছেন জাহানারা। শাহজাদী বুঝলেন, আব্বা হুজুর শাহজাদার মন শান্ত করতেই এই সাধুর কাছে দারাকে নিয়ে যেতে চান। বাদশা বসে থাকার মানুষ নন। হয় তিনি কিছু গড়ে

তুলবেন—সে মসজিদই হোক বা সমাধিমহলই হোক। তিনি কোনো মাথা তুলে দাঁড়ানো সইতে পারেন না। খানজাহান লোদিকে শায়েস্তা করে তবে বাদশা থেমেছেন। আবার শাহজাদা দারা যে মেয়েকে হারিয়ে সবকিছুতে আগ্রহ, ইচ্ছে হারিয়ে বসে আছেন—তাও আব্বা হুজুরের নজর এড়ায়নি। ছেলেকে তার ধাতে ফিরিয়ে আনতে বাদশা এমন সুন্দর সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েছেন। জাহানারার মনে হলো—আব্বা হুজুর সব সময় আমাদের মাথায় ছাতা ধরে আছেন। কেমন সুন্দর লাফিয়ে জুড়িগাড়িতে উঠে বসলেন। কত তাজা। সুন্দর। তাগদদার।

গাড়ি চলেছে লাহোরের বসতি এলাকার বাইরে দিয়ে—রাভি নদীর গা ধরে। শাহজাহান বললেন, মিঞা মীর খলিফা উমরের বংশের মানুষ। উনি এসেছেন মধ্য এশিয়ার শিস্তান থেকে। দাদাসাহেব আকবর বাদশা যখন ফতেপুর সিক্রিতে নয়া রাজধানী বানাতে ব্যস্ত—গুর্জর, মালবে বাগী শায়েস্তায় ডুবে আছেন—তখন এই কাদিরি ফকির মানুষটি কাঁচা উমরে এই লাহোরে এসে জওয়ান বয়সে আস্তানা গাড়েন। তখন আমার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশাই নেহায়েত ছেলেমানুষ! এই দুনিয়ার কোনো জিনিসেই মিঞা মীরের কোনো লোভ নেই—

কথা বলতে বলতে বাদশা শাহজাদার মুখে তাকালেন। নবীন সন্ধ্যার হলুদ জ্যোৎস্না পড়ে দারার মুখ আরও কৃশ দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, কাল রাতেও তোমার গা পুড়ে যাচ্ছিল দারা—

দারা অবাক হলেন। কখন? আমি তো জানি না আলমপনা—

—তুমি ঘুমোচ্ছিলে। রাত তখন অনেক। পাহারা হাজিরারাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তোমার বুকে হাত রাখলাম—

—আপনি এসেছিলেন? আমি তো টের পাইনি।

—বাদশাই হই—আর শাহেনশাই হই—আমি তোমার আব্বা! আমি দেখবো না তুমি কেমন আছো?

দারা জাহানারার মুখে তাকালেন। দেখলেন, আব্বা হুজুরের মুখে তাকিয়ে আছেন বাজি। তাঁর চোখে জল টলটল করছে। দারার মনে হলো—আমি এত ভুগছি কেন? আমার কিছুই ভালো লাগে না কেন? আমার এত সুন্দর বাজি। এত সুন্দর আব্বা হুজুর। এই দুর্গ—এই হিন্দুস্থান—সবই তো আমাদের। আমার যে কোনো ইচ্ছাই মুখের কথা খসতে না খসতেই পূর্ণ হয়। তবে? আমি কি কোনোদিনই সেরে উঠবো না? নাদিরা বেগম রোজ সন্ধ্যায় আল্লাতালার মবারকে দোয়া জানায়। তার স্বামী সেরে উঠুক। অথচ আমি সেরে উঠি না। আমি কি তাহলে সেই সুদূর অজানা মাঠের ভেতর আমার ছোট্ট মেয়েটার পাশে গিয়ে একদিন শুয়ে পড়বো।

রাভির জল হলুদ জ্যোৎস্নায় ছলছল করে বয়ে চলেছে। তার গায়ে হাসনুহানার ঝোপের ভেতর রেড়ির আলো। বাইরে অভ্রের মশাল হাতে দুই সেপাই মিঞা মীরের আস্তানার দুয়ারে। দারা মিঞা মীরকে দেখতে পেলেন।

অস্ত্রের আলোর ভেতর একজন বেশ লম্বা ছিপছিপে মানুষ যেন শিখা হয়ে জ্বলছেন। তাঁর চোখ হাসছে। মুখ হাসছে। বুক অব্দি সাদা দাড়ি আলোতে-বাতাসে ঝকঝক করছে।

শাহজাদা দেখলেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানো আব্বা হুজুর দুই চোখ ভরে ফকির মানুষটিকে দেখছেন। দেখতে দেখতে বাদশা একটু ঝুঁকলেন। আমার এই আওলাদের জন্যে আল্লার কাছে দোয়া করুন—

মিঞা মীর হাত বাড়িয়ে শাহজাদা দারার ডান হাতখানি নিজের হাতে নিলেন। তারপর জল ভর্তি একটা ছোট তুর্কি ঘড়া এগিয়ে দিলেন। খেয়ে নাও তো—

শাহজাদা দারা বাইরে কোথাও কিছু খান না; কিন্তু এখানে কোনোরকম আপত্তি করার ইচ্ছেই তাঁর ভেতর জাগলো না। তিনি এক নিঃশ্বাসে ঘড়ার সব জলটাই খেয়ে ফেললেন।

আস্তানা বলতে নদীর গা ঘেঁষে খানিকটা ভাঙা জায়গা। তার বেশিরভাগই ঝোপঝাড়ে ঢাকা। বড় মতো ছায়া ছড়ানো গাছ। জ্যোৎস্নার ভেতর দারা চিনতে পারলেন না গাছটাকে। রেড়ির ডালের ঘন কাঠামোর ওপর শুরু করে পাতালতার চাল।

শাহজাদার কী ইচ্ছে হলো। তিনি ঝুঁকে কদমবোসি করতে গেলেন মিঞা মীরকে। তিনি মাঝপথে দারাকে তুলে ধরলেন। নিজের দু'হাতের ভেতর দারাকে ধরে ফকির মানুষটি মুগ্ধ চোখে তাঁর মুখে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, বড় সুকুমার। বড়ই সুকুমার—

শাহজাদী জাহানারা কোনো কথা বললেন না। বাদশা শাহজাহান বললেন, আপনি আশীর্বাদ করুন দারাকে। আপনি কৃপা করুন ওকে—

—আমি সবসময়ই শাহজাদাকে আশীর্বাদ করছি। দেখামাত্র ওকে আমার মনের মানুষ মনে হচ্ছে হজরত।

—দারার নসিব!—বলতে বলতে শাহজাহান একটি মোরাদাবাদি পাগড়ি আর জপের মালা এগিয়ে ধরলেন। পাগড়ি আর জপমালাটি আব্বা হুজুরের হাত থেকে নিয়ে শাহজাদী জাহানারা মিঞা মীরের পায়ের কাছে রাখতে গেলেন।

ফকির সাহেব পাগড়ি আর জপমালা নিজের হাতে তুলে নিয়ে জাহানারার মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, শাহজাদী নিশ্চয়—

বাদশা বললেন, হুঁ। দেখেই চিনতে পারলেন?

—ভক্তিমতী মুখশ্রী। তাছাড়া হিন্দুস্থানের চকে চকে ওকে নিয়ে চর্চা হয়—

একথায় গুটিয়ে গেলেন জাহানারা। বাদশা জানতে চাইলেন, কী নিয়ে চর্চা?

—শাহজাদী জাহানারা ফকির দরবেশে খুব দয়াপরবশ।

ফকির সাহেবের এ কথায় আরও যেন গুটিয়ে গেলেন জাহানারা। দারা বললেন, আমি আগেও আপনাকে দেখেছি—

—কোথায় ?

—আমি তখন ছোট ছিলাম। আপনি দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। ঠিক বলেছো। তখন বাদশার ডানপাশে একটি বালক দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় চোখ—

—সে-ই আমি।

—তাই বলো! সেজন্যেই তোমাকে আমার অত চেনাজানা লাগছিল। সে তো অনেকদিন আগের কথা।

—হ্যাঁ। জাহাঙ্গীর বাদশা আপনার যে কোনো চাহত সেদিন পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু—

মিঞা মীর দারার মুখে তাকালেন। কিন্তু ?

—সেদিন আপনি বাদশার কাছে শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন—তিনি যেন ভবিষ্যতে কোনোদিন আপনাকে আর না ডাকেন—ডেকে নিয়ে যেন বিব্রত না করেন। দাদাসাহেব আপনার এই চাহত শুনে একদম চুপ হয়ে গিয়ে বলেছিলেন—বেশ। তাই হবে—

মিঞা মীরের আস্তানাও আজ সন্ধ্যায়—শাহজাদার এ কথায় একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। জ্যোৎস্নার ভেতর হাসনুহানার ঝোপ মিহি বাতাসে দুলছে। হিন্দুস্থানের বাদশার সামনে তাঁর আব্বা হুজুরকে এভাবে 'না' বলে দেবার কাহিনী—সে যত পুরনোই হোক না কেন—যত সুন্দরই হোক—আর কেউ বলতে সাহস করতো না। নিজের আব্বা হুজুরের বে-ইজ্জতি ছেলের কাছেও বে-ইজ্জতি বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে সেই ছেলেও যদি হন একজন বাদশা—যাঁর ইচ্ছাই হিন্দুস্থান।

মিঞা মীরের মুখের শান্ত হাসি এসব কথায় একটুও নিভলো না। পরিষ্কার গলায় তিনি বললেন, আল্লার রাস্তা—সোজা। আল্লার সমস্তই মুখ, সমস্তই চোখ, সমস্তই কান।

ফেরার পথে বাদশা শাহজাহান কোনো কথা বললেন না। রাভির গায়ে গিয়াথপুর এলাকায় চাষী-বাসি মানুষজনের বসতি। ডাঙা জায়গা। অড়হর, মুগ চাষ হয়। পাশেই আলমগঞ্জ। সেখানে তাঁতীদের বাস। শাহজাদা দারা মনে মনে চিনে রাখলেন জায়গাটা। আলমগঞ্জের গিয়াথপুরের মাঝ বরাবর সরু রাস্তা দিয়ে ভগবানপুর বা কফিপুরায় পৌঁছলেই মিঞা মীরের আস্তানা।

ফকির সাহেবের দেওয়া জলটুকু খাওয়া ইস্তক শাহজাদার শরীরটা হালকা লাগছে। হিন্দুস্থানের বাদশার মুখোমুখি আটঘোড়ার গাড়িতে বসে শাহজাদার মনে হলো—চাঁদের জ্যোৎস্না কেমন দিলদরিয়া হয়ে সবার ওপরেই ছড়িয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্নার হলুদ আলো কারও পাশ টানে না। আমি থাকতে এই সুন্দর দুনিয়া আছে। আমি পয়দা হওয়ার আগেও ছিল—আমার এন্তেকালের পরেও থাকবে। তাহলে ইনসানের চলে যাওয়া নিয়ে এত কান্নাকাটি কিসের ?

অনেক রাতে শাহজাদা দারার ঘুম ভেঙে গেল। বুকের ওপর যেন কিসের ভার। খুব সাবধানে তিনি সেই ভারের জায়গাটায় হাত রাখলেন। আরেকখানি হাত। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন দারা—কে?

—আমি। ভয় পেয়ো না। আজ আর গা তেতে ওঠেনি দেখছি—

উঠে বসলেন দারা। আব্বা হুজুর! আপনি?

—রোজ রাতে তোমার গা পুড়ে যেতো। আজ দেখছি—গা একদম ঠাণ্ডা।

অন্ধকারের ভেতর কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। দারা বললেন, সবই কফিপুরার সেই জলের মেহেরবানি!

বাদশা খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। শেষে মুখ খুললেন। কোনো জিনিসে কোনো লোভ নেই মীরের। নইলে হিন্দুস্থানের বাদশার মুখের ওপর 'না' বলতে পারেন! চাইলে—ফকির সাহেবের কোনো চাহত পুর্ণ না-হবার নয় দারা।

শাহজাদা কোনো কথা বলতে পারলেন না। দুর্গের খোলা অলিন্দের বাইরে নিশুতি লাহোর হলুদ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। এই লাহোরেরই শেষদিকে ভগবানপুরার এক ডাঙা জায়গায় রাভির গা ঘেঁষে মানুষটির আস্তানা।

অন্ধকারে বাদশা শাহজাহান বললেন, প্রায় ষাট বছর হয়ে গেল—ফকির-সাহেব ওখানে ডেরা বেঁধেছেন। ওখানে আমরা কাল গিয়েছিলাম, না, পরশু?

—গতকাল আব্বা হুজুর।

—তাহলে কাল আবার যাবো আমরা।—বলতে বলতে শাহজাহান চলে গেলেন।

শাহজাদা খোলা অলিন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনেই চাঁদের পরেকার পহেলা পুর্ণিমা। নাম-না-জানা পাখির দল ভুল করে দিন ভেবে বেরিয়ে পড়েছে। অনেকদিন পরে দারার কেন জানি মনে হলো—তিনি ওই পাখিদের মতোই মুক্ত। তাঁর আর কোনো বাঁধন নেই। নেই কোনো শোক। তাঁর মাথার ওপরে শুধু তারা বসানো আসমান। আর পায়ের নিচে শুধু ঘাসে ঢাকা মাটি। মাঝখানে স্রেফ তিনি একা। যা ইচ্ছে করতে পারেন। দুনিয়াদারের দুনিয়াদারির সামিল হয়ে তিনি এখন মুসাফির হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। একবারের জন্যেও নাদিরা বেগমের কথা তাঁর মনে পড়লো না। ফকির সাহেবের কথামত এই সুন্দর জ্যোৎস্না ভাসানো দুনিয়াই আল্লার মুখ—আল্লার চোখ—আল্লার কান।

পরদিন দুপুরের পর আবার রাভির গা ধরে আলমগঞ্জ। গিয়াথপুর। খেতিবাড়ির ডাঙা জায়গা। সিঁচাই বলতে রাভির মিষ্টি জল গিয়ে গেঁহুর গোড়ায় রস যোগায়। গাছে গর্ভ হয়। থোড় আসে। একদিন গেঁহুর ছড়া বেরিয়ে পড়লে রাভির জল গিয়ে দানা পুষ্ট করে তোলে। দিনে দিনে রাস্তাটা ভালো চেনা হয়ে গেল শাহজাদার। বাদশার একপাশে তিনি। আরেক পাশে শাহজাদী জাহানারা। আজ ভাই-বোন দু'জনেই দুর্গের জামদারখানা থেকে বেছে বেছে আগাগোড়া সাদা পোশাক পরেছেন। পাথুরে রাস্তা দিয়ে আটঘোড়ার গাড়ি একটা হুড়মুড় আওয়াজ তুলে এগোচ্ছিল। দু'পাশে পাহারার রিসালা ঘোড়-

সওয়াররা সমান দুলকি চালে ছুটছে। বসতি লাহোরের বাইরে দেহাতি মানুষজন বাদশার দর্শন পেতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এরই নাম তাগদ। জোস। রওশন। এই তাগদেরও একটা রূপ আছে। কিন্তু আল্লাতালার দুনিয়া জোড়া রূপের পাশে তা যেন নিভু নিভু। ঠিক এইসময় শাহজাদার মনে কাল নিশুতি রাতের লাহোর ভেসে উঠলো। সবকিছু তখন সারা গায়ে হলুদ আলো মেখে পড়েছিল।

দিনের বেলায় হাসনুহানার ঝোপে ঝোপে গুচ্ছের বুলবুলি পাখি। রোদ বেশ চড়া। মিঞা মীরের আস্তানার মাঝখানে ছায়া ছড়ানো গাছটাকে দিনের বেলায় দেখেও ঠিক চিনতে পারলেন না দারা। পুবদেশের কোনো গাছ হবে। আজ ফকিরসাহেবের ডেরার সামনে এসে কেউ দাঁড়াননি। এমন শান্ত কুঁড়ির সামনে শাহী ছাতার নিচে হিন্দুস্থানের বাদশার পাশে দাঁড়িয়ে শাহজাদার মনে হলো—শাহীর চেয়ে ফকিরিই বা কম কিসে? বাদশা হয়েও ফকিরের জন্যেও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। সারা হিন্দুস্থান বাদশার হলেও—এই আস্তানাটুকু যেন হিন্দুস্থানের বাইরে। একেবারে অন্যরকম।

মিঞা মীর হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। গায়ে জাফরানি রংয়ের পা অব্দি খিরকা। তার ঠিক উল্টো রংয়ের সাদা দাড়ি, দুপুরের চড়া রোদে রুপোলি কোনো পোশাক আগুন হয়ে বুকের কাছে আটকে আছে। চোখে হাসি। মুখেও হাসি। মিঞা মীর বললেন, আজ আসবেন যে—তেমন তো খবর পাইনি কোনো।

বাদশা শাহজাহান এগিয়ে এসে বললেন, আপনার এই শান্ত আস্তানা আজ দু'দিন ধরে আমাকে মনে মনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঞা মীর।—আলা হজরত! আমি জানতাম আপনি আবার আসবেন। শাহজাদা-শাহজাদী যে আসবেনই—তা আমার ভেতর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

কথা বলতে বলতে ফকির সাহেব ওদের নিয়ে নিজের কুঁড়িতে ঢুকলেন। একেবারে আগে শাহজাদী জাহানারা। মাটির ওপর বালি। তার ওপর কাঠ। শেষে দড়ির মাদুর। এই হলো গিয়ে মেঝে। বাইরের রোদের ঝাঁঝ পুরু করে বিছানো লতাপাতার চাল ফুঁড়ে ভেতরেও কিছুটা এসেছে। শাহজাদীর পেছনে বাদশা শাহজাহান। তারপর মিঞা মীর। শেষে শাহজাদা।

কুঁড়িতে ঢোকার মুখে দারা তাঁর পায়ের বিনামা জুতো খুলে দোরগোড়ায় রাখলেন। জুতোয় লাহোরের পাথুরে মিহি ধুলোর গুঁড়ো। এখানে এসেই তিনি কী একটা সুগন্ধ পেয়েছেন। অনেকদিন পরে কোত্থেকে যে এত উৎসাহ তাঁর শিরদাঁড়ার গোড়ায় এসে জমা হলো! এখুনি দারা যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন। তাঁর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল—ফকির সাহেবের হেঁটে যাওয়ার মাটি হয়ে যান।

এগোতে এগোতে মিঞা মীর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘরের আবছা আলোয় দারা দেখলেন, মীরের চোখের সাদা কোণ ঝকঝক করছে। ফকির সাহেব বললেন, এই নাও—

দারা না জেনেই বুকে নিলেন। তখনো জানেন না—জিনিসটা কী? হাতের মুঠো খুলে দেখলেন—জপের মালা। বাদশা তখন কী যেন জানতে চাইলেন মীরের কাছে। জপমালা হাতে নিয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল দারার। তিনি বাদশার কোনো কথাই শুনতে পাননি।

কথা বলতে বলতে মিঞা মীরের মুখ থেকে চিবোনো লবঙ্গ পড়লো একটা। কারও সেদিকে নজর পড়বার আগেই দারা তা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে দিলেন। আঃ! একি সাধারণ কোনো লবঙ্গ! মিঞা মীরের মুখের ভেতর থেঁতো হয়ে মেঝেতে পড়েছিল? না, অন্য কোনো বিশেষ জাতের লবঙ্গ? এর স্বাদই যে আলাদা।

বাদশা শাহজাহান বেরিয়ে যাচ্ছেন। শাহজাদা ইচ্ছে করেই পেছনে পড়ে রইলেন। শাহজাদী জাহানারাও বেরিয়ে গেলেন। দারা তখন দাঁড়িয়ে থাকা মিঞা মীরের পায়ে গিয়ে ঝুপ করে নিজের মাথাটি রাখলেন।

কতক্ষণ রেখেছেন মনে নেই দারার। হঠাৎ নিজের পিঠে মিঞা মীরের হাতের ছোঁয়া পেলেন।—ওঠো—

দারা সোজা হয়ে ওই মুখের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

মিঞা মীর বললেন, তুমি আবার এসো শাহজাদা। বাদশা দাঁড়িয়ে আছেন। এখন যাও—

শাহজাদার তখন ছন্নদশা। তিনি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। একছুটে হাসনুহানার ঝোপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অমনি ঝোপ থেকে বুলবুলির দল ছররা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। দারা দেখলেন, বাদশা গিয়ে গাড়িতে বসেছেন। বাজি গাড়িতে উঠছেন।

বিকেলবেলা লাহোরের আসমানে আঁধি উঠলো। দিনের বেলাতেই যেন রাতের অন্ধকার। শাহজাদা দুর্গের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, সারা লাহোরের পাথুরে ধুলো বাতাসের তোড়ে ওপরে উঠে এক জায়গায় জমা হচ্ছে। এখুনি মেঘ ফেটে বাজ পড়বে।

এমন সময় শাহজাদী জাহানারা এসে দারার সামনে দাঁড়ালেন। দারা দেখলেন, বাজির মাথার পেছনে চালির মতোই আসমানের আঁধিয়ারি। যাকে বলা যায় ধুলোর মেঘ। জাহানারা গেয়ে উঠলেন—

কি ইশক্ আসা নমুদ অব্বল
বলে উফ্তাদ মুশ্কিল হা—

দারা ছোট করে বললেন, হাফিজ!

—হুঁ। তোমারও ভাইয়া হাফিজের দশা! আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ! আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা। তাই না ভাইয়া?

দারা তখন তখনই কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ জলে ভরে এলো। বুকের ভেতর কে যেন থাক দিয়ে পাথর সাজিয়ে চলেছে। পাথরের ভারে বুকটা টনটন করে উঠলো। খুব ভারি। কিন্তু মধুর।

একদম কাছে এসে জাহানারা তাঁর ওড়না দিয়ে দারার চোখ মুছিয়ে দিলেন। ভাইবোনের চোখের সামনেই ঝড়ের আগের সবে ওঠা পাগলা বাতাসে একটা জামগাছের ঝাঁকড়া মাথা মোচড় খেয়ে দুলতে শুরু করলো। জাহানারা কোনো কথা বললেন না।

দারা নিজে থেকেই বললেন, আসমান তারার ভারে নিশুতি রাতে যখন ভেঙে পড়ে তখন সেদিকে তাকিয়ে আমার নিজের বুকও ভারি হয়ে ওঠে—

এবারও জাহানারা কোনো কথা বললেন না।

দারা বললেন, আসমানে মেঘ জমলে কালো হয়ে আসা বিকেলে আমার বুকের ভেতরটা আবার টনটন করে ওঠে—মনে হয়—আমি যেন কী জানতাম। কিন্তু সবই ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না। তখন না-জানা কষ্টে বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। চোখে জল আসে—

শাহজাদী এগিয়ে এসে বললেন, জানি। জানা জিনিস হারিয়ে ফেলার কষ্ট। মনে হয় ভাইয়া—আমি তো সেখানে ছিলাম একদিন। কিন্তু এখন আর যেতে পারবো না। ভালোবাসার এত জ্বালা!

—ভালোবাসা?

—হ্যাঁ। ফকিরসাহেব মিঞা মীরকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না?

দারা ফস্ করে বলে বসলেন, মনে হয় ওঁর ভেতর দিয়ে আমরা হারানো দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারি। সেখানে ফিরে যাবার রাস্তায় আমরা রাহী। উনি আমাদের মতো রাহীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। ও রাস্তায় মিঞা মীরই আমাদের মতো রাহীর রাহীদার—আলেম। ঝড় জল কাটিয়ে ভালোবাসায় ঢেকে আমাদের মঞ্জিলে পৌঁছে দেবেন। ওঁর বুকের ভেতরটা পুরোপুরি ভালোবাসায় ঠাসা। মীর সাহেবের গলার স্বর কী শান্ত। গা কী ঠাণ্ডা—

—তুমি তো পায়ে মাথা রেখে দেখলে ভাইয়া—।

—তুমি দেখতে পেয়েছো বাজি?

—হ্যাঁ। আব্বা হুজুর এগিয়ে যেতে তুমি পিছিয়ে পড়লে। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে দেখি—তুমি ওঁর পায়ে মাথা রেখেছো।

—আমার মাথা তুলতে ইচ্ছে করছিল না বাজি। ওঁর পায়ের পাতা ঠাণ্ডা। ওঁর ডেরার মতোই নির্জন—শান্ত। —বলতে বলতে দারা দুহাতে তাঁর বাজিকে টেনে অলিন্দের সামনে থেকে দুর্গের মোটা পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে নিয়ে এলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই আসমান চিরে বিদ্যুতের কড়কড়াত ফাটতে ফাটতে রাওয়ালপিণ্ডির দিকেই যেন ছুটে গেল। আর অমনি ধুলোর ঝড়ে সারা লাহোর ঢেকে গেল।

ভাইবোন দেওয়ালের আড়ালে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অজানা আনন্দে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। শাহজাদা দারা বললেন, জানো বাজি—এই যে দুনিয়া সবসময় দেখতে পাই—এ-দুনিয়ার সবটা আমার সত্যি বলে মনে হয় না। মনে হয় সাচ্চা দুনিয়া—অসলিয়তে যাবার কোনো গুপ্ত রাস্তা আছে।

—আর সেই রাস্তার হদিস মিঞা মীরই দিতে পারেন ভাইয়া—

—আমার মনে হয় খোদার কোনো ফরমান আছে আমার ওপর। আমাকে যেন কী সব কাজ করতে হবে। সেসব কাজের কোনো কিছুই আমি আজও জানি না বাজি। কিন্তু করতে হবে আমাকেই—তা কিন্তু আমি জেনে গেছি।

শাহজাদী অবাক হয়ে নিজের ছোট ভাইয়ের মুখে তাকালেন। ভাইয়ের জন্যে তাঁর গর্ব হচ্ছিল। আবার ভয়ও হচ্ছিল। না জানি দারা কত দূরে সরে যাচ্ছেন।

—এক একদিন বাজি ঘুমের ভেতর টের পাই—কে যেন আমায় ডাকেন। বড় চেনা সুরের সে-ডাক। কিন্তু ঘুম ভেঙে উঠে কিছুই মনে পড়ে না। কিছুতেই মনে করতে পারি না—আগে কোথায় এ সুরে কে আমায় ডেকেছিল! একদিন আগ্রা দুর্গের নিচে কারা যেন কাদেরিয়া কীর্তন গাইছিলেন। পথে বেরিয়ে পড়া কোনো ফকির-দরবেশ হবেন। তা কীর্তন শুনতে শুনতে নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের ভেতর দেখি—বশিষ্ঠ ঋষি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র—চারদিকে জঙ্গল—

—শেখ সাদুল্লা মসীহর রামায়ণ ছোটবেলায় তোমার খুব প্রিয় ছিল।

শাহজাদা আকাশের দিকে তাকালেন। সারা লাহোরের ধুলো আকাশে উঠে গিয়ে আঁধি তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে যেন কিছু শুনতে পাবেন ওইভাবেই সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আমি জানি না বাজি—এ আমার কিসের যন্ত্রণা। আকাশে বাতাসে—আমার বুকের ভেতরেও কী এক রহস্য তার থমথমে মুখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে দেখতে পাই। সে কোনো কথা বলে না—

শাহজাদী জাহানারা আস্তে বললেন, এসব কথা তোমার বেগম—নাদিরাকে বলেছো?

—না বাজি। বলা হয়নি।

—কেন?

—এমনিতেই ওর জীবনটা তো ভালো কাটেনি। আমিই ওর সব। আমাকে ঘিরেই ওর সব কল্পনা। আমাকে ঘিরেই ও থাকে। এসব শুনে বুঝতে না পেরে হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। আমাকে হারাবার ভয় ওর সবচেয়ে বড় ভয়। সব সময় হারাই হারাই—

জাহানারা এগিয়ে এসে দারার পিঠে হাত রাখলেন। দুর্গের বাইরের দুনিয়া আঁধিতে, এলোপাথাড়ি বাতাসে, ধুলোর ঝড়ে ঢেকে যাবার দশা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে ছোট ভাইয়ের মুখে তাকালেন শাহজাদী।—ভাইয়া! একটা ভুল কোরো না। প্রথম জীবনের দুঃখ, অপমান নাদিরাকে বুঝদারি, মগজদারি দিয়েছে। তাতে নাদিরার লাভ হয়েছে। তুমি তার হমদম। তোমার সব কথাই তাকে বলবে। সে সবই বুঝবে। দুঃখ মানুষকে শিক্ষিত করে। অপমান মানুষকে সাহসী করে। মৃত্যুর মুখোমুখি হলে জীবনকে সহজে চেনা যায়।

শাহজাদা কোনো কথা না বলে শাহজাদীর মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

হিন্দুস্থানের মাটিতে আগের মতোই ঘাস জন্মাতে লাগলো। হিন্দুস্থানের ধুলো আগের মতোই বাতাস পেলে ওড়ে—জল পেলে জমিনে মিশে গিয়ে জমিন

হয়ে যায়। গাছের বাসায় পাখিদের ডিম ফুটে আগের মতোই ছানা বেরুতে লাগলো। আগের মতোই বর্ষার পরে ধান ওঠে—শীতের শেষে গম। নিশুতি রাতে আসমান থেকে তারার দল আগের মতোই ঘুমন্ত হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণিমার রাতে টিয়ার ঝাঁক ভুট্টার খেতে নেমে কচিদানায় বাঁকা ঠোঁট বসায়। শাহী খাজানাখানায় জমা আর হাসিলের ভেতর ফারাক কিন্তু ঘোচে না। এর ভেতর আগ্রার মসনদ ঘিরে খেতাব, খেলাত, ইজফার জন্যে কাড়াকাড়ি—তাগদদার মানী ইনসানদের তাতে শুধু রক্তচাপই বাড়ে। কয়েদ-খানায় যে একবার গেল—গারদের এপারের মানুষ তাকে যেন চিরকালের মতোই ভুলে গেল। এর ভেতর ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতি—হাতিদের বরাদ্দ শরাবে ভাগ বসিয়ে নিশুতি রাতে একা একা মোরি দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যমুনার ভাঙা তীরে দাঁড়ায়। আবছা চর জায়গার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে। হাতিরা সে আওয়াজ শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। মানুষ শুনলেও তার ভেতর থেকে কিছুই বের করতে পারতো না।

বর্ষা এসে চলে গেল। হিন্দুদের দশেরাও কেটে গেল। শীতের শুরুরাতে বাদশা শাহজাহান আজ অনেকদিন পরে দেওয়ান-ই-খাসে বসেছেন। উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব কিছুর ওপর শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। বিরাট অজগরের মতো মুঘল শাহী নামে যে-বস্তুটি গত শ'খানেক বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে—তারই হাত, পা, মাথা—মানে আমির, ওমরাহ, মনসবদার, জায়গিদার, ফৌজদার—তাগদের বাছাই বাছাই গেণ্ডুয়া আজ এখন এই দেওয়ান-ই-খাসে জড় হয়েছেন। ক্ষমতার মানুষেরা ক্ষমতার বিলি ব্যবস্থা দেখতে হাজির।

একটু বাদেই রিয়াসতের তিসরি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বাহাদুরকে তাঁর এই ষোলো বছরের তাজা জিন্দেগিতে পহেলা মনসব দেওয়া হবে। বন্দুক, কামান, গোলা, হাতি, ঘোড়া, গেঁহু, ঘি, চিনি নিয়ে এই জমায়েতের সবাইকেই নাড়াচাড়া করতে হয়। এঁরা নিজের নিজের এক্তিয়ারে বখশিস, জরিমানা, কয়েদ, হামলা—সব কিছু আসমানের বৃষ্টির মতোই জারি করে থাকেন। চাপা গলায় ওঁরা যা দেওয়ান-ই-খাসে বসে নিজেদের ভেতর বলাবলি করছেন—তা থেকে একটি কথাই বারবার উঠে আসছে।

তা হলো—বুন্দেলখণ্ড।

আগ্রা থেকে দক্ষিণে যেতে গোয়ালিয়র পড়ে। গোয়ালিয়রের বাঁয়ে জঙ্গলে ঢাকা বিরাট এলাকাই বুন্দেলখণ্ড। ওমরাহ, মনসবদার, জায়গিরদার, বনজারা চৌধুরীদের কথাবার্তায় বারবার বুন্দেলখণ্ড কথাটা শোনা যাচ্ছিল। বুন্দেল-খণ্ডের উত্তর-পূবে যমুনা। দক্ষিণে কাইমুর পাহাড়। পশ্চিমে মালবের টিলার পর টিলা। বেতোয়া নদী বুন্দেলখণ্ডকে দু'ভাগে ভাগ করে বয়ে গেছে। ওদের কথা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে এই কথাগুলোই দেওয়ান-ই-খাসের চাঁদোয়ায় গিয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল। যেমন—যমুনা, কাইমুর, টিলা, বেতোয়া। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছিল—ঝুঝর সিং। ঝুঝর সিং। বারবার।

বাইরের দিনের আলো ভেতরের মাকরানা পাথরে পড়ে দেওয়ান-ই-খাসের ভেতরে পাল্টা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। সে আলোয় শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঝকঝক করে জ্বলে উঠলেন। ষোলো বছরের টান টান চাবুকের মতো ফর্সা চেহারা। শাহজাদার চোখ দুটি কালো। পাতলা ঠোঁট। মনসবি পাওয়ার জন্যে তিনি আজ আগাগোড়া লাল পোশাকে এসেছেন।

বাদশা শাহজাহানকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই দু'জন হাবসি দাখিলা রুপোর থালায় ক'টি রঙিন ফিতে নিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো। তখন দেওয়ান-ই-খাসে সবাই চুপ। একটুও শব্দ নেই। ফৌজে রসদ যোগানদার বনজারা চৌধুরীর বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করে উঠলো। আগ্রা দুর্গে দেওয়ানখানার কাছারি থেকে তিনি যা খবর পেয়েছেন—বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করতে শাহী ফৌজ যাবে। মুঘল শাহীর সঙ্গে এককালের দোস্তির সুবাদে বুন্দেলখণ্ড কিছুদিন হলো থোড়াই পরোয়া করে। সে ফৌজকে রসদ যোগানোর ঠিকা পাওয়া যাবে কিনা—তার অনেকটাই নির্ভর করছে— ওই ফৌজকে কে চালাবেন তার ওপর। বছরের এই সময়টায় সাধারণত মনসব দেওয়া হয় না। বনজারা চৌধুরী দেওয়ানখানার ভেতরকার খবর থেকে যা জানতে পেরেছেন—তা হলো —শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে মনসবি দিয়ে বুন্দেলখণ্ডে পাঠানো হবে। তিনিই ফৌজ চালাবেন।

বনজারা চৌধুরীও তাই চান। বুন্দেলি শায়েস্তা ফৌজের মাথায় কোনো ঘাগু মনসবদার বসলে রসদের দাম আদায় করতে দফায় দফায় মনসবদারকে পান খাবার খরচ যোগাতে হবে। তার চেয়ে আনকোরা শাহজাদা অনেক ভালো। মোটামুটি সরেস গেঁহু, শুখা বারুদ যোগাতে পারলেই ঠিকার দাম বেহুদা না ঘুরেই পাওয়া যাবে। যাঁরা ঘি, চিনি, তেল যোগান ফৌজকে—তেমন বড় বড় শেঠও আজকের এই মনসবি ব্যাপারে দাওয়াত পেয়ে এখানে এসেছেন। আগ্রা দুর্গের ছায়ায় ঘোরাঘুরি করে শাহী হালচাল আগাম না জেনে রাখলে হিন্দুস্থানের রাজধানীতে বসে ব্যবসা করা যায় না। কোন ফৌজ এখন কোথায়—কোন মনসবদারের এখন আর তেমন কদর নেই—এসব কথা জানা থাকলে ঘুঁটির কোর্ট বদলানো সহজ হয়। সিপাহসালার, মীর আতশ, ফিল-ই-বকসি—এঁদের তো ঈদে—দশেরায় ভেট পাঠাতেই হয়।

বাদশা শাহজাহান নিজের ছেলের মুখে ভালো করে তাকালেন। তাঁর এই শাহজাদাটি কিছুতেই তাগড়া হয়ে উঠছে না। মুখ দেখে ওর ভেতরের কোনো আঁচ পাওয়া যায় না। বাদশা আওরঙ্গজেবের দুই কাঁধে হাত রাখলেন।—আজ থেকে তুমি দশ হাজারি 'জাতের' মনসবদার—

দেওয়ান-ই-খাসে শাহজাহানের গলা গমগম করে উঠলো। সেই সঙ্গে ওমরাহ-মনসবদারদের জমায়েতে একটা চাপা আওয়াজ উঠলো—দশ হাজার-র-র—

—শাহজাদা আওরঙ্গজেব। আজ থেকে তুমি আর রোজিনদার নও—এখন থেকে তুমি চার হাজার ঘোড়সওয়ার পাবে।

অমনি জমায়েত থেকে চাপা আওয়াজ উঠলো—চার হাজার-র-র—

কোনো কোনো মনসবদার নিজেদের ভেতর চাপা গলায় বলতে থাকলেন—এত কম বয়সেই চার হাজার ঘোড়সওয়ার দেওয়া কি ঠিক হলো ?

দক্ষিণের রুখাশুখা মনসবির এক উজবেক মনসবদারের খরচ খরচা জমি জায়গা থেকে তুলতে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর দশা হয় ফি-সন। তিনি সব ব্যাপারেই বেশ সাবধানী। কথাবার্তায় তাঁর কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। তিনি স্পষ্টই বললেন, শাহজাদার কাঁচা উমর। এই বয়সেই এক লাফে দশ হাজারি 'জাতের' মনসবি না দিয়ে ওঁকে আহেদি করলে ভালো হতো। তাহলে পাকাপোক্ত হয়ে ধাপে ধাপে ওপরে উঠতেন।

মুঘল শাহীতে কথা চালাচালি বড় বিপদ ডেকে আনে। তাই মনসবদারদের বাকি প্রায় সবাই চুপ করে ছিলেন।

আলা হজরত আব্বা হুজুরের কথায় শাহজাদা আওরঙ্গজেব প্রথমে চুপ করে রইলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, আলমপনা! সবই আপনার মেহেরবানি।

কথাগুলো খুবই পাকা মাথার। তাই-ই মনে হলো বাদশার। শাহজাহান ভেবেছিলেন—শাহজাদা বয়সোচিত আনন্দে—আন্তরিকতায় হড়বড়িয়ে অগোছালো কিছু বলে বসবে। বাদশা গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার বয়সে আমি মনসবদারির কথা ভাবতে পারিনি। নেহায়েত রোজিনদার হয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

—জাহাপনা। তখনকার সেদিনও তো আর নেই। দেখুন না আগ্রাই কত বদলে গেছে। উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁও শুনছিলেন। তাঁর দুই চোখ স্থির হয়ে গেল। আমির-ওমরাহদের সামনের সারির তাবড় তাবড় মানুষজনও নির্বাক। একজন মনসবদার তো মাথা তুলে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। যেন শাহজাদা কতটা লম্বা তা দেখতে পেলেই এই কাঁচা উমরের মানুষটির আন্দাজ তিনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন।

দেওয়ান-ই-খাসের এই খোলা দরবারে মনে যা-ই আসুক সব বলা যায় না। শাহজাহান জানেন—তিনি হিন্দুস্থানের বাদশা। এই নওজওয়ান তাঁরই ছেলে। হিন্দুস্থানের শাহী রিয়াসতের তিসরি শাহজাদা। বাদশা হিসেবে আগ্রার বদলে যাওয়া শাহজাহান জানেন। তাঁর ইচ্ছে হলো—একবার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে জানতে চান—বলো তো। আগ্রা কতটা বদলেছে— ?

আসলে আওরঙ্গজেব তখন তাঁর নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে অন্য একটা অঙ্ক তুলে আনছিলেন। বছর খানেক আগে এই দেওয়ান-ই-খাসে এমনই দরবারে বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোকে রোজিনদারি থেকে ছুটি করিয়ে প্রথম মনসবি দেওয়া হয়। সেবারে বড়েভাইকে আব্বা হুজুর এক লাফে বারো হাজারি 'জাত' তো দেনই—সেই সঙ্গে ছ'হাজার ঘোড়সওয়ারও তাঁকে দেওয়া হয়। আমার চেয়ে জাতে দু'হাজার বেশি। ঘোড়সওয়ারও দু'হাজার বেশি। কেন ? কেন ? আমিই বা কম কিসে ? সেদিন তো বড়েভাই ছুটে গিয়ে জংবাজ হাতি সুধাকরের টক্কর নিতে সাহস পায়নি। জান কবুল করে কে ছুটে গিয়েছিল সুধাকরের সামনে ?

কে ? সে এই অভাগা আওরঙ্গজেব ! এই আওরঙ্গজেব !

সারা দরবার শাহজাদার চোখে অন্ধকার হয়ে আসছিল। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম মনসবি পাওয়ার দিনটিকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না—বড়োভাইয়ের সঙ্গে তাঁর জাত আর সওয়ারের এই ফারাক। কোথায় যেন তিনি ঠকে যাচ্ছেন। শুধু কি তাই ! এইরকম পহেলা মনসবি পাওয়ার দিনে বড়োভাইয়ের হাতে সরকার হিসারের ফৌজদারিও তুলে দিয়েছিলেন আব্বা হুজুর। সরকার হিসারের ফৌজদারি কাকে দেওয়া হয় ? আমি জানি না নাকি কী আছে আব্বা হুজুরের মনে ?

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাদশা তার কিছুই টের পেলেন না। তিনি শান্ত গলায় ঘোষণা করলেন, আওরঙ্গজেব ! তুমি বাহাদুর ! তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়—

—হুকুম করুন আলমপনা।

—তুমি ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করবে। শাহী ফৌজ নিয়ে বুন্দেলখণ্ড যাবে। আগ্রাকে অবহেলা করার দাম কী—তা তুমি বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।

ফৌজি রসদ যোগানদার বনজারা চৌধুরী এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে ছিলেন। এবার তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক। দেওয়ানখানার কাছারির গোপন খবর তাহলে ঠিকই।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাদশাকে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—বীরসিংহ বুন্দেলা আমার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার কাছের মানুষ ছিলেন। আব্বা হুজুরের কথায় বীরসিংহ দাদাসাহেব আকবর বাদশার উজির আবুল ফজলকে কোতল করে অনেক—অনেক সুবিধা, সুযোগ পেয়েছিল শাহী রিয়াসত থেকে। আগের চেয়ে বুন্দেলখণ্ড এখন অনেক বড় হয়েছে। বড় মাথাটি ঘুরে গেছে। দেবী সিংহ নেই। সে জায়গায় ঝুঝর সিং যা ইচ্ছে তাই করছে। শাহী খাজনাখানায় উসুল খাজনা তো জমা করেইনি—আগ্রার পরোয়া না করে ইচ্ছেমত হাসিল করে চলেছে। আগ্রা এর বিহিত চায় শাহজাদা—

—আলা হজরত ! তাই হবে। —বলতে বলতে আওরঙ্গজেব লক্ষ্য করলেন, পেছনে গোটানো বাদশার দুই হাত—একখানা আরেকখানাকে ধরার চেষ্টা করছে। পুরুষ্ট পুরুষালী হাতের আঙুলের ডগাগুলো টসটসে আঙুরের মতো। তিনি শুনেছেন, আব্বা হুজুরের ওই হাতে আপেলের গন্ধ পাওয়া যায়। আরও শুনেছেন, আপেলের সেই গন্ধ যেদিন মুছে যাবে—উবে যাবে—সেদিন থেকেই বাদশার তাগদও ফুরিয়ে যাবে।

হঠাৎ বাদশা শাহজাহান নিজের দু'হাত আচমকাই আবার নিজের দু'পাশে ছেড়ে দিলেন। হাত দু'খানাও মানুষের যেমন থাকে—তেমনিই শাহজাহানের শরীরের দু'পাশে ঝুলে রইলো। তিনি ফের গাঢ় চোখে শাহজাদার দুই চোখে তাকালেন।

আওরঙ্গজেব সেই চোখের একেবারে সামনে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়া থেকে কেঁপে উঠলেন। কিন্তু কিছুতেই নিজের চোখের পলক পড়তে দিলেন না।

নিজেকেই মনে মনে বলে উঠলেন—আপনি আব্বা হুজুর হতে পারেন—কিন্তু ভুলে যাবেন না—আমিও আপনারই আওলাদ। আপনি স্নেহ করতে পারেন। ঘৃণা করতে পারেন। খেলাত দিতে পারেন। শাস্তি দিতে পারেন। আবার ভালোবাসতেও পারেন। আমি চোখের পলক না ফেলে দেখতে চাই—নিজের ছেলেকে আজ আপনি আসলে কী দিতে চান।

বাদশা বললেন, আজ থেকেই তুমি মুঘল শাহীর লাল তাঁবু ব্যবহার করতে পারবে। আশা করি এই তাঁবুর মান রাখতে পারবে তুমি—

শাহজাদা আওরঙ্গজেব নিজের কোমর থেকে আধখানা হয়ে অনেকটা ঝুঁকলেন। তারপর ডান হাত ঝুলিয়ে দিয়ে তা নিজের কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই অবাক হলেন। দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে আমির, ওমরাহ, মনসবদার, জায়গিরদাররা সবাই যে যার জায়গায় বসে। কারও মুখে একটিও কথা নেই।

কিন্তু বাদশা শাহজাহান কখন তাঁর কুর্নিশের মাঝামাঝি লম্বা লম্বা পায়ে দেওয়ান-ই-খাসের মেঝেতে বিছানো বনাত মাড়িয়ে মুহূর্তে দুর্গের ভেতরে চলে গেছেন। বুঝি বা পলকে অদৃশ্যই হয়ে গেলেন। পুরো ব্যাপারটাই এত হঠাৎ ঘটে গেছে—মনসবদার-জায়গিরদারও বুঝতে পারেননি—বাদশা চলে গেলেন—এতই আচমকা যে সবাই একদম হতবাক।

পুরো দরবারের সামনে সবে মনসবি পাওয়া কচি শাহজাদা একা দাঁড়িয়ে। বাইরের আলো এসে এইমাত্র তাঁর দরবারি পোশাকে পড়ায় সব কিছু ঝলমল করে উঠলো। তাই দেখে দরবারের ঘোর কাটলো। মনসবদাররা দাঁড়িয়ে উঠে শাহজাদাকে মবারকবাদ দিতে লাগলেন। সবার আগে উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ এগিয়ে এসে মবারক জানালেন।

আওরঙ্গজেব জানেন, সাদুল্লা খাঁ যদিও উজিরে আজম—কিন্তু আজও তিনি সেই রোজিনাদার হয়েই আছেন। আহারে! কবে যে সাদুল্লা খাঁকে মনসবি দেওয়া হবে। পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা কিন্তু তাঁর উজিরে আজম আবুল ফজলকে রোজিনাদার করে রাখেননি। এক লাফে তাঁকে পাঁচ হাজারি মনসবদার করে দিয়েছিলেন। বাদশা শাহজাহানও কি তাঁর এই উজিরে আজমকে রোজিনাদারি থেকে ছুটি দিয়ে মনসবদার করতে পারেন না?

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে ভেসে উঠলো শাহজাদার—মনসবদার হয়ে লড়াই ফতে করে দক্ষিণ থেকে ফেরার পথে উজিরে আজম আবুল ফজল গোয়ালিয়রের কাছে নারওয়ার জঙ্গলের ধারেই বুন্দেলা রাজ বীর সিংহের হাতে খুন হন। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা—তখনকার শাহজাদা সেলিমের ষড়যন্ত্রে। সেই বীরসিংহের বংশের বুন্দেলারাজ ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করতেই বাদশা শাহজাহান আজ আমাকে ভার দিলেন। সময়ের কী সুন্দর খেলা! বাদশা বদলালে এককালের দোস্ত আজ দুশমন। মসনদকে ঘিরে নসিব—নিয়তি—সব সময় ঘর বদলাচ্ছে।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁয়ের মবারকবাদের জবাবি সালাম ফেরাতে

শাহজাদা আওরঙ্গজেব সামান্য ঝুঁকে তসলিম জানাচ্ছিলেন। সেই সময় দেখলেন, মুঘল শাহীর বাঘা বাঘা আমির-ওমরাহ, মনসবদাররা উঠে আসছেন। কে আগে শাহজাদাকে মবারকবাদ জানাবেন—তাই নিয়ে ওদের ভেতর যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই মানী। সবাই তাগদদার। ইরানি, তুর্কি, উজবেক, আফগান, হায়দরাবাদি। এক এক জনের এক এক রকমের 'জাত'—এক এক রকমের ঘোড়সওয়ার।

এত কিছুর ভেতর শাহজাদা আওরঙ্গজেব যেন একদম একা হয়ে গেলেন। কিছুই যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। কিছুই যেন তাঁর কানে যাচ্ছে না। অথচ তাঁরই সামনে—মনসবদাররা সামান্য ঝুঁকে কখনো আফগানি—কখনো উজবেকি ভাষায় তাঁকে মবারক দিচ্ছেন। এর ভেতর কখন যে মির্জা রাজা জয়সিংহের মতো মানী মানুষ এগিয়ে এসে তাঁকে মবারক জানিয়ে চলে গেলেন—তাও খেয়াল হলো না শাহজাদার।

এতক্ষণ দুই শাহী ওয়াকেনবীশ দেওয়ান-ই-খাসের খোলা অলিন্দের কাছাকাছি বসে আজকের শাহী দরবারে যা কিছু ঘটেছে তা আগাগোড়া লিখে নিয়েছেন। দরবার ভাঙায় এখন তাঁরা ঠাণ্ডার ভয়ে গলা অব্দি পশমে ঢেকে নিজেদের ভেতর সুর করে পড়ে পড়ে লেখার ভেতরকার গরমিল শুধরে নিচ্ছেন। তারই একটা কথা সুদূর স্বপ্ন হয়ে শাহজাদারও কানের কাছে ভেসে রইলো।

—আজ অল হিজরি ১০৪৪ সনের ২২শে জামাদা—

শাহজাদা আওরঙ্গজেব তখন মনে মনে বলে উঠলেন, বুরহানপুর। বুরহানপুর। ওই বুরহানপুর থেকেই আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের জন্যে টুকরি বোঝাই দিয়ে বুরহানপুরি ল্যাংড়া আসে। ওই বুরহানপুরের দুর্গেই বাজি রোশনআরা আর আমি জন্মেছি। ওই বুরহানপুর দুর্গেই গওহরআরাকে দিতে গিয়ে আম্মিজানের এন্তেকাল হলো।

সুখ, ভোগ, তাগদের জিন্দা গেণ্ডুয়ার মতোই এইসব আমির, ওমরাহ, মনসবদাররা আমায় মবারক জানিয়ে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এরা যার যার এক্তিয়ারে বকশিশ, শাস্তি দিয়ে থাকেন। তাগদ এক আশ্চর্য চাকা। এই চাকার ওপরে উঠলে সুখ। নিচে নামলেই হারিয়ে যাওয়া। চাকা তো সবসময় ঘুরছে। ওপরে উঠলেও তো একসময় চাকার নিচেই নেমে আসতে হয়। তাই একদিন রাতে এসেছিলেন শাহজাদা খসরু। ওই বুরহানপুর দুর্গেই। আমার নাকি তখন মোটে তিনবছর বয়স। সেদিন অন্ধকার শীতের রাতে বাইরে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। পরদিন সকালে তামাম হিন্দুস্থান জানলো—পিত্তশূলের ব্যথায় শাহজাদা খসরুর এন্তেকাল হয়েছে।

এসবের কিছুই জানতেন না শাহজাদা আওরঙ্গজেব। ক'দিন আগে নিশুতি রাতে দেখতে পেলেন—নিচে যমুনার দিকে মোরিদরওয়াজার কাছে একটা হাতবাতি খুব ঘোরাঘুরি করছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। কেমন সন্দেহ

হলো শাহজাদার।

কোনোরকম পাহারা সঙ্গে না নিয়েই শাহজাদা নিচে নেমে এলেন। শাহী হাতিরা কেউ কেউ জেগে। কেউ ঘুমের ভেতর মাঝে মাঝে অভ্যেসবশে লেজ ঘুরিয়ে দাবনায় আছাড় মারছে। কারও সামনে শরাব যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। আরেকটু এগিয়ে আওরঙ্গজেব দেখলেন, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের দুটো বুড়ো ময়ূর দাঁড়ানো দশায় পাখনার ভেতর ঠোঁট গুঁজে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। পেখম খসা ডানার সাদা জায়গাগুলো কেমন ঘা ঘা।

শাহজাদা মোরি দরওয়াজার কাছাকাছি আসতেই ছুটোছুটি করা হাত-বাতিটার মালিক চেঁচিয়ে উঠলো, দূর বাস্! দূর বাস্!

সরো। সরে যাও। ফারসিতে ভয় দেখানো এই হুঁশিয়ারির গলা তো কোনো ইস্পাহানির নয়। দিব্যি হিন্দুস্থানের টান। আওরঙ্গজেবও হুকুমি গলায় বলে উঠলেন, তুমি কে?

হাতবাতি হাতে লোকটা এগিয়ে এলো। চুলদাড়ির ভেতর দিয়ে শুধু চোখ দুটো দেখা গেল। শরাবের গন্ধ ভুর ভুর করছে। হাতির শরাব হাতি কোনো-দিনই পুরোটা পায় না। শাহজাদা চিনতে পারলেন। হাতিতে হাত পাকানো—তুখোড় ফিল-ই-বকসি। সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আব্বা হুজুরের বাগী আমলে নাসিক থেকে বাদশার আশপাশেই লোকটা সবসময় ঘুরঘুর করে।

আওরঙ্গজেব বুঝলেন, ফিল-ই-বকসি তাঁকে আদৌ চিনতে পারেনি। চেনার দশা নেই।—কোথায় গিয়েছিলে?

শাহজাদার ধমকানিতে ফিল-ই-বকসি ভেতরে ভেতরে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করলো।

—ঠিক করে বলো—এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথাও তো যাইনি। এখানেই আছি—বলেও সনাতন হাতি ভেতরে ভেতরে এই টুকটুকে চেহারার নওজোয়ানকে চেনার চেষ্টা করতে লাগলো।

—বাইরের অন্ধকার থেকে মোরি দরওয়াজা দিয়ে এইমাত্র ঢুকতে দেখলাম যে—

—ওঃ! যমুনার ধারে গিয়ে মেপে দেখছিলাম—

শাহজাদা পিছোবার পাত্র নন্। যমুনায়? কী মাপা হচ্ছিল?

—নদীতে কী মাপে হুজুর! কিন্তু এত রাতে? এখানে? আপনি কে জানতে পারি কি?

শাহজাদা রহস্য করে বললেন, এতক্ষণ দেখছো। তাও চিনতে পারোনি?

ঘাবড়ে গেল সনাতন। খোদাবন্দ! সত্যি করে বলুন আপনি কে?

সনাতনের হাত থেকে বাতিটা পড়ে যাচ্ছিল। আওরঙ্গজেব ধমকে উঠলেন, ঠিক করে ধরো। শাহজাদা সেলিমকেও চেনো না!

কেমন খটকা লাগলো সনাতনের। আপনি শাহজাদা সেলিম?

—কোনো সন্দেহ আছে!

—কিন্তু তিনি তো—

—কোনো কিন্তু নেই ফিল-ই-বর্কাস। এই নিশুতি রাতে যমুনায় জল মাপার কী দরকার পড়লো ?

নিজের পদের কথা নির্ভুল শুনেই সনাতন শাহজাদার সামনে একদম ঠিকঠাক হয়ে ওঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। তার মনে হলো—হবেও বা—শাহজাদা সেলিমই হয়তো এসেছেন। অনেকটা ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলো। তারপর বলে উঠলো, জল নয় শাহজাদা। রক্ত—রক্ত। কতটা রক্ত যমুনা দিয়ে বয়ে চলেছে—তাই মেপে দেখছিলাম—

—রক্ত ? —বলেই আওরঙ্গজেবের ভ্রু কুঁচকে গেল।

—হ্যাঁ শাহজাদা। আপনার পহেলা আওলাদ খসরুর রক্ত—

—খসরুর ? সে তো বুরহানপুর দুর্গে পিতশুলের—

হো হো করে হেসে উঠলো সনাতন হাতি। হাসি আর থামতেই চায় না।

শাহজাদা ধমকে উঠলেন। থামো। বে-তমিজির শাস্তি কী জানো ?

—জানি শাহজাদা। বলতে বলতে আওরঙ্গজেবের কানের কাছে চুলদাড়ি সমেত মুখ নিয়ে এলো সনাতন। অন্য সময় স্বপ্নেও এ ছবি কল্পনা করা যায় না। নিশুতি রাত। আলো বলতে হাতবাতির কাঁপা কাঁপা শিখাটি। সামনে মোরি দরওয়াজায় হা হা করছে যমুনার বুকের কালো অন্ধকার। একে বোটকা গন্ধ—তায় নোংরা চুলদাড়ি গায়ে মুখে লাগে লাগে। কিন্তু ফিসফিস করে সনাতন কানের কাছে যা বললো—তাতে শাহজাদা ওকে ধমকাবেন কি ! আরও জানার ইচ্ছে হলো।

আওরঙ্গজেব বললেন, তুমি ঠিক জানো ?

—বেঠিকের কী আছে ! তাজ্জব ! এ কথা তো তামাম হিন্দুস্থান জানে ! আপনার ছোটা শাহজাদা শারিয়ার—আপনার পহেলা নাতি সুলতান দাওয়ার বকস্ কোথায় ? কোথায় তারা ? গোয়ালিয়র দুর্গে—আপনি শোনেননি ?

বলতে বলতে সনাতন হাতি ফের সেই বোটকা গন্ধ নিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠলো।

দশ হাজারি 'জাত'—চার হাজারি ঘোড়সওয়ারের আনকোরা মনসবদার—শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরের খেয়াল হলো চারদিকে কেউ কোথাও নেই। তিনি একা দেওয়ান-ই-খাসের ফাঁকা দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরে রাজধানী আগ্রার দুপুরে শীতের চকচকে রোদ। আজ অল হিজরি ১০৪৪ সনের ২২শে জামাদা। আজ থেকে শাহী হুকুমে তিনি তাগদদার মনসবদার। এখন তিনি লাল তাঁবু ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর হুকুমে ঘোড়সওয়াররা ছুটে যাবে। সুখ, ভোগ, তাগদ—সবই হাতের মুঠোয়। পায়ের নিচে বিশাল হিন্দুস্থান। মাথার ওপরে তারও চেয়ে বড় আসমান।

—এ কি ! এখানে একা দাঁড়িয়ে ভাইয়া ?

আওরঙ্গজেব ছোট্ট করে বললেন, হুঁ।

—ঘোড়সওয়ারদের ভার বুঝে নিতে সাকেত ছাউনিতে যাবে না ?

এবার কোনো কথাই বললেন না শাহজাদা। তিনি চুপ করে তাঁর চেয়ে এক বছরের বড় শাহজাদী রোশনআরাকে দেখছিলেন। শাহজাদী জাহানারার চেয়ে মুখ চোখ—ভাবভঙ্গি কিছু অন্যরকমের। জাহানারা বাজির মুখে মরহুমে আত্মজানের ভঙ্গি ফুটে ওঠে। সেই তুলনায় রোশনআরা বাজির মুখে আব্বা হুজুরের মুখের ছুঁচলো ভঙ্গিটাই বেশি আসে। চোখের নিচে গালের কিছু কিছু বেশি উঁচু। অনেকটাই আব্বা হুজুরের সঙ্গে মেলে। একেবারে খাঁটি চাঘতাই ছাঁচ যেন। চওড়া কাঁধ। খাঁজে খাঁজ। সরু কোমরে মসলিনের ডোরিয়া এঁটে বসেছে। চোখ নীলচে। তবে মাথা ভর্তি কালো চুল।

শাহজাদা হঠাৎ জানতে চাইলেন—একদম অন্য কথা। আচ্ছা বাজি—তোমার জন্ম কোথায় ?

—কেন ? বুরহানপুর দুর্গে—

—আমার ?

—তুমিও ওখানেই জন্মেছিলে। আজ এতদিন পরে ওকথা কেন ভাইয়া ?

—এমনি। একবার বড় বাজির কাছে যেতে হবে—

—ওঃ ! তিনি তো ফেরেননি !

—কোথায় ?

—তিনি আর বড়েভাইয়া সেই যে লাহোরে গেছেন—ফেরার নাম নেই।

॥ সাতচল্লিশ ॥

হিন্দুস্থানের বুকের কাছে বুন্দেলখণ্ড—আর মাথার কাছে বলক—বদকশান। গোয়ালিয়রের বাঁদিকে কাইমুর পাহাড়ের পায়ের কাছে বুন্দেলখণ্ডের শুরু। ঘন জঙ্গল। টিলার পর টিলা—আর পাহাড়ী নদী বেতোয়ার দরুন বুন্দেলখণ্ডে ঢোকাই কঠিন। সেখানকার বাগী কাণ্ডকারখানায় বাদশা শাহজাহান খুবই চিন্তিত। চিন্তিত তিনি বলক্ আর বদকশানকে নিয়ে। উত্তর থেকে হিন্দুস্থানের ওপর যে কোনো হামলা আটকাতে বলক আর বদকশানের ওপর শাহী দখল রাখা ভীষণ দরকার। তাই লাহোরে এলেই তিনি কাশ্মীর হয়ে বলক আর বদকশানের ফৌজি ছাউনিগুলোতে একবার ঘুরে আসেন। সেখানে সিপাহিরা কতটা তৈরি তার যাচ্ ইমতেহানি করে তবে ফেরেন।

শীতে চিনার গাছের পাতাগুলো যেন মুছে গেছে। তুষার পেছল পাহাড়ী পথ দিয়ে বাদশার কাফেলার ঘোড়াগুলো ভিজে দাবনা নিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে সমতলে নেমে এলো। সামনেই ভিম্বরের রাজার জমিদারি। বদকশান যাবার সময় বাদশার কাফেলা এই পথ দিয়েই ওপরে উত্তরে উঠে গিয়েছিল। কাশ্মীরের স্কার্দু, গিলগিট হয়ে বলক-এ যাবার রাস্তা। যাতায়াত কম পথ নয়।

এদিকে বাদশা শাহজাহানের ফেরার পথে ভিম্বরের একমেব পাহাড়ী নদী

ধলির তীরে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অপেক্ষা করছিলেন। অনেক বই লিখেছেন তিনি। তাই শাহী দৃষ্টিতে তিনি হলেন গিয়ে সরামদ্-ই মুসন্নিফান্। বহু গ্রন্থের জনক। জগন্নাথ একজন বড় দরের গায়কও বটে। তবে কর্ণাটিক ভাষায় গান বলে আগ্রার শাহী দরবারে বিশ্রাম খাঁ বা দরাঙ্গ খাঁয়ের মতো নামযশ পাননি। মল্লিনাথের টীকা ছাড়াও তাঁর মনোরমা কুচমর্দন রসিকদের দরবারে কদর পেয়ে থাকে। গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে টলেমির বিখ্যাত বইটি আরবি অনুবাদে 'অলম্যাজিস্ট' বলেই পরিচিত। সেখানি সামনে রেখে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লিখেছেন সিদ্ধান্তসার কৌস্তভ। মোট কথা শাহী দরবারে তিনিই সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত।

আজ এই শীতের দুপুরে ধলি নদীর পাড়ে তিনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ জাফরান রংয়ের আঙরাখা—মাথায় রং মেলানো পাগড়ি পরে বাদশা শাহজাহানের জন্যে অপেক্ষা করছেন। এই পথ দিয়েই বাদশার ফেরার কথা। আজ ১০৪৪ হিজরির ২২ শে রবিউস-সানি।

জগন্নাথের পাশে তাঁর নবীন সাকরেদ নীলাক্ষ দাঁড়িয়েছিলেন। ন্যায় তাঁর বিষয়। নীলাক্ষ বললেন, গুরুদেব, আমার মনে হয় আপনি এখন বিশ্রাম নিতে পারেন। বাদশার এসে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।

—সন্ধে অব্দি তো এই ঠাণ্ডায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। বাদশার যে প্রশস্তি লিখলাম—তা তো মাঠে মারা যাবে তাহলে।

—গুরুদেব! আপনি শাহী দরবারে সবচেয়ে প্রবীণ—সবাই আপনাকে সম্মান করেন। আপনি না হয় কাল ভোরে উঠে বাদশাকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁকে আপনার লহরী শোনাবেন। প্রশস্তি লিখেই তো আপনার আয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছেন। আর এদিকে—

পণ্ডিতরাজ তাঁর কাঁচা সাকরেদ নীলাক্ষর মুখে তাকালেন। দেখলেন, সে মুখে বিষাদ—রাগ একই সঙ্গে খেলা করছে। প্রশস্তি নিয়ে নীলাক্ষর কথায় শ্লেষ কেন? বছর খানেক হলো নীলাক্ষ একটি কাশ্মীরী মুসলমান মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। মেয়েটি ভালো শায়ের।

—এদিকে কী?

—আপনার কিছুই অজানা নয় গুরুদেব।

—আহা খুলেই বলো না নীলাক্ষ।

নীলাক্ষ তাঁর গুরুর মুখে তাকালেন। চোখে দ্বিধা। শেষে বললেন, আপনি নিশ্চিত শুনে থাকবেন—ভিম্বরের জমিদার তাঁর এই জমিদারিতে ধর্ম ত্যাগ না করেই হিন্দু মেয়ের মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা চালু করেন। তাঁর ব্যবস্থায় হিন্দু ছেলে ধর্ম ত্যাগ না করেই মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে পারে।

—তাই তো তুমি সাকিনাকে বিয়ে করলে—

—গুরুদেব! এ-পথ দিয়ে কাশ্মীর যাবার পথে বাদশা তো সব উল্টে দিয়ে গেলেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের চোখ রাস্তার দিকে। পাহাড়ী পথের মাথায় কখন বাদশার সূর্য আঁকা ধ্বজার ডগা চোখে পড়ে। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়ের

চুড়োগুলো দুপুরের রোদে ঝকঝক করছে। তিনি বললেন, কিরকম ?

নীলাক্ষ বললেন, ওপরে স্কার্দু যাবার সময় বাদশা ফরমান দিয়ে গেছেন—যে সব হিন্দু মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছে—তাদের বউ কিংবা ধর্ম—দুটোর যে কোনো একটা ত্যাগ করতে হবে। এখন সাকিনা আর আমি কী করি ? মোল্লারা বাদশাকে তাতিয়ে তাতিয়ে ইসলামের ইমাম মেহদী—যাকে বলে কল্কি অবতার করে তুলেছে।

পণ্ডিত জগন্নাথ পাহাড়ী পথের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। দূরে তুষার চাপা ডাঙা মাঠে লম্বা ঠ্যাংয়ে এদিক ওদিক করছে কয়েকটি পাখি। ওরা পোকা খুঁজে খাবে। এমন সময় পাহাড়ী সড়কের মুখে সূর্য আঁকা চাঘতাই ধ্বজার ডগা পরিষ্কার নীল আকাশে ফুটে উঠলো।

—ওই যাঃ ! বাদশা তো এসে গেলেন নীলাক্ষ।

—আপনি অত উতলা হবেন না গুরুদেব—

—উতলা হবো না ? কী বলছো নীলাক্ষ ! খোদ বাদশা আসছেন—

—আপনি তো বাদশা কম দেখেননি। বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলেও ছিলেন দরবারে। তখন উজিরে আজম আসফ খাঁ—বাদশা শাহজাহানের শ্বশুরমশায়ের নামে আসফ লহরী লিখেছিলেন।

নীলাক্ষর কথা শেষ হতে না হতে বাদশার সঙ্গী ঘোড়সওয়াররা ধূলি নদীর গা ধরে রাস্তা সাফ করতে করতে ছুটে গেল। আশপাশে দাঁড়ানো লোকজন বাদশাকে একবার চোখের দেখা দেখবে বলে সকাল থেকে এসে জড় হয়েছিল। তারা ছুটে নাবি জমিতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়লো। ততক্ষণে ফিল-ই-ফতের পিঠে গাদেলার ওপর তখত-ই-রওয়ানে বসা বাদশা এসে পড়েছেন।

নীলাক্ষ দেখতে পেলেন—তাঁর গুরুদেব কোমরবন্ধের ভেতর থেকে গোল করে পাকানো কিছু রঙিন কাগজ দু'হাতে তুলে ধরছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে দাঁতে চাপা স্বরে এই দুটি কথা বেরিয়ে এলো, প্রশস্তি ! প্রশস্তি !

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বড় গাইয়েও বটে। সুরেলা ভরাট গলা। তিনি ফিল-ই-ফতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বাদশার ইঙ্গিতে ভৈ আর মেঠ মিলে হাতিকে থামালো। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী পথ জুড়ে বাদশার পুরো কাফেলা—হাতি ঘোড়া উট—সওয়ার, পদাতী, বন্দুকচী সমেত দাঁড়িয়ে গেল। রঙিন রঙিন সব পতাকা—এক এক রিসালার এক এক রকম। কিছু ফূর্তিবাজ উজবেক সওয়ার তাদের ঘোড়ার হাঁটু, বুক নীল আর হলুদে রাঙিয়ে নিয়েছে। ঘোড়ার দল জায়গায় দাঁড়িয়ে পা বদলাচ্ছে। শীতের দুপুরের পরিষ্কার রোদে হাতি, ঘোড়া, উট, মানুষের সে এক আশ্চর্য চেষ্ট।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বাদশা শাহজাহানের আগ্রার শাহী দরবারে রীতিমত আলো করা নাম। তাঁর কুর্নিশের জবাবে বাদশা গাদেলার ওপর থেকে সামান্য হাসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ তাঁর কাগজের গোছায় চোখ রেখে পড়তে পড়তে গেয়ে উঠলেন, কর্ণাটক টানে—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা মনোরথান্—

রীতিমত তাল লয়ে বিস্তার। গান শোনা কান বাদশার। তাঁর ভালোই লাগছে। দিল্লি কথাটি ছাড়া আর কোনো কথারই তিনি মানে ধরতে পারছেন না। তবে এটা বুঝতে পারছেন—তাঁরই গুণ গেয়ে পণ্ডিতরাজের এই গান। ফিল-ই-ফতের পায়ের সামনে সিঁদুরে চিহ্ন আঁকা হিন্দুদের মঙ্গল কলস পণ্ডিতরাজ তৈরিই রেখেছিলেন। বাদশাকে কুর্নিশ করেই হাতির পায়ের সামনে বসিয়ে দিয়েছেন। তারপরই এই সুরেলা গুণগান—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্ পূরয়িতুংসমর্থঃ

মঙ্গলকলস, তুলাদান, প্রশস্তিতে হিন্দু হিন্দু গন্ধ থাকলেও অমঙ্গলের ভয়ে বাদশা শাহজাহান এসব ব্যাপারে কখনো বাদ সাধেন না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের প্রশস্তি শেষ হলো। এবার বাদশার ইঙ্গিতেই ফিল-ই-ফতে হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসলো। তবু বাদশা অনেক উঁচুতে। পণ্ডিতরাজ ফিল-ই-ফতের গা বেয়ে উঠে বাদশার কপালে সিঁদুরে আবিরে তিলক এঁকে দিতে দিতে বললেন—দিল্লীশ্বরো বা জগদ্বীশ্বরো বা—

কপালে তিলক নিতে নিতে বাদশা দেখলেন—দূরে মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই ওয়াকেনবীশ। ওঁরা একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন—আবার মাথা নিচু করে নিজেদের খাতায় লিখছেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বাদশার প্রশস্তি শেষ করে নিচে নামতেই শাহজাহান ওয়াকেনবীশদের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তিনটি আঙুল একসঙ্গে তুলে দেখালেন।

দেখেই ওয়াকেনবীশদের একজন অন্য ওয়াকেনবীশকে বললেন, বাদশা চান—তুজুক-ই-শাহজাহানে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের এই প্রশস্তির ছবি থাকবে তিনখানা—

অন্য ওয়াকেনবীশ বললেন, একই ঘটনার তিনখানা ছবি?

—তিনদিক থেকে! ধরুন ধলি নদীর তীর থেকে একখানি ছবি। আরেক-ওই চিনার গাছতলায় দাঁড়িয়ে যেমন দেখাবে তেমন—তিসরি ছবি হবে ওই টিলায় দাঁড়িয়ে দেখলে যেমন দেখায় তেমন।

—তাহলে তো যা দেখেছি শুধু তাই লিখলেই হবে না।

—বটেই তো। অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলে কেমন দেখাতো—তাও ভেবে ভেবে লিখে রাখুন। আমরা আগ্রায় ফিরলে আমাদের লেখা পড়েই তো খুঁটি-নাটি জেনে তবে ছবি আঁকা হবে। ভালো কথা—পণ্ডিতরাজের মাথার পাগড়ির রং লিখেছেন তো?

—নিশ্চয়। তবে রোদ পড়ে যেমনটি দেখাচ্ছে—তাই-ই লিখেছি।

—ওতেই হবে।

—দেখবেন। শেষে যেন ফাঁপরে না পড়ি।

ফের কাফেলা চলতে শুরু করলো। যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। বাদশা নাগাড়ে চলতে চলতে সন্ধের মুখে মুখে গিয়ে রাতের মতো তাঁবু ফেলাবেন।

জগন্নাথের সুরেলা প্রশস্তি বাদশা শাহজাহানকে মুগ্ধ করেছে। তিনি মনে মনে আওড়াচ্ছিলেন—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্—

আগ্রায় ফিরে ওই মনোরথান কথাটির মানে খুঁজে নিতে হবে। না জানি কথাটার ভেতর কী এক সুন্দর রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি দিল্লির ঈশ্বর! এই দুনিয়ার ঈশ্বর! এই শীতের দুপুরে কাশ্মীর কী সুন্দর। সুন্দর পাহাড়ী নদী ধলির জল। কী সুন্দর এই হিন্দুস্থান। সবার চেয়ে সুন্দর এই হিন্দুস্থানের বাদশাহী। হঠাৎ বাদশা শাহজাহান হাত তুলে কাফেলা থামাতে বললেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষজন, হাতিঘোড়া—সব থেমে দাঁড়ালো।

পেছনের ঘোড়া থেকে দুই ওয়াকেনবীশ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে বাদশার হাতির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন।

বাদশা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে তাঁর সমান ওজনের সিক্কা তনখা বকশিশ করলেন। ভিম্বরের মহাল কানুনগো, ক্রোরি, তসিলদার, মুকদ্দম—সবাই হাজির ছিল। বাদশা কোথাও গেলে সেখানকার ওসব শাহী লোকজন তো হাজির থাকবেই।

বাদশার হুকুম শুনে ওয়াকেনবীশ দু'জন খসখস করে লিখে নিলেন। শাহী মুকদ্দম চাপা গলায় খাজানাখানার ক্রোরির কাছে জানতে চাইলেন, এই গায়কটার ওজন কত হবে?

ক্রোরি তার চেয়েও চাপা গলায় বললেন, চুপ। চুপ। শুনতে পেলে ঘাড়ের ওপর মুণ্ডুটা হারাতে হবে। গায়ক নয়। আগ্রার দরবারি কোনো শায়ের হবে হয়তো।

—লোকটা যাই হোক আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে ওজন বেশ হবে। দু'কলি গান গেয়ে একেবারে মুফতে অনেক সিক্কা তনখা বকশিশে টেনে নেবে!

মুকদ্দরের একথায় ক্রোরি বললেন, তা নিক না। কত আর হবে? মানুষটা ওজনে বড়জোর এক মণ বিশ সেরই হোক। তাহলে হাজার পাঁচেক তনখার বেশি তো আর বকশিশে যাচ্ছে না। আগ্রা শাহীতে বছরে যেখানে একশো কুড়ি কোটি তনখা খরচা—সেখানে এ ক'টা তনখা এলো কি গেল তাতে কী যায় আসে!

কাফেলা আবার চলতে শুরু করেছে। দূরে লম্বা পায়ে পাখিগুলো তুষার সরিয়ে জ্যান্ত পোকা খুঁজছে। শীতের রোদে কোনো জোর নেই। এক প্রস্থ প্রশস্তি গেয়ে পণ্ডিতরাজ প্রায় চোখ বুজে দাঁড়ানো। তাঁর সামনে দিয়েই কাফেলা এগোতে শুরু করলো। ন্যায়ের ছাত্র নীলাক্ষ শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, জগন্নাথের মতো মানুষ যখন তাঁর গুরু—তখন ধর্ম বা সাকিনা—দুটোর কোনোটাই তাঁকে ছাড়তে হবে না—এমন কোনো পথ বাতলে দেবেন পণ্ডিতরাজ। এমন খোশমেজাজে বাদশাকে বড় একটা পাওয়া যায় না। রাজধানী আগ্রার বাইরে এমন শরিফ মেজাজে বাদশাকে পাওয়া নসিব। সেই সুযোগ ছেড়ে দিলেন গুরুদেব? প্রশস্তি গান শুনে একেবারে জল হয়ে গিয়ে শাহজাহান বকশিশ কবুল করলেন। এখন তো গুরুদেব তসলিম জানিয়ে

বাদশার মবারকে এই বলে আর্জি জানাতে পারতেন, জাঁহাপনা ! এই না-লায়েক আমার সাগ্রিদ। আপনার ফরমানে ওর যে জিন্দা গোর যাওয়ার দশা। বন্দেগান ! ও ধর্ম যা সাকিনা—কাউকেই যে ছাড়তে পারবে না !

কিন্তু এসব কিছুই ঘটলো না। গুরুদেব দিব্যি হাসিমুখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে। নীলাক্ষর এ অবস্থা আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি খুব আস্তে পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথের কোমরে আলতো করে ধাক্কা দিলেন। দিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, এগিয়ে যাওয়া ফিল-ই-ফতের পিঠে গাদেলার ভেতর তখত-রওয়ানে বসা হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান কেন জানি আচমকাই পেছন ফিরে তাকিয়েছেন এদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে নীলাক্ষর হাতখানি পাথর হয়ে গেল। প্রশস্তি গেয়ে সার্থক গুরুদেব চোখ খোলেননি। তিনি জানেনও না, বাদশা তাঁরই দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। নীলাক্ষর বুক কেঁপে উঠলো। লালচে মুখ। নীল চোখ। উষ্ণীষের বাইরে বিখ্যাত কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল। বুকে, গলায়, কানে, সরবন্ধে সূর্যের এই নরম, অলস আলোতেও চুনির ঝিলিক। ন্যায়ের ছাত্র নীলাক্ষর পরিষ্কার মনে হলো—কী যেন বুঝতে পেরে বাদশার নীল চোখের কোণ রাগে লাল হয়ে উঠছে। বাদশা তাঁকে এখুনি পিঁপড়ের মতোই টিপে মেরে ফেলতে পারেন। আমার জীবন কী সামান্য ! অকিঞ্চিৎ ! ওই মানুষটির এক ফরমানে আমার আর সাকিনার জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এই মানুষটি হিন্দুস্থানের মানুষজন তো বটেই—পাহাড় পর্বত, নদী জঙ্গলেরও মালিক।

বাদশা শাহজাহানের একধারা সামনে তাকিয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগছিল বলে তিনি কয়েক পলকের জন্যে পেছন ফিরেছিলেন। আবার তিনি ঘুরে বসে সামনে তাকালেন। নীলাক্ষ এসবের কিছুই জানলেন না। শাহী কাফেলা অজগর গতিতে এগোচ্ছে। ভয়ে, অপমানে নীলাক্ষ ধলি নদীর গা ধরে এগোনো রাস্তার একধারে ধপাস করে পড়ে গেলেন। তাঁর এখন জ্ঞান নেই।

ডিসেম্বরের পাহাড়ী ধলি নদীর জল কালো করে কাশ্মীরে হিম সন্ধে নামলো। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারও বেশি বেশি করে পড়তে শুরু করবে। এরকমই এক হিম সন্ধ্যায় আরেক নদীর গা ঘেঁষে আরেকজন মানুষ এগিয়ে চলেছেন। পায়ে হেঁটে। সন্ধের হিমেল বাতাসে তাঁর নতুন গজানো দাড়ি চিবুকের ডানদিকে বেঁকে যাচ্ছিল। নদীটির নাম রাভি। সামনে গিয়াথপুরের চাষবাসের মাঠ। বাঁয়ে আলমগঞ্জ। মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলে কাফিপুরা। কেউ কেউ জায়গাটাকে ভগবানপুরাও বলে। লাহোরের ঠিক বাইরেই শাহজাদা দারা একা একা চলেছেন। যাবেন মিঞা মীরের আস্তানায়।

আজ বিকেলেই দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। সঙ্গে কোনো পাহারাকে আসতে দেননি। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা হিসেবে তাঁর এভাবে বেরনোর কথা নয়। হাতি, ঘোড়সওয়ারদের রিসালা—এসব নিয়ে পথে বেরলে শাহজাদা নিজের ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারেন না।

হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ের ভেতর মিশে গিয়ে আজ বড় ভালো লেগেছে শাহজাদার। দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ার সময়—তিনি জামদারখানার কড়া করে বলে দিয়েছিলেন, নাদির জামা থেকে চুনিগুলো যেন খুলে রাখা হয়—

বিকেল থেকেই লাহোরের বাতাসে হিম হিম ভাব। হাঁটতে হাঁটতে শাহজাদা লাহোরের কিল্লা মহল্লায় এসে পড়েছিলেন। সেখানে তুর্কিদের পাড়া পেরিয়েই নতুন গড়ে ওঠা শিখসঙ্ঘে বান্দা সিংয়ের দল কীর্তন গাইছিল। শাহজাদা আফগান পাগড়িই শুধু মাথায় পরেননি—পাগড়ির গুছি খুলে নিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছিলেন। তাই কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কোনো মুসাফির আফগান ভেবে থাকবে তাঁকে সবাই। শিখসঙ্ঘের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনতে বড় ভালো লাগছিল শাহজাদার। কী এক সুর এই গানের ভেতর—যা কিনা মুহূর্তে আসমানে পৌঁছে দেয়।

কিছুদিন ধরেই আকাশে বাতাসে—সুদূর ফাঁকা শাহী সড়কে ফুটে ওঠা হা হা করা নির্জন ধূসর ছবি শাহজাদাকে এক অজানা দুনিয়ার হাতছানি দেয় কেবলই। সন্ধ্যার মুখে মুখে সেই বিখ্যাত হাসনুহানা ঝোপের সামনে এসে শাহজাদা দারা তাঁর মুখের ওপর থেকে আফগানি পাগড়ির গুছি সরিয়ে দিলেন। আঃ! এখানকার বাতাস বুকে টেনে নিতেও কত সুখ। পাশেই রাভির বুকে ঢেউ ভাঙার ছলাত ছলাত। দুনিয়ায় কোথাও যদি নিজেকে একা পাওয়া যায় তো এখানে—সে এখানে।

—কে? কে ওখানে?

এ কণ্ঠস্বর শাহজাদা চেনেন। যেমন ভরাট তেমনি স্নেহে ডোবানো।

—আমি। আমি আপনার মুরিদ—

—মুরিদ? —বলতে বলতে আশি ছাড়ানো ছিপছিপে মানুষটি তাঁর লতা-পাতার ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই শাহজাদাকে দেখে অন্ধকারেও চিনতে পারলেন। ওঃ! তুমি শাহজাদা—এসো এসো। ভেতরে এসো।

শাহজাদা ঝুপড়ির ভেতর ঢুকে দেখলেন, কাঁচা মাটির বুকে বসানো অভ্রের একখানি পাত ধিকি ধিকি জ্বলে আলো দিচ্ছে। হিন্দুস্থানে কোথাও কোথাও ঘরে ঘরে এভাবে আলো করা হয়। মাঝে মাঝে পাতটি বসানোর কাঁচা মাটিতে জল ছিটিয়ে দিলে অভ্র পট পট করে না পুড়ে ধিকি ধিকি করে জ্বলে। তাতেই সুবিধা।

সেই আলোয় মিঞা মীরের নিরাভরণ পা দু'খানি বড় অলৌকিক লাগলো শাহজাদার। তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। সেই পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে নিজের চোখ মুখ পায়ের পাতায় রাখলেন। আজ কিছুদিন ধরে ভেতরে ভেতরে সবসময় যে বুক কাঁপে—কী করি—কী করি ভাবে ভেতরটা উতলা হয়ে ওঠে—তা নিমেষে কোথায় চলে গেল শাহজাদার।

—ওঠো শাহজাদা। উঠে দাঁড়াও—

কী ভরাট গলা। দারা বুঝতে পারলেন না—মিঞা মীর হুকুম করলেন! না, এ তাঁর অনুরোধ। শাহজাদা দারাশুকোর চোখে জল এসে গেল। তিনি

উঠে দাঁড়ালেন। মিঞা মীরের একদম মুখোমুখি।

মিঞা মীর দুই বড় বড় চোখে শাহজাদার মুখে তাকালেন। শাহজাদার মুখ থেকে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

শাহজাদার ঠোঁট কাঁপছিল। তিনি কোনোমতে বলতে পারলেন, হুজুর—!

—বোসো। বোসো। —বলে মিঞা মীর নিজের কাঠের পালিশ করা দাবানে বসলেন। বসে শাহজাদাকেও টেনে পাশে বসালেন। দারা দেখলেন, হুজুরের মুখভর্তি হাসিতে তাঁর চোখ দুটি—মুখের দুই হনু যেন নিশুতি রাতে আলো পেয়ে বরফের মতো জ্বলে উঠছে।

দারা বসলেন। মিঞা মীর বললেন, এসো। তোমার মুসাহদা শিখিয়ে দিই।

বলতে বলতে মিঞা মীর আসন করে বসলেন। বসে শাহজাদাকেও একই ভাবে বসতে বললেন, চোখের ইশারায়। বলে চোখ বুজলেন। দেখাদেখি দারাও চোখ বুজলেন।

চোখ বুজেই দারা দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে ফিকে একটা নীল আলোর ভেতর বেগুনি রং ঢুকে গিয়ে চারদিক আস্তে আস্তে সাদা আলোয় ভরিয়ে তুলছে। সব সময়ের অস্থির অস্থির অবস্থা কেটে গিয়ে মনটা কেমন শান্ত হয়ে এলো। শাহজাদার মনে হলো, মুসাহদা শিখিয়ে দেবার নামে হুজুর তো কিছুই শেখালেন না। স্রেফ নিজের পাশে আসন করিয়ে বসিয়ে দিলেন। তাতেই ?

হঠাৎ দারা বুঝলেন, হুজুর তাঁর পিঠে হাত রেখেছেন। দারা চোখ খুললেন। মিঞা মীর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাহজাদা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন।

—বোসো। হাত দু'খানা তোলো—

দারা অবাক হয়ে হাত দু'খানি তুলতেই মিঞা মীর তাঁর গায়ের জামাটি খুলে দিয়ে পাশে রাখলেন। লাহোরের শীতে রাত্তির গায়ে খোলা জায়গায় সামান্য ঝুপড়ির ভেতর খালি গায়ে শাহজাদার শীতে কেঁপে ওঠার কথা। অবাক হলেন তিনি। না, কোনো শীতই লাগছে না তাঁর। বরং যেন কোন অদৃশ্য আগুনের কাছাকাছি বসায় তাঁর আরামই লাগছে।

এবার মিঞা মীর তাঁর নিজের গায়ের ঢিলে খিরকাটিও খুলে ফেললেন।

—কাছে এসো—

শাহজাদা এগিয়ে যেতে মীর সাহেব তাঁর নিজের ডান বুক দারাশুকোর ডান বুকে চেপে ধরলেন। —আমার মধ্যে যা আছে তা তুমি নাও—

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা দেখলেন, হুজুরের বুকের ভেতর থেকে যেন বা অভ্রের উজ্জ্বল আলোই বেরিয়ে এলো। এবং তা তাঁর নিজের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলো। নিজের বুকে আলোর এই ঢুকে পড়া শাহজাদা স্পষ্ট টের পাচ্ছিলেন। সে এক অদ্ভুত অবস্থা।

খানিক বাদে শাহজাদা দারা বলে উঠলেন, হুজুর! আমি যে আর পারছি না—

মিঞা মীর হাসলেন। কেন ? কী হলো ? তুমি তো এ-ই চেয়েছিলে!

—যথেষ্ট। যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর পারছি না।

—কেন ?

—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আর নিলে আমার সারা বুকটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। আমি আর নিতে পারছি না। আর ধরতে পারছি না হুজুর। আমার বুক ভরে উঠছে আনন্দে! এত আলো!

মিঞা মীর কোনো কথা বললেন না। শুধু হাসি ছড়িয়ে তাকিয়ে আছেন। চারদিক নির্জন। ঝুপড়ির কোণে অভ্রপাতের উজ্জ্বল শিখাটি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শাহজাদার মনে হলো, যেন স্বয়ং পয়গম্বর তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে আজ এই রাতে রাভির তীরে নেমে এসেছেন। গাছপালা, লতাপাতা, দুনিয়ার ধুলো, রাভির জল, আসমানের তারার দল মাথা নিচু করে তাঁকে—তাঁর পায়ে কদমবোসি করছে। দারা যেন কাবা মসজিদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। ঘুমের ভেতর যেভাবে মানুষ হাঁটে—সেইভাবেই শাহজাদা হেঁটে হেঁটে ঝুপড়ির বাইরে হাসনুহানা ঝোপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই পরিষ্কার বুঝলেন, আজ রাতে সারা আসমান অনেক নিচে নেমে এসে হুজুরের এই ঝুপড়ির ওপর চাঁদোয়া হয়ে থেমে আছে। সে চাঁদোয়ায় বুটিদার সব তারা।

—এসো। আজ তোমাকে আমি কিছু শেখাই—

মিঞা মীরের এই গলার স্বর শাহজাদার মনে হলো—বুঝি বা দৈববাণী।

শাহজাদার দু'দিকের কানের ওপর তাঁর দু'হাতের পাতা রাখলেন মিঞা মীর। অমনি দারাশুকোর দুই কানে ভীম গর্জনে কোনো ভূমিকম্পের ভেঙে পড়ার শব্দ ঢুকে পড়লো। আচ্ছন্ন শাহজাদা বুঝতে পারছেন ভেঙে পড়া খান খান শব্দ বেড়েই যাচ্ছে। আর পারলেন না। ধপাস্ করে হাসনুহানা ঝোপের সামনে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হারাতে হারাতে টের পেলেন—কিসের এক আনন্দে তিনি ভরে উঠছেন। সেখানে সুদূর আগ্রা আর কাছের লাহোর দুর্গ—সবই মনে হলো পাশাপাশি—একই জায়গায়।

তখন শাহজাদা একটু একটু করে শুনতে পেলে—নির্জন রাত—নির্বাক আকাশ—মিঞা মীরের আস্তানার গাছপালা যেন কথা বলছে। ঠিক কথা নয়। আসমান-জমিন মিলিয়ে একটি মাত্র শব্দ—একটি মাত্র সুর। যেন বা রাজধানী আগ্রার দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে বসে দরাঙ্গ খাঁ ধ্রুপদের লম্বা তানের একটি স্বরই আলাপ করে চলেছেন। ওম্-ম্-ম্। আস্তে আস্তে তা বেড়েই চলেছে—জোরালো থেকে আরও জোরালো হয়ে উঠছে। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে—ঢেকে ফেলে তা আরও প্রবল হয়ে উঠলো। সারাদিন এই দুনিয়ায় যেসব শব্দ শোনা যায়—তার চেয়ে এ শব্দ একদম আলাদা—ভিন্ন।

শাহজাদা একদম জ্ঞান হারালেন। কতক্ষণ মনে নেই—চোখ খুলে দারা দেখলেন—তারায় তারায় বুটিদার আসমান আরও নেমে এসেছে। একদম তাঁর মুখের ওপর। বুটিদার একটা তারার আলোর তাপ যেন তাঁর চোখে মুখে এসে লাগলো।

—ওঠো। উঠে বোসো।

দারা দেখলেন, হুজুর তাঁর মুখে বড় বড় চোখে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে আছেন। মিঞা মীরের প্রাচীন সাদা দাড়ি শাহজাদার বুকে এসে লুটিয়ে পড়েছে। এ যে কত বড় ভাগ্য। দারা উঠে দাঁড়ালেন। পড়ে যাওয়ার কোনো ব্যথা বা ক্লান্তি শরীরে নেই। বরং সারা শরীরটাই অজানা আনন্দে চনমন করছে।

—আজ তুমি সুলতান-উল-আযকর শুনতে পেলে—

দারা অবাক হয়ে তাকালেন।

—এই আযকর—এই শব্দ দুনিয়ার অন্য সব শব্দ থেকে ভিন্ন শাহজাদা। অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে এর মিল নেই। এ হলো গিয়ে নির্জন, নিঃশব্দ দুনিয়ার নিজের আওয়াজ। তোমার ভেতর জ্ঞানের আলো এলো। ভক্তির মধু তুমি আজ খেলে। তাই দুনিয়ার আদি শব্দ শুনতে পেলে দারা। যে ধ্যান হলে এই অবস্থা আসে—বা ওই শব্দ শোনা যায় তাকেই বলে সুলতান-উল-আযকর। এই হলো গিয়ে ধ্যানের সেরা ধ্যান শাহজাদা।

শাহজাদা কোনো কথা বলতে পারলেন না। আজ বিকেলে লাহোর দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় তিনি যে-মানুষ ছিলেন—এখন তিনি আর সে-মানুষ নন। এখন তিনি একদম অন্য মানুষ।

মিঞা মীর বললেন, সুলতান-উল-আযকর অভ্যেস করতে হলে একটা নির্জন জায়গা বেছে নেবে শাহজাদা। এমন জায়গাই বাছবে যেখানে লোকের যাতায়াত নেই—বাইরের কোনো শব্দ যেখানে পৌঁছবে না। সেখানে বসে নিজের মনকে কানের কাছে ভাবতে থাকবে। তখনই ওই সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে শুরু করবে দারা। আস্তে আস্তে সেই শব্দ গর্জন হয়ে উঠবে। সেই গর্জন তোমার মনকে বাইরের দুনিয়া থেকে টেনে আনবে। মন—মনের ভেতর তখন ডুব দেবে।

শাহজাদা তাঁর হুজুরের পায়ের কাছে গিয়ে বসলেন।

তখন যেন মিঞা মীরকে গল্পে পেয়ে বসলো। তিনি বলে উঠলেন, একবার সাধকেরা পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে আপনার কাছে বাণী আসে ?

জবাবে পয়গম্বর বললেন, আমি একরকম শব্দ শুনতে পাই যার আওয়াজ জলন্ত কড়ার মতো। কখনো তা মৌমাছির গুনগুনানির মতো। আবার কখনো ইনসানের চেহারা নিয়ে ফেরেস্তারা এসে আমার সঙ্গে কথা বলে যান। আবার কখনো আমি ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাই—

শাহজাদা দারার শরীর মন—দুই-ই এখন খুব হালকা মনে হচ্ছে। তিনি উঠলেন না। যেমন বসে ছিলেন—তেমনি রইলেন। তাঁর বুকের কাছে হুজুরের দু'খানি পা।

॥ আটচল্লিশ ॥

কাফিপুরায় মিঞা মীরের আস্তানা থেকে শাহজাদা দারা যখন বেরুচ্ছেন তখন মীরসাহেব তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। হিন্দুস্থানের তাবত তাগদ একদিন এই তাজা ইনসানের দু'হাতে বর্তাবে। সেই একদিন এই নওজওয়ানই হয়তো হবে হিন্দুস্থানের বাদশা। মিঞা মীর জানেন, তাগদের একটা ওজন আছে। সেই ওজনের চাপে নওজওয়ানি একদিন উবে যায়। উবে যাবে সুকুমার সুন্দর এই ভাবটি। তার বদলে ওখানে বাসা বাঁধবে উদ্বেগ, প্রতাপের উল্লাস।

—এই নাও শাহজাদা। এটা তোমার গায়ে রাখো। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—

দারা অবাক হয়ে তাঁর হুজুরের মুখে তাকালেন। কবেই আশি ছাড়িয়ে যাওয়া এই মানুষটি কী সুন্দর, সরল, সিধে। চোখ দুটি তাজা। সাদা দাড়ির ফাঁক দিয়ে বুকের ওপর জপের মালাটি জেগে আছে। এমন মানুষের চোখ আর মুখ একই সঙ্গে হাসে। খলিফা উমরের বংশধর মীর সাহেবের জন্ম শিস্তানে। পঁচিশ বছর বয়সে লাহোরে এসে আস্তানা গেড়েছেন—তাও তো হয়ে গেল প্রায় যাট বছর। দারা মিঞা মীরের দেওয়া পশমের কমলা রংয়ের উড়ুনি দিয়ে ভালো করে গলা, বুক ঢাকলেন। এমন হিমেল নির্জন রাতে তিনি কখনো একা পায়ে হেঁটে কোথাও যাননি।

—আল্লাতালার কাছে যাওয়ার পথ অনেক শাহজাদা। তার ভেতর থেকে যে কোনো একটি রাস্তা বেছে নিতে হয়।

শাহজাদার নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হলো। তিনি আজ সত্যি সত্যিই মিঞা মীরের মুরিদ। মিঞা মীর তাঁর হুজুর। অনেকদিন আগে বেশ অল্প বয়সে—শাহজাদার মনে পড়লো—একদিন রাতে আসমান থেকে ভেসে এসেছিল এই কথা ক'টি—আল্লা তোমায় যা দিয়েছেন, দুনিয়ার কোনো বাদশাকেও তিনি তা দেননি। হুজুরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুরিদ দারার বারবার মনে হলো—দুনিয়ার কোনো বাদশাকেও তিনি তা দেননি। নয়তো মিঞা মীর এত সহজে আমাকে তাঁর নিজের করে নেন কী করে?

হুজুর আবার মুখ খুললেন। আল্লাতালার কাছে যাবার রাস্তা ভালোবাসার রাস্তা। করুণার রাস্তা। তিনি আমাদের শাস্তি দিতে বসে নেই। তিনি আমাদের ভালোবাসতেই এসেছেন দারা—

শীতের রাতের লাহোর যেন বরফের আস্ত একটি চাঙ। পথে-ঘাটে কোনো লোক নেই। শাহজাদা দারাশুকো তাঁর জীবনে কখনো এমন রাস্তা দিয়ে এমন সময়ে একা একা হাঁটেননি। হিন্দুস্থানের শাহজাদা মানে—আগে পেছনে এক রিসালা ঘোড়সওয়ারের পাহারা। শাহজাদা ঘোড়া বা হাতি কিংবা জুড়িগাড়ি নয়তো সুখদোলা—যাতেই থাকুন—সওয়াররা এমনভাবেই এগোবে যাতে কিনা দূর থেকে ছোঁড়া ঘাতকের বিষ-তীরও শাহজাদার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আর এখন যেভাবে শাহজাদা আম আতরাফ মানুষের মতোই কোনোরকম জানান না দিয়ে চলেছেন—তা যদি কখনো বাদশা শাহজাহানের কানে ওঠে তো সর্বনাশ। একজন শাহজাদার এমনভাবে বেরিয়ে পড়া—পথ ভাঙা—সবই

শাহী কেতার পক্ষে বে-তমিজি—বেমানান।

শাহজাদা দারার কিন্তু আনন্দই লাগছিল। এভাবে তিনি একা আসমানের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন, শীতে সারা লাহোর জবুথবু—তাঁর কিন্তু কোনো ঠাণ্ডাই লাগছে না। বরং আরাম লাগছে। আর বুক ভর্তি যেন কিসের আনন্দ। কথা বলে মুখ খুললেই তা ভেতর থেকে এসে গড়িয়ে পড়বে। এত আনন্দ কোথায় ছিল আমার? জানতাম না তো।

লাহোর দুর্গ শহরের বসতি এলাকা থেকে একপাশে আলাদা মতন। খিলজি আমলে এ-দুর্গের শুরুয়াত। সিঁড়িগুলো আগ্রা দুর্গের মতো নয়। ভীষণ ঘুপচি মতো। শাহজাদা খুশি মনে ওপরে উঠছিলেন। সামনে তাকিয়ে দেখেন—সিঁড়ির মাথায় বাতিদান হাতে নাদিরা বেগম।

দারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আলো হাতে তুমি? আর কেউ নেই?

নাদিরা বেগম লজ্জার মাথা খেয়ে বললেন, আপনি ফিরছেন না দেখে—

শাহজাদা কয়েক লাফে সব ক'টা ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠে এলেন। এভাবে যখন তখন যেখানে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে না নাদিরা! যদি পড়ে যাও এই সময়।

—এখনো তো দেরি আছে। আপনি আমার জন্যে খুব চিন্তা করেন—তাই না?

—কোথায় দেরি? আর মাস দুয়েক পরেই তো।—বলতে বলতে শাহজাদা দারা তাঁর বেগমের পিঠে হাত রাখলেন। নাদিরা হাঁটতে হাঁটতে শাহাজাদা মহলে চললেন। পাশে পাশে শাহজাদা। লাহোর দুর্গের এই দারামহল থেকে লাহোরের অনেকটাই দেখা যায়। দেখা যায় বসতি এলাকার মাথা, ওপরকার আসমান। সেখানে হিম মাখানো একফালি চাঁদ। সেদিকে তাকিয়ে নাদিরা বেগম বললেন, শাহজাদা! আমার কেবলই মনে হয়—আমি অনেকদূরে চলে যাবো—

—ওসব কথা বলে না নাদিরা। তুমি মা হতে চলেছো—

—সেবারেও তো হয়েছিলাম। কথা বলতে শেখার আগেই মেয়েটা চলে গেল—।

শাহজাদা এবার কোনো কথা বলতে পারলেন না। নাদিরাও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। শেষে বললেন, এবার মা হতে গিয়ে যদি আমিই চলে যাই—

—ওসব কথা কোত্থেকে আসে! জানো নাদিরা—আজ আমি সুলতান-উল-আযকর-এ ডুবে ছিলাম—। চারদিক কী নির্জন। সেই নির্জন যেন কথা বলে উঠলো নাদিরা!

—সারাদিনই তো ফকির-দরবেশ করে বেড়াচ্ছেন!

—ইনি সাধারণ ফকির নন। ফকির-ই-আজম বলতে পারো।

—মিঞা মীর সাহেবের আস্তানায় যাওয়া হয়েছিল নিশ্চয়।

—হ্যাঁ নাদিরা। এমন সুফী সাধকের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না। তিনি আমায় ছুঁয়ে দিলেন! সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা মনে হলো এখুনি আনন্দে

ফেটে যাবে। আমি ধরে রাখতে পারছি না।

নাদিরা বেগম তাঁর স্বামীর মুখে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হচ্ছিলেন। এ তো সেই শাহজাদা নয়। তিনি আবারও ভালো করে তাকালেন। শাহজাদার গায়ে মামুলি নাদিরি জামা। তাতে একটিও চুনি বসানো নেই। গলায় একটি মামুলি উড়ুনি জড়ানো—কমলা রংয়ের—

—ওটা তো আপনার নয় শাহজাদা।

—ঠিক ধরেছো নাদিরা। এটা দেখতে খুব সাধারণ। মোটা পশমের খিরকা বলো খিরকা—উড়ুনি বলো উড়ুনি। কিন্তু আমার কাছে মামুলি তো নয়ই—বলতে পারো খুবই কিমতি—দামি—অসাধারণ। আমার হুজুর আমায় দিয়েছেন।

—হুজুর ?

—হ্যাঁ। আজ থেকে মিঞা মীর সাহেব আমার হুজুর। আমি তাঁর মুরিদ। তিনি নিজের হাতে ধরে আমায় মুসাহিদা শেখালেন নাদিরা।

নাদিরা বেগম ছুটে এসে শাহজাদা দারাশুকোকে জড়িয়ে ধরলেন।—আমার খুব ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে—আমার সরতাজ—

—কেন ? কিসের ভয় নাদিরা ? আজ আমার সারা মন আনন্দে ভরে আছে।

—আপনি শেষে না ফকির হয়ে যান শাহজাদা। এই এতবড় হিন্দুস্থানের এমন শাহী শান-সওকত ছেড়ে দিয়ে আপনি না শেষে খিরকা গায়ে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন—

শাহজাদা দারা কী ভাবলেন একবার। তারপর খোলা উদাস চোখে বললেন, শাহীর চেয়ে ফকিরি কম কিসের ?

—আমার সরতাজ! আমার কথা বাদ দিন। আমি ডুবো নৌকোয় বসে বেড়ে উঠেছি। ফকিরি-বাদশাহী দুই-ই আমার দেখা। কিন্তু বাদশা শাহজাহানের উষ্ণীষের সরবন্ধে আপনি শাহী চুনি। আপনি বাদশার হাতের আঙুলের দস্তবন্দের শাহী হীরে। আপনাকে নিয়ে তাঁর কত খোয়াব। কত আশা। আপনি ফকিরি বেছে নিলে তিনি তো পাগল হয়ে যাবেন।

—অতদূর একসঙ্গে ভেবো না নাদিরা। ফকিরি নিতে গেলেও ফকিরির যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। আমি নসিব নিয়ে এসেছি এ-দুনিয়ায়। নয়তো হুজুর কেন আমায় লাইলত-উল-কাদির দেখাবেন ? কেনই বা আমায় সুলতান-উল-আযকর শুনতে শিখিয়ে দেবেন ? খোদার কী করুণা। হুজুর আমাকে তাঁর নিজের করে নিয়েছেন।

—হজরত! আমার একটা আর্জি রাখবেন ?

—বলো।

—মা হতে গিয়ে আমি যদি আর না ফিরি—তাহলে আপনার হুজুরের কবরের পাশেই যেন আমায় মাটি দেওয়া হয়।

শাহজাদা কোনো কথা বললেন না। খুব আস্তে নাদিরার গায়ে এসে গা লাগালেন। আমি তোমায় ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবো না। আজ আমার

চোখ দিয়ে আনন্দে কেন জানি জল আসছে। কিসের আনন্দ তা আমি জানি না। নাদিরা। এমন সুখের ভেতর কী করে তোমায় হারাই ?

—আস্তে! ছাড়ুন। আমি যে পড়ে যাচ্ছিলাম—

—ওঃ।—বলে দারা সরে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকাই দু'হাতে নাদিরা বেগমকে কোলে তুলে নিলেন। নিয়ে গিয়ে সুখদোলায় শুইয়ে দিলেন। খোলা অলিন্দে এতক্ষণে কুয়াশা ছিঁড়ে বেরনো চাঁদের দেখা পাওয়া গেল। আসমানের ফিরে যাওয়া হলুদ ফালিটি এখন যেন কিছু স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়লো লাইলত-উল-কাদিরের রাতে পাহাড়-পর্বত. বন-জঙ্গল, মানুষজন, চিড়িয়া, সাপ, শের, হাতি—সবাই দুনিয়াদারকে তসলিম জানায়। নাদিরার মুখে ফিরে তাকালেন শাহজাদা। কখন নাদিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর শরীরটা। এইমাত্র জেগে ছিল। এই ঘুমিয়ে পড়লো।

শাহজাদা দারা তাঁর গলা থেকে হুজুরের দেওয়া কমলা রংয়ের পশমি উড়ুনিখানা খুলে পায়ের দিক থেকে কোমর অব্দি বিছিয়ে দিলেন। খেয়েছে কি নাদিরা ? দূরে দেখলেন—আবদারখানা থেকে পাঠানো সুরুয়া জুড়িয়ে জমাট কাই হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর নাদিরার নিজের হাতের কাজ ঢাকা দেওয়া। সূক্ষ্ম কারুকাজের সুতোলী খুঞ্চিপোশ। তার পাশেই সোনালি আঙুরের থোকায় থোকায় পাহাড়ী মৌমাছি।

অন্যদিন হলে শাহজাদা মৌমাছি ক'টাকে উড়িয়ে দিতেন। আজ তাদের কিছুই করলেন না। কী এক মধুর মায়ায় তাঁর মনে হলো—ওরাও তো আজ লাইলত-উল্-কাদিরে আল্লাতাল্লাকে তসলিম জানিয়েছিল। তবে কেন ওদের আঙুরের থোকা থেকে উড়িয়ে দিই !

শাহজাদার আজ কোনো খিদে নেই। শীত নেই। আলমগঞ্জ-গিয়াথপুর থেকে এতটা হেঁটে এসেও দারা কোনো রকম ক্লান্তিই টের পাচ্ছিলেন না। মনে হচ্ছিল—এতটা পথ এইমাত্র তিনি উড়ে এসেছেন। একবার মনে হলো শাহজাদার—কোথায় যেন অবিরাম গম্ভীর, মধুর স্বরে ঘণ্টা বেজে চলেছে। থামার কোনো চিহ্ন নেই। দারা তাঁর দু'হাতের পাতা দুই কানে আজকের শেখানো কায়দায় ধরলেন। অমনি সেই ঘণ্টাধ্বনি আরও গম্ভীর আরও মধুর হয়ে তাঁর কানে এসে আছড়ে পড়তে লাগলো।

শাহজাদা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। কান থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তিনিও পাশের সুখদোলায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। মাথায়, বুকে, কোমরে—শরীরের ভেতর কোথায় কী আছে জানা নেই—সব যেন আলগা হয়ে খুলে গেছে।

খানিকবাদে দারামহলের হাজিরা বাঁদিটি এসে দেখলো, শাহজাদা আর তাঁর বেগম—দু'জনই অঘোর ঘুমে। বাঁদির বয়স বেশি নয়। তার সব সময় দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। ডাকলে তবে কাছে এগিয়ে আসা। এসে তসলিম জানিয়ে হুকুম তামিল করা। বছর আঠারো উনিশের বাঁদিটি এই প্রথম ঘুমন্ত

শাহজাদা, শাহজাদা-বেগমকে দেখলো। চোখ ভরে। বেগমের পায়ের আঙুলের চুটকির ঝিলিক নখে এসে পড়েছে। ঘুমন্ত চোখের কোণে বুঝি জল। এগিয়ে গিয়ে মুছে দেবার সাহস হলো না। সে দূরে থেকেই শাহজাদাকে দেখার সাধ মেটালো। গায়ের নাদিরি জামা বা কুর্তা কোনোটাই খোলা হয়নি। বড় বড় দুই চোখ বুজে আছে। ঠোঁটে মুছে আসা হাসি। শাহজাদা কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনো সুনহরি খোয়াব দেখছেন?

আর দাঁড়ালো না বাঁদি। অলিন্দের ভারি চিলমন টেনে অনেকটা নামিয়ে দিলো। ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস ঢুকে পড়ছিল এতক্ষণ। বাঁদিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় নিজের মনে মনেই বললো, খোদা! বেগমসাহেবা যেন ভালোয় ভালোয় মা হন।

ঠিক এই সময় সারা হিন্দুস্থানের মাঠে মাঠে ধানের দানা শক্ত হয়ে এসেছে। নদীর জলে শুশুকেরা এখন ভুস করে ভেসে ওঠা কমিয়ে দেবে। গাঁয়ে গাঁয়ে ক্রোরি, তসিলদাররা রে রে করে বেরিয়ে পড়লো বলে। খরচ-ই-দে মানবার মতো খাজনা আদায়ের জুলুমি-কর আকবর বাদশার আমলে বাতিল হয়ে গেলেও গাঁ-গঞ্জের দেহাতি মানুষজন তো রাজধানী আগ্রার ফরমানের খোঁজখবর রাখে না। ক্রোরি, তসিলদার, কানুনগোরা তাই নিজেদের ফুর্তি আহ্লাদের খরচ-খরচা তুলতে যুগ যুগ ধরে, খরচ-ই-দে-র মতো বাতিল আইনেই দাম-দামড়ি আধেলা পওয়া দিব্যি আদায় করে চলেছে।

দিল্লির গায়ে শাহজাহানবাদে লালকেল্লা আসমানের নিচে একটু একটু করে মাথা তুলে উঠেছে। নতুন যা খবর—লালকেল্লার সামান বুরুজ তৈরি করতে গিয়ে ইজ্জত খাঁ আর আলিবর্দি খাঁয়ে এমনই ঝগড়াঝাটি হয়েছে যে, আলিবর্দি খাঁ গোঁসা করে গিয়ে দিল্লিতে গানেওওয়ালিদের মহল্লায় পাকাপাকি বাসা বেঁধেছেন। কাজ যাতে থেমে না থাকে তাই আগ্রার দেওয়ানখানার হুকুমে আগ্রা দুর্গের এক কালের সামান বুরুজ বানানেওয়ালা বুড়ো নসরত খাঁকে শাহজাহানাবাদে যেতে হয়েছে।

তাজমহল মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঠেছে এখন। সেখানে ঝগড়া কাজিয়ার সুযোগ নেই। বানানেওয়ালা একজনই। নকশা ফেলে দেওয়া হয়েছে। উস্তাদ ঈশা সেইমত এগিয়ে চলেছেন। তবে খিলানের একরকমের পাথর আসা বন্ধ আছে কিছুদিন। বিশ হাজার কারিগর তাম্বু গেড়ে থেকে দিনরাত কাজ করে চলেছে। তারা জানে না—কেন এই পাথর আসা বন্ধ। ব্যাপারটা জানেন উস্তাদ ইশা। গুর্জরের জাহাজি গফুরের জাহাজেই দরিয়া চষে এই পাথর এসে নামে সুরাটে। সেখান থেকে টানা গো-গাড়ির মিছিল সে-পাথর এনে ফেলে এখানে যমুনার তীরে। ক'মাস হলো গফুরের এন্তেকাল হয়েছে। তার বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ওয়ারিশানদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় ব্যাপারটা আগ্রার দেওয়ানখানা অব্দি গড়িয়েছে। তাই পাথর বয়ে আনার কয়েকটি জাহাজ বসে গেছে। শেষ অব্দি খোদ বাদশার কানেই সব তুলতে

হবে। হাতির পিঠে বসে উস্তাদ ইশা ছাই ছাই জ্যোৎস্নার ভেতর যমুনার চর জায়গার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তিনি মনে মনে ওই কথা স্থির করলেন। উস্তাদ ইশার কথা হলো, আমি তুর্কি। হিন্দুস্থানে এসেছি দুটো আশরফি মোহরের লালচে। সময়মত কাজ তুলে দিতে না পারলে বে-ইজ্জতি, চুক্তি খেলাপ—পরিণামে লোকসান। তার চেয়ে সরাসরি বাদশাকেই সব জানাবো। হাজার হোক তাঁরই বেগমের সমাধি মহল। চালাকি নয়!

খান, শুশুক, তসিলদার, লালকেল্লা, উস্তাদ, ইশা, গফুর, আসমান, যমুনার চর—সবকিছু থেকে আলাদা—একদম অন্য সুর—অন্য দুনিয়ায় শীতের চকচকে রোদে একজন নওজওয়ান একটা বাঁশ ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

এ জায়গায় দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানকে টের পাওয়া যায় না। চারদিকে বিশাল বিশাল গাছ, কাঁটালতা, রাস্তা বলতে লতাপাতার ভেতর শুঁড়ি পথ। রোদ একটু বাড়তে সবুজ গাছপালার ভেতর বোঝা গেল এই নওজওয়ান কতখানি সফেদ। আলো পেয়ে তিনি যেন জ্বলে উঠেছেন। কালো চুল, ঘন কালো জোড়া ভ্রূ, কিন্তু তেমন তাগড়া নয়।

গোয়ালিয়রের বাঁ পাশে জঙ্গল আর পাহাড়ে ভরা এই জায়গাই বুন্দেলখণ্ড। নওজওয়ান দেখলেন দক্ষিণে কাইমুর পাহাড়ের দিক থেকে একদল ঘোড়সওয়ার জঙ্গল, আগাছা ভেঙে এগিয়ে আসছে। এদের এগিয়ে আসার পথে মাঝে মাঝেই টিলা। সেগুলো বিশেষ উঁচু নয়।

ঘোড়সওয়াররা এসে খানিক দূরে রাশ টেনে থামলো। তারপর তারা ঘোড়া থেকে নেমে নওজওয়ানকে দূর থেকে কুর্নিশ করে জানালো, না। কাউকে পাওয়া যায়নি।

মোট জনা ষোলো ঘোড়সওয়ার। তাদের সবার মুখে আলাদা আলাদা করে তাকালেন নওজওয়ান। তাঁর পেছনে দূরে শাহী লাল তাম্বুর মাথায় সূর্য আঁকা চাঘতাই পতাকা শীত সকালের বাতাসে পত পত করে উড়ছে।

নওজওয়ান জানতে চাইলেন, একজনকেও না? একজন বুনোকেও পাওয়া যায়নি?

—না শাহজাদা। একজনকেও আমরা পাইনি।

নওজওয়ান আফসোসের গলায় বললেন, ইস! দু'দিন আগেও যদি আমরা এসে হামলা চালাতে পারতাম! তাহলে ঝুঝর সিংকে গোয়ালিয়রের গারদে নিয়ে গিয়ে জিন্দা পোরা যেতো—

ঘোড়সওয়াররা দেখলো, শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর আফসোসে তাঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলো পেছনে পাঠিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে টানছেন। তিনি এখন পেছন ফিরে তাঁর নিজের লাল তাম্বুর মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর এই ষোলো বছরের জীবনে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের এটাই পহেলা লড়াই। তিনি

বেতোয়া নদী পেরিয়ে বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা ঝুঝর সিংকে তাড়া করে কোণঠাসা করে এনেছিলেন। পালাতে পালাতে ঝুঝর সিং এই এলাকায় এসে পড়েছিল। এখানটায় জঙ্গলের বুনোরা থাকতো।

শাহজাদা নিজের হাতে ঝুঝর সিংকে কোতল বা জিন্দা কয়েদ করতে না পেরে নিজের হাতের আঙুল মটকেই চলেছেন। আফসোস! আফসোস! দূরে বাঁশ ঝাড়ের কাছে অগুনতি ঘোড়া পড়ে আছে। কোনোটার পা নেই। কোনোটার বুকের পাঁজর হা হা করছে। তার পাশেই এখানে ওখানে রাজপুত সেপাইদের মুন্দত ছড়িয়ে আছে।

একজন রিসালাদার শাহজাদার কাছে এসে জানালো, হুজরত! মোট ১১৭০।

আওরঙ্গজেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বলে উঠলেন, কী?

—১১৭০ টা ঘোড়ার লাশ গুনতি করে পাওয়া গেছে।

—আর সেপাই?

—গুনতি চলছে শাহজাদা। তা তিনশো ছাড়িয়ে যাবে। আসলে বুনোরা বুঝতেই পারেনি—বুন্দেলা ঝুঝর সিং বাঁশঝাড়ের ওখানটাতেই বারুদ গুদাম করেছে—

শাহজাদা কিছু বললেন না। তিনি মনে মনে ছবিটা সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। তাড়া খেয়ে ঝুঝর সিং এই গভীর জঙ্গলে এসে ঘাঁটি গাড়ে। সঙ্গে শ'তিনেকের মতো বিশ্বাসী রাজপুত। আর সব মিলিয়ে প্রায় বারোশো ঘোড়া। কয়েকটা হাত-কামানও ছিল। নয়তো অত বারুদ জমা করবে কেন?

এখানকার বুনোরা জানেও না—কে ঝুঝর সিং! কেই বা শাহজাদা আওরঙ্গজেব! খাবারদাবার আর ঘোড়াগুলো কেড়ে নেবার লোভে তারা ঝুঝর সিংকে তাড়াতে চায়। তাড়াবার জন্যে ভয় দেখানো দরকার। তার সহজ রাস্তা শুকনো বাঁশ ঝাড়ে আগুন লাগানো আর তাতেই এই কাণ্ড!

শাহজাদার আন্দাজ বুনোদের দু'চারটে লাশও পাওয়া যাবে। অমন বিরাট বিস্ফোরণে দু'চারটে বুনো কি মারা যায়নি? বাকিরা সবাই এই কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে কাইমুর পাহাড়ে গিয়ে সেঁধিয়ে আছে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর এবার নিজেই উড়ে যাওয়া বাঁশ ঝাড়ের দিকে এগোতে লাগলেন। ঘোড়া এক বিশাল জানোয়ার। বারুদ ঘরে আগুন লাগলে অমন বিরাট জানোয়ারও শামা পোকার মতো দপ করে জ্বলে যায়—উড়ে যায়। কার দুশমন কে কোতল করে! বারুদ? না, বুনোরা?

ভোরের ঝকঝকে রোদে ঘোড়ার ছড়িয়ে থাকা চার পেয়ে সব লাশের ভেতর ঝুঝর সিং বুন্দেলার রাজপুত সেপাইদের গুনতি করাই কঠিন। শাহজাদার মনে পড়লো, এই বুন্দেলারাই আব্বা হুজুর, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার দোস্ত ছিল।

শীতের বেলা যতই বাড়ছিল—ততই গহীন জঙ্গলের ভেতর জায়গায় জায়গায় চকমকে রোদ ঢুকে পড়ছিল।' শীতের দুপুরে জায়গাটা এখন

আরামের। শাহজাদা আওরঙ্গজেব তাঁর লাল শাহী তাম্বু থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল উঁচু উঁচু গাছের পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু ঘোড়াই অস্থির হয়ে উঠলো। কোথাও পা রেখে দাঁড়াতে পারে না স্বস্তিতে। মাছি জায়গা বদলে বদলে বসছে। দাবনায়, ছাটুতে, নাকের নরম কালোতে। অস্থির হয়ে ঘোড়া পা বদলাচ্ছে। আওরঙ্গজেব ওপরে তাকিয়ে দেখলেন গাছের মাথা অনেক উঁচুতে। গাছগুলো তাঁরই মতো সিধে দাঁড়ানো। ওরা বুন্দেলখণ্ড জঙ্গলের শাহজাদা। আমি আগ্রাই রিয়াসতের শাহজাদা। আমার আগে শাহজাদাদের ভেতর না দারা—না সুজা—কেউই কোনো লড়াই করেনি—কেউই ঝুঝর সিংয়ের মতো জবরদস্ত কোনো দুশমনকে হারিয়ে দিতে পারেনি।

কাঁটালতার ঝোপের ভেতর সব সময় সরসর আওয়াজ। বেলদার মজুরের দল জঙ্গল কেটে সাফ করতে ওস্তাদ। ওরা চেঁছে কেটে—জায়গাটা অনেক সহজ করে দিয়েছে। শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর খোলা চোখেই যেন আগ্রা দুর্গের সেই ছবি আগাম দেখতে পেলেন।

দেওয়ান-ই-খাসে আমির ওমরাহরা সার দিয়ে বসে। তাঁদের মাঝখান দিয়ে এক তরুণ চলেছেন মসনদের দিকে। কুর্নিশ জানাবেন বাদশাকে। দু'ধারে বসে থাকা মনসবদার, জায়গিরদারের চোখে এই তরুণকে দেখে একই সঙ্গে সাবাসি আর ঈর্ষা ফুটে উঠলো। সেই তরুণ আর কেউ নয়—সে আমি—সে আমি!

একা একাই ঝুঝর-দমন আওরঙ্গজেব বাহাদুর হেসে উঠলেন। এখানে হাসি লুকোবার দরকার নেই। কারণ, সামনে পেছনে তেমন কেউ নেই এখানে। এমন সময় মাথার ওপরের গাছ থেকে পাঁচ ছ'টা শকুন একসঙ্গে ঝুপ করে মাটিতে পড়লো। পড়েই তারা দু'পাশে লম্বা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে বারুদে উড়ে-যাওয়া বাঁশ ঝাড়ের দিকে টলে টলে ছুটে গেল।

একটু আগে জয়ের খোয়াবে মশগুল মুখখানি জ্বলে উঠেছিল। এখন তা নিভে গেল একদম। জয় মানে এই! দখল মানে এই? হয় খতম করো। নয়তো তাড়িয়ে বেড়াও—যতক্ষণ না দম ফুরিয়ে তোমার কাছে হেরে যায়। জয়ে হাসি, আনন্দ, বকশিশ, খেতাব, খেলাত। হারে বে-ইজ্জতি, মওত, মুছে যাওয়া।

কাঁচা উমরের শাহজাদা ঘোড়ার পিঠে রাতের অন্ধকারের মাঠ পেরতে পারেন। এই সেদিনও আগ্রার কাছে সাকেতের ফৌজি ছাউনিতে নিজের মনসবির সেপাইদের নিয়ে মহড়ার সময় আওরঙ্গজেব বাহাদুর অবলীলায় লড়াই হামলায় ঘোড়সওয়ারি হারবল ভেঙে দিয়েছেন। ফিকা পর্দার ওপর আচমকা চড়াও হয়ে। সেই শাহজাদা শকুনদের অমন করে ইনসান আর ঘোড়ার মুন্ডত নিয়ে টানাছেঁড়া করতে দেখতে পারছিলেন না। চেঁচিয়ে উঠলেন, জলদি শেষ করো—জলদি—

বেলদারের দল বেলচা হাতে জলদিই কাজ করছিল। বিশাল বিশাল খানা কেটে সেই সব গর্তে ঘোড়া আর মড়া ভরে মাটি চাপাই চলছিল। শাহজাদা দেখতে পেলেন, বেলদারদের তাড়া খেয়ে গোটা কয়েক শকুন নাচতে নাচতে পিছিয়ে এলো। খানিকবাদে তারাই আবার নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল। এসব

দেখে আওরঙ্গজেব বাহাদুর শিউরে উঠলেন। জয়ের পরিণাম শেষে একপাল শকুন? ওরা বোধহয় দূরে ওই কাইমুর পাহাড়ের গর্তে থাকে।

বেলদাররা যেখানে মাটি খুঁড়েছিল—সেখান থেকে একটা শোরগোল উঠলো। বেতোয়া নদী কাছাকাছি হলে এতগুলো মড়া স্তূপ দিয়ে একসঙ্গে আগুনে দিয়ে দেওয়া যেতো। সবই রাজপুত হিন্দুর মড়া। নদী থাকলে কোনো অসুবিধা থাকে না। পোড়ানোর পর বাকি যা-কিছু সবই নদীর জলে স্বচ্ছন্দে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। এখানে সে সুবিধে নেই বলেই মাটি চাপাই। এরা সব গহরওয়ারি রাজপুত। ঝুঝর-সিংয়ের সবচেয়ে বিশ্বাসী—সবচেয়ে তেজী সেপাইয়ের দল। এখন স্রেফ গর্ত বোঝাইয়ের মড়া।

বেলদার সর্দার এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। হজরত! একটা সিন্দুক পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে।

—হুঁশিয়ার হয়ে ওপরে তোলা চাই।

সন্ধেবেলা শাহী লাল তাঁবুতে সেই সিন্দুক খোলা হলো। কোনো সাবেক সিন্দুক নয়। পুরনো কোনো খাজানাও নয়। সুখদোলায় বসে আওরঙ্গজেব বাহাদুর সব দেখছিলেন। বাঁশঝাড়ের নিচে বারুদ গুদাম করার সময় ঝুঝর সিং বুন্দেলা রিয়াসতের গয়নাগাঁটি, হীরে জহরত মজুত তনখারের সঙ্গে সিন্দুকে ভরে অতি সাবধানে মাটির নিচে জমা করেছিল।

মনসবির ঘোড়সওয়ার দলের দুই বুড়ো রিসালাদার মাথা পিছু দু'জন খাজাঞ্চি নিয়ে অভ্রের চড়া আলোয় তনখা গুনতি করে থেরিয়া ভর্তি করছিল। শাহজাদা দোলায় দুলতে দুলতে নিজের মনের ভেতর দুটো জায়গা বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছিলেন। চোখ ছিল গোনাগুনতিতে। মন ছিল মনের ভেতরে। সুখদোলা যেন শাহজাদারই মনের ভেতর দুলতে দুলতে একবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল—জয় নামে একটি রুপোলি ঝকঝকে মুকুটকে—আবার সেই দোলাই পিছিয়ে গেল বিশাল এক অন্ধকারে কয়েক পলক হারিয়ে যাচ্ছিল। শাহজাদা জানেন—ওই অন্ধকারই পরাজয়।

বসন্তের মুখে আগ্রার বাজার সন্ধে সন্ধে ফুলে ফুলে ছয়লাপ হয়ে যায়। এখন জামাদা সুরেম মাস শেষ হয় হয়। ক'দিন আগেও রাজধানীর যোগীপুরা মহল্লায় বাণফোঁড়া সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোর ভোর ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো।

আজ সকাল থেকেই আগ্রা দুর্গে যাবার হাতিপোল দরওয়াজার দিককার শাহী সড়কে কড়া পাহারা। দুর্গের ভেতরকার হপ্তচৌকি বেরিয়ে এসে সেপাই সান্ত্রী সমেত শাহী সড়কে থানা গেড়েছে। ও-পথ দিয়ে একটি মাছিরও গলে যাবার কোনো সুযোগ নেই। ওদিক দিয়ে দুর্গের যারা কাজের মানুষ ভেতরে যাচ্ছে—তাদের দোবারা তল্লাসির মুখে পড়তে হচ্ছে।

যমুনার দক্ষিণে ঢলে পড়া সূর্যের পড়ন্ত আলোয় তাজমহলের থলচোটিয়ালি সব পাথর ঘষাই হয়ে দিব্যি গড়ান খেয়ে কাঠের পাটাতন ধরে ওপরে জায়গামত গিয়ে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে। উস্তাদ ইশার টান বেশি তাঁর দেশোয়ালি তুর্কি কারিগরদের দিকে। টানা শীতের পর নতুন গরমের দিনে সূর্য যখন তাজমহলের

মিনার গড়ে তোলার জায়গা বরাবর চড়া রোদ পাঠায়—ঠিক তখনই উস্তাদ ইশা তাঁর দেশোয়ালি কারিগরদের মিনারের যে-পিঠে গাঢ় ছায়া সেখানে বদলি করে দেন রোজ।

আজও উস্তাদ ইশা তাঁর দেশোয়ালি ভাইদের ছায়ায় পাঠিয়ে চড়া রোদের ভেতর মীর্জাপুরি অগ্নিপালদের এনে ফেলার তোড়জোড় করতেই তারা তো খেপে গেল। অগ্নিপালদের কথা একটাই। মিনারের পাথরের কাজে মজুরি বেশি। উস্তাদের দেশোয়ালিরা মজুরি বেশি পাবে—আবার চড়া রোদের সময় ছায়াও পাবে—দুটো একসঙ্গে হয় না। যে কোনো একটা ছাড়তে হবে ওদের।

কয়েক বছর হয়ে গেল তাজমহল একটু একটু করে তার মাথা দেখাতে শুরু করেছে সবে। বিশ হাজার মানুষ দিনরাত পালা করে খেটে পাথরের এই সাদা গোলাপ ফুটিয়ে তুলছে। হিন্দুস্থানের মন-মেজাজ এখন সব বোঝেন উস্তাদ। মির্জাপুরের এই অগ্নিপালরা এমনিতে খুব বাধ্য তাঁর। কিন্তু খেপলে এরাই ষাঁড়। এদের ওষুধ জানেন তিনি।

হিন্দুস্থানের নানান জায়গার কারিগর তো বটেই—এশিয়ার নানা দেশ থেকেও অনেক কারিগরকে আনতে হয়েছে। এক এক দেশের ঘরানা অনুযায়ী কাজ হলেও—সব কাজকেই উস্তাদ ইশা মীর আবদুল করিমের মূল নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

কারিগরদের এইসব বিরাট দল যদি রোজ যমুনার ওপারে আগ্রা থেকে কাজের জায়গায় যাতায়াত করতো তাহলে সময় অনেকটাই চলে যেতো। তাই এপারেই কাজের জায়গার আশপাশে এক এক জায়গায় কারিগরদের এক একটি বসতি—এই ক'বছরে প্রায় পাকা চেহারা পেয়ে বসে আছে। উস্তাদ জানেন—তাজমহলের চেহারা পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে ওসব কাঁচা ঘর-বাড়ি—তাঁবু একদিন ভেঙে তুলে দিতে হবে। সে-কাজ অবশ্য উস্তাদ ইশাকে দেখতে হবে না। তবে তাঁরই পরামর্শে কারিগরদের এখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। ওদের ঘর-বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে তখন। ততদিনে তাজমহল জ্যোৎস্নারাতে হেসে উঠবে।

নিজের নিজের ঘরবাড়ি থেকে দূরে হাজার বিশেক মানুষের বসতি এলাকায় শান্তি রাখতে ফৌজি তাঁবুও পড়েছে । কোতোয়ালিও হয়েছে।

অগ্নিপালদের হইচই—বাগীপনা বাড়তেই উস্তাদ ইশা হাত তুলে কোতোয়ালির দিকে তাকালেন। বলা নেই, কওয়া নেই—যমুনার জলে সবে ঢলে পড়া সূর্যের লালী—ফৌজি তাঁবুর আশপাশ থেকে জনা কুড়ি উজবেক ঘোড়সওয়ার দৌগুণি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে অগ্নিপালদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চড়া রোদ—তার ওপর পাশ টেনে টেনে কাজ করানো। উজবেক ঘোড়সওয়াররা কোড়া মারতে শুরু করতেই অগ্নিপালরাও মাকরানা মর্মরের টুকরো তুলে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে শুরু করলো।

উস্তাদ এতটা ভাবেননি। সারা তাজমহলের কাজ বন্ধ হয়ে যায় যায়—এমন সময় তিনি নিজেই উজবেক ঘোড়সওয়ারদের সামনে গিয়ে লাফিয়ে

পড়লেন। —ভেবেছো কী তোমরা ? থামো। থামো বলছি—

উজবেকরা ঘাবড়ে গেল। এ কেমন খারা লোক ? ডেকে এনে হাত গোটাতে বলে! উস্তাদও জানেন—এই উজবেকরা হুকুম বোঝে—তামিলও করে তা খুব মন দিয়ে—কিন্তু এ যে ভালো করতে গিয়ে খারাপ করে বসলো। ওদের হাত পা চলে। মাথাটি চলে না।

আজকের মতো তিনি তাঁর দেশোয়ালিদের ফের চড়া রোদেই নিয়ে এলেন। না এনে উপায় নেই উস্তাদের। কয়েক ঘড়ির জন্যে হলেও তাঁকে আজ সন্ধে সন্ধে একবার আগ্রা যেতে হবে। তিনি রাজধানীতে দেওয়ান-ই-খাসে হাজির থাকলেও তাজমহল তো থেমে থাকতে পারে না। সেখানে গেলে শাহী রিয়াসতের সবাই জানতে চাইবেন—তাজ কত দূর ? যেমন কিনা সেলাম আলাইকুম!—বলেই সবাই একথা সেকথার পর বলে বসে—লাল কিল্লার চাঁদোয়ায় এখন কিসের কাজ চলছে ?

সন্ধে সন্ধে আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-খাস হিন্দুস্থানের তাবড় তাবড় মানুষের মাথায় ভরে গেল। আজ বুন্দেলার ঝুঝর সিং-দমন শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরের বাহাদুরির সাবাসি জানানো হবে সেখানে। সেই সুবাদে রাজধানীর কোনো চকেই আর একটিও ফুল নেই। দেওয়ান-ই-খাসে দাওয়াত পাওয়া বড় মানুষরা সবাই সেসব ফুল আজ চড়া দামে কিনে নিয়েছেন।

সূর্য ডোবার খানিক আগেই দেওয়ান-ই-খাস আলোয় ঝলমল করে উঠলো। শাহী মিলাদ শরিফ বা মজলিশে যেমনটি হয়ে থাকে—তেমনি আজও সন্ধ্যায় দেওয়ান-ই-খাসে সুখ, আরাম, ক্ষমতা, স্বাদু খাবার আর অঢেল বিশ্রাম পাওয়া সুন্দর, বিরাট, বেঢপ দেখতে সব মানুষে ভরে গেল।

বাদশা শাহজাহান তখতে এসে বসতেই মানীগুণীরা তাঁদের পোশাক, গলার মালা, কানের দুলের চুনিতে ঝিলিক তুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাদশা তাঁদের বসতে বললে সবাই যে যার আসন নিলেন। অমনি উস্তাদ লাল খাঁয়ের দুই ছেলে খুশহাল আর বিশ্রাম খাঁ সন্ধ্যার এক রাগিণী গলায় তুলে আনলেন।

মুঘল শাহীর তিসরি শাহজাদাকে সাবাসি জানাতে খোদ বাদশা আজ এই মজলিস ডেকেছেন। রাজধানী আগ্রার নাকের ডগায় বসে বুন্দেলা ঝুঝর সিং বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছিল।

দুই ভাইয়ের গান থামতে আঙুরিবাগের দিক থেকে শাহজাদা এসে ঢুকলেন। বাদশাকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই আওরঙ্গজেবের মনসবির দুই বুড়ো রিসালাদারদের একজন বিরাট এক রুপোর থালায় বুন্দেলখণ্ড অভিযানে পাওয়া বুন্দেলা পরিবারের হীরে জহরতের স্তূপ বাদশার মবারকে তুলে ধরলো।

বাদশা হাসিমুখে নিজের ছেলের মুখে তাকালেন। তাকিয়ে অবাক হলেন। সে মুখে কোনো ভাবলেশ নেই। এ মুখ দারার নয়। এ-মুখ সুজার নয়। তা তিনি জানেন। একটি মোহর হাতে নিয়ে তা তিনি থালার ওপরেই উল্টে

রাখলেন। তখন তখনই শাহী তেপনচি এসে রিসালাদারের হাত থেকে থালাখানি সরিয়ে নিলো। সব চলে যাবে খাজানাখানায়।

বাদশা শাহজাহান ছেলের মুখে তাকিয়ে তাঁর মনের কোনো তল পেলেন না। এই ছেলের জন্যে তাঁর গর্ব হচ্ছে। আবার ছেলেকে ঠিকমত বুঝতে না পেরে তাঁর অস্বস্তিও হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তখত থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে হেঁটে চলে এলেন।

—তুমি আবারও বাহাদুরি দেখালে—

আওরঙ্গজেবের চোখে কোনো পলক পড়লো না। তিনি বাদশার চোখে যেমন তাকিয়ে ছিলেন—তেমনই তাকিয়ে রইলেন। শাহজাহান আশা করেছিলেন শাহজাদা কিছু বলবেন।

আওরঙ্গজেব কিছুই বললেন না। বুন্দেলখণ্ড লড়াইয়ে জয়ী শাহজাদা যেন আরও রোগা হয়ে ফিরে এসেছেন। চোখের চাহনি আগের চেয়ে এখন যেন আরও তীব্র। সফেদ মুখে কালো, জোড়া ভ্রূ সবার আগে চোখে পড়ে।

—বুন্দেলা শায়েস্তা করেই তুমি থামোনি—দুশমনের ওপর হামলা করে শাহী খাজনাখানার জন্যে কোটি তন্‌খাও নিয়ে এসেছো—

বলতে বলতে সারা দেওয়ান-ই-খাসে শাহজাহান চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমির-ওমরাহ-মনসবদারদের জমায়েত থেকে সাবাসির একটা আওয়াজ ফুটে উঠলো। ওঃ!—

এবার ছেলের মুখে তাকালেন বাদশা। না, শাহজাদা এবারও নির্বিকার। চোখের পলকও পড়লো না আওরঙ্গজেবের। বাদশার মনে হলো, আমার এ ছেলে কী দিয়ে তৈরি? হিন্দুস্থানের বাদশার মুখ থেকে দেওয়ান-ই-খাসে সাবাসি পেয়েও চোখের পাতা নড়ে না! ওর কি কোনো গোলমাল আছে? আমার ফারসি কি শাহজাদা বুঝতে পারছে না। তা তো হবার কথা নয়। রুমির ফারসি দিওয়ান তো একসময় আওড়াতো আওরঙ্গজেব।

বাদশা এবার ঘোষণার মতো লম্বা টানের গলায় বললেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর—

শাহজাদা মুখ খুললেন, আলা হজরত! হুকুম করুন—

—কোনো হুকুম নয় শাহজাদা। সারা হিন্দুস্থানের তারিফ তোমার পাওনা। এই কাঁচা উমরে—নওজওয়ান-বয়সে তুমি যা করেছো—

—আব্বা হুজুর! বন্দেগান! আপনার হুকুমই আমাকে তাগদ যুগিয়েছে।

—বুন্দেলখণ্ডে তোমার জয়ের ইয়াদগারির জন্যে আজ থেকে কিরকির নাম হলো—তোমারই নামে—ঔরঙ্গাবাদ।

ওমরাহ, মনসবদার, জায়গিরদার, ফৌজদার—সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নওজওয়ান শাহজাদাকে তারিফ করলেন। বারবার। নানান্ ভাষায়। আলোয় ঝলমলে সন্ধ্যার দেওয়ান-ই-খাসে যেন সারা মধ্য এশিয়া উঠে এসেছে এইমাত্র। হিন্দুস্থানে ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা উজবেক, ইস্পাহানি, চাঘতাই, বদকশানি, তুর্কি সব মনসবদাররা যে-যার নিজের ভাষায় তারিফদারি করতে ডুবে গেলেন।

সেই সঙ্গে তাঁরা বাদশার তরফ থেকে শাহজাদাকে এই তারিফ জানানোর জন্যে বাদশাকেও যেন দৌগুণ সাবাসি দিতে থাকলেন।

—এবার তুমি হিন্দুস্থানের দক্ষিণে যাবে—

বাদশার এই ঘোষণায় সারা দেওয়ান-ই-খাস নিশ্চুপ। এতগুলো ক্ষমতার ফোয়ারা একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল! বাদশা শাহজাহান বললেন, আজ থেকে তুমি দক্ষিণের সুবেদার।

সারা দেওয়ান-ই-খাস একসঙ্গে ফেটে পড়লো। সেই আনন্দের নানান রকম আওয়াজের ভেতর একটি সফেদ দীপশিখার মতোই দাঁড়ানো শাহজাদা আওরঙ্গজেব সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকলেন মাত্র। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো, সবই আপনার মেহেরবানি জাঁহাপনা!

ওকথা বলেই শাহজাদা মসনদের দিকে মুখ করে পিছিয়ে যেতে যেতে আঙুরিবাগের দিককার অলিন্দে নিমেষে মিলিয়ে গেলেন। সিপাহসালার, উজির জাফর খাঁ, বিহারের ফৌজদার, ওলন্দাজ ইলচি—একে একে সবাই শাহজাদার ভঙ্গিতেই বাদশা শাহজাহানকে তসলিম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

একসময় দেওয়ান-ই-খাসের এই সাবাসি, মিলাদ-মজলিশ ভাঙলো। এখন এখানে শুধু হিন্দুস্থানের বাদশা একা দাঁড়িয়ে। ঝলমলে আলো নতুন করে পাথর বসানো স্তম্ভে ঠিকরে গিয়ে চাঁদোয়ায় ঝিলিক দিচ্ছে। এত আলো একা অসহ্য লাগলো বাদশার। তিনি ডান দিককার অলিন্দ ছাড়িয়ে অন্ধকার কানাতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সামনে যমুনা। যমুনার বুক অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে আবার আলো। সেই আলোর ভেতর মমতাজমহলের সমাধি সৌধে কাজ থেমে নেই। বাদশা জানেন—এখন ওই সমাধি সৌধ মানুষের মুখে মুখে তাজমহল বনে গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বাদশা বিড়বিড় করে বললেন, মমতাজ—বাদশা-বেগম—মমতাজমহল। আমার আরজুমন্দ—

দু'জনের মাঝখানে এখন যমুনা। যমুনার চর। চরে তরমুজ চাষীদের ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে কুপির আলোর হলুদ ফুটকি—জায়গায় জায়গায়।

বাদশা নিজের মনে মনেই বললেন, আজ শাহজাদা আওরঙ্গজেব দক্ষিণে সুবেদার হলো আরজুমন্দ—। কিছুক্ষণ আর কোথা ফুটলো না বাদশার মুখে। তারপর বললেন, মনে আছে? ঠিক বিশ বছর আগে—

আর কথা ফুটলো না বাদশার মুখে। ঠিক বিশ বছর আগে আজকের বাদশা ছিলেন সেদিনকার শাহজাদা খুর্‌রম। আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুমে সেদিনকার শাহজাদাকে দক্ষিণে যেতে হয়েছিল মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার হয়ে। মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে।

বাদশা শাহজাহানের অনেক কিছুই মনে আসছিল। আগ্রার চোখে দক্ষিণ চিরকাই অশান্ত। বাগী। খতরনাক। দাদাসাহেব আকবর বাদশাকেও বারবার

দাক্ষিণাত্য ছুটে যেতে হয়েছে। আমি নিজেও দক্ষিণে গিয়ে আগ্রার চোখে বাগী হয়ে উঠি।

খুব আলতো করে ডাকলেন শাহজাহান। —আরজুমন্দ। আরজুমন্দ—

কোনো সাড়া পেলেন না বাদশা। তিনি মনে মনেই বললেন, তোমার দারা—শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো আজ বলতে পারো একজন 'ইনসান-ই-কামিল'। আস্ত একজন পুরুষ। ফৌজদার-ই-হিসার। আমার মতো শুধুই লড়াকু নয়। সে তোমারই মতো নাজুক—সুন্দর—সব দিকে তোমারই মতো তার ভালোবাসা বয়ে যায় মমতাজমহল—

শাহজাদা সুজাশুজার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার পেয়ারের নাতি আজ একজন বুঝদার শাহজাদা—শাহী মনসবদার। শাহজাদা আওরঙ্গজেব আজ থেকে দক্ষিণের সুবেদার। বাহাদুর লড়াকু। বুন্দেলাকে শুধু সে শায়েস্তাই করেনি মমতাজ—তোমার শাহজাদা আওরঙ্গজেব সেখান থেকে কোটি তনখা নিয়ে ফিরেছে। আমি তাকে বুঝি না। তোমারই মতো ভীষণ চুপচাপ—কথাটি নেই মুখে। আবার শাহজাদী জাহানারাকে দ্যাখো আরজুমন্দ—তার মুখে সবসময় তোমারই মতো দিওয়ানের ফোয়ারা—এই সাদি তো সেই হাফিজ—গলায় গান—ফুল ভালোবাসে তোমারই মতো মমতাজমহল—

হিন্দুস্থানের বাদশা এখন দুর্গের অলিন্দ-বরাবর অন্ধকারে বারান্দার কানাতে একা দাঁড়িয়ে। ঠিক একই সময়ে হায়াত বকস বাগের মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন শাহজাদী রোশনআরা। ছিপছিপে, তীক্ষ্ণ, দোহারা গড়নের শাহজাদী মুখের ওড়না সরিয়ে নিচে তাকালেন।

হাতিপোল দরওয়াজার সামনে টানা তক্তা পোলের সামনে নিজের শিবিকায় বসে আছেন শাহজাদী জাহানারা। আগে পিছনে ঘোড়ার পিঠে ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দর সব আফগান সওয়ার। রোশনআরা শুনেছেন, বাজি জাহানারার পাহারায় কয়েকজন সওয়ারের মাথায় একজন আফগান আহেদিও দেওয়া হয়েছে সাকেত ছাউনি থেকে। দেমাকে জমিতে পা-ই পড়ে না বাজির।

রাজধানী আগ্রার ভেতর বাজি শাহজাদী জাহানারার কিসের এত পাহারা দরকার? সবটাই আব্বা হুজুরের বাড়াবাড়ি। তাছাড়া কী! সুরাট বন্দরের যা আদায় হয়—সবটাই বাজির হাতখরচা। খরচটা এত কিসের তোমার শুনি। এমনিতে সুফী-দরবেশ নিয়ে মাতামাতি যায়—তার এত দাম-দামড়ি, আশরফি-মোহরের কী দরকার। সবটাই আব্বা হুজুরের খেয়াল খুশি। আম্মিজানের এন্তেকাল হলো বলে বাদশা-বেগমের শান-মহব্বত সবই দিতে হবে বাজিকে? ঘোড়সওয়ারের পাহারা, হাতি, সুখদোলা, দিনরাতের হাজিরা দাখিলা—সবই!

শাহজাদী জাহানারা তখন হাতির পিঠে গাদেলায় বসে দুর্গে ঢুকছেন। হাতির ঘণ্টা গম্ভীর মধুর স্বরে বেজে উঠলো। চওড়া পাথরে দেওয়ালের আড়ালে তাঁর শিবিকা মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল সঙ্গী তাতার বাঁদির দল।

হায়াত বকস্‌ বাগে কয়েকটি সেঁউতি তুলে নিলেন শাহজাদী রৌশনআরা। তুলতে তুলতে তাঁর মন বললো, বাজি—শাহজাদী জাহানারা তুমি যতই দিওয়ান আওড়াও—যতই তুমি আউলিয়াদের কথা মুখে বলো না কেন—সুফী দরবেশদের নিয়ে মেতে থাকো না কেন—আমি তোমায় চিনতে পেরেছি বাজি।

তুমি তাগদের কাছাকাছি—শান-সওকতের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসো। গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে ভালোবাসো তুমি বাজি। আর তাই—

আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের চোখের মণি বড়েভাই—হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা দারাশুকো। তাকেই তুমি গুণ করেছো—তাকেই তুমি বশ করেছো—এরপর তোমার কোন্‌ খায়েস পুরতে আর বাকি থাকতে পারে। হিন্দুস্থানে সবই এখন তোমার হাতের মুঠোয়। বড়েভাই তোমার কথায় ওঠেন। তোমার কথায় বসেন। বাদশার সফরে বড়েভাই সঙ্গী হলে তুমিও সঙ্গী হবে—এ তো জানা কথা। কোথায়! আমাকে তো সঙ্গে যেতে ডাকেন না আব্বা হুজুর। আমিও কি তার মা মরা মেয়ে নই? এবার লাহোর দুর্গে বড়ে ভাইয়ের সঙ্গে বসে কী মতলব এঁটেছো কে জানে? আমিও মুঘল শাহজাদী বাজি—একথা ভুলে যেও না—

সেঁউতির তোড়া বেঁধে দিলো গুলবরদার। কুর্নিশ করলো শাহজাদীকে। সেদিকে তাকাবার সময় নেই শাহজাদীর। তিনি ওড়নার আঁচলে তোড়াটি ঢেকে খরো পায়ে নিজের মহলে এসে ঢুকলেন।

যা ভেবেছিলেন তাই। ছোটেভাইকে দেখে দুয়ার থেকেই কুর্নিশ জানালেন রৌশনআরা। জানিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন শাহজাদী, হজরত! সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর! কতক্ষণ এসেছো?

—এই তো। এইমাত্র রৌশন।

—আমি যে আজ কি খুশি হয়েছি ভাইয়া কি বলবো! তোমায় দেবো বলে ক'টা সেঁউতি তুলে নিয়ে এলাম। সন্ধ্যায় এরা ফোটে বলে হিন্দুরা এই ফুলকে সন্ধ্যামণি বলে। কেমন একটা চাপা খুশবু। ঠিক তোমার মতো ছোটে ভাই—

—আম্মিজান থাকলে আজ সবচেয়ে খুশি হতেন—

—সবাই চিরকাল থাকেন না ভাইয়া। তাতে কী? তোমার এই সওকতে আজ আমি একাই খুশি মানাবো। আমার ছোটে ভাই খুব বাহাদুর একজন শাহজাদা। সে আজ থেকে সুবেদার। তাকে আব্বা হুজুর ঠেলে ওপরে তুলে দেননি। তাকে তাগদ দেখিয়ে সব আদায় করতে হয়েছে—সাহসের গাওয়াই—পেশ করে তবে সব কিছু ছিনিয়ে নিতে হচ্ছে—

—আঃ। রৌশন! ও কী কথা আজ?

—কেন? আমি ডরপোক নই ছোটে ভাই। যা সত্যি তাই বলবো। তাতে যা হয় হবে। আমিও এই মুঘলশাহীর একজন শাহজাদী। সেবারে জঙ্গি হাতি সুধাকরের মুখোমুখি শাহজাদাদের ভেতর কে একা এগিয়ে গিয়ে লড়াই দিয়েছিল শুনি? তাই না বাদশা তোমায় বাহাদুর খেতাব দিলেন। মনসবদার

করেই তোমায় পাঠিয়ে দিলেন বুন্দেলাখণ্ডে। খতরনাক বুন্দেলা ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করতে। তাও যদি তোমার ঘোড়সওয়ার বড়েভাইয়ের সওয়ারের সমান সমান হতো তো বুঝতাম। বড়েভাই শাহজাদা দারাশুকোর চেয়ে দু'হাজার কম সওয়ার নিয়েই তুমি ঝুঝর সিংকে হারিয়ে দিলে। তবে না তুমি আজ সুবেদার। অন্য যারা আজ মনসবদার—সুবেদার তারা তো কোনোদিনই লড়াই করেনি ছোটেভাই!

আওরঙ্গজেব বুঝলেন রোশন বলছে বড়ে ভাইয়ের কথা।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

আজও শাহজাদা দারাশুকো সত্যিই কোনো লড়াইয়ে যাননি। একলাফে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ছ'হাজার ঘোড়সওয়ার। আর আমার জন্যে ঘোড়সওয়ার মোটে চার হাজার। বড়েভাই পেলেন বারো হাজার জাতের মনসবদারি। আর আমার বেলায় মোটে দশ হাজার জাতের মনসবদারি! যে কোনো বাহাদুরিই দেখায়নি তারই জুটলো ফৌজদার-ই-হিসার? চমৎকার বিচার! যদি বুন্দেলখণ্ডে ঝুঝর সিংয়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা না যেতো—তাহলে কি আমি দক্ষিণে সুবেদারি পেতাম? জং-কি-ময়দানে আমায় তো মাটি নিতেও হতে পারতো।

সদ্য সদ্য সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর তাঁর চেয়ে মোটে এক বছরের বড় বাজি—শাহজাদী রোশনআরার মুখে তাকালেন। এখন বসন্তের নবীন সন্ধ্যা। দুর্গের অলিন্দের বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে নিচের মাণ্ডির সাধারণ মানুষজনের কথাবার্তা থেকে ওপরে উঠে আসা শোরগোল। যার কোনো কথা আলাদা করে চেনা যায় না।

রোশনআরা দেখলেন, ছোটে ভাইয়া আওরঙ্গজেবের গায়ে সুবেদারি আঙরাখা। তাতে বুটিদার চুনি। কপালে উত্তেজনার ঘাম। মুখখানি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাইয়ার। সবার চেয়ে সফেদ। রোশনআরা মনে মনে বললেন, দাঁড়াও বাজি। আমিও তোমায় মজা দেখাচ্ছি। তোমার রাস্তাতেই। বাদশার চোখের মণি শাহজাদা দারা। নিকম্মা দারা। তাকে বশ করে তুমি আজ ওখানে উঠেছো। আমি বশ করবো শাহেনশার সবচেয়ে কামিয়াব—জং-ফতেদার শাহজাদা—আওরঙ্গজেব বাহাদুরকে।

মুখে কিন্তু একদম অন্য কথা বললেন শাহজাদী রোশনআরা। ছোটে ভাইয়া! তোমার মতো এত অল্প বয়সে তামাম মুঘল রিয়াসতে কেউ কিন্তু সুবেদার হয়নি।

আওরঙ্গজেব ভুল শুধরে দেবার শান্ত গলায় বললেন, ভুলে যেও না রোশন। সুবেদারি কোন্ ছার! পরদাদাসাহেব জালালুদ্দিন আকবর বাদশা হয়েছিলেন আরও অনেক কম বয়সে।

—ও হ্যাঁ। তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তো দিনকাল অনেক সহজ ছিল। বাদশাহীও এত বিরাট এত ঝঞ্ঝাটের ছিল না।

—পুরোনো দিনকে সবাই ওই চোখেই দেখে থাকে।

শাহজাদী বললেন, দক্ষিণে ফৌজের সিপাহ-সালার হয়ে গিয়েই কিন্তু আব্বা হুজুর শেষমেশ আগ্রায় এসে উঠলেন।

কথাটায় কী ছিল। শাহজাদা খচ্ করে ঘুরে তাকালেন তাঁর বাজি শাহজাদী রোশনআরার মুখে। সে মুখে তখন একটি হাসি এসে দাঁড়িয়েছে। সে হাসি ছোটে ভাইয়ের চোখে ধরা পড়ুক—তাও যেন চান না রোশনআরা। কেননা, তাঁর কথার মানে খুঁজতে গেলে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অনেক ভেতরে চলে যেতে হয়। সেখানে পেঁৗছে কী দেখতে হবে কে জানে?

আওরঙ্গজেব রোশনআরার মুখে পরিষ্কার করে তাকাতে না তাকাতেই বাজির মুখের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। চোখ নামিয়ে নিলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর চোখে সহ্য হলো না। শাহজাদার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। তিনি বললেন, রাজধানী থেকে অতদূরে পড়ে থাকবো। আগ্রার হাল-হকিকত কিছুই জানতে পাবো না—

—তা কেন ভাইয়া? আমি এখানে আছি কী করতে?

অবাক হয়ে শাহজাদীর মুখে তাকালেন আওরঙ্গজেব। কী রকম?

—তোমার কাসীদ পাঠাবে হপ্তায় হপ্তায়। তার হাত দিয়ে আগ্রায় যা ঘটবে —সব খবর তুমি দক্ষিণে বসে পেয়ে যাবে ভাইয়া—

শাহজাদা অবাক হলেন। এটা তো মাথায় আসেনি তাঁর। কতদূর ভেবে রেখেছে রোশন! আওরঙ্গজেব তখন তখনই সবটাই বেরিয়ে আসতে চান না। তিনি তাঁর বড় বোন রোশনকে কোনোদিন এভাবে জানেনও না। আজ খুব মগজদার লাগছে শাহজাদীকে। তাঁর ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। সামান্য ক'টি কথার ভেতরে কত কথা রয়েছে। আগ্রাই হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের কলিজা আগ্রা। আমি যখন নর্মদার ওপারে থাকবো।—তখন ওই কলিজার অন্দরমহলে থাকবে রোশন। সে সবই দেখতে পাবে। শুনতে পাবে। তার পক্ষে কাসীদের হাত দিয়ে হপ্তায় হপ্তায় তাজা খবর পেঁৗছে দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। আওরঙ্গজেব বললেন, বলছো?

—এ আর এমন কি! আগ্রায় বসে থেকে এটুকু আর তোমার জন্যে পারবো না?

শাহজাদা কৃতজ্ঞ চোখে শাহজাদীর মুখে তাকালেন!

শাহজাদী রোশনআরা মিষ্টি করে বললেন, দেখো শাহজাদা—আমি আগাম বলে দিচ্ছি—তোমার ঘোড়ওয়ার—তোমার মনসবদারি দোগুণ—চৌগুণ তালে বাড়তেই থাকবে।

—কী করে বুঝলে?

—আমার মন বলছে ছোটে ভাইয়া। যেমন করে বাহাদুরির জোরে সুধাকরকে ছিনিয়ে নিলে—

—ছিনিয়ে নিলাম?

—ওই হলো! তোমার বাহাদুরিই ছিনিয়ে নিলো। তোমার বাহাদুরিই

তোমাকে মনসবদারি ছিনিয়ে এনে দিয়েছে। এনে দিলো সুবেদারি। এইভাবেই তুমি আরও ঘোড়সওয়ার ছিনিয়ে আনবে। আনবে নতুন নতুন শান-সওকত। কে বলতে পারে ভাইয়া! একদিন আগ্রায় এসেও তো উঠতে পারো।

দু'জনের কেউই এর বেশি খোলসা করে আগ্রার কথা বলতে এখনই রাজি নন যেন। আগ্রায় হিন্দুস্থানের বাদশা থাকেন। তাঁর মসনদও এই আগ্রাতেই। সেখান থেকেই হিন্দুস্থানের সব ইচ্ছা, হুকুম, ফরমান দিকে দিকে জারি হয়। মনসবদারি, জায়গিরদারি, খেলাত, খেতাব, ইজফা—সবই ওই মসনদের তাগদের ফোয়ারা থেকেই চৌদিকে আরাম, সুখ, নিশ্চিন্তির জলকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের চোখে সাবাসি ফুটে উঠলো। তিনি সেই চোখে শাহজাদীর মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

বাদশা শাহজাহানের চোখে এতক্ষণে যমুনার বুকের অন্ধকার সয়ে এসেছে। তিনি দুর্গের অলিন্দের বাইরে ঘোর অন্ধকার কানাতে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে ঝকমকে আলোর ভেতর তাজমহলের এলাহি কাণ্ডকারখানার লোকজনকে আলাদা করে চিনতে পারছিলেন না ঠিকই—কিন্তু পুরো ছবিটাই তাঁর চোখে কালো কাপড়ের ওপর সোনালি বুনুনি বলে মনে হচ্ছিল।

—কে?

—বন্দেগান। আমি আপনার মেহজবিন।

এভাবে জানান না দিয়ে কেউই আসতে পারে না বাদশার কাছাকাছি। এ হলো বেদম বে-তমিজি। শাহজাহান রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একা একা নিজের কাছে থাকবেন—একা একা অন্ধকারের মুখোমুখি হবেন খানিকক্ষণ—এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছে। তিসরি শাহজাদা আওরঙ্গজেব সুবেদারি পেয়েও অমন নির্বিকার? কেন? কেন? বিশেষ করে দক্ষিণের সুবেদারি? আর এই কাঁচা উমরে? কেন? কেন? ঠিক বিশ সাল আগে আমিও তো দক্ষিণে সিপাহ-সালার হয়ে গিয়েছিলাম। মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে। তখন কত জোশ আমার ভেতর। কত আহ্লাদ। আওরঙ্গজেব কি আহ্লাদ করতে জানে না? আহ্লাদ আসে না ওর? চোখের পলকও পড়ে না যে ওর!

এসব ভাবতে ভাবতেই বাদশার খানিক আগে মনে হচ্ছিল, আরজুমন্দ! আমি কি তোমার শাহজাদাদের ঠিকমত গড়ে তুলতে পারিনি? তুমি আর নেই বলে ওদের কি আমি একজন আব্বা হুজুরের দিল আর জান দিয়ে বানিয়ে তুলতে পারিনি? আমি কি ভুল করেছি? ভুল করলাম কোনো? এইসব ভাবনার ভেতর দিয়েই বাদশা এতক্ষণ যমুনার ওপারে আলোর ভেতর উঠতি তাজমহলের দুধ সাদা পাথরের ধনুক যেমন খিলানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ঠিক এইসময় মেহজবিন বেগমের এই বেদম বে-তমিজি। শাহেনশা কী একটা কথা বলতে যাবেন। সিকামোর গাছের গায়ে জড়ানো লতার মতোই শাহজাহানকে জড়িয়ে ধরে মেহজবিন বেগম তাঁর ঠোঁটে সমান সমর্থ আওরতের মতোই নিজের ঠোঁট রেখে তা ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। ইস্পাহানি আতর খুব

তীব্র হয় না। কিন্তু আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে। সেই সঙ্গে মুলতানি মাটি, ক্ষীরার রসে মাজা মেহর্জাবনের শরীরের খাঁজ শাহেনশার চিন্তার ঢেউকে মুহূর্তে অন্য খাতে বইয়ে দিলো। ও আমাকে এত ভালোবাসে? আমি এখনো এমন ভালোবাসা পাওয়ার মতো লায়েক আছি সত্যি সত্যি? আমি তো জানতাম হিন্দুস্থানের বাদশা হলেও আমি অনেকদিন হলো এতখানি পাওয়ার পক্ষে না-লায়েক হয়ে পড়েছি। তাহলে দুনিয়ায় অন্তত একজন আওরত—মেহর্জাবনের চোখে আজও আমি দামি—কিমতি চিজ! দোগুণ আহ্লাদে জাঁহাপনা শাহজাহান মেহর্জাবনকে আঁকড়ে ধরলেন।

এখানে এখন কেউ নেই। কেউ এলেও এ-অবস্থায় দেখলে তখন তখনই সরে যাবে। এ বড় আহ্লাদের সময়। আমার ছেলেমেয়েরা ফারসি দিওয়ান আওড়ায়। ঘোড়া দাবড়ায়। বিদেশি ইলচিদের দেওয়ান-ই-খাসে খাতিরদারি করে বসায়। এক ছেলের ফকির-দরবেশে ঝোঁক। আরেকজন খ্যাপা হাতির মুখোমুখি মহড়া নেয়। এত সবের পরেও আমি আজও জওয়ান। তাজা। এখনো পারি। এখনো আমি খুবসুরত মেহর্জাবনের চোখে কিমতি। আজও আমার দু'হাতে কত জোর। মেহর্জাবিন আমাকে আঁকড়ে ধরে শূন্যে উঠে আছে। খোদাতালা দু'হাত ভরে আমায় দিয়েছেন। মুঠ্‌ঠি ভর আমায় দিয়েছেন। তাঁর করুণার শেষ নেই। মেহর্জাবনের পা আমি এখন মাটিতে লাগতে দেবো না কিছুতেই। ও আমার লতা হয়ে জড়িয়ে আছে।

বিশেষ এক ভঙ্গিতে মেহর্জাবিন বেগম হিন্দুস্থানের বাদশাকে আচ্ছন্ন করে থাকেন। ইদানীং শাহজাহানকে প্রায়ই আনমনা দেখায়। সেসব সময় ওরকম ভঙ্গি করেও মেহর্জাবিন বেগম শাহেনশাকে খাতে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বরং তাতে বাদশা যেন বিরক্তই হয়ে ওঠেন। আজ এমন সুন্দর অন্ধকারে সেই ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন মেহর্জাবিন। দু'হাতে গলা জড়িয়ে হিন্দুস্থানের বাদশার ডান কাঁধে মাথা রাখা—ছাতির ওঠা পড়া টের পেতে পেতে শূন্যে ঝুলে থাকা খানিকক্ষণ।

অন্ধকারে একটা কেঠো মতো পোকা ছুটে এসে বাদশার কপালে লাগতেই শাহজাহান মাথা ঝাঁকিয়ে পোকা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যমুনার ওপারের আলো ঝলমল উঠতি তাজ তাঁর চোখে বিঁধে গেল। সারা শরীর সমেত ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠলেন বাদশা। সেই ঝাঁকুনিতে মেহর্জাবিন বেগম টুপ করে খসে পড়লেন। পড়েই উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখে তাকিয়ে বাদশার সারা মুখ বিরক্তিতে ভরে গেল। পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়ানোর সময় মেহর্জাবনকে কেমন বেঢপ তাতারনির মতো লাগলো বাদশার। কোমরটা বাতাস-গেলা হাপর যেন। আওরত বসেই উঠে দাঁড়ালে অমন লাগে?

শাহজাহানের সে-চোখের সামনে মেহর্জাবিন দাঁড়াতে পারলেন না। অন্ধকারে বড় আশা করে এসেছিলেন। অন্ধকারেই মিশে গেলেন।

বাদশার চোখের সামনে তখন শুধুই যমুনার ওপারের সেই আলো। আলোর

ভেতর সবে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় তাজ। মানুষজনের আবছা জটলা তাদের হাত। পা। মুণ্ডু। একটা বড় কাণ্ড কারখানার নিঃশব্দ ছবি।

বাদশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মমতাজমহল—। এরপর শাহজাহানের মনের ভেতর এইসব কথা এসে ঢুকতে লাগলো। যেমন: কার সঙ্গে কথা বলবো? তেমন একজনও কেউ নেই। এক তুমি ছিলে। তুমি আর নেই। বাদশা হলে বড় একা হয়ে যেতে হয়। এ আমি কী করছিলাম? কী করছি?

শাহেনশা শাহজাহান অনেক নিচে যমুনার জলভর্তি বাঁধানো নালার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকালেন। পাহারায় রাজপুতের মাথা। ঘোড়ার দাবনায় আকবরি দরওয়াজার চৌকি থেকে আলো এসে পড়েছে। যমুনার বুক থেকে এইমাত্র বাতাস উঠলো। কেউ জানলো না—হিন্দুস্থানের বাদশা এখন এমনভাবেই দাঁড়িয়ে—একটু ধাক্কা দিলেই তিনি নিচের বাঁধানো চাতালে পড়ে থেঁতলে যেতে পারেন।

শাহজাদী মহলের আরশির সামনে দাঁড়িয়ে রৌশনআরা। এমন ভাবেই এ-ঘরে অভ্রের আলো—লম্বা ইস্পাহানি আরশি জুড়ে শাহজাদী ফুটে উঠেছেন। একদম জ্বলজ্বল। ঘাগরা, কাঁচুলি, ডোরিয়া, বাদল কিনারি ওড়নায় রৌশনআরা ঘেমে উঠেছেন। হালকা কিছু গায়ে দেবেন বলে একটা একটা করে পোশাক খুলছেন—আর কোমর গলিয়ে নিচে মেঝেতে ফেলে দিতে দিতে চটি সমেত পায়ের ডগায় আঙটা করে তোলার ভঙ্গিতে সেগুলো দূরে দূরে ফেলে দিচ্ছিলেন তিনি।

এরকম দিতে দিতেই শাহজাদী চেঁচিয়ে উঠলেন। কোথায় গেলি?—অ্যাঁ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শাহজাদী যেন কাউকে ডাকার কথা নিজেই বেমালুম ভুলে গেলেন। আরও কাছে গিয়ে আরশির রৌশনআরার চোখ,মুখ, নাক ভালো করে দেখতে লাগলেন। তারপর আসল রৌশনআরা আরশি বরাবর বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। আরশির রৌশনআরার মুখোমুখি।

এখন তাঁর গায়ে ওপরের দিকে শুধুই কাঁচুলি। নিচে দামি মসলিনের শালোয়ার। দু'পাটি বিনামা চটিও তিনি পায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলেন। দিয়েই দু'হাতে তালি দিলেন। কোথায় গেলে? বেরিয়ে এসো। ভয় নেই। কিছুই বলবো না—

এবার দেখা গেল সুঠাম চেহারার একজন পুরুষ এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। দাঁড়িয়েই সে কুর্নিশ করলো অনেকটা ঝুঁকে। ফের সিধে।

তাকে দেখতে পেয়ে শাহজাদী নিজের মনেই হাসলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, ভাবলাম আবার পালাবার চেষ্টা করে দুর্গেরই কোথাও ধরা পড়েছো। হয়তো খোদ কিল্লাদারের হাতেই ধরা পড়ে কোড়া খাচ্ছো।

যাকে এত কথা বলা—তার মুখে কোনো ভাবলেশ নেই। সে যেমন দাঁড়িয়েছিল—তেমনই রইলো। অভ্রের বাতিদানে নিজের হাতে খানিক সাদা মতো গুঁড়ো কী মিশিয়ে দিলেন শাহজাদী। সঙ্গে সঙ্গে আলো অনেক উজ্জ্বল

হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে কর্পূরের চড়া গন্ধে অত বড় ঘরখানা ভরে গেল। এবার দেখা গেল—সুঠাম পুরুষটির পোশাক ঠিক গোলামদের মতো নয়। বরং বলা যায়—কিছুটা শৌখিন। চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে গুর্জরীর মখমলের পট্টিদার নীল জামার সেলাই কনুই অব্দি নেমে এসেছে। তার নিচে গোড়ালি অব্দি সরু হয়ে আসা সাদা মোটা কাপড়ের শালোয়ার। বাসন্তী রঙের কোমরবন্ধ। চোখে কোনোরকম পলক পড়ার নাম নেই। ভালো করে সুর্মা টানা। মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়া চুল। মুখ কালো দাড়িতে ঢাকা। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে।

আলো জোরদার করে দিয়ে শাহজাদী রৌশনআরা দু'খানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এসো—কাছে এসো বিষণ—

বিষণ নামে লোকটির মুখে চোখে একথায় কোনো উনিশ বিশ হলো না। তার ডানদিকে পাথরের দেওয়ালে বসানো বিরাট আরশি জুড়ে শাহজাদী রৌশনআরার কোমর অব্দি দেখা যায়। শাহী ঘরানার চোখ মুখ। একঢাল সোনালি চুল এসে পড়েছে বুকের ওপর। শাহজাদীর গোলাপি গায়ের ওপর সবুজ রংয়ের কাঁচুলির বাঁধন। সোনালি, গোলাপি, সবুজে মিলে জায়গাটা ভীষণ চোখ টানে।

বিষণ নামে লোকটি এবারই প্রথম মুখ খুললো।—আমি গোলাম। আপনি শাহজাদী। গোলামকে গোলামিতেই থাকতে দিন মালকিন—

বিষণের ভরাট গলা পাথুরে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে গড়াগড়ি খেয়ে যেন ঘরেরই অদৃশ্য বাতাসে ভেসে রইলো। বিশওয় হয়নি শাহজাদীর। বিষণের গলার ওই আওয়াজ, মুখের হাড় হাড় ঝিক, কনুইয়ের নিচে হাড় হাড় শির বের করা চওড়া কবজি—সবই যেন রৌশনআরার মনের ওপর মাছি হয়ে এসে বসে। আড়ালে উড়ে যায়। ফের এসে বসে একেবারে চলে যায় না।

ফের আরশিতে ফিরে এলেন শাহজাদী। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেন তা যাচাই করেই দেখলেন। দেখতে দেখতেই আরশিতে নিজের দিকে তাকিয়ে শাহজাদী বললেন, তুমি কি শুধুই গোলাম বিষণ?

—হ্যাঁ শাহজাদী। আমি সারা জিন্দেগিই আপনার গোলাম। আপনিই আমাকে এই জিন্দেগি দিয়েছেন নইলে—

—নইলে?

—নইলে সেদিন এই আগ্রা দুর্গের হাতিপোল দরওয়াজার টানা তক্তা পোলের নিচেই আমার জ্ঞান হওয়া মাত্র ফের ওরা জিন্দা গোর দিয়ে দিতো আমাকে। আপনারই নানাসাহেব—তখনকার উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের সেপাইরা আমায় জিন্দা ছাড়তো না। কী কুক্ষণেই যে মীর আতশ মানুচ্চির গোলামি ছেড়ে সেই এক আহেদি—

কথা আটকে যাওয়া বিষণকে কথা ধরিয়ে দিলেন রৌশনআরা। আমি তখন ছোট। নানাসাহেব আসফ খাঁয়ের পেয়ারি নাতনি। আব্বা হুজুর সবে বাদশা হয়েছেন।

কথার খেই ধরে ফেললো বিষণ। শাহী আহেদি বেলাইতি বাজারখানির

মিঠে কথায় ভুলে বাদশা-বেগম ন্রজাহানের সামনে গিয়ে হাজির হলাম।—বলতে বলতে কেঁপে উঠলো বিষণ। সেখানেই প্রথম দেখলাম লাডলি বেগম আর তাঁর খসম শাহজাদা শারিয়ারকে—

বাধা দিলেন শাহজাদী রৌশনআরা।—কে বেশি স্ন্দরী বিষণ? আমি? না, লাডলি বেগম?

কী কথায় কী কথা। থতমত খেয়ে গেল বিষণ। একবারই তো দেখেছি লাডলি বেগমকে। সেই প্রথম। সেই শেষবার।

—তব্?

—আপনিই শাহজাদী। তখন কি আমার কে স্ন্দরী—তা দেখে রাখার মতো বিচারব্দ্ধি ছিল। ওখান থেকে আহেদি বাজারঘানির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে না আসতেই হাতিপোল দরওয়াজার টানা তক্তাপোলের নিচে কে বা কারা কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে ভীষণ জোরে মাথায় মারলো। সঙ্গে সঙ্গে পোলের নিচে জল-কাদার ভেতর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম—

—থাক। আর বলতে হবে না। অনেকবার শ্নেছি। জ্ঞান হতে দেখলে কিল্লাদারের ঘরের সামনের চাতালে পিছমোড়া হয়ে পড়ে আছো।

—খোদার শও স্ক্রিয়া। সেই সময় আপনি আপনার নানাসাহেব উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের সঙ্গে এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন—

—থাক। বাকিটা আর বোলো না বিষণ। নিকম্মার ধাড়ি। যে কাজ পারো না—সে-কাজে না ব্ঝে স্ঝে গিয়েছিলে কেন? বেঘোরে জানটা দিতে।

—কিছ্ই জানতাম না মালকিন। আহেদি বাজারঘানি আমায় কিছ্ ভেঙেও বলেনি। ছিলাম আগ্রা দ্র্গের সামান ব্র্জের বানোয়াটি উস্তাদ নসরত খাঁয়ের কয়েক আশরফির না-চিজ গোলাম। শ্নেছিলাম রাজধানীর হাওয়ায় মোহর ওড়ে। নসিব ফেরে। তাই চোখ-কান ব্জে ঝাঁপ দিলাম—

—আমি সেদিন ওখানে না এসে পড়লে আব্বা হ্জ্রের পিলখানায় হাতিদের স্র্য়া হয়ে যেতে।

কৃতজ্ঞ গোলাম হিসাবে বিষণ ফের ঝ্ঁকে পড়ে কুর্নিশ করলো। শাহজাদী সেদিন যদি আপনি আমায় নিজের দিনরাতের হাজিরা-গোলাম হিসাবে বেছে না নিতেন—

—নানাসাহেব আমার কোনো আবদার কোনোদিন ফেরাননি—।

অনেক কথা একসঙ্গে এসে যাচ্ছিল, বিষণের ম্খে। তখন আপনি নেহায়েত ছোটটি। কচি শাহজাদী। বিলকুল বেহসতের গ্লাব।

—থামো। এটা খ্লে দাও এসে। —বলতে বলতে শাহজাদী রৌশনআরা ফের আরশিতে নিজের ম্খোম্খি হলেন। হয়েই দেখতে পেলেন, সোনালি চুলে ঢাকা গোলাপি ব্কের ওপর সব্জ কাঁচ্লির বাঁধন এঁটে বসেছে। সামান্য চাপা নাকের নিঃশ্বাস নেবার দ্টি সর্ পথ একটি আবছা ছায়া ফেলেছে যেন টসটসে দ্ই ঠোঁটের বন্ধ দরজায়। মাথার চ্লের সঙ্গে মিলিয়ে চোখও কিছ্ কটা। শাহজাদী অস্ফ্টে বললেন, আরশি। তুমি কার?

বলেই খেয়াল হলো, বিষণ তো যেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেখানেই দাঁড়িয়ে। আয়নায় দেখা যাচ্ছে। মুখে জেগে ওঠা হাড় হাড় ঝিক। মোটা করে সুরমা টানা কালো গভীর দুই চোখ। যেনবা খুব সুন্দর। মাথার কোঁকড়া কালো চুলের মতোই চিবুক—গালের দু'ধারে ভালোভাবে ঢাকা কালো দাড়িতে। চওড়া কাঁধের দু'ধার দিয়ে গুর্জরি মখমলের পাট্টিদার নীল জামার ওপর সেলাইয়ের জলছাপ। শিরা জেগে ওঠা চওড়া কবজির দু'খানা হাত আনাড়ির মতোই বাসন্তী রঙের কোমরবন্ধের কাছে নাড়াচাড়া করছে বিষণ।

—কী হলো? বললাম যে—

এমন ঝাঁঝালো গলাতেও যখন কাজ হলো না—তখন শাহজাদী রৌশনআরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আরশির সঙ্গে রাখা কর্পূর গুঁড়ো বোঝাই পাথরের গোল গলা ভারি ঘটটাই সিধে বিষণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন।

চাঘতাই শাহজাদীর ছুঁড়ে দেওয়া জিনিস কখনো নিশানা হারায় না। বিষণ চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।—উঃ!

যেন কিছুই হয়নি—এভাবে শাহজাদী আবার আরশির সামনে ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখে সেই একই বিলাসী হাসি—অলস, কিন্তু কঠিন। নিচের ঠোঁটে ওপরের একটি গজদাঁত এইমাত্র চেপে বসলো।

কপালের ডান কোণে রক্ত। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বিষণ এগিয়ে এলো। যেন কুড়ুলে বাঁটে বসাচ্ছে—এমন মন দিয়েই সে শাহজাদীর পিঠে সবুজ কাঁচুলির বাঁধন খুলতে লাগলো।

রৌশনআরা টের পেলেন বিষণের দু'খানি হাতই থরথর করে কাঁপছে। একটুও না থেমে। এখান থেকে বাইরের আগ্রা বোঝা যায় না। বসন্তের শুরুতে বাতাস যেমন—তেমনই তাতে সারাদিনের চড়া রোদের বাড়তি তাত। শাহজাদী এও টের পেলেন—শাহজাদী-মহলের পুরনো হাজিরা-গোলাম বিষণ ভীষণ ঘামছে। যেসব গোলাম শাহী ঘরানার মানুষজনের কাছাকাছি হয়—যাদের কাছাকাছি থেকে হয়—তাদের এমন কুলকুল করে ঘেমে ওঠাও ভীষণ বে-তমিজি। শাহজাদী দেখলেন, তাঁর কিন্তু এই পুরুষালি ঘাম বেশ ভালোই লাগে। এ এক আজব খুশবুদার পুরুষ-আতর।

কাঁপতে কাঁপতেই কাঁচুলির বাঁধন একসময় খুলে ফেলতে পারলো বিষণ।

অমনি রৌশনআরা ঘুরে দাঁড়ালেন। এই গোলামের চোখের সামনেই তিনি নেহায়েত বালিকা থেকে দিনে দিনে আজকের এই রৌশনআরা বেগম হয়ে উঠেছেন। দু'হাতে বিষণকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ডান পা তুলে দিলেন তার কোমর বরাবর।—অ্যাতো কাঁপছো কেন? বেওকুফ কোথাকার! আমি কি তোমার অজানা—অচেনা—? আমি তো তোমার চোখে আজনবি নই বিষণ!

তখনো বিষণ দাঁড়িয়ে—নিজের দু'খানা চওড়া হাত কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছে না। তার জামার ফাঁকে চোখ, নাক বুকে ঘষটে নিতে নিতে শাহজাদীর গলা জড়িয়ে এলো।—কতদিন বলেছি না—মুলতানি মাটি মাখবে। তাহলে অ্যাতো ঘাম হয় না—

বিষণ প্রায় অভ্যেসবশেই তার আনাড়ি হাত দু'খানা দিয়ে শাহজাদীকে জড়িয়ে ধরলো।—শাহজাদী, আমি গোলাম। মুলতানি মাটি গোলামের জন্যে নয়।

তখনই সে-হাত সরিয়ে দিয়ে রোশনআরা মুখ তুলে তার কপালে তাকালেন। কোথায় লেগেছে দেখি—আঃ। দেখি না—। বলতে বলতে মুখ নামিয়ে শাহজাদী নিজেকেই বললেন, রাগ হলে আমার কোনো জ্ঞান থাকে না। অ্যাতো ডাকি—তবু আসো না কেন?

—আমি একজন গোলাম শাহজাদী। গোলামের সঙ্গে আপনার এসব শোভা পায় না।

আঃ! বলে দু'হাতে নিজের দুই কান চেপে ধরলেন রোশনআরা। সব সময় আমি আর গোলাম! গোলাম! শুনতে পারছি না। থামো বলছি। বেয়াড়াপনা একদম দেখতে পারি না। কথা শুনলে না বলেই তো আমার রাগ হলো। আর তাই—বলে ফের কাছে এগিয়ে এসে বাঁ হাতের নরম, লতানো আঙুল দিয়ে বিষণের কপালের কেটে ফুলে যাওয়া জায়গায় হাত বোলাতে লাগলেন শাহজাদী। হঠাৎ থেমে গিয়ে রোশনআরা বললেন, এই নাও ইনাম। এই নাও। একটা—দুটো··· তিনটে···

পরপর তিনটে চুমো দিলেন শাহজাদী। বিষণের জামার ফাঁকে। খোলা বুকে। বেশ শব্দ করে। দিয়েই বললেন, এবার আমায় একটু আদর করো। করো না—

বিষণ দু'খানি হাত তুলেও নামিয়ে নিলো। তার সামনে হিন্দুস্থানের দুসরি শাহজাদী দাঁড়িয়ে। তাঁর দু'চোখ প্রায় বুজে এসেছে। নিচে স্বচ্ছ মসলিনের শালোয়ার শুধু। ওপরে সবুজ কাঁচুলি গোলাপি গা থেকে খসে যায় যায়। তার ওপর মাথায় একঢাল সোনালি চুলের কয়েক গোছা মাত্র।

হঠাৎ গর্জে উঠলেন শাহজাদী।—বেতমিজ! আমায় দাঁড় করিয়ে রাখা? —বলতে বলতে আলুথালু রোশনআরা ছুটে গিয়ে সুখদোলার ওপর থেকে চামড়ার মোটা কোড়াটি ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। তারপরেই সাপের ছোবলের মতো একটা লম্বা শব্দ—হিস্—

পরেপর সেই একই শব্দ। হিস্-স্-স্—হিস্-স্-স্—

বিষণ হাত তুললো না। যেমন নামিয়ে নিয়েছিল—সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো। শাহজাদীর হাতের কোড়া উঠতে লাগলো। আর চামড়ার লম্বা মোটা লেজটি তার গায়ে, হাতে, পিঠে নেমে এসে জড়িয়ে গিয়ে বসে যেতে লাগলো।

কোনো রকম বাধা না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণকে কোড়া খেতে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন শাহজাদী। রাগে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। হাতের কোড়াটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালঙ্কের বালিশে ঝাঁপ দিলেন। দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

বিষণ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। রাতের বাঁদির আসার সময়

হলেও কোনো চিন্তা নেই। না বলে কয়ে কেউ এখন এখানে ঢুকবে না। বিষণ হেঁটে গিয়ে মেঝে থেকে কোড়াটা তুলে বেশ যত্ন করে পাকিয়ে সুখদোলার ঝুলার পাশে সেটি যেমন থাকে সেইভাবে রাখলো। তারপর ছুটে বেরিয়ে গিয়ে জামদারখানা থেকে তিন তিনখানা মসলিনের ছোট রঙিন কাপড় এনে পালঙ্কের বাজুতে রাখলো। মুখ মুছতে যদি দরকার হয় শাহজাদীর।

উপুড় দশায় নিজের হাতের ফাঁক দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলেন রৌশনআরা। দেখতে দেখতে তাঁর কান্না থেমে গেল। নীল মখমলের পট্টিদার জামার বাঁ হাতের ওপর দিকটায় কোড়া খাওয়া বিষণের গা থেকে রক্ত বেরিয়ে খানিক জায়গা কালচে করে তুলেছে। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না শাহজাদী।

এমন সময় বিষণ কথা কয়ে উঠলো।—শাহজাদী। কাল ভোর ভোর যমুনার চরে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়াবো তো ?

ফের রাগ উঠে এলো শাহজাদীর মাথায়। এত অপমান, এত কোড়া খাওয়া—তবু মুখে একটি রা নেই কেন ? কোনোরকম বাধাই বা দেয় না কেন ? পালাবার পথ নেই। লাডলি বেগমের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হাতিপোল দরওয়াজার টানা তক্তাপোলের নিচে এক আহেদির সঙ্গে সে রাতে ধরা পড়ার পর কোতল হতোই। আমারই জন্যে আজও তুমি জিন্দা আছো বিষণ। শাহী চাঘতাই এক বালিকার খেয়ালে তুমি জীবন ফিরে পেয়েছিলে। সেজন্যেই কি—যাই করি না কেন—কোনোটাতেই কোনো রা নেই তোমার ? কিছু না পারো—অপমানে, মনের দুঃখে মরে তো যেতে পারো। অন্তত খুদখুশি তো করতে পারো বিষণ—। তাহলে তোমার লাশ যমুনায় ভাসিয়ে দিতে পারতো দাখিলারা।

কোনো জবাব না পেয়ে বিষণ ফের বললো, শাহজাদী।

শীত চলে যাওয়ার পর থেকেই রৌশনআরা রোজ ভোর ভোর যমুনার চরে ঘোড়ায় চড়া শিখতে যাচ্ছেন' তাই ঘোড়া নিয়ে অন্ধকার থাকতে বিষণ চরে গিয়ে দাঁড়ায়। আলো যখন ফুটি ফুটি—শাহজাদী রৌশনআরা তখন মোরি দরওয়াজার মুখে দেখা দেন। চর থেকে শাহজাদীর নিশানা কাপড় ছিপটির ডগায় দোলাতে থাকে বিষণ। এই যে আমি। চলে আসুন। এইখানে আছি শাহজাদী।

কোনো কোনোদিন বিষণ এগিয়ে গিয়ে যমুনার ভাঙা পাড়ে শাহজাদীর হাত ধরে। রৌশনআরা তার গায়ে ভর দিয়ে সাবধানে চরে লাফিয়ে পড়েন।

শাহজাদী গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যাঁ। দাঁড়াবে। বাদামি তুর্কি ঘোড়াটাকেই নিয়ে যাবে—

—ও ঘোড়া এখনো পেছনের পা ছোটায়। পুরো পোষ মানেনি শাহজাদী। তার চেয়ে কালচে আরবি ঘোড়াটাকে—

—না। যা বলছি তাই যেন হয়।

—তাই হবে শাহজাদী। —বলেই বিষণ অনেকটা ঝুঁকে ফের কুর্নিশ করলো। তারপর ঘুরে বেরিয়ে যেতে যাবে। অমনি রৌশনআরা বলে উঠলেন,

দাঁড়াও। পুরো পোষ মানেনি তো কি? ও তুর্কি'টাকে আমি চাবুকে চাবুকে পোষ মানাবো। কী করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।

—তাই করবেন মালকিন। —বলে নয়া কোনো হুকুমের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো বিষণ। আধো শোয়া রোশনআরার আধখানা গোলাপি বুক সল করা সবুজ কাঁচুলির বাইরে বেরিয়ে। তাতে সোনালি চুলের সামান্য আড়াল। শাহজাদী ভোলেননি—এই বিষণের গালের দাড়ি তখনো এমন কালো আর ঘন হয়ে ওঠেনি—কোথাও বেরবার সময় তিনি তার পা এগিয়ে ধরতেন। গোলাম বিষণ ছুটে গিয়ে অগোছালো বিনামা চটি কুড়িয়ে এনে নিজের হাতে তাঁর পায়ে গলিয়ে দিতো। খুব মন দিয়ে।

পালঙ্কে উঠে বসলেন রোশনআরা। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ তার চোখ সরিয়ে নিলো। বসার সময় পালঙ্কের ওপর থেকে ফ্রানসিসি দেশ থেকে আনানো নরম চাদর দিয়ে গলা—বুক দুই-ই ঢেকে নিলেন শাহজাদী। তুমি না মরদ?

কিছু বুঝে উঠতে পারলো না বিষণ। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—মরদের লজ্জা তুমি। একটা সামান্য ঘোড়া। সে পোষ মানেনি—একথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না?

—ঠিকই বলেছেন। তুর্কি'টাকে আমারই পোষ মানানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি তো সারা দিনরাত আপনার মহলেই থাকি। কখন একটা বেয়াড়া ঘোড়াকে সমুত করবো মালকিন?

—জানি না। যাও। আমার সামনে থেকে যাও। জাহান্নমে যাও।

—হ্যাঁ শাহজাদী। এখুনি যাচ্ছি—বলে আবারও বেরিয়ে যেতে গেল বিষণ।

—শোনো। কাল ভোরে ঘোড়া যখন দৌড়ুবে—তুমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে দৌড়বে। পিছিয়ে পড়া চলবে না। আমি খেয়াল রাখবো। গোলাম কি কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে?

তাই দাঁড়ানো অভ্যেস বিষণের। সে বললো, তাই হবে মালকিন। কিন্তু আমার ডান পায়ে যে ব্যথা—কোড়ার ঘা-টা এখনো শুকোয়নি।

এই কোড়াও ক'দিন আগে শাহজাদীই মেরেছিলেন। সেবারে আজকের চেয়ে কোড়ার মাত্রাটা কিছু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। তাও একই জায়গায়—বারবার। কোনোরকম রেয়াত করা শাহজাদীর ধাতে নেই একদম। তিনি সমান তেতে উঠে বললেন, তাতে কী। সামনে একটা রাত পুরো পড়ে আছে। ইলাজ করাও—

—তাই হবে মালকিন। তাই হবে—বিড়বিড় করে বলতে বলতে ঝুঁকে কুর্নিশ করেই সামনে তাকিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো বিষণ। একসময় সে শাহজাদী মহল থেকে এভাবে বেরিয়ে গেল।

এখন শাহজাদী রোশনআরার সামনে কেউ নেই। কর্পূর সবটা পুড়ে যেতে অভ্রের আলো ফের কিছু ঢিমে হয়ে পড়লো। তিনি তাঁর গায়ের ফ্রানসিসি উড়ানিখানি ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাঁচুলিটা। এবার বালিশে

মুখ চেপে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরিষ্কার গলায়—বিষণ—আমার সোনা—সোনার বিষণ—আমার আকবরি মোহর—

দুনিয়ায় কোনো কিছুই থেমে থাকে না। বাদশা যেমন ঘোড়সওয়ার, তোপ, লড়াকু হাতি নিয়ে বড় বড় প্রান্তর ভেঙে দুশমনের মুখোমুখি হবেন বলে এগিয়ে যান—তেমনই সামান্য একটি ঘুণপোকাও দিনরাত ধরে একটি খাটের পায়া কুরে কুরে কাঠের মিহি গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। কাঠের ভেতর থেকে তাকে কুরে কুরে শেষ করে ফেলাই ঘুণপোকাটির নিশানা। এই ক্ষয়ের চাঁদমারি সব জায়গায়—

অভিমান, লড়াই, মৃগয়া—সব জায়গাতেই এই ক্ষয়ের চাঁদমারি খুব পরিষ্কার দেখতে পান শাহজাদী জাহানারা। তিনি আজ সন্ধ্যা থেকেই ভাবছেন, কোথায়! আব্বা হুজুর তো সারাদিনে একবারও তলব করলেন না। মনসবদারদের বদলি, ফৌজের আহেদিদের ইজফা, কচ্ছবাহ রাজপুত বনাম শিশোদিয়া রাজপুতদের ঝগড়া-কাজিয়ার নিষ্পত্তি, ইংলিশস্তানের ইলচি মশায়—হেকিম গোব্রিয়েল ব্রাউটনের রাজধানী আগ্রার বাইরে দেহাতি এলাকায় নীলের দাদনের ঝঞ্ঝাট—কোনো ব্যাপারেই কি বাদশা আজ আমার পরামর্শ চাইবেন না? বন্দর আব্বাস থেকে একটানা ভেসে এসে যেসব বিদেশি জাহাজ সুরাট বন্দরে নোঙর ফেলে—তাদের জাহাজি লশকরদের সুবিধার জন্যে শাহী খাজানাখানা থেকে খরচ করে তেষ্টার পানি, থাকার জন্যে মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার কথা আজ দু'বছর। কাজ একটুও এগোয়নি। গুর্জরের সুবেদার এ নিয়ে কথা বলার জন্যে আজ নিয়ে তিনদিন হলো ঘুরে গেছেন। বাদশার দেখা পাচ্ছেন না তিনি। কী নিয়ে এত ব্যস্ত আব্বা হুজুর। মসজিদ? সে তো তৈরি হচ্ছে। তাজমহল? তাও তো থেমে নেই। লাল কিল্লা? রোজ সন্ধের ঘোড়াডাকে তাজা খবর এসে যায়—কাজ যতটা এগোলো। নয়া রাজধানী শাহজাহানাবাদ? সেখানে তো আগ্রার দেওয়ানখানার কাছারি খানিকটা খানিকটা করে উঠে যাচ্ছে। তাহলে?

ছোটেভাইয়া শাহজাদা দারাশুকোই বা কোথায়? দারার জন্যে মনটা কেমন করে উঠলো জাহানারার। অঢেল সময় হাতে। ইশারায় ডাকলেই হুকুমবরদার দাখিলা—হাজিরার দল ছুটে আসবে। গোস্তের মশল্লাদার মালখোবা থেকে অঙ্গুরার রস—যা-ইচ্ছে খেতে চাইলেই আবদারখানার রসুইকাররা এক পায়ে খাড়া। তখন তখনই তৈরি হবে। সামনের আরশিতে নিজেকে দেখলেন শাহজাদী। হিন্দুস্থানের বাদশার পহেলা বেটি। নিজের বুকে মাথা নিচু করে তাকালেন একবার। না, আমাকে না-দেখে কারও উপায় নেই।

যেমন ছিলেন—তেমন পোশাকেই শাহজাদী ছোটেভাইয়ের মহলের দিকে চললেন। শুধু একটা ওড়না তুলে নিলেন বুকের ওপর।

দারা নেই। তাঁর বীণাটি পালঙ্কে। খোলা অলিন্দ দিয়ে দুটি ছাতারে পাখি ছোটে ভাইয়ের মহলে ঢুকে পড়ে বীণাটি দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। কেননা, একটির পায়ের নখে লেগে এইমাত্র বীণার তার বেজে উঠেছিল। এমন জিনিস

পাখিরা আগে কখনো দেখেনি। হয়তো দুপুর দুপুর এ-ঘরে ঢুকে এত বড় দুর্গের ভুলভুলাইয়াতে পড়ে পাখি দুটো আর বেরবার পথ পাচ্ছে না। শাহজাদী তাদের হাততালি দিয়ে বের করবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। *ছোটেভাইয়া তাহলে দুপুরেরও আগে বেরিয়েছে। কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?*

আগ্রা দুর্গে শাহজাদী জাহানারা সর্বত্রগামিনী। তাঁর কোনো বাধা নেই। তিনি এবার শাহজাদার বইয়ের স্তূপে এসে পড়লেন। মেঝে থেকে ঠেলে উঠে তা পালঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। একখানি মেহেন্দি রঙের চামড়ায় বাঁধাই বই হাতে নিয়ে খুলে ফেললেন শাহজাদী।

মুন্তেখাব-উৎ-তাওয়ারিখ। মোল্লা বদায়ূনী।

। পঞ্চাশ।

মোল্লা বদায়ূনী তো পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার দরবারে আসতেন। তখনকার তাওয়ারিখ তাহলে? তখনকার ইতিহাস। মোটা পুরু কাগজে নাস্তালিক ফারসিতে লিখে গেছেন মোল্লা বদায়ূনী। মুন্তেখাব-উৎ-তাওয়ারিখ। অল-হিজরি ৯৯৮-এর ১২ই জিলকাদ—মনে মনে হিসেব করে দেখলেন শাহজাদী জাহানারা। এই লেখা—তাওয়ারিখের এই পাতাটি তাহলে এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। তার মানে দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা মসনদে বসারও প্রায় বিশ সন আগের। তখনকার জিলকাদ মাসের ১২ তারিখটি ধরে রেখেছেন মোল্লা বদায়ূনী। হুজুর শাহজাহান বাদশাই তখনো জন্মাননি। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা তখন মোটে ষোলো বছরের তাজা শাহজাদা সেলিম। শাহজাদী বুঝলেন, পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা তখন তাঁর বানানো নয়া রাজধানী ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-খাসের দরবারেই বসছেন।

চোখ বুজে ফেললেন শাহজাদী জাহানারা। চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন তিনি। সেই দরবার তো ছিল তারার মালা। কবি ফৈজী, টোডরমল, তানসেন, বীরবল তো সে দরবার আলো করে থাকতেনই। ফৈজীর ছোটভাই আবুল ফজলও ছিলেন। তিনি ছিলেন উজিরে আজম। পরদাদাসাহেবের বন্ধু, যোদ্ধা, মনসবদার, আকবরনামা আর আইন-ই-আকবরীর লেখক। মোল্লা বদায়ূনী বাদশার সেই দরবারে তেমন পাত্তাই পাননি। দেখা যাক তিনি কী লিখে গেছেন।

জাহানারা ছোটেভাই দারাশুকোর পড়াশুনোর আলোটির শিখায় খানিকটা কর্পূর ছড়িয়ে দিয়ে আলো জোরালো করে নিলেন। নিয়ে পড়তে পড়তে একাই হেসে উঠলেন। এ কী লিখেছেন বদায়ূনী। ফতেপুর সিক্রির নবরত্নের মধ্যমণি আকবর ছিলেন নিরক্ষর—আনপঢ়। সে তুলনায় আমাদের আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশা তো সত্যিই বিদ্বান। আরবি ফারসিতে আলিম। হিন্দি লেখাপড়ায় পাকা ফতেহারবাদী কায়স্থ।

শাহজাদী জানেন, অনেক মুসলমানের চোখে আজও আকবর বাদশা একজন

দঙ্গাল বিশেষ। কিন্তু এ কী লিখে গেছেন বদায়ূনী। বাদশা আকবরের নওরত্তন আসলে নয়টি কুগ্রহ। বীরবল, টোডরমল থেকে আবুল ফজল—সবাই লুচ্চা। ওদের কথা লিখলে কলম না-পাক হয়ে যায়?

হাসতে হাসতে জাহানারার হাত থেকে মুন্তেখাব-উৎ-তাওয়ারিখ মেঝেতে খসে পড়ে গেল। তাওয়ারিখ তুলে নিয়ে ওই পাতাতেই ফের মন বসালেন শাহজাদী। বদায়ূনী লিখছেন—বেশ বিদ্রূপ করেই—

আকবর বাদশা হিন্দুযোগ নিয়ে সকাল থেকে সন্ধে অব্দি এক একদিন আলোচনা করছেন। তাতে বৌদ্ধতন্ত্রও এসে পড়ে মাঝে মাঝে। বাদশা ওসব অভ্যেসও করছেন। বাদশার শোবার ঘরের সামনে সুখদোলায় বসে সুফীরা যোগ অভ্যেস করতে শুরু করেছে। খোদ বাদশাকে যোগ শেখাচ্ছে দুই ভণ্ড। তাদের হাবভাব সাধকদের মতো। একজনের নাম পুরুষোত্তম। অন্যজন দেবী।

মুন্তেখাব-উৎ-তাওয়ারিখের পাতা বন্ধ করলেন শাহজাদী। পড়তে পড়তে তাঁর সারা শরীরে পিঁপড়ের মতোই যন্ত্রণা উঠে আসছিল। এত বিদ্বেষ? সেকেন্দ্রায় লালপাথরে তৈরি পরদাদাসাহেবের সমাধিতে গেছেন শাহজাদী। সেখানে গেলে মাথা নিচু হয়ে আসে। কাছেই ফতেপুর সিক্রি। সেখানে বুলন্দ দরওয়াজার গায়ে পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা যীশুর কথা খোদাই করান। আরবি হরফে। এখন তাঁর রাজধানী ফতেপুর-সিক্রির পোড়ো দশা। হয়তো ওসব কথা লতায়-পাতায় ঢাকা পড়ে গেছে। যীশু বলেছিলেন, এই দুনিয়া একটি সেতুমাত্র। সেই সেতু পেরিয়ে এসো। এখানে কোনো ঘরবাড়ি বানিয়ো না। এ দুনিয়ায় যে একটি পলক নিষ্পাপ কাটায়—সে অনন্তের সন্ধান পায়। এ দুনিয়া তো অনন্তের একটি পলক মাত্র।

যে বাদশা এমন কথা খোদাই করান—তিনি কতটা না-পাক কাণ্ডকারখানায় মাতলেন? কতটাই বা হিঁদুয়ানির দিকে ঝুঁকলেন। এসব নিয়ে মাতামাতি করে অন্ধ—নয়তো পাগল। বিদ্বেষে অন্ধ—বিদ্বেষে পাগল। বিদ্বেষেই নফরতির জন্ম। নফরতি থেকেই পাগলামি আসে। ফৈজী, আবুল ফজলের মতো মানুষকে বদায়ূনী কুগ্রহ বলছেন। নিজের দরকারে ফৈজী কখনো কিছু চাননি। চাইলেই আকবর বাদশা তাঁকে তাই দিতেন। এঁদের বদায়ূনী দুশমন মনে করতেন। অথচ এই বদায়ূনীর জন্যে ফৈজী একবার আকবর বাদশার কাছে অনুগ্রহ চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন। আবুল ফজল বলেছিলেন, হিন্দুস্থানে বহু ঈশ্বরের ওপর আছেন পরমেশ্বর। আর সেই আবুল ফজলকেই…

শাহজাদী জাহানারার মনটা ভারি হয়ে এলো। তিনি মোল্লা বদায়ূনীর মুন্তেখাব-উৎ-তাওয়ারিখ যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলেন। লাহোরে কাফিপুরায় মিঞা মীরের আস্তানায় ছোটেভাইয়ের সঙ্গে ঘুরে আসার পর থেকেই জাহানারার কী হয়েছে—সারাদিনে দারাকে একবার না দেখলে মনটা ভরে না। মনে হয়—কী যেন বাকি আছে। কী যেন বাকি থাকলো।

ছোটেভাইয়ের খোঁজে শাহজাদী দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চললেন। বাঁ হাতে আঙুরিবাগ। তারপর আলোয় আলো যুঁইমহল। ওখানে একসময় দাদাসাহেব

জাহাঙ্গীর বাদশার বাদশা-বেগম নূরজাহান থাকতেন। নূরজাহান বেগমকে কী ভালোই বাসতেন দাদাসাহেব। বর্ধমান থেকে ফৌজদার গিন্নিকে তুলে আনার পর বাদশাকে চার চারটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপর মেহেরুন্নিসা রাজি হলেন। তাতে সে কি আনন্দ বাদশার। সেই আনন্দে এই খুইমহল গড়ে তুললেন দাদাসাহেব। সবই ধাইমায়ের মুখে গল্প কথায় শোনা। ছোট থাকতে আম্মিজানকে তো আমরা তেমন করে পাইনি। তিনি যে বারবার মা হয়েছেন।

হঠাৎ শাহজাদীর চোখে বিরাট চওড়া কাঁধের সেই মানুষটির ছবি ভেসে উঠলো। সরু কোমর। তাঁর জন্যে আমার কী আসে যায়? হরিণ-চোখে ছত্রশালের সেই মোহন হাসি নলদমনের কাহিনীর নলরাজার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাগ্যিস ফারসিতে আবুল ফজলের নলদমন পড়েছিলাম। আমি বাদশা শাহজাহানের বড় মেয়ে—বাদশার চোখের মণি। আমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। এই হিন্দুস্থানে কার এমন তাগদ আছে শাহজাদী জাহানারার বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে পারে?

খুইমহল থেকে পাথরের ঢাকা পথ যমুনার জলে বোঝাই শান বাঁধানো নালার ওপরকার টানা তক্তাপোলে গিয়ে মিশেছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শাহজাদী জাহানারা দেখলেন, দুর্গের হপ্তচৌকির জোয়ালো আলোর ভেতর ছোটেভাইয়া শাহজাদা দারাশুকো ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন।

কাছাকাছি এসে ফোটা পদ্মর মতোই ঢলঢলে মুখে শাহজাদা দারা একলাফে ঘোড়া থেকে নামলেন। সন্ধে রাতের বাতাসে স্বস্তি থাকলেও ঘোড়া আর দারা দু'জনেই ঘামে নেয়ে উঠেছে।

কাছাকাছি ছুটে এসে শাহজাদা ঘামে ভেজা হাতে শাহজাদীর একখানি হাত ধরলেন। ধরেই হাসতে হাসতে বললেন, বাজি। এত গম্ভীর? তুমি নজবত খাঁকে বিয়ে করবে কি? আব্বা হুজুর শিকার, তাজমহল, লাল কিলা, নয়া রাজধানী —শাহজাহানাবাদের মসজিদের পাথর বাছাই, দরাঙ্গ খাঁয়ের নয়া রাগ শুনতে এতই ব্যস্ত—কখন বা 'হ্যাঁ' বলবেন। কখনই বা 'না' বলবেন। বলো?

ছোটে ভাইয়ার কথা শুনে—হাসি হাসি মুখ দেখে শাহজাদীর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তবুও নিজের মুখের হাসি নিভতে দিলেন না জাহানারা। শাহজাদা কি আমার মনের কথা জানে না? আমি তো বলেছি। তাই তো মনে হয়। কারও কথা এক মনে ভাবলে মনটাই ভুলো হয়ে যায়। তবে কি আমি ছোটেভাইয়ের সামনে ছত্রশালের কথা তুলিনি? কয়েক বছরের ভেতরেই শাহজাদা দারা হিন্দুস্থানের মসনদে বসবে। নজবত খাঁ তখন হবেন শাহী তাগদ। সেজন্যেই কি দারার এই আগ বাড়ানো আগ্রহ? শাহীর জন্যে নিজের বাজিকে সে কোরবানি দিতে চায়?

বলক্-এর শাহী খানদানের মানুষ নজবত খাঁ। জানবাজ লড়াকু। আজকাল আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান দেওয়ান-ই-আমে বসার সময়ই পান না। শাহজাদীর নজর এড়ায়নি—ইদানীং অন্দরমহল থেকে মেহজাবিন বেগমের ডাক

আসে বড় ঘন ঘন। তাই আজকাল উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ, সিপাহ-সালার, সুবেদারদের সঙ্গে শাহজাদীকেই শলাপরামর্শে বসতে হচ্ছে। এমনকি শাহজাদী নজবত খাঁয়ের সঙ্গেও বলক্ বদকশান নিয়ে পরামর্শে বসেছেন দু'চারবার। বাদশার তরফে।

কিন্তু তাই বলে?—মনে মনে এ কথাটি নাড়াচাড়া করতে করতেই জাহানারা থামলেন।

যেমন এসেছিলেন শাহজাদা দারা—তেমনই তিনি পা দাপিয়ে দুর্গের ভেতর চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আজ রাতেই বাদশার সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলবো। আব্বা হুজুরের মবারকে আজই নজবতের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাটা পাড়বো।

শাহজাদী মনে মনে বললেন, তোমার বাজির জবাবের জন্যে তো দাঁড়ালে না দারা?

অভিমানে চোখ ফেটে জল এলো জাহানারার। শাহীমহলের সব কিছুই মরদানি। মরদের তাগদ, সুখসুবিধা, মসনদের জন্যেই এই দুনিয়া। এখানকার দুনিয়া। এখানে জেনানা শুধু কোরবানির জন্যে। শাহজাদী আনমনে হাঁটতে হাঁটতেই আঙুরিবাগের দিকে চললেন। তাঁকে দেখে গোলাম, বাঁদির দল পিছু হটে তসলিম জানাতে লাগলো। সেসব তসলিমে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই জাহানারার। শুধু একজনের কথাই এখন মনে উঁকি দেয় বারবার। বুন্দেলারাজ ছত্রশাল। আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশা বুন্দেলখণ্ডকে শায়েস্তা করতে কেন শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে পাঠালেন? কেন? কেন? ঝুঝর সিংকে দমন করতে তো শাহজাদা দারাশুকোকে পাঠাতে পারতেন। দারা বুন্দেল লড়াই ফতে করে ফিরলে তাঁর সবচেয়ে আদরের শাহজাদা যা চাইতো—তাই তাকে দিতেন বাদশা। তখন শাহজাদা দারা বলতে পারতো, আব্বা হুজুর! আলা হজরত। আমার একটা আর্জি আছে—

—কবুল করো। হিন্দুস্থানের বাদশার তোমাকে না-দেবার তো কিছু নেই—

—বন্দেগান। আকবর বাদশার একটি কানুন থেকে রেহাই চাই।

অবাক হয়ে তাকালেন শাহজাহান। রেহাই? কোন কানুন? কার জন্যে? তোমার জন্যে দারা?

—না। আমার জন্যে নয় আলমপনা। আমি বাজি শাহজাদী জাহানারার জন্যে বলছি।

—জাহানারা? ঘুরে তাকালেন বাদশা। কোন কানুনের কথা বলছো দারা?

—পরদাদাসাহেব নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন—কোনো চাঘতাই শাহজাদীর বিয়ে হবে না—

—হ্যাঁ দারা। আকবর বাদশা অনেক ভেবেই এই কানুন করে গেছেন। অন্দরমহলে মন কষাকষি এড়াতে এই নিয়ম। মসনদের লড়াই যাতে আরও না ছড়িয়ে পড়ে সে-জন্যেই এই কানুন।

—জাঁহাপনা। খোদ বাদশাই হিন্দুস্থানে কানুন। তিনিও কি তাঁর আদরের

শাহজাদীকে এ-কানুন থেকে রেহাই দিতে পারেন না। বে-রহেম হবেন না আলমপনা।

—তুমি কী চাও দারা?

—আপনি শাহজাদী জাহানারাকে তাঁর পসন্দ-সই খসম বেছে নেবার অধিকার দিন হুজরত।

শাহজাহান খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। জাহানারা যেন নিজেকে দেখতে পেলেন। তিনি নিজে ঝরোকার পেছনে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে বাদশার মুখোমুখি শাহজাদা দারা।

বাদশা শাহজাহান যেন ঝরোকার ফাঁকে-ফোকরে নিজের মেয়েকে চোখ দিয়ে খুঁজে দেখতে চাইলেন। তারপর একসময় নিতান্ত উদাসীন চোখে বললেন, বেশ। তাই হবে দারা—

শাহজাদা দারা হেসে কোমর ভাজ করে হিন্দুস্হানের বাদশাকে কুর্নিশ জানালেন। আনমনা জাহানারাও আব্বা হুজুর বাদশাকে কুর্নিশ করতে গেলেন। ঢাকা পথের নিরেট পাথুরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল। উঃ।

এসব কিছুই ঘটেনি। সবই তাঁর মনের ভেতরকার ছবির ছবি। ছোটেভাই হিসেবে শাহজাদা দারাশুকোর কাছে আমি বড্ডো বেশি আশা করি। সে আমার জন্যে অতটা এগিয়েই বা আসবে কেন? তার এখনও তাজা বয়স। সে হিন্দুস্থানের পয়লা শাহজাদা। বাদশার চোখের মণি। তার সামনে শাহী মসনদ। সে তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সে তো দেখবেই কী কী করলে তার এই মসনদ আরও পাকা হয়—সে মসনদের শেকড় কী করলে আরও গভীরে নামিয়ে দিতে পারে। নয়তো কেন জানতে চাইবে—বাজি। তুমি কি নজবত খাঁকে বিয়ে করবে? বিয়ের বাঁধনে বাজিকে কোরবানি না দিলে যে তার মসনদ মজবুত হয় না। এ দুনিয়াটাই মরদের। জেনানা এখানে না-চিজ—বে-কদরের।

এ আমি কী ভাবছি? ছিঃ। ছিঃ। ছোটে ভাইয়া শাহজাদা দারাশুকো যে একদম অন্য কিসমের ইনসান। কামিল-ই-ইনসান। সে আমায় বলেছে—সারা আসমান থেকে সে একটি শব্দই শুনতে পায়। সে শব্দ নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিজের শব্দ। হাতের পাতা কানে চেপে ধরলে সেই শব্দের শুরুয়াত। যাকে বলে সুলতান-উল-আযকর। সে আযকরে সারা আসমান একদম ভরভরাট হয়ে যায়। দারা—ছোটে ভাই আমার। তুমি আমার হুজুর। আমি তোমার মুরিদ।

বাদশা শাহজাহানের বিশ্বাসী রাজপুত সেনাপতি বুন্দেলারাজ ছত্রশাল। রাজরক্তের ঘরানা তাঁর সারা শরীরে। যেন বা জঙ্গলে সবচেয়ে বড় গাছটিই তিনি। চিনিয়ে দিতে হয় না। দেখেই বোঝা যায়। আর তাঁর মুখের হাসি। সে হাসি আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই। রাত বেড়েছে। বোরখায় আমি এখন সবার চোখের বাইরে। হায়াত-বক্স বাগের ভেতর দিয়ে চলেছি। এখানে এখন যেন ফুলের জলুস চলছে। নানান্ রঙের পাথর দিয়ে সাজানো ফোয়ারা-গুলো যেন সেই উৎসবের খবর পেয়ে গেছে। চারদিক আলোয় আলো।

শাহজাদী জাহানারা যেন পথ হারিয়ে ফেললেন। শীতের কমলালেবু তুলে

নেওয়ার পর শুকনো গাছে আবার পাতা ধরতে শুরু করেছে। একটা মদির গন্ধে জাহানারার যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার দশা। বিশাল একখানি পাথরে গিয়ে তিনি বসলেন। সারা শরীরে একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে। আমি হবো নজবত খাঁয়ের বেগম! যাকে ভালোবাসি না—শাহীর দরবারে তাঁর হুকুম বয়ে বেড়াবো? একদিন বলক্ নিয়ে কথা হচ্ছিল নজবতের সঙ্গে। কী কুটিল চাহনি। গলার স্বর একদিকে যেমন শান্ত, মিষ্টি—অন্যদিকে তেমনি গম্ভীর—ভেতরে ভেতরে যেন আঁতকে উঠছিলেন। তখনই নজবত খাঁ বলেছিলেন, আমি যদি বলকের সুলতান হই তো শাহজাদী তখন হবেন—

সেই মুহূর্তে আমার মনে এই কথাটিই থেকে গিয়েছিল—হ্যাঁ! শাহজাদী জাহানারা হবেন নজবতের…!

দেওয়ান-ই-খাস থেকে বাঁশির করুণ তান। করতালের কলরোল। শাহজাদীর কান বুজে এলো সে শব্দে। তিনি দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চললেন। ঠিক করলেন, দুর্গেরই গোপন গলিতে নিজের মহলের পাশে ছোটে ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করবেন। শাহজাদা দারা নজবতের সঙ্গে তাঁর বাজির বিয়ের কথা পাড়ায় আব্বা হুজুর কী বললেন—সে-কথা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন শাহজাদী। বাদশার রায়ই শেষ রায়। হয়তো বা সে-রায় বেরিয়ে পড়ার আগে বাধা দিলে একটা বাবস্থা হলেও হতে পারে।

দেওয়ান-ই-খাসের পথে একটা শব্দ। ছায়ার মতো দু'জন মানুষের আভাস। একজনের মাথায় ফিকে হলুদ উষ্ণীষ। গায়ে তার নাদিরী জামার ঘন কালো ঝালর ঝুলে পড়েছে। যেন বা সে কুয়োর ভেতর নেমে গম্ভীর গলা ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেওয়ালের ছায়ার আড়াল থেকে জাহানারা দেখলেন—মানুষটি আর কেউ নয়—নজবত খাঁ।

নজবত খাঁ যেতে যেতে তাঁর সঙ্গীকে বললেন, মনে হয় যেন শাহজাদা দারা ভাবছেন—তিনি মসনদে বসে পড়েছেন—আমার হাতে খোলা তলোয়ার থাকতে তাঁর সাধ্য নেই যে তিনি মসনদে বসবেন।

নজবত যতই এগিয়ে যান—শাহজাদীও আড়ালে আড়ালে ততই এগিয়ে যান। নজবত খাঁ আবার মুখ খুললেন—আমার সঙ্গে বাদশা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। মনে হয়—বাদশা তাঁর মেয়েকে কুমারী করে অন্দরমহলে রাখতেই ইচ্ছুক।

একথা বলার সময়—জাহানারা দেখলেন—নজবতের ঠোঁট ঘেন্নায় বেঁকে যাচ্ছে। এরই নাম নফরতি।

হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গীকে নিয়ে নজবত খাঁ চীনে ঝাউগাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গী। সে মানুষটিও কোনো মনসবদার বা আর কিছু হবেন। শাহজাদী পা টিপে টিপে কাছেরই সেঁউতি গাছের ঝোপের আড়ালে গিয়ে দম বন্ধ করলেন। পাছে তাঁর নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়।

নজবত বললেন, বাদশাকে শিগগির তাঁর মত বদলাতে হবে। কেননা তাঁর মসনদ

রাখতে হলে তাঁকে তাগদদারের মদত নিতেই হবে। শাহজাদা খুর্‌রম একদিন জাহাঙ্গীর বাদশার বিরুদ্ধে বাগী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবও একদিন শাহী মসনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। খুর্‌রমের সময় সেই বাগী দিনগুলোর সাক্ষী ছিলেন বাদশা-বেগম নূরজাহান। জাহানারা বেগমের খুবসুরতি আছে। আছে মগজ। সোনাদানা হীরে জহরত। সমস্ত সুরাট বন্দরের আদায় তো তাঁর নামেই জমা হয়। এখন তিনি কিসের সাক্ষী হন দেখা যাক।

আবার নজবত খাঁ এগোতে লাগলেন। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। লালচে গোর মতো দেখতে মানুষটির পা ফেলার ভেতরেই জোস আর ঘমণ্ড একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ রাগী গলায় তিঁনি বলে উঠলেন, আমি কোনো-দিনই জাহানারা বেগমের হাত দু'খানি চাইনি—

এখানে শাহজাদী আড়াল থেকেই মনে মনে বলে উঠলেন, মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা নজবত খাঁ। তোমার চোখ বলতো—তুমি আমায় চাও—আমায় কামনা করো। নইলে শলাপরামর্শে বসেছি তোমার সঙ্গে যখন—যখন আব্বা হুজুরের তরফে তোমার সঙ্গে শাহী ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে বসেছি—তখন তুমি একবারের জন্যেও চোখ তুলে আমার মুখে তাকাতে পারোনি কেন? আমার চোখে চোখ পড়লে কেন কেঁপে উঠতে?

নজবত খাঁ তাঁর সঙ্গীকে বলতে বলতে চলেছেন। কোনদিকে যাবেন—বোঝা যাচ্ছে না। নজবত বললেন, শাহজাদা দারা ঘমণ্ডি। তারিফির কদরদার। তিনিই আমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলেছেন। জাহানারা বেগমকে আমি দেখেছি মাত্র ওড়নার আড়াল থেকে।

সেইটুকুই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়! —মনে মনে এ-কথা বলে শাহজাদী খুব সাবধানে তাঁর দুধসাদা পায়ের পাতার ওপর থেকে একটি বিষ পিঁপড়ে খুব সাবধানে টেনে তুললেন। পিঁপড়েটা এইমাত্র তাঁর পায়ের নরম পাতা কামড়ে ধরেছিল। কিন্তু এখন ব্যথায় একটু শব্দ করারও উপায় নেই। তাহলে নজবত খাঁ সাবধান হয়ে চুপ করে যাবেন। জাহানারা মনে মনে বললেন, ওড়নার আড়াল থেকে আমার মুখের আভাসটুকু দেখলেই কি দিওয়ানা হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

সঙ্গীর কাঁধে ডান হাতখানি রেখে বলকের সুলতান নজবত খাঁ একটি সিঁড়ি ভাঙলেন। এবার নিশ্চয় মহাতব বাগের রাস্তা ধরবেন। শাহজাদী সেঁউতির ঝোপ ছেড়ে কয়েকটি সাইপ্রেস গাছের জটলার আড়াল নিলেন।

নজবত খাঁ তখন বলছেন, শাহজাদীর খুবসুরতির খুশবু তামাম হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে—জানি। তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন—এমন অনেক মানুষই এই আগ্রায় আছেন। বুন্দেলারাজ ছত্রশালকে পুছতাছ করলেই জানা যাবে। কী বলো? আরো অনেকেই জানেন—তাঁদের নাম আগ্রা দুর্গের এই পাথরের দেওয়ালের পাশেই শোনা যায়। কী বলো।

শাহজাদী জাহানারার গায়ে এইমাত্র যেন একটি বিষ তীর এসে বিঁধে গেল। তিনি একদম বনের হরিণী হয়ে নজবত খাঁয়ের কথাগুলো চুপ করে শুনে গেলেন।

নজবত খাঁ ভারি গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি জানি কেমন করে বলক-এর সুলতানির সুনাম রাখতে হয়। চাঘতাই শাহজাদীর বদনে রয়েছে কাফেরের খুন। শাহজাদী জাহানারাকে বিয়ে করে আমার খানদানের সরতাজে কোনো জেবরাত পরানোর দরকার নেই। আমার ঘোড়ার রাশ আমিই টানবো। অন্য কাউকে দরকার হবে না।

জাহানারা বেগম সাইপ্রেস গাছগুলোর জটলার আড়ালে প্রায় ঢলে পড়েন। রাগে, অপমানে, দুঃখে তাঁর দু'চোখ শুকিয়ে উঠেছে। শিরায় শিরায় রক্ত ঢেউ হয়ে ফুটে বেরিয়ে আসবে নাকি?

সঙ্গী মানুষটি বললেন, শাহজাদীর সুনামের খুশবু তো আগ্রার বাতাসে।

নজবত খাঁ যেন সঙ্গীর কথাটি লুফে নিলেন। দরকার হলে কাউকে পাবার জন্যে শাহজাদী প্রাণপণ করতে পারেন। তবে আমি যে-সে লোক নই—তা আমি ভালো করেই জানি। যদি জানতাম—কে শাহজাদীর আশিক—তো আমার তলোয়ার তার মাথার ওপর ঝলসে উঠতো। আমার অন্দরমহলের সব জেনানাই বলক-এর পাহাড়খসা তুহিন সমান সফেদ—আনকোরা।

শাহজাদী জাহানারা এবার নজবত খাঁয়ের সঙ্গীটিকে ভালো করে দেখতে পেলেন। মনে হলো—লোকটা তুখোড় শিকারী। সব সময় নয়া শিকার খুঁজতে ব্যস্ত। চোখে একরকমের চোখা কঠিন চাউনি। জাহানারার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। নজবত খাঁ রাতের লালচে অন্ধকার আসমানে তাকিয়ে।

নজবত খাঁয়ের ওই সঙ্গীটিকে জাহানারা জানতেন। কয়েকবার দেখেওছেন। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। ও শাহজাদা আওরঙ্গজেবের জিগরি দোস্ত। হলে হবে কি—হিন্দুস্থানের মানুষজনের ওপর এক ভয়ঙ্কর নফরতি। নজবত খাঁয়ের হাত দু'খানি ধরে তাঁর সঙ্গী বললেন, ভাইসাহেব ভেবে দ্যাখো একবার—তুমি যদি মুঘল শাহীর সেরা আওরত শাহজাদী জাহানারাকে দুশমনের হাত থেকে ছিনিয়ে নাও—তবে কে তোমাকে আটকাতে পারে? জাহানারা বেগম যখন তোমার অন্দরমহলে ঢুকবেন—তখন সে-মহল হয়ে উঠবে বেহেস্ত। জাহানারা হয়ে উঠবেন কুঁয়ারি।

নজবত খাঁয়ের চোখে পলক পড়লো না। তিনি গমগম করে বলে উঠলেন, আমি যদি কোনো আওরতকে দুশমনের হাত থেকে তাগদের জোরে নিতে চাই তবে সে দুশমন আবার খানদানের সমান সমান খানদানের মানুষ। কিন্তু জাহানারা যদি আমার অন্দরমহলকে খারিজ করে দিয়ে কোনো কাফেরের অন্দরমহলে যায়—তবে সে নিশ্চয় শাহজাদীকে বেহেস্তের হুরীর কদরদারি করে নিজেকে মুকন্দর-কি-সিকন্দার মনে করবে। কী বলো? তাই না। ভাববে—কী নসিব আমার।

শাহজাদী জাহানারা আর শুনতে পারলেন না। সাইপ্রেস গাছগুলোর গুঁড়ির চারপাশে ঝোপের ভেতর তিনি ঢলে পড়লেন। সারা শরীর তাঁর যেন বিষ পিঁপড়েয় কামড়ে ধরেছে। ফের যখন চোখ চাইলেন শাহজাদী—তখন নিশুতি আসমানের শিশিরে তাঁর সারা শরীরের রক্ত নিরেট পাথর-জমা জমে গেছে।

কাছাকাছি কেউ নেই। সামনেই মহতাব বাগে গোলামরা বাতিদান হাতে নিয়ে অন্ধকারে কী খুঁজছে। হাতে হাতে লাঠি। সাপ নয়তো?

শাহজাদীকে কেউ দেখতে পায়নি। জাহানারার ইচ্ছেও নেই—কেউ তাঁকে এখন এই দশায় দেখতে পাক। চারদিকে যূথী, গোলাপ, করবী। বাতাসে তাদের সুবাস। দূর্বার ওপর দিয়ে শাহজাদী আলগোছে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ মনে হলো—যেন কে খুব সাবধানে তাঁর হাত ছুঁয়ে দিলো। সাপের ভয় শাহজাদীকে কাবু করতে পারেনি। বরং একটা বিষঢালা সাপ যেন শাহজাদীর মনে বিষ ঢেলেছে। একটা চোরা ঝরনার পাশে শাহজাদীর খাস হাজিরা কোয়েল কখন এসে বাতিদান রেখে গেছে। খানিক এলিয়ে নেবার জন্যে তার পাশেই ছোট একটা চাঁদোয়া খাটানো সারা।

আওরত হয়ে পয়দা হওয়া কী ভীষণ বে-নসিব। পিঠের বোঝার চাপে ক্লান্ত উট মরুভূমির ভেতর চেঁচিয়ে ওঠে। অসহ্য ভারে। শাহজাদীরও ইচ্ছে হলো—অমন বিকট চিৎকার করে ওঠেন। তাঁর সে চিৎকারে তামাম আগ্রার মানুষ চমকে উঠুক।

মহতাব বাগের ওই শ্বেতপদ্মটির মতোই আমায়—শুধু আমায় কেন? তাবত আওরতকে শুচিশুভ্র রাখতে চারদিকে বেড়া—বেড়াজালের ঘের। কারণ, মানুষ শুচির ভেতর সুবাস খোঁজে। সে চায় একাই আমি এই সুবাস নেবো। কিন্তু আওরতের খুনে যে আগুন—তার খবর কে রাখে! সে-ও তো চায় ফলভারে নুয়ে পড়তে। না পড়তে পেরে নিজনে সে শুকিয়ে যায়। মরদের তাতে কি বা যায় আসে! মরদ এই শুকিয়ে থাকার—শুকিয়ে ওঠার নাম দিয়েছে—খাঁটি থাকা! বাঃ! চমৎকার। মরদের চাহত-এ পড়ে আওরতের দাম বদলায় কি? হয়তো কয়েক পলকের জন্যে। কত তাড়াতাড়ি সেইসব পলক মুছে যায়।

শাহজাদী জাহানারা সেই চোরা ঝরনার জলে তাকালেন। জল হীরে হয়ে ভেঙে পড়ছে। ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। স্বচ্ছ—কিন্তু নির্মম। শাহজাদীর চোখ সেই জলে স্নান করে উঠলো।

নজবত খাঁ। বিশাল শরীর নিয়ে বিরাট খেজুর গাছের মতোই তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে। আওরতের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার তাগদ তোমার নেই। তুমি মূর্খ। রেগে গিয়ে যে ক'টি নাম বলেছো—তার বাইরে তুমি আমার কী জানো? ইনসান যদি ফেরেস্তা হয় তো ছত্রশাল তাই। বনের হরিণী তেষ্টা মেটাতে হিমালয়ের ঝরনার খোয়াব দেখে। আমিও তেমনি তাঁর জানবাজির ভেতর আমার রওশনের খোয়াব দেখেছি।

বাতাস পদ্মগন্ধে ভারি। রাতের বুক খুঁড়ে জোনাকির পর জোনাকি। শাহজাদী একখানি পাথরের ওপর শুয়ে পড়লেন।

হঠাৎ কোত্থেকে ঘুম এসে শাহজাদী জাহানারার দখল নিলো। আগ্রা দুর্গ নিজেই যেন একটা শহর। তবে নির্জন শহর। এখানে কেউ কারও খবর নেয় না। এখানে ঘুমিয়ে পড়া যায়। ফুল ফোটে মহতাববাগে। একা একাই ঝরে

যায়। এখানে জেগে থেকে ষড়যন্ত্র করা যায়। কোতল-কয়েদের হুকুম দেওয়া যায়। আবার দরাজ খাঁয়ের বৈরাগ রাগে গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে পড়াও যায়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বড় আশ্চর্য খোয়াব দেখতে লাগলেন শাহজাদী। রাত নিশুতি! তিনি দেখতে লাগলেন—দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে দুটি সিংহ খেলছে। সিংহটি মাথা নামিয়ে অপমানিত মানুষের মতোই ঘন ঘন গর্জে উঠছে। শাহজাদীর মনে হলো—সিংহীটা দূরে সরে যাওয়ায় সিংহ বড় কষ্ট পাচ্ছে। আবার কোত্থেকে দেওয়ান-ই-খাসের দরবার নিপাট মরুভূমি হয়ে গেল। সেখানে ওরা যুগলে খেলছে। ঝলমলে একটি ঝরনার ধারা। তার গায়ে খেজুর গাছের ছায়া। আসমানে মাত্র একটিই ঝকঝকে তারা। এই-ই তাহলে সিংহের দুনিয়া। মাত্র এইটুকু দুনিয়া ওদের? খোদা এই সামান্য দুনিয়ায় ওদের এত শক্তি দিলেন কেন? তাবত এই দুনিয়ার ভেতর শুধু আমিই একা। বিয়ের বাসরের আলোয় নিয়ে গিয়ে আমায় কি কোনোদিন কেউ মুক্তি দেবে? এই নির্জন দশা থেকে মুক্তি? লাল আসমান। তার ভেতর থেকে ভেসে উঠলো একটি সাদা উষ্ণীষ। আর দুটি ঝকঝকে চোখ।

ভোররাতে উঠে বসলেন শাহজাদী জাহানারা। সারা গায়ে ব্যথা।

এমনই ভোরে ঘুম ভাঙলো শাহজাদী রোশনআরার। শাহজাদী মহলের দোরে দুর্গের এক ফাঁক দিয়ে চাওড়া মতো এক চাদর রোদ এসে মেঝের গালচে বনাত ছুঁয়ে আছে। আরশিতে নিজেকে দেখলেন রোশনআরা। তারপর দুর্গের গলিপথে তাকালেন না। সেখানে রাতের কোনো পাহারা বাঁদি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলি পথে দাঁড়ালেন শাহজাদী। যা ভেবেছেন! ভোরের আলো ফুটতে বাকি। আবছা আঁধারে নিথর হয়ে পড়ে আছে বিষণ।

চওড়া বুক। আঁধারে মিশে আছে চিবুকের ঘন কালো দাড়ি। ভারি নিঃশ্বাসে বুকটা উঠছে—পড়ছে। শক্ত চোয়াল—মুখের হাড় হাড় ঝিক যেন বা কোনো মূর্তির। রোশনআরার একবার মনে হলো—আহারে। কতবার কোড়া মেরেছি। হাত বুলিয়ে দিই বুকে। নিজের অজান্তে শাহজাদী বসে পড়েছিলেন। ঝুঁকে পড়ে নিজের ডান হাতখানা এগিয়েও দিয়েছিলেন। কী মনে হতে পিছিয়ে নিলেন সে হাত।

উঠে দাঁড়ালেন। হাতিপোল দরওয়াজার টানা তক্তাপোলের যেন বিশাল এক তক্তা হয়ে পড়ে আছে বিষণ। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচুলি খোলার জন্যে ওকে ডেকে এনে কষ্টই দিয়েছি। হাজার হোক মরদ তো। একদম আলিসান মরদ। যত তাগদই ধরুক না কেন—আমার মতো আওরতের ছবি যদি চোখের সামনের আরশিতে ফুটে ওঠে—তবে তা দেখে না ডরাক—ভিরমি তো খাবেই! মগজ তো গুলিয়ে যাবেই।

—আহারে! —বলতে বলতে শাহজাদী রোশনআরা এসে ফের আরশির

সামনে দাঁড়ালেন। আগ্রায় তখন ভোর এসে গেছে। আরশি জুড়ে লালচে গোলাপি একটি শরীর। সে শরীর দেখার মতো। নিজেই নিজের তারিফদারি করলেন রৌশনআরা। তারপর বিড়বিড় করেই বললেন, তাও যদি বাজি জাহানারা বেগমের মতো তোয়াজ—শাহী শান-সওকতে থাকতাম।

এগিয়ে গিয়ে ডানপায়ের ডগা দিয়ে বিষণের পাঁজরে খোঁচা দিলেন রৌশনআরা। বিষণ সে খোঁচায় পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দু'হাতে শাহজাদীর পা জড়িয়ে ধরলো ঘুমন্ত চোখে। রৌশনআরা স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর পায়ে বিষণের চওড়া রোমশ হাত ঘষে যাচ্ছে। এ স্বাদ এর আগে কখনো পাননি শাহজাদী। তাঁর দম বন্ধ হয়ে এলো। সারা আগ্রা দুর্গের মহলের পর মহলে এখন শুধুই ঘুম। স্রেফ হাজিরা, দাখিলারা ছাড়া কেউ এখনো বিছানা ছাড়েনি। মোরি দরওয়াজার দিক করে হাতিরা পর্যন্ত আধোঘুমে। দু'একটা বাচ্চা হাতির বুক চেরা আওয়াজ শুধু মাঝে মাঝে কানে আসে।

তড়াক করে উঠে বসলো বিষণ। বসেই দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই ভাঁজ হয়ে কুর্নিশ।—সবই তৈরি আছে শাহজাদী। চরে ঘোড়া মজুদ মালকিন। আপনি গেলেই আমি সংগে সংগে দৌড়বো। একদম পাশে পাশে। যেমনটি বলেছেন—

ভোরের প্রথম আলোয় ঘুম চোখের এই গোলামটিকে আজ বড় ভালো লাগলো শাহজাদীর। তিনি শুধু হাসলেন। কোনো কথা বলতে পারলেন না তখনই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, বিষণ নামে এই তাগড়া গোলামটির দিল আর জানের মালিক আমি। অন্য কেউ নয়। শুধু আমিই ওর মালিক। আমি বললে ও শ্বাস ফেলবে। আমি বারণ করলে ও আর শ্বাস নেবে না। ওর ডান হাতে কোড়া মেরে আমিই বলতে পারি—বাঁ হাত এগিয়ে দাও। দেবে। না করবে না। কোড়া খাবে। মারা হয়ে গেলে বলতে পারি—যাও। কোড়াটা জায়গা মতো রেখে দাও। তাও দেবে। বেশ গুছিয়েই রেখে দেবে।

এত ভোরে এমন হাসিমুখে শাহজাদীকে কখনো দেখেনি বিষণ। সে ঘাবড়ে গেল। তড়বড় করে বলে উঠলো, মালকিন! ঘোড়াকে দানা দিয়েই রাত থাকতে তৈরি রেখেছি চরে—

শাহজাদী বুকের ওড়নাটা ইচ্ছে করেই মেঝেতে ফেলে দিলেন। সেখানে ঢোলা জামার খোলা বুকে যেন লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো। বিষণ চোখ নামিয়ে নিলো।

রৌশনআরা বললেন, তুমি আবার শুয়ে পড়ো বিষণ।

এমন শান্ত এ কথায় ভীষণ ভয় পেল বিষণ। আমার উঠতে দেরি হয়ে গেছে। উঠে আপনাকে ডেকে দেবার কথা ছিল। এ ভুল আর হবে না। এবারের মতো মাফ করে দিন।

ভয়ে শুকিয়ে আসা বিষণের মুখে তাকালেন শাহজাদী। তাকিয়ে ফের হাসলেন রৌশন। হেসে বললেন, তুমি ইংলিশস্তানের হেকিম সাহেবের হাভেলি দেখেছো?

বিষণ মাথা নেড়ে জানালো—দেখেছে।

—ভিতরে গ্যাছো ?

মাথা নেড়ে বিষণ বললো—গ্যাছে। শাহী মহলে ডেকে আনার জন্যে সে গোব্রিয়েল ব্রাউটনের হাভেলিতে গিয়েছে।

—ওখানে নাচ হয়। দেখেছো ?

—হুঁ। দূর থেকে মালকিন—

—সে কেমন নাচ ? শুনেছি—জেনানা আর মরদ হাত ধরাধরি করে নাচে ?

—হুঁ। ফৈজাবাদি কয়েকজন তওয়াইফ নাচনেওয়ালি ওখানে আসে—

—তুমি কী করে জানলে বিষণ ?

—আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ব্রাউটন সাহেবকে নিয়ে জোর চর্চা হয় মালকিন।

—এসো—বলেই দু'খানি লতানো হাত বিষণের সামনে মেলে ধরলেন রোশনআরা। সে হাত দেখে রীতিমত অবাক হলো বিষণ। এত নরম, সুন্দর হাত। এই হাত কোড়া দিয়ে তাকে নিত্যদিন মারে ? আশ্চর্য! এতদিন হয়ে গেল এসেছি আগ্রায়। আমার এখনো এখানে অনেক কিছু দেখা বাকি।

—এসো বলছি—

বিষণ বুঝলো, শাহজাদীর গলা জড়িয়ে আসছে। এমন এসে থাকে সময়ে সময়ে।

—এসো। নাচি—

আতঙ্কে দু'খানি হাত এগিয়ে দিলো বিষণ। ওরা দু'জন ঘুরতে ঘুরতে গলিপথ ছেড়ে আরশির সামনে এসে পড়লো। বিষণ যেন এক জাগা-খোয়াবের ভেতর ভাসছে। তার নাকের সামনে মোলায়েম কোনো আতরের ঝুলন্ত সুবাস। সবটাই আজগুবি। হিন্দুস্থানের এক শাহজাদীর হাত ধরে নিতান্তই এক গোলাম এমন ভোরবেলায় নাচছে। অথচ সব সত্যি।

রোশনআরা হালকা ঘূর্ণী থেকে বেদম ঘূর্ণীতে পা পাল্টাতে লাগলেন। বিষণ কোনোদিনই নাচেনি নিজে। সে আগ্রার লালচকে একদিন এক নাচনেওয়ালির নাচ দেখেছিল। রানাদিল না কী যেন তার নাম। এমন দামদামড়ি তার কোনোদিনই জমেনি—যা কিনা সে শয়তানপুরার কোনো কোঠায় গিয়ে নাচনেওয়ালির পায়ে ঢেলে দিয়ে আসতে পারে।

শাহজাদীর সঙ্গে তাল রেখে বিষণ কিছুতেই পাক খেতে পারছিল না। পারবে কী করে! একবার শাহজাদী তাকে বুকের ওপর টেনে নেন। আবার সরিয়ে দিয়ে নিজেই ঘূর্ণী হয়ে বেদম জোরে পাক খান। ফের তাকে টেনে বুকের ওপর ফেলেন। নিজের দাড়ির নিচে ঠিক বুকের ওপর শাহজাদীর মাথা—মুখ, নিঃশ্বাস—তার বুকের ভেতর কী এক ভয়ের গুড়গুড়ি তুলে দেয়।

বিষণের সব গুলিয়ে গেল। নিজেরই পায়ে পা বেঁধে সে মেঝের বনাতের ওপর ছিটকে গিয়ে পড়লো।

—আঃ! এ যে ভয়েই মরে! —বলতে বলতে নিজেই ঘূর্ণীর ভেতর খচ করে থেমে দাঁড়ালেন শাহজাদী। এত ভয় কিসের ? এখানে তো শুধু তুমি আর

আমি। এসো—

বলতে বলতে ফের সেই সুন্দর দু'খানি হাত বিষণের দিকে মেলে ধরলেন রৌশন।

—না মালকিন। আমায় মাফ করুন। আমায় ফাঁসি দেন তো সে-ও ভালো। আমায় আর নাচতে বলবেন না।

খিলখিল করে হেসে উঠলেন শাহজাদী। তারপর খুবই মিষ্টি করে বললেন, কেন-ও-ও? কী হলো?

শাহজাদী যেখানে রৌশনআরা—আবার তাঁর গলা দিয়ে যখন এত মধু ঝরে পড়েছে—তখন না জানি সামনে কী নাচছে! একটু আগেই না ফের শুয়ে পড়তে বলছিলেন। চাই কি এখুনি বলতে পারেন—শুয়ে পড়ো বিষণ। আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকো সিধে। আমি কোড়া মারবো দশ ঘা। উঠবে না কিন্তু।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে রীতিমত আঁতকে উঠে বিষণ বললো, আমি নাচ জানি না মালকিন—

—এ নাচ আবার জানতে হয় নাকি! এ তো আর গুলরুক বাইয়ের কথক নয় বিষণ। এসো—

—না মালকিন।

—কেন? শরীর খারাপ হলো?

কোনো জবাব দিলো না বিষণ। শাহজাদী এগিয়ে এসে গোলাম বিষণের ঢোলা জামার ভেতর বুকে তাঁর ডান হাতখানি চালান করে দিলেন। এই গোলামের শরীর গরমের সময়কার সরোঠার পানির মতো ঠাণ্ডা থাকে সবসময়। কী হয়েছে? আমায় বলো। —বলতে বলতে বিষণের মরদানি শরীরে লেপটে গেলেন শাহজাদী। বলবে না? কী হচ্ছে ভেতরে? ফের? সেদিনকার মতো?

ভেতরে ভেতরে একসঙ্গে অনেক কিছু হচ্ছিল বিষণের। সেসব গুছিয়ে বলার ক্ষমতা নেই তার। শিরায় শিরায় রক্ত ফুটে উঠে বেরিয়ে আসে। বিষণ একদম বোবা হয়ে গেল। কোনদিনকার কথা বলছেন শাহজাদী—তা মনে করে উঠতে পারলো না বিষণ। সে রৌশন আরার এক এক দিনকার এক এক রকমের খেলার পুতুল মাত্র। পা দিয়ে খোঁচানোর শোয়ানো পুতুল। হাত সুখ করে কোড়া মারার দাঁড় করানো পুতুল।

—কী? বলবে না? —বলতে বলতে কঠিন হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন শাহজাদী। ডানহাতে অভ্যেসবশে সরকার নাসিকের মোষের চামড়ার কোড়াটি তুলে নিলেন। নিয়েই তাঁর হাত উঠতে লাগলো। পড়তে লাগলো। এসব সময় বিষণের ব্যথায় কাতরানোও বারণ। সে তাই কোড়া খেয়ে একদম চুপচাপ নিজের শরীরের নানান জায়গা—হাত, পিঠ—যতটা পারে শাহজাদীর কোড়ার মুখে যাকে বলে এগিয়ে দিয়ে মেলে ধরতে লাগলো।

এতক্ষণে সকালের রোদে রৌশনমহল হেসে উঠেছে। বাইরে রোদ যত চড়াই হোক—দুর্গের ভেতর মহলে মহলে ঢুকতে পারে শুধু তার আলোর আভা।

রোদের ছাট। কেননা দুর্গের গায়ের চাঝায় আটকে গিয়ে স্রেফ আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। সেই আলোয় বিষণ এখন দেখতে পাচ্ছে শুধু একখানি বাহুমূল। শাহজাদীর। বড় মনোহর। বড় কষ্টের। যেমন সুন্দর —তেমনি নিষ্ঠুর। ওই মূল থেকে রোশনআরার ডানহাতের শুরু। সেই হাতেই কোড়া।

রোজকার মতোই ক্লান্ত হয়ে শাহজাদী কোড়াটা ছুঁড়ে দিয়ে পালঙ্কে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন। পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রীতিমত না-পারা পড়ুয়ার মতোই মাথা নিচু করে বিষণ কোড়াটা কুড়িয়ে জায়গা মতো গুছিয়ে রাখলো। এই সময়টা সে দূরে চলে যায়।

ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতি রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাতের খোয়ারি ভেঙে জেগে ওঠে। আজ একটু দেরিই হলো। রোদে গরমের আভাস। গা চিড়বিড় করে উঠতেই সে এক গড়ান দিয়ে পটাং করে উঠে দাঁড়ালো। সিধে মোরি দরওয়াজা পেরিয়ে এই সময়টায় সে যমুনার জলে গিয়ে পড়ে। তাতে যেন সারা রাতের ময়লা ধুয়ে যায়। আজও এক ছুটে সনাতন হাতি যমুনার পাড়ে এসে জলে গিয়ে পড়বে পড়বে—এমন সময় একটানা কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে থেমে গেল। অনেক সময় মনের দুঃখে কোনো কোনো বাঁদি এসব জায়গায় এসে ঝোপের আড়ালে বসে চোখ ভরে কেঁদে নেয়। কিন্তু এ-গলা যে মরদের।

—কে? সাত সকালে কে আবার কাঁদতে বসলে?

যমুনার ভাঙা পাড় ধরে খানিক এগিয়ে একটা কচি আঁশফল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসা বিষণকে দেখতে পেল সনাতন। সে আগ্রায় কোনো মরদকে কোনোদিন এমন হাপুস হুপুস করে কাঁদতে দেখেনি। বিশেষ করে এমন তাগড়া জোয়ানকে।

বিষণ চোখ খুলে কাঁদছিল। চোখের জল এসে কালো দাড়িতে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে যেন আহ্লাদেই হেসে উঠলো সনাতন। কী হলো? কেউ মারা গেছে?

মাথা নাড়লো বিষণ।

—তাহলে? কেউ হারালো?

এবারো মাথা নাড়লো বিষণ।

—তবে? কোথায় থাকা হয়? লালচকে? বনজারাদের গোলায়? গেঁহুর হিসেব মেলেনি?

—উঁহু। বলে আঙুল দিয়ে দুর্গ দেখিয়ে দিলো বিষণ।

—ওঃ। তাই বলো। তা তোমাকে তো কোনোদিন দেখিনি। কামারশালে আছো?

—না।

—তাহলে তো তুমি গোলাম। তাই বলো। গোড়ায় ভেবেছিলাম—তুমি বুঝি ইস্পাহানের সিরাজি কারিগর। তামার হাপরদারি করো দুর্গের কামারশালে।- তা কোথায় লেগেছে?

বিষণ অবাক হয়ে সনাতনের মুখে তাকালো। চোখ দেখা যায় না। যেমন চুল—তেমনই দাড়ি। কাঁচাপাকা। তাতে ধুলো উড়ছে।

সনাতন ফের বললো, কোথায় মেরেছে? দেখি—

কোনো কথা না বলে বিষণ নিজের হাত দু'খানি এগিয়ে ধরলো। তারপর গোলামদের গায়ে দেবার খাটো খান্দেশি আঙরাখা একটু তুলে ধরে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো সনাতন হাতি।—আরে! নামাও। আঙরাখা নামাও বলছি। আমি আবার ওসব একদম দেখতে পারি না।

বিষণ জামা নামিয়ে নিলো। সনাতন জানতে চাইলো, কোন মহলের গোলাম গো তুমি?

নিচের ঠোঁট দাঁতে চেপে বিষণ কোনোরকমে বলতে পারলো, রৌশনমহল—

—ওরে বাবা! যা শুনি—তাতে আছো কী করে ওখানে? চলো দেখি কী দাওয়াই দেওয়া যায়। আমার যে আবার হাতি নিয়ে কারোবার। এখন কোথায় তোমার দাওয়াই পাই? কী দিয়ে ইলাজ করি?

লেজে বুনো মাছি তাড়াতে তাড়াতে হাতিদের লেজের গোড়ায়, বালাণ্ডির শুরুতে আর দাবনাতে তো বটেই—প্রায়ই ছালওঠা ঘা হয়ে যায়। তাতে ইলাজে সবসময় হেকিমি মলম যোগাড় রাখতে হয় পিলখানায়। মনে মনে তাই ভেবে সনাতন বিষণকে নিয়ে ফের মোরি দরওয়াজা দিয়ে আগ্রা দুর্গে ঢুকলো।

সকালের রোদে মুঘল শাহীর অফুরন্ত তাগদের ছবি হয়ে উঁচু-উঁচু হাতির দল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা বদলাচ্ছে—লেজে মাছি তাড়াচ্ছে। সামনে তাদের অঢেল খাবার। অঢেল স্বস্তি। আর আমি সনাতন হাতি এই তাগদের দেখভাল করি। ওদের খাওয়াই। রোগ হলে সারাই। ওদের মাদীরা গাভিন হলে বাচ্চা পয়দা করাই সাবধানে—যাতে কিনা মা আর ছানা দুটোই ভালো থাকে—তাগদ পায়—তাগড়া হয়ে ওঠে। অথচ আমার ছানা দুটোই এই শাহীর হামলায় হারিয়ে গেল। ছানা দুটোর মা এক ঝলক দেখা দিয়েই কোথায় যে উবে গেল। কে জানে!

এই বোবা, নিশ্চিন্ত, সুখী, শাহী-হাতির পালের সামনে নিজেকে ভীষণ নিরুপায় লাগলো সনাতনের। রাগে, বুক বেয়ে গলায় উঠে আসা দলা পাকানো কান্নায় কিছুক্ষণ কোনো কথাই ফুটলো না সনাতনের মুখে। সে তাগড়া তাগড়া বেহেদর হাতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্গের ত্রাস—রৌশনমহলের খাস গোলাম আরেক তাগড়া বিষণের পিঠে—হাতে কোড়ার মোটা চামড়া-চাবুক বসে যাওয়া জায়গায় জায়গায় ঢালাওভাবে হাতিদেরই ইলাজের মলম মাখিয়ে দিতে লাগলো। যেন বা মুঘল শাহীর মুখের ওপর এই তার জবাবি বাগীপনাহ্।

ব্যথায়, আবার শাহী পিলখানার খোদ ফিল-ই-বর্কাসর নেকনজরে পড়ে যাওয়ায় খুশিতেও বটে—বিষণ আঃ! উঃ! করে উঠছিল মাঝে মাঝে।

—তার ভেতরেই হাতে মলম লাগিয়ে দিতে দিতে সনাতন বললো, মহল বদল করে নাও না কেন? জাহানারা মহল, দারামহল—কত তো মহল আছে দুর্গে—

—আমি যে শাহজাদীর জিম্দা-পসন্দ গোলাম।

—ওঃ! কবেকার?

—সে অনেকদিন আগের। তখন শাহজাদী ছোটটি—আমিও এমন বড় হইনি।

॥ একান্ন ॥

সনাতন হাতি আগ্রা দুর্গে এমন তাগড়া গোলাম দেখেনি অনেকদিন। যাও বা দেখা যায়—তারা কামারশালের কারিগর—নয়তো তাতার বা হাবসি। হিন্দুস্থানি গোলাম বাঁদি যা দু'চারটে তাগড়া চোখে পড়ে—তারা বছর না ঘুরতেই কেমন ভিস্তির জলভরার কাঁচা চামড়ার চোপসানো চেহারা পায়। এরা অনেকেই যমুনার ওপার থেকে সকাল সকাল আসে। সন্ধে সন্ধে ঘরে ফিরে যায়। আবার অনেকেই এই দুর্গে থাকে।

সনাতন কেটে বসা জায়গায় জায়গায় বেশি করে মলম লাগিয়ে এক সময় বললো, পালালে পারো।

—কোথায় পালাবো! কিল্লাদারের নজর ফসকে বেরনো কঠিন।

সনাতন আর বিষণে কথা হচ্ছিল আগ্রার বাজার এলাকার চলতি জবানে। এ জবানও শ'খানেক বছর ধরে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে। মুঘলশাহীর বারো জাতের ফৌজ বারো ভাষায় কথা বলতে বলতে—তাঁবু গেড়ে কুচ করতে করতে আগ্রা আর তার আশপাশে ফারসির সঙ্গে তুর্কি, তুর্কির সঙ্গে হিন্দুস্থানির, হিন্দুস্থানির সঙ্গে উজবেকি জবান মিলিয়ে গুলিয়ে এ এক আজিব জবান পয়দা করে বসে আছে। সেই জবানই এখন রাজধানীর আম-আতরাফ মানুষজনের ভেতর চালু। ঘোড়ার কারবারি থেকে সরাইওয়ালা—সবাই এখন এই জবানে কথা বলে। এ জবান কোনো দেশের ভাষা নয়—অথচ সব দেশের কথা মিলিয়ে পয়দা হয়েছে।

এই আজিব উর্দু জবানে বাদশা থেকে আমির-ওমরাহ কেউ-ই কথা বলবেন না। বলবেন না মনসবদার কিংবা জায়গিরদার। কিন্তু নিত্যদিনের কাজ-কারবারে ক্রৌরি থেকে তসিলদার, টাঁকশাল-দারোগা থেকে কোতোয়াল, সবাই সারাদিন তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে এই উর্দু জবানেই কাজ-কারবার সারে।

সনাতন ঠিক ধরতে পারছিল না—বিষণ আসলে কোন সুবার মানুষ। চেহারা সুরত তো বলে দাল-রুটি খাওয়া ফৈজাবাদি পরদায়িস। সে বাজিয়ে দেখার জন্যে বললো, আসলে তুমি পালাতে চাও না তাই বলো।

এ কথায় বিষণেরও যেন কেমন লাগলো। শাহী ফিল-ই-বকসি কিছু কম কেউ-কেটা নন। ফেলনা তো নয়ই। সে কেন পালাবার কথা মগজে ঢোকাতে চাইছে? ব্যাপারটা তো সুবিধের নয়। তাকে বাজিয়ে দেখছে না তো? আসলে লোকটা শাহী দেওয়ানখানার হয়ে দুর্গের ওপর নজর রাখতে গিয়ে আমায় পরখ করে দেখছে। শাহী হাতির বকসিগিরি করার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো গোপন খবর

রাখার জন্য কাসীদগিরিও চালায়। কোনো কথা বললো না বিষণ।

সনাতন বললো, তোমরা দুর্গের ভেতর মহলে মহলে ঘোরাফেরা করে থাকো। অন্দরমহলে শাহজাদী শাহজাদাদের খিদমতে লেগে আছো। আমি পড়ে আছি মোরি দরওয়াজায়। বাকি জীবনটা কেটে যাবে হাতি আর সিংহের গু-গোবরের গন্ধ শুঁকে শুঁকে—

এ কথাতেও কোনো রা কাড়লো না বিষণ। সে বুঝতে পারছিল—আগ্রা দুর্গে—দুর্গের বাইরে যমুনার বুকে—রাজধানীর মান্ডিতে মান্ডিতে আবার এখন একটা নতুন দিন শুরু হয়ে গেল। অন্দরমহলে হাজিরা বাঁদি গোলামরা এখন বদল হবে। দিনের হাজিরা, দাখিলারা সব এসে যাবে। কিন্তু তার কোনো বদল হবে না। শাহজাদী রোশনআরা ডাকলেই তাকে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াতে হবে।

সনাতন বললো, দুর্গের বাইরেটা তোমার ভালো লাগে না?

বিষণ সাবধানী গলায় বললো, বিশেষ না।

এ কথায় সনাতন বেশ অবাক হলো। একথা বলছো কেন? বাইরেটা কত বিরাট।

—মোটেই বিরাট নয়। আগ্রা দুর্গের চেয়েও ছোট। আমাদের মতো গোলামের দুনিয়ায় চৌহদ্দি তো কোড়া—নয়তো চাবুক! তা দুর্গের বাইরে থাকলে তো থাকতাম কোনো কারোবারি কিংবা ফৌজি মানুষজনের গোলাম হয়ে। নয়তো কোনো বনজারা ফৌজি রসদ যোগানদারের গোলায় বা কোনো রসুইখানায় চৌপর দিন ফরমাশ খাটুনির গোলামি করে। উঠতে বসতে হুকুমদারি। ভুল হলেই সাজা। তার চেয়ে অনেক ভালো আছি। একজন শাহজাদীর অন্দরমহলে কোড়া খাই আর চাবুক খাই—তাও ঢের—ঢের ভালো আছি। বাইরের ওই আগ্রাকে আমি চিনি। ভালো করেই জানি।

মলমডলা হাতখানি সনাতন বিষণের চোখের সামনে তুলে ধরলো। ধরে বললো, এই তোমার ভালো থাকা! অন্দরমহলে গোলামি বাবদে ছায়ায় থেকে—শাহজাদীর নাজুক ফরমাশ খেটে—পড়ে থাকা খোবানি খরমুজ খেয়ে চাবুক-কোড়া এখন গায়ে সয়ে গেছে।

বিষণ ফিরে তাকালো। কাছেই পিলখানায় একটা সিংহী মাথা নিচু করে চাপা গর্জনের তোড়জোড় করছে।

—পড়ে থাকা খোবানি খরমুজ আমি খাই না। শাহজাদী আমাকে ওসব দেনও না।

—শুধু কোড়া দেন।

—হ্যাঁ, তাই দেন। শুধু যখন রেগে থাকেন। যখন তাঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। মগজে জিন ভর করে।

—আর এমনি সময়ে?

বিদ্যুতের ঝলকের মতোই শাহজাদী রোশনআরার এমনি সময়টা বিষণের মাথার ভেতর ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। সেসব সময়ের কথা হিন্দুস্থানে

বলা যায় না। দুর্গের এই পাথুরে দেওয়ালেরও কান আছে। সেসব সময়ের কথা ছবি হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলেও বিষণ কেঁপে ওঠে। মুঘল শাহীর দুসরি শাহজাদীর পায়ের নখের ডগাও কেউ দেখতে পায় না। দেখলেও তাই নিয়ে কথা বলা মানে ধড়ের ওপর মুন্ডুটি হারানো। এমনি সময়ে বিষণকে যে সব দশায় পড়তে হয় তার সাক্ষী রৌশনমহলের আরশি, আগেনগার, সুখদোলা আর পাথরের দেওয়াল, রঙের কাজ করা ঘরের চাঁদোয়া।

—এমনি সময়ে শাহজাদী ভীষণ ভালোমানুষ।

মনে মনে সনাতন ভাবে হিন্দুস্থানে মুঘলশাহীর হাজারো চাবুক—কোড়ার নিচে পড়ে পড়ে মার খেয়েও এই আহাম্মকগুলোই সেই শাহীর ধ্বজা ধরে আছে—শাহীকে টিকিয়ে রেখেছে। এরা কোনোদিনই বুঝবে না। এরাই মুঘলশাহীর শেকড়ে জল ঢেলে চলেছে। সেই জলের অন্য নাম—অগাধ বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি। ভেতরটা আক্রোশে, দুঃখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল সনাতনের। সে খুব নিষ্পাপ গলায় জানতে চাইলো, তা সে ভালোমানুষের অন্দরমহলখানি কেমন?

—যেমন হয়ে থাকে।

—দরওয়াজার কপাটে মণি-মুক্তো বসানো?

হো হো করে হেসে পড়লো বিষণ।—আরে। না না। দুর্গের আর সব মহলেরই মতো।

—ঠিক কেমন বলো তো?

—ওঃ! তুমি দ্যাখোনি বুঝি।

—আমরা দেখবো কোত্থেকে। বছরের পর বছর পড়ে আছি তো এই মোরি দরওয়াজায়।

মহতাব বাগ থেকে ডাইনে লম্বা ঢাকা পথ। চারমানুষ সমান পাথুরে গলিপথের মাথায় পাথরের নিচু ছাদ। সেখান থেকে বেরলেই গোয়ালিয়র সড়কের মুখোমুখি ঢালাও খোলা চত্বর। সে চত্বরের পুবেই লাগোয়া রৌশনমহল।

—মহতাববাগও দেখিনি। খোলা চত্বরও কোনো দিন দেখবো না।

—ওঃ! তাও তো ঠিক। সে চত্বরে দাঁড়ালে সারা রাজধানী দেখা যায়। দূরে লালচকের হামামখানা চেনা যায়।

—তা তোমরা থাকো কোথায়? অন্দরমহলের অন্দরে? না, চত্বরে পড়ে পড়েই রাতটা কাটিয়ে দাও?

—তা কেন? শাহী অন্দরমহল বলে কথা। যেখানে অভ্রের বাতিদানে আলো জোরালো করতে কর্পূর ছিটোবার কর্পূরদানি রাখবারও জায়গা আগে থেকে ঠিক করা আছে—সেখানে গোলাম-বাঁদিদের জন্যে ঘুমিয়ে নেবার জায়গা থাকবে না? হাসালেন আপনি।

সনাতন হাতি রীতিমত অস্থির গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, আহা বলোই না। হেসো পরে। সারা জীবন ধরে হাসবার সময় পাবে অনেক। জায়গাটা কেমন? গরমের দিনে গরম লাগে? শীতে—শীত?

বিষণ মনে মনে কেঁপে উঠলো। জানবার জন্যে এত অস্থির? এত জানতে চায় কেন? সে স্রেফ বলে বসলো, কেমন আবার? যেমন হয়ে থাকে। আলাদা করে এমন কিছু নয়।

—তবু?

—অতশত আমার মনে থাকে না।

—যেখানে থাকো—যেখানে তোমার ওঠা-বসা—তা মনে থাকে না?

—ভুলে গেছি।

—অ।—বলে চুপ করে গেল ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতি। সে বুঝতে পেরেছে—কোড়া খাওয়া এই তাগড়া জোয়ান আগাপাস্তলা একজন গোলাম। সে তার গোলামির ইমান ধুলোয় লুটোতে দেবে না। নিজের মনের ভেতরেই সনাতন একা একা নিঃশব্দে হাসলো। গোলামেরও ধর্ম আছে। সে ধর্ম হুকুমবরদারি। আবার মালিকেরও ধর্ম আছে। সে ধর্ম হুকুমদারি। সে হুকুমের এপাশ-ওপাশ হলেই সাজা, চাবুক, কোড়া। যে যার ধর্ম মন দিয়ে করে চলেছে। ধর্ম করো। ধর্ম করো। সবাই মিলে যে যার ধর্ম করে চলো। আর বেহেদের হাতির মতো সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে চলা মুঘলশাহী তার শেকড় হিন্দুস্থানের জমিনের গভীরে—আরও গভীরে চালিয়ে দিয়ে চলতে থাকুক। বাকি হিন্দুস্থান মরে যাক।

বিষণ একটু একটু করে অস্থির হয়ে পড়ছিল। এখুনি রৌশনমহলে তার একবার যাওয়া দরকার। বলা যায় না—শাহজাদীর হয়তো খেয়াল চাপলো—এখুনি যমুনার চরে যাবেন—সেই বেয়াড়া তুর্কি ঘোড়াটাকে চাবুকে চাবুকে পোষ মানাবেন। বাদামি রংয়ের ঘোড়াটা চরের নরম বালিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে সবটা দানাই সাবাড় করে বসে আছে নির্ঘাত। ঘোড়া ছুটবে। তার পাশে পাশে বিষণ ছুটবে। বালি ভেঙে। নিচু জোলো জায়গা ভেঙে। ঘোড়ার পিঠে বসা শাহজাদীর জিন-বলগার দিকে ছুটতে ছুটতেই নজর রাখতে হবে বিষণকে। তখন রৌশনআরার দুই উরুর ওপর মসলিনের শালোয়ার চরের বাতাসে ফুলে উঠবে।

বিষণ ফিল ই-বর্কাস সনাতন হাতির মুখে তাকালো। ধুলো মাথা কাঁচাপাকা এক মাথা চুল ঠিক কোন জায়গা থেকে সমান ধুলোটে—প্রায় চোখ ঢেকে ফোলা আগাগোড়া সাদা দাড়ির সঙ্গে এসে মিশেছে—তা আলাদা করে বের করার কোনো উপায় নেই। সেই চুল-দাড়ির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানুষটা মোরি দরওয়াজা, চর যমুনার যেটুকু চোখে পড়ে—সেদিকে তাকিয়ে। সাত সকালেই মানুষটাকে ঘিরে বুনো মাছির ঘূর্ণী। মাছিদের আর দোষ কি। চৌদিকে তার কড়া শরাবের নাক জ্বালানো গন্ধ।

বিষণ ঠিক করতে পারলো না—ফিল-ই-বর্কাস আসলে কি হাতিদেরই বর্কাস? না, তলে তলে দেওয়ানখানার নজরদারি কাসীদ? কিংবা একই সঙ্গে দুটোই? তাই-ই যদি হয়—তবে অত খুঁটিয়ে কেন রৌশনমহলের খবর জানতে চায়?

ভোর ভোর কোড়া খেয়ে বিষণের মগজটাই দুলে গেছে। সে কিছুই ঠিক

করতে পারছে না এখন।

দিনের আগ্রা গরমে রোদে ধুলোয় তেতে পুড়ে থাকে। যমুনার ওপারে সূর্য ঢল নিলে হাওয়া অন্যরকম হয়ে আসে। তখন রইসি মানুষজন টাঙায় ফুলছড়ি উড়িয়ে—বাতাসে আতরের খুশবু ভাসিয়ে শয়তানপুরার পথ ছোটে।

ঠিক এইসময় দেখা গেল যমুনার গায়ে সস্তার সন্ধ্যাবাজারের আশপাশে একজন জওয়ান মতো দীঘল ফকির ঘুরঘুর করছেন। কালো আলখাল্লায় পায়ের পাতা অব্দি ঢাকা। কোমরবন্ধটি উজ্জ্বল সবুজ হওয়ায় এই মানুষটির দিকে চোখ ফিরে যাবেই। গালে কচিকাঁচা দাড়ি সন্ধ্যার বাতাসে একপেশে হয়ে উড়ে যায় যায়। হাতে চামর। কিন্তু ভিক্ষে চাওয়ার কোনো মালসা বা ঝোলা নেই সংগে। ফকির হাঁটছেন—আর তাঁর গলায় রঙিন কড়ির ভেতর বসানো রুপোর চাকতি দুলে উঠে বাজারের ব্যাপারীদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। তাঁর চোখ যেন কী খুঁজে বেড়ায়। তিনি যমুনার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়েই চলেছেন।

কাশ্মীরের উত্তরে স্কার্দু, গিলগিট ছাড়িয়ে বলক্ বদকশানের দিকে যতই ওপরে ওঠা যায়—ততই হাড় হিম করা শীত। ওদিকে খালিমাথায় ঘুরলে মাথায় আর চুল থাকে না। পড়ে যাবেই। অনেক সময় মোটা পশমের উষ্ণীষ ধাঁচের জিনিসেও কুলোয় না। তাই ওদিককার আমিররা একরকমের উজবেক পরচুলা মাথায় পরে থাকেন। তাতে দেখতে বাহার খোলে—আবার কাজও চলে।

সেরকমই একখানি বাহারি পরচুলা মাথায় দিয়ে না বেরলে এই দীঘল ফকিরকে সারা আগ্রাই খুব সহজে চিনে ফেলতো। চিনে পথ ছেড়ে দিতো। দিয়ে তাঁকে দেখার জন্যে ভিড় করতো। এই ফকির আর কেউ নন। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। বাদশা শাহজাহানের চোখের মণি। শাহজাদী জাহানারার ছোটে ভাইয়া। মুঘলশাহীর বারোহাজারি মনসবদার। ফৌজদার-ই-হিসার। ঘোড়সওয়ার পেয়ে থাকেন ছ'হাজার।

ক'দিন ধরেই কী হয়েছে শাহজাদার—কী এক মধুর ঘণ্টার আওয়াজ পান। অবিরাম। বেজেই চলেছে। থামার নাম নেই। দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরলে সে ধ্বনি আরও স্পষ্ট—আরও মধুর হয়ে ওঠে। যতই রাত বাড়ে—শাহজাদার মনে হয়—তারার ভারে এই বুঝি আসমান ভেঙে পড়লো। কী এক ব্যথায় আসমান না জানি তারা হয়ে ফেটে পড়ছে। সে ব্যথা শাহজাদা নিজের বুকের ভেতরেও টের পান।

এ ব্যথায় অদ্ভুত এক আনন্দও আছে। এই আনন্দ—এই ব্যথার যুগলবন্দী শেকড় ঠিক কোথায়? বুকে হাত দেন দারাশুকো। পাঁজরের নিচে? দুই বুকের মাঝখানের জোড়ে? না, নাভিমূলে?

লাহোরে রাঙির ওপরকার আসমান যখন হিমেল কুয়াশায় চাঁদের আলো জমাট করে ধরে রাখতো—তখন শাহজাদা একা একা গিয়াথপুর আর আলমগঞ্জের মাঝামাঝি কফিপুরায় গিয়ে নিজের এই সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। কী দরকার ছিল যাবার? কী ছিল মিঞা মীরের চোখে? গলার আওয়াজে? তিনি আমার

বুকে বুক ঠেকাতেই কী এক আনন্দ গলগল করে ঢুকতে লাগলো বুকে। সে আনন্দ আর ধরে রাখা যায় না। এই বুঝি বুক ফেটে যায় যায়।

এ আমার কী হলো? কিছু বুঝে উঠতে পারেন না দারা। তিনি এখন প্রায়ই সেই সব মানুষ খুঁজে বেড়ান যারা লোকের চোখে পাগল। যমুনার পাড়ে—রাজধানী আগ্রার সীমানায় বিয়ানার আনাচে-কানাচে খালি বা পোড়ো কিল্লার খিলানের ছায়ায় যেসব লোক আসমানের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে—একা একা বিড় বিড় করে—মাঝে মধ্যে একাই হেসে উঠে বাতাসের সঙ্গে কথা বলে—তুড়ি মারে—কিংবা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তাদেরই খুঁজে বেড়ান দারা। খুঁজে পেলে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আকবরি দরওয়াজা দিয়ে সিধে নিজের অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে তোলেন তাদের। নিজের হাতে তাদের গায়ে জল ঢেলে সাফসুতরো করে নেন। তারপর বসেন তাদের মুখোমুখি। খোবানি আসে, তরমুজ আসে—আসে অঙ্গিরা। নসিবে তেমন পাগল জুটলে তো কথাই নেই। মুসাহিদ, তৌহিদ, সুলতান-উল-আযকর—কী না আসে তখনকার কথায়। আবার অনেক সময় বে-নসিবিও ঘটে যায়। রোজ তো আর কপাল ভালো যায় না। ঝুটা-মাল অনেকসময় ঢুকে পড়ে। জালি-পাগল তাড়ানোও এক কঠিন কাজ। তারা উঠতে চায় না। নগদ কিছু আশরফি যায় তখন শাহজাদার।

আসল পাগল পেলে শাহজাদা ছাড়তে চান না। এই সব রসখ্যাপা আবার কোনো এক জায়গায় থাকতে চান না। তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন। এখন শাহজাদা আসলে নকলে যাচাই করতে শিখেছেন কিছুটা।

সন্ধ্যাবাজারের মানুষজন বলতে কারিগর, ভিস্তিওয়ালা, কামার, যমুনার ওপার থেকে জন খাটতে আসে দেহাতি। রেড়ির তেল, কচু, ক্ষীরা, বেগুন, কুঁদরি, তিল তেলের ব্যাপারীরা বড় বড় মশাল জেবলে খানিকক্ষণের জন্যে যমুনার গায়ে এই সন্ধ্যাবাজার বসায় রোজ। খন্দের-ব্যাপারী সবাইকেই একবার করে ঘুরে দেখতে হলো এই ফকিরকে।

যমুনার গায়ে এক জায়গায় মাথা বোঝাই জট নিয়ে এক জটাজুটো আজ ক'দিন হলো সিধে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো কথা বলে না। সন্ধেরাতে এসে দারা দেখলেন—তখনো সাধুর চোখ আকাশে। মহম্মদ দারাশুকোর বিশ্বাস—এসব সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, দরবেশ—এঁরা ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারেন। চাই কি যমুনার চর-জায়গায় জলের ঢেউ তুলে তার বুকে পালের জাহাজ ভাসাতে পারেন। কিংবা এমন অন্ধকারেই হয়তো আলো হাসাহাসি সূর্যকে ডেকে এনে অলৌকিক কাণ্ড করে বসতে পারেন।

শাহজাদা ক'দিন আগে রাজধানীর আরেক সীমানায় বিয়ানার এক পোড়ো কিল্লায় এক সাধুর দেখা পান। পাঠান আমলের ভাঙা দুর্গের ভেতর সে সাধু মাথা মাটিতে আর পা আসমান-মুখো করে মাসখানেক হলো খাড়া হয়ে আছেন। দারাশুকো গিয়ে একদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর মত পেয়েছিলেন। হিন্দু সিদ্ধ যোগী। শাহজাদার কথায় তিনি ওই দশাতেই কথা বলছিলেন।

দারাশুকো জানতে চেয়েছিবেন, এই দুনিয়াটা কী?

সিদ্ধযোগী হো-হো করে হেসে বলেছিলেন, তুই যেমন দেখিস তেমনই—

—আমি তো দেখি আসমান, জমিন, পিপুল গাছ, ময়ূর, হরিণ, মানুষজন, বাঁদর—

—সবই মায়া। তুই যদি দেখতে চাস—দুনিয়াটাই স্রেফ জল—তো সারা দুনিয়াটাই দেখবি জল—ঢেউ তুলে জল বয়ে যাচ্ছে।

—আপনি দেখাতে পারেন।

—তুই নিজেই দেখতে পারিস।

—তা তো দেখতে পাচ্ছি না। পানি কোথায়? এ দুনিয়া তো এখন এই কিল্লা—

—সময় হয়নি তাই দেখতে পাচ্ছিস না।

যোগী, ফকির, সাধু-দরবেশদের দেখে শাহজাদার মনে হয় এঁরা আল্লাতালার খোদ ফেরেসতা। যীশুর নাম গান করেন আগ্রায় চারজন ফাদার। এঁদের দেখেছেন দারা। এস্টানিলাম মার্লাপিকা, পেড্রো জুজাতে, হেনরি বুজেও আর হাইনরিশ রথ। এঁরা মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে ঘুরে বেড়ান। বর্ষা এলে সবাই রাজধানীতে ফিরে আসেন। একবার জলে ভিজে ভিজে ফাদার রথ খুব অসুখে পড়েছিলেন। তখন শাহী হেকিমের সঙ্গে শাহজাদাও গিয়েছিলেন ফাদারকে দেখতে। রাজধানীর বাইরে নলখাগড়ার ওপর মাটি ফেলা দেওয়াল। ছাদ বলতে টালি। তার ওপরে যীশুর দুই কাঠির আড়াআড়ি চিহ্ন। সেখানেই উপাসনা। সেখানেই একপাশে ফাদারদের থাকা। খুবই সাদামাঠাভাবে। কোনো কথা হয়নি ফাদার রথের সঙ্গে। জলে ভিজে ঠান্ডা লেগে তাঁর গলা তখন ঘড় ঘড় করছে। শাহাজাদা নিজে ওঁদের ব্যাপারে আগ্রহ নিয়েছিলেন—যাতে শাহী হেকিম ভালো করে এই বিদেশীদের চিকিৎসা করেন। যীশুর নাম করতে এসেছেন ওঁরা। বড় বড় সমুদ্র পার হয়ে। বিভূঁইয়ে যেন মারা না পড়েন। এঁরাও তো খোদাতাল্লার নিজের দূত।

দারা সাধু দরবেশ পেলেই ছুটে ছুটে যান। তাঁর কাছে যেন এখন এই চোখের দেখা জগৎ মিথ্যা। এর আরেক পিঠে রয়েছে আসল জগৎ। সে জগৎ দেখতেই তিনি ইদানীং মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়েন। এক ফকির তাঁকে বলেছিলেন, নির্জনে গিয়ে এক মন স্থির করে বোসো। চোখ ওপরে তুলে আকাশে তাকিয়ে থাকো। নির্জলা উপবাস চাই। কিছুদিন ওভাবে থেকে আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিজের নাকের ডগায় তাকিয়ে থাকো। ওখানেই তাঁকে দেখতে পাবে।

এই যোগীদের সঙ্গে চালচলনে শাহজাদা সুফীদের মিল খুঁজে পান। যোগী, সুফী—এঁরা সবাই সবসময় ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শাহজাদা লক্ষ্য করেছেন, ওঁদের মুখে একটা উদাসীন ভাব। কোনো কিছুতেই বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। দারাশুকোর মনে হয়—এঁরা জানেন না এমন কিছু জিনিস নেই। একজন ফকিরকে নাকি দেখা গেছে—তিনি গোয়ালিয়র সড়কের গায়ে বাগোয়ানের গহিন জঙ্গলে ঢুকে গেছেন—শীত এলে বেরবেন—তিনি যে কোনো জিনিস হাতে নিয়ে—তা সোনা করে ফেলতে পারেন। অভ্রের মতো দেখতে কী একটা

দানা বানান—তা খেলেই রোগ বালাই পালাই পালাই—যা খাবে তাই তৎক্ষণাৎ হজম। ও'রা মনের ভাবনা মুখ দেখেই বলে দেন। নির্ভুল। শুকনো গাছে মুহূর্তে ফুল ফল ফোটান। বুকের ভেতর ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে ফেলেন—শুধু বাচ্চাই নয়—যে কোনো পাখির বাচ্চা ফুটিয়ে থাকেন। তাকে উড়িয়ে দিয়ে তবে থামেন।

যমুনার এবড়ো খেবড়ো পার ধরে অন্ধকারে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল শাহজাদার। পায়ের বিনামা জুতোটি বেশ জবরদস্ত বলেই রক্ষে। এক সময় দারাশুকো দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাঁচা রাতে ঘন হয়ে চাঁদ উঠছে। একটু পরে যমুনার চর জ্যোৎস্নায় ভেসে উঠবে। এই দুনিয়া কী সুন্দর। কী সুন্দর এই হিন্দুস্থান। কত পুরনো দেশ। কত সাধুসন্ত সুফী-ফকির এদেশের মাটি থেকে রস নিয়েছেন। এই দেশের ইতিহাস তো এই আউলিয়াদেরই ইতিহাস। যোগী আর দরবেশদের নিয়েই এই হিন্দুস্থান। সেই সব সুফী-ফকিরের কথা মানুষ হারিয়ে ফেলে। তাদের কথা একসঙ্গে কোথাও পাবার মতো কোনো কেতাবই নেই। যদি পাওয়া যেতো। পেলে জানা যেতো এই পাক-জমিনের ইতিহাস। সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পারতো তুজুক-ই-হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থাননামা।

অন্যমনস্ক হয়ে শাহজাদা দারা এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে তাঁর মনে পড়লো একখানি কেতাবের কথা। তর্জাকিরাত-উল-আউলিয়া। ফরিদউদ্দীন আখতারের লেখা। তাতে আউলিয়াদের জীবনী আছে। আছে হজরতের কথা। খলিফাদের কথা। অনেকদিন আগের কেতাব। আমি এমন একখানি কেতাব লিখতে চাই যাতে থাকবে এখনকার আউলিয়াদের কথা। থাকবে মিঞা মীরের কথা। তাঁর কথা তো অনেক আগে লেখা তর্জাকিরাত-উল-আউলিয়াতে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না এমন অনেক সুফীরই কথা। আমি এমন কেতাবই লিখবো —যাতে তাবৎ সুফী-আউলিয়ার জীবনী থাকবে। থাকবে তাঁদের সাধনার কথা। সিদ্ধির কথা।

মিশরের এক সাধিকা নাকি এক জায়গায় একইভাবে ত্রিশ বছর দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার ভেতর পঁচিশ সনই তিনি নাকি কিছুই খাননি। একদম ঘুমোননি। তাঁর কথা লেখা দরকার। লেখা দরকার মিঞা মীরের ছোটবোনের জীবনী। তাঁর এখন বছর ষাট বয়স হলো। সিন্ধু নদের পশ্চিমে সিবিস্তানে এই বিবি জামাল খাতুন সাধনা করে চলেছেন।

হঠাৎ দারাশুকো দেখলেন—যমুনার অন্ধকার গা জুড়ে ঢোলক আর ঘুঙুরের আওয়াজ। সেই সঙ্গে তালে তালে হাততালি। চরের বাতাসে থ্যাঁতলানো মশালের পাগলা শিখা একবার এপাশ—আরেকবার ওপাশ। তাতে ফুর্তিবাজ একপাল মানুষের একদিককার মুখ দেখা যায় একবার। আরেকবার আরেকদিককার। মাঝখানে এলো চুলে ঘাগরার ঘূর্ণী তুলে একটি মেয়ে নাচছে। সেই সঙ্গে ঢোলক, ঘুঙুর আর কান ফাটানো হাততালির এলোমেলো ফুর্তি।

দেওয়ান-ই-খাসের জলসা মজলিসে গুলরুক বাইয়ের নাচ দেখেছেন শাহজাদা। সেখানে হাততালি ব্যাপারটাই বে-সহবত। এমনকি সমঝদারির ঝোঁকে

বেশি বেশি করে মাথা দোলানোও বে-তমিজি। আম-আতরাফ ইনসান সব তাহলে এভাবেই নাচগানার কদরদারি করে থাকে। এখানে যেন প্রাণ আরও উজ্জ্বল—আরও খোলামেলা—একদম আসমানের নিচে নদীর গায়ে খুলি হাওয়ায় নাচ—মানুষের রূপ আরও খুলে যায়।

দারাশুকো ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়লেন। এমনভাবেই—যাতে তাঁর দিকে কারও আলাদা করে নজর না পড়ে। সেই মেয়েটিই নাচছে। জলের ঢেউ হয়ে ঘাগরা আর মাথার এলোচুলের ফোলানো চরকি তুলে। এ সেই রানাদিল। রাজধানী আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে—চকে চকে যে নেচে বেড়ায়। আগ্রা দুর্গের ওপর থেকে সন্ধ্যাবাজারে যার নাচ দেখে বাজি খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন একবার—কোতোয়াল ওকে ধরছে না কেন?

সস্তায় চর্বি মাখানো মশালটার পাগলা শিখাটাও যেন বা বাতাসের সঙ্গে মাতাল হয়ে নাচছে। তাতেই দারা এক এক করে নাচিয়ে রানাদিলের মুখের এক এক পাশ দেখলেন। ঘেমে ওঠা সুন্দর মুখে দু'টি কালো চোখ কুঁদে বসানো। গুলরুক বাই কিংবা আখতারিবানুর মতো সাধা পায়ের কাজ নেই এই নাচে। কিন্তু নিজের একটা সহজ চলন রানাদিলের নাচকে মনোহারি করে তুলছে। ওরই ভেতর ঢোলকের সমে এসে ঘুঙুর পেঁচানো পায়ের দমক তুলে রানাদিল হেসে উঠছে। ঘেমে ওঠা রীতিমত ক্লান্ত চোখেই।

নাচের শেষে এসে রানাদিল দু'হাতে গায়ের অঙ্গরা জামার আঁচল তুলে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচের মজুরি চাইতে লাগলো। মজুরি না বলে তওফা বলা ভালো। কিংবা শুকনো কেয়াবতের বদলে রুটি মাংসের জন্যে শাহী টাকশালের আধেলা, পওয়া। ভুখা পেট নিয়ে তো নাচা যায় না। সাজাও যায় না।

রানাদিলের আঁচলে দাম দামড়ি পড়তে লাগলো। আর মুহূর্তে ভিড় ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। ঢোলকবাজের সঙ্গে যাও বা দু'একজন বেশি ফুর্তিবাজ ছিল—তারাও দেখতে দেখতে অন্ধকারে পায়দলে মিলিয়ে গেল।

রইলেন একা দারা। দীঘল আলখাল্লায় ঢাকা দীঘল দেখতে এক ফকির। যাঁর গলায় রঙিন পাথরের মাঝে মাঝে ধাতুর গোল চাকতি মশালের আলো পেলেই ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। তাঁর মাথায় বদকশানি আমিরদের পরচুলা। বাতাসে একপাশে ঘুরে যাওয়া চিবুকের দাড়ি। সামনে মশালের মুখোমুখি চুপ করে বসে রাস্তার নাচিয়ে রানাদিল। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সে একটা একটা করে দাম দামড়ি গোনাগাঁথা সারলো।

দেখতে দেখতে শাহজাদা মনে মনে হেসে উঠছিলেন। এই সামান্য ক'টা দামড়ির জন্যে এত নাচানাচি—এত ঘাম—এত ঘুর্ণী—এত হাসি বিলোনো? শাহজাদা ফি জুম্মাবারে জামা মসজিদে যখন নামাজ আদায় করতে যান—তখন মসজিদের বাইরে মিশকিনরা তাঁরই পথ চেয়ে ভিড় করে বসে থাকে। ওদের মাঝে ফি জুম্মাবারে শাহজাদাকে কয়েক মুঠো করে আশরফি, তনখা ছড়াতে হয়। মুঠো করে আশরফি ছড়িয়ে দিলে ওদের সে কি হুড়োহুড়ি। বনজারা চৌধুরীরা গোলার সামনে বরবাদ গেঁহুর দানা ছড়িয়ে দিল কবুতর, কাউয়া ঠিক

অমন করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সব গুনেগেঁথে রানাদিল তার সাধের দাম দামড়িগুলো এবার খুব সাবধানে ডানদিকের ঘাগরা অনেকটা তুলে তার নিচে লুকোনো লম্বা খেরিয়া-গেঁজের ভেতর পুরলো। পুরে ঘাগরা ফের নামিয়ে দিলো। ফকির হলেও শাহজাদা একজন মরদ। সে যে একজন জওয়ান মরদ তা আলখাল্লায় আগাগোড়া ঢাকা থাকলেও বুঝতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আর, তাঁরই সামনে একজন নাচনেওয়ালি হয়ে কোনো হায়া নেই। বিলকুল বে-শরমিনদান। গা-পা অতখানি বের করে?

শাহজাদা চোখ নামিয়ে নিলেন। মশালটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। তিনি ফিরবেন বলে ঘুরে দাঁড়ালেন।

অমনি রানাদিল চাপা গলায় বলে উঠলো, কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান—

শাহজাদাকে থামতে হলো।

রানাদিল মশাল হাতে এগিয়ে এলো। দাউ দাউ করে জ্বলছিল এটা একটু আগে। এখন তার বাতাসে থ্যাঁতলানো আলো শাহজাদার বুকের কাছে তুলে ধরলো। ধরে রানাদিল বললো, ফকির আপনি। গড় করি। কিন্তু একদম মুফতে আমার নাচ দেখবেন।

—ওঃ। বলেই শাহজাদা তাঁর ঢিলে আলখাল্লার ভেতর পাশ-ঝোলায় হাত গলিয়ে বলে উঠলেন, সঙ্গে তো কিছুই আনিনি।

—নাচ দেখিয়ে আমি খাই—

দারা এ কথায় কুঁকড়ে গেলেন। কী মনে হতে নিজের গলায় ঝোলানো রঙিন কড়ির মালাটা খুললেন। তাতে ইংলিশস্তানের শাহ জেমসের সোনার জ্যাবোরাস, শাহ এডোয়ার্ডের গোলাপ খোদাই সোনার রোজ নোবেল মোহর রঙিন কড়িগুলোর মাঝে মাঝেই নাদিরা বেগম গেঁথে দিয়েছেন—যাতে কিনা তাঁর খসমকে মানায়—আরও সুন্দর দেখায়। বিদেশি এসব সোনার মোহর ভিনদেশি বণিকদের কাছ থেকে আমির, মনসবদার, সুবেদার, জায়গিরদাররা কিনে থাকেন। ভালো সুবায় বদলি, ভালো ইজফা, খেলাত, খেতাব পাওয়ার লোভে ওঁরা শাহজাদী জাহানারা, শাহজাদা দারাকে এসব মোহর তোফা দিয়ে থাকেন। নাদিরা বেগম তারই কয়েকটি শাহজাদার গলায় মালায় গেঁথে দিয়েছেন।

শাহজাদা সোনার গোলাপ খোদাই করা একটি বেশ ভারি এডোয়ার্ড রোজ নোবেল মোহর মালা থেকে ছিঁড়ে নিলেন। নিয়ে রানাদিলের মেলে ধরা অঙ্গিরার আঁচলে ফেলে দিলেন। দিয়ে মনে মনে ভাবলেন, সঙ্গে নিয়ে এলে এর চেয়ে অনেক বেশি দিতাম। এতক্ষণ ঘাম ঝরিয়ে, হাসি বিলিয়ে নেচে নেচে তুমি তো বিশেষ কিছুই পাওনি রানাদিল। গুচ্ছের দাম-দামড়ি দিয়ে কী-ই বা পাবে তুমি আগ্রার বাজারে। নয় দামে এক আশরফি। সব মিলিয়ে বড় জোর পাঁচ ছ' আশরফি জুটেছে তোমার। এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি ফি জুম্মাবারে আমি এক এক মুঠোয় জামা মসজিদের সামনে মিশকিনদের ভিড়ে ছড়িয়ে দিই।

আহা রে। আগে জানলে অনেক আশরফি সঙ্গে করে আনতাম। কেউ কিছু চাইলে তাকে কোনোদিন আমি ফেরাইনি। কঞ্জুস কখনো কোনোদিন আল্লাতালার পাক ভালোবাসা কিংবা জ্ঞানের বীজে পৌঁছতে পারে না।

রোজ নোবেল কখনো দেখেনি রানাদিল। হাতে তুলে নিয়ে দেখলো বেশ ভারি। এটা সোনার?

এ কথায় শাহজাদা দারা হেসে উঠলেন, তবে কী? আরও ভালো কিছু থাকলে তাও তোমাকে দিতাম। এত দুঃখিয়ারির পর পাসিনা ফেলে তুমি রুটি কামাও।

ফকির হলেও মরদ তো বটে শাহজাদা। কোনো মরদের নরম সরম স্নেহ মাখানো কথা রানাদিলের একদম সয় না। গায়ে জ্বালা ধরে। কম মরদ তো দেখলো না রানাদিল হিন্দুস্থানের এই রাজধানীতে। তার কেমন সন্দেহ হলো। সে রোজ নোবেলটা নিভে আসা মশালের আলোয় তুলে ধরে বললো, জালি নয়তো?

চমকে উঠলেন শাহজাদা দারা। রাগও হলো। বলে কি এই আনপঢ় নাচনেওয়ালি? হিন্দুস্থানের মুঘল শাহীর পহেলা শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো দেবেন জাল মোহর? ইংলিশস্তানের শাহী মোহর দোগুনি দামে বিদেশি ব্যাপারীদের কাছ থেকে কিনেই না তবে আমির-ওমরাহরা বাদশাকে, বাজিকে, আমাকে তোফা দিয়ে থাকেন। জাল মোহর তোফা দেবার মতো সাহস এই হিন্দুস্থানে কোন্ আমিরের থাকতে পারে।

ফকির সাহের গম্ভীর গলায় হিন্দুস্থানে জাল মোহর যাচাইয়ের চলতি রাস্তা বাতলে দিলেন নাচনেওয়ালি রানাদিলকে। এ রাস্তা আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে সবাই জানে। শাহজাদা বললেন বিশ্বাস হলো না তো? বেশ। ইংলিস্তানী মোহরটা মশালের আগুনের ভেতর ফেলে দাও। পুড়ে লাল হয়ে উঠলে তাতে পানি ছিটিয়ে দাও। আমি এক আঁজলা যমুনার পানি এনে দিচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। নেচে নেচে রুটি, কাবাব, ঘাগরা, চুড়ি, গলার মালা জোটানো রানাদিল এ দুনিয়ায় কাউকেই আর ইমানদার মনে করে না। সে এখন ঠেকে ঠেকে শেখা পোড় খাওয়া এক কঠিন আওরত। বুকের ভেতর ভারি নিঃশ্বাস লুকিয়ে রেখে তাকে নাচের ফাঁকে ফাঁকে ঘাম আর হাসি ঝরাতে হয়। সে মশালটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে দপদপানো শিখার মাঝেই রোজ নোবেলটা ঠেসে বসিয়ে দিলো। দিয়ে বললো, বেশ তো। যাচাই হয়ে যাক।

শাহজাদা দারা ঢিলেঢালা আলখাল্লা সামলে ভাঙা পাড় ধরে অন্ধকারেই যমুনায় নামলেন। কাঁটাঝোপ। বনবাদাড়। বালি। অন্ধকারে পানি তুলতে গিয়ে দেখেন আঁজলা গলে তা বেরিয়ে যায়।

ওপর থেকে রানাদিল তখন চেঁচাচ্ছে, কী হলো? মোহরটা যে পুড়ে লাল হয়ে উঠলো। পানি কোথায়—?

—আনছি। বলে দারাশুকোর মনে হলো। এ যেন এক অদ্ভুত খেলা। মুঘলশাহীর পহেলা শাহজাদা হিন্দুস্থানের এক সামান্য নাচনেওয়ালির মবারকে

নিজের ইমানদারির ইমতেহানি দিচ্ছেন। সাচ্চা ঝুটার মাঝবরাবর সাচ্চাইয়ের সরু রেখাটি চলে গেছে। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন শাহজাদা। নিরুপায় হয়ে তিনি হাটু অব্দি জলে নেমে আলখাল্লার নিচের দিকের অনেকটাই ভিজিয়ে তবে অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠে এলেন।

ওপরে উঠে শাহজাদা দারা বড় বড় নিঃশ্বাসে হাঁপাচ্ছিলেন। নিঃশ্বাসের সেই বড় বড় ওঠা-পড়া রানাদিলেরও কানে গেল। অন্ধকার যমুনার পাড়ে তারও এই খেলা অদ্ভুত লাগছিল। এক সামান্য নাচনেওয়ালি তার জীবনে এই প্রথম খোদার খোদ বান্দা এক ফকিরের সাচ্চাইয়ের, ইমানদারির ইমতেহানি নিচ্ছে। রানাদিল রীতিমত অস্থির গলায় বলে উঠলো, পানি ? পানি কোথায় ?

—এই তো।—বলে শাহজাদা একটু কুঁজো হয়ে তাঁর আলখাল্লার নিচের দিকটা নিংড়ে মশালের শিখায় ফেললেন। ফেলতেই রানাদিল একটা ভাঙা ডাল দিয়ে রোজ নোবেলটা আগুনের বাইরে টেনে আনলো। এনে পোড়া আলুর মতোই লুফতে লুফতে তার ডান হাতের তালুতে লাফানো ইংলিশস্তানি মোহরটার দিকে তাকিয়ে বললো, না। বেঁকে যায়নি তো। জাল হলে ঠিক বেঁকে যেতো—

আহত সাচ্চা ইনসানের মতোই শাহজাদা একদম গুম মেরে গেলেন।

মোহরটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে রানাদিল—সেটার দিকে তাকিয়েই বললো, বেশ ভারি। খাঁটি সোনার—

এবারও কোনো কথা বললেন না শাহজাদা দারা।

—আপনি একজন ফকির হয়ে এমন মোহর গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! বাঃ। চমৎকার।—এই অব্দি বলে রানাদিল তার হাতের তালুর মোহর থেকে ফকিরের মুখে তাকিয়েই চমকে উঠলো। তার হাত থেকে মোহরটাও অমনি যমুনার অন্ধকার পাড়ে খসে পড়লো। ততক্ষণে মশালের আগুনও মোহর যাচাইয়ের জলের ঝাপটায় নিভে এসেছে প্রায়।

চমকে উঠলেন শাহজাদা। কী হলো ? হারিয়ে ফেললে যে—

রানাদিল কোনো কথা বলতে পারলো না। সে ভয়ে, আতঙ্কে কোমর থেকে একদম দুভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে নিভু মশালের সামান্য আলোয় শাহজাদার ডান হাত নিজের মাথায় উঠে গেল। সর্বনাশ। যমুনার পানি আনতে গিয়ে অন্ধকারেই হাতড়ানির ভেতর বদকশানি পরচুলাটা কোথায় খসে পড়েছে।

শাহজাদা জানেন, তাঁর এই মুখ আগ্রায় কারও না-চেনার কথা নয়। রানাদিল ঝুঁকে ডান হাত নিজের কপালে ঠেকালো। পরপর দুবার। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো।

প্রায় নিভে আসা আলোতেও দারাশুকো দেখলেন, রানাদিলের দুই চোখে জল। অন্ধকারে খসে পড়া অমন দামি ইংলিশস্তানি মোহরটা খুঁজে বের করার কোনো তাড়াই নেই তার ভেতর। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সহবত মোতাবেক ফের তসলিম জানালো শাহজাদাকে। জানিয়ে বললো, হুজুরত। এ জাল সাজিসের

কী দরকার ছিল।

—বিশ্বাস করো আমাকে। বিশ্বাস করো রানাদিল—

—আপনার মোহরটাই সাচ্চা। কিন্তু আপনি।

মশালটা একদম নিভে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

॥ বাহার ॥

শাহজাদা দারা অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে আন্দাজেই রানাদিলকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর বুকের ওপর তখন কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠা একজন নাজুক আওরত। ভয়ে, আনন্দে, লজ্জায়, আতঙ্কে—কী করবে? কোনদিকে যাবে? কিছুই ঠিক করতে পারছে না রানাদিল। আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ভুট্টা, গেঁহুর দানার গোলার সামনে—সরাইখানার খোলা উঠোনে নেচে নেচে যে রুটি যোগাড় করে বেড়ায় তার পক্ষে হিন্দুস্থানের একদম মুঘলশাহীর পহেলা শাহজাদার শক্ত হাতের বাঁধনে তাঁরই বুকে—তাঁরই গায়ের যুঁই যুঁই খুশবুর ভেতর তো তলিয়ে যাবার দশা। ভেসে ওঠার জন্যে রানাদিল চেষ্টা করলো। কেননা, এখন যা ঘটছে—তা কোনো খোয়াব নয়। কিন্তু কাউকে বললে—রানাদিল জানে—সে শুনে মনে করবে আগাগোড়াই কোনো শাহী খোয়াব। আজ সন্ধে রাতে একদম স্বপ্নের কাণ্ড-কারখানা ঘটে যাচ্ছে। যেমন কিনা ঘটে থাকে দেহাতি রামযাত্রায়। যমুনার ওপারের গাঁ-গঞ্জে।

রানাদিল নওজওয়ান শাহজাদার মরদ বদনের রকম বুঝতে দু হাতে আলখাল্লার ওপর দিয়ে দারাশুকোর কোমর জড়িয়ে ধরলো। হাড় হাড়—কিন্তু দু'ধারে চওড়া হয়ে উঠে যাওয়া বুক। বুকের কাছে আলখাল্লাটা ভিজে—পসিনায় কিংবা যমুনার জলে—সেখান থেকে যে গন্ধটা ধক করে এসে রানাদিলের নাকে লাগলো—তা সে এই রাজধানী আগ্রারই যোগীপুরায় সাধুসন্তদের ধুনী জ্বালানো আখড়া আস্তানার কাছাকাছি বাতাসে পেয়েছে।

রানাদিল ফের কেঁদে উঠলো। ফুলে ফুলে। ভয়ে? না, আনন্দে? সে নিজেই জানে না।

শাহজাদা চাপা গলায় বলে উঠলেন। চুপ করো। থামো—। বলেও তিনি ঠিক করে উঠতে পারলেন না কী করবেন। নাদিরা বেগমও কোনোদিন এভাবে আসমানের নিচে কোনো খোলা জায়গায় তাঁর বুকে এতখানি লেপটে যাননি। তিনি জানেন না—শাহী ঘরানার বাইরে হিন্দুস্থানের একজন আমআতরাফ সাধারণ আওরত কেমন হয়ে থাকে—তার গা নিজের গায়ে লাগলে কেমন লাগে, তার কান্নাকাটিই বা কিরকম? অথচ মুঘলশাহীর একজন শাহজাদা হিসেবে তিনি হিন্দুস্থানের যে কোনো আওরতের জান, দিল আর দুনিয়ার মালিক। ইচ্ছে করলে তাকে রাখতে পারেন। তাকে ভাঁসিয়েও দিতে পারেন।

—মুখ তোলো রানাদিল—

রানাদিল তুললো না। সে বুঝতে পেরেছে—তার গায়ে গা দিয়ে যে মানুষটি

এখন দাঁড়ানো—তিনি কোনো খোয়াব নন—গোয়ালিয়র যাবার সড়কের মতোই শক্ত, তাঁকে ছুঁয়ে দেখা যায়, টের পাওয়া যায়—তিনি একজন শাহজাদা। এই শাহজাদাই একদিন যমুনার ওই চরে হুল্লোড়বাজ তরমুজ চাষীদের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। সেবারে ওদের ওখানে মুজরো করতে গিয়ে নিজের বিপদই ডেকে এনেছিল রানাদিল। তার নাচেই তরমুজ চাষীরা বেসামাল হয়ে পড়ে সেবারে।

—মুখ তোলো বলছি। তুমি কষ্ট পাও তা আমি চাইনি। —এইভাবে বলেও শাহজাদা দারা বুঝতে পারছিলেন না—তিনি ঠিকভাবে বলতে পারছেন কিনা। নিজের অনুরোধ নিজেরই কানে ধমকের মতো শোনালো। কেননা রানাদিলের মতো মানুষজনের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলেননি। তাঁকে কথা বলতে হয় উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে। সুবেদার-মনসবদারদের সঙ্গে। সেসব কথায় সবটা বলার দরকারও পড়ে না। খানিকটা বলে চুপ করে বসে থাকতে হয়। ওঁরা বাকিটা ধরে নেন। এখানে এই অন্ধকারে তিনি যেন নিজেকে খুলে মেলে ঢালাও করে বলেও বোঝাতে পারছেন না।

রানাদিল খুব আস্তে বললো, আপনি আমার নাম মনে রাখতে পেরেছেন খোদাবন্দ—

—তোমার নাম কে না জানে। সারা আগ্রার মাণ্ডি—সরাই তুমি তো মাতিয়ে রাখো। তোমার নাচের কত কদরদার—

খুব লজ্জা হলো রানাদিলের। সে শাহজাদার আলখাল্লায় ভিজে চোখ—তার চেয়েও ভিজে নাকের ডগা চেপে—কেন যে আজ এত কান্না আসছে রানাদিল তা জানে না—খুব আস্তে বললো, সেবারে এই নাচের জন্যেই চরে মরতে বসেছিলাম। যদি আপনি না এসে পড়তেন—

—যাক্। ভোলোনি তাহলে।

—হুজরত। আপনাকে কি ভোলা যায়? তামাম হিন্দুস্থানে আপনাকে নিয়ে চর্চা হয়।

—তাই বুঝি। নাও। এবার মুখ তোলো।

সব কথাই হচ্ছিল অন্ধকারের ভেতর। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। দূরে রাজধানী আগ্রার হই-হুল্লোড় টুকরো টুকরো হয়ে ফিকে আলোর সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসছিল। যমুনার বুকের অন্ধকারে এখানে ওখানে দু' একটা আলোর ফুটকি। কিন্তু ওপারে চড়া আলোয় খানিক মাথা তুলে ওঠা বাদশা শাহজাহানের দিনরাতের খোয়াব তাজমহলের তিনটে মিনার। কাতারে কাতারে কারিগর, মজুরদের কালো কালো মুণ্ডু। ওদের কাজ কখনো থামে না। তুর্কি কর্ণিকের আওয়াজের সঙ্গে ফৈজাবাদি দেহাতি ঝুমুরের কলি মিশে গিয়ে নানান জবান, নানান আওয়াজ ধমক-ধামকের রকম সকমই পাল্টে দিচ্ছে। মাঝ-খানে আব্বা হুজুরের খোয়াব একটু একটু করে মাথা তুলে জেগে উঠছে। এ সবই জানেন শাহজাদা দারাশুকো। ওই খোয়াব সম্পূর্ণ হলে এপারে মাটি দেওয়া ঘুম থেকে আমার আম্মিজান মরহুম বাদশা-বেগম মমতাজমহলকে তুলে

ওপারে নিয়ে গিয়ে পাথরের পালঙ্কে ফের শোয়ানো হবে। তাজমহলের নিচে। আম্মিজান বড় নাজুক ছিলেন। বড় শর্মিলি আওরত ছিলেন। দুনিয়ার কোনো আওরতকেই আমি কোনোদিন ব্যথা দেবো না। আমার জন্যে তাদের যেন কাঁদতে না হয়। ওরা বড় নাজুক চিজ। ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা বললেন, আর কেঁদো না। আমি ফিরবো এবার—

সঙ্গে সঙ্গে রানাদিল সেই অন্ধকারের ভেতরেই যেন শাহজাদার গায়ের ঢোলা খিরকা আঁকড়ে ধরলো। ধরে বললো, আপনিই তো কাঁদালেন হজরত—

শাহজাদার মন এই মুহূর্তে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। মাথার ওপর ফের সেই তারার ভারে ভেঙে পড়া আসমান। ওখানে ব্যথার ভার লুকিয়ে থাকে। সে ব্যথার কানাতে কানাতে বুক ভরে ওঠার আনন্দ থাকে।

রানাদিলের ও কথায় চমকে উঠলেন শাহজাদা। তিনি তো কাউকে কোনোদিন কাঁদাতে চাননি। বিশেষ করে সে যদি হয় আওরত—তবে তো আরও নয়। তিনি বলে উঠলেন, আমি? কোথায়! তুমিই তো ইংলিশস্তানি গোলাপি মোহরটা যাচাই করতে গেলে—

এবার রানাদিল শাহজাদার বুক থেকে দিব্যি প্রায় একটি নাচের বোল হয়ে কলকল করে বলে উঠলো, ভাগ্যিস গেলাম তাই। —খোদাবন্দ।

কিছুই বুঝতে পারলেন না শাহজাদা। এভাবে সারা মুঘলশাহীতে তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলে না। কুর্নিশ নেই। তসলিম নেই। নেই কোনো সিজদা। কদমবোসি। এই অন্ধকারে তাঁর মবারকে নজরই বা কে দেবে! তবু?

শাহজাদা বুঝলেন, হিন্দুস্থানের সাধারণ মানুষ নিশ্চয় এমনভাবেই কথা বলে—এমন ঝোঁক দিয়েই। তাতে এভাবেই—কিছু বোঝা যায়—কিছু বোঝা যায় না—এমনই একটা কুয়াশা মাখানো থাকে।

রানাদিল কথা বলছিল ফৌজি ছাউনি থেকে ছড়িয়ে পড়া বাজার চলতি উর্দু নামে ব্যাপারী, মুটে, মজুর, তওয়াইফদের ভেতর আসর জাঁকানো নয়া নয়া এক জবানে। এ জবানে আগ্রা দুর্গের দেওয়ানখানায় কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না। বলতে সাহসও পাবেন না। তিনি নিজেও এ-জবানের সামান্য দু'চারটে কথা শুনে শুনে জানেন—বোঝেন। কিন্তু বলেন না কখনো। এখন নিজের ফারসিকে ওই জবানে নামিয়ে এনে কথা বলতে হচ্ছে শাহজাদার। নয়তো রানাদিল যে বুঝবে না। তিনি রানাদিলকে বললেন, সাচ্চা কি ঝুটা? তার জালসাজিস যাচাই করতেই তো মশালের আগুনে ইংলিশস্তানি মোহরটা তুমিই ঠেসে ধরলে। যখন দেখলে বেঁকে যায়নি—পুড়ে লাল হয়ে উঠলো মোহরটা—

—খোদাবন্দ! ভাগ্যিস লাল হয়ে উঠেছিল!

এ কি কথার ধারা? কিছুই বুঝতে পারছেন না শাহজাদা। এর ভেতর আবার নসিবকে ডাকা কেন? তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কী বলতে চাইছো?

—পুড়ে লাল হয়ে উঠলো বলেই তো যাচাই হয়ে গেল?

অন্ধকারে রানাদিলের মুখ দেখতে না পেলেও দারাশুকো বুঝলেন, ও যেন

হাসছে। তিনি চাপা কিন্তু গম্ভীর গলায় বললেন, ভুলে যেও না রানাদিল—তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এই মুঘলশাহীর একজন শাহজাদা—

—হ্যাঁ হজরত। তা আমি জানি। বলতে চাইছি—ইংলিশস্তানি মোহরটা পুড়ে লাল হয়ে উঠতেই একসঙ্গে দুই-ই যাচাই হয়ে গেল—

—দুই ?

—হ্যাঁ শাহজাদা। মোহর—ফকির—দুইই যাচাই হয়ে গেল খোদাবন্দ।

—ওঃ। বলে চাপা কিন্তু টেনে টেনে হো হো করে হাসলেন শাহজাদা দারাশুকো। ভালো বলেছো।

—মোহরের সাচ্চাই জানা গেল। আর জানলাম—ফকিরের ঝুটাই—কথা শেষ হলো না রানাদিলের। হু হু করে কান্না এসে তার গলা ভরে দিলো। সে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো রানাদিল। শাহজাদা তাকে ধরে না ফেললে সে পড়েই যেতো।

—থামো বলছি। থামো। অ্যাতো কান্না কিসের— ? কেন কাঁদছো ?

শাহজাদার গায়ের ঢিলে খিরকার ওপর মুখ সমেত ঢলে পড়ে রানাদিল জড়িয়ে জড়িয়ে তার কান্নার ভেতর যা বলতে পারলো—তা সাজালে এরকম দাঁড়ায়—ফকির যে ঝুটা তা সে বুঝতেই পারেনি। ইশ্‌। যদি একবার বুঝতে পারতো। যদি বুঝতে পারতো খিরকার ভেতর খোদ শাহজাদা দারাশুকো দাঁড়িয়ে আছেন। ভাগ্যিস যমুনা থেকে জল আনতে গিয়ে পরচুলাটা খসে পড়েছিল। তাই তো আসল মানুষটাকে দেখার সৌভাগ্য হলো—

কান্না জড়ানো কথাগুলোর ভেতর শাহজাদা নিজেই হারিয়ে গেলেন। তিনি প্রায় ধমকেই উঠলেন। আঃ। থামবে ? কী বলবে পরিষ্কার জবানে বলো—নয়তো থামো। আমি এবার যাবো।

তাতেও কান্না থামলো না রানাদিলের। সে চেষ্টা করেও অদ্ভুত এই কান্নাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। এটা ভয়ের কান্না নয়। এটা আনন্দের কান্না নয়। নদীর বুক ফুটো হয়ে গেলেই বোধহয় এমন কান্না বেরিয়ে আসতেই থাকে। সে অনেক কষ্টে খিরকার মোটা পশমে তার ভিজে নাক ডলতে ডলতে বললো, যদি জানতাম হজরত—ফকির সাহেবের ভেতরেই শাহজাদা দাঁড়িয়ে তবে কি আমি ওই নাচ নাচি ?

—আমি তো নাচ দেখতে বেরোইনি রানাদিল। —বলে শাহজাদা দারা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। তিনি বলতে গিয়েছিলেন—আমি তো রানাদিল—দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে জলসায়—মজলিশে হামেশাই নাচ দেখে থাকি। ভালো ভালো নাচিয়ের নাচ।

ভাগ্যিস ও-কথাগুলো বেরিয়ে আসেনি মুখ দিয়ে। আল্লাতালার শও শুকরগুজর। তিনিই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ও-কথা শুনলে রাস্তার এই আনপড় নাচিয়ে আওরত মনে মনে বড় ব্যথা পেতো। ব্যথা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি দিতে চাই আনন্দ।

রানাদিল বললো, জানি শাহজাদা। কিন্তু আমার একটা উধার শোধ করার

আছে আপনার কাছে।

—উধার ?

—হ্যাঁ খোদাবন্দ। সেবারে আপনিই আমাকে যমুনার চরে বাঁচিয়েছিলেন।

—ওঃ। তা বেশ—

—আমার নাচ দেখিয়ে সে উধার আমি শোধ করবো শাহজাদা।

—তাই ? তা বেশ তো। হবে একদিন।

—একদিন নয় হজরত। আজ। এখুনি—বলতে বলতে রানাদিল শাহজাদার গায়ের খিরকার ছোঁয়া থেকে সরে দাঁড়ালো।

—এখুনি ? কী ব্যাপার ? কোনো তাড়া নেই তো। অন্য কোনোদিন হতে পারে—

—না হজরত। এখুনি। ওই নিভে আসা মশাল আমি ফের জ্বালাবো—

—এখুনি—বলতে বলতে রানাদিল প্রায় নিভন্ত মশালটা হাতে তুলে নিলো। শাহজাদা দেখলেন, রানাদিল অন্দরমহলের জেনানাদের মতো নাজুক নয়। দাপানো শিখার আলোয় বোঝা যায়—সে রীতিমত সাহসী। মুখে একটা জেদ। শক্ত-সমর্থ রকমের মানুষ। হবেই বা না কেন ? যাকে রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় নেচে রুটি কামাতে হয়—তার তো শক্ত না হয়ে উপায় নেই। সারা হিন্দুস্থানে এমন কত মানুষ আছে। তার ক'জনকেই বা আমি চিনি। চিনি বলতে সুবেদার মনসবদারদের শুধু। আর চিনি নানান ফৌজের মাথাদের, মীর আতশদের। বড় জোর কিছু আহেদির মুখ মনে করতে পারি। রানাদিল তো ভিড়ের মানুষ। ভিড়ের কোনো মুখ নেই। ভিড় হলো গিয়ে অনেক মানুষের দলা। দেওয়ান-খানার কাছারিতে এই ভিড়ের মানুষদের কোনো হিসেব লেখা নেই। অথচ এরাই হলো গিয়ে আসল হিন্দুস্থান। এদের নিয়েই হিন্দুস্থান। মসনদ এদের কোনোদিনই চেনে না।

দেখতে দেখতে রানাদিল মশাল ফের জ্বালিয়ে ফেললো। অন্ধকার যমুনার পাড়েই কোথায় চর্বির মালসাটা পড়ে ছিল। তা খুঁজে বের করলো রানাদিল। মালসা উপুড় করে মশালে মাখালো। সস্তার চর্বি পট পট করে পোড়ে আর মশালের দাউ দাউ বড় হয়ে ওঠে।

রানাদিল মুজরো করার ভঙ্গিতে ঘাসের ওপর বসে ডান পা এগিয়ে ধরে ঘুঙুর বাঁধলো।

শাহজাদা দারা বললেন, মশালটা দাও তো।

—কী করবেন হজরত ? আমায় বলুন। বাঁদি হাজির—

—আরে না না। তেমন কিছু নয়। পরচুলাটা খুঁজে নিতাম। কোন: কাঁটা ঝোপে লটকে পড়ে আছে। পরচুলাটা মাথায় দিতে চাইলেন দারা। লাট্টুশাহর দিক দিয়ে ফিরবেন।

—বন্দেগান। ফের আপনার ফকিরের জালসাজিসের কোনো দরকার নেই।

শাহজাদা দারাশুকো বেশ অবাক হলেন। শাহজাদার ইচ্ছাই হুকুম। শাহজাদার ইচ্ছাই কানুন। এর ওপর তামাম হিন্দুস্থানে শুধু একজনই কথা বলতে

পারেন! তিনি আব্বা হুজুর হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান। আরও দুজন সময়ে সময়ে বলতে পারেন—বলেও থাকেন। তাঁদের একজন বাদশা-বেগম শাহজাদী জাহানারা। মহম্মদ দারাশুকোর বাজি। অন্যজন হলেন নাদিরা—শাহজাদা-বেগম। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ানো রানাদিল কোন সাহসে তাঁর মুখের ওপর বলে—ফকিরের জালসাজিসের কোনো দরকার নেই।

মশালের আলোয় দারাশুকোর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালো রানাদিল। দাঁড়িয়েই মাটিতে বাঁ পায়ের ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুঙুরগুলোকে এক দমকে জাগিয়ে দিলো। দিয়ে বললো, ফকিরের সঙ্গে যমুনার তীরে নাচুনিকে মানায় না হুজরত! আমি নাচবো হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার সামনে। তাঁকেই তো আমি নাচ দেখাচ্ছি।

শাহজাদা দারা বলতে গেলেন—আমি ফৌজদার-ই-হিসার। বারো হাজারি মনসবদার। বাদশা শাহজাহানের বড় শাহজাদা। আমি এভাবে অন্ধকার রাতে যমুনার পাড়ে দাঁড়িয়ে কোনো নাচিয়ে মেয়ের নাচ দেখতে পারি না। আমাকে তা মানায় না।

ঘুঙুরের জোর আওয়াজের ভেতর শাহজাদা যেন কী বলে উঠলেন। মশালটাকে নরম মাটিতে অনেকটা গেঁথে দিয়ে রানাদিল ঘুঙুরের বোল বাজিয়ে একদম কাছে ছুটে এলো। এসে বললো, হুজরত ধরুন না—এটাই আপনার দেওয়ান-ই-খাসের দরবার। দরবারের মজলিশ!

শাহজাদা আর কোনো কথা বললেন না। তাঁর সামনে মশালের শিখার মুখোমুখি রাজধানীর সাধারণ মানুষজনের সস্তার নাচুনি রানাদিল কোমর ভেঙে ঘুর্ণী খাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ঘুঙুর ঝাঁকানো পা দুর্বা ঢাকা নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে টেনে তাল তুলছে রানাদিল।

দেখতে দেখতে মনটা উন্মনা হয়ে পড়লো শাহজাদার। রাজধানী আগ্রার জীবন কী কঠিন। অন্তত এই রানাদিলের পক্ষে। কেননা আগ্রায় একজন আওরতের পক্ষে কাজ বলতে তো শয়তানপুরার মাঠকোঠায় উড়ে গিয়ে তওয়াইফি করা। খদ্দের-মেহমানের খাতিরদারি করে গান শোনানো—কিংবা নাচ দেখানো। সে পথ না নিয়ে জানবাজ, জিদ্দি এই জেনানা খোলা রাস্তা নিয়েছে। ফেলো কড়ি দ্যাখো নাচ—নয়তো ভাগো। সেই আওরত তার উধার শোধের নাচ দেখাচ্ছে এখন আমাকে। এই দশায় এখন যদি আমাকে দেওয়ানখানার কাছারির কোনো তসিলদার কিংবা মুকন্দর দেখতে পায় তো তার চোখ কপালে উঠে যাবে।

যমুনার বুক জোড়া আঁধার। তার দু'পাশে আঁধার। এর ভেতর ওপারে খানিক জায়গা জুড়ে আলোর দেওয়ালির ভেতর তাজমহল একটু একটু করে মাথা ঠেলে উঠছে। আর এপারে সবেধন মশালের দাপানো শিখা যেন এমন আঁধারের বুকে রানাদিলকে কুঁদে দিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দে শাহজাদা দারাশুকোর বুকটা ভরে উঠলো। আসমানের নিচে আমার এত বড় দরবার! যেখানে কিনা বুনো পাখির

মতোই অনেকটা জায়গা জুড়ে রানাদিল ইচ্ছেমত দৌড়ে, নেচে, ঘুঙুরের বোল তুলে ভরিয়ে দিচ্ছে। কখনো দূরের আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরেও আসছে মশালের মুখোমুখি। ভরাট আলোয়।

আমি খুব নসিবি ইনসান। এ দেশের বাদশা আমার আব্বা হুজুর। এ দেশের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, মানুষজন, হাতি ঘোড়া, উট, ময়ূর, দরাঙ্গ খায়ের চুটকিলা তানকারি, আশরফি-মোহর, বুরহানপুরি ল্যাংড়া আম, নীলগাই—কী নয়? সবই আমার। আমার ইচ্ছেয় তারা আমার এই হাতের তালুর নিচে। এই দুনিয়া কী বিশাল! ভরাট রঙদার। জানি—যা দেখি—তা-ই দুনিয়া নয়। আসল দুনিয়া এই দেখা দুনিয়ার ওপিঠে! সেখানে নির্জন সান্নাটার ভেতর কান পাতলে সে দুনিয়ার সুর শোনা যায়।

তবু কেন এই দেখনসই রঙদার দুনিয়ার মজায় মজি? কেন রানাদিলের এই নাচ ভালো লাগে? শাহজাদা বুঝতে পারছিলেন—রানাদিল ফৌজি ছাউনি মাতানো ইরানি আর ছাট মেশানো চড়া তালের সস্তাই কোমর দোলানো—পা ঝাঁকানো নাচ দেখাচ্ছে। দেওয়ান-ই-খাসের দরবারি নাচের পাশে এসব দুলুনি, ঝাঁকুনি নেহায়েত ছেলেমানুষি। রানাদিলের মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছিলেন না—নিজের নাচের মোহে, দেমাকে, আনন্দে ও এখন নিজেরই তৈরি বেহেসতে ভাসছে। খানিক আগেও ঢোলকের তালে ঘুঙুর মিলিয়ে নেচে ও ক্লান্ত ছিল। আবারও এখন ঘূর্ণী হয়ে নাচছে। পসিনা মাখানো মুখখানি মশালের আলোয় ঝকমক করে উঠলো রানাদিলের।

তাকে যেন আজ আনন্দে পেয়ে বসেছে। এ নাচ সে শয়তানপুরার মাঠকোঠায় বড় বড় ইরানি তরওফাওয়ালির খোলা দরজায় উঁকি দিয়ে কয়েক ঝলক দেখেছে মাত্র! সেখানে ফৌজের ওপর দিককার আহেদিদের আনাগোনা। বাকিটা রানাদিল নিজের মনোমত করে বানিয়ে নিয়েছে। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার মতো মানুষকে কোনোদিন যে আলাদা করে নিজের নাচ দেখাতে পারবে তা ভাবতেও পারেনি রানাদিল। অন্ধকারের ভেতর মশালের খানিক আলো মেখে ঢিলা খিরকা-আলখাল্লায় ঢাকা শাহজাদা দারাশুকো যেন সবে ডগডগিয়ে ওঠা কোনো তেজী পিপুল গাছের মতোই দাঁড়িয়ে আছেন। কে বিশ্বাস করবে—আজ সন্ধে রাতে এই মানুষের বুকে মাথা রেখে আমি কিছুতেই আমার কান্নাকে বশ মানাতে পারছিলাম না। কেন কাঁদছিলাম তাও জানি না। কেন যে এখন এমন আনন্দে নাচছি তাও জানি না।

নিজের বুকটা এখন কেমন হালকা হালকা বোধ হলো দারাশুকোর। এই বুকে খানিক আগে রাস্তার নাচিয়ে এক আওরত তার জলে ভেজা চোখ ডলছিল। সে যে কী রকম লাগে তা আগে কোনোদিন জানতেন না শাহজাদা। নাদিরা বেগম তাঁর বুকে মাথা রেখেছেন। কিন্তু সে রাখা একদম অন্যরকম।

নাদিরার মতো এই রানাও বদনসিবির শিকার। কিন্তু দু'জন যেন দু'রকমের। বদনসিবির দিনগুলো পেরিয়ে এসেও নাদিরার মুখে-চোখে সব সময়ের জন্যে এক দুখিয়ারির ছায়া ভেসে থাকে। এমনকি ঘুমন্ত নাদিরার মুখের ওপর ঝুঁকে

সেই ছায়াই দেখতে পেয়েছেন দারা। একজন আওরত কখন রাস্তায় নাচতে নামে? নিশ্চয় খুশনসিব থেকে নয়। হিন্দুস্থান—হিন্দুস্থানের রাজধানী আগ্রা পুরোপুরি মরদের দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় রানা তার রুটি কামায় মরদের পাশাপাশি গায়ের পসিনা ঝরিয়ে। নেচে। হেসে। কথায় বার্তায় হাসি-ঠাট্টার আমেজ ছড়িয়ে দিয়ে। কোত্থেকে এই খুশিয়ারির মুখোশটা রানাদিল যোগাড় করে? যেন বা সুফী সন্তদের মতোই একটা শান্তির ভাব পাকাপাকি বজায় করে এই আওরত জীবনের ধ্যানে বসেছে। সে ধ্যান ওর নাচ। সেই ধ্যানেই ওর রুটি।

দেওয়ান-ই-খাসের দরবারি মজলিশের নাচিয়ে গুলরুক বাইয়ের হাত পায়ের কথকী ভাউয়ের ঢং ঢাং যেন উঠে এলো এইমাত্র রানাদিলের নাচের ঘূর্ণীতে। বেশ মেজাজেই নাচছে রানাদিল। যমুনার ঠান্ডা বাতাসে যা দু'একটা বুনোপোকা উড়ে এসে মশালে পড়ছে—তারা বেশ শব্দ করেই পুড়ে যাচ্ছে নিমেষে। কেননা, মশালের আগুন এখন রীতিমত দাউদাউ।

শাহজাদা দারা আকবর বাদশার পোড়ো রাজধানী ফতেপুর-সিক্রিতে বাদশার তখনকার হারেম দেখেছেন। তাতে নাকি পাঁচ হাজার আওরত থাকতো। সে হারেম দেখাশুনো করতে মেয়েদের ভেতর থেকে বাছাই করে দারোগা রাখা হতো। রানাদিলের মতো নাচিয়েরা হয়তো হারেমে থাকতো। শাহী যখন লড়াই, হামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়ে—হারেম তখন তার কোনো খবরই রাখে না। সেখানে হয়তো তখন মখমলের ডোরিয়া, কথকের ভাউ—এসব নিয়েই মাতামাতি চলে।

একটা শাহী কী বিপুল। তার কতটুকুই বা দেখা যায়। আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান এখন বিজাপুর-গোলকুন্ডা নিয়ে ব্যস্ত। রাতের আঁধারে ফৌজ কুচ করে দক্ষিণে চলেছে। আর রানাদিল নিশ্চিন্তে আমায় তার নাচ দেখাতে ব্যস্ত। খানিকবাদে সে আর আমি এখান থেকে চলে যাবো। তখন সারা জায়গাটা যমুনার বুক থেকে উঠে আসা অন্ধকারে ঢেকে যাবে। দুনিয়ার আলাদা কী যেন একটা মানে আছে। মানুষ একদিন সে মানে জানতো। আজ আমরা তা হারিয়ে বসে আছি। কিছুতেই মনে আসে না। মাঝে মধ্যে ঘুমের ভেতর খোয়াব সেই হারানো মানে খুঁজে পাই। কিন্তু ঘুম ভাঙলেই তা আবার হারিয়ে যায়। চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না। কেন এমন হয় খোদাতালা? আমাকে এই দুনিয়ার বীজে নিয়ে চলো। তোমার দরবারে আমার জান হাজির।

—ও কী?—বলতে বলতে লাফ দিয়ে সামনে ছুটে গেলেন দারাশুকো। অন্যমনস্ক শাহজাদা খেয়ালই করেননি—তাঁর চোখের সামনেই নাচুনি রানাদিলের পায়ে নাচের তাল কখন কেটে গেছে। সে টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল।

দারা এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ধরে ফেললেন রানাকে। কী হলো! পড়ে যাচ্ছো যে। থামো এবারে—

রানাদিল দমবার নয়। সে শাহজাদার হাতের বাঁধনের ভেতর ফের উঠে দাঁড়াতে গেল। ছেড়ে দিন আমায় হজরত। ছেড়ে দিন—

—না। সেই কখন থেকে নাচছো। আমি বসছি মাটিতে। তুমি খানিক শুয়ে থাকো।

শাহজাদা এমন অবস্থায় কখনো পড়েননি। নাদিরা বৈ কখনো আর কারও মাথা তিনি নিজের কোলে নেননি। মশালটা নিভু নিভু। একদম নিভে গেলে বাঁচেন শাহজাদা। গায়ে ফকিরের খিরকা আলখাল্লা। অথচ মুখ দেখলে যে কেউ চিনে ফেলবে—তিনি শাহজাদা দারাশুকো। বদকশানি পরচুলাটা পড়ে আছে যমুনার জলের গায়ে।

এ তো চোখ চায় না। কী মুশকিল! দারা ভালো করে তাকালেন রানার মুখে। ক্লান্ত। ঘামে ভিজে সারা মুখ। এলো চুলে গুচ্ছের ধুলো। পরনের ঘাগরাটি ডানদিকে পায়ের ওপর অনেকটা উঠে এসেছে। আরে! এ আওরত তো বেহুঁশ!

কী হবে এখন? শাহজাদা তো উঠতেও পারছেন না। তিনি উঠতে পারলে যমুনা থেকে জল এনে ঝাপটা দিতে পারতেন। এখানে এভাবে বসে থাকাও এখন বিপজ্জনক। রাত বাড়ছে। খানিক বাদে এই পথ দিয়েই হয়তো ফৌজি সেপাইরা যমুনা পেরবে। যাবে দক্ষিণে। মাসখানেক ধরেই যাচ্ছে। রাতে রাতে ফৌজি রসদও এ-পথ দিয়ে নদী পেরয়।

শেষ চেষ্টা করতে দারা রানাদিলের ঠোঁট ফাঁক করে মাথা নিচু করে খুব জোরে ফু দিলেন। পরপর দু'বার। নাঃ! কিছুই হলো না। অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। অথচ একটু আগে দিব্যি ঘূর্ণী হয়ে ঘাগরার ঘের তুলে নাচছিল রানাদিল।

মশালটা একদম নিভে গেল। জায়গাটা হিন্দুস্থানের আর পাঁচটা দেহাতের মতোই অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার ওপর শুধুই আসমান।

হিন্দুস্থান তো থেমে নেই। সেখানে নদীতে নদীতে ঢেউগুলো সর্বদাই আগের চেয়ে একদম অন্যভাবে ভেঙে ভেঙে জলে মিশে যাচ্ছে। মাটিতে মাটিতে নতুন নতুন উদ্ভিদ তাদের অঙ্কুর প্রাণের খোঁজে, জলের খোঁজে, আলোর খোঁজে ঠিক ঠিক জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। তারা ভরা আসমান এক একজন হিন্দুস্থানির চোখে রোজ রাতে এক এক রকম দেখায়। কোনো একজনের দেখার সঙ্গে আরেকজনের দেখার কোনো মিল থাকে না। এতসব কিছুর ভেতর বাদশা শাহজাহান আগ্রা দুর্গের অন্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখেন, যমুনার ওপারে তাজমহল কতটা উঠলো। তাঁর ভারি আফসোস—দিল্লির গায়ে নতুন তৈরি রাজধানী শাহজাহানাবাদ লোকমুখে চলতি কথায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে—শুধুই জাহানাবাদ। কেউ আর কষ্ট করে শাহজাহানাবাদ বলতে চায় না। মানুষ বড় অলস। কষ্ট করে শাহ কথাটা বসাতে পারে না কেন জাহানাবাদের আগে। সেই কবে প্রায় চল্লিশ সন আগে তার পরদাদা আকবর বাদশা দক্ষিণকে মুঘলশাহীর তাঁবে আনার কোশিশ শুরু করেন। সেই শুরুয়াৎ এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলো। দক্ষিণে সুবেদার এখন শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর।

দক্ষিণে রাত গভীর হলে তবেই না বাতাস ঠাণ্ডা হয়।

খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা, আহমদনগর—এই চার সুবা নিয়ে বিশাল এলাকার মাথায় এখন একজন তরতাজা মুঘল। তাঁর বয়স মোটে আঠেরো। তিনি শাহজাদা মুহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর। সুবা আহমেদনগরের দৌলতাবাদ থেকে পাঁচ ক্রোশের মতো দক্ষিণে তাঁরই নামে নাম—ঔরঙ্গাবাদে এখন তিনি। ঠিক এই সময় সন্ধেরাতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব সাতপুরা পাহাড়ের দকে মুখ করে বসে আছেন। সন্ধে রাতে বাইরের আকাশ অন্ধকার। একটু বাদে তারা ফুটবে। তাঁর চোখের সামনের রাস্তাও এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। এই রাস্তা দিয়েই আলাউদ্দিন খিলজির ফৌজ পরপর তিনবার পাহাড়ী ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে দৌলতাবাদ দুর্গ দখল করে। সেখান থেকে তাল তাল সোনা নিয়ে যায়। তখন দৌলতাবাদ নাম হয়নি ওখানকার। নাম ছিল দেবগিরি। এসব তিনশো বছরেরও আগেকার কথা। তারও পরে প্রায় তিনশো বছর আগে সুবা আহমেদ নগরের ওই দেবগিরি নগরেই মহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী সরিয়ে নেন। দেবগিরির নাম বদলে তার নাম দিলেন দৌলতাবাদ।

সারাদিনটা আজ ঘোড়ার পিঠেই কেটেছে শাহজাদার। চার চারটি সুবার মাথার ওপর সুবেদার-ই-আজম হয়ে থাকার ঝক্কি যে অনেক। এই বিশাল এলাকায় এখন অব্দি চৌষট্টিটি কেল্লা মুঘলশাহীর ধ্বজার নিচে আনা সম্ভব হয়েছে। এখনো আরও দশটি কেল্লা আগ্রার কাছে মাথা নোয়ায়নি। সেইসব শায়েস্তা, হামলার তোড়জোড়েই ভোর থেকে সন্ধে অব্দি কোত্থেকে কেটে যায় তা টেরও পান না শাহজাদা আরওরঙ্গজেব বাহাদুর।

একটু একটু করে চাঁদের মুখ ভেসে উঠছে সাতপুরা পাহাড়ের ওপারে। এবার সুবেদার-ই-আজম শাহজাদা আওরঙ্গজেব চিঠি লিখতে বসলেন। এ চিঠি আগ্রার ডাকে যাবে না। কিন্তু আগ্রাতেই যাবে। গোপন পথে। কাসীদের হাত দিয়ে।

বাজি শাহজাদী রৌশন,

আজ ১২ই জিলকাদা, ১০৪৫ অল হিজরি। তোমার ছোটেভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব তোমাকে চিঠি লিখছি ঔরঙ্গাবাদ থেকে। আমার চোখের সামনে সাতপুরা পাহাড়ের কোলে এইমাত্র চাঁদ উঠলো। খোদার রহেমে আমি এখন জান আর দিলে সহি সলামত আছি। তুমি হুকুম করলেই তোমার জন্যে এই ছোটে-ভাইয়ের জান হাজির।

পাঁচ বছরেরও বেশি হয়ে গেল—আমাদের আম্মিজানের এন্তেকাল হয়েছে। আগ্রা থেকে সুদূরে এই ঔরঙ্গাবাদে বসে বারবারই আম্মিজানের কথা মনে পড়ছে আজ। এখন আমি যেখানে বসে তোমায় চিঠি লিখছি—যে বিশাল এলাকায় আজ আমি বলতে গেলে সুবেদার-ই-আজম—এখানেই আম্মিজান আমাদের নিয়ে হাতির পিঠে গাদেলায় বসে আব্বা হুজুরের পেছন পেছন মাঠ ভেঙেছেন। আম্মিজানের সে-চলার ভেতর হিন্দুস্থানের দিনরাত মিশে আছে। মিশে আছে সূর্যোদয়—সূর্যাস্ত। গোধূলি—কাকভোর। নিশুতিরাত—প্রখর দ্বিপ্রহর।

আমাদের আব্বা হুজুর—তখনকার শাহজাদা খুর্রম তখন বাগী। তিনি মুঘল ফৌজের তাড়া খেয়ে কোথাও এক রাতের বেশি থাকেন না। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা তখন কত ছোট। আজ সেই এলাকায় আমি বেরার, খান্দেশ, তেলিঙ্গানা, আহমদনগর—চার চারটি সুবার ওপর বলতে গেলে আগ্রার সুবেদার-ই-আজম। এ যেন হিন্দুস্থানের ভেতর আরেক হিন্দুস্থান। এখানকার সাতপুরা পাহাড়, নর্মদা-তাপ্তি-গোদাবরীর মতো সব নদী, বুরহানপুর, ইলিচপুর, নান্দের, ঔরঙ্গাবাদের মতো সব নগর—আসিরগড়, আহম্মদনগর, দৌলতাবাদের মতো সব দুর্গ—সব, সব আমার অধীনে। এই বিশাল এলাকায় সনভর খাজনায় আদায় হয় পাঁচ কোটি তন্‌খা।

তোমার আগের চিঠির জবাবে লিখেছিলাম—এই দাক্ষিণ নিয়ে সেই পরদাদা সাহেব আকবর বাদশার আমল থেকেই আগ্রার কত চিন্তা-ভাবনা। প্রায় চল্লিশ বছর হতে চললো—দাক্ষিণ নিয়ে আগ্রা শুধুই ভেবে চলেছে। এবার ভাবনা থামিয়ে কাজে নেমে পড়া দরকার। আমি তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই—গোলকুণ্ডা কিংবা বিজাপুরে মুঘল ফৌজ ঢুকলেই ওখানকার সুলতানি কী ভাবে ভেঙে পড়বে। এই কথাটাই তোমাকে আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের কানে তুলতে হবে। তবে সময়মত। আবার এটাও আমার আশঙ্কা—বাজি শাহজাদী জাহানারা আর বড়েভাই শাহজাদা দারাশুকো যেভাবে আব্বা হুজুরকে ঘিরে রেখেছে—তাতে তুমি কি আব্বা হুজুরের কাছাকাছি হয়ে ওসব কথা তাঁর কানে তুলতে পারবে? বিজাপুর, গোলকুণ্ডা মুঘল ধ্বজের নিচে না আসা অব্দি হিন্দুস্থানের যেন কী বাকি থেকে যায়। একথাটা সবচেয়ে ভালো বুঝতেন পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা। আমাদেরও এটা মগজ দিয়ে বুঝতে হবে।

আশা করি বড়েভাই দারাশুকোর কার্ফোর যোগাযোগ আরও বেড়েছে। যতসব পাগল আর সন্ন্যাসীদের জন্যে তিনি নিশ্চয় দোর খুলে বসে আছেন। কবে যে আব্বা হুজুর এইসব রাফিজি বন্ধ করবেন জানি না।

এই দাক্ষিণেই আব্বা হুজুর একসময় সুবেদারি করে গেছেন। এই দাক্ষিণ থেকেই আগ্রার ভাগ্য স্থির হয়ে থাকে। এখানকার জমি ভালো ফসল দেয়। এখানকার খনিতেই হীরে পাওয়া যায়।

আজ যে আগ্রা দাক্ষিণকে চারসুবায় ভাগ করে ঔরঙ্গাবাদে আমাকে বসিয়েছে শাসন করতে—তার বীজ রয়েছে এই দাক্ষিণেরই তওয়ারিখে। মহম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদকে বেশিদিন তাঁবে রাখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। ওখানে আমির ওমরাহরা একজোট হয়ে আলাউদ্দিন হাসান বাহমনি শাহকে সুলতান করে বসান। সেই স্বাধীন সুলতানই প্রথম দাক্ষিণকে চারভাগে ভাগ করে বুরহানপুর, ইলিচপুর, নান্দের, দৌলতাবাদে চার চারজন সুবেদার বসিয়েছিলেন। আজকের আগ্রা সেই পথটাই নিয়েছে মাত্র।

ভাবছি—আমার রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাবো। এ ব্যাপারেও আব্বা হুজুরের কানে কথাটা তুলে আমার হয়ে বাদশার কাছ থেকে তোমাকেই ইজাজত আদায় করে দিতে হবে। ঔরঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদ পাঁচ

ক্রোশের মতো উত্তরে। ক'বছর হলো আমাদের হাতে আহমেদনগরের নিজামশাহীর পতন ঘটেছে। ওদের রাজধানী ছিল এই দৌলতাবাদেই। ওদের ফতেখান এখন মুঘলদের মাসোহারায় বেঁচে আছে।

উঁচু পাহাড়ের ওপর বিশাল জায়গা নিয়ে দৌলতাবাদ দুর্গ। সেই পাহাড়ের পায়েই দৌলতাবাদ নগর। আমি ওই দুর্গে উঠে যেতে চাই—কারণ এ দুর্গ বড় জবরদস্ত। দুশমনকে ওপরে উঠতে হলে পাহাড়ের গভীর নালা পেরতে হবে। যে-নালা পাহাড়ী ঝরনার জলে ইচ্ছেমত ভরে দেওয়া যায়। কেল্লায় উঠতে পাথরের টানা সেতু আছে। সেই সেতু সহজেই ঝরনার জল ছেড়ে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। এসব পেরিয়েও যদি দুশমন ওপরে ওঠে—তবে তাকে একটি পাহাড়ী সুড়ঙ্গ দিয়ে দুর্গের উঠোনে গিয়ে পড়তে হবে। মজার কথা—কেল্লায় ঢুকতে এই একমাত্র ঘূর্ণী সুড়ঙ্গ কাঠের আগুন জেলে ধোঁয়ায় ভরে দেওয়া সহজ। তাই করলে কোনো শত্রুর পক্ষেই দুর্গে ঢোকা অসম্ভব। এমনিই সুড়ঙ্গপথ খুবই অন্ধকার। এ ছাড়াও ছত্রিশটি তোপ বসাবার আশ্চর্য সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে পাহাড়ের ওপর। ওখান থেকে তোপ দেগে নিচের দুশমনকে উড়িয়ে দেওয়া কিছুই নয়। দুশমন যদি বুকে হেঁটেও ওপরে উঠে আসতে চায়—তাহলেও পারবে না। কেন না, খোদার ইচ্ছাতেই ওই পাহাড়ের গা খুবই মসৃণ। কোনো ইনসান ওভাবে উঠতে গেলে পিছলে পড়ে যাবে।

আমি চাই রৌশন—তুমি আমার রাজধানী দৌলতাবাদে সরিয়ে নেবার কথাটা সবদিক বুঝেসুঝেই তবে আব্বা হুজুরের কানে তুলবে। যেন শুনেই না তিনি ঐ আর্জি বাতিল করে না দেন। ও কথাটা পাড়ার আগে বলে নেবে—দক্ষিণ থেকে তোমার ছোটে ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব খাজনার পাঁচ কোটি তনখাই উসুল করে আগ্রার শাহী খাজনাখানায় হাসিল করেছে। একথা শুনলে পর বাদশার মেজাজ শরিফ থাকবে।

দক্ষিণের উর্বর জমি, জবরদস্ত কেল্লা, খনির হীরে, বিজাপুর-গোলকুণ্ডার জহরত তোমার ছোটে ভাইকে তাগদ জোগাবে। সুদিন এলে তোমার ছোটেভাই সবচেয়ে আগে যাকে মনে করবে—সে হলো গিয়ে তুমি—মুঘলশাহীর দুসরি শাহজাদী রৌশনআরা।

ইনসাহল্লা। আহমেদনগর মুঘল ধ্বজের নিচে এসে গেছে। এই দক্ষিণ থেকেই আব্বা হুজুর শাহজাদা থাকতে থাকতে তাগদদার হয়ে ওঠেন। আমিও হয়তো কোনওদিন দক্ষিণের এই দৌলতাবাদ থেকেই নসিবের সুন্দর মুখখানি দেখতে পাবো। কে জানে। তবে একথা জানি—যেদিন নসিবের সুন্দর মুখখানি দেখতে পাবো—সেদিন আমি একা তা দেখবো না। সেই সুসময়ে তুমি আমার পাশে থাকবে।

একটি বিষয় তুমি আব্বা হুজুরকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে। দক্ষিণে আমি সুবেদার-ই-আজম হয়ে আসবার আগে থেকেই—বলতে পারো প্রায় তিন বছর আগে আহমেদনগরকে মুঘলশাহীর ধ্বজের নিচে আনার সময় থেকেই সারা দক্ষিণে, গুজরাতে খরা আর অব্যবস্থার দরুণ দুর্ভিক্ষের দশা চলছে। দক্ষিণের

কী দেহাত—কী কিল্লা এলাকা—সব জায়গাতেই একখানি রুটির বদলে এখন একজন জিন্দা ইনসান খরিদ করা যায়। কিন্তু হায়! তেমন খরিদ্দারও পাওয়া ভার! দলছুট সেপাইরা তাদের ফৌজি দাগ বেচে দিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু তাও কেনার কেউ নেই। যেসব জমি ফসলের জন্যে বিখ্যাত—তা আজ নিষ্ফলা। এর ভেতর আমাকে বিরাট ফৌজ বহাল রাখতে হচ্ছে। এ যে কী কঠিন কাজ—তা আমিই জানি। এক এক হামলায় আমার ফৌজই দক্ষিণের দেহাতি গাঁগুলো নিঃস্ব করে ফেলছে। না করে উপায় কী? তারাই বা খাবে কী? দেশ-গাঁয়ের এই অবস্থা ফেরাতে শাহী দেওয়ানখানার তরফ থেকে কোনো খয়রাতি দেওয়া হয়নি। চাষবাস কমে গেছে। যাচ্ছে। ফলে জায়গিরদাররা তাঁদের নিজেদের খরচখরচা চালাতে তো পারছেনই না—উপরন্তু শাহী দায়দায়িত্বও মেটাতে পারছেন না। এই অবস্থায় বিশাল ফৌজের খরচ চালাতে হচ্ছে আমাকে। সারাদিন এই কাজেই ডুবে থাকি। অন্য কিছু ভাবার সুযোগ বা সময় কোনোটাই পাই না। মনে রাখতে হবে—বিজাপুর-গোলকুণ্ডার এখনো মুঘলশাহীর তাঁবে আসা বাকি। শাহী খাজনাখানা থেকে এজন্যে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। তার কী হলো? আব্বা হুজুরকে বুঝিয়ে বলো—এজন্যে তাঁর দিক থেকে আমার অনুকূল সাড়া পাওয়া দরকার। তনখা না পাঠিয়ে আগ্রা আমাকে মুর্শিদকুলি খাঁ নামে একজন তুখোড় ইরানিকে পাঠিয়েছে। মানুষটি চাষবাস, জমি-জমা, খাজনা উসুলে খুবই দক্ষ। কিন্তু আমার যে চাই তনখা অনেক তনখা। এবং তা এখুনি চাই।

ভালো কথা। আব্বা হুজুরের জন্যে বুরহানপুরের শাহীবাগের বাদশাপসন্দ আমের পয়লা ঝুড়িটি পাঠালাম। খোদা হাফেজ।—

এই অব্দি লিখে শাহজাদা চিঠির নিচে নিজের পুরো নামটি লিখলেন। মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেব।

॥ তিপ্পান্ন ॥

আগ্রার লালচকে এখন ফুল নিয়ে বসার জায়গা নেই। সারা হিন্দুস্থানের আমের টুকরি এসে রাতে রাতে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে যায় চক এলাকা। দিনে দিনে সে আমের পাহাড় ক্ষয় হতে থাকে খদ্দেরদের আহ্লাদে। হরেক কিসিমের আম। খদ্দেরও হরেক কিসিমের। চৌসা, ল্যাংড়া, কোহিতুর যেমন—তেমনই তাদের কিনতে ক্রোরি, মুকদ্দর থেকে জায়গিরদাররা অবধি ভিড় করে আসেন। আম আসেও নানান জায়গা থেকে। ইলাহাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, ফতেহাবাদ, মুজঃফরাবাদ—এমন অনেক বাদ থেকে—পুর থেকে—ধাম থেকে—গড় থেকে। যেমন কিনা আসকাবাদ, বুরহানপুর, নৈনিধাম, আসিরগড় থেকে। আম কেনেও অনেকে অনেক কারণে। কেউ কেনে খাবার জন্যে। আবার কেউ কেনে খাওয়াবার জন্যে। রইসি কোনো টাকশালার দারোগা হয়তো দু'টুকরি কোহিতুর নিয়ে চললেন তাঁর মনপসন্দ গানেওয়ালির কোঠায়—শয়তানপুরায়—তার মন পাবার জন্যে। আবার বনজারা রসদ যোগানদার কোনো চৌধুরী চললেন একগাড়ি দশেরি আম

নিয়ে—দেওয়ানখানার কাছারির কোনো বড় আমলার হাভেলিতে—পাছে ফৌজে ঘোড়ার বলগা—রেকাব যোগানের ঠিকাটা না হাতছাড়া হয়ে যায়।

যাঁরা রাজধানীর রাস্তায় দোলায়, ঘোড়ায়, উটে বা হাতিতে চলাফেরা করেন—তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের তো এই অঝোর বৃষ্টির ভেতর রাস্তায় পা ফেলতে হয় না। পায়দল চলাফেরাই যাদের নসিব—সেই সব মানুষজনের পক্ষে এমন রাজধানীর রাস্তায় হাঁটাচলাই বড় কঠিন। এমনিতেই বৃষ্টির দরুন বাঁধানো পাথরের সড়ক পেছল হয়ে থাকে। তার ওপর আম খেয়ে খেয়ে লোকে আঁটি আর খোসা ফেলে রাখে। সারা রাজধানীতে চরে বেড়ানো গোটা বারো ধর্মের ষাঁড়ও সে-সব খেয়ে সাবাড় করতে পারে না।

মুশকিল হয় সবচেয়ে দোলা বয় যারা তাদের। দোলার ভেতর সওয়ার বসিয়ে এরা খুব সাবধানে পা ফেলে। একবার একজনের পা পেছলালে সবাইকে পড়তে হবে। আর পা পিছলে যায় সাধারণত ওইসব ছড়িয়ে থাকা আমের খোসা আর আঁটিতে। কোতোয়াল যে কেন ফরমান দিয়ে আমের খোসা ফেলা বন্ধ করেন না—অঝোর বৃষ্টির ভেতর আমের খোসা বাঁচিয়ে পা ফেলে এগোতে এগোতে এক শিবিকার বাহকরা যে যার মতো এই কথাটাই ভাবছিল। তাদের মতো বদনসিবদের কথা বলার কেউ নেই রাজধানীতে। পাছে হাতির পায়ের নিচে ওসব পড়ে—তাই ভিস্তিরাই ওগুলো একপাশে সরিয়ে দেয়। এটাও ওদের কাজের ভেতর পড়ে। হাতি যায় সড়কের মাঝখান দিয়ে। আর বাহকদের চলতে হয় রাস্তার পাশ ধরে ধরে।

এমন বৃষ্টিরে ভেতর এত বাহারি সুখদোলায় শিবিকায় যিনি চলেছেন—তিনি নিশ্চয় কেষ্ট-বিষ্টু কেউ। বেশ কিছুদিন ধরেই গোয়ালিয়র সড়ক ধরে দক্ষিণে ফৌজি রসদ চলেছে। এখন দুপুর পেরিয়ে যাওয়া মেঘলা আকাশ। ভোর থেকেই বারুদ, সোরা এসব চলেছে। তোপের মশলা। তাই নানান সাবধানী ব্যবস্থা। সড়কের মোড়ে মোড়ে পাহারা চৌকি।

সেরকমই এক চৌকিতে সুখদোলা থামিয়ে দেওয়া হলো। শাহী মীর আতশের নিজের লোকজন চৌকিতে চৌকিতে। কামানের গোলার সোরা-বারুদ পাছে দুশমনের কাসীদরা ভিজিয়ে বরবাদ করে দেয় তাই এত পাহারা, তল্লাশি, পুছতাছ। ঘোড়ার পিঠে বসা ফৌজি পাহারার কাঁধের পট্টিদার উর্দি ভিজে চাপচুপ। মাথা বাঁচানোর চামড়ার টুপিতে বসানো তামার গোল গোল চাকতি বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে ঝকঝকে পরিষ্কার। সে ওপর থেকেই হাতের বর্শার ডগা দিয়ে সুখদোলার চিলমন খুলে সওয়ার কে তাই জানার চেষ্টা করতে যাবে—অমনি একজন সিপাহী ছুটে এসে সেই ওঠানো বর্শা হাত দিয়ে আটকালো।

ঘোড়সওয়ার পাহারাটি এই চৌকির মাথা। খানিক বাদেই তার ছুটি হওয়ার কথা। ভোর থেকে বৃষ্টির ভেতর চৌকিতে মোতায়েন। এমনিতেই বর্ষায় ভিজে গা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। সে তো সাধারণ একজন পদাতী সেপাইয়ের এই সাহস দেখে খেপে উঠলো। হাত দিয়ে আমার বর্শা আটকানো? এত বড় বেয়াদপি?

সেপাই বুঝতে পেরেছে চৌকির মাথা এই ঘোড়সওয়ার রেগে এখন আগুন। সে ছুটে ঘোড়সওয়ারের কাছাকাছি গিয়ে মুখ তুলে চাপা গলায় বললো, ছেড়ে দিন হুজুর। এ সুখদোলা আটকাবেন না—

—কেন? বায়না নাকি! থামাও দোলা—থামাও। আমি তল্লাশি নেবো।

পায়দল সেপাই আরও আকুল হয়ে বললো, ও কাজটি ভুলেও করতে যাবেন না হুজুর। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। তল্লাশি নিতে গিয়ে নিজেরই ঘোর বিপদ ডেকে আনবেন কিন্তু—

এবার ঘোড়সওয়ারের টনক নড়লো। তল্লাশি নিতে গেলে ঘোর বিপদ আসবে? তার মানে দোলার ভেতর এমন কেউ চলেছেন—যিনি শাহী ফৌজের কানুনের ওপরে।

এক লহমায় আরবি ঘোড়ার ভিজে পিঠ থেকে সড়াত করে পিছলে নামলো তার সওয়ার। সে বেশ চাপা গলায় বললো, কে? ভেতরে কে? এখুনি বলো। বলতে হবে তোমাকে—

পদাতী সেপাই হাতের ইশারায় দোলাকে এগিয়ে যাবার সংকেত দিতেই বাহকরা মুহূর্তে পাহারা চৌকি পেরিয়ে গেল। যেতেই সেই সেপাই বেশ রহস্য ভরা গলায় বললো, গরিবের কথাটা শুনে ভালোই করেছেন—

—আঃ! আসল কথাটা বলবে তো?

—বলছি হুজুর। এইমাত্র সুখদোলায় যাকে আপনি যেতে দিলেন তাঁকে সারা রাজধানী চেনে। আগে সবসময় আগ্রার রাস্তায় তাকে দেখা যেতো। এখন তাকে সব সড়ক ঢুঁড়েও খুঁজে পাবেন না কোথাও!

—তোমায় আমি এবার চাবকাবো উজবুক। কে ছিলেন সুখদোলায়?

—নাম শুনলে আপনি আমায় কোড়া দিয়ে না মেরে লালচকের সেরা কোহিতুর কিনে খাওয়াবেন।

—বলোই না কে?

—শুনুন তবে। উনি হলেন গিয়ে দারাদিল!

—দারাদিল? সে কে?

—হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা—সরকার-ই-হিসার, রানাশুকোর—

—রানাশুকোর? এ নামে তো কোনো শাহজাদা নেই।

—ওই হলো হুজুর। একই তো কথা! শাহজাদা, রানাশুকোর জান আর দুনিয়া এখন—ওই দারাদিল!

—ওঃ! বলে সামান্য হাসলো চৌকি পাহারার ঘোড়সওয়ার। মনে মনে বললো, ওঃ! খুব বাঁচা বেঁচে গেছি!

—এ হলো গিয়ে হুজুর আশিকি ব্যাপার। এখানে হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা আশিক। আর রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় একসময় নেচে বেড়ানো এক নাচুনি তাঁর মাশুকা। আশিকিতে সব হয় হুজুর। সব। দারাদিল আর রানাশুকো—নাম দুটো দেখছি শুধু আপনারই কানে যায়নি। নয়তো ও-দুই নাম তো এখন রাজধানীর সবাই জানে।

ঘোড়সওয়ার গম্ভীর গলায় বললো, যাও। নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।

পদাতী সেপাইটি মনে মনে বললো, এই বদরসিক। রাজপুত ঘোড়সওয়ারদের মেজাজের কোনো ঠিক নেই। সে বৃষ্টির ছাট যতটা বাঁচিয়ে চলা যায়—তাই খেয়াল রেখেই রাস্তার গায়ে নিমগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। এই যে এত বড় রাজধানী আগ্রা—এখানে সবসময় বড় বড় মনসবদার, শেঠ, কারোবারি, আমিরদের চলাফেরা। ওই যে বিশাল আগ্রা দুর্গ—ঝড়, জল, রোদে যার কোনো লয়-ক্ষয় নেই—ওখানে থাকেন মুঘল বাদশা—তামাম হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কাজটা আমার ছোট- কিন্তু এইসব বড় বড় ব্যাপার—লোকজনকে নিয়েই আমাকে সবসময় চলতে হয়। কখন কে গেলেন—কে এলেন—সব খেয়াল রাখতে হয়। ওই রাজপুত ঘোড়সওয়ার বেটা আমার মাথার ওপর। ইরানি-তুরানি ঘোড়সওয়াররা মাস মাইনে পায় পঁচিশ তনখা। ও ব্যাটা হিন্দুস্থানি বলে কুড়ি তনখা পায়। আমার মাস মাইনে পাঁচ তনখা মাত্র। অথচ আমাকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে সুখদোলার ভেতর কে ওড়নায় মুখ ঢেকে চলেছে! দারাদিল। না, রানাশুকো! চল্লিশ দামে এক তনখা। তার মানে মাস গেলে পাই দুশো তনখা। বাহারে নসিব! পিঠে বাঁধা চানা চিবিয়েই মাসের ভেতর দশটা দিন কাটাতে হয়।

ঠিক এই সময় শাহজাদা দারাশুকো হাতের খাগের কলমটি নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। লিখতে লিখতে কলমের ডগা ভোঁতা হয়ে এসেছে। চোখের সামনে খোলা পাতা। পৃষ্ঠা একশো পঁচাশি। কয়েক বছর ধরে তিনি সুফী সাধকদের জীবন—তাঁদের কাজ—কাজের খুঁটিনাটি যোগাড় করে লিখে চলেছেন। খুব ধারালো একটি ইরানি ছুরি নিয়ে খাগের ডগা বেশ সরু করে ছেঁটে ফেললেন শাহজাদা। এবার লেখা পরিষ্কার হবে। ফের তিনি লিখতে শুরু করলেন। হিন্দুস্থানে মুসলমান সাধকরা বহুদিন ধরে কাজ করে আসছেন। কত কত সাধক কতদিন ধরে এদেশের ধুলো-মাটিতেই নিঃশ্বাস নিয়েছেন। কী বিরাট তাঁদের ইতিহাস। কবে এই দুনিয়ায় তাঁরা পয়দা হলেন। কবেই বা তাঁরা বিদায় নিলেন। সময় দেখে দেখে তাঁদের জীবনী সাজিয়ে সাজিয়ে লেখা। বিশাল কাজ। এমন সাধকের খোঁজ পেয়েছেন তিনি চারশো এগারো জনের মতো।

ইসলাম হিন্দুস্থানে আসার পর ইসলামের রহস্যের ভেতর কোথায় যেন সুক্ষ্মভাবে হিন্দু দর্শনের মাখামাখি হয়ে গেছে। তাই তো মনে হয় শাহজাদার। প্রায় ছ'শো বছর আগে আলবেরুনি—বছর পঞ্চাশেক আগে আবুল ফজল। হিন্দুদের ষড় দর্শন মুসলমান সমাজের সামনে তুলে ধরেন। পরদাদা আকবর বাদশার আমলেই হিন্দুর মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত ভাগে ভাগে ফারসি হতে লাগলো। নলদমন কাহানি ফারসিতে পাওয়া গেল। এদেশে সব যেন মাখামাখি হয়ে গিয়ে একটি কথাই ফুটে উঠছে—সব ধর্মের যাত্রা সেই এক ঈশ্বরের দিকেই।

ইসলাম হিন্দুস্থানে এসেছে তিনটি খোলা দরজা দিয়ে। আরব বণিকদের

জাহাজে চড়ে। ইরান থেকে সিন্ধুতে ডাঙায় ডাঙায়। আর খাইবারের পাহাড়ি পথ ধরে। সাধকরা বহুদিন আগে থেকেই এইসব পথ দিয়ে নানান দুঃখ সহ্য করে হিন্দুস্থানে এসে পা রেখেছেন। শাহজাদার মনে হলো—তবু যদি বলা যেতো তাঁদের চেষ্টা বেশ সফল হয়েছে! আকবর বাদশার আমলের মোল্লা বদায়ুনি তো খোলাখুলিই বলেছেন, কাফেরদের ওসব জিনিস ফার্সিতে আনাও গুণাহ্—পাপ।

তবু আমি থেমে থাকবো না। আমার এই প্রথম বইয়ের নাম দিলাম—সাফিনাৎ-উল-আউলিয়া। নিজের লেখা খোলা পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন শাহজাদা। শুরুতে হজরত মহম্মদ, চার খলিফা, তিন আমির-উল-মুমিনিন আর আঠেরো জন ইমামের জীবনের কথা।

তারপর এসেছে কাদিরিদের কথা। এখন অব্দি লিখতে পেরেছি তিনশো এগারোজন সাধকের জীবনী। কাদিরিদের সুরাবর্দি, চিস্তিয়া, নকসবন্দী যা সব ধারা তার বাইরেও অনেক সাধক ছিলেন। তাঁদের কথাও কিছু কিছু এসেছে। এবার লিখতে হবে পয়গম্বরের স্ত্রী, তাঁর মেয়েদের জীবনের কথা। আর লিখতে হবে কয়েকজন সাধিকার কথা। সব মিলিয়ে মোট চারশো এগারোজন।

জামিরের লেখা নফৎ-উল-উনসের না পড়লে এই লেখায় এগোতেই পারতাম না। আমি নিজেও একজন কাদিরি। পীরদের নফর আমি দারাশুকো—হানিফি—কাদিরি—শাহজাহানের ছেলে। যেখানে যেটুকু পাওয়া যায় তা আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। সাধকদের নাম, পয়দায়িসের দিনক্ষণ, কাজকর্ম এই বইতে আমি তুলে ধরছি। ভুল থেকে যেতেই পারে। নফৎ-উল-উনস্, তাওয়ারিখ-ই-হাফিজি, তবকৎ-ই-সুলতান-ই-তে ওইসব সাধকের সবার জন্ম তারিখ পাইনি। ফলে আমাকে যা হাতড়াতে হচ্ছে—তা আমিই জানি। সন-তারিখ দেখে দেখে এইসব সাধকের জীবনী সাজানো যে কী কঠিন।

খোলা পাতার এক জায়গায় শাহজাদার চোখ আটকে গেল। ছেষট্টি পৃষ্ঠা। দারাশুকোর চোখে জল এসে গেল। মিঞা মীরের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাতের কথা। গত সনে মহরমের ক'দিন পরেই তাঁর এন্তেকাল হলো। লাহোরে আলমগঞ্জ আর গিয়াথপুরের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে কফিপুরায় যাবার সেই রাস্তা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হিমেল জ্যোৎস্নায় রাভির পাড়ে অড়হড়ের খেত থেকে খুসবুদার হাওয়া আসছিল সেদিন। রেড়ির শুকনো ডাল আর মাটি দিয়ে বানানো হুজুরের আস্তানা শাহজাদা আগ্রা দুর্গে বসে বর্ষার এই বিকেলে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন। এন্তেকালের খবর পেয়ে তিনি লাহোরে ছুটে যেতে পারেননি। নাদিরা বেগম তখন খুবই ভুগছিল। শাহজাদা দারার পহেলা আওলাদ সুলেমানশুকোর তখন মোটে পাঁচ মাস। শাহজাদার বড় ইচ্ছে—কফিপুরায় মিঞা মীরের সমাধির ওপর সৌধ গড়ে তোলেন। সেখান থেকে লাহোর দুর্গ অব্দি সারাটা পথ লাল পাথরে বাঁধিয়ে দেন।

আজমির শরিফ তো বটেই—নানান্ তীর্থে ঘুরতে হয়েছে শাহজাদাকে। এই

কেতাবকে সবদিক থেকে সেরা করে তুলতেই কোনো কিছুই বাদ রাখেননি তিনি। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একশো চার, একশো ছয়, চুরানব্বই, একশো ছেষট্টি, একশো আঠারো পাতায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছিল। সেসব কথাই ওখানে লেখা।

শাহজাদা এক জায়গায় দেখলেন, পরদাদা আকবর বাদশা, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার কথাও তিনি লিখতে ভোলেননি। তবে ও'দের কথা খুবই ছোট করে লিখতে হয়েছে।

একটা ব্যাপার খুব ভাবিয়ে তুললো শাহজাদাকে। হজরতের জন্ম তারিখ নিয়ে মতের অমিল আছে। আমি তো সাহস করে ইতিহাসের আলোয় সব তুলে ধরলাম। ভাবীকাল এর বিচার করবে। তখন আমি থাকবো না। এসব লেখার সময় তিনি একদিন একটি খোয়াব দেখেন। খুব উ'চু এক জায়গায় হজরত রসুলাল্লা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক তাঁর নিচে প্রথম চার খলিফাও দাঁড়িয়ে—আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলি—সমান দূরে দূরে।

কত কী যে জানা বাকি। আফসোস। জীবন বড় ছোট। আমি কি এ-কাজ শেষ করতে পারবো? ইসলাম হিন্দুস্থানে সবচেয়ে আগে আসে দক্ষিণে। ওখানে হজরতের খুব প্রিয় মুরিদ তামিম আনসারির সমাধি রয়েছে। তিনি এসেছিলেন বড় দরিয়া পেরিয়ে। হয়তো কোনো ব্যাপারী-জাহাজে চড়ে। দক্ষিণ ইরান থেকে বালুচদের এলাকায় দরবেশরা আসেন। আসেন মাকরান পাহাড়ের দক্ষিণ দিয়ে সিন্ধুতে। খাইবারের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে তুর্কি'রা, আফগানরা হিন্দুস্থানে এসেছে। এসেছি আমরা। এসেছেন সুফীরা—দরবেশরা।

শাহজাদার মনে হলো—তবু বলা যায় না—ঠিক ঠিক কবে প্রথম সুফীরা হিন্দুস্থানে আসেন। বাবা রতন নামে এক হিন্দু সাধু ছিলেন। তিনি নাকি দুবার মক্কায় যান। দুবারই নবী হজরত মহম্মদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দোবারা দেখা সাক্ষাতের সময় বাবা রতন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুস্থানে ফিরে এসে তিনি প্রায় সাতাশ বছর বে'চে ছিলেন। তাঁর কথাও এই সাফিনাৎ-উল-আউলিয়ায় লেখার ইচ্ছে ছিল শাহজাদার। ইবন্ হাজার আসকালানিরআসবা কি মারিফতি-স-সহাবা কেতাবে বাবা রতনের কথা আছে।

লাহোরের সবচেয়ে পুরনো কবরস্থান—বিবি পাকদামনান। ওখানে সাত আওরতের কবর। ও'রা সবাই হিজরি শুরু হওয়ার প্রথম একশো বছরের সাধিকা। বিবি রুকিয়া, বিবি হুর, বিবি নূর, বিবি গওহর, বিবি তাজ, বিবি শাহবাজ—সবারই ইরানি নাম। ইরান জয় করে মুসলমানরা ওখানকার শাহ খানদানের মেয়েদের বিয়ে করেন। সাত নম্বর কবর হলো বিবি তন্নুরের। উনি ও'দের রাঁধুনি। মহরমের মাসে কারবালার প্রান্তরে এজিদ হোসেনকে ঘিরে ধরলে—হোসেন ওই আওরতদের বলেন—তাঁবু ছেড়ে হিন্দুস্থানের দিকে এগিয়ে যাও। হোসেন খুন হলেন।

অনেক রাস্তা ভেঙে ওই সাত বিবি লাহোরে এসে পে'ছিলেন। তখনকার হিন্দু রাজা তাঁর ছেলে শাহজাদাকে পাঠালেন। বললেন, রাজপ্রাসাদে নিয়ে

এসো ও'দের। ও'রা আসতে চাননি। তখন শাহজাদা হুকুম দিলেন—আসতেই হবে।

তাজবিবি শাহজাদার দিকে তাকাতেই শাহজাদা জ্ঞান হারালো। জ্ঞান ফিরে শাহজাদা ক্ষমা চাইলো। শেষে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিছুদিন এই সাতবিবি শাহজাদার দেখাশুনোয় ভালোই ছিলেন। তারপর নানান অসুবিধে দেখা দিলো। তখন ও'রা দোয়া জানালেন—আর যেন কারও মুখ দেখতে না হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে গেল। সাতজনই মাটির ভেতর চলে গেলেন। শাহজাদা এসব দেখে একদম বদলে গেলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওখানে সাতটি সমাধি সৌধও বানিয়ে দিলেন। ইসলাম নেবার পর এই শাহজাদার নাম হয়েছিল আবদুল্লা। পরে সবাই তাকে বাবা খাকী বলে ডাকতো। লাহোরে ওই পাক দামনান সমাধির ভেতর বাবা খাকীরও সমাধি রয়েছে। এই বাবা খাকীর কথা আমি লিখলাম। নিজামুদ্দিন আউলিয়া কিংবা আমির খসরুর কথা সবাই জানেন। কিন্তু বাবা খাকীর কথা ক'জন জানেন।

ইসলাম জায়গা দখল করে যতটা না পেরেছে—দিল জয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে। হিন্দুস্থানে এসে ইসলাম হিন্দুস্থানের বাইরের মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে এখানকার মাটির বসে—ইনসানের দিলের খুশবুতে অনেক—অনেক বেশি ধনী হয়ে উঠেছে। আর সে-কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন—এই সুফীরা—এই দরবেশরা। তাদের নিয়েই আমার এই সাফিনাৎ-উল-আউলিয়া। আমি আমার এ কাজ শেষ করতে পারবো? ইয়ে আল্লা! তেরি রেজা! সবই তোমার ইচ্ছা।

—আসমান আঁধার করে এলো। এর ভেতর এখনো মাথা গ'ুজে লিখছেন? এ-গলা নাদিরা বেগমের। বড় চেনা চেনা গলা। কিন্তু শাহজাদা যেন লাহোরের বিবি পাকদামনানে চলে গিয়েছিলেন। অল-হিজরির আশি একাশি সনে। কারবালার প্রান্তরের সেইসব দিনে—তখন সাত বিবি হিন্দুস্থানের দিকে চলেছেন। হিন্দুরাজপুত্র হয়ে উঠলেন সাধক বাবা খাকী—সেই সব সময়ের আলো যেন তাঁর চোখে এসে পড়ে।

এইবার নাদিরা বেগমকে দেখতে পেলেন শাহজাদা দারা। মায়ের কোলে বছর খানেকের সুলতান সুলেমানশুকো। নিজের আব্বা হুজুরকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হাত-পা ছু'ড়ছে। সুলেমান আজকাল দারাকে চিনতে পারে। বড় টান হয়েছে তার আব্বা হুজুরের দিকে।

হাত বাড়িয়ে দিলেন দারা।—দাও। আমার কোলে দাও নাদিরা।

—না। আপনার লেখালেখি বরবাদ করে দেবে।

—দিক না একটু। ও তো কম দামি নয়।

সুলেমান এক লাফে দারাশুকোর কোলে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো।

এ-ছবি আগ্রা দুর্গে দৈবাৎ দেখা যায়। নাদিরা বেগম চোখ ভরে দেখতে দেখতে বললেন, ছেলের খত্‌না দেবার সময় হয়ে এলো—সে খেয়াল আছে কি শাহজাদার।

—ওঃ। বলে চুপ করে গেলেন শাহজাদা। নাদিরার সময় হয়ে এলো কথা ক'টি তাঁকে অন্য এক কথা মনে করিয়ে দিলো। রানাদিল বারবার বলে দিয়েছে—ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক—আমি তোমার জন্যে লাট্টু শাহ চিসতির দরগা শরিফের পেছনে যমুনার কোল ঘেঁষে পিপুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকবো। অন্ধকারে কেউ আমায় দেখতে পাবে না। ঠিক সন্ধ্যায়। ভুলে যেও না কিন্তু শাহজাদা—

সেই সন্ধ্যা এসে গেছে। সময় হয়ে এলো। আমার কোলে আমারই একমাত্র আওলাদ। পহেলা মেয়েটি মরে যাবার পর এই ছেলে নাদিরার কোলে এসেছে। এখন সে আমার গলা জড়িয়ে আছে। কিছুতেই ছাড়বে না। সামনে আমার বেগম। নাদিরার মতো বেগম পাওয়া নসিব। আমি লিখছি আউলিয়াদের কথা। সুফীদের কথা। আল্লাতালার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা। আর আমিই কিনা এখুনি রওনা হবো—ফকির বা দরবেশের জালসাজিস নিয়ে—ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে লাট্টু শাহ চিসতির দরগা শরিফের পেছনে—অন্ধকার পিপুলতলায় যাবো বলে! সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার মাশুকা। আগ্রার রাস্তার এক নাচনেওয়ালি। রানাদিল। যার চলনের ঠমক—গলার লচক—চোখের জমক্ আমায় টানে।

আমি কিছুতেই যাবো না। একথা মনে মনে ঠিক করে শাহজাদা শান্ত গলায় ডাকলেন, নাদিরা। শোনো।

—বলুন হজরত। আমি তো আপনার কাছেই আছি।

শাহজাদার বুকের ভেতর ধক্ করে মনে হলো, নাদিরা বেগমের গলায় কী স্বন নেই—যা কিনা রানাদিলের গলায় আকছার পাওয়া যায়। সে জিনিসটা কী? কী সে জিনিস যার জন্যে আমি ছুটে ছুটে যাই!

একজন হাজিরা এসে আঁধার হয়ে আসা ঘরে অভ্রের বাতিদানটি জ্বালিয়ে দিলো। দিয়ে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। তার মানে যদি কোনো হুকুম থাকে। দারা হাত তুলে নামিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজিরাটি মিলিয়ে গেল।

দারাশুকো ভাল করে নাদিরা বেগমের মুখে তাকালেন। একদম নির্ভুল মুঘল আওরত। এত সুন্দর মুখ সবসময় দেখা যায় না। রানাদিলের মতোই নাদিরাও নসিবের উঠতি চাকায় ওপরে উঠেছে—নিচেও নেমেছে—বারবার। আগ্রার রাস্তায় নেচে নেচে রুটি যোগাড় করতে হয়নি নাদিরাকে। কিন্তু নাদিরার আব্বা হুজুরের—শাহজাদা পরভেজের নসিবে তো শুধুই ওঠাপড়া ছিল। সে ওঠাপড়ার কোনো ছাপই পড়েনি নাদিরার মুখে। আশ্চর্য। রাস্তার নাচনেওয়ালি রানাদিলের মুখেও সময়ের কোনো দাগ পড়েনি। যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসে নাচ জুড়ে দিয়েছে।

—শাহজাদা এত কী দেখছেন আমার মুখে। এ-মুখ তো আপনি সকাল-সন্ধে দেখেই থাকেন—

দারা কী বলতে যাচ্ছিলেন। শিশু সুলেমানশুকো ছোট্ট হাতে শাহজাদার মুখ চেপে ধরলো। হাতখানিকে চুমু দিয়ে দারা বললেন, তোমার মুখ আমার নিত্য

নতুন লাগে নাদিরা।

—হুজরত। আপনি একজন মুঘল। আপনি মরদ। আপনি একজন শাহজাদা। আপনাকে এই হিন্দুস্থানে কত খুবসুরত মুখই না দেখতে হয়। তাই না?

এ কথায় ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন দারা। নাদিরা কি আমার মনের ভেতরটা দেখতে পেয়েছে? আমি সুফী দরবেশদের জীবনী সাজিয়ে সাজিয়ে লিখছি। সেইসব মহৎ জীবনের ভেতর ঘোরাফেরা করেও নিজের বেগমের সঙ্গে আমি এ কী গদ্দারি—বেইমানি করে চলেছি? পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা বলেছিলেন—এক আল্লা। এক বেগম। তাই তো ইনসানকে কামিল ইনসান—পুরো মানুষ করে তোলে। আমি কি তাহলে পুরো মানুষ নই? আধা-ইনসান?

ফস্ করে দারাশুকো বলে বসলেন, ধরো নাদিরা—আমি যদি কোথাও চলে যাই?

নাদিরা কেঁপে উঠলেন। ও কথা কেন হুজরত? এই নওজওয়ানির দিনে আপনি যেন বেশি বেশি করে ফকিরির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। সুফীদের নিয়ে সারা দিনরাত মেতে আছেন। এ বয়সে কি তা মানায়?

শাহজাদা কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন। নাদিরা ফের বললেন, আপনি একজন শাহজাদা। দেওয়ান-ই-খাসের কোনো মজলিশে থাকেন না কোনোদিন। আমি ঘরেলু বেগম হয়ে পড়েছি। আপনাকে কোনো চমক দিতে পারি না—

—ও কথা বলছো কেন নাদিরা?

—আমি ডাল বরাবর। আপনার উচিত হবে মনপসন্দ কোনো খুবসুরতিকে এনে হারেমে রাখা। তাহলে আপনি দুনিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন।

—আমি কোনোদিন হারেমে যাইনি নাদিরা।

—তা আমি জানি হুজরত। দেখুন তো আপনার ছোটে ভাই শাহজাদা সুজাকে। কেমন খুবসুরতিদের নিয়ে মেতে আছেন। আপনিও তো থাকতে পারেন অমন। সেটাই তো একজন শাহজাদার মানানসই হয়। তাই না?

—এ কথা থাক নাদিরা। আমি তো হারিয়েও যেতে পারি।

—তাহলে আমাকে আর সুলেমানকে সঙ্গে নিয়ে হারিয়ে যান। এই বিরাট হিন্দুস্থানে আমি আর আপনি একসঙ্গে হারিয়ে যাবো।

—ধরো নাদিরা—একদিন যদি আগ্রা দুর্গের বাইরে গিয়ে হঠাৎ ভুলে যাই—আমি কে—কোথায় থাকি—কোথায় যাবো—কোত্থেকে এসেছি। তারপর আসমানের নিচে মুসাফির হয়ে ঘুরতে থাকি—ঘুরতেই থাকি?

—আপনার দরকার আরেকটি বেগম।

সন্ধ্যার আগেই আঁধার করা সন্ধ্যা এসে হাজির। সুলেমানশুকো তার আম্মিজানকে বসতে দেয়নি। দিনরাতের হাজিরা মেয়েটি এসে খুদে সুলতানকে কোলে নিলেও সে সর্বক্ষণ তার আম্মিজানের দিকে হাত বাড়িয়েই আছে। ছোট্ট হাতে বাতাস কেটে সে এমনভাবেই নাদিরাকে ডাকে—যে ডাকে দুনিয়ার কোনো

মা-ই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না।

দারাশুকো একা এখন। আগ্রার আকাশ মেঘের ভারে গম্ভীর। বৃষ্টির কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এই থামে তো ফের শুরু হয়। দুর্গের মোরি দরওয়াজার দিক থেকে মাঝে মাঝে সিংহের গাঢ় গর্জন ভেসে আসছে—তেমনি আসছে কলাপি ময়ূরের তীক্ষ্ন গলা।

আরশির মুখোমুখি হয়ে শাহজাদা আজ একজন খাঁটি আফগান ওমরাহের ধাঁচে খয়ের রংয়ের মেহেন্দি লাগানো পরচুলাটা নিজের মাথায় বসালেন। তার সঙ্গে মানানসই ভুলভুলে দাড়ির রসি পাগড়ির ভেতর দিয়ে দুই কানে সাবধানে বাঁধলেন। চোখে দিলেন একটি কালচে ফিনফিনে পাতলা চশমা। ফ্রানসিসি দেশের। গায়ে দিলেন চুনৌটি আঙ্গিয়া। নিচে অনেক মখমল দিয়ে বানানো ঢোলা ডোরিয়া। কোমরবন্ধে ভরে নিলেন হিরাটের একখানি ছুরি।

আরশিতে এবার একজন বনেদি আফগান ওমরাহের ছবি ভেসে উঠলো। যেন বা মানুষটির কাবুল কান্দাহারের পশমের ভারি কারোবার আছে। এবার পায়ে ঐকজোড়া হেলমন্দি নাগরা গলালেই ছবিটি সম্পূর্ণ হয়। বেরবার সময় গলায় পরে নিলেন দু'প্রস্থ লম্বা প্যাঁচের রঙিন কড়ির মালা। তার মাঝে মাঝে ইংলিশস্তানি আসলি সোনার ডুকাট মোহর—যাতে ছোট্ট করে খোদাই করা পাপড়ি মেলা একটি করে গোলাপ।

এ যে কী এক অস্থির অবস্থা। সময় হয়ে এলো কথা ক'টি যেন মেঘ-চেরা বিজলি। পলকে বুকের ভেতর গিয়ে ঝলসে ওঠে। তখন আর বসে থাকা যায় না। কোথাও একঠায় তিষ্ঠনো কঠিন। বসে থাকা যায় না। যায় না শুয়ে থাকা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা।

আকবরি দরওয়াজা দিয়ে বিদেশি ইলচিরা দেওয়ান-ই-খাসে দাওয়াত রাখতে এসে থাকেন। ওই পথেই তাঁরা বিদায় নিয়ে থাকেন। শাহী মজলিশে কিংবা খেলাত-ইজফা দেওয়ার ভারি জমায়েতে মানীগুণীরা এই দরওয়াজা দিয়েই যাতায়াত করেন। শাহীফৌজ কোনো অভিযানে বেরলে এখানেই তার শুরুয়াত হয়। বিজয়ী হয়ে ফিরলে এখানেই তাদের সওগাত জানানো হয়।

শাহজাদা দারা এক একদিন সন্ধের দিকে এই আকবরি দরওয়াজা দিয়েই এক এক সাজে বেরিয়ে পড়েন। কোনো দিন ফকির—আবার কোনো দিন বা ওমরাহ কিংবা ধরাচুড়ো পরা রাজপুত মনসবদার—এইসব জালসাজিস নিয়েই ইদানীং তিনি এই দরওয়াজা দিয়ে বেরন—ফিরেও আসেন।

জালসাজিস যেমনই হোক—হাঁটাচলা লুকোবেন কোথায় শাহজাদা? আকবরি দরওয়াজার পাহারারা সবই জানে। শাহজাদা বলে কথা। চৌকির ফৌজি চোখে সবই ধরা পড়ে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। সবাই জানে—বাদশার পহেলা শাহজাদা খেয়ালি। ভাবুক। কিছু অন্যরকম। তাই কেউ ঘাঁটায় না।

শাহজাদা দারাও আফগান ওমরাহের চালে আকবরি দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অনায়াস চালে। পাহারার রাজপুত সেপাইরা এ ওর চোখে তাকালো শুধু। তাদের মুখে কোনো ভাঁজ পড়লো না। এসব ওরা শাহী মেজাজ

-বা খেয়াল বলেই ধরে নিলো। এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে শেষে কি গর্দানটা যাবে ? তাই তারা দরওয়াজার মুখে স্রেফ মূর্তিটি হয়েই থাকলো।

খানিক এগিয়েই ভিড়ের রাস্তায় পড়েই দারা বুঝলেন, তাঁর পক্ষে পথ চলতি মানুষের ফিরে তাকানো—এড়িয়ে চলা কঠিন। এমনই মুঘল কোমর—চ্যাটালো বুক—ফকির কি মনসবদার—যে জালসাজিসই তিনি নেন না কেন—রাস্তার ভিড়ে মিলে গেলেও মানুষজন বার বার তাঁকে ফিরে ফিরে দেখবেই! চমকে তাকাবে। যেন আগে কোথায় দেখেছে—কিন্তু মনে পড়ছে না কিছুতেই।

সওয়ারি নামিয়ে এক জাব্দা ঘোড়ায় টানা টাঙা যাচ্ছিল। হাত দেখিয়ে থামালেন শাহজাদা। উঠে বসে আফগানি গলায় ঘড় ঘড় করে শব্দ তুলে বললেন, বড়ে হামাম—

বর্ষার সন্ধেবেলা অনেক রইসি মানুষ বড়ে হামামে গিয়ে গরম জলে স্নান করে চাঙ্গা হয়ে নেন। তারপর তাঁরা আতর-গুলাল ছিটিয়ে বড় জায়গায় দেখাসাক্ষাতে গিয়ে থাকেন। কেউ বা যান গান-বাজনা শুনতে। এসব শাহজাদার শোনা কথা। সাধারণ মানুষজনের কথা চুঁইয়ে চুঁইয়ে আগ্রার দুর্গের পাথরের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে অন্দরমহলেও কিছু কিছু পৌঁছয়।

বড়ে হামামের সামনে সবসময় কাঁড়ি কাঁড়ি গাড়ির ভিড়। মানী মানুষজনের আনাগোনা। ফুল আর আতরের ফেরি লেগেই থাকে। সে ভিড়ে নেমেই হাতে যা উঠলো তাই-ই দিয়ে হামামের সদরে ঢুকে পড়লেন শাহজাদা। টাঙাওয়ালার পাওনা দশ দাম। সে তো মহাখুশি। এই আফগান আগা তাকে আস্ত একটা আশরফি দিয়ে হন হন করে হামামে ঢুকে গেল। সদর দিয়ে ঢুকে হামামের খিড়কির অন্ধকার দিয়ে যমুনার দিককার মাঠে পড়েই শাহজাদার সারা মন বিষাদে ছেয়ে গেল।

এ আমি কী করছি? আগে ফকিরের জালসাজিস নিয়ে বেরতাম— যাতে কিনা আসলি কোনো ফকিরের খোঁজ পাই— যাতে কিনা তাঁর কাছাকাছি হতে পারি। হয়ে কোনো গভীরের কথা যদি শোনা যায়।

আর এখন?

অনুতাপে মনটা ভরে গেল দারাশুকোর। লোকালয়ের চোখের বাইরে যমুনার অন্ধকার গা ধরে—আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে শাহজাদা এগোচ্ছেন। কোনো আফগান ওমরাহ হিন্দুস্থানের রাজধানী আগ্রায় এসে নিশ্চয় এ-পথ নেবেন না। এক যদি তিনি গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়ে থাকেন তো সেকথা আলাদা।

রানাদিল কি আমার গুপ্তধন। যে গুপ্তধনের স্বাদ আমি কোনো দিন পাইনি। আওরত কী জিনিস? আম্মিজানকে দেখেছি। তিনি ছিলেন মা। আব্বা হুজুরের মনের বন্ধু। বাদশা শাহজাহান তো কোথাও থমকে থেমে থাকতে পারেন না। হয় দক্ষিণে ফৌজি অভিযান চালাবেন—নয়তো যমুনার পারে দিল্লির কাছাকাছি হুমায়ুন বাদশার সমাধির গায়ে গড়ে তুলবেন লালকেল্লা— নয়া

রাজধানী শাহজাহানাবাদ। নয়া দেওয়ান-ই-খাস। নয়া দেওয়ান-ই-আম। সেখানকার পাথরের রং কী হবে—তার জেল্লা বা ঝিলিক কেমন দাঁড়াবে—তাই নিয়ে ইজ্জত খাঁ আর আলিবর্দি খাঁয়ের সঙ্গে শলায় বসবেন। দিনের বেলায় আলো পড়লে কোন রং উঠে আসবে। রাতের আলোতেই বা সে-রং বদলে কী দাঁড়াবে। এই নিয়েই হিন্দুস্থানের বাদশা মেতে থাকবেন। এই মানুষকে আশ্মিজান বুঝতেন। ধরে রাখতে পারতেন। নিজের বাগী দিনগুলোতে বাদশা পাশে পেয়েছিলেন মমতাজমহলের মতো বেগমকে।

আরেক আওরত বাজি। শাহজাদী জাহানারা। শাহী বাদশা-বেগম। তিনি যেমন বিদেশি ইলচিদের সঙ্গে বসে হিন্দুস্থানের দরিয়া-কারোবার বুঝে নিতে পারেন—তেমনি পারেন মনস্থির করে বসে কাদিরি উপাসনার সঙ্গে মিশে যেতে। রুমি বোঝেন—সাদিও বোঝেন। জিভের ডগায় তাঁর হাফিজের দেওয়ান সবসময়—। বাজির তুলনা নেই।

নাদিরা সুখে দুঃখে একই রকম। অনেক ওঠা পড়া তাকে অচঞ্চল করেছে। এক এক সময় ভয় হয়—নাদিরা বুঝি এই দুনিয়ার কিছুতেই সাড়া দেবে না।

শাহজাদী রৌশন যতটাই সুন্দরী—ততটাই একরোখা—নিষ্ঠুর। বড়ে ভাই হিসেবে যতটা কানে এসেছে দারাশুকোর— দিনরাতের হাজিরা-বাঁদিরা, নফর-গোলামরা উঠতে বসতে রৌশনের কাছ থেকে কোড়া খায়। সেটাই ওদের জন্যে শাহজাদীর তোফা। বাজিকে রৌশন যা করে তার নাম দস্তুরমত হিংসা। কেন সে আব্বা হুজুরের মবারকে বাজির মতো খাতির-কদর পায় না—এটাই তার হিংসার কারণ—তা জানেন দারাশুকো।

আওরতের তাগদের লোভে প্রলয় হতে পারে। তাগদের নেশা শরাবের নেশার চেয়ে অনেক—অনেক মারাত্মক। ইসলামের ইতিহাসে আওরতের উল্টোপিঠ দেখলে খুন জমাট হয়ে যায়। আবু সুফিয়ানের বেগম—মারিয়ার আশ্মিজান—হিন্দা প্রথম যৌবনে হজরত মহম্মদের চাচা হামজার প্রেমে পড়েন। হামজা হিন্দাকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে—অনেক পরে—হামজা তখন বুড়ো মানুষ। জং-কি-ময়দানে পড়ে গিয়েছেন। এন্তেকালের আর দেরি নেই তাঁর। সেই সময় হিন্দা হামজার বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে খেতে থাকেন। তাতেও যেন প্রতিহিংসার কলস পূর্ণ হলো না—এমন ভাব হিন্দার চোখে মুখে। এ কথা ভাবতে ভাবতেই হাঁটছিলেন শাহজাদা—আর অন্ধকার নদীর গায়ে একা একাই শিউরে উঠছিলেন। হারুন-অল-রশিদের মা খাইজুরান নিজের খসমকে ভেড়া বানিয়ে শাহী চালাতেন। ছেলে হাদি খলিফা হয়েই মাকে সরিয়ে দিলেন। ওই দোষে খাইজুরান হাদিকে বাঁদিদের দিয়ে খুন করিয়ে হারুনকে খলিফা করেছিলেন। রৌশনের মুখের দিকে তাকাতে আজকাল ভয় করে দারাশুকোর। অথচ তাঁরই মায়ের পেটের ছোট বোন।

নুরজাহানের কথা শুনেছেন দারা। বালক বয়সে দু'একবার দেখার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে। মগজ আর খুবসুরতির মিশেল এই আওরতকে মাসোহারা দিয়ে বাদশা কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিয়েছেন অনেকদিন। দাদাসাহেবের বকলমে

একসময়—তিনি মুঘলশাহী চালিয়েছেন। খুবসুরতিই শুধু নয়—জিদ্দি, জানবাজির জন্যেও তাঁর নাম ঘিরে এক রহস্য চিরকালই হিন্দুস্থানের মানুষজনের মনে বাসা বেঁধে থাকবে। এসবের সঙ্গে ছিল মগজ। তাঁর কূটবুদ্ধির সঙ্গে তখনকার শাহজাদা খুর্রম এঁটে উঠতে পারছিলেন না। এসব বড় হয়ে উঠতে উঠতে দারাশুকো টুকরো টুকরো করে শুনে নিজের মনের ভেতর জোড়া লাগিয়ে নূরজাহান নামের আওরতের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করে আসছেন বহুদিন ধরে। একবার কাশ্মীরে গিয়ে দাদা সাহেব বাদশা জাহাঙ্গীরের বাদশা-বেগমকে দেখে এলে হয়। এখন তিনি কেমন আছেন। কেমন দেখতে হয়েছেন এখন। রৌশনের কি কোথাও মিল আছে বাদশা-বেগম নূরজাহানের সঙ্গে।

কিন্তু রানাদিল। রানাদিল আমায় টানে কেন? ওই তো সেই অন্ধকার পিপুলতলা।

॥ চুয়ান্ন ॥

ক'বছর হলো শাহজাদা দারা ছ'হাজারি ঘোড়সওয়ারের মনসবদার হয়েছেন। হয়েছেন ফৌজদার-ই-হিসার। হুমায়ুন বাদশা থেকে শাহজাহান বাদশা অব্দি শাহী মসনদে বসার আগে যে যার আব্বা হুজুরের কাছ থেকে সরকার হিসার জায়গির হিসেবে পেয়ে আসছেন। দারাশুকো জানেন—তাঁর সামনে আরও দুটি বড় তোফা অপেক্ষা করছে। আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান খুব শিগগিরি তাঁকে এই দুই তোফা দিয়ে আরও উঁচুতে তুলে নেবেন। সারা হিন্দুস্থান মনে মনে জানে—যাঁকে সরকার হিসারের ফৌজদার দেওয়া হয়—কালে তিনি-ই হন হিন্দুস্থানের বাদশা।

পহেলা তোফাটি হলো: সরকার কোয়েলের ফৌজদারি। তার মানে যমুনার ওপারে আগ্রা আর দিল্লির পূর্বদিককার দোয়াব জেলার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠা।

দুসরি তোফা হলোঃ আগ্রা থেকে দিল্লির মাঝের শাহী সড়কের রাহদারি। এই রাহদারির আয় বছরে সাড়ে বাইশ লাখ তনখা।

এই দুই তোফা দিয়ে বাদশা আমার ওপর রাজধানী আগ্রা, দিল্লির ভার ছেড়ে দিতে চান। আগ্রার কাছেই চম্বল নদীর তীরে ঢোলপুর ঘাট থেকে দিল্লির ছ'মাইল উত্তরে বাদলী অব্দি শাহী সড়কের রাহদার উত্তর আর দক্ষিণ থেকে আগ্রা-দিল্লিতে ঢোকার পথে জবরদস্ত পাহারা বলা যায়। আবার সুবে এলাহাবাদ মালব, আজমির, লাহোর থেকে কোনো দুশমনের পক্ষে সরকার কোয়েলের ফৌজদার আর ওই শাহী সড়কের রাহদারকে এড়িয়ে আগ্রা-দিল্লিতে ঢুকে পড়া অসাধ্য ব্যাপার। সরকারি ঘোড়া-ডাক চলাচলের এটাই রাস্তা।

আব্বা হুজুর কি আমাদের চার ভাইয়ের স্বভাব-মতিগতি লক্ষ্য করেই আমাকে এসব তোফা দিতে চলেছেন? নামাজে আওরঙ্গজেব কাঠ মোল্লাদের ছাড়িয়ে যাবে। একেবারে ভণ্ড। চালাক দাঁড়কাক। কায়দাবাজ আয়েসি সুজার

ভয়ঙ্কর ঘমন্ড। চটকে সুজাঙ্গীর ঝুঁটিদার শাহী কাকাতুয়া হয়ে উঠেছে। এক-গুঁয়ে মুরাদ সবসময় চোখ লাল করে আছে। একেবারে বুনো তিতির।

কিন্তু এখন কোন দিক রাখি? আব্বা হুজুরের ইচ্ছায় শাহী এত এত কাজ ঘাড়ে চাপছে। ওদিকে চারশো এগারোজন সুফী দরবেশের জীবন নিয়ে সাফিনৎ-উল-আউলিয়ার কাজ এখনো শেষ করে উঠতে পারিনি। এর ভেতর ঠমকদার নাচনি রানাদিল অন্ধকার ভিজে পিপুলতলায় ওই তো দাঁড়িয়ে—

আফগান ওমরাহের জালসাজিস নিয়ে শাহজাদা এগিয়ে গেলেন। অন্দরমহলে নাদিরার মতো বেগম, সুলেমনশুকোর মতো আওলাদ, ছাউনিতে ছ'হাজার ঘোড়সওয়ার, সরকার হিসারের ফৌজদারি, আসমান জুড়ে এত তারার বুক ব্যথা করানো ডাক, নিঃশব্দ দুনিয়ার নিজের সেই অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মতো সুলতান-উল-আযকর—সব—সব ফেলে এ আমি কোথায় চলেছি?

সামনেই লাট্টু শাহ দারোগা বাবা চিসতির মাজার শরিফ। দরগাহর ভেতর থেকে মশালের আলো এসে এইমাত্র খানিকটা পিপুলতলায় পড়লো। আমারই ঘাড়ে সরকার কোয়েলের ফৌজদারি। আমারই ঘাড়ে আসছে সাড়ে বাইশ লাখ তনখার রাহদারি তোফা!

মন থেকে মাছি তাড়ানোর মতোই একটা রেহাই পাওয়ার রাস্তা ভেবে নিলেন শাহজাদা দারা। আকবরশাহী আমলের দেওয়ানখানা আপনি চলতে থাকা হুকুম-দারির এক ঘোড়া যেন। আমি সুফীদের নিয়েই থাকি—আর রানাদিলেই থাকি—শাহী কাজ থেমে থাকবে না। সরকার হিসারে বাঁকি বেগের মতো তুখোড় খোজা সর্দারকে যেমন নায়েব-ফৌজদার করে বসিয়েছি—অমন কাউকে কাউকে দেখেশুনে বসানো যাবে।

অন্ধকার থেকেই যেন দু'খানা হাত উঠে এসে দারাশুকোর গলা জড়িয়ে ধরলো। এমন করে নাদিরা বেগম কখনো এগিয়ে আসে না। জড়ানো তো দূরের কথা। বরং নাদিরা ধীরস্থির। কথার শুরুয়াতে 'হজরত'—নয়তো 'সরতাজ' বলবেই। 'বন্দেগান'ও বলে বসে মাঝে মাঝে। সেই তুলনায় যতই দিন যাচ্ছে—রানাদিল কথায় কথায় ওসব সহবতি লবজ ততই দিব্যি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। দারা যে শাহজাদা—সে কথা মনে করিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই নেই রানাদিলের। দেখা হতেই কিংবা বিদায় নেবার সময় কুর্নিশ কিংবা তসলিম জানাবার কোনো বালাই নেই রানাদিলের। না বলে কেতামাফিক আল-বিদা। এ এক নয়া স্বাদ—যা কোনোদিন পাননি দারাশুকো। তার ওপর এই এগিয়ে আসা? এক পা বাড়িয়ে দিয়ে—দু'হাত তুলে? তাবত শাহী আমাকে শাহাজাদা বানিয়েও যা দিতে পারেনি—তাই যেন রানাদিল আমাকে এক লহমায় দিলো। আমি ওর চোখে ভীষণ কিমতি। রানাদিলের মতো সুন্দরী, নাচনি আওরতের চোখে আমি যে চাঁদ, তারা কিংবা সুরজ—এটা ভাবলেই আমি এক রকমের আনন্দ পাই।

আমি এগিয়ে এসে তোমাকে সওগাত দিলাম দিলের জান!

বুকে জড়িয়ে থাকা, রানাদিলের গা থেকে আগ্রার সস্তার আতরের খুশবু উঠে এলো দারাশুকোর নাকে। এসব গন্ধ সহ্য হয় না দারাশুকোর। গা গুলিয়ে

ওঠে। আজ কিন্তু ভালো লাগলো। শাহজাদা বললেন, বারিশের দিনে এই ভ্যাপসা গরমে হেঁটে এসেছি এতটা। আমার বদনে এখন পসিনার বদবুই পাবে রানাদিল—

—এই বদবুই আমার পসন্দ শাহজাদা!—বলতে বলতে রানাদিল পুরনো আম গাছে বেয়ে ওঠা লতার মতোই দারাশুকোর দীঘল শরীরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো। এমন কি বাঁ পাখানি ঘাগরায় বসানো বেলোয়ারি দামদামাড়, চুমকি সলমার ঝনঝনানি তুলে রানাদিল যখন দারাশুকোর কোমর বরাবর উঠিয়ে আনলো—তখন শাহজাদা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠে খুব হাসিমুখ করে চাঙ্গা গলায় বললেন, এটা পিপুলতলা রানা—

—হোক না পিপুলতলা।

—বৃষ্টি আসছে যাচ্ছে। অন্ধকার। তুমি পড়ে যাবে।

—পড়বো না শাহজাদা। তোমার পসিনাই আমার আতর। এমন মরদানি আতরের চেয়ে ভালো জাতের আতর আর কী থাকতে পারে! এক এক সময় কী ইচ্ছে হয় জানো?

—কী?

—তোমায় দুধে খোবানি মেশাবার মতো মিশিয়ে খেয়ে ফেলি একেবারে।

দারার মনে হলো, তিনি সুগন্ধী বাতাসে ভাসছেন। এর নাম পেয়ার তাহলে। একজন মরদ তাহলে একজন আওরতের জন্যে এভাবেই মরে! তিনি আলতো করে বললেন, রানা! তুমি আমায় অনেক নাম দিয়েছো। আজকের দিলেরজান নামটা তার ভেতর সবচেয়ে ভালো।

—জানো। আমাদেরও কিছু নাম দিয়েছে রাস্তার মানুষজন।

—কী রকম?

বেশ চিন্তিত গলায় রানাদিল বললো, আমি এখন তাদের মুখে দারাদিল। আর তুমি হলে গিয়ে রানাশুকো।

এ কথায় শাহজাদাও গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। এমন কথা আমারও কানে এসেছে রানা—

—বলুক না। কী আসে যায়। আমি তো সত্যি সত্যিই দারাদিল। তাই না দিলের জান?

অন্ধকারে মাথার ওপর গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ছে। সঙ্গে ভিজে বাতাস। সামনেই দরগাহ শরিফ থেকে ভাঙাগান ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এই আওরত রাজধানীর রাস্তায় নেচে নেচে শাহী সড়কের মতোই শক্ত, কঠিন হয়ে উঠেছে। কিছু বা দৃপ্ত। কোনো কিছুতেই ঘাবড়াবার নয়। অথচ শক্ত বলে যে একেবারে কঠিন তাও নয়। বরং ভেতর থেকে নরম। এমন পিয়ারিজান যে কখনো কেউ আমার হবে—তা কোনোদিন ভাবিনি। দারাশুকো দু'হাতের ভেতর রানাদিলকে তুলে ধরলেন। তুমি আমার—

—না। আমি তোমার নই। কী বিচ্ছিরি একটা হাভেলিতে আমায় তুলেছো!

—বিচ্ছিরি? মোটেই না। যমুনার গায়ে এক সময় ওই হাভেলি ছিল

ফৌজদার-ই-হিসারের রাজধানীর ঠিকানা।

—চারদিকে রাজপুত ঘোড়সওয়াররা চৌকি বদলে বদলে পাহারা দেয়। আমি কি বন্দী?

—বন্দী কেন হবে? তুমি এখন আমার।

—রাস্তায় বেরিয়ে আমি আর একটুও নাচতে পারি না শাহজাদা—

—তা তো আর পারবে না। এখন তুমি বাইরে বেরিয়ে ইচ্ছেমত নাচতে পারো না রানা। তুমি আর মুজরো করতেও পারো না। তা যদি করো তাহলে তোবার দিলের জান ভীষণ কষ্ট পাবে মনে।

—তাই বলে আলাদা হাভেলিতে আমি তোমার জন্যে শয়তানপুরার আওরতদের মতো কোঠিরানী হয়ে থাকবো নাকি? বাঁধা তওয়াইফ হয়ে থাকবো না কিন্তু।

—ছিঃ। তওয়াইফ হবে কেন রানাদিল?

—তাই তো হয়ে যাচ্ছি? ইচ্ছেমত বাইরে বেরিয়ে নাচতে পারি না। মুজরো করতে পারি না। সবদিকে রাজপুতগুলোর চোখ। আমায় কিন্তু শাদি করতে হবে তোমায়। হ্যাঁ—বলে দিলাম তোমার তওয়াইফ হয়ে থাকতে পারবো না কিন্তু।

শাহজাদার মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। শাহী হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদাকে রাস্তার নাচনি বিয়ে করতে হবে। মুঘল হারেমে দুনিয়ার আওরতের সেরা পশরা এসে জমা হয়। সুফী-দরবেশদের নিয়ে একটু কম মাথা ঘামিয়ে দারাশুকো যদি সারা দিনরাতে কিছুটা সময় হারেমের ইরানি-তুরানি, আওরতদের নিয়ে মাতোয়ারা হন তো তাতে নাদিরা বেগমও কিছুটা খুশি হন। আল্লাতালা, তৌহিদ এসব নিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর খসম না শেষে একদিন শাহী ঠাটবাট ছুঁড়ে ফেলে ফকির খিরকা গায়ে দিয়ে বসে—এই তাঁর বড় ভয়। তুর্কি উজবেক, ইরানি, আরবি, বলখওয়ালি, বদকশানি সব খুবসুরতিদের বন্দর আব্বাস, কাভাইরোর মান্ডি থেকে কিনে এনে মুঘল অন্দরমহলের খিদমতগারির জন্যে হারেমে রাখা হয়। কিনে আনে দরিয়ায় দরিয়ায় কারোবার করা ব্যাপারীরা। কিংবা ডাঙায় ডাঙায় যেসব পশম আর রেশমের কারোবারিদের গতায়াত—তারাই। কিনে এনে দেওয়ানখানায় ঠিকা বা যোগানে সুবিধা পাবার জন্যে এইসব খুবসুরতি আওরতদের এক এক হাভেলিতে ভেট করে পাঠায় ওরা, সেইসব ভেট শেষ অব্দি শাহী নজরানা হয়ে হারেমে এসে জমা হয়। আগ্রায় সব খুবসুরতির একই গতি। শাহী হারেম।

দরগাহ শরিফের পেছন দিককার ঘাটে এখন কেউ আসে না। শাহজাদা দারা রানাদিলের হাত ধরে তাকে নিয়ে ধাপে বসলেন। অনেক নিচে যমুনার জল। শাহজাদা রহস্য করে বললেন, হাভেলি পছন্দ না হলে হারেমে এসে ওঠো। তোমার সাজ-পোশাক, খাবার-দাবার—সব কিছুর দেখভাল করতে জেনানা দারোগা আছে। মাস গেলে তোমার মতো খুবসুরতির জন্যে আঠেরোশো তনখা অব্দি মাসোহারা। সেখানে বাগে বেড়াবে। দীঘির বাতাস খাবে। তবে মুসরেফদের পাহারা আছে।

—খুব পাহারা বুঝি ওখানে ?

—তা তো হবেই রানা। মুসরেফদের একদফা পাহারার পর চৌড়ুরা পাহারা দেয়। তাদের ওপর খোজাদের পাহারা। অবিশ্যি শেষমেশ সদরে সেই রাজপুত পাহারা।

—আবার রাজপুত ? রক্ষে করো। হারেমে আমার কাজ নেই।

—হ্যাঁ রানা। আকবরশাহী আমল থেকে এসব ব্যবস্থা। পরদাদা সাহেব এই নিয়ম বেঁধে রেখে গেছেন।

—উঃ। নিয়ম। কানুন। আমি ক'দিনে হাভেলিতে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছি। আমি হলাম গিয়ে রাস্তার নাচনি। আমার এসব সয় না। আচ্ছা ? এত সেজেছো কেন ?

—কোথায় ? তোমার কাছে আসবো বলে জামদারখানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। ঠিকই করতে পারি না—কোন্ জামা গায়ে দেবো ? কোন্ মালা গলায় পরবো। সব গোলমাল হয়ে যায় রানা। মনে মনে ভাবি—কী পরলে তোমার সামনে আমায় সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে—

—জানো। আমারও ঠিক তাই হয়। শুধু এই বিন্দিয়াই পরেছি পাঁচবার। যত পরি—মনে হয় ঠিক জায়গায় বসেনি। ভয় হয়—পাছে তোমার নজরে না ধরি। ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তোমার চোখে। —বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রানাদিল। সে আনমনা হয়ে বললো, আমি জানি—তুমি আমায় শাদি কিছুতেই করবে না।

চমকে উঠলেন দারাশুকো। ও কথা বলছো কেন রানা ? তুমি কী সুন্দর করে কথা বললে এইমাত্র। তুমি যে ছোট থেকে আগ্রার রাস্তায় লড়াই করে নিজের রুটি যোগাড় করেছো—সেসব কঠিন দিনের কোনো ছায়া তোমার জবানে পড়েনি। বরং মনে হচ্ছিল—ভোরের শিশিরে ধোয়া কোনো আনকোরা মনের কথা শুনছি—

—অমন কঠিন কঠিন কথা রাখো তো। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

—তুমি না বুঝেও নিজের মনের ভেতর অজান্তে সব বোঝো রানা। সব বোঝো।

—ফের কঠিন কঠিন কথা ? আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—

—তুমি আমার কাছে নতুন এক দুনিয়ার ফেরেসতার মতো। যে দুনিয়ার কথা আমি জানতাম না রানা। মরদ আর আওরত যে সমানে সমানে ভালোবাসতে পারে—সে দুনিয়ায় কেউ শাহজাদা নয়—কেউ নাচনি নয়—সিরিফ মরদ আর আওরত—এ তুমিই আমায় শেখালে। এখানে তুমি হলে হুজুরাইন্। আর আমি সেই হুজুরাইনের সামান্য মুরিদ মাত্র। তুমি সেই দুনিয়ার ফেরেসতা—

যমুনার জল বর্ষায় ফুলে উঠে নিজের মতো বয়ে যাচ্ছিল। সেই জলভাঙার আওয়াজের ভেতর রানাদিল ধমকে উঠলো।—খবর্দার। আমায় ফেরেসতা বানাবার চেষ্টা করবে না। আমি নেহায়েত ইনসান।

ভিজে বাতাসে রানার পায়ের ওপর ঘাগরার ঘের যেন বা নৌকোর পাল

তুলে ফুলে উঠলো। তাতে নেচে নেচে তৈরি পায়ের গুছি দরগাহ শরিফের লাফিয়ে পড়া আলোয় শাহজাদার চোখে ধরা দিলো। দারাশুকো লোভ সামলাতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন—ওই পায়ের পাতা—গুছি—বুঝি বা কোনো উঁচু জায়গায় যাবার সিঁড়ি। তিনি ঘাটের এক ধাপ নেমে বসে নিজের ঠোঁট রাখলেন রানাদিলের পায়ে—পায়ের পাতায়—যেন বা চুমু দিয়ে পথভাঙার ধুলোবালি মুছে দিচ্ছেন।

—ও কী হচ্ছে? —বলে পা সরিয়ে নিলো রানাদিল।

—আমার তোমাকে খুব বিরাট লাগে রানা!

—তাই বুঝি!

—হ্যাঁ। তাই সেই বিরাটের পা থেকে চুমু দিয়ে আমি শুরুয়াত করতে চাই।

রানাদিল দেখলো, শাহজাদার চোখ জোড়া কোন স্বপ্নে ভাসছে। সে আস্তে বললো, না। আমি বিরাট কিছু নই। আগ্রার রাস্তার নাচনি মাত্র। তুমি সব কিছুতে সুন্দরকে কত সহজে দেখতে পাও।

দারাশুকো অবাক হলেন। কথার এমন বাঁধুনি কোত্থেকে পেল রানাদিল? এ তো রাস্তার নাচুনির মুখের ভাষা নয়। তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন, তুমি কে রানাদিল? কে তুমি?

বুঝতে পারলো না রানাদিল। এত অধীর অবস্থাই বা কেন শাহজাদার! সে আস্তে বললো, আসমানের নিচে আমি একজন মানুষ। কেন?

—সব ইনসানই তাই রানা। তুমি আসলে কে?

—তাতো জানি না।

—তোমার আব্বাহুজুর? আম্মিজান?

—তাদের কোনোদিন দেখিনি।

—পয়দায়িস?

—অবাক হয়ে তাকালো রানাদিল। কী জানতে চাইছো?

—কোথায় হয়েছো?

—ওঃ। এই দুনিয়ায়।

—না না। ঠিক কোন্ জায়গায়?

—তা আমি বলবো কী করে শাহজাদা? তখনকার কথা কি কারও মনে থাকে! তবে চোখ মেলেই তো দেখছি আমি আগ্রায়—

—তোমার পরবারিস?

—কিছু বুঝতে না পেরে রানাদিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠলো, ফের কঠিন কঠিন কথা? এই আমি উঠলাম কিন্তু—বলেই চলে যাবার জন্যে রানাদিল উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

দারাশুকো তার হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, কোথায় বড় হয়েছো?

—আগ্রার রাস্তায়—

—তা কী করে হয়। কেউ তো তোমায় দুধ খাইয়েছে। ঘুম পাড়িয়েছে কোলে করে।

রানাদিল যেন অনেক দূরে তাকিয়ে কী মনে করার চেষ্টা করেও পারলো না। শেষে চাপা গলায় বললো, একখানা দোতলা কোঠাবাড়ির কথা মনে পড়ে—কাঠের সিঁড়ি—

—কোথায় ?

—মনে হয় এই রাজধানী আগ্রাতেই।

—ঠিক কোন জায়গায় রানা ? কোন মহল্লায় ?

—তা মনে নেই। গানের দরাজ গলার এক কলি দু কলি ভেসে আসে—ঘুঙুরের বোল—

—আরেকটু মনে করার চেষ্টা করো রানা—

—আর তো পারছি না। একখানি বুড়ি মতো মুখ—তিনি খুব মায়া ভরে আমার মুখে তাকিয়ে—যেন কোন নানী—ব্যস—আর কিছু মনে নেই শাহজাদা। ছ'সাত লাখ মানুষের বাস এই রাজধানীতে। তার ভেতর সেই নানী নানী মুখখানি আমি এই এত বছর ধরে কত খুঁজেছি। একবারের জন্যেও সে মুখের দেখা পাইনি আর—

দারাশুকো মুখ নিচু করে বললেন, তুমি কি মুসলমান ?

—তা তো জানি না শাহজাদা।

—তুমি কি হিন্দু ?

—তাও তো জানি না। তবে—

অস্থির হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন দারাশুকো, তবে ? তবে কী ?

—মনে হয়—ঠিক জানি না শাহজাদা—মুসলমান হলে কি আমি কাঁচ উমর থেকেই অমন বেসাহারা হয়ে ভেসে বেড়াতে পারতাম ? কিছু না হোক—শাহী এতিমখানায় তো জায়গা হয়ে যেতো আমার। যা-ই হোক কিছু তা দেখ-ভাল হতো আমার—তাই—

—তাই ?

—তাই মনে হয় আমি হয়তো হিন্দু। হিন্দুস্থানের আদি বাসিন্দা হিন্দুদের দশা তো সব সময় দেখি।

—কী দ্যাখো ?

কী দেখি না শাহজাদা। তীর্থ করতে এসে সংক্রান্তির স্নানেও শাহী খাজানা-খানায় দামদামড়ি গুনতে হয় ওদের। যাক্ গিয়ে। ওসব কথায় গিয়ে কাজ নেই আমার। তোমারই সুবিধা সবদিক থেকে। তাই না ?

—একথা বলছো কেন ? রানা ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বাঃ! তুমি একজন শাহজাদা। আর আমি কে ? কোথায় আমি। অন্দর-মহলে তোমার বেগম আছে। বাইরে আমি আছি তোমার। দু'দিক থেকেই সুবিধে। কিন্তু আমার কী আছে বলতে পারো ?

শাহজাদা দারা চমকে উঠলেন। এ কী কথা বলছে রানাদিল। এই ছিল একরকম। আবার হয়ে গেল আরেকরকম। প্রায়ই রানাদিল এমন করে থাকে। দেখা হলে শুরুটা হয় সুন্দর করে। দু'হাতে গলা জড়িয়ে। সওগাত জানিয়ে।

কিন্তু শেষ হয় ভয়ঙ্কর খারাপ করে। কেন ? কেন এমন হয় ? বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো দারাশুকোর। তিনি অনেক কথাই বলতে পারেন। কিন্তু কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারছেন না। রাগে, দুঃখে, অপমানে তাঁর গলা বুজে আসছে। কী এক কঠিন অভিমানে দারা চুপ করে গেলেন। কেন রানাদিল এমন করে ?

—তুমি তো আসো মাপা সময়ের জন্যে—

—আমি একজন শাহাজাদা রানা। ভুলে যেও না—আমার আছে মনসবদারি। সরকারি হিসাবের ফৌজদারি। দেওয়ানখানায় নানান সুবা থেকে সুবেদার, ফৌজদারের আর্জি, নালিশ সব আসছে তো আসছেই। সময়ে সময়ে তারা নিজেরাও চলে আসে। আব্বা হুজুর বাদশার হয়ে অনেক কিছুই আমায় দেখতে হয়। তার ভিতরেও সব সময় তোমার নাম আমার মনের ভেতর জিকর দেয়—রানাদিল নামে একটা ঘণ্টা সবসময় বেজে চলেছে আমার মনের ভেতর—

—চুপ করো। ঝুটি কাঁহিকা—। রানাদিল প্রায় চেঁচিয়ে ধমকে উঠলো।

এমন গলা চিরে যাওয়া আওয়াজে কেউ কোনোদিন শাহজাদাকে ধমকায়নি। তারপর মিথ্যে কথা বলার বদনাম ? এ তো ভাবতেই পারেন না দারাশুকো। আর এমন রাস্তার ভাষায় ? শাহজাদা রীতিমত বোবা হয়ে গেলেন। কী বলবেন ! রাস্তায় নেচে নেচে রানাদিলের সহবত রাস্তার কেতায় ঢালাই হয়ে গেছে। আমায় ঝুটা ইলজাম দিচ্ছো রানা— ?

মুখে ওকথা এলেও দারা তা বলতে পারলেন না। শেষে অনেক কষ্টে বললেন, আমি মিথ্যেবাদী ? কোনটা মিথ্যে বলেছি ? বলো ?

—একটাও মিথ্যে বলোনি—

একথায় দোগুণী অবাক হলেন দারা। তাহলে ?

—ক'দিন বাদে বাদে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তুমি আসো শাহজাদা। তুমি এলে বাহার চলে আসে। বাগের ফুল খুশবুদার হয়ে ওঠে। হাওয়া যেন চামেলি বনে যায়। তুমি যখন আসো না ? তখন ? সেই লম্বা—শুকনো দিনগুলোর কথা ভাবো তো।

দারা তখনো বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি দেখলেন, আঁধার কুঁদে বসানো রানাদিলের মুখখানি একা একা চোখের জলে, চোখেরই আলোয়, মুখের হাসিতে, মুখেরই বিষাদে আসমান থেকে নেমে আসা কোনো দলছুট তারার মতো জ্বলছে।

—তুমি আগ্রা দুর্গের অন্দরমহলে নাদিরা বেগমের সোহাগ খাচ্ছো। দেওয়ানখানায় বাকি সবাই তোমায় কুর্নিশ বাজাচ্ছে। তার দুশো মজা লুটছো। লুটছো না ? বুকে হাত দিয়ে বলো ? সাকেত ছাউনিতে গিয়ে ফৌজী সালাম নিচ্ছো কুচকাওয়াজে। ভালো লাগছে না ? আর আমি ? তোমার দেওয়া রানী হাভেলিতে একা একা পড়ে থাকি। বেরতে পারি না। এত চেনা আগ্রা একটু ঘুরে দেখবো তার উপায় নেই আর। হাভেলি থেকে বেরলেই রাজপুত পাহারার চোখে পড়ো। নামেই রানী হাভেলি। আসলে রানী-কয়েদ, রানী-হারেম। এমন কত হারেম তোমার আছে কে জানে !

—রানা—প্রায় চিৎকার করে উঠলেন দারাশ্বকো।

—যা সত্যি বুঝি তাই বলবো। আমি কারও পরোয়া করি নাকি!

—তুমি পরোয়া করবে কেন? পরোয়া তো আমি করি। না করে উপায় নেই। আমি যে নিরুপায়। আমার আর কোনো রাস্তা নেই রানাদিল।

—নিরুপায়?

—হ্যাঁ। নিরুপায় রানা। আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি অন্যায়ভাবে ব্যথা দিলে কষ্ট পাই। সে কষ্টও আমার ভালো লাগে। সেই কষ্টই আমার আমানত। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলে—সে সময়টা কেমন কাটবে—তা নির্ভর করে তোমার মর্জি'র ওপর। তুমি ইচ্ছে করলে সে সময়টা হাসিতে—আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারো। আবার ইচ্ছে হলো তো একদম আঁধার করে দিতে পারো। আমার কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। সবই তোমার ইচ্ছে। সবই তোমার ওপর নির্ভর করে রানা—

—বটে! তাই তো আমায় রানী-হারেমে পুরেছো! তোমার রানী-কয়েদে—

—আমি কোনোদিন কোনো হারেমে যাইনি। আমার কোনো হারেম নেই। কয়েদ নেই। হিসাব সরকারের ফৌজদার হিসেবে রাজধানী আগ্রায় ওই হাভেলিই আমার ঠিকানা। আমার অপরাধ আমি হিন্দুস্থানের মুঘলশাহীর শাহজাদা হয়ে পয়দা হয়েছি। মুঘল খানদানে আমার পয়দায়িস। মুঘল খানদানে আমার পরবারিস। ওখানেই আমি বড় হয়েছি। আমার জীবন তুমি ভালোবাসা দিয়ে ধন্য করেছো। এমন জীবনের স্বাদ তুমি আমায় দিয়েছো—যা আমি কোনোদিন জানতাম না। জানতাম না—কোনো আওরত কোনোদিন এগিয়ে এসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আমায় সওগাত দিতে পারে। এর স্বাদ আমার কাছে একদম নতুন। এমন যে কোনোদিন ঘটতে পারে তা আমি কোনো খোয়াবেও দেখবো বলে ভাবতে পারিনি রানাদিল। যখন ঘটলোই—যখন তুমি আমার মাশুকাই হলে—তখন হিন্দুস্থানের শাহজাদার মতো একজন আশিকের মাশুকা কি আর রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াতে পারে? এমন মাশুকা কি আর মুজরো নিয়ে যমুনার চরে নাচতে যেতে পারে? তুমিই বলো?

—আমি রাস্তার নাচনি। আমায় রাস্তায় দিয়ে এসো।

—তাহলে আমায় ভালোবাসলে কেন? আমায় ভালোবাসতে দিলে কেন রানা?

—আমি তো আসিনি। তুমিই জালসাজিস নিয়ে আমার কাছে এসেছো। দিয়ে এসো আমায় রাস্তায়। আমি ফের নাচের মুজরো নেবো। মুজরোর আশরফি দিয়ে ইচ্ছেমত ঘুরে ঘুরে কিনবো। খাবো। রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াবো।

—তুমি ফের নেচে বেড়াবে। আম-আতরাফ মানুষজন তোমায় ঘিরে কদরদারির তালিয়া বাজাবে আবার। তোমার ঘাগরা ঘূর্ণী হয়ে ঘুরবে—আর হাজার ইনসানের দিলে খুন চলকে চলকে উঠবে। তাই তো তোমার ভালো লাগে। তাই না?

—হ্যাঁ। তাই আমার ভালো লাগে। আগ্রা আমায় না দেখে দেখে ভুলে যেতে বসেছে। আমি রানী-হাভেলির ওই সুখের পিঁজরাতে আর ফিরে যাবো না।

—বেশ। আমার আশিকির বদনামি কে বইবে রানা ?

—আশিকি ? তোমার ! হুঁঃ !—বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলো রানাদিল।

শাহজাদার বুকের ভেতর একদিককার অনেকটা জুড়ে ধস নামলো। আমাকে রানাদিলের এতটা নফরতি ? তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। দেখা হলে এত ভালো লাগে। রানাদিলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কথাটি না বলে। তা এত সুখের। তা এত আনন্দের। আমার আশিকি কি কিছু নয় ? আমি কি কিছু নয় রানার চোখে ?

দারোগা বাবা লাট্টু শাহ চিস্তির মাজার শরিফ এই কয়েক বছরে এক দরগাহ হয়ে উঠেছে। দূর দূর জায়গা থেকে ফকির দরবেশরা ওখানে এসে জোটেন। তাঁরা নাচেন। গান করেন। আবার দূরের পথে তাঁরা মিলিয়েও যান। জায়গাটা এখন নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে।

রানাদিল শান্ত গলায় বললো, তুমি থাকো তোমার শাহী শাহজাদায়ানার বদনামি নিয়ে—মনসবদারি—কুর্নিশ-তসলিম নিয়ে, ফৌজদারির দুশো মজা নিয়ে। আমাকে রানী-হাভেলির গরাদ থেকে রিহাই দাও।

—বেশ। তাই হবে। তুমি যখন চাইছো—

—হ্যাঁ। ফের আমি পায়ে ঘুঙরু বেঁধে আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াবো। আমি নাচলে দুনিয়া ঝুঁকে পড়বে।

—তোমার ইচ্ছাই শেষ কথা। তাই হবে—

শাহজাদার এমন শান্ত গলায় রানাদিল জ্বলে উঠলো। সে ফস্ করে বলে উঠলো, তোমার নেই হারেম। ভালোমানুষী ? সাচ্চাইয়ের বাদশা ? রানী-হাভেলিতে আমায় কয়েদ করে রাখলে তোমারই তো লাভ।

হারেম ? ভালোমানুষী ? সাচ্চাই ? কয়েদ ? লাভ ? কিসের লাভ ?—এমন সব খটকা একের পর এক শাহজাদার মনের ভেতর প্রশ্ন হয়ে মাথা তুলে উঠলো। উঠে জট পাকিয়ে গেল সব। তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। শেষে খুব আস্তে বললেন, আমার নসিবই খারাপ। আজকের সন্ধেটা যে এত খারাপ কাটবে তা বুঝতে পারিনি। পারলে কেউ আসে ? কিসের লাভ রানাদিল ?

—লাভ নয় ? বদনামির কথা তুলে আমায় রানী-হাভেলিতে রাখা কেন ? বুঝি না আমি ?

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রানা ? কেন ?

—আমাকে ব্যবহার করা যায়। ইচ্ছে মতো ভোগ করা যায়। আমাকে হাত টাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখা যায়—

—রানা—বলে চেঁচিয়ে উঠে একদম গুম মেরে গেলেন দারাশুকো। কী বলবেন তিনি রাস্তার এই নাচনিকে ? আমি ভাবি ওর মুখ—ওর মুখের হাসি। দেখি ওর চোখের আলো। ও যখন 'দারা' বলে আমার নাম ধরে ডাকে—আমার

এগিয়ে পড়া হাতে বাধা দিয়ে থামিয়ে যখন বলে—'শোনো, সেদিন না—কী হয়েছে—তুমি তো চলে গেলে—তারপর যা ঘটলো—তা তো তুমি কিছুই জানে না—' —তখন আমার না-জানা এক অন্য দুনিয়ার দরওয়াজা খুলে যায় আমার সামনে। সেখানে কোনো শাহাজাদা নেই। নেই কোনো বেগম। আছে শুধু সমানে সমান মরদ আর আওরত। ও হেসে উঠলে ভাবি সারা দুনিয়ার পানি বুঝি এইমাত্র একখানি আরশি হয়ে ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো। ওকে এজন্যেই আমার ফেরেসতা লাগে। এ জন্যেই আমি ওর পায়ে চুমু দিয়ে এতদিন ধরে আগ্রার রাস্তায় নেচে বেড়ানোর ধুলো-বালি—মেহনত সব মুছিয়ে দিই। কেন না, আমার মনে হয়—ওই পা থেকেই ওর বিশাল, রঙিলা খুবসুরতির শুরুয়াত। ওকে স্বস্তিতে—আরামে—সাবধানে রাখতেই রানী-হাভেলির দুয়ার খুলে দেওয়া।

আর ও কি না ভাবছে—ব্যবহার ? ভোগ ? নেড়েচেড়ে দেখা ? আমার আশিকি কিছু নয় ? আমি তো ওসব ভাবিইনি।

শাহজাদাকে এতক্ষণ কোনো কথা বলতে না দেখে রানাদিল নিজেই শুরু করলো। সে জানতে চাইলো, তোমার কখন আসার কথা ছিল ? কাওয়ালি ভেঙে গেল—তখনো তুমি আসছো না দেখে—আমার মনের কী অবস্থা হয় বলো তো ? টানা তিনদিন রানী-হাভেলিতে কাটাবার পর ?

শাহজাদা দারাশুকো চাপা শান্ত গলায় বললেন, দরগাহ শরিফে ফকির দরবেশদের সাধনার ভেতর পড়ে ওঁদের গান। ওঁরা নেচে নেচে গান করেন। রাস্তার লোকের মতো সে গানকে তুমিও 'কাওয়ালি' বোলো না রানাদিল।

—আমিও তো রাস্তার লোক। রাস্তায় বড়টি হয়েছি। রাস্তায় ঘুমিয়েছি। রাস্তায় নেচেছি—

—তুমিও রাস্তার লোক নও রানা।

—হ্যাঁ, আমি রাস্তার লোক। রাস্তায় নেচে নেচেই আমার রুটি হয়েছে।

—আল্লাতালা তোমাকে রাস্তার লোক করে বানাননি। তোমার ভেতর কত সুন্দর জিনিস দেখি—

ঝামটা দিয়ে উঠলো রানাদিল। থামোতো। সেই এক পুরনো কথা।

—দেখি। তোমার মুখখানি ফেরাও এদিকে একবার। আমি দেখবো—

—রাখো তো তোমার সেই এক কথা—সেই বাসি বায়না—! শুনে শুনে আমার কান পচে গেল।

দারাশুকো এই ঝামটায় একেবারে মরমে মরে গেলেন। তিনি আস্তে বললেন, ভালো কথা খুব বেশি হয় না রানা। হাতে গোনা যায়। ভালো কথার ভাষা খুব কম। মন্দ কথা আছে ভুরি ভুরি। খারাপ কথার কোনো শেষ নেই রানাদিল।

—আমি খারাপ। আমি খারাপ কথাই ভালোবাসি। তুমি আবার সিদ্ধাই—সুফী নিয়ে বকতে বোসো না। আমি কাওয়ালিই বলবো। তোমার কখন আসার কথা ছিল ?

—ফকির দরবেশদের নাচগান শুরু হওয়ার আগেই—

—তা সেই কাওয়ালিও ভেঙে গেল। আঁধার করে সন্ধে এসে পড়লো। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। তোমার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। একবার মাথা গরম হয়ে গেলে আমার কথার কোনো বাঁধন থাকে না— তা তো তুমি জানোই—

—আমি যে এক একদিন জালসাজিস নিয়ে ঠায় বসেই থাকি—রাস্তার দিকে চেয়ে—তুমি এসে পৌঁছও মর্জি মতো। অনেক—অনেক পরে—সেই বেলা।

—আমি না তোমার ফেরেসতা। তুমি তো আমার পথ চেয়ে বসেই থাকবে।

—কতক্ষণ রানাদিল? কতক্ষণ?

—দরকার হলে ভোর থেকে সন্ধে অব্দি—আমার মর্জি মতো সময়ে আমি আসবো। বলতে বলতে আশ্চর্য এক সুন্দর ভঙ্গিতে রানাদিল দুই চোখে দেমাক ছড়িয়ে দরগাহ শরিফের ঘাটের দু'ধাপ নেমে উঠে দাঁড়ালো।

শাহজাদা দারার এই আঁধার করা ঘাটলায় রানাদিলের চোখ দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তিনি মন দিয়ে আঁধারকে যেন জেবলে নিয়েছেন। সেই আঁধারই তাঁকে রানাদিলের চোখের দেমাক দেখিয়ে দিলো।

আওরত কী জিনিস। তার জন্যে একজন ইনসানের কেন এমন হয়। এই এমন হওয়াটাই কি আশিকি? এরকম সাত-পাঁচ গুলিয়ে যাওয়া চিন্তার ভেতর হাবুডুবু খেতে লাগলেন হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা। রানাদিল কি জানে আমার এই দশা? রাস্তার এক নাচনেওয়ালি কী সহজে, অবলীলায় একজন শাহজাদার মতো আমি এই ইনসানকে মর্জি মাফিক নাড়াচাড়া করে। কখনো সোহাগে—সওগাতে। কখনো রীতিমত অবহেলায়—ঝঙ্কার তুলে এক ঝামটায়—

আমি তো রানাদিলকে অমন পারি না। কেন পারি না? হারাবার ভয়ে? এমন স্বাদ জীবনে কোনোদিন পাইনি বলে? সাধারণ একজন দেহাতি হিন্দুস্থানি যা সহজেই পায়—তা কি শাহী শাহজাদার পক্ষে পাওয়া খুবই কঠিন?

জিন্দা জীবন এক আজিব ময়দান।

শাহী জামদারখানা থেকে এখন রানাদিলের ঘাগরা, আঙ্গিয়া যায়! শাহজাদার হুকুম। লেবু রঙের ওড়নায় ঢাকা মুখখানি নিয়ে রানাদিল এক দৃষ্টিতে যমুনার বুকে তাকিয়ে আছে। একটু একটু করে বৃষ্টি ভেজা আঁধার থেকে আলো বেরচ্ছে। রাজধানী আগ্রার নিজের ছড়িয়ে পড়া আলো। দরগাহ শরিফের আলো! আসমানের নিজের আলো। এইসব আলো এখন একাকার হয়ে রানাদিলকে আঁধারে আগাগোড়া কুঁদে ফুটিয়ে তুলবে।

ওর দেওয়া কষ্টও আমার কাছে আমানত। ওর যে হাসি বাতাসে মিশে গিয়ে ফুরিয়ে যায়—তাও যদি কুড়িয়ে তুলে রাখা যেতো। এই যে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাটের দু'ধাপ আজিব সুন্দর ভঙ্গিতে ওর নেমে যাওয়া—তা মিশে রইলো আজকের এই ভিজে আঁধারে। ওর চলা—ওর বলা—ওর নিষ্ঠুর ধমকানি—আবার আওরতি দেমাকে বলে ওঠা—ভোর থেকে সন্ধে অব্দি বসে থাকবে দরকার হলে—আমার মর্জি মতো আমি আসবো—এও যে আরেক আশ্চর্য রহস্যের জাল ছড়িয়ে দেয়। মাশুকা কি তাহলে এমনই হয়ে থাকে? আমি তো জানতাম না। অথচ

হিন্দুস্থানের রাস্তার একজন দেহাতি মানুষ তা অনেক আগেই জানে। শাহজাদারা দুনিয়ার হকিকত অনেক কিছুই জানতে পারেন না কোনোদিন।

—রানাদিল! একজন শাহজাদা যদি ভোর থেকে সন্ধে অব্দি দরগাহ শরিফের পিপুলতলায় কিংবা ঘাটে বসে থাকে তো সারা আগ্রায় জানাজানি হয়ে যাবে।

—তাহলে তুমি শাহজাদা হয়েই থাকো। আর এসো না।

দারাশুকোর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তা আমি পারবো না রানাদিল। তোমায় ছেড়ে থাকা আমাকে দিয়ে হবে না।

রানাদিল যমুনা থেকে চোখ সরিয়ে দারাশুকোর দিকে ঘুরে তাকালো। —তাহলে তুমি আর শাহজাদা হয়ে থেকো না।

দারা মনে মনে বললেন, কী সহজ ফয়সালা। এক পলকও লাগলো না।

রানাদিল সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আমার সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসো। আমার মতো খারাপ হয়ে যাও। চলো—আমরা হাত ধরাধরি করে রাজধানীর শাহী সড়কে ভিড়ের ভেতর মিশে যাই—গোয়ালিয়রের রাস্তা ধরে বাগোয়ানের জঙ্গলে গিয়ে উঠি।

শাহাজাদা দারাশুকো কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ অল্প আলোয় খুঁজে খুঁজে রানাদিলের মুখখানি আগাগোড়া দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। সাধারণ ঘরেলু মানুষের বেগম এভাবেই তাঁর খসমকে জাগিয়ে তোলে। বলে—গাঁঠরি বাঁধো। এখনই আমরা রওনা হবো। জীবনের এই স্বাদ আমি আগে কখনো পাইনি। মুঘল খানদানে কোনো শাহজাদার এ স্বাদ জোটার কথা নয়। মনসব-সুবেদারি দিয়ে ঘেরা সে-জীবন।

বর্ষার এই সন্ধ্যার সময়টায় বাদশা শাহজাহান বড় একটা বেরন না কোথাও। তাঁর আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা—শাহজাহানের এই বয়সে ঘন ঘন কাশ্মীর নয়তো লাহোর হয়ে কাবুল যেতেন—বর্ষা মাথায় করেই। অবিশ্যি তার একটা কারণও ছিল। এরকম বয়সেই জাহাঙ্গীরের জীবনে মেহেরুন্নেসা নুরজাহান হয়ে ওঠেন। জীবনের দু-কুল ভাসানো ভালোবাসায় জাহাঙ্গীর তখন কানায় কানায়।

আর শাহজাহানের জীবন থেকে মমতাজমহল চলে গেছেন—তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। শাহজাদারাও মনসবদার হয়ে একে একে সুবেদারিতেও বসেছে।

এমন বর্ষার সন্ধ্যায় বাবর বাদশা কী করতেন? শরীরটা সযুত রাখতে হয়তো ঘোড়ার পিঠে বেরিয়ে পড়তেন। হুমায়ুন বাদশা—শোনা যায়, এই বয়সে সন্ধেবেলাটা তিনি বই পড়ে কাটাতেন। বাদশা আকবর? নিশ্চয় ইবাদতখানায় বসে নানান ধর্মের কথা, আকাশের তারাদের কথা নিয়ে মেতে থাকতেন। জাহাঙ্গীর তো সন্ধেবেলাটা অঙ্গিরার শরাবের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলি পিচ গালে দিয়ে ষোড়শীদের মুখে গান শুনতেন। পাশেই বেজে উঠতো কিঙ্গিনা। পায়ের নুপুর। বাজাতো ওই ষোড়শীরা। নাচতো ওরাই।

এতসব কিছুর ভেতর না গিয়েই বাদশা শাহজাহান সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে গিয়ে ঢোকেন। বড়জোর দুর্গের ঢাকা অলিন্দে দাঁড়িয়ে যমুনার ওপারে তাজমহল গড়ে তোলার ময়দানবী কাণ্ডকারখানার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন।

অন্দরমহলে ক'দিন ধরে দরাংগ খাঁ বাদশাকে বর্ষার কিছু রাগ শোনালেন। মাঝে একটা সন্ধ্যা ওখানে বাদশার কাছে শুধু ছিলেন মেহজাবিন বেগম। আজকের সন্ধ্যার মজলিশ কিছু অন্যরকম।

শাহজাহানকে ঘিরে বসে আছেন গুজরাতের সুবেদার শায়েস্তা খাঁ—মরহুম মমতাজমহলের বড় ভাই। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর দুই ছোটবোন মেহজাবিন আর সিতারাও আজকের মজলিশে হাজির। তাঁদের পেছনে নিজের নিজের খসম খলিলুল্লা খাঁ আর উজির জাফর খাঁ বসে।

উপলক্ষটা কিছু কম নয়। বুরহানপুর থেকে ল্যাংড়া এসেছে। বুরহানপুরের শাহীবাগে একটি আমগাছ আছে। বাদশাপসন্দ ল্যাংড়া হয় তাতে। একবছর বাদ দিয়ে একবছর ফলে। সেই ল্যাংড়া আজই এসেছে। তাই এতজনকে ডেকে তবে শাহজাহান আম খেতে বসেছেন।

দক্ষিণের সুবেদার-ই-আজম মহীউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর বুরহানপুরে ওই আমগাছটি দেখাশুনোর জন্যে খান্দেশের সুবেদারকে বিশেষভাবে বলে রেখেছেন। বুরহানপুর খান্দেশেরই রাজধানী। ওই আম পাকা মাত্র আওরঙ্গজেব কিস্তি করে জরুরি ডাকচৌকি মারফত তাঁর আব্বা হুজুরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আওরঙ্গজেব বাহাদুরের কড়া হুকুম: আমের ঝুড়ি পথে কোথাও মাটিতে রাখা চলবে না।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণে রওনা হবার সময় আগ্রাতেই বাদশা নিজে তাঁকে ওই গাছটির কথা বলে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবও কোনো ঝুঁকি নেননি। তিনি এদিকে এসেই একজন অতি বিশ্বাসী হায়দরাবাদি রিসালাদারকে বুরহানপুরে বসিয়ে রেখেছেন। বাদশাপসন্দ ল্যাংড়ার গাছটির দেখভাল করতে।

বাদশার সঙ্গে বসে আম খাওয়ার মতো সহজ কাজটিও কঠিন হয়ে পড়ে। বাদশা কখন কী বলে বসেন তার কোনো ঠিক নেই। বাদশার আমের স্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিও আলাদা। সে কেতা এখনো রপ্ত হয়নি বলে খলিলুল্লা খাঁয়ের হাত কাঁপছিল। এই বুঝি আমের আঁটিটা হাত ফসকে মেঝের দামি বনাতে গিয়ে পড়ে। পড়লে তো কেলেংকারি। তার চেয়ে বে-সহবতি কাজ আর কিছু হতে পারে না। তখন বাদশার এক একটা কথা দোগুণী হুল হয়ে গায়ে বিঁধবে খলিলুল্লা খাঁয়ের। কেন না, সামনে বসে আছে তাঁরই বেগম মেহজাবিন—যে কিনা আবার বাদশারই দুপুরের 'বড় নাস্তা'। আম খেয়ে বাদশা কিছু বলার আগে স্বাদ কেমন বলে বিপদে পড়তে চান না খলিলুল্লা খাঁ। বলে হয়তে দেখলেন—বাদশা ঠিক উল্টোটা বলে বসেছেন।

পয়লা ঝুড়ির একটা আম মুখে দিয়ে আলা হজরত বললেন, এবার আম ঠিক সময় তোলা হয়নি।

খলিলুল্লা খাঁ মনে মনে নিজেকে শুক্রিয়া জানালেন বারবার। ভাগ্যিস আগ বাড়িয়ে বলে বসিনি—খাসা আম! একদম গাছপাকা। বললেই হয়েছিল!

বাদশা শাহজাহান এবার জহুরির চোখে দুসারি ঝুড়ি থেকে একটি আম বেছে বের করলেন। মুখে দিয়েই বললেন, আম বোধহয় আসবার সময় মাটিতে রাখা হয়েছিল।

মেহজাবিনের আম খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখের পাতা নাচছে। লক্ষণ ভালো নয়। তিনিই মরহুম বাজি মমতাজমহলের পরেই বাদশাকে ভালো করে চেনেন। আজ না কোনো ভীষণ কাণ্ড ঘটে। ফলের ভেতর বাদশা আম সবচেয়ে ভালোবাসেন। সেই আম চেখেই বাদশার মুখের চেহারা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মেহজাবিন খুব মিষ্টি গলায় বললেন, খোদাবন্দ! আপনি ওই ঝুড়ির আরেকটা আম খেয়ে দেখুন না—

শাহজাহান কোনো কথা বললেন না। তিসারি ঝুড়ি দেখে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, এ-বছর আম যেন কম এসেছে।

এবার সবারই আম খাওয়া থেমে গেল। উচিত বক্তা উজির জাফর খাঁ খাওয়া শেষ না হতেই আমটা রেখে দিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই অবস্থা দেখে সিতারা বেগমের চোখে তাকালেন। পালটা সিতারাও তাকালেন। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুজনের।

শেষ ঝুড়িটার একটা আমে হাত দিয়েই বাদশা বললেন, আমের ঝুড়ি বোধহয় বুরহানপুর থেকে দৌলতাবাদ ঘুরে আসে।

শায়েস্তা খাঁ মনে মনে বললেন, সর্বনাশ! এবার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের হয়েছে।

কিছুকাল হলো আওরঙ্গজেব তাঁর দেওয়ানখানা রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদের দুর্গে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আর্জি জানিয়ে আসছেন। এখন বুরহানপুরের আম দৌলতাবাদ ঘুরে আসছে বলার মানে—শাহজাদার বিরুদ্ধে মোটামুটি ইলজাম আনা। ঠিক তেমনি—আম এবছর যেন কম এসেছে বলার মানে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আরও বড় ইলজাম তোলা।

কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতর এই মজলিশ তার চেহারা ফিরে পেল। মেহজাবিন যা ভয় করেছিলেন—তেমন অনর্থ কিছুই ঘটলো না। বাদশা শাহজাহান বেশ হেসে হেসেই বললেন, দাদাসাহেব আকবর বাদশার খোয়াব ছিল—মুঘল ধ্বজের নিচে সারা দক্ষিণ চলে আসবে একদিন।

সবাই একসঙ্গে বাদশার মুখে তাকালেন।

শাহজাহান বললেন, তাঁর সেই খোয়াব প্রায় চাল্লিশ বছর পরে সত্যি হতে চলেছে।

জাফর খাঁ বাদশার মুখে বড় করে তাকালেন। এমনিতেই জাফরের চোখ জোড়া বেশ বড় বড়। সেদিকে তাকিয়ে শাহজাহান বললেন, আমি নিজে ফৌজ নিয়ে যাচ্ছি। আহমেদনগর ক'বছর হলো আগ্রার তাঁবে এসেছে। এবার আসবে গোলকুণ্ডা!—বিজাপুর!

বলতে বলতে বাদশা দু'হাত শূন্যে তুলে আনন্দে হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। সে চিৎকারে জোশ, তেজ সবই ফুটে উঠলো। চোখের দুই কোণে রক্তের রং। উজির জাফর খাঁ বাদশার মুখে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলেন। কত দাঁত। ঝকঝকে। ফর্সা। ধারালো। এই মানুষটি লড়াকু—জানবাজ। হামলা এই মানুষটির বড় পছন্দ। লড়াই পেলে শাহজাহান আর কিছু চান না।

মুখে জাফর খাঁ বললেন, ওদিকে অজন্মা যাচ্ছে। খেতে না পেয়ে লোকে কোলের ছেলে বেচে দিচ্ছে। কেনার কেউ নেই। গুজরাত থেকে মালব অব্দি জায়গায় জায়গায় সামান্য চাষবাস হয়েছে। খান্দেশের দিকটা তো নেড়া একেবারে—

নিজের শাহীর খবর পরের মুখের ঝাল হিসেবে শুনতে ভালোবাসেন না বাদশা। সে পর যদি একজন উজিরও হন। বেশ চাপা গলাতেই তিনি বললেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেবের চিঠি দেখেছি।

—ক'বছর ধরে জমি বিলিতেও ভীষণ অগোছালো দশা হয়েছে দক্ষিণে।

—সে জন্যেই তো আওরঙ্গজেব বাহাদুরকে পাঠানো।

—হজরত।—বলে দ্বিধায় পড়ে থামলেন উজির জাফর খাঁ। তিনি মরহুম মমতাজমহলের ছোটবোন সিতারা বেগমের খসমও বটে। বাদশার আম চেখে খাওয়ার সঙ্গীও তিনি।

—থামলে কেন?

—শাহজাদা আওরঙ্গজেব জানিয়েছেন—তিনি তাঁর দক্ষিণের চার সুবা থেকে পাঁচ কোটি তনখার সম্বচ্ছরের খাজনা এই দুর্ভিক্ষ দশার ভেতরেও পুরোপুরি উসুল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শাহজাদার আর্জি—ওখানকার চাষবাস, মানুষ-জনের হাল ফেরাতে শাহী খাজানাখানা থেকে কিছু দেওয়া হোক।

—জানি জাফর খাঁ। আমাকেও লিখেছে শাহাজাদা আওরঙ্গজেব।

—তবে কি দেওয়ানখানা থেকে তনখা পাঠাবো আমরা? ওখানে খাজানাখানা থেকে সত্যিই মোটারকমে পাঠানো দরকার।

—না। দরকার নেই।

—দরকার নেই?

—হ্যাঁ। শাহজাদা দারাশুকো সবটা খতিয়ে দেখেছে। দেখে বলেছে—দরকার নেই। ওখানে জমিজমার গোলমাল, অগোছালো দশা আগে ঠিক করা দরকার। কেন অজন্মা? তা খতিয়ে দেখতে হবে। সেজন্যে মথুরার ফৌজদার মুর্শিদকুলি খাঁকে ঔরঙ্গাবাদে পাঠানো হয়েছে। ইরানি এই মুর্শিদকুলি নাকি টোডরমল বোঝে—আবার অজন্মাও বোঝে। দেখি কেমন করে? আমি তো যাচ্ছিই—তখন দেখে আসবো। আগ্রা ফেরার পথে বুরহানপুরের শাহীবাগের আমগাছটাও দেখে আসবো। কী বলেন খলিলুল্লা খাঁ।

খলিলুল্লা কেঁপে উঠলেন।

বাদশা তাঁর খাস খরচের জন্যে বিঘা পিছু দশ সের করে গেঁহু নিয়ে থাকেন। যেখানে ধান—সেখানেও সেই দশসের ধান পেয়ে থাকেন বাদশা। সারা হিন্দুস্থানের চাষের খেতখামার থেকে এই আয় দিয়েই বাদশার খাসখরচ—ফৌজিখরচ কুলিয়ে যায়। জমিদার, জায়গিরদার, ফৌজদার, সুবেদার নিজের এলাকার সম্বচ্ছরের খোরাক ছাড়াও ফৌজের ছ'মাসের খোরাকি মজুদ করবেন সবচেয়ে আগে। তারপর তিনি আগের আগের বছরের মজুদ বাজারে ছাড়তে পারেন। ছাড়তে পারেন হাল সনের ফসলও। অজন্মা হলে সাধারণের খাবারদাবার যোগাবেন সুবেদার।

কিন্তু শাহজাদা আওরঙ্গজেব তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। সুবা গুর্জরের খানিকটা তো বটেই—খান্দেশ, মালব, বেরার, তেলিঙ্গানায় যেসব জায়গা ফসলের জন্যে বিখ্যাত সেখানে ঘাসও জন্মায়নি। এই দশার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘন ঘন ফৌজি হামলার লুটপাট। আগ্রা যে মোহরের খেরিয়া ঢেলে এই এলাকায় দিয়ে থুয়ে জমি জায়গার একটা বন্দোবস্ত করবে—তাও করেনি। চাষবাস একরকম উঠেই গেছে। কী কষ্টে যে দক্ষিণের খাজনা হাসিল করতে হয়েছে—তা শাহজাদাই জানেন। এই অবস্থায় জায়গিরদার, ফৌজদাররা তাদের দায়দায়িত্ব বইবে কী করে? বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এখনো তাঁবে আসেনি বলে বিরাট ফৌজ পুষতে হচ্ছে।

জোতজমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফেলে রাখার কথা। সেখানে গরু মোষ চরবে। আইন-ই-আকবরী ঘাঁটছিলেন আওরঙ্গজেব। তাতে পরিষ্কার লেখা হয়েছে—এক ক্রোশ অন্তর বড় বড় ইঁদারা কাটাতে হবে। একশো বিঘায় একটা বড় দীঘি খুঁড়তে হবে। জমিটা কেমন? কাছে জলের যোগানই বা কী? কাছাকাছি বড় বসতি আছে? থাকলে সেখানে যাবার রাস্তা কী? ব্যবসা বাণিজ্য কেমন সেখানে? ওখানে কী রকম চাহিদা জিনিসপত্রের? এত সব দেখে তবে রাজকর বসাতে হবে।

এতসব দেখবে কে? আগ্রা কোনো আশরফি পাঠায়নি। তার বদলে পাঠিয়েছে এক ইরানিকে। মাঝবয়সী এই মুর্শিদকুলি খাঁ একা এতসব দেখবেন কী করে? সেই কোন ভোরে দুই আমিন নিয়ে মানুষটি ঘোড়ার পিঠে দূরে দিগন্তে মিলিয়ে গেছেন। ফিরবেন সন্ধে পার করে দিয়ে। কোনোদিন বা রাত হয়ে যায় অনেক। মুর্শিদকুলি কথা বলেন কম। মানুষটিকে এই ক'দিনে মনে ধরেছে শাহজাদার।

এখন দুপুরবেলা। আজ কোনো মেঘ নেই আকাশে। তাঁবুর বাইরে দূরের পাহাড়ের গা খসে যাওয়া লালচে পাথুরে বুকে নির্মম রোদের ঝলসানি। বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না। শাহজাদা ফের আইন-ই-আকবরীতে চোখ নামালেন।

কর বসানোর আগে সেখানকার বাসিন্দাদের অবস্থাও ভাবতে হবে। যদি সেচের জন্যে বেশ দূরে থেকে জল আনতে হয় তো কর কিছু কম হবে। হিন্দুস্থানে রাজারা আগে ফসলের আট ভাগের এক ভাগ নিতেন। তুর্কি চাষীরা ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ শাহকে দিয়ে থাকে। ইরানে এই করই ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। এত সব মাথা গুলিয়ে দেওয়া বিধান দেখে পরদাদা আকবর বাদশা সারা দেশের জমি জরিপ করালেন। তাতে তাঁর দোসর ছিলেন টোডরমল। সেই টোডরমলি ব্যবস্থায় হাত পাকানো এই মুর্শিদকুলি খাঁ।

গতকাল সন্ধের পর মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছে শাহজাদার। চার চারটি সুবা জুড়ে অজন্মা। তার সঙ্গে বিশাল ফৌজকে তৈরি রাখা ছেলেখেলা নয়। এই অবস্থায় আগ্রা কোনো রা কাড়ছে না। রাগে দুঃখে আওরঙ্গজেব ডান হাতের আঙুল কামড়াচ্ছিলেন।

মুর্শিদকুলি তখন তাঁকে এই বলে শান্ত করেন—অস্থির হবেন না হজরত। সব ফসলই ফলে এমন পুলেজ জায়গায় এখুনি খাজনা বসিয়ে তোলা যাবে। ওসব জায়গা তো খালি পড়ে থাকে না। পারৌতি জায়গাতেও কিছু কম করে খাজনা বসাচ্ছি। বছরে দু'এক মাসের বেশি ওসব জায়গা খালি পড়ে থাকে না। চেচর জায়গার কথা আলাদা। ওখানে এখুনি কোনো খাজনা বসানো যাবে না। তিন চার বছর চেচর জায়গা ফেলে রাখা হয়।

—পুলেজ, পারৌতি কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। আমি চাই আশরফি। নাহলে ফৌজ চলবে কিসে?

একগাল হেসে মুর্শিদকুলি খাঁ কালই সন্ধেরাতে বলেছিলেন, পাবেন বন্দেগান। এরই ভেতর থেকেই আশরফি আসবে দেখবেন। আসতে শুরু করেছে। বুঞ্জের ধাঁচের জায়গাগুলো পাঁচ বছরেরও বেশি পড়ে আছে। ওসব জায়গায় আমরা হাত দিচ্ছি না। হাত দিচ্ছি না চেচর জায়গা জমিতেও—

—তাহলে? —বলে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। এখান থেকে আগ্রা অনেক—অনেক দূরে। মাঝখানে নদী, পাহাড়, প্রান্তর। আগ্রা দুর্গে বসে বড়েভাই ফৌজদার-ই-হিসার। একটি হামলাতে না গিয়েও শাহজাদা দারা বারো হাজারি মনসবদার। আর আমি? সবই নসিব। বুন্দেলায় ঝুঝরকে শায়েস্তা করে ফিরতেই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন আব্বা হুজুর।

—শুনুন তাহলে শাহজাদা। মুলেজ, পারৌতির জায়গা জমির আবার সবচেয়ে সেরা, মাঝারি, নীরেস—এই তিনটে ভাগ থাকে।

—আপনি এতসব জানলেন কোত্থেকে? আপনি তো ইস্পাহান থেকে এসেছেন—

—ইস্পাহান নয় হজরত। আমি এসেছি সিরাজ থেকে।

—ওঃ। হাফিজের দেশ—

—কোন হাফিজ?

শাহজাদা বুঝলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ জীবনে হাফিজের নাম শোনেননি। তাঁর দিওয়ান শোনা তো দূরের কথা। ইরান থেকে নসিব বদলাতে চলে এসেছেন

হিন্দুস্থানে। এসেই জমা, উসুল, হাসিল, তামাদির ভেতর জড়িয়ে গেছেন মানুষটি। আওরঙ্গজেব মুখে বললেন, ও এক জহুরির কথা বলছিলাম—

—নাম শুনিনি তো।

—তেমন শোনার মতো কেউ নন। —বলেও শাহজাদা নিজের মনের ভেতর পলকে ভাবলেন—সিরাজ বলতে তো হাফিজই বোঝায়। যেমন কিনা আগ্রা বলতে বোঝায় মুঘল। মুখে বললেন, আপনি এখন ক্লান্ত। না হয় কাল সকালে বলবেন—

মাল গুজারির এই ইরানি আমলাটি ক'দিনের ভেতরেই শাহজাদার মন জয় করেছেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নিজেও তা জানেন। খাঁ সাহেব বললেন, হজরত আমি মথুরায় ফৌজদার ছিলাম। আপনি ভোররাত থেকে মাঝরাত অব্দি চোখের পাতা কখনো এক করেন না। আপনার মতো বন্দেগানের মবারকে কাজ করেও সুখ। কোত্থেকে আশরফি আসছে—আসবেও—তা বলতে না পেরে আমিও সুস্থির হতে পারছি না।

—বেশ। বলুন।

—সেরা, মাঝারি, নীরেস—এই তিন রকমের জায়গার ফলন যোগ করে যা হয়—তার তিনভাগের এক ভাগকে পুলেজ জায়গার ফলন ধরছি। তারও তিন ভাগের এক ভাগ শাহী পাওনা। সেরা পুলেজ জমির এক বিঘায় আঠারো মণ গম জন্মায়, আঠারো মণ যব, সাড়ে দশ মণ সরষে, তেরো মণ ছোলা বা মটর আর চব্বিশ মণ কলাই জন্মায়—

শাহজাদার ঘুম আসছিল। কিন্তু এমন উৎসাহী আমলার মুখ চেয়ে তিনি তাঁকে বিদায় দিতে পারছিলেন না। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মুখে ছোলা, মটর, কলাই, গম—নানা ফসলের নাম আতশবাজি হয়ে ফুটছে। একসময় খাঁ সাহেব সব ফসলের একটা গড় ফলন বলতে লাগলেন। তার কিছু আওরঙ্গজেবের কানে গেল, কিছু গেল না। বেশিরভাগই তিনি ভুলে গেলেন। ভুলতে ভুলতেও তাঁর মন বললো, শাহী কী কঠিন জিনিস। এ জিনিস পরদাদা আকবর বাদশা কী অবলীলায় চালিয়ে গেছেন। তার সোনালি সুফল আজ পাচ্ছে আগ্রা।

মুর্শিদকুলি বলছিলেন, বাদশার পাওনা হলো তাহলে বিঘা পিছু চার মণ গম, চার মণ যব, আড়াই মণ সরষে, সাড়ে তিন মণ ছোলা বা মটর আর ছ'মণ কলাই। কিন্তু জমিতে যদি পেঁয়াজ, লেবু, শাক-সবজি ফলে—তাহলে নগদ তনখায় খাজনা দিতে হবে।

নগদের কথায় শাহজাদা সিধে হয়ে বসলেন। নগদের জন্যে তাঁর এখন বুভুক্ষু দশা।

খাঁ সাহেব বলছেন—এছাড়াও নীল, পান, তেঁতুল, গাঁজা, চুবড়িআলু, শাঁকালু, লাউ, কুমড়ো ফলালে নগদে খাজনা চাই। পাটোয়ারিদের গাঁয়ে গাঁয়ে এদিকেই এখন জোর দিতে হবে।

—তাহলে কানুনগোদের হুকুম পাঠান।

—পাঠানো হয়েছে হজরত। গরু মোষ রক্ষার গোসেমারি খাজনা চালু

করতে চাই আমরা—

—তা কী করে হবে ? সেজন্যে আগ্রার সায় দরকার খাঁ সাহেব ?

—আগ্রা যদি আশরফি না দিতে পারে তো এই অবস্থায় কি আমরা তার সায়ের জন্যে বসে থাকবো ? আপনার শাহী ফৌজের তনখা হয়নি দু'মাস। তা কি আগ্রা দেখেছে ? আমার তো মনে হয়, ফলবান গাছের ওপর খাজনা—সরদবক্তি, শান্তি রাখতে দারোখানা খাজনা, সরাফি, হাসিলবাজার—সবরকম খাজনা এখন আমাদের চালু করতে হবে। বাঁচতে তো হবে শাহজাদা। গাঁজা, কম্বল, তেল, কাঁচা চামড়ার ওপরেও কর বসাতে হবে দরকারে।

শাহজাদা গতকাল সন্ধ্যায় শাহী লাল তাঁবুর হাতায় বসে দাক্ষিণী গরম হাওয়ায় এই ইরানি আমলাকে দেখছিলেন। ওসব কর আকবর বাদশা তাঁর আমলে উঠিয়ে দেন। এর বেশিরভাগই মুঘলশাহীর আগে পাঠানদের বসানো। আগুন জেবলে রেঁধে খাওয়ার ওপরেও খাজনা দিতে হতো যাত্রীদের—পাঠান আমলে।

খাঁ সাহেব বলছিলেন, ভাওলি বন্দোবস্ত করেও শাহী পাওনা আদায় করা যায়। উনিশ বছর অন্তর জমি-জায়গার নতুন ন্দোবস্ত হয়। থাকবন্দি জরিপ হয়। কারণ, উনিশ বছর অন্তর চাঁদের গতি পাল্টায়—উনিশ বছর অন্তর শীত গ্রীষ্মের চেহারাও বদলায়—

—তাই নাকি ? —অবাকই হলেন শাহজাদা।

—হ্যাঁ হজরত। এসব কথায় আমার কোনো কেরামতি নেই জানবেন।

—কী রকম ?

—আকবর বাদশার শাহীর পনেরো বছরে রাজা টোডরমল মোজাফর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসব হিসেবপত্তর করে গেছেন। ওঁরাই নতুন জমা তৈরি করেন। দশজন বড় কানুনগোকে লাগানো হয়। তাঁরাই সুবায় সুবায় হিসেব কষে—ভাগ করে—পাটোয়ারিদের কাছ থেকে হিসেব চেয়ে নিয়ে সব তৈরি করেছিলেন। নদী খাত পাল্টায়। তাতে শিকস্তী মহল জলের তলায় চলে যায় হজরত। আবার নতুন চর জায়গা মাথা ঠেলে ওঠে। সেসবও তখন জরিপ করে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই নতুন জমার হিসেবে সেসময় আয় কিছু কমেছিল ঠিকই—কিন্তু আদায় কখনো বাকি পড়তো না। আমরাও এই পথে এগোতে চাই। আমি নতুন কিছু বলছি না শাহজাদা। সবই আইন-ই-আকবরীতে পাবেন হজরত।

কাল সন্ধের কথাগুলো মনে রেখেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব আজ দুপুরে আইন-ই-আকবরীখানা খুলে বসেছেন। নাস্তালিক ফারসিতে লেখা সুন্দর করে বাঁধানো এই আইন-ই-আকবরী—মালফুজাত-ই-তৈমুরার মতোই সব সময় শাহজাদার কাছে কাছে থাকে। তৈমুরের জীবন ও বিধান আর আকবর বাদশার বেঁধে দেওয়া এই আইনকানুন—হিন্দুস্থানে চলতে-ফিরতে দরকার। নয়তো একজন মুঘল শাহজাদা এগোবেন কী করে ? ভেবে পান না আওরঙ্গজেব। অথচ বড়েভাই শাহজাদা দারার এসব কোনো বালাই নেই। বড়েভাইয়ের অন্দরমহলের দুয়ারে ফকির-সন্ন্যাসীদের জন্যে কোনো পাহারাই নেই। মুঘলশাহীকে রাস্তার

ধুলোয় নামিয়ে এনে তবে থামবেন বড়েভাই।

কী মহান এই তৈমুর বংশ। ফরগনা থেকে চাঘতাই মুঘলরা যেদিন খাইবার দিয়ে থলচোটিয়ালের পাহাড়ী রাস্তা পেরিয়ে হিন্দুস্থানে এসে পা রেখেছিল—সেদিন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল—মাত্র একশো বছরের ভেতর মুঘলশাহী এখানে এসে পৌছবে? এতটা বড়—বিশাল হয়ে উঠবে? এই অতিকায় ফৌজ? সুবার পর সুবা? দুনিয়ার অন্য সব শাহীর জলুনি হয়ে দাঁড়াবে?

আইন-ই-আকবরীর এক জায়গায় চোখ আটকে গেল শাহজাদা আওরঙ্গজেবের। আমীল গুজর। যিনি খাজনা আদায় করবেন। কী ভাবে করবেন? চাষীদের তনখা দিয়ে—বীজ যুগিয়ে—বলদ কিনতে সাহায্য করে। এই তাক্কাভি দানের ওপর সুদ নেওয়া চলবে না। সুদ নেওয়া মহাপাপ। জল শুকিয়ে গেলে দীঘি কেটে দিতে হবে শাহী খরচায়। বানের পর জল নিকাশের ব্যবস্থা করবে দেওয়ানখানা।

বাঃ! চমৎকার! কিন্তু পরদাদাসাহেব, আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন তো বুঝতেন।

এক জায়গায় চোখ আটকে গেল আওরঙ্গজেবের। গাঁয়ে গাঁয়ে কুস্তির আখড়া রাখতে হবে। সবাই যেন ঘোড়ায় চড়তে পারে। বন্দুক-তলোয়ারে পটু হয়।

ব্যাপারটা ভালো লাগলো শাহজাদার।

বছরে খাজনা আদায় দু'বার। দোলের সময় রবিখন্দ থেকে। দেওয়ালির সময় ধানের মাঠ থেকে।

শাহজাদা ভাবলেন, আমার সামনে দোল দেওয়ালি—দুই-ই সমান। মাঠে খন্দ কোথায়! এক যদি খাজনা আদায়ের জাদুকর মুর্শিদকুলি খাঁ কিছু করতে পারেন।

ভাবতে না ভাবতেই ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ এসে হাজির। তাঁর সঙ্গী দুই আমিনও ঘোড়ার পিঠে। তারা এই দাক্ষিণী রোদে ধুঁকছে।

ঘোড়া থেকে নেমে খাঁ সাহেব কুর্নিশ করলেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব তুখোড়—খাটিয়ে মানুষজনের দাম জানেন। এই কাঁচা উমরে তিনি বুন্দেলা জয় করেছেন। এই তাজা বয়েসে তিনি বিশাল দক্ষিণে বলা যায়—সুবেদার-ই-আজম। তাঁবুর খুঁটি থেকে তুরানি ঘোড়ার দানা—সবই তাঁর নজরে। তিনি ডান হাত তুলে এই মাঝবয়সী মানুষটিকে সম্মান জানাতেই যেন বললেন, কাজের সময় আমি সহবত্ নিয়ে মাথা ঘামাই না। সবার ওপরে আল্লাতালা আছেন। আপনি আগে বসুন। অনেকটা রাস্তা ঘোড়া দাবড়ে এসেছেন।

সরোঠার ঠাণ্ডা পানিতে বুকের ছাতি ভিজিয়ে নিয়ে খাঁ সাহেব জানালেন, নান্দের যাবার সড়কের দু'ধারে চাষীদের ভেতর ঢালাও বাগীপনাহ্ দেখা দিয়েছে।

—ফৌজি সেপাইরা ছিল তো আপনার সঙ্গে ?

—এত বড় দেশে ক'জন সেপাই নিয়ে কী হবে শাহজাদা ! ওরা পুরনো বন্দোবস্তে খেপে আছে। দিলাম টোডরমলি দাওয়াই।

—তা দিতে গেলে তো বীজ—বলদের জন্যে তাক্কাভি-উধারের আশরফি ছড়াতে হয় খাঁ সাহেব—

—যেমন যেটুকু আদায় হয়েছে—সেটুকু বিলি করছি। নতুন করে জরিপের ব্যবস্থা করছি। আমরা যে ভালো চাই—সেটা বোঝাতে পারলেই তো অনেকটা কাজ হাসিল হয়ে যায়। ছেড়ে যাওয়া গাঁয়ে চাষীদের ফিরিয়ে আনছি।

—কী করে ?

—আপনার দেওয়া কোরানখানি ছুঁয়ে হলফ করে বললাম। আল্লার নামে বললাম।—তোমরা ফিরে এসো। শাহী তোমাদের চায়। তোমরাই হিন্দুস্থান।

—ফিরে এলো ?

—হজরত ! কাজের পেছনে আপনার মতো শাহজাদা থাকলে—ইচ্ছা থাকলে—কোনো কাজই অসাধ্য নয়।

সূর্য নাম না জানা পাহাড়ের পেছনে ঢল নেবে। রোদের কাত হয়ে পড়া কিছু নরম। একটা শতাব্দী জুড়ে খাঁ সাহেবদের মতো কারিতকর্মা মানুষজনেরাই হিন্দুস্থানের মাঠে-ঘাটে শাহী ধ্বজ বয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আল্লাতালা আর শাহীতে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এঁরা সব অসাধ্য কাজে ঝাঁপ দিয়েছেন। কেউ ভেসে উঠেছেন। বেশিরভাগই ভেসে গিয়েছেন। মুঘলশাহীর মতো বিশাল আমলাশাহীর ভেতর আগ বাড়িয়ে কাজ করতে যাওয়াও বিপদ। তাতে সবার চক্ষুশূল হয়ে পড়তে হয়। আওরঙ্গজেব বুঝতে পারছিলেন—রাজধানী আগ্রায় বসে এমন কাজ করতে গেলে খাঁ সাহেবকে গোড়াতেই উজির সাদুল্লা খাঁ—কিংবা উজির জাফর খাঁয়ের বিষনজরে পড়তে হতো। তাঁরা ভাবতেন—খাজনা আদায়ের একজন আমীন গুজারের এত বাড় ভালো নয়।

পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। তার ভেতর দাঁড়ানো গোরাপানা শাহজাদা যেন বা এই বিশাল লালীর ভেতরকার বীজে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তো মনে হলো মুর্শিদকুলি খাঁয়ের।

আওরঙ্গজেব সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, দক্ষিণে এই চার সুবার ওপর আমি সুবেদার।

কোথাও কোনো ভুল হয়েছে ভেবে খাঁ সাহেব তাড়াতাড়িতে তসলিম জানাতে গেলেন শাহজাদাকে।

আওরঙ্গজেব তাঁকে তসলিমের ভেতরেই থামিয়ে দিলেন। হাত তুলে। বললেন, থামুন। আমার একটা কথা আছে—

থেমে পড়ে অবাক হয়ে তাকালেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি এর আগে শাহী খানদানের কোনো শাহজাদার এত কাছাকাছি আসেননি। মথুরার ফৌজদার থাকতে গোকুল, বৃন্দাবন আর মথুরার শান্ত নিস্তরঙ্গ ফৌজদারিতে কোনো ওঠা-পড়া কিংবা ঝুঁকি ছিল না। তবে সবসময় তৈরি থাকতে হতো। কেননা রাজধানী

আগ্রা কাছেই। কখন কে এসে পড়েন—কিংবা কখন যে মথুরার ওপর দিয়ে যান—সেদিকে খেয়াল রাখতে হতো।

খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, খোদাবন্দ!

—শুনুন। আজ থেকে আপনি এই চার সুবার দেওয়ান।

মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দাক্ষিণে আমীল গুজারি আর মথুরার ফৌজদারি—একই মাত্রার কাজ। কিন্তু সেসব হিসেব ওলটপালট করে দিয়ে এক লাফে চার চারটে সুবার ওপর দেওয়ানি।

খাঁ সাহেব কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়লেন। কেতা দস্তুর কুর্নিশ জানিয়ে—সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। কোনোক্রমে বলতে পারলেন, আপনার মেহেরবানি। —বলেই মুর্শিদকুলি জানতে চাইলেন, ডাক চৌকিতে আগ্রার কোনো হুকুম এলো বন্দেগান?

হুকুম মানে, শাহী খাজনাখানা থেকে আশরফির জন্যে আর্জি। শাহজাদা কোনো জবাব দিলেন না। যেন শুনতে পাননি। এইভাবেই চিলমন সরিয়ে লাল তাঁবুর ভেতরে চলে এলেন।

হুকুম নয়। চিঠি এসেছে। ডাক চৌকিতে নয়। কাসীদের হাতে হাতে। গোপনে। রোশনআরার চিঠি। তাঁবুর ভেতর বাতিদান জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে দাখিলা। সেই আলোয় কোমরবন্ধের ভেতর থেকে রোশনের চিঠিখানি বের করলেন আওরংগজেব। ভাবলেন পড়ি। ফের পড়ে দেখি। তারপর মনে হলো—কী হবে পড়ে! শাহীর একদিকে কাঁধে করে পাথরের চাঁই ওপরে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে সেই চাঁই ওপর থেকে ঢালুতে গড়িয়ে দেওয়া হলো। নিতান্ত অবহেলায়। অথচ এই বরবাদীর পেছনে কত মানুষের স্বপ্ন, হাড়ভাঙা খাটুনি রয়েছে। কত পাসিনা—কত খুন।

মুঘল শাহীতে জমার তুলনায় হাসিল সব সময়েই কম। তাই শাহী চলছে বছরের পর বছর—আগাগোড়া ঘাটতিতে। সেই ঘাটতি কমানোর জন্যে মাঝে মাঝেই দেওয়ানখানায় শোরগোল ওঠে, চেষ্টা হয়। তখন চারদিকে খরচ কমানোর তোড়জোড় হয়ে থাকে। বাদশা শাহজাহান এই কাজের ভার মাঝে মাঝে বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোকে দিয়ে থাকেন। এই ভার পেয়েই কি বড়ে ভাই দাক্ষিণের অজস্মায় শাহী খাজনাখানা থেকে মোটারকমে তনখা পাঠানোর আর্জিতে না করে দিলেন? হবেও বা। তিনি কি জানেন না—কী অবস্থায় আমার কাটছে।

নবীন শাহজাদা আওরঙ্গজেব তাঁবুর ভেতর এখন একা। তিনি যেন নিজেকেই বললেন, আগ্রা থেকে এই অজস্মায় কোনো সাহায্য না পাই—মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মতো করিতকর্মাকে তো পেয়েছি। এ-ই বা কম কী? আল্লায় বিশ্বাস রেখে যদি সবকিছু ঢেলে সাজাতে পারি তো এই দাক্ষিণ-ই হয়ে উঠবে আমার সোনা। খাঁটি সোনা। যার কেউ নেই—তার আল্লা আছেন। আমি হারবো না। হেরে যাওয়াকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ঘেন্না করি।

শাহী তাঁবুর বাইরে তখন সূর্য পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। দাক্ষিণের

অন্ধকার গরম সন্ধ্যায় সদ্য সদ্য দেওয়ান হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর সারাদিনের সঙ্গী দুই আমিন তখনো হুকুমের অপেক্ষায় শাহী তাঁবুর হাতায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাদের ঘোড়া দুটো তখনো লেজ ঘুরিয়ে দাবনার ওপর থেকে দূরের পাহাড়ের মাছি তাড়াচ্ছিল।

রাজধানী আগ্রায় দুর্গের ভেতর এখন অন্দরমহলে নিশ্চয় দক্ষিণের প্রান্তরের ওই অন্ধকার নেই। তবু অন্যদিনের মতো ঝকঝকে আলোও নেই। অভ্রের খনিতে যেখানে অভ্রের পাত গাদ থেকে শুধরে নেওয়া হয়—সেখানেও ঠিকাদারদের জোড়াতালি ঢুকে পড়েছে। তাই শাহজাদা দারার ঘরে অভ্রের বাতিদানে নাদিরা বেগম বারবার এসে কর্পূরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। যাতে আলো উজ্জ্বল হয়। গাদ কেটে গিয়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

বিকেল থেকেই শাহজাদা বইপত্তর নিয়ে আছেন। কখন সন্ধ্যা এসে গেছে বুঝতে পারেননি। একবার চোখে পড়লো, নাদিরা বেগম বাতিদানে ক্ষয়ে আসা অভ্রের পাতটি পাল্টে দিচ্ছেন। দেখেই উঠে বসলেন শাহজাদা, এ কাজ তোমার নয় নাদিরা। দাখিলারা কেউ নেই কাছাকাছি!

—হয়তো আছে। হয়তো নেই।—বলে শাহজাদার মুখে তাকিয়ে বেগম ভীষণ সুখী হাসি হাসলেন। দারার মনে পড়লো, নাদিরা নিজেই একসময় এই দুর্গে মেহজবিন বেগমের দিনরাতের হাজিরা ছিল। দিনরাত সে হুকুমবরদারি করতো তখন! সেই পুরনো অভ্যেস স্বভাবের ভেতর মিশে গেছে নাদিরার। দারা শান্ত গলায় বললেন, তুমি শাহজাদা বেগম। এবার থেকে ওসব কাজে দাখিলাদের কাউকে ডাকবে।

—আপনার যে কোনো কাজই আমার কাজ শাহজাদা।

দারাশুকো কী বলবেন। তাঁর ইচ্ছা হয়—নাদিরা তাঁর হাজারো কাজ থেকে সরে এসে যদি একটু একটু করে আমার পড়ার—জানার দুনিয়ার ভাগ নিতো তো কত সুখের হতো। ও আছে ওর সুখে। আমি আছি আমার সুখে। এর কোনোটাই কি সুখ আসলে?

আমাদের নাদিরা তার সবকিছু ভেবে বসে আছে। আমার ভাবনাই নাদিরার চোখে সারাদিন খোয়াব মাখিয়ে রাখে। এসব বাদ দিয়ে ও যদি আমার ভাবনার ভেতরে একটু ডুব দিতো।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হলো দারার—আমি তো নাদিরা আমার সব তোমায় দিতে পারিনি। আমার মনের ভেতরে ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে রানাদিল। যদি দিতেই পারতাম তো রানাদিল আসে কোত্থেকে!

আমার জন্যে নাদিরার যে আশিকি—রানার জন্যে আমার যে আশিকি—সেই আশিকিই খোদার জন্যে হলেই তো একজন ইনসান সুখী হয়ে যায়। তাই হওয়ার জন্যেই তো মানুষের এই ফকিরি। হঠাৎ দারা বললেন, এসো নাদিরা তোমায় এক সুফীর কথা শোনাই—

—আমি কি বুঝবো?

—খুব বুঝবে।—বলে দারাশুকো জামিরের লেখা সুফীদের জীবন কথা —নফৎ-উল-উনস থেকে পড়তে লাগলেন। সমশী তাব্রিজি বলে গেছেন—হে এই দুনিয়ার মুসলমান! উপায় কী? আমি তো নিজেকে চিনতে পারলাম না। আমি ইহুদি নই। আগুনের পুজোও করি না। মুসলমানও নই। আমি না পুবদেশের না পশ্চিমের। আমি ইরাকের নই। খোরাসানেরও নই। আমি আদম-হবার সন্তান নই—আমি বেহেস্ত থেকেও আসিনি।

—কী বুঝলে?

—সরতাজ! আমি এত বুঝি না। আমি বুঝি—আপনি। শুধু আপনি —বলতে বলতে নাদিরা বেগমের চোখ বুজে এলো। শাহজাদা এগিয়ে গিয়ে বেগমকে না ধরলে নাদিরা পড়েই যেতেন। তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো? —বলতে বলতে বেগমকে এনে সুখদোলায় বসালেন শাহজাদা।

নাদিরা বললেন, আমি খুব ভালো আছি। এর চেয়ে আর ভালো থাকা যায় না। কোনোদিন থাকিওনি হজরত!

নিজের গলা থেকে বেগমের দু'হাতের বাঁধন খুব সাবধানে নামিয়ে দিলেন শাহজাদা। এ যেন নাছোড় লোহার বেড়ি। এত শক্ত। দুপুর থেকেই দারা জামিরের নফৎ-উল-উনস পড়ছেন। সাফিনৎ-উল-আউলিয়া লিখতে গিয়ে কত বই যে ঘাঁটতে হচ্ছে শাহজাদাকে। ইস্! আমার জন্যে নাদিরার যে আশিকি—ওর জন্যে সেই আশিকি আমার হয় না কেন?

একবার শাহজাদার মনে হলো—সমশী তাব্রিজির কথা নাদিরার পক্ষে কঠিনই বটে। ওসব ভাবের কথা। যাতে কাহিনী আছে—যে কথা রসে রোদে বলা—সেখানে নাদিরার মন টানবে।

সামনেই পড়ে রয়েছে 'রাজম্ নামা'। পরদাদা আকবর বাদশার ইচ্ছায় ফারসিতে মহাভারতের অনুবাদ। ভেতরে অনেকগুলো ছবি আছে। নাদিরার ভালো লাগতে পারে। নকিব খান, আবদুল কাদির বদায়ুনি, সুলতান আহম্মদ থানেশ্বরি আর মুল্লা শেয়েরি মিলে খুব খেটে মাত্র চার মাসে এই অনুবাদ করেন। সবটা পারেননি তাঁরা। মহাভারতের আটভাগের এক ভাগ—এই অনুবাদ ওঁদের সবসময় সাহায্য করেছেন মধুসূদন সরস্বতী, দামোদর ভট্টর মতো পণ্ডিতরা।

রাজম নামাখানি হাতে তুলে নিয়ে শাহজাদা বললেন, বেগম! শোনো পরদাদা সাহেবের উজিরে আজম আবুল ফজল কী লিখেছেন গোড়ায়—

হিন্দু আর মুসলমান—দু'জন যাতে দুজনকে ভালো করে চিনতে পারে —তাদের ভেতরকার হিংসা, রাগ দূর করতে পারে—সেজন্যে আকবর বাদশা হুকুম দিলেন—প্রত্যেক জাতের কির্মাতি সব বই সাধারণে যাতে বুঝতে পারে এমন ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। তাহলে দু'জন দু'জনকে ভালোবাসতে পারবে। তুলনা করে কথাবার্তা বলে নিজেদের শুধরে নিতে পারবে।

হঠাৎ চোখ তুলে দারাশুকো দেখলেন—নাদিরা বেগম চোখের পলক না

ফেলে তাঁর মুখে তাকিয়ে।

রাজমু নামা ধপ করে সুখদোলায় নামিয়ে দিলেন শাহজাদা।

—কী হলো আমি তো শুনছি—

দারা কোনো কথা না বলে যমুনার দিককার অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনের অন্ধকারের এক জায়গায় যমুনা আছে। দেখা যায় না।

নাদিরা উঠে এসে শাহজাদার পিঠে হাত রাখলেন।—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—বলুন না হজরত। জানতে পারলে আমার গাফলত শুধরে নিতাম।

—এ শোধরাবার নয় নাদিরা।

—আমি তো আপনার কথাই শুনছিলাম।

—না। শুনছিলে না। তুমি আমার মুখে তাকিয়ে ছিলে সারাক্ষণ। আর আমি পড়ে পাড়ে হন্দ হচ্ছিলাম।

—ওঃ! এই কথা! তা কী করবো বলুন। খোদাবন্দ—আপনার মুখ দেখলে আমার আর কিছু মনে থাকে না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। এত সুন্দর। আপনি পড়ছিলেন। আপনার গলার এত সুরেলা আওয়াজ। কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি। ও মুখ দেখলে আমি বহেরা হয়ে যাই একদম, কিছু শুনতে পাই না—

নাদিরার এ কথায় ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন শাহজাদা। মনে মনে বললেন, আমায় তুমি অ্যাতো ভালোবাসো নাদিরা? আমি তোমায় তত পারি না কেন? তুমি নসিবি আওরত। আমি বে-নসিবি। খুব ভালো হয় যদি তুমি আমায় কম ভালোবাসো—সেই আশিকি দিয়ে আমার ভাবনা—আমার দুনিয়ায় আমার পাশাপাশি হও। তুমি আমার সামনে সমান হও না কেন? তোমার জন্যে তো আমি সেই আশিকির স্বাদ পাই না। তোমার মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তো আমি বহেরা হয়ে যাই না। তোমার এই আশিক তুমি ওই তারা খোদাই আসমানের নিচে তুলে ধরো নাদিরা। তাহলে খোদ খোদা তোমার সামনে এসে দাঁড়াবেন।

নিজেকে ভীষণ অপরাধী লাগলো দারাশুকোর। যে আমার মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার গলার আওয়াজও শুনতে পায় না—তাকে ফেলে আমি সন্ধে সন্ধে জালসাজিস নিয়ে রানাদিলের জন্যে ছুটে যাই?

নাদিরার এই তারিকতকেই তো সুফীরা মনে করেন আল্লার দিকে রওয়ানা হওয়া। যে এই রওয়ানা দিতে পারে—সেই সালিক। খোদার রাস্তার সালিক। খোদা আর ইনসানের মাঝে সাত হাজার পর্দা। এই পর্দাই খোদার কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে রেখেছে। এর অর্ধেক পর্দা আঁধার মাখানো। সালিক যখন খোদার দিকে এগোতে থাকে—তখন সে এই আঁধার কেটে বাকি অর্ধেক আলো মাখানো পর্দার কাছে গিয়ে পড়ে। আমরা পয়দা হই আলোয়। এগোতে থাকি আঁধার করা পর্দার দিকে। আবার যখন খোদার কাছে ফিরে যাই—তখন আলোতেই ফিরতে থাকি।

সাতটি সিঁড়ি ভেঙে খোদার কাছে সালিককে যেতে হয়। পহেলা সিঁড়ির নাম—অনুতাপ। আমার তো অনুতাপ হচ্ছে নাদিরা। তুমি আমায় এত ভালোবাসো। অথচ আমি তো তোমায় তত বাসিনা। তুমি দীন হয়ে দাখিলার বদলে আমার ঘরের বাতিদানে অভ্রের পাত পাল্টে দাও। আমি কোথাও তো তোমার জন্যে দীন হই না?

অনুতাপ ইনসানকে খোদার দিকে এগিয়ে দেয়। কেয়ামতের দিন শাস্তির কথা ভেবে এই অনুতাপ নয় নাদিরা। তোমার ভালোবাসার পাশে আমি কত ছোট—সেই লজ্জায় এই অনুতাপ। এই অনুতাপই আমার রাশ টেনে ধরবে। আমি আর জালসাজিস নিয়ে ছুটে ছুটে যাবো না।

শাহজাদা মুখে বললেন, চলো নাদিরা—কোথাও ঘুরে আসি—

—কোথায়? এই সাঁঝে?

—চলোই না। অনেকদিন তুমি আর আমি ঘুরি না।

—আপনার কোনো শাহী কাজ বরবাদ হবে না তো হজরত?

—ফের হজরত! বারণ করেছি না নাদিরা—

—ওঃ! বলে লজ্জায়, সুখে, আনন্দে হেসে ফেললেন নাদিরা বেগম।

বাতাসে বসন্ত। সারা হিন্দুস্থানের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানো আগ্রা কান্দাহার থেকে কামরূপ অব্দি ছড়ানো মানুষজন, পাহাড়পর্বত, নদীনালা, জঙ্গল, জানোয়ারের রাজধানী। এখানে জামা মসজিদের ইমাম যখন আজান দেন—তখন জানেন, বুখারা বা গজনীতে কোনো ইমামের এতবড় মসজিদে আজানের ডাক দেওয়ার নসিব হয়নি। এখানে কোনো মনসবদার যখন রেগিস্থানে উটের পিঠে হাত-কামান বসানোর হুকুম দেন—তখন তিনি জানেন—আমি এমনই এক বিশাল ফৌজি বাহিনীতে আছি—যার সমান তাগদি ফৌজ ইস্পাহান, তুর্কিস্তান—দুনিয়ার কোথাও নেই।

এমন দেমাকি রাজধানীর পথে পথে আলো। বালহস্তীর গলায় গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি। কাঁচা উমরের দাম্ভিক আহেদির বুকে বসানো ঢালের ধাতু-পাত আলো পড়ে ঝলসায়।

তার ভেতর দিয়ে শাহজাদা দারার জুড়ি চলেছে। আটটি তুরানি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে পাশাপাশি বসেছেন দারা, নাদিরা। সেই কোন কবে ইংলিশস্তানের ইলচিমশায় টমাস সাহেব দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশাকে এমন ক'খানি গাড়ি ভেট দেন। সেই আদলেই দুর্গের কামারশালে এখন এ-গাড়ি হামেশা তৈরি হয়। পথ পাথুরে হোক না—বসলে কোনো ঝাঁকুনি নেই।

—কোন দিকে যাবো?

নাদিরা বেগম বললেন, তার আমি কি জানি! সে তো বন্দেগান আপনি ঠিক করবেন।

শাহজাদা দারা মনে মনে বললেন, আশ্চর্য! বেরলাম আমি তোড়জোড় করে। অথচ আমিই জানি না কোনদিকে যাবো? বাঃ! —এসব ভাবতে

ভাবতেই তিনি লুকিয়ে নাদিরা বেগমকে দেখলেন। শাহী সড়কের দোকান-পসরার আলোয়।

শাহী জুড়ি দেখতে সড়কের দু'ধারে মানুষজনের ভিড় হয়ে যাচ্ছিল। তুর্কি ঘোড়সওয়াররা অনবরত কোড়া হাঁকিয়ে সে-ভিড় ফিকে করে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জুড়ির আগুপিছু সওয়ারি—পাহারার ঘোড়াদের পায়ের খটখট। ওরই ভেতর দারা দেখলেন, নাদিরা বেগম আজ অনেকদিন পরে সেজেছেন। চওড়া কাঁধের ওপর সুন্দর একটি মাথা বাঁ পাশে কী সুখে হেলানো। পাশে বসে শাহজাদা মুখের একদিকার চোখের আভাস পেলেন। তাতে সুরমার টান। ওড়না ছাড়িয়ে সিরাজি আতরের খুশবু বাতাসে মিশে যাচ্ছে। নাদিরা কী সুন্দরী। রাস্তার আম-আতরাফ মানুষজন এক ঝলক ওদের দেখার জন্যে কী কষ্টই না করে। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা তাঁর বেগমকে নিয়ে চলেছেন। এই বেগমই একদিন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম হবেন।

রাজধানী পেরিয়ে জুড়ি গোয়ালিয়রের রাস্তায় পড়তেই টের পাওয়া গেল—আজ জ্যোৎস্না আছে। নাদিরা যেন সেই জ্যোৎস্নায় মিশে গেলেন। দূরে দূরে ঘর-গেরস্থিতে আলোর ফুটকি। সন্ধে রাতে এক রিসালা ঘোড়সওয়ারের পাহারায় শাহজাদার সফর। দারা জানতে চাইলেন, তোমার ভালো লাগছে?

—ভীষণ। ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা কতদিন কোথাও যাই না—

—এবার থেকে তোমায় নিয়ে আমি বেরবো নাদিরা।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি হজরত?

এই হজরতে কোনো বাধা বা বকুনি দিলেন না শাহজাদা। বললেন, জানি না। যতদূর প্রাণ চায়—

নাদিরা বেগম প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলেন। দারা কখনো নাদিরার এই রূপ দেখেননি। যেন বা শাহজাদা পরভেজ বেঁচে আছেন। তিনিই হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। তাঁর আওলাদ নাদিরার বুকে সর্বক্ষণ এক পাথরচাপা ভয়ের কোনো লেশই নেই। সে আর ভীরু নয়। কোনো অজানা বিপদ তাকে তেড়ে আসছে না। নাদিরা আজ উচ্ছল।

হঠাৎ জুড়ির রাশ টেনে ধরা হলো। গোয়ালিয়র সড়কের দু'ধারে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ। দু'পাশে জঙ্গলও বটে। সড়কের ওপরেই ঢোলক বাজছে। সঙ্গে নাকাড়ার কাঠির আওয়াজ। দেহাতি মানুষজনের ভিড়। ভিড়ের মাঝখানে একটা মশালের দাউ দাউ আগুন।

ঘোড়সওয়াররা ছুটে যাচ্ছিল। নাদিরা বেগম জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার, বন্দেগান?

—বোধহয় কেউ জাদু দেখাবে—কিংবা রাস্তার নওটাঙ্ক হবে—

—আমি দেখবো। রাস্তার জাদু কোনোদিন দেখিনি। ঘোড়সওয়ারদের থামান হজরত। ওদের দেখলে সবাই ভয়েই পালাবে—

আজ শাহজাদা দারাশুকো দিলদরিয়া।—ভালোবাসায় আমি তোমার কাছে হারতে চাই না নাদিরা। তিনি ডান হাতখানি তুলে নামিয়ে নিলেন। অমনি

জুড়ির পাশাপাশি ছুটে চলা দুই মনোযোগী ঘোড়সওয়ার এগিয়ে যাওয়া সওয়ারিদের থামাতে তীরবেগে ছুটে গেল ॥

এগিয়ে পড়া ঘোড়সওয়াররা পেঁছনোর আগেই মশালের দাউ দাউ আগুন আর আলোর তালে তালেই যেন কালো কালো দেহাতি মুন্ডুর মাঝখানে ঘুঙুর আছড়ে পড়লো। সেই সঙ্গে ঢোলক। আর তার সঙ্গী নাকাড়া।

শাহজাদা স্বস্তি পেলেন। আবছা জ্যোৎস্নার ভেতর এগিয়ে পড়া ঘোড়সওয়ারদের থামানো গেছে। হিন্দুস্থানের আম-বাসিন্দা বড় মজাদার। তাই তো লাগে শাহজাদার। অজন্মা, বান, খরা, রোগ শোক—যাই আসুক না কেন—ফাঁক পেলেই ওরা আনন্দ করে নেয়। ঢোলক বাজায়। নাকাড়া পেটায়। নদীর ঘাটে দন্ডী কাটে। ফুর্তির কোনো শেষ নেই।

ঘুঙুর আর ঢোলক একসঙ্গে একটা সুন্দর ঝোঁক নিয়েই হঠাৎ থেমে গেল। ঘোড়সওয়াররা থামলেও তাদের ঘোড়ার পায়ের টগাবগ্ যাবে কোথায়।

নাদিরা বেগম অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কী হলো?

—থেমে গেল।

—কেন-ও?

—তুমি যাচ্ছো এ-পথ দিয়ে। সবাই ভয়ে পালাচ্ছে।

—ওদের থামান হজরত। থামান। এত আনন্দ করে কোনোদিন আপনার সঙ্গে আমার বেরনো হয়নি শাহজাদা। থামান ওদের। নাচ হোক—নওটংকি হোক—জাদু হোক—আমি ওদের সঙ্গে দেখবো আজ—

এবার ঘোড়সওয়ারদের পুরো রিসালাই ফিকা পর্দার মতো সড়কের দুধারের নাবিতে নেমে পড়লো। রিসালাদার ত্রিহুতী এক জানবাজ। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। দিশী ভাষায়। নিশ্চয় ভয় পেতে বারণ করছে। জ্যোৎস্নার ভেতর ভয় পাওয়া মানুষজনকে দাবড়ে দাবড়ে ঘোড়সওয়াররা নাবাল মাঠ থেকে বেড় দিয়ে সড়কে তুলতে লাগলো। ওঠে কি তারা। এমন তো হয় না। শাহী ঘোড়সওয়ার হঠাৎ এসে পড়বে। এসেই যাকে সামনে পাবে তাকেই কোড়া নয়তো বেত কষাবে। তাই তো হয়ে থাকে। এ কী আজগুবি ব্যাপার হচ্ছে আজ সন্ধেয়? ভয় মেশানো অবাক চোখে সবাই গোয়ালিয়র সড়কে উঠে আসতে লাগলো। কেউ কেউ চাপা গলায় বললো, এ কেমন শাহজাদা? শাহী টিকলে হয়।

একে একে ঢোলকওয়ালা ফিরে এলো। তার ঢোলকের চামড়ায় খড় জ্বালিয়ে যে ছোকরা সেঁক দিয়ে আওয়াজটা মিঠে করে তোলে—সেও ফিরে এলো। এলো নাকাড়াওয়ালা। আবার দেহাতিরা মশালের দাউ দাউ ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে তারা পেছন ফিরে আবছা জ্যোৎস্নার ভেতর দাঁড়ানো শাহজাদার জুড়ি দেখার চেষ্টাও করতে লাগলো। জুড়ির মুখোমুখি জায়গাটা ফাঁকা করে দিলো এক ঘোড়সওয়ার—যাতে সবটা দেখতে সুবিধে হয় শাহজাদা—শাহজাদা-বেগমের।

জুড়িতে বসে বসেই শাহজাদা দেখতে পেলেন, মাটিতে গেঁথে বসানো

মশালের পাশ থেকে শুধু একজন একটুও নড়েনি। সে ঘুঙুরওয়ালি। দারা চিনতে পারলেন। পেরে কেঁপে উঠলেন। সে আর কেউ নয়। সে রানাদিল।

মশালের আলোর ভেতর রানাদিল আজ বেশি জ্বলজ্বলে। জুড়িতে নাদিরা বেগমের পাশে বসে শাহজাদা দারা কারণটা কী তা মনে মনে ভালো করে বুঝতে পারলেন। রানী-হাভেলিতে ওঠার পর থেকে রানাদিলের ঘাগরা, কাঁচুলি, অঙ্গিয়া, ডোরিয়া, ওড়না তো বটেই—আতর, সুরমা, মুলতানি মাটিও শাহী জামদারখানা থেকেই যাচ্ছে। রানী-হাভেলিতে রানার সুখদোলার পাটাতন শাহজাদার হুকুমে চন্দনকাঠে তৈরি। রানাদিল তো আর রাস্তায় নাচিয়ে নয়। সেসব দিনের সব কিছুই বিদায় দিয়েছেন দারাশুকো। কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছেন না—রানা কেন বেরিয়ে পড়েছে? পাছে রাজধানীর রাস্তায় ফের নাচলে খবরটা তখন তখনই শাহাজাদার কানে গিয়ে পেঁছিয়—তাই হিসেব কষেই আগ্রার বাইরে দেহাতে মুজরো নিয়ে নাচতে এসেছে। আমি তো কোনো অভাব রাখিনি রানার, তবে কেন সে নাচতে বেরিয়ে পড়লো? নাদিরার মতো বেগমের পাশে বসে গোয়ালিয়র সড়কের ওপর দেহাতি মুজরো নেওয়া ওই রানাদিলের ওপর শাহজাদার একরকমের অভিমান হলো।

শাহী জুড়ি নাচের চত্বর থেকে বেশ দূরে। এখান থেকে বসে নাদিরা বেগম নাচনিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। নিজে যেন আবছা জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাবেন। আজ পথে তিনি হারিয়ে যেতেই চান। খোলা দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়লেই যে এত আনন্দ পাওয়া যায় তা তাঁর জানা ছিল না আগে। নিজের আব্বা হুজুর শাহজাদা পরভেজের নসিবের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাদিরার কুয়াঁরি জীবন উঠেছে পড়েছে। তাই দুর্গের বাইরে এই বিশাল হিন্দুস্থানের সাধারণ মানুষ-জনকে—তাদের সুখদুঃখের ভেতর কখনো দেখার সুযোগ পাননি নাদিরা। নিজের ওঠাপড়ার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে হয়েছে আগাগোড়া। তাই আজকের এই রাত নাদিরা বেগমের কাছে একেবারেই নতুন—অজানা—না জানি আরও কত চমকে ভরা।

গমক তুলে তুলে রানাদিল নাচছে। শাহী জামদারখানার পোশাকে রানাদিলকে রীতিমত জ্বলন্ত এক ফোয়ারা লাগলো দারাশুকোর। যে ফোয়ারা উজ্জ্বল খুনখারাবি রঙের ঘাগরার ঘূর্ণীর ওপর থেকে এক আওরতের শরীর হয়ে বারবার যেন আসমানকে ছুঁতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। ময়ূরের পাখনা থেকে গাঢ় নীল রঙ নেওয়া জামার ওপর রানাদিলের গলার মালা বারবার বুকে আছড়ে পড়ছে। খোলা বেণী কখনোই স্থির হয়ে পিঠে পড়তে পারছে না। সেই সঙ্গে ঢোলকের ঝোঁক নাকাড়ায় কাঠি পেটায় বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে গিয়ে গোয়ালিয়র সড়কের দুধারের অন্ধকার জঙ্গল—দেহাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

দারাশুকো দেখলেন, আগ্রার দেওয়ানখানায় বসে রাস্তার লোকজনকে সবাই যে আম-আতরাফ—আনপঢ়—বেহুদা ভাবি—তা তারা নয়। উঁচু উঁচু ঘোড়ার পিঠে বসা সওয়াররা ঠিক পেছনে। আর সামনে মশালের আলোয় জ্বলন্ত

নাচনির নাচ। মাঝখানে গোল হয়ে দাঁড়ানো দেহাতিরা কয়েক পলকের ভেতর দিব্যি এই নাচ রসিয়ে রসিয়ে নিতে পারছে।

এত খুশি—এত সুখী কোনোদিন লাগেনি নাদিরাকে। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার বেগম হয়েও নাদিরা কোনোদিন মুখ ফুটে—আগ বাড়িয়ে কিছু বলেননি। চাননি। সেই নাদিরা আজ এগিয়ে যাওয়া ঘোড়সওয়ারদের থামাতে বললেন। নিজের থেকে। জাদু দেখবে বলে। নওটংকি হলে নওটংকি দেখবে বলে। তখনো জানা ছিল না—মশাল ঘিরে দেহাতি অনুষ্ঠানের জটলার ভেতর কী চলছিল।

শাহজাদা ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেন। জুড়ি গাড়িতে তাঁর পাশে বসা মানুষটি তাঁরই আওরত। আবার দাউ দাউ মশাল সাক্ষী রেখে নাচনি মানুষটিও তাঁরই আওরত। একজন নাচের সমঝদার। অন্যজন নাচনি। মাঝখানে বসে দু'জনকেই তিনি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। কোনো নাচ দারাশুকোর মাথায় ঢুকছিল না। দেখার বলে তাই দেখছে চোখ।—আঃ। বলে আড়মোড়া ভাঙলেন শাহজাদা। তাঁর কিছুই করার নেই। তাঁর বেরিয়ে যাবারও রাস্তা নেই কোনো।

ঠিক এই সময় মশাল ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ানো দেহাতি জটলা একদম ঘুরে দাঁড়ালো শাহজাদা আর বেগমের দিকে। কেন না, নাচের ঝোঁকে নাচতে নাচতে রানাদিল জুড়ি গাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঢোলকও ঘুরলো। নাকড়াও। একজন এগিয়ে গিয়ে মাটিতে গেঁথে বসানো মশালটা তুলে উঁচু করে ধরলো। এবার সিধে আলোয় জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠলো তিনজনই—একই সঙ্গে নাদিরা, দারাশুকো, রানাদিল।

বিপদ গুনলো ঘোড়সওয়াররা। ফৌজি মোতাবেক শাহী খানদানের কাউকেই তারা খোলা সড়কে মানুষের ভিড়ে এভাবে এগিয়ে দিতে পারে না। সেই ত্রিহুতী জানবাজ রিসালাদার চিৎকার করে একটা ফৌজি হুকুম পেড়ে ভিড়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিতে যাচ্ছিল। শাহজাদা বাঁ হাত তুলে তাকে সময়মত থামালেন। দেহাতিরা কিছুই বুঝতে পারেনি। ঢোলকের ঝোঁকে রানার পায়ের ঘুঙুরুর বোলে দেহাতি মাথাগুলো দুলছে। রিসালাদার ঘোড়া চালিয়ে দিলে এক্ষুণি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।

রানাদিল আজ যেন দোগুণী সুখ পাচ্ছে নেচে। নাচের ভাও তাকে কেউ শেখায়নি। আজ যেন নাচ তার খুনে। যে-খুন এখন শরীরের ভেতর ঘূর্ণী হয়ে পাক খাচ্ছে। তার সারা গায়ে বুঝি মশালের ফুলকি পড়ে আগুন ধরে গেছে। ঘাগরায—ওড়নায়—কাঁচুলিতে। সারা গা পুড়ে যাচ্ছে। এই জ্বলুনি বড় আরামের।

দারাশুকো তাকাতে পারছিলেন না সামনাসামনি। যে ওখানে গোয়ালিয়র সড়কের ওপর খালি পায়ে নাচছে—তাকেই লাট্টু শাহ চিসতির যমুনা ঘাটে বসে কতবার বলেছি—তোমায় ছাড়া থাকতে পারি না রানা। আর আজ এখন! তারই সামনে বেগমকে পাশে নিয়ে শাহজাদা সেজে তারই নাচ দেখছি—

জুড়ির উঁচুতে বসে। আজ তো কোনো জালসাজিস নেই আমার—যে তার আড়াল খুঁজবো। আজ তো আমি দস্তুর মতো শাহজাদা। আগুপিছু ঘোড়সওয়ারের বহর। আর যাকে মাথায় করে রাখতে রানী-হাভেলি—হাটুরে ধুলো মুছিয়ে দিতে যার পায়ে আমার ঠোঁট নেমে আসে—সে-ই হাটের মাঝে *ন্যাড়া সড়কে খালি পায়ে নেচে চলেছে। আমার কিছুই করার নেই।* কিছুই করছি না। স্রেফ শাহজাদা সেজে বসে আছি।

রানাদিলের একবার মনে হলো—শাহজাদা দারা তারই মুখে তাকিয়ে। সেই তাকানো নিজের ঠোঁটের হাসিতে বিঁধিয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত মুখ করে ঢোলকের চাঁটির সঙ্গে ঝুঁকে পাল্টা তাকাতে লাগলো রানাদিল।

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়লেন শাহজাদা। এমন অবস্থায় কখনো পড়েননি তিনি। ঘোড়ার পিঠে সওয়াররা সব পাথর-মূর্তি। দেহাতির দল নাচে মাতোয়ারা। জুড়ির ঘোড়াগুলো লেজ মুচড়ে রাতের মাছিদের কিছুতেই বসতে দিচ্ছে না দাবনায়। দারা বুঝতে পারছিলেন—এখানে এখন একই সঙ্গে দুটি নাটক হচ্ছে। একটি নাটক তাঁর আর রানাদিলের ভেতর। অদৃশ্য বাতাসের ওপর দিয়ে রানা তাঁকে দেখছে। তিনি নিজেও ভাবলেশশূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন কিন্তু সবই। আর অন্য নাটকটি একদম বাইরের। সেখানে রানাদিলের পায়ের কাজের দিকে এক মনে তাকিয়ে নাদিরা বেগম আর মাতোয়ারা ভিড়—দু'তরফই এক সঙ্গে মজে আছে।

হঠাৎ রানাদিল নাচ থামিয়ে শাহজাদা আর শাহজাদা বেগমকে অনেকটা ঝুঁকে কুর্নিশ জানালো। জানিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। সারা গা মুখচোখ পাসিনায় নেয়ে উঠেছে। ঠোঁটে ঝিলিক তোলা হাসি।

নাদিরা বেগম খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত নিজের গলায় পাঠালেন। তাই দেখে কী হয় কী হয় ভেবে দম বন্ধ হয়ে এলো দারাশুকোর।

গলার মালাটি খুলে মিষ্টি গলায় নাদিরা ডাকলেন, কাছে এসো। দারা দেখলেন, রানাদিল এগিয়ে আসছে। মুখ থমথমে। চোখে ঝিলিক। খুব সুন্দর করে নিজের গলাটি এগিয়ে ধরলো রানা। ঢোলক, নাকাড়া—সব স্তব্ধ। পাশের অন্ধকার জঙ্গল থেকে জ্যোৎস্নার ভেতর একটা রাতচরা পাখি বেরিয়ে পড়লো।

নাদিরা বেগম নিজের গলার দামি মালাটি নিজের হাতেই রানার গলায় পরিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, বড় খুশি করে দিলে আজ। বড় খুশি হলাম—

রানাদিল এই সময়টায় কয়েক পলকের জন্যে সবার আড়ালে একদম কাছ থেকে শাহজাদার মুখে সরাসরি তাকালো। সেই তাকানোর ভেতর কোনো ইলজাম নেই। নেই কোনো অভিযোগ, অভিমান কিংবা শাপশাপান্ত।

নাদিরা বেগম ফের বসে পড়তেই রানাদিল আবারও কুর্নিশ করলো। করে বললো, সবই আপনার মেহেরবানি।

শাহজাদা দেখলেন, রানার চোখে কোনো রাগ নেই। বরং একরকমের দীন চোখে সে শাহজাদা-বেগমকে দেখছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হয়তো নিজেকে নাদিরার পাশে মনে মনে বসিয়ে দেখছে। অন্য সময় হলে হয়তো রানার মাথা

গরম হয়ে উঠতো। সে রাস্তায় নেচে রুটি কামানো মানুষ। কাকে তার পরোয়া! হয়তো নাদিরার মালা ফেরতই দিয়ে দিতো।

শাহজাদা নিজেকে বললেন, নাদিরা তো এত দীন নয় কখনো। এত সামান্য হয়ে সে তো কখনো তাকায় না। সালিক যখন আশিকিতে পাগল হয়ে খোদাতালার দিকে এগোয়—তখন সে দীন-আশিক হয়ে এগোয়। আমি কিছুই নয়। তুমিই সব। রানার চোখে পলক পড়ছে না। পাহারায় আলগা দেওয়াতে কখন রানী-হাভেলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে কে জানে!

শাহজাদার মনে হলো—এই মুহূর্তটি—মশালের আলোতে বন্দী আমরা এই তিনজন চিরকালের মতো পুতুল হয়ে গেছি।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

আমরা এখন ঔরঙ্গাবাদের চার কোশ উত্তরে—তাই না আওরঙ্গজেব?

—ঠিকই বলেছেন আলমপনা। এখান থেকে আমরা দুর্গের সামানবুরুজে যদি উঠি—তাহলে নিচে দক্ষিণে ঔরঙ্গাবাদের বড় দীঘি—দীঘির পাড়ের গাছপালা পরিষ্কার দেখা যাবে। আলাদা করে চেনা যাবে না অবশ্য তাদের।

—না। আমরা এখন অত উঁচুতে উঠবো না আওরঙ্গজেব। শীতের ধারালো বাতাস দুর্গের পাথুরে গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে সবসময়। —বলতে বলতে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান দূরের পাহাড়ের গায়ে নাম-না-জানা গাছগুলোর মাথায় তাকালেন। পাথরের কয়েক ধাপ নিচেই তাঁর ছেলে শাহজাদা মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর দাঁড়িয়ে। সবে আঠারো ছাড়িয়েছেন তিনি। এই বয়সেই তিনি সারা দক্ষিণের চার সুবার মাথায় সুবেদার-ই-আজম।

দুজনে কথা হচ্ছিল দৌলতাবাদ দুর্গের খোলা অলিন্দে দাঁড়িয়ে। জামাদা মাসে এই দুপুরেই বেশ জাঁকিয়ে—শীত পড়েছে। আস্ত একটা পাহাড়ের মাথা খোদাতালা এমন করেই বানিয়েছেন—যা কিনা আপনা আপনি জবরদস্ত এক দুর্গ। তার গা দিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথা দিগন্তের সবটা জুড়ে দাঁড়ানো।

তিনশো বছর আগে মহম্মদ বিন তুঘলক এখানকার নাম দেন দৌলতাবাদ। সেদিন থেকে দেবগিরি হয়ে গেল দৌলতাবাদ। কিন্তু দৌলত মিলিয়ে গেল! তুঘলক ফিরে গেলেন আবার দিল্লি!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঠিক বুঝতে পারছেন না। আজ কি আব্বা হুজুরকে তুজুকে পেয়ে বসলো? ইতিহাস নিয়ে এই ঘাটাঘাটি কেন?

—তুঘলক ফিরে যেতেই দৌলতাবাদে আমির-ওমরাহরা বাগী হলেন। আলাউদ্দিন হাসান বাহমনী শাহর আজাদ শাহী শুরু হলো এখানে। বাহমনী শাহী একদিন ভেঙে পড়লো। সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ালো পাঁচ পাঁচটি সুলতানি। বেরারে ইমাদশাহী, আহম্মদনগরে নিজামশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী, গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী আর বিদরে বারিদশাহী। দাদাসাহেব

আব্বর বাদশার দাদাসাহেব বাবর বাদশার শাহীও তখন হিন্দুস্থানের জমিনে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে। ধরো এসব একশো সনেরও দশ সন আগের কথা—

শাহজাদা হিন্দুস্থানের বাদশার মুখে তাকালেন। লাল ঠোঁট, নীল চোখ, গোলাপি গালে ঘন কালো দাড়ি। উষ্ণীষের সরবন্ধে একটি হীরা ঝলমল করছে। চওড়া কাঁধ। গায়ের নাদিরি জামার ওপর গলা থেকে নেমে এসেছে চুনী বসানো রঙিন মালা। আব্বা হুজুরের বয়স এখন চুয়াল্লিশ। কোমরের সঙ্গে ঝোলানো খাপের মাথায় তাঁর তলোয়ারের বাঁট উঁকি দিচ্ছে। দুজনের সামনেই দুনিয়া তৈরি হওয়ার সময়কার পাহাড়গুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—বছর তিনেক হলো আহম্মদনগর আগ্রার তাঁবে আসায় আমি আর তুমি আজ নিশ্চিন্তে এখন দৌলতাবাদ দুর্গে দাঁড়িয়ে আছি আওরঙ্গজেব। দৌলতাবাদ এখন এই দক্ষিণে মুঘল দুর্গ। বেরার, বিদরও এখন মুঘল এলাকা মারাঠা সর্দার শাহজি এতদিন নিজামশাহী সুলতানের নামে আহম্মদনগরে তাগদবাজি করে এসেছেন। বিজাপুরের সুলতান তাঁকে মদত দিয়ে আসছিলেন। সে খেলা এবার বন্ধ হবে—বলতে বলতে বাদশার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো চোখ ছোট হয়ে এলো।

শাহজাদা বললেন, গোলকুণ্ডাকে শায়েস্তা করে পঞ্চাশ হাজারের মুঘল ফৌজ এখন বিজাপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে?

—হাতি?

—বন্দেগান। একশো সত্তরটা জংগী হাতি রয়েছে ফৌজের সঙ্গে। গজনল গেছে দেড়শো। সেই মতো বারুদও।

বাদশা ফিরে তাকালেন শাহজাদার দিকে। শোনো আওরঙ্গজেব! বুন্দেলার ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করতে গিয়ে কিছু মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। তাই সেখানকার বাগীপনাহ থামেনি। আমরা বেশি কড়া হওয়ায় বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী এখনো বারুদঘর হয়ে আছে কিন্তু—

—জাঁহাপনা! দক্ষিণের এই পাঁচ সুলতানিই শিয়া সুলতান—

—তা তো মুঘল তাগদে খতম হয়ে এলো বলে শাহজাদা। মারাঠা সর্দার শাহজির ফৌজি খেলকুদও এবার বন্ধ হয়ে যাবে। আহম্মদনগরের পশ্চিমদিককার কয়েক সরকারে এখনো যা কিছু মারাঠা দাপাদাপি—তা তুমি নিশ্চয় মুছে ফেলতে পারবে আশা করি?

—নিশ্চয় খোদাবন্দ। গোলকুণ্ডার আবদুল্লা কুতুব শাহ বছরে আটলাখ তনখা বাদশার মবারকে নজরানা দেবেন। বাদশার নামে খুতবা পড়েছেন। বিজাপুর হামলায় তিনি আমাদের দশ হাজার সেপাই দিয়েছেন। নিজে শিয়া হয়েও খুতবা থেকে শিয়া বয়েত বাদ দিয়েছেন সুলতান আবদুল্লা কুতুব শাহ।

—আমার তো সেখানেই প্রশ্ন শাহজাদা।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব থমকে গেলেন। তিনি বোঝেন হামলা, হাতি, তোপ, কিল্লার গায়ে মই ফেলে দেওয়াল বেয়ে ওঠা। তারপর শেষমেশ দখল। বিজাপুরের সুলতান মাথা নোয়াননি।

বাদশা বললেন, বাবর হিন্দুস্থানে বিশেষ সময় পাননি। হুমায়ুন বাদশা লড়াই শেষ করে বসতে না বসতেই চলে গেলেন। দাদাসাহেব আকবর বাদশা লড়াই করেছেন যেমনি—তেমনি মসনদে বসে শাহীও চালিয়েছেন লম্বা সময় ধরে। তিনি নর্মদার দিকে তাকিয়ে ভাবতেন—কবে দক্ষিণ মুঘল ধ্বজের নিচে আসবে। শুরুয়াত আকবর বাদশাই করে যান। তাঁর খোয়াব—বিজাপুর মাথা নোয়ালেই—চল্লিশ বছর পরে সফল হবে।

শাহজাদা বিতাং দিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন বিজাপুরকে তাঁবে আনতে ফৌজকে কয় দফা হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমন তিনদিক থেকে মুঘল ফৌজ বিজাপুরে ঢুকছে। পথে যেসব গাছ পড়বে—সব কাটতে কাটতে এগোবে ফৌজ। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে। গোয়াল থেকে গরু মোষ বের করে নেবে সব। দেহাতিদের টেনে বের করে কয়েদ করতে হবে। পরে তাদের গোলাম বাঁদি হিসেবে মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে বেচে দেওয়া হবে। বিজাপুরের সুলতান মাথা নোয়ালে তিনি আগ্রাকে দেবেন বিশ লাখ তন্‌খা নজরানা।

—আমি দাদাসাহেব আকবর বাদশার রাস্তাই নেবো শাহজাদা। তাতেই হিন্দুস্থানে মুঘলশাহীর তাগদ বাড়বে। মাথা নোয়ালে বিজাপুরের সুলতানের সুলতানি যাবে না। বিজাপুরে আদিলশাহী বহাল থাকবে। যেমন কিনা গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী আমরা বজায় রেখেছি। আদিলশাহীর হাতে বিজাপুর তো থাকবেই। সেই সঙ্গে আহম্মদনগরের সুলতানকে দেওয়া হবে সরকার পুনে, সরকার উত্তর কোংকন। এই দুই সরকার থেকেই তিনি বছরে আশি লাখ তন্‌খা খাজনা পাবেন। তবে আদিলশাহী কিছুতেই আর গোলকুণ্ডার ওপর হামলা চালাতে পারবে না। নিজের দখল থেকে মারাঠা সর্দার শাহজি যতক্ষণ না নিজাম-শাহী কিল্লাগুলো আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে—ততক্ষণ বিজাপুরের আদিলশাহী শাহজিকে কোনো চাকরি দিতে পারবেন না—কোনোরকম আশ্রয়ও দিতে পারবেন না।

—জাঁহাপনা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—বিজাপুরে আদিলশাহী বজায় রাখলে—তাদের চাপে—আমাদের চাপে মারাঠা সর্দার শাহজি মাথা নোয়াবেই নোয়াবে। নিজামশাহী কিল্লাগুলোও তাহলে আমাদের হাতে এসে যাবে আওরঙ্গজেব।

—হজরত। বিজাপুরের আদিলশাহী বজায় রাখবেন—কিন্তু এত বড় মুঘল ফৌজের তো একটা খরচ আছে। বিশাল খরচ—

—বিজাপুর হামলায় আওরঙ্গজেব কিছু না হোক দু'কোটি তন্‌খার লুটের জিনিস আসবে। আসবে তো?

—তা আসবে জাঁহাপনা। বেশিও আসতে পারে।

—এছাড়াও আহম্মদনগরের নিজামশাহী এখন মুঘল শাহীর ভেতর মিশে যাওয়ায় অন্তত কোটি তন্‌খার খাজনা আসবে শাহী খাজনাখানায়।

—কিন্তু জাঁহাপনা। এসব সুলতানি বহাল না রেখে—গোলকুণ্ডা, বিজাপুরকে সরাসরি হিন্দুস্থানের ভেতর মিশিয়ে দেওয়াই যে ভালো।

গোলকুণ্ডার হীরের বাজার দুনিয়ার দেশে দেশে। বিজাপুরের দুই সীমানায় দুই বড় দরিয়া। বিজাপুরের দুই তীরেই দুনিয়ার সব জাহাজ নোঙর ফেলে। দুই সুলতানি শিয়া-সুলতানি। আমরা সুন্নী হয়ে এমন সুযোগে হাত গুটিয়ে থাকবো?

—হ্যাঁ। তাই থাকতে হবে। বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী বারুদঘর হয়ে আছে মনে নেই? দক্ষিণেও আমি আরও দুটো বারুদঘর চাই না আওরঙ্গজেব। দক্ষিণে দৌলতাবাদই এখন মুঘল ঘাঁটি। এই কেল্লা সবদিক থেকে জবরদস্ত। এখান থেকে মুঘল ফৌজ সবদিকে নজর রাখতে পারবে। গোলা দেগেও দৌলতাবাদকে কাবু করা যাবে না।

শাহজাদা তা জানেন। দৌলতাবাদ শহর চারদিক থেকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কিল্লা দৌলতাবাদ চারশো হাত উঁচু পাহাড়ী পাটাতনের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়ানো। কিল্লার চারদিকের ঘের লম্বায় দেড় ক্রোশের মতো। খোদাতালা এমনভাবেই এখানকার পাথর পয়দা করেছেন—তা যেন তেল ঢেলে কে পেছল করে রেখেছে—কারও বেয়ে ওঠার কোনো উপায় নেই—উঠতে গেলে পিছলে নিচে পড়ে যাবে। কিল্লা ঘিরে পাথরের গভীর নালা—যা কিনা ঝরনার জলে ভরে দেওয়া যায়। তার ওপরকার সেতুও সেই জলে ডুবিয়ে রাখা সহজ। ভেতরকার উঁচু চাঁদ মিনার থেকে এগিয়ে আসা দুশমনকে সহজেই দেখা যায়। তখন তাদের তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া কিছুই নয়। সুলতান আলাউদ্দিন বাহমনী অনেক ভেবেচিন্তেই এই মিনার বানিয়েছিলেন।

—শাহজাদা—

আওরঙ্গজেব তটস্থ হয়ে উঠলেন। হুকুম করুন হজরত—

শাহজাহান ভালো করে ছেলের মুখে তাকালেন। দীঘল—গোরাপানা এই শাহজাদার মুখে তিনি কখনো হাসি দেখেননি। কী একটা করুণ আভা সবসময় ও মুখ ছেয়ে আছে। জোড়া কালো ভ্রূ। কালো চোখ। এই দক্ষিণেই আমি মসনদের খোয়াব দেখেছিলাম। আমিও আওরঙ্গজেবের মতো সবসময় তটস্থ থাকতাম। ভীষণ হুঁশিয়ার থাকার সময় ইনসান এমন চমকে চমকে ওঠে। এই বুঝি কেউ আমার অজান্তে আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই দক্ষিণে মুঘল ফৌজের সিপাহসালার থাকতে থাকতে আমি মনসবদারদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এখান থেকেই আমি মুঘল মসনদের তাগদ কোথায় জানতে পারি। জানতে পারি সে-মসনদ কোথায় কোথায় কমজোরি। ফৌজ—তার রসদ, বারুদ, তোপ, ঘোড়সওয়ার, তনখা, হাতি—ভালো মতো জানতে হলে এই দক্ষিণই সেই জানপহচানের মক্তব।

বাদশা শাহজাহান ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটি খুব সরল কথা জানতে চাইলেন। খান্দেশের রাজধানী কোথায় শাহজাদা?

এমন সরল জিজ্ঞাসায় আওরঙ্গজেব রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। তবু বাইরে কিছুই হয়নি এমন ভাব বজায় রেখেই বললেন, বুরহানপুর হজরত।

—ভালো। সেখানকার মুঘল কিল্লা কোথায়?

—আসিরগড়ে বন্দেগান।—বলেও বুঝতে পারলেন না শাহজাদা—বাদশা কী জানতে চান।

—আসিরগড় থেকে বুরহানপুর যেতে কতটা সময় লাগে ?

বাদশার পর পর এমন শান্ত গলায় সব জিজ্ঞাসায় শাহজাদার স্নায়ুর ছিলা ছিঁড়ে পড়ছিল। তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে বললেন, জোর কদমে ছুটলে একজন ঘোড়সওয়ারের পক্ষে এক বেলার রাস্তা।

এবার বাদশা সরাসরি ছেলের চোখে তাকালেন। আসিরগড়ে তো মুঘল চৌকি রয়েছে শাহজাদা। তুমি বুরহানপুরের শাহীবাগের আমগাছের ওপর নজর রাখতে পারোনি ?

আওরঙ্গজেব হুঁশিয়ার হয়ে গেলেন। মনে মনে তিনি বাজি শাহজাদী জাহানারাকে শও সুকর গুজর করলেন। তোমায় যে কী বলে সালাম জানাবো বাজি। জাহানারা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন চিঠি দিয়ে—ছোটে ভাই। হুঁশিয়ার। ঝুড়ি দেখে বাদশার মনে হয়েছে—এবার বুরহানপুর থেকে আম কম পাঠানো হয়েছে।

শাহজাদা বললেন, দিনরাত বুরহানপুরের শাহীবাগে আমার লোক থেকেছে আব্বা হুজুর। গাছের দেখভাল করেছে।

—তাহলে এবার আগ্রায় আম কেন কম গেল ?

—ঝড়ে আপনার পসন্দের গাছের একটা ডাল ভেঙে যায় গত রমজান মাসে। তখনই অনেক বউল ঝরে যায়। তারপর সারা মরসুম এত কুয়াশা—আম ফলেওছে এবার অনেক কম।

বাদশা কিছু না বলে চুপ করে ছেলের মুখে তাকিয়ে রইলেন। শাহজাদাও পাল্টা তাকিয়ে রইলেন। চোখ নামালেন না। তাঁর মন বলছিল, কোটি কোটি তনখার ফৌজি হামলা চলছে বিজাপুরে, তিনদিক থেকে ফৌজ এগিয়ে চলেছে। লুটের মাল কিছু না হোক দু'কোটি তনখার ওপর হবে। তার ভেতর হিন্দুস্থানের বাদশা ক'টা আমের হিসেব চাইছেন। তাও কার কাছে ? নিজেরই ছেলের কাছে। যে কিনা দাক্ষিণে চার সুবার মাথায় সুবেদার-ই-আজম। আশ্চর্য!

আওরঙ্গজেব নিজের অজান্তেই চোখ নামিয়ে নিলেন। কী এক অভিমান না, রাগে তাঁর গলা বুজে এলো। চোখ দিয়ে জলের বদলে আগুন বেরিয়ে আসতে চাইলো। সরেজমিনে আমি এত বড় মুঘল ফৌজের রসদ, বারুদের যোগান বহাল রাখছি। ক'বছর ধরে সারা এলাকায় এত বড় অজন্মা গেল। তার ভেতরেও পাঁচ কোটি তনখার সম্বচ্ছরের খাজনা হাসিল করে জমা বজায় রেখে আগ্রা পাঠালাম। সেজন্যে তো কোনো সাবাসি নেই আব্বা হুজুরের দিক থেকে ? আর শাহী তনখার জন্যে আমার আর্জি যে বড়েভাই বাতিল করে দিলো—সে-বেলায় হিন্দুস্থানের বাদশা একটি কথা বললেন না ? অথচ সামান্য ক'টা ল্যাংড়া আমের হিসেব নিতে তো হিন্দুস্থানের বাদশার আটকায় না ?

শাহজাদা নিজের মনকে বললেন, নসিব। নসিব।

বাদশা শাহজাহান দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শুধু একটি

পাহাড়ের মাথা কেটেই এই কিল্লা দৌলতাবাদ। মানুষের তাগদের ঘাঁটি। এমন কত পাহাড় পরেপর পড়ে আছে—লতায়, জঙ্গলে ঢাকা। মাঝে মাঝে জঙ্গল ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে এক একটি বিশাল গাছ। কোনোদিন ওখানে হয়তো মানুষের পা পড়বে না। শীতের দুপুরের অলস কিন্তু ঠান্ডা ধারালো বাতাস এইসব পাহাড়ের গা ঘষে অদৃশ্য শূন্যলোকে মিশে যাচ্ছে। বুরহানপুরের শাহীবাগের আমের কথাটা বলে ফেলে বাদশারও ভালো লাগছিল না। তিনি ফিরে তাকালেন নিজের ছেলের মুখে। তাকিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। এ যেন বিশ বাইশ বছর আগেকার শাহজাদা খুর্রম দাঁড়িয়ে। নিজের আব্বা হুজুরের খুব বাধ্য—কিন্তু চিতার মতো তীর হয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে। তটস্থ—কিন্তু আচমকা হামলার মোকাবিলায়—কারও চেয়ে কম নয়।

হায়রে শাহী! যার মোদ্দা কথা তাগদ, হুকুম, হামলা, ফরমান—তার ভেতর বসে থেকে একজন আব্বা হুজুরের বুকে আওলাদের জন্যে ভালোবাসা টনটন করে উঠলেও বাদশা জানেন না কিভাবে তা বলবেন। শাহজাহান বুঝলেন, ভালোবাসা খোলাখুলি বলা যায় না। কিন্তু হুকুম? পলকে দেওয়া যায়।

তিনি শাহজাদার মনের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে—যা কিনা বাদশা শাহজাহানের চলন বলনের সঙ্গে আদপেই কোনো মিল খায় না—সেই ভাষায় বললেন, গত রজব মাসেই তো তোমার আর শাহজাদা মুরাদের বিয়ে গেল। তাই না?

আওরঙ্গজেব কিছু অবাক হলেন। মুখে সেভাব ফুটতে না দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হজরত।

—কেন শুধু শুধু হজরত বলো? তুমি আমার তিসরি শাহজাদা। বাহাদুর লড়াকু। হিন্দুস্থানের শান তুমি।

আওরঙ্গজেব কোনো কথা বললেন না।

শাহজাহান বললেন, তোমাদের আম্মিজানকে তোমরা অল্প বয়সে হারিয়েছো। একজন আব্বা হুজুর একজন আম্মিজানের ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে পারেন না—বলতে বলতে বাদশা দেখলেন, শাহজাদার চোখ জলে ভরে উঠেছে।

—তবুও আমি চেষ্টার কোনো কসুর করিনি। সময়ে তোমরা রোজিনাদার থেকে মনসবদার হয়েছো। শাহজাদা—তোমারা সবাই বাহাদুর। সময়ে সুবেদার হয়েছো। আমার কাঁচা উমরে তোমারই মতো নওজওয়ানির দিনে আমি নর্মদা পেরিয়ে দক্ষিণে সিপাহ-সালার হয়েছিলাম আওরঙ্গজেব।

—হ্যাঁ খোদাবন্দ।

—আমি শুধু খোদাবন্দ নই তোমার শাহজাদা! আমি তোমার ওয়ালিদ সাহাব। আমি তোমার আব্বা হুজুর।

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর।

—তোমার আর শাহজাদা মুরাদের জন্যে আমি অনেক ঢুঁড়ে ইস্পাহানের শাহী খানদানের শাহনাওয়াজ খানের দুই মেয়েকে তোমাদের বেগম করে এনেছি। শাহজাদা-বেগম দিলরস বানু কেমন আছেন? খয়রিয়াত তো সব?

—আপনার মেহেরবানিতে কোনো অসুবিধা নেই আব্বা হুজুর। সবাই সহি-সালামত আছেন।

—ডাকচৌকিতে আগ্রা থেকে দিলরসের চিঠি আসছে তো সময়মতো ?

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর।

—শাহজাদা দারার বিয়ের দাওয়াতের মতোই তোমার বিয়ের দাওয়াতেও আমি সওগাত জানিয়েছিলাম শায়েরি লিখে।

—সে শায়েরি আমি আমার বুকের খনিতে জমা রেখেছি আলমপনা—বলতে বলতে আওরঙ্গজেবের মুখে মেঘ নেমে এলো। এই হিন্দুস্থানে আমার নসিবে কি কোনো কিছু আনকোরা ঘটবে না ? সবই বড়ে ভাইয়ের জীবনে ঘটে যাবার পর আমার জীবনে হাত ফেরতা হয়ে দোবারা ঘটবে ? এ নসিব আমি পাল্টাবোই।

—তোমার বিয়েতে তোমার নানাসাহেব আসফ খাঁ আর শাহজাদা মুরাদ যমুনার পাড়ে এসে আমায় সওগাত জানিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর। নানাসাহেব এখন শীতে বড় কাবু হয়ে পড়েন।

—আমি যমুনায় নৌকো করে শাহজাদা-বেগম দিলরস বানুকে আনতে গেলাম। চার লাখ তনখার দেনমোহর। কত আনন্দ হয়েছিল। বড় সুখের সে দিনগুলো। বিয়েতে তোমায় যে ঘোড়া দিয়েছিলাম—আসল তুরানি ঘোড়া—সে কোথায় ?

আওরঙ্গজেব কিল্লার প্রাকারের নিচে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই যে—

বাদশা দেখলেন—অনেক নিচে একটা বাদামী রংয়ের ঘোড়া কেশর বাগিয়ে দাঁড়ানো। আর পাঁচটা ঘোড়া থেকে আলাদা হয়ে। তিনি জানতে চাইলেন, আর যে কারাদ ছোরা দিয়েছিলাম তোমায়—

আওরঙ্গজেব বাঁ কোমরে ডান হাত চেপে ধরে বললেন, এই যে। আমি সবসময় সঙ্গে রাখি আব্বা হুজুর। এ ছোরা আমার জানের চেয়ে কিমতি। হিন্দুস্থানের বাদশা—আমার আব্বা হুজুরের নিশান।

বাদশা শাহজাহান খাপের বাইরে বেরিয়ে থাকা বাঁট দেখে নিশ্চিন্তের হাসি হাসলেন। যেন এইজন্যেই বাদশা এতক্ষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিয়ের রাতের উপহার ঘোড়া আর ছোরা না দেখে তিনি যেন সুস্থির হতে পারছিলেন না।

অথচ তাঁর তো এখন সুস্থির থাকার কথা নয়। পঞ্চাশ হাজারের মুঘল ফৌজ তিনদিক থেকে আদিলশাহীর বিজাপুরে আজ শেষরাত থেকে ঢুকছে। তোপ, হাতি, ঘোড়া, উট, মানুষের মিছিল বিজাপুরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আদিল শাহীকে মাথা নোয়াতেই হবে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব হিন্দুস্থানের বাদশার মুখে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দৌলতাবাদের চেয়ে আগ্রার শীত অনেক বেশি ধারালো। উত্তরে হিমালয় থেকে এইসময় দুটি জিনিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগ্রায়। একটির নাম শীত।

অন্যটি হলো দূর দেশের পাখি। ওরা এসে যমুনার চরে কয়েক মাসের জন্যে বাসা বাঁধে। চরের বালি জায়গা ওদের গা গরম করে তোলে। গা গরম হলে পাখিরা ডানা মেলে। এই বুঝি বসন্ত ফিরে এলো ভেবে কিচির মিচির জুড়ে দেয়।

যমুনার চর জায়গায় এমনই এক পাখ-পাখালি ভরা, আলো ছড়ানো, রবিখন্দের সদ্য ওলটানো জমির মুখোমুখি যমুনার তীর ঘেঁষে রানী-হাভেলি। সামনে বাহারি ফুলের বাগ। পেছনটা মাল গুদামের মতোই দেখতে। একসময় সারাটা বাড়িই ছিল ফৌজি মালপত্তর রাখার জায়গা। সোরা, বারুদ, রেড়ির তেল, বেলদারদের বেলচা আর ঘোড়ার রেকাব, লাগাম, বোঝাই করে রাখা হতো। শাহজাদা দারা ফৌজদার-ই-হিসার হবার পর থেকেই এই ক'বছরে রানী হাভেলি ধোপদুরস্ত হয়ে এখন একদম অন্য চেহারা পেয়েছে। কোনো এক কালে আশপাশের কোনো দেহাতি জমিদার বা জায়গীরদারের রানী এই হাভেলিতে থাকতেন কিনা কেউ বলতে পারবে না।

হাভেলির ভেতর হাতায় শাহজাদা দারাশুকো ঢাকা পথের খোলা অলিন্দ থেকে দেখতে পেলেন, শীতের দুপুরে রোদ চড়ে উঠতে কেয়া ঝোপ, বালির গর্ত থেকে যাযাবর পাখিরা গা গরম করতে বেরিয়ে পড়েছে। নাখদ ডালের মরসুমি চাষীরা ওলটানো জমির ঢেলা ভাঙছে। বীজ ছড়াবে। গরমের মুখে মুখে আগ্রার মান্ডিতে মান্ডিতে এই ডাল এসে হাজির হয়।

এমন সময় ঘরোয়া হামামে গরম জলের ভাপে সারা গায়ের ঘাম ঝরিয়ে রানাদিল এসে দাঁড়ালো। ভাপের এই চানে শরীরটা চনমনে হয়ে ওঠে। তারপর চন্দনে-আতরে রানাদিল অন্যরকম হয়ে যায়। মাথার চুল এলো করে খুলে দেয় বাঁদিরা। তার নিচে রাখা হয় সুগন্ধী গুগ্গুলের ধোঁয়া ছড়ানো ছোট আগেনগার। দু'জন বাঁদি মিলে ঘাগরা, কাঁচুলি, ওড়নায় সাজিয়ে তোলে রানাদিলকে। সুর্মা, বিন্দিয়া, টিকলি, মালা—সব পরে এসে দাঁড়িয়েছে রানাদিল।

এই সাজে রানাদিলের মুখের ডৌলটি শাহজাদার বড় প্রিয়। তিনি প্রায়ই খুব গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে রানাকে দেখে থাকেন। আজও চুপচাপ দেখছিলেন শাহজাদা। তাঁর মনে হচ্ছিল, কোনো এক তৃষ্ণায় রানাদিলের এই ভঙ্গিমাটুকু স্রেফ পিপাসার জল।

—কখন এলে? আমি হামামে ছিলাম।

দারা মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, তোমায় যে হাভেলিতে পাবো ভাবতে পারিনি। নানান সড়ক পেরিয়ে যতই এই হাভেলির কাছাকাছি হই—বুকটা কাঁপতে থাকে—দেখা হবে তো? দেখা হবে তো?

—কেন। কোথায় যাবো?

—আবার যদি পাহারাদের লুকিয়ে দেহাতে গিয়ে নাচের মুজরো নিয়ে বসো!

হো-হো করে হেসে উঠলো রানাদিল। সে তো একবারই মোটে। তারপর

মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো রানাদিলের। তুমি আমায় ভালো রেখেছো শাহজাদা : ভালো ভালো খেতে পাই এখানে। আর নেচে রুটি কামাতে হয় না আমার—

—কেন বারবার এসব বলো রানা ? এ তো কিছুই নয়।

—এখানকার পাহারাগুলো নিজেদের ভেতর কী সব বলে—তার কিছু কিছু আমারও কানে এসেছে।

—কী বলে ? —বলে দারা খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

—বোসো। অস্থির হবার কী আছে ? ঠিকই তো বলে। আমি হলাম ওদের মুখে—দারাদিল। তা সত্যিই তো। তোমার দিলই তো আমি।

—ওদের গুর্জরের কচ্ছে বদলি করবো রানা—শীতে খুব শীত—গরমে ভীষণ গরম সেখানে।

—তাতে লাভ ! সেখানে গিয়েও বলবে। যারা নতুন পাহারা আসবে তারাও বলবে। এভাবে মানুষের মুখ চাপা দেওয়া যায় না শাহজাদা।

—জানি রানাদিল। মুঘলদের খুনে কী আছে জানি না। পরদাদা সাহেব আকবর বাদশার আব্বা হুজুর হুমায়ুন বাদশা হামিদা বানুকে দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারেননি। হামিদাকে নিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর ভাই হিন্দনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। আবার মেহেরুন্নিসাকে দেখার পর থেকে শাহজাদা সেলিম মনে মনে ওই একটি নামই বলে এসেছেন। বছরের পর বছর। বাদশা হয়ে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসার নামে মোহর ছাড়লেন। দেওয়ানখানায় শুনেছি—আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে সে মোহরকে ব্যাপারীরা নিজেদের ভেতর বলে, 'মেহের !' মানেই লেনদেন করতেন। সে তুলনায় দারাদিল কিংবা রানাশুকো কী আর এমন বেশি !

—এক জায়গায় বেশি শাহজাদা।

দারাশুকো রানাদিলের গম্ভীর মুখ দেখে সিধে হয়ে বসলেন। রানা কখন কী বলবে—তার কোনো ঠিক নেই।

—হুমায়ুন হামিদাকে বিয়ে করেছিলেন। জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করেছিলেন। তুমি কিন্তু আমায় বিয়ে করোনি শাহজাদা।

—বিয়ে তো করবোই।

—না। তুমি বিয়ে করবে না, আমি ভালো করেই জানি। আমার কাছে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আসো। বাইরে আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে তোমার শাহজাদা দারাকে মুছে ফেলে তুমি নতুন নতুন জালসাজিস নাও। কোনোদিন আফগান মনসবদার—কোনোদিন বা ইরানি ওমরাহ্। আমরা দু'জন একসঙ্গে বেরুলে তুমি পাছে আম-আতরাফ মানুষজনের চোখে পড়ে যাও—সেই ভয়ে মাথার পাগড়ি টেনে নাক-মুখ ঢেকে নাও দেখেছি—

—আঃ। অস্থির হয়ে পড়ছো কেন রানা। আমাদের তো বিয়ে হবেই।

—না। হবে না। আমি জানি। আমাকে তুমি এমন তওয়াইফ করেই রাখবে সারাজীবন। আমি যেন তোমার রাখনি আওরত। ঘেন্নায় এক একসময় আমার কান্না আসে। মনে হয় সারাটা শরীর যমুনার জলে ভালো করে ধুয়ে আসি।

তাও যেন ময়লা যাবার নয়।

নিরুপায় হয়ে শাহজাদা বললেন, ভালোবাসা কোনো ময়লা নয়। আমি যে তোমার রূপে ডুবে আছি রানা। তোমার গমক—গলার সুরেলি আওয়াজ, হাসি—সব—সব আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি—দেখি।

—মরদ রূপ নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। এ রূপে আমার করার কিছু নেই। খোদার দেওয়া এ রূপ চলে গেলে তুমিও চলে যাবে। নাদিরা বেগমের রূপে এমন মাতোয়ারা কি হওনি তুমি? বুকে হাত দিয়ে বলো শাহজাদা।

—একদিন হয়েছি। কিন্তু সে যে আর আমাকে জাগাতে পারে না—সেজন্যে তার কথা ভেবে আমার দুঃখই হয়।

—তাহলে? একদিন আমার জন্যেও তো একই দুঃখ হতে পারে।

—এর জবাব আমি জানি না রানা। কিন্তু এটা সত্যি তোমায় দেখলে আমার মন ভরে যায়। তোমার গলা শুনলে আমার মনে হয় কোনো ঝরনার জল আরশি গুঁড়ো হয়ে আমার কানে ঢুকছে। ঢুকে আমার শরীরের ভেতর মিশে যাচ্ছে। আমার খুনের দরিয়ায় পড়ে তা গলে যাচ্ছে।

—আওরত গুণে ভোলে শাহজাদা। তুমি যে খোদার কাছে যাওয়ার রাস্তার সালিক—ভগবানের কাছে যাওয়ার সড়কের ভবঘুরে—এই কথাটা ভাবলে তোমার চেহারা, তাগদ, শাহী, রূপ—কিছুই আমার মনে থাকে না শাহজাদা। আমি সব ভুলে যাই। তাই বলি কি—তুমি আমায় ছেড়ে দাও। রানী-হাভেলির এই ভালো আমার সইবে না। আমি রাস্তার নাচনি—রাস্তায় ফিরে যাই। বাঁদিদের এই উঠতে বসতে কুর্নিশ, তসলিম আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। এখানে আমাকে নিজেকে কিছুই করতে হয় না। সর্বক্ষণ আমি ওদের খাটুনি চুরি করছি। চুরি করে আরাম খাচ্ছি। অসহ্য!

—বেশ তো। ওদের সরিয়ে দিলেই হবে।

—তার আগে আমায় সরিয়ে দাও। আমায় ছেড়ে দাও। তুমি এই মাপা সময়ে লুকিয়ে আসা বন্ধ করে শাহজাদা-বেগম নাদিরার কাছেই পাকাপাকি ফিরে যাও।

—অস্থির হয়ো না রানা। আমি তোমায় বিয়ে করবোই।

—কবে?

দারা রানার মুখে তাকালেন। জলের ভাপে চান করে এসে রানাদিল একদম তকতকে এখন। সারাটা শরীর নাচের একটি ভাও হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। দারা বললেন, আব্বা হুজুর আমায়—কান্দাহার কিল্লা দখল করতে পাঠাতে পারেন। দখল করে ফিরতে পারলে আমি যা চাইবো—তাতে না বলতে পারবেন না বাদশা।

—যদি দখল করতে না পারো? দখল করতে পারলে তবে তোমার বাজি জাহানারার বিয়ের কথা পাড়বে বলেছিলে।

শাহজাদা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। তাহলেও তোমায় আমি বিয়ে করবো রানা। তোমায় ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। আমার কোনো উপায় নেই।

—যে-শাহজাদা জয় না করে ফেরে—হেরে যাওয়া শাহজাদা কখনোই শাহী দরবারে পাত্তা পায় না।

—জীবনে তো হারজিত আছেই রানা। আমি হেরে গেলে তুমি আমায় নেবে না?

—তুমি কি আমায় এখনই নিতে পারো না শাহজাদা?

—আমি তো নিয়েছি তোমায় রানা। শাহী কিছু ঝঞ্ঝাট মিটলেই তোমায় আমি বিয়ে করবো। তোমাতে আমি সবসময় ভরে আছি রানা। তোমায় আমি সবসময় টের পাই। তুমি আছো তাই দুনিয়া এত সুন্দর। তোমার ভেতর দিয়ে আমি ভগবানের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না—তুমি আছো বলেই আমি সুফী-দরবেশদের জীবনী নিয়ে সাফিনৎ-উল-আউলিয়া লিখে চলেছি। তুমি আমায় দিয়ে লেখাও।

—আমাকে ছিবড়ে করে দিয়ে?

—ছিবড়ে?

—আমার আর কী বাকি রেখেছো শাহজাদা?

—আমারও তো কিছু বাকি রাখোনি রানা। তোমার কি ভালো লাগেনি?

—ঘাগরা খুলে একজন মরদকে বুকে নিতে এ বয়সে ভালো লাগারই কথা। তবু তুমি কিছু বাকি রাখলে না কেন? কেন? তুমি তো একজন শাহজাদা। আমি যে রাস্তার নাচনি। আমার যে আর কিছু নেই। কিছু ছিলও না। —বলতে বলতে রানাদিলের চোখে জল এসে গেল।

দারাশুকোর ভয়ংকর কষ্ট হতে লাগলো। তিনি ভাবতে পারেননি, এ নিয়েও কোনোদিন কথা বলতে হবে। ঠিক বুকের মাঝখানটায়। এ তো ভীষণ যন্ত্রণা। তবু ওরই ভেতর শাহজাদা বললেন, পাছে তোমায় হারাই—তাই আগ বাড়িয়ে আমাকে তোমায় দিলাম। আমি শাদিসুদা মানুষ। আমি সব জানি। আমার অত ইচ্ছেও ছিল না—নেইও কোনোদিন। কিন্তু ভয়ে রানা—ভীষণ ভয়ে—যদি হারিয়ে ফেলি তোমায়—তাই আমার সারা শরীর দিয়ে তোমায়—বলতে বলতে দারাশুকোর দুই চোখ ভিজে গেল। গলা বুজে এলো। তবু ওরই ভেতর তিনি বলে উঠলেন, তুমি কি আনন্দ পাওনি? তুমিও তো এগিয়ে এসেছো?

—তুমি তো একজন শাহজাদা। তোমার অনেক আছে। আমার যে কিছু নেই।

—এখুনি বিয়ে হচ্ছে না বলে তুমি অস্থির হয়ে পড়ছো। কী হলে তুমি ঠাণ্ডা হবে বলো? কিসে তুমি সুস্থির হবে?

—তা তুমি পারবে না। আমি জানি।

—বলেই দ্যাখো।

—পারবে? এখুনি আমায় বিয়ে করো।

—তা কী করে হয় রানা? তোমায় বেগমের মান দিয়ে নিয়ে যেতে হলে—

—থাক। আমি জানতাম। তুমি ভাবো তোমার কথাই ঠিক। বুজদার।

—আমি অসৎ নই রানা। তোমার ব্যাপারে আমি কোথাও মিথ্যে বলিনি।

ঝ্টে কোনো কাজ করিনি। তোমাকে পাওয়ার ভেতর দিয়েই আমি ঈশ্বরের সন্ধান পাই। ফকির-দরবেশদের জীবনী আমায় আরও বেশি করে টানে।

—রাখো! আগ্রার বাজারে আবার সং-অসং আছে নাকি? তুমি কেন লিখছো আমি জানি।

—কেন?

—নাম পাবে—তাই।

—অ।

—মালকড়িও পাবে।

—কোথেকে?

—আউলিয়া সেজে থাকলে প্যালা পড়বে সারা হিন্দুস্থানের। বাদশার ঘরে ফকির। তাই তো? সারা হিন্দুস্থান ঝুঁকে পড়বে।

অজানা ভোঁতা ব্যথায় শাহজাদা দারার সারাটা শরীর ভারি হয়ে উঠলো। চোখে এসে পড়া জল শুকিয়ে গেল। এ কোন রানাদিলের সঙ্গে আমি এতক্ষণ কথা বলছি। মালকড়ি? প্যালা?

খুব শান্ত গলায় দারাশুকো বললেন, আমি তোমার চেয়ে অন্যভাবে বেড়ে উঠেছি—এটা আমার দোষ নয় নিশ্চয়?

—অ্যাই। গলা চড়াবে না। আমি তোমার রাখনি আওরত নই। আমি তোমার খরিদা বাঁদিও নই। বেজন্মা কোথাকার।

—কে বেজন্মা?

—তুমি। আর তোমার নাদিরা বেগম।

—এর ভেতর নাদিরা আসছে কোথেকে? সে বেচারা—

দারার কথা শেষ হতে পেল না। রানাদিল চিৎকার করে বললো, সব—সবাই বেজন্মা। এই আগ্রাকে আমি চিনি।

—তুমি যে-ভাষায় কথা বলছো—বেজন্মা বলছো, মালকড়ি বলছো—

—জানি। আমি তো আনপড়।

—আনপড়রাও ভালোবাসে! ভালোবাসার ভেতর যখন বেজন্মার মতো কথা আসে তখন ভালোবাসা থাকে কোথায় রানা? শাহজাদা হয়ে পয়দা হওয়া কি দোষের?

॥ সাতান্ন ॥

আমার পয়দায়িস আমার হাতে ছিল না রানা।

—তুমি কে এমন যে তোমায় নিয়ে আমায় এত ভাবতে হবে! আমায় যেতে দাও—

দারা অনেক কষ্টে বললেন, আজ যখন তুমি হামাম থেকে একদম তকতকে হয়ে বেরিয়ে এলে—আমি চোখ ভরে তোমায় দেখলাম—তখনই আমি জানতাম—তোমার-আমার আজকের শেষটা খুবই খারাপ হবে।

মাকরান পাথরের মেঝেতে বাঁ-পাখানি মুখের ঝামটার মতোই দাপিয়ে রানাদিল বলে উঠলো, দ্যাখো শাহজাদা ? তুমি আমায় ভালো খাওয়াচ্ছো। ভালো রেখেছো। তাই বলে যা বলবে, তাই-ই একদম সাচ্চা—কোনো ভুল নেই তাতে—এমন হতে পারে না। তোমার ছেলে, তোমার বেগম—তাদের জন্যেই যদি দিনের সবটা দিয়ে দাও তো—আমার কাছে কখন আসবে বলতে পারো ? আমি শুধু পথ চেয়ে পড়ে থাকবো এই ফাঁকা হাভেলিতে ?

—আমার শাহী—

—চু-উ্-প। একদম কথা বলবে না। লজ্জা করে না তোমার ?

চমকে গেলেন শাহজাদা। কী ভাবে রাস্তার নাচনি মেয়েটা ? ওর কি খেয়াল নেই—আমি হিন্দুস্থানে মুঘল শাহীর পহেলা শাহজাদা। যার সঙ্গে কেউই এভাবে কথা বলে না। নিজের মনের ভেতর মরেও গেলেন দারাশুকো। ভালোবাসায় কি এমন ধমক থাকে ? ভালোবাসতে গিয়ে তো আমি পুরোপুরি বেইজ্জতির শিকার। পুরোদস্তুর দুপুর যেন আলো হারিয়ে ম্যাটমেটে হয়ে গেল। অপমানে, যন্ত্রণায় শাহজাদা ভেতরে ভেতরে ছিঁড়ে যাচ্ছিলেন। সেই দশায় তিনি আবিষ্কার করলেন, যাকে একবার ভালোবাসা যায়—যাকে দেখলেই মন ভরে যায়—তার ওপর খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না—বিশেষত সে যখন আওরত। তাকে গারদে ভরে দেওয়ার হুকুমও দেওয়া যায় না। এক রকমের কুরে খাওয়া অভিমানে নিজের তাগদই যেন মুছে যায়।

রানাদিল গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠলো, তোমার ওই শাহী, সুবেদারি—ফৌজদারি মনসবদারি দেখাতে আসবে না বলে দিলাম।

এ কী কথা ? এ কী গলার আওয়াজ ? আমি কি আগ্রায় রাস্তার ভিক্ষের গেঁহুদানা খুঁটে খাওয়া মিশকিন নাকি ! প্রচণ্ড যন্ত্রণার ভেতরেও ঝিম মেরে গেলেন শাহজাদা। আমি আবার শাহী-সুবেদারি কখন দেখাতে গেলাম ! আশ্চর্য ! —এসব কথা দারাশুকোর মনে ভেসে উঠে মনেই ডুবে গেল। মুখে কোনো কথা ফুটলো না তাঁর। তিনি রানী-হাভেলির খোলা অলিন্দ টপকে যমুনার চর-জায়গার কেয়া ঝোপে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখলেন, চলে যাবার জন্যে—সব সম্পর্ক কাটান-ছাটানের জন্যে এত মরিয়া রানাদিল কিন্তু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে—সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু অলস রোদ্দুরের জায়গা বদলে ছায়াটা কিছু সরে গেছে।

হাভেলির বাগানে কয়েকটা পাখির চিড়িক চিড়িক শাহজাদার মনের ভেতরকার ভাব-ভাবনা—রানাদিলের একতরফা ঢেলে দেওয়া অপমান—সব কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তার ভেতরেও তাঁর চোখ যমুনার বুকে যেখানে যেখানে জল—সেসব জায়গা খুঁজে ফিরছিল। নদী মানেই তো জল। কিন্তু ভালোবাসা মানে ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা মানে কিছু আহ্লাদ। আর অনেকখানি অপমান। আমি রানাদিলকে দেখার জন্যে—একটুখানি চোখের দেখার জন্যে এমন করি কেন ? দেখেই বা আমার কী হয় ? ওকে নিয়ে আমি আসমান অব্দি ঠেলে ওঠা যেসব বেহেসত সমান খোয়াব দেখি জেগে জেগে—তাতো সবই আমারই

মনের মতো রাঙানো। আসলে তো রানাদিল রাস্তায় নেচে নেচে রুটি কামানো এক নাচনি মাত্র। রাস্তার দেহাতি হিন্দুস্থানের কোনো আওরতকে কোনোদিন কাছ থেকে দেখিনি বলেই তো রানাকে ঘিরে আমার এত চাহত—এত লালচ—এত অবাক হওয়া! নয়তো ওর ভেতর এমন কী আছে যা কিনা নাদিরার ভেতর আমি পাইনি?

আমার হুজুর মরহুম মিঞা মীর। আমি মরহুম মিঞা মীরের মুরিদ। জগতে আমার অনেক কিছু করার আছে। এই কুঁদুলে, দেমাকি, আনপড় মেয়েটার সঙ্গে আমার তো কোনো কাজ নেই। তবে কেন আমি পড়ে আছি? কেন আমি মিথ্যেই ভাবি—ইনসানের জন্যে ইনসানের আসলি গহীন ভালোবাসাই ইনসানকে খোদাতালার দিকে যাবার রাস্তায় রাহী করে তোলে—করে তোলে সালিক। এসবই আমার অল্প বুদ্ধি অলীক খোয়াব মাত্র! আমারই মনগড়া সরল সিধে রাস্তাই কিছু নয়।

—শাহজাদা। আমি আর এভাবে পারছি না—

দারা ফিরে তাকালেন। রানাদিলের দু'চোখে জল। সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে—এক অজানা বিষের ব্যথায়।

—কী পারছো না রানা? —বলেও নিজের জায়গায় বসে রইলেন দারা। তিনি ঠিক করেছেন—এখন আর তিনি চোখের জলে ভেসে যাবেন না।

রানাদিল চোখের জল আটকাবার কোনো চেষ্টাই করলো না। কান্নায় বুজে আসা গলায় বলতে লাগলো, আমি হজরত—

রানার মুখে 'হজরত'! শুনে দারাশুকো চমকে সিধে হয়ে বসলেন। তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন শাহজাদা। বললেন, কী ব্যাপার?

রানাদিল সে হাসিতে একটুও বদলালো না। সে যেমন কথা বলছিল—তেমনি কষ্টে, কান্নায় বুজে আসা গলায় বললো, হজরত! আপনার আগে আমি কারও জন্যে—আমার আশিকি আসেনি। আমি নিজেকে কখনো কারও মাশুকা ভাবিনি। মরদ মানে আমার কাছে জংলি চিতা। হয় সে আমায় খাবে—নয়তো আমার নখরাবাজিতে সে কোতল হবে—তার মগজের গোলমাল হয়ে যাবে—তখন আমি তার জেব ফর্সা করে দিয়ে মোহর-আশরফি নিয়ে সটকাবো। কিন্তু এমন দশায় আমি কখনো পড়িনি। এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না বন্দেগান, আমি আর পারছি না।

—কী রানা? কী পারছো না? আমায় বলো—

—এই যে এক বেড়া তুলে রেখেছেন আপনি। পাথরের বেড়া—

—বেড়া?

—হ্যাঁ হজরত। আমি রাস্তার মানুষজন দেখে দেখে বড় হয়েছি শাহজাদা। সেসব ইনসান আমারই মতো রাস্তার ইনসান। আমি তাদের জানি। তারা আমাকে বোঝে। বাদশা, শাহজাদা, শাহজাদী, সুবেদার—এসব আমার কাছে কহানির মানুষজন। খোয়াবের মানুষজন। আমি আগে কখনো কোনো শাহজাদা দেখিনি—কথা বলিনি তার সঙ্গে—তাদের বদনের খুশবু কেমন তাও জানতাম

না—এই যা প্রথম দেখলাম আপনাকেই—আপনার বুকের ভেতর হারিয়ে যেতে যেতে ভাবি—এ কি সত্যি ? এ কি সত্যি ? জীবন তো মোটে চারদিনের। তাই না শাহজাদা ?

দারাশুকো মনে মনে বললেন, এ আমি কাকে রাস্তার মামুলি নাচনি ভাবছিলাম ? এ কোন রানাদিল ? একে কি আমি চিনি ? তিনি তখন তখনই কিছু বলতে পারলেন না।

—কিন্তু শাহজাদা। এত সুখ আমার সহ্য হবে না। আপনি এক পাথুরে বেড়া তুলে দিয়ে বসলেন, এটা টপকালেই আপনি আর আমি এক হয়ে যাবো।

—সেটা কী রানা ? বলবে তো ?

—কবে আপনি কিল্লা কান্দাহার কবজা করবেন—তারপর সেই সুবাদে খুশির জলসা মানাবার ফাঁকে বাদশার মবারকে আমার সঙ্গে আপনার শাদির কথাটা পেড়ে সব কিছু পাক্কা করে ফেলবেন। এই শর্ত—রানী-হাভেলিতে বসে এই শর্তের দিকে চেয়ে থেকে আমি আর বসে থাকতে পারি না শাহজাদা।

—কী করবো রানা। আমি হিন্দুস্থানের বাদশার পহেলা শাহজাদা। আমাকে ঘিরে আব্বা হুজুরের কত কত খোয়াব। এখুনি কথাটা পাড়লে যদি সব বানচাল হয়ে যায় ? আমার বেগম আছেন। আছে আওলাদ সুলতান সুলেমানশুকো—একটু সবুর করো রানা—একটু সবুর করো।

সমান কেঁদে রানাদিল বললো, আশিকিতে আবার শর্ত কিসের ? এ শর্ত তো আমার কাছে বে-ইজ্জতির পাথর—এ পাথর সবসময় আমার বুকে চেপে বসে আছে শাহজাদা।

—আমায় দয়া করো রানা। রহেম কর। আর কিছুটা সময় দাও—

—আশিকি তো নওজওয়ানকে বেপরোয়া করে। আর আপনি ?

—ওভাবে কথা বলে আমায় পর করে দিও না।

—আমি কতদিন এভাবে সেজেগুজে রানী-হাভেলিতে আপনার তওয়াইফ বনে থাকবো হজরত বলতে পারেন ?

—তওয়াইফ নও তুমি। তুমি আমার মাশুকা—রানাদিল। আমি তোমার আশিক।

—কেন মিথ্যে বলেন শাহজাদা। আশিয়ানায় ভুল বোঝাবুঝি হয়—কিন্তু কেউ ঠান্ডা হিসেবি হয় কি বন্দেগান ?

—আমি হিসেবি নই রানা। হিসেবি নই। কিন্তু আমি যে শাহজাদা। আমি যে সুবেদার। আমি মনসবদার। আমি যে ফৌজদার। আমার মাথার ওপরে রয়েছেন আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশা।

—তাই আপনি দরবারে ফৌজি টাট্টুর খেলা দেখতে যাবেন। দেওয়ানখানায় উজিরদের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন। আর আমি পথ চেয়ে বসে থাকবো। আমার বুকের ওপর শর্তের বেইজ্জাতি পাথরখানা চেপে বসে যাচ্ছে যে—রানাদিল আর কিছু বলতে পারলো না। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে রানী-হাভেলির মেঝেতেই বসে পড়লো।

শাহজাদা দারা ছুটে এগিয়ে গেলেন। দু'হাতে রানাদিলকে তুলে ধরবেন বলে। দু'কাঁধে হাতও রাখলেন দারাশুকো। কিন্তু অন্যদিন যেমন সহজভাবে নিজের ইচ্ছেমত তাঁর মাশুকা রানাদিলকে দু'হাতে পাঁজাকোলে শূন্যে তুলে ফেলেন—আজ তার অর্ধেকের অর্ধেক—সামান্য নাড়াতেও পারলেন না শাহজাদা। রানা যেন এখন এক পাথরের চাঙ।

নিজেকে বড় নিষ্ফল লাগলো দারাশুকোর। আমার দুই কবজিতে জোর আছে। কোমর থেকে নিজের শরীরটাকে শাহজাদার মনে হয়—যেন বা উদ্যত সিংহ। লাফিয়ে পড়লেই হলো। তাঁকে নিয়ে আরবি ঘোড়া যখন ছোটে—তা নাকি দেখার মতো। তাই তো বলে থাকে তাঁর সওয়ারদের রিসালাদাররা। অথচ রানাদিলকে তিনি এখুনি নিজের ঘরণী করে তুলতে পারছেন না। কারণ, উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। সে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন হিন্দুস্থানের বাদশা—যাঁর ইচ্ছাই শেষকথা।

দিনের এমনই ঝলমলে আলোর ভেতর হিন্দুস্থানের আরেক দিকে তখন দিগন্ত অব্দি ঠেলে ওঠা ঢেউ ভাঙা কালো রংয়ের বড় দরিয়ায় পালতোলা জাহাজের আনাগোনা। নানা রংয়ের মাস্তুল। কোনো জাহাজের গায়ে তার দেশের বিশ্বাস মতো অস্ত্রচিহ্ন আঁকা। বাতাসে জলের ফেনার গুঁড়ো। কাছেই কোথাও জলের প্রাণী পুড়িয়ে বন্দর এলাকার চুন বানানো হচ্ছে। আর গাদা গুচ্ছের জল-চিল দুই ডানা মেলে দিয়ে ভেসে পড়ছে। কখনো ডানা ঘেঁষে—কখনো বা ডাঙা ছেড়ে যাওয়া জাহাজের পেছনে পেছন। খাবারের আশায়। সবচেয়ে বেশি ভিড়—যেখানটায় জাহাজের খোল থেকে জোড়ায় জোড়ায় ইরানি-তুরানি ঘোড়া নামানো হচ্ছে।

ঠিক এমন সময় দেখা গেল—দূরে দিগন্তরেখায় তিন প্রস্থ পাল খাটানো একটি ব্যাপারী জাহাজ আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। পুরো চেহারা নিয়ে। কলাপাতা রঙের পালগুলো আকাশের রঙের সঙ্গে একাকার। চড়া রোদের আলো না থাকলে ধরা যেতো না।

জাহাজের দু'ধারে কাঠের ওজনদার লাগসই সব গোলাই ঝোলানো। দেখেই বোঝা যায়—এ-জাহাজ অনেক দরিয়ায় পাড়ি দিয়ে তবে হিন্দুস্থানের ডাঙায় এসে ভিড়ছে।

পাটাতনে একখানি উঁচু তক্তার ওপর একটি মেলে রাখা মানচিত্রে তাকিয়ে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের একজন ভিনদেশি তাগড়া মানুষ বলে উঠলো, আমরা নিশ্চয় এখন সুরাটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি।

লোকটির মুখে মাথায় লালচে দাড়ি—লালচে চুল। ভুরু নিচে নীলচে চোখ জোড়া জ্বলে উঠলো আবার। সে তার পাশে দাঁড়ানো তারই গায়ের রংয়ের—কিছু কমবয়সী জনা তিনেকের দিকে তাকালো। তাকিয়েই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি—আমরা অবশ্যই বন্দর সুরাটের মুখে এসে

পৌঁছেছি।—তারপর তিনজনের ভেতর একজনের কাঁধে ভারি থাবা মেরে বললো, এই দ্যাখো দানিয়েল! আমার কম্পাস ভুল বলতে পারে না। একশ ডিগ্রি পশ্চিমে —আবার চুয়াত্তর ডিগ্রি উত্তরে—

ঠিক এমন সময় বিশাল লম্বা ইয়া লাশ এক বুড়ো চামড়ার গোটানো চাবুক হাতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে ষাঁড়ের চামড়ার জামার এখানে-ওখানে ফুটো। মাথার পালক গোঁজা তেরছা টুপিটি আর পায়ের জ্যাক বুটটিই চিনিয়ে দেয়—বহু দরিয়ার বাতাস খাওয়া এই বুড়োই এই জাহাজের কাপতান। তিনি উত্তেজনায় ফেটে পড়া তাগড়া চেহারার জওয়ান মানুষটির কাঁধে হাত দিয়ে খুব শান্ত গলায় বললেন, আমরা যে বন্দর সুরাটের মুখে এসে পড়েছি—তা জানতে কম্পাস লাগে নাকি!

বুড়োর ভারি, শান্ত গলা, নানান দরিয়ার নোনা জলের ঝাপটায় রং চটে যাওয়া চামড়ার জামা, নীল স্থির চোখ আর মাথার পিছিয়ে যাওয়া চুল সহজেই সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। তার কথায় কিছুটা দমে যাওয়া মুখে তাগড়া চেহারার মানুষটি বললো, কাপতান আঁতোয়ান, আপনার কাছে তো দরিয়া মানে গির্জার ইস্কুলের মাঠ। বড় চেনা। কম্পাসে কী দরকার আপনার!

কাপতান আঁতোয়ান দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, হরমুজ, বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, মাসকাট হয়ে সুরাট আসছি সেই আকবর বাদশার আমলের শেষ দিক থেকে। একসময় আন্ত ওয়ার্পের মানুষ ছিলেন বলেই—অবরে সবরে প্যারিসে গেলে ট্যাভারনিয়ার তোমাদের বাবার সঙ্গে দেখা করতাম আগে—

একথায় ট্যাভারনিয়ার নামে অতি তাগড়া জওয়ানবয়সী সেই দাড়িওয়ালার পাশে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো দানিয়েল নামে যুবকটি। তার দাড়ি নেই। কিন্তু মাথার লালচে চুল রীতিমত বাবরি ধাঁচের।

কাপতান আঁতোয়ন এবার দুজনের মুখে তাকিয়ে বললেন, মঙ্গলবার রাতে মাসকাট ছাড়ার পর পশ্চিমা বায়ু পেয়ে যাওয়ায় পাল তুলতে হুকুম দিয়েই দেখি দুটি নৌকোও পাল তুলছে আমাদের পেছন পেছন। আমরা ভেসে চলেছি বাতাসের সঙ্গে। দেখি ওরাও পিছু ছাড়েনি। বুঝলাম, মালাবারি জলদস্যু। ভাগ্যিস তোমরা দুভাই বন্দুক ধরলে—

তাগড়া ট্যাভারনিয়ার লাজুক মুখে বললো, ও কিছু নয় কাপতান। এ আমাদের বাবার শিক্ষা—

—অন্ধকারে দরিয়ার বুকে অমন টিপ দেখেই বুঝেছি—গ্যাব্রিয়েল খুড়োর হাতে তৈরি তোমরা। আমরাই তো অল্পবয়সে প্যারিসে ওর আস্তানায় গিয়ে কত নতুন নতুন জিনিস শিখতাম।

—বাবার ফার্স্ট লাভ ছিল ভূগোল। ভূগোল নিয়ে কথা বলতে সবচেয়ে ভালোবাসতেন গ্যাব্রিয়েল ট্যাভারনিয়ার।

কাপতান আঁতোয়ান পাল নামিয়ে নেওয়ার হুকুম দিয়ে ডেক মাস্টারকে খোলে নেমে সব কিছু দেখে নিতে বললেন। তারপর বললেন, ওর আস্তানায় গিয়ে সবসময় দেখেছি—অন্তত তিনটে মানচিত্র টাঙানো থাকবে। দুটো গ্লোব

গড়াগড়ি খাবে। আর রকমারি লিভারের বন্দুক, পিস্তল—যেন বা ফায়ার আর্মসের এগজিবিশন চলছে।

—বাবা ওইরকমই ছিলেন—

—ছিলেন বলছো কেন? গ্যাব্রিয়েল খুড়ো নেই?

—নেই। সাত বছর হলো তিনি দেহ রেখেছেন। রোমের অত্যাচারে জেরবার হয়ে তিনি সবসময় আতঙ্কে ভুগতেন। এই বুঝি আচমকা হামলা হলো। তাই সবসময় নানা রকমের বন্দুক যোগাড় করে রাখতেন। কিন্তু তাঁর প্রোটেস্টান্ট বিশ্বাস থেকে তিনি একচুলও সরে আসেননি। বন্দুক নয়—করুণায় ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। বাবা কখনো আমাদের মতো দুনিয়ার দরিয়ায় ভেসে পড়েননি। কিন্তু তিনিই আমার মনে এই ভেসে পড়ার বীজটি বুনে দেন সেই কোন ছোটবেলায়। নানা দেশের পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র নিয়ে তিনি কথা বলতেন। আমি হাঁ করে শুনতাম—মনে মনে ভাবতাম—কবে ওসব দেশে গিয়ে হাজির হবো?

—তোমাদের একজন ছবি আঁকতে না?

—হ্যাঁ। আমাদের বড় ভাই মেলশিওর। সে এখন প্যারিসে মানচিত্রকর।

—এরা দু'জন?

ট্যাভারনিয়ার দানিয়েলের পেছনে দাঁড়ানো জনকে দেখিয়ে বললো, ও হলো গিয়ে মলিয়ের—ছবি আঁকে। হিন্দুস্থানের মানুষজন, রাস্তাঘাট, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার এঁকে নিয়ে যাবে। আর ওর নাম আলেকজেন্ডার—ডাক্তারি করে। তা এবার আমরা সুরাটে নামি?

হো হো করে হেসে উঠলেন কাপতান আঁতোয়ান। এখানে সুরাট কোথায়? সুরাট তো এখনো অনেক দেরি।

—তাহলে?

—এটা তো সুওয়ালি। এখান থেকে বালিচর—নয়তো কাদাজল গোগাড়িতে পেরতে পারো। নয়তো পায়দল। এগিয়ে গেলে একবেলার ভেতর সুরাটে গিয়ে উঠবে। নৌকোতেও যেতে পারো। অনেকটা জুড়েই বালিচর। মান্ডবী আর তাপ্তি নদী মিশে গিয়ে এখানে দরিয়ায় পড়েছে। ওদের গা ধরে এগোলেই সুরাট।

—অ্যাতো বালি?

—এ আর কী বালি দেখলে ট্যাভারনিয়ার। আমার জাহাজি জীবনের একেবারে গোড়ায় জাহাজ গিয়ে মাল খালাস করতো থাট্টায়—

—থাট্টা?

—হ্যাঁ। তখন হিন্দুস্থানের পশ্চিমে বন্দর বলতে সুরাট আর থাট্টা। তা সে থাট্টায় নামার খাঁড়িও তো বালিতে বুজে গেছে আজ বিশ বছর। সুরাটের মাথার ওপর উত্তরে—সিন্ধুর মোহানায় একসময়—খুবই বড় বন্দর ছিল থাট্টা। তোমরা বরং নৌকো নিয়েই যাও।

ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, বালিচর জায়গায় ঝোপের ভেতর হালকা হালকা

নৌকো নিয়ে পারানিরা বসে। ডাকতেই একজন নৌকো পিঠে করে বেরিয়ে এলো। বেত বেঁকিয়ে ষাঁড়ের চামড়ায় মোড়া নৌকো। কিন্তু বেশ শক্ত। তাতে ওঠার সময় ট্যাভারনিয়ার জানতে চাইলো, আর কিছু লিখে দেবেন নাকি ?

—নাঃ। তার আর দরকার পড়বে না। সুরাটের ফাদার হাইবারিশ রথকে সব কথাই লিখেছি। পেঁছেই তাঁর হাতে চিঠিখানি দেবে। কোনো অসুবিধে হবে না। ওঃ! মনে পড়েছে। বন্দরে কোনো সরাফ বা পোদ্দারের পাল্লায় পোড়ো না। পড়লে একেবারে সর্বস্বান্ত হবে—

—ওরা কারা ?

—শাহী কর্মচারি। ওরা তোমার লুই বা ডুকাট বদলে আশরফি দেয়। যাচাইয়ের সময় অনেকটা কেটে নেয়। বদলি আশরফি বা মোহর নেবার সময় বলবে—আমাদের চলতি শাহজাহানি মোহর দিন।

—কেন ? কেন ?

—পুরনো মোহর বা তনখা যা-ই দেবে—তা যদি তুমি দেশে ফেরার পথে বদলাতে যাও তো এই পোদ্দারই বলবে—অনেক হাত ফেরতায় ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে গেছে। তখন তোমায় পাওনা থেকে অনেকটা কেটে রেখে তবে দেবে। সাবধান কিন্তু।

ট্যাভারনিয়ারদের নৌকো ছাড়ার মুখে কাপতান আঁতোয়ান চেঁচিয়ে বললেন, সোরা নীল রেশম নিয়ে ফিরবো। জায়গা বেঁচে যেতেও পারে। যদি সাতাশে মে-র ভেতর ফিরতে পারো তো তোমাদের চারজনেরই জায়গা হয়ে যাবে।

নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। ট্যাভারনিয়ার হ্যাঁ বা না কোনো কিছুই পরিষ্কার করে বললেন না। নিজের মনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, পাঁচ বছর আগে আলেপ্পো অব্দি এসে ফিরে গেছি। একবার যখন এসে পড়তে পেরেছি—তখন এত বড় দেশ হিন্দুস্থান না দেখে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা আসছে কোত্থেকে!

বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় ওদের নৌকো দুই বালিচরের মাঝামাঝি শান্ত জলে গিয়ে পড়লো।

ট্যাভারনিয়ারের বাবা গ্যাব্রিয়েল তাঁর প্যারিসের আস্তানায় বসে ভূগোলের সব জটিল জটিল জট খোলার চেষ্টা করতেন। মানচিত্র খুলে বসে তিনি সবচেয়ে আগে মালভূমিগুলোকে লাল টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করতেন। তারপর কোন জায়গা সমুদ্র থেকে কত উঁচুতে তার হিসেব কষতেন। সেসব খুব মন দিয়ে দেখতো তখনকার এক বালক—যার পুরো নাম জাঁ-বাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার।

সুওয়ালিতেই বাইরের সব জাহাজ এসে নোঙর ফেলে। এখান থেকেই ওদের নৌকো চললো সুরাট। মাঝে মাঝে বালিচর। আবার হাঁটুজল। আবার বালিচর। তাতে নলখাগড়া আর কেয়ার ঝোপ। চোখের সামনে নানা রঙের পালের সব জাহাজ। নানা দেশের লশকর। দানিয়েল তার দাদাকে বললো, এতদিনে তাহলে আমরা হিন্দুস্থানে এলাম।

ট্যাভারনিয়ার বললো, এখনো আসিনি দানিয়েল। সামনেই হিন্দুস্থানের একমাত্র বন্দর সুরাট। তবে হ্যাঁ দানিয়েল—আজ আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের বাবা মঁসিয়ে গ্যাব্রিয়েলের কথা। এই দুনিয়ার পাহাড় পর্বত, নদীনালা মরুভূমি নিয়ে বাবা কত সব জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে কথা বলতেন। কিশোর বয়সে আমি সেসব কথা মুগ্ধ হয়ে গিলতাম—

—জানো দাদা—একথা ভেবে অবাক হই—সারা দুনিয়ার সাগর-স্রোত যাঁর নখদর্পণে ছিল—তিনি কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলও পার হননি জীবনে।

দানিয়েলের একথা কানে গেল না ট্যাভারনিয়ারের। বেতের নৌকো একবার এগোনো ঢেউয়ে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে—আবার ফিরতি ভাঙনে ফিরেও আসছে খানিক। সেসবেও নজর নেই ট্যাভারনিয়ারের। পশ্চিম আকাশে সূর্য অনেকটা ঢল নিয়েছে। সেদিকে তাকিয়েই ট্যাভারনিয়ার বললো, অ্যাটলাস দেখে যেসব দেশ চিনেছিলাম—সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে আমার আশ মিটতো না দানিয়েল। আজ মিটতে চলেছে। আর কিছুক্ষণ পরে আমরা হিন্দুস্থানের মাটিতে পা রাখবো। সেই বয়সেই অধীর হয়ে উঠেছিলাম,—কবে আমি মানচিত্র আঁকা ওসব দেশ নিজের চোখে দেখতে পাবো? বাইশ বছরও পুরো হয়নি—তার ভেতর দেখা হয়ে গেল—ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি—এমনকি ইতালি। ইউরোপের সেরা সব দেশ দেখা সারা—বাইশ হবার আগেই।

—সুইস, পোলিশ—দুই ভাষাই তো তুমি বলতে পারো।

তার গর্বে ছোটভাই গর্বিত দেখে ট্যাভারনিয়ারের খুব ভালো লাগলো। মুখে বললো, তুমি তখন বেশ ছোট। আমি মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইউরোপ দেখতে বেরিয়ে পড়ি।

কথা প্রায় একাই বলছিল ট্যাভারনিয়ার। সবারই হাতে নুনে জমানো দক্ষিণ ফ্রান্সের বাছুরের মাংস—যা কিনা খেতে আবার তুলে রেখে দিতেও যে কোনো দরিয়া পাড়ির বেলায় খুব কাজের হয়।

চিত্রকর ছেলেটি কোনো কথা বলছিল না। তার স্বপ্নের হিন্দুস্থান তখন পড়ন্ত বেলায় নরম হয়ে আসা সূর্যের আলোয় বিরাট হয়ে সবে ধরা দিতে শুরু করেছে। নাম না জানা সব গাছ—ভাঙা তীরভূমি—খালি গা কালো কালো সব মানুষ। এই হলো গিয়ে হিন্দুস্থান।

ট্যাভারনিয়ার বললো, ইন দি ইয়ার অফ দা লর্ড—সিক্সটিন থার্টিওয়ান—ফিফটিনথ জানুয়ারি—তুরস্কে এসে হাজির হই। সেবারই প্রথম এশিয়ায় পা দিলাম। সেবারে ভেবেছিলাম—ইরান হয়ে হিন্দুস্থানে যাবো। কিন্তু ইস্পাহান সিরাজ ঘুরে আলেপ্পো হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। আবার প্রায় ছ'বছর পরে এই এলাম।

ডাক্তার ছেলেটির হাত থেকে সুস্বাদু মাংসের টুকরো জলে পড়ে গেল। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, ওই তো সুরাট—

বিকেলের লালচে আলোয় বিশাল তীরভূমি। জল-চিলদের ওড়াউড়ি।

কাঠের পাটাতন মাড়িয়ে চারজন ডাঙায় এসে উঠলো। মালপত্র বলতে যার যার সঙ্গে ভারি বনাতে মোড়া বোঁচকা। ট্যাভারনিয়ারের পিঠে এমন বোঁচকা—দু'টি। তার একটির ভেতর থেকে গোটানো মানচিত্রের লেজ উঁকি দিচ্ছে। সে-ই সবার আগে। অনেকটা কাপতানের মতোই। চালানি শুঁটকি মাছের গন্ধে দানিয়েল নিজের নাক চেপে ধরলো। আশপাশে আরব ব্যাপারীরা সেই গন্ধের পরোয়া না করেই নিজেদের ভেতর হাসাহাসি করে কথা বলছিল। ওদের লোকজন ঝুড়ি বোঝাই দিয়ে শুঁটকি তুলছে জাহাজের খোলে।

চারদিক তাকিয়ে প্রায় ঘোষণার গলাতেই ট্যাভারনিয়ার চেঁচিয়ে উঠলো, এসো দানিয়েল—এখানে আকাশের নিচে হাঁটু গেড়ে সবাই মিলে যীশুকে ধন্যবাদ জানাই—অবশেষে আমরা হিন্দুস্থানে এলাম।

দানিয়েল তার দাদা ট্যাভারনিয়ারের মতো তাগড়া কিংবা দীঘল নয়। তার গালে দাদার মতো দাড়িও নেই। কিন্তু চোখ দু'টি সবসময় কৌতুকে ডুবে আছে। সে হা-হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, তোমার ভাবখানা দেখছি—তুমি যেন হিন্দুস্থান আবিষ্কার করে বসে আছো।

দানিয়েলের কথায় ট্যাভারনিয়ার ভ্রূক্ষেপও করলো না। সে ততক্ষণে একা একাই বন্দর সুরাটের ধুলোকাদার ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। তাকে ওভাবে বসতে দেখে চিত্রকর আর ডাক্তার—দু'জনই কিন্তু কিন্তু করে হাঁটু মুড়ে বসতে যাচ্ছে।

শানানো তীরের মতোই দানিয়েল বলে উঠলো, ভুলে যেও না দাদা।—আজ থেকে দেড়শো বছর আগেই ভাসকো-দা-গামা নামে একটা লোক হিন্দুস্থানে এসে হাজির হয়েছিল।

এ কথাতে ডাক্তার আর চিত্রকর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ট্যাভারনিয়ারের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে চোখ বুজে ফেলেছে।

এ দৃশ্য সুরাটে নতুন নয়। ব্যস্ত বন্দরের কারও সময় নেই দাঁড়িয়ে পড়ে লাল দাড়ি শূন্যে তোলা কোনো ফিরিঙ্গিকে প্রার্থনা করতে দেখবে। কিন্তু দানিয়েলকে তার দুই সঙ্গী নিয়ে দাঁড়াতেই হলো। তারা তিনজনই ট্যাভারনিয়ার নামে সবসময় টগবগানো এই মানুষটির কাপতানিতে হিন্দুস্থানের মাটিতে এসে পা রেখেছে। তারা জানে, ট্যাভারনিয়ার হিন্দুস্থান ঘুরে দেখতে যেমন এসেছে—তেমনই এসেছে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। ইস্পাহান থেকে সঙ্গে করে এনেছে বেশ কিছু আসমানি রঙা দামি পাথর—যা কি না এদেশের মানুষের গলার মালায়—গায়ের গয়নায় রীতিমত ব্যবহার করা হয়। দানিয়েল জানে—দাদার মাথায় আছে—একবারটি গোয়া যাবে। তারপর সেখান থেকে গোলকুণ্ডায়। হীরার খনি দেখার বড় সাধ ট্যাভারনিয়ারের।

সন্ধ্যা হয় হয়। মাণ্ডবী আর তাপ্তি—দুই নদীর ঘোট পাকানো জলধারা বেশ শান্ত। এটাই বড় দরিয়ায় গিয়ে ভেসে পড়ার খাঁড়ি। এখানে ট্যাভারনিয়ার দেখলো—বড় জাহাজ ঢুকতে পারে না। কেননা, মাণ্ডবী আর তাপ্তির মোহনায়

বড় বড় বালিচর। জাহাজে থাকতেই ট্যাভার্নিয়ার কাপতান আঁতোয়ানের কাছে শুনেছে, শাহজাদী জাহানারার হুকুম মোতাবেক ওলন্দাজ আর ইংলিশস্তানি জাহাজ সুরাটে ঢুকতে পারে না। ওই দুই দেশের তিন চার জন কাপতান নাকি সোনা পাচার করতে গিয়ে শাহবন্দরের হাতে ধরা পড়েছে। তবে কিছুকাল হলো—বর্ষার পর ইংলিশস্তানি জাহাজ মাঝনদীতে ভাসতে পারে। তীরে ভিড়তে পারবে না। ট্যাভার্নিয়ার শুনেছে—মুঘলশাহীর হুকুম মানে হুকুমই।

ওরা চার জনে সন্ধে রাতের ভেতর শহর সুরাট ঘুরে ঘুরে ফুরিয়ে ফেললো। বসতি এলাকা মাঝারি মতো। আলেপ্পোর চেয়ে কিংবা স্মারনার চেয়ে কিছু বড় হবে। মুঘলদের কেল্লাটিও খুব মজবুত নয়। জল দিয়ে—কিংবা ডাঙা দিয়ে—যেদিক দিয়ে যাও না কেন—কেল্লার পাশ দিয়েই যেতে হবে। কেল্লার চার কোনায় চারটি গম্বুজ। দেওয়ালের ওপর আঙিনা না থাকায় কামানগুলো বসাতে হয়েছে আলাদা আলাদা বেদি করে।

ট্যাভার্নিয়ার শুনে আসছে—মুঘলশাহী খুবই তাগদ রাখে। ঘোড়সওয়ারের বিশাল ফৌজ। পালে পালে জঙ্গি হাতি। নিশানা মতো কামান দাগার জন্যে দরকারে বিদেশী করিৎকর্মা সব লোক আমদানি করে থাকে আগ্রা। কিন্তু বন্দর সুরাটের ঘের-দেওয়াল কেন মাটি দিয়ে তৈরি? মান্ডবী আর তাপ্তির মোহনা দিয়ে ঢুকে জাহাজ থেকে যদি দুশমন গোলা দাগে—তো ঘের-দেওয়াল পলকে ধসে পড়বে।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে দেখলো, সাধারণ বাসিন্দাদের বাড়িগুলো গোলাবাড়ির মতো দেখতে। নিছক নলখাগড়া দিয়ে গড়া। ফাঁক ঢাকতে গোবর আর মাটির প্রলেপ।

সারা শহরে ন'দশখানি ভালোমত তৈরি কোঠাবাড়ি। তার ভেতর দু'তিনখানির মালিক খোদ শাহবন্দর। তাই তো বললো সেপাইরা। বাকিগুলো মুসলমান সওদাগরদের। ইংলিশস্তানি, ওলন্দাজ কুঠি সে তুলনায় খারাপ নয়! তবে সবই ভাড়া। বাদশা শাহজাহান নিজের ঘরবাড়ি বানানোর সুযোগ কোনো বিদেশীকে নাকি দেন না। বাদশাটি খুব হুঁশিয়ার। তাঁর নাকি আশংকা, ঘরবাড়ি বানাতে থাকলে বিদেশীরা শেষ পর্যন্ত সেসব কেল্লা করে ফেলবে।

সুন্দর একটি গির্জার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। চ্যাপলেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালেন। পা অব্দি ঢাকা সাদা আলখাল্লা। তাঁর ডান হাতে একটি বাতিদান। তোমরা?

—ফাদার হাইনরিশ রথ আছেন?

—ওঃ! বুঝেছি। হাইনরিশ তো শাহজাদা দারাশুকোর ডাক পেয়ে রাজধানী আগ্রায় গেছেন। যাবার সময়—তোমাদের কথা আমায় বলে গিয়েছেন। আমিই চ্যাপলেন—হেনরি লর্ড। তোমরা ভেতরে এসো। যা আছে ভাগ করে খাবে—

ট্যাভার্নিয়ার বললো, সিরাজ থেকে কাপতান আঁতোয়ান চিঠি দিয়েছিলেন—

হ্যাঁ। রথ বলেছেন—তোমাদের কথা জানিয়ে লেখা চিঠি তিনি পেয়েছেন। ভেতরে এসো তোমরা—

ভেতরে ঢুকে ট্যাভারনিয়ার দেখলো, ভালো পোক্ত করেই সাজানো। কাঠের একটি যীশুমূর্তি কাঠেরই দেওয়ালে লটকানো। তার নিচে উপাসনা বেদী।

রাতের খাবারের আগেই দানিয়েল ঢুলছিল। ট্যাভারনিয়ার সবসময় টগবগ করে ফুটছে। চ্যাপলেন হেনরি লর্ড বলছিলেন, যীশুতে বিশ্বাসী বিদেশী ব্যাপারীরা কেউ কেউ রোজ নোবেল, ডুকাট দিয়ে যায়। তাই জমিয়ে জমিয়ে এই গির্জার পত্তন।

ট্যাভারনিয়ার জানে, গোলাপ খোদাই করা সোনার মোহর—রোজ নোবেলের কদর সর্বত্র। সিরাজ, বন্দর আব্বাস, তুসকানি—সব জায়গাতেই সে দেখেছে—গোলাপ খোদাই করা রোজ নোবেলের জন্যে কাড়াকাড়ি। সে বললো, রোজ নোবেল কি এদেশে চলে?

—নাঃ। পোদ্দার বা সরাফদের কাছে নিয়ে গিয়ে আমরা ওসব বদলে শাহজাহানি মোহর নিয়ে থাকি।

—পোদ্দাররা তো কিছু কেটে রাখে—

—তা রাখে। নানা বাহানায় কিছু ওরা কেটে রাখবেই। কিন্তু তুমি তো এই প্রথম হিন্দুস্থানে পা রাখলে। তুমি এসব জানলে কোত্থেকে?

—দরিয়ায় কিছু চাপা থাকে না। এক বন্দরের কথা আরেক বন্দরে চাউর হয়ে যায় ফাদার। তা ফাদার হাইনরিশ রথকে শাহজাদা তলব করেছেন কেন?

—হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা বলে কথা। তিনি ডাকলে তো যেতেই হবে। তবে শাহজাদা দারাশুকো একজন বড় দরের ঈশ্বর-জিজ্ঞাসু মানুষ। অন্যের কথা শান্ত হয়ে শোনেন। বিশেষ কোনো গোঁড়ামি নেই—

—তিনি মুসলমান?

—হ্যাঁ। ইমানদার খাঁটি মুসলমান। ধর্মভীরু মানুষ।

আজই হিন্দুস্থানে পা রেখেছে ট্যাভারনিয়ার। সে একসঙ্গে অনেক কিছু জানার জন্যে রীতিমত অস্থির হয়ে পড়েছে। যেমন, এখানে কি এখন খুব শীত? বরফ পড়ে না তো? খাবার জল কোত্থেকে খাবো? ফুটিয়ে নেবো নিশ্চয়? নুনে জারানো বাছুরের মাংস আমার খুব প্রিয়। কোথায় কোথায় পেতে পারি? রাতে রাতে আগ্রার দিকে এগোবো—আর দিনে ঘুমিয়ে নেবো। এটাই ঠিক? না, দিনে হেঁটে রাতে ঘুমিয়ে নেবো?

কিন্তু এসব কথা কিছুই বলার সুযোগ পেল না ট্যাভারনিয়ার। চ্যাপলেন হেনরি লর্ডের বয়স হয়েছে। কথা বলেন বড্ড ধীরে-সুস্থে। দু'কথার ভেতর অনেকটা ফাঁক। আর সেসব কথাও ওঁর দাড়ির জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছিল। বাতিদানের শিখাটি নিভু নিভু। গির্জার মেঝে কাঠের। তার ওপর দিয়ে খেড়ে ইঁদুর অবিরাম যাতায়াত করে চলেছে। দানিয়েল ঢুলে পড়ে পড়ে। খাবার যে কখন দেবে? কালই ভোরে কেনাকাটা করে খাবার-দাবার গোছাতে হবে। ছবি আঁকিয়ে ছেলেটি ভালো রাঁধতেও জানে। দেখাই যাক।

এর ভেতর শোনা গেল, চ্যাপলেন হেনরি লর্ড বলছেন, তোমরা যেন দুষ্টুমি কোরো না। এক ইংলিশস্তানি কাপতান শুয়োর ছানার রোস্টের ভেতর ইংল্যান্ডের শাহ জেমসের জ্যাকোবাস মোহর গুঁজে নিয়ে দিব্যি মাণ্ডিতে গিয়ে বেচে দিতে পেরেছে। শাহবন্দর তো শুয়োর ছোঁবেন না। শুয়োর ওদের কাছে হারাম। যাক গিয়ে—ওসব দুষ্টুমিতে তোমরা যেও না কিন্তু।

বাধ্য বালকের মতোই ট্যাভারনিয়ার ঘাড় নেড়ে বললো, না না ওসবে আমরা নেই। আপনি আছেন তো দেখবেন—

সুরাট একেবারে জলের গায়ে। মাণ্ডবী আর তাপ্তির গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গড়ে ওঠা জাহাজি বস্তির কোথাও আলো নেই। কিন্তু এই রাতে গির্জা ঘরের পাটাতনে বিছানা বিছিয়ে শোওয়া ট্যাভারনিয়ার চোখ বুজতে পারছিল না। বড় কালো দরিয়া এখান থেকে আরও দু'ক্রোশ। কিন্তু সেখানকার শোঁ শোঁ সবসময় কানে আসে। বাতাস ভিজে। কেননা বড় দরিয়ার ঢেউগুঁড়ো বাতাসে ভেসে ভেসে বহুদূরে চলে যায়। জাহাজি বস্তি থেকে এক আজিব আওয়াজ আসছে। যেন অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলছে। কেউ কারও কথা শুনছে না।

বিছানায় উঠে বসলো ট্যাভারনিয়ার। সে এখন এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে এসে পড়েছে। কিছুতেই সে ক্লান্ত হয় না। যা-ই খায় যেখানে—সবই হজম। দানিয়েল বলে, দাদা—তোমার পেটের ভেতর একটা বেবুনের লিভার আছে। নয়তো অ্যাতো হজম হয় কী করে? আর ডাক্তার বলে—উঁহু। ওই পেটের ভেতর রয়েছে আস্ত একটা কুণ্ড—যার জলে পাথরও হজম হয়ে যায়।

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখলো ট্যাভারনিয়ার। দানিয়েল আর ওরা দু'জন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নল খাগড়া ও মাটি চাপানো দেওয়াল কেটে জানলা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো ট্যাভারনিয়ার। অন্ধকারে বাইরেটা বোঝা যায় না। কাল ভোরে সূর্যের আলোয় সারা হিন্দুস্থান আমার সামনে খুলে যাবে। মগজ, ঘুরে বেড়ানোর দু'খানা পা—আর খিদে নিয়ে আমি যীশুর বানানো দুনিয়ায় চরে বেড়াচ্ছি। এখানে আমাকে ভাগ্য ছিনিয়ে নিতে হবে। যেমন দেখছি দেশ—তেমনই গড়ে তুলছি ভাগ্য। একই সঙ্গে। জীবনটা যে কী সুন্দর। এখানে খিদে পায়। সেই খিদের মুখে যে-খাবারই মুখে পড়ে—তাই-ই খুব স্বাদু লাগে। এ কি খুব কম কথা! এটাই তো একটা আনন্দ।

সামনে অনেক কাজ। এখানকার পোশাক অভ্যেস করতে হবে। শিখতে হবে হিন্দুস্থানের ভাষা। না শিখলে তো হিন্দুস্থানের কিছুই বুঝতে পারবো না। জানা দরকার এদেশের খাবারে মশল্লার কেরামতিটা কেমন। শুনতে হবে এখানকার গান। দেখবো মেয়েদের নাচ। আর তারাই বা দেখতে কেমন—তাও তো দেখা দরকার। ট্যাভারনিয়ারের মনে হলো—তার সামনে অন্ধকারের ভেতর হিন্দুস্থান নাকে এক বিরাট জাদুকরের ঝোলা পড়ে রয়েছে। তার ভেতরে অজানা সব খেলা, খেলার প্রতিভা লুকিয়ে আছে। কিসে করে মানুষ লম্বা পথ পাড়ি দেয়? হাতি তো সবাই পুষতে পারে না। নদীতে না হয় নৌকো আছে। কিন্তু ডাঙায়? কত কী যে জানার আছে।

কাপতান আঁতোয়ানের জাহাজে করে হরমুজ থেকে পশ্চিমী বাতাসে পাল তুলে দিয়ে সুরাটে আসার পথে অনেক রকমের জাহাজি গপ্প কানে এসেছে ট্যাভারনিয়ারের। ইংলিশস্তানি লশকররা পরচুল মাথায় দিয়ে তার ভেতর জ্যাকোবাস, রোজ নোবেল, ডুকাট মোহর লুকিয়ে আনছে। এক সওদাগর তো জাহাজের সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা বাক্স জলের নিচে ডুবিয়ে দিলো। তা ছিল প্রবালে ভর্তি। শাহী ক্রোরিরা ও বাক্সের খোঁজ পেল না। সওদাগর সময়মত বাক্সটি সুরাটে ডাঙায় তুললো। কিন্তু ক'দিন ধরে জলে ডুবিয়ে রাখায় প্রবালে দাগ পড়ে যায়। সওদাগর সে-প্রবাল কম দামে বেচতে বাধ্য হয়েছিল।

কাপতান আঁতোয়ান বারবার বলে দিয়েছেন—সরাফ বা পোদ্দারের হাতে পোড়ো না। যে মোহরই ওদের কাছে নিয়ে যাও—তা পুড়িয়ে যাচাই করার পর খানিকটা কেটে রাখবেই। নেবার সময় ওরা চাইবে শাহজাহানি মোহর—কিন্তু দেবার সময় দেবে জাহাঙ্গিরি কিংবা আকবরি মোহর। অন্ধকার আবছা সুরাট বন্দরের দিকে তাকিয়ে ট্যাভারনিয়ার মনে মনে বললো, কাপ কিংবা প্লেট—নয়তো ফুলদানির আকারেই সোনা বা রুপো এদেশে নিয়ে আসা সবচেয়ে লাভের দেখছি। ওসব তখন সহজেই বাটে করে নেওয়া যায়। বিদেশী মোহরকে এদেশী মোহর করে নেওয়ার খরচটা তাহলে বাঁচে। তাছাড়া কোনো করও তখন দিতে হয় না।

অনেক ভেবে ট্যাভারনিয়ারের একটা কথা মনে হলো। আরও আশ্চর্য—সে দেখেছে—যখন একা একা অন্ধকার রাতে সে ভাবে—তখন অদ্ভুত অদ্ভুত নতুন সব লাভের রাস্তা সে পেয়ে যায়। এই যেমন—এখনই সে বুঝতে পারলো তৈরি মোহর নিয়ে হিন্দুস্থানে ঢুকতে হলে রোজ নোবেল, পুরনো জ্যাকোবাস, আলবার্টাস নিয়ে ঢোকাই ভালো। একশো দেড়শো বছর আগের পর্তুগিজ কিংবা স্প্যানিশ মোহরও নেওয়া যেতে পারে সঙ্গে। তাতে কিছু না কিছু লাভের মুখ দেখা যায় সবসময়। জার্মানি, পোলান্ড, হাঙ্গেরি, সুইডেন, ডেনমার্কের ডুকাট নিয়েও হিন্দুস্থানে ঢুকে লাভ আছে। আগে নাকি ভেনিসের সোনার ডুকাট হিন্দুস্থানে খুব কদর পেতো। তাই বলছিলেন কাপতান আঁতোয়ান। আমাদের ফ্রানসিসি ফ্রাংক হিন্দুস্থানে অন্য সব ডুকাটের চেয়ে চার পাঁচ সোল বেশি দর পেতো। মনে মনে হিসেব করলো ট্যাভারনিয়ার। সারা দুনিয়ার মোহর, ফ্রাংক, পাউন্ড-এর দরদাম পলকে করে ফেলতে পারে সে। ফ্রানসিসি পাঁচ সোল মানে ইংলিশস্তানি সাড়ে চার ফার্দিং। আসার পথে বন্দর আব্বাসে ট্যাভারনিয়ার দেখেছে—আরবি ঘোড়ার ব্যাপারীরা, কায়রোর গ্র্যান্ড সেনিয়র ওরা নিয়ে থাকে।

আজই রাতে খেতে বসে ফাদার হেনরি লর্ডের সঙ্গে খাবার টেবিলে খানিক আগে কথা হচ্ছিল। এদেশকে জানতে হলে হিন্দুস্থানের ভাষা লিখতে হবে। বহু ভাষার দেশ এই হিন্দুস্থান। অন্তত দেহাতি হিন্দি না জানলে এদেশের কিছুই জানা বা বোঝা যাবে না। যতক্ষণ না ভাষায় দখল হচ্ছে—ততদিনের জন্যে চাই একজন তুখোড় দোভাষী।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ট্যাভারনিয়ার গির্জার দরজা খুলে রাস্তায় এসে

দাঁড়ালো। দূরে মাণ্ডবীর বুকে দাঁড় করানো একটি জাহাজ থেকে বাজনার সুর ভেসে আসছে। আলোয় ঝলমলে ভাসন্তজাহাজ দেখতে অনেকটা অন্ধকারের ভেতর আচমকা কোনো নগরী। অন্ধকারের ভেতর সুন্দর সব কণ্ঠস্বর। কোনো মানুষ কিন্তু দেখা যায় না।

আজই হিন্দুস্থানে আমার প্রথম রাত। এদেশের রাজধানী আগ্রায় দুনিয়ার ভেতর সবচেয়ে ভাগদী মুঘলশাহী একশো বছরের ওপর রাজ্যপাট করে চলেছে। প্যারিসে থাকতেই এসব আমি শুনেছি। বাবার কাছে কত রকমের মানুষ আসতেন। তাদেরই কারও মুখে শুনে থাকবো। আমি কি কোনোদিন আগ্রায় গিয়ে বাদশার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ করতে পারবো? সে ভাগ্য কি আমার হবে?

অন্ধকার আকাশে ক্ষয়া চাঁদ। কুয়াশার ভেতর জাহাজের মাস্তুলের আভাস। এদেশের সোনারুপো—এদেশের রেশমের কথা প্যারিসের বাজারে—লন্ডনের বাজারে কান পাতলে শোনা যায়। আমি কবে—কখন সেসবের মাঝখানে গিয়ে পড়বো জানি না।

ট্যাভারনিয়ার সারা ইউরোপের বাজারে বাজারে ঘুরে দেখেছে—হিন্দুস্থানের একই কাপড় কেমন ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে এক এক বাজার মাত করে রেখেছে। এমনি সাদাসিধে হিন্দুস্থানি সুতি কাপড় প্যারিস, লন্ডন কেনে। সেই কাপড়েই সোনা রুপোর সুতোর কাজ থাকলে পোলিশ, মস্কোভি ব্যাপারীরা একদম হামলে পড়ে। স্মারনার বন্দরে ট্যাভারনিয়ার শুনে এসেছে এসব কাপড় নিয়ে কারবার করার ঝক্কি পোহাতে পারলে মোটা লাভ আছে। ঝক্কি বলতে—জাহাজে করে নিয়ে যাবার সময় স্যাঁতসেঁতে খোলের ভেতর কাপড়ে দাগ ধরে যাওয়ার ভয় থাকে।

তার চেয়ে আমার হীরে-জহুরতের কারবার অনেক ভালো। লেনদেনে বিরাট কোনো বোঝা বওয়ার নেই। বাইরে থেকে চোর-ডাকাতরা হঠাৎ বুঝতেও পারবে না কী নিয়ে চলেছি। একবার মনে ধরে গেলে খদ্দের যে কোনো দামে আমার জিনিস কিনতে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি এমন করেই হীরা, চুনি, মালা হাজির করি—তার সঙ্গে এমন এমন সব গল্প জুড়ে দিই যাতে কিনা ওসব কেনার জন্যে—পাওয়ার জন্যে খদ্দেরের বুকের ভেতরটা আকুপাকু করতে থাকে। আমার চাই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত খদ্দের। যেখানে বসে হীরের বাক্স খুলবো—সেখানে আলো থাকা চাই যথেষ্ট। যাতে কিনা নানান দিক থেকে হীরেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালে নানান ভাবে ঝিলিক দিয়ে উঠবে।

রাত এখনো কতটা বাকি? রোজ সকালে আমার মনে হয়—এ দুনিয়া একদম আনকোরা। এইমাত্র তৈরি হলো। আমার দাড়ির ভেতর দিয়ে উত্তরের বাতাস যখন বয়ে যায়—দাড়ি খানিকটা যখন সেদিকে হেলে যায়—চোখের কোণে আমি তখন সেই বাতাসের ছোঁয়া টের পাই। তখন আমার খিদে পেতে শুরু করে। কী খাবো তখনই ভাবতে শুরু করি। সেই সেই জিনিস খাওয়ার সময় মুখের ভেতরটা স্বাদু হয়ে ওঠে। যে দেশে যেমন তরল গলা ভেজাতে পাই—

তাই-ই আমার ভালো লাগে—তাতে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে এই দুনিয়ার বুকে নিত্য নতুন রাস্তা পেয়ে যাই হাঁটার—হেঁটে দেখার—দেখতে দেখতে চোখের খিদে মেটে—বুকের ভেতরকার তৃষ্ণাও মেটে।

গির্জার ঘরে ফিরে আসার মুখে ট্যাভারনিয়ার নিজের মনে মনে একটা সত্যের খোঁজ পেল। মনে মনেই সে বলে উঠলো—প্রাণ মানেই অভিযান। অভিযান ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে? খিদে, রক্তের যাতায়াত, চোখের দেখা—দেখার জন্যে অনেকটা হেঁটে যাওয়া—অনেক পথ ভাঙা—এসবই তো অভিযানের সঙ্গে জড়ানো। সেই অভিযানই প্রাণ। আমি প্রাণ ছাড়া থাকতে পারি না।

॥ আটাশ ॥

পর্তুগালে এখন শাহ্ জন। ফ্রানসিসি দেশে বাদশা এখন লুই। ইংলিশস্তানি শাহ্ চার্লস। আর এখন হিন্দুস্থানে মুঘলশাহীর বাদশা হলেন গিয়ে শাহজাহান। পাশেই ইস্পাহানের শাহী চালাচ্ছেন সফাবি খানদান। এইসব দেশের ইলচিমশাইরা আগ্রায় বাদশাকে কুর্নিশ করতে এসে হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম জাহানারা শাহজাদীকে তসলিম জানিয়ে যান। তখন তাঁর মবারকে পর্তুগিজ পিস্তলের কার্তুজের মালা নজর পড়ে। বাদশা-বেগম পাখি শিকারে বেরিয়ে যদি ব্যবহার করেন।

আজ শীত শেষের এই বিকেলবেলায় শাহজাদী জাহানারা নিজের শাহী জামদারখানার সামনে বসেছেন। সেখানে সোনার সুতোয় বসানো চুনীর কাজ করা সব আঙ্গিয়া ঝুলছে। তাদের সঙ্গে রং মিলিয়ে ডোরির বহর। কোনোটা মখমলের। কোনোটা বা রেশমের। এর পাশেই সাদা মর্মরের তাকে নজরে পাওয়া জিনিসপত্তর সারি সারি সাজানো। একটাও নিজের হাতে তুলে দেখছেন না জাহানারা। তাঁর পায়ের কাছে বসা হাজিরা—কোয়েল নামে বাঁদিটি একটা একটা করে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরছে—দেখা হয়ে গেলে জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিচ্ছে কোয়েল।

পর্তুগিজ পিস্তলের কার্তুজের মালা যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে পয়লা দিন থেকে। শাহজাদী জাহানারা পাখি শিকার দেখতে পারেন না। ওসব তাঁর বরদাস্ত হয় না। পড়ে আছে ফ্রানসিসি আতর—শাহ্ চার্লসের পাঠানো দু'দিকই ধারালো সমশের—যা কিনা মুখোমুখি লড়াইয়ে হাতে থাকলে খুবই ভালো। এ সবই এখন জাহানারার অন্দরমহলের শোভা। ওর কোনোটিতেই কোনো আগ্রহ নেই শাহজাদীর।

বরং জামদারখানার নিচের দিকে একটি কাঁচুলিতে চোখ আটকে গেল শাহজাদীর। যেন নিজেকে লুকিয়ে সেদিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন। আর পাঁচটি কাঁচুলির চেয়ে এটি কিছু ভিন্ন। ওটা অমনই পড়ে থাকে। পরা আর হয়ে ওঠে না জাহানারার।

সোনালি কাঁচুলির সামনেটা লাল রেশমে তৈরি। তাতে কাঁচুলির ফাঁপানো

সরু হয়ে আসা দুই মুখ ঘিরে চাঁদের মতো গোল করে বসানো পদ্মরাগ মণি, মুক্তো, হীরে আর প্রবাল। সেদিকে তাকিয়ে লজ্জায় জাহানারা বারবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলেন। অথচ এখানে দেখে লজ্জা পাওয়ার মতো কোনো ইনসান এখন নেই। তবু চোখ তুলতে পারছিলেন না শাহজাদী।

বিজাপুর হামলায় শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ফৌজি অভিযানের সামিল বুন্দেলার রাজা ছত্রশাল। তিনিই দক্ষিণ থেকে এই কাঁচুলি পাঠিয়েছেন শাহজাদীকে।

এ ঠিক ছত্রশালের শাহজাদীকে তসলিম জানানো বা নজর পেশ করা নয়। এ কাঁচুলি একজনের আরেকজনকে সমানে সমানে উপহার পাঠানো। এই উপহার পেয়ে—আমি জাহানারা বেগম—হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদী—যাঁর হাতের একটি আঙুলের বাতাস কেটে ফিরতে না ফিরতেই সুবেদারের সুবেদারি যায়—ছত্রশালকে চিঠি লিখেছি : যদি হাতির দাঁতে খোদাই করিয়ে আপনার ছবি পাঠান তো খুব খুশি হবো।

বাদশাহ শাহজাহানও জানলেন, তাঁর শাহজাদী তাঁর সেরা রাজপুত বন্ধুরাজাকে চিঠি পাঠাচ্ছে। আব্বা হুজুরও লিখলেন একখানি দরকারি চিঠি। দু'খানি চিঠি একসঙ্গে কাসীদের হাত দিয়ে আওরঙ্গজেবের শিবিরে পাঠানো হলো। কাসীদকে অবশ্য ফকিরের জালসাজিস নিতে হয়েছে। পাছে চিঠি দু'খানি আওরঙ্গজেবের হাতে পড়ে—তাই। কারণ, বাদশা চাননি তাঁর চিঠি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের হাতে পড়ে। শাহজাদী জাহানারা চেয়েছেন—তাঁর চিঠি শুধু ছত্রশালই দেখুন।

কিন্তু সে চিঠির জবাব তো এলো না আজও। তবে কি কিছু হলো? একটি চিন্তাই সবসময় আমার মন ছেয়ে আছে। দক্ষিণে লড়াই-হামলা তো শেষ। আগ্রার পায়ে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর তো মাথা নুইয়েছে। এখন তামাম হিন্দুস্থানে বাদশা শাহজাহানের বিরুদ্ধে এমন একটি সুবা, তালুক, সরকার বা মহাল নেই—যে কিনা মাথা তুলে দাঁড়াবে। তবে কেন লড়াইয়ের শেষে তিনি এলেন না? ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মাথায় তিনি ভেসে উঠছেন না কেন? সবার আগে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আমাকে এখানে দেখতে পাবেন। আমায় তিনি সওগাত জানাবেন। কিন্তু এসব তো হচ্ছে না। আমি আর কি তাঁর হাত ছুঁতে পারবো না?

জাহানারা গলা থেকে মুক্তোমালা খুলে ফেললেন। তারপর হাজিরা কোয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা কোয়েল—এই মালা নিয়ে গিয়ে হওচৌকিতে দাঁড়িয়ে থাক।

—হুকুমে-মালকিন! একথা কেন? কী জন্যে গিয়ে দাঁড়াবো?

—নর্মদার ওপার থেকে চিঠি নিয়ে যদি ফিরে থাকে কাসীদ—তবে তাকে এই মুক্তোমালা দিবি।

—ও মা! সে কি কথা? কেন?

—যদি সেই চিঠি এসে থাকে তো—

—একখানা চিঠি এসে পড়ে আছে তো। মালকিন—

—বলিসনি কেন ? কোথায় ? কখন এলো ?

—কাল সন্ধেবেলা কাসীদ এসে দিয়ে গেল। আপনি তখন দেওয়ানখানায় উজির জাফর খাঁয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কাউকে সেখানে যেতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। চিঠিখানা রেখেছি—আতরদানির পাশে—গুলদস্তার নিচে—। নিয়ে আসি ?

—না। তুই থাক। আমিই নিয়ে দেখছি।

কোয়েল দেখলো, শাহজাদী যেন পায়ে কোনো গায়েবী ঘুঙুর পরে আছেন। তারই বোল তুলে ঢাকা অলিন্দের দিকে ছুটে গেলেন। সাদা চোখে সে ঘুঙুর দেখা যায় না।

ছুটে যেতে যেতে জাহানারার মনে পড়লো, ছত্রশালের হাসির ভেতর সবসময় একটি শিশু যেন হাসছে। আমার রাজা। তুমি কাঁচুলির সংগে পাঠানো আগের চিঠিতে আমায় লিখেছিলে—'দেবী'। তুমি লিখেছিলে—আমি সংযুক্তা হলে তুমি পৃথ্বীরাজ হয়ে কনৌজে অভিযান চালাতে। আজ সারা দুনিয়া আমার কাছে একটি বড় গোলাপ।

গুলদস্তা সরিয়ে চিঠিখানি খুলে ফেললেন জাহানারা। হাতের লেখা যেন কেমন কাঁপা কাঁপা। শাহজাদীর মাথার ভেতর যেন পটাং করে রবাবের সব ক'টি তার একসংগে ছিঁড়ে গেল। হিমালয় কি তার জায়গা বদলালো ? সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। চিঠিখানি খুব ছোট আর তার সুরে হিম ঠাণ্ডা। জাহানারার বুকের ভেতর ধুকপুকি থেমে গেল। চিঠির শেষে লেখা—

মুঘল শাহজাদীর তসবিরদানে কোনো চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না।

শাহজাদীর সব আনন্দ পলকে খাক হয়ে জ্বলে গেল। কারো কাছে আমার কোনো নিন্দামন্দ শুনেছেন না কি ? শুনে থাকলে কেন তিনি সেই নিন্দায় বিশ্বাস করেছেন ? আমার রাজা ! আমার বাদশা ! যদি হাজার সাধু এসে আমায় বলতো—তোমার নামে—আমি বিশ্বাস করতাম না কিছুই—যতক্ষণ না তোমার মুখে শুনতাম সে কথা।

আওরঙ্গজেব কিছু বলেছে ? রৌশনআরা ? ওরা দারাকে দেখতে পারে না। তাই আমাকেও দেখতে পারে না। আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা—চৌহান খানদান। বুন্দির এই খানদানে হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সেরা বীর পয়দা হয়ে থাকে। তোমার নামে কোনো কলঙ্ক নেই। তোমার চোখের আলোয় সব আপদ দূর হয়ে যায়।

নিজের মনকে একটার পর একটা কথা জিজ্ঞেসা করে চলেছেন জাহানারা বেগম। কোনো জবাব নেই। ডানহাতের খানিকটা আনমনা হয়ে কামড়ে ধরলেন। রাত আসছে। আমার মহলে একটার পর একটা দীপ জ্বলে উঠলো। উঃ। কী কষ্ট। বাঁশি, বীণা, করতালের রোল। চেঁচিয়ে উঠলাম, এই ! কে কোথায় আছো ? জলদে বাজাও।

আমার অজান্তে ফিরোজ শার নালার কাছে এসে পড়েছি। দিল্লির সেরা গাইয়ে যাচ্ছিলেন। কোয়েলকে বললাম, যাও। থামাও ওঁকে—

গায়ক ফিরোজ শার নালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে সম্ভ্রম।

কোয়েলকে বললাম, যা। দরবারি আঙ্গিয়া এনে দে—

গায়ক তো তটস্থ। মনে মনে বলি—এ আঙ্গিয়া তাঁর জন্যে রেখেছিলাম। সে তো বুঝলো না। গায়ক। তুমি এখন সেই আঙ্গিয়া গায়ে দাও। নইলে আমি এ অপমান সহ্য করতে পারবো না। আমি আর ভাবতে পারছি না। দুনিয়ার নিঃশ্বাস কী গরম।

গায়ক তো দরবারি আঙ্গিয়া গায়ে চড়িয়ে গলে পড়েন আর কি। ছ'জন ঘোড়সওয়ার—ছ'জন পায়দল সেপাই দিলাম তাঁকে—আমার তাঁবের হিসেব থেকে। কোয়েলই আমার হুকুম মতো সব করে দিলো। পতাকা উড়িয়ে তিনি দরবারের দিকে চললেন।

আলন্দে দাঁড়িয়ে শাহজাদী দেখতে পেলেন, পথে গায়কের সঙ্গে দেখা হলো—দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার সময়কার মনসবদার মহাবত খানের সঙ্গে। মহাবত রানা প্রতাপের ভাইপো—নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল নিজেরই খানদানের বিরুদ্ধে।

মহাবত খানও দরবারের দিকে চলেছেন। শাহজাদী দূর থেকে দেখতে পেলেন, মহাবতের ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে গায়কের ঘোড়সওয়ারদের জোর ঝগড়া বেধে গেছে।

আমি জানি—সাবেক মনসবদার মহাবত খান শাহজাদা দারার ওপর খুশি নন। আমি এগিয়ে গেলাম। গায়কের সঙ্গী ঘোড়সওয়ার? তাঁর হাতে পতাকা! এবার আমি মহাবত খানের কোপে পড়লাম।

আমি পা টিপে টিপে দেওয়ান-ই-খাসের পেছন দিককার ঝরোকায় এসে মুখ ঠেকিয়ে বসে পড়লাম। আমার চোখ দরবারে। ওই তো বাদশা শাহজাহান হিন্দুস্থানের মসনদে বসে আছেন।

মহাবত খান দরবারে ঢুকলেন। বয়সের ভারে কিছু নুয়ে পড়লেন। জাহাঙ্গিরী আমলের মনসবদার। চোখের গাঢ় সুরমা মুখের দুধসাদা দাড়ির ভেতর ঝকঝক করে উঠলো। সঙ্গে কোনো পতাকা নেই তাঁর।

বাদশা শাহজাহান চমকে উঠলেন, এ কি? আপনার পতাকা কোথায়?

কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মহাবত খান। তারপর বললেন, জাঁহাপনা—পতাকার তো কোনো দরকার দেখি না।

এ কথায় বাদশা আরও অবাক হলেন। কেন? কেন একথা বলছেন?

মহাবত খান একগাল হেসে বললেন, হজরত! একজন গায়ক পতাকা নিয়ে এই শাহী দরবারে ঢোকার অধিকার পেয়েছে। এরপর আমির, মনসবদারদের কি পতাকার আর দরকার থাকতে পারে!

শাহজাদী জাহানারা মনে মনে ফুঁসে উঠলেন। মনে মনেই গজরাতে গজরাতে বললেন, গায়ক ফেলনা নন। তাঁরও পতাকা থাকা দরকার। ওরে মূর্খ!

আমিরি, মনসবদারি দুনিয়ার সেরা কাজ নয়। ওসব জুটে যায় জঙ্গবাজি তোয়াজদারির দৌলতে। কিন্তু খোদার আলো না পেলে গায়ক, তসবিরদার হওয়া ঘটে ওঠে না। মুঘলশাহীতে একথা বুঝতেন শুধু একজন। তিনি পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা। এখন একথা কে বুঝবে।

শাহজাদী দেখলেন, আব্বা হুজুরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তিনি ইঙ্গিতে মহাবত খানকে বসতে বললেন। তারপর খুব চাপা হিসহিসে গলায় স্পষ্ট করে বললেন, গায়কের পতাকারও দরকার নেই—

জাহানারা বুঝলেন, দরবারে দুশমন একজন বাড়লো। নসিব। আওরঙ্গজেবের দিকেই যে বেশিরভাগ লোক দোস্ত হয়ে চলে পড়ছে। উঃ। এই যে একজন দুশমন বাড়ালাম—এ তো আমারই কেরামতি। দোস্ত তো বাড়াতে পারছি না। শাহজাদা দারা ঘাড় উঁচু করে চলা মানুষ। সে জায়গামত সিন্নি চড়াতে জানে না। তার মুখের কাটা কাটা শ্লেষ কাউকে রেয়াত করে না। অনেক মানী—দামি দরবারি মানুষ তাই আজ দারার ওপর মহা খাপ্পা।

আব্বা হুজুর বলে চলেছেন। তাঁর ডান হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি এই মাত্র বললেন, একজন সামান্য গাইয়ে—তার কি দরকার পতাকা আর ঘোড়সওয়ারে? একজন আমির কি মনসবদার—কিংবা সুবেদার বা সিপাহ-সালার যখন যান—মানুষ পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু দিল্লির গায়কের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে?

শাহজাদী জাহানারা দেওয়ান-ই-খাসের ঝরোকা থেকে সরে এলেন। তিনি কোথায় যাবেন? কোথায় গেলে মনের একটা আশ্রয় পাবেন তা ঠিক করতে পারলেন না। আব্বা হুজুরের শেষ কথাটিতে তাঁর মাথা নুয়ে পড়েছে। পথের ভিখারিনীর মতো নিজেকে লুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে হলো। নূরজাহান কিংবা তাজ বেগমের মতোই আমি মুঘলশাহীকে শাসনে রাখতে পারতাম। কিন্তু রাম কিংবা নলরাজার মতো আমার তো কোনো খসম নেই। আমার ছিল ছত্রশাল। তাঁর সুরেলা গলা, হাসি—সবই ছিল হিন্দুস্থানের এই বাদশা-বেগমের চাপা আলো—দীপ্তি। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন শাহজাদী। খোলা অলিন্দ জাঁকানো শীত আর অন্ধকারে মুছে গেছে। তাঁর সামান-খিলানের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন জাহানারা। তাঁর চোখের সামনের আঁধারে যমুনাও হারিয়ে গেছে। অভিমানে তাঁর চিন্তার জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কণ্টে অভিমানে—আজ যদি গাইয়েকে দুনিয়ার চোখে খাতিরদারি করতে না যেতাম—খসে পড়া ওড়না অন্ধকারে আন্দাজে তুলে নিলেন শাহজাদী।

নিচে আলো দেখে বুঝলেন, মহতব বাগের মালাকার দিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরছে। তার বেগম আজ তার পহেলা আওলাদের খোয়াব দেখে মা হয়েছে। কী আনন্দ আজ এই আওরতের। এই আনপড় সামান্য আওরতেরও একটি শাহী আছে। সেই শাহীতে আছে অজস্র ফুলফল। আছে তার পিয়ারি খসম। অথচ বাদশা-বেগমের ভার বয়েও আমি কতটা বদনসিব আওরত। জাহানারার চোখ দিয়ে অবাধে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোয়েল কাছে থাকলে ছুটে

এসে মুছিয়ে দিতো।

বিরাট দরিয়ার নিচে শুক্তি-মুক্তোর নিঃশব্দ গানের মতোই একটা শব্দ যেন শাহজাদীর কানে এসে পেঁছিলো। এ গান যেন দুনিয়া শুরু হওয়ার দিনকার গান। জাহানারার মনে হলো তারা খোদাই নীলা আসমান তাঁর বিয়ের বাসরের চাঁদোয়া। চোখে দেখা যায় না—এমন বর এলেন। হাওয়া এসে জাহানারাকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে গেল—ওগো। তোমার সে আসছে।

খোলা অলিন্দের সামানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেম জাহানারা। ঘুম একবার আসে। আবার ফিরে যায়। এ এক অসহ্য অবস্থা। সত্যিই চৌহান খানদানের সেরা বীর—বুন্দেলা রাজ ছত্রশাল আমায় ভুলে গেলেন? আমায় তিনি ত্যাগ করেছেন? তিনি তো আমায় তাঁর সংযুক্তা বলে ডেকেছিলেন। তাহলে ওকথা তিনি লিখলেন কেন?

উঃ। কোথায় গেলে শান্তি পাই? একদিকে অভিমান। আরেকদিকে অপমান। এ দুই জিনিস কখনো পাশাপাশি থাকতে পারে না। আমার রাজা! ওকথা তুমি লিখলে কেন? সত্যিই কি তুমিই লিখেছো? না, লেখার সময় অন্য কিছু কিংবা অন্য কেউ তোমার ওপর ভর করেছিল?

মুঘল শাহজাদীর তসবিরদানে কোনো চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না।

উঃ! বলে মাথা তুললেন জাহানারা। দূরে যমুনার ওপারে আলোর ভেতর আধখানা তাজমহল দাঁড়িয়ে। আমার আব্বা হুজুরের ভালোবাসার সৌধ। যেন আমাকে দেখেই হাসছে সেই সৌধ। কোথায় যাই?

জাহানারা ছুটতে ছুটতে শাহজাদা দারার মহলের দিকে চললেন। দারামহল মহতব বাগের বাঁয়ে। একটা ঢাকাপথ পেরলেই দারামহল। মহতব বাগ থেকে মাকরান পাথরের তিনটি ধাপ পেরিয়ে যেন এক অন্য দুনিয়ায় চলে এলেন জাহানারা।

দারা! ছোটে ভাই আমার। শাহজাদা দারাশুকো। ফৌজদার-ই-হিসার। কত নামে তুমি আজ লোকের মুখে মুখে ফিরে থাকো। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। আমি কিন্তু মনে মনে তোমায় একটি নামেই ডাকি। তুমি আমার হুজুর। আমি সেই হুজুরে হাজির—মুরিদ মাত্র। তোমার চেলা আমি হুজুর। স্রেফ পয়দায়িসের কারসাজিতে আজ আমি তোমার ব্যজি। নয়তো তুমি সত্যিই তো খোদার পথের ভবঘুরে সালিক। তুমিই আমায় পথ দেখাও দারা। আমি মানুষের ভালোবাসায় বড্ডো ডুবেছিলাম। এবার খোদার রহেম আমার ওপর পড়ুক। আমি তাঁর হয়ে উঠি। সেখানে অভিমান থাকলেও অপমান তো নেই। আমি তোমায় সব উজাড় করে না বলতে পারলে হালকা হবো না ছোটে ভাই।

দারা মহলের দুয়ারে পাহারা থাকলেও তার কোনো কড়াকড়ি নেই। দিব্যি ঢিলেঢালা। ছুটে আসা শাহজাদীকে দেখতে পেয়ে দুই পাহারাই চমকে উঠে দাঁড়ালো।

জাহানারা ভারি চিলমন সরাতেই তাঁর মুখে জোরালো আলো এসে পড়লো।

সেই সঙ্গে চন্দনের খুশবু। দারা এই খুশবুর খুব কদরদার। সারা চত্বর জুড়ে নাস্তালিক-ফারসিতে লেখা কাগজ ছড়ানো। অনেকটা উঁচু সুখদোলায় এক বিদেশী—বেশ বুড়ো সাধুর মুখোমুখি শাহজাদা দারা বসে। দু'জনের কেউই শাহজাদীকে দেখতে পেলেন না। জাহানারা পিছিয়ে আসার সময় এক ঝলকে যা দেখলেন—ঘরের কোণে বড় দোয়াতদানে দারার কলম ডোবানো। পাশেই পাতার পর পাতার থাক। নিশ্চয় সাফিনৎ-উল-আউলিয়া লেখা চলছিল। বাঁ দিকে খোলা অলিন্দ আর শাহজাদার সুখদোলার মাঝামাঝি এক যোগী দিব্যি কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এমন শীতে একদম খালি গা হয়ে মেঝের বনাতের ওপর শুধু পেট রেখে পা আর মাথা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে তুলেছেন। তাঁর চোখ ঘরের অভ্রের আলো পড়ে চকচক করে উঠলো।

জাহানারা পিছিয়ে এলেন। একই মানুষ একই সঙ্গে সর্বশক্তিমানকে ভালোবাসতে যেমন পারে—তেমনই পারে এই দুনিয়ার ধুলোমাটির সামান্য আওরতকেও। ছোটেভাই এক অবিশ্বাস্য কামিল-ই-ইনসান। পূর্ণমানুষ। দারা নাদিরাতে আছে—আবার রানাদিলেও আছে। আবার এরই সঙ্গে সে আল্লাতালাতেও আছে। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের জন্যে অধীর হতে হতে সেই ব্যাকুল দশায় সে তো সর্বশক্তিমানের রাস্তায় ভবঘুরেও হয়ে উঠতে পারে। ভালোবাসা এক আজিব যাদুকাঠি। তার ছোঁয়া মানুষকে সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ন, ধারালো করে—আবার ভাবুক করেও তোলে।

শাহজাদী ঠিক করলেন, আজ তিনি মক্কার দিকে মুখ করে আসন করে বসবেন। মন এক জায়গায় করে তিনি সর্বশক্তিমানের কথা ভাববেন। সেখানে অভিমান নেই। নেই কোনো অপমান।

ফাদার হাইনরিশ রথ বললেন, তাহলে শাহজাদা আপনাকে অনেকদিন আগেকার একটা কথা বলি। তখন আপনার পরদাদা আকবর বাদশার আমল। হিন্দুস্থানের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতেই। আমি মাত্র কয়েক বছর হলো হিন্দুস্থানে এসেছি—বয়সও খুব কম আমার।

দারাশুকো বললেন, আপনার শীত করছে না তো? আগেনগারটা এগিয়ে দেবো?

—তা দেওয়া যেতে পারে। —বলে ফাদার রথ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ও কী করছেন? আপনি হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা। আমার জন্যে আপনি নিজেই আগেনগার টেনে আনছেন যে—

—তাতে আর কী হবে। আপনি তো ঈশ্বরের চেলা। —বলে দারাশুকো ফের ফাদার হাইনরিশ রথের মুখে মুখে বসলেন। রথের কাঁধ চওড়া। গায়ে সাদা আলখাল্লার ওপর সস্তার পশমি দিশি খিরকা চাপানো। দুধ সাদা দাড়ি। মাথাও সেই রংয়ের। ছাই রং দস্তানায় ঢাকা আঙুলগুলো এতই লম্বা যে দেখেই বোঝা যায়—আঙুলের মালিক মানুষটিও খুবই লম্বা।

সাধু সন্ত ফকির দরবেশ পেলেই শাহজাদা দারা নিজের হাতে তাঁদের যতটা পারেন সেবা করতেই ভালোবাসেন। সেটুকু করতে পারলে তাঁর নিজের বুকটা

যেন ভরে ওঠে। তাই দাখিলাদের কাউকে না ডেকে নিজেই তিনি আগেনগারটা টেনে ফাদার রথের কাছাকাছি এনে দিলেন। নিজেই আগেনগার টেনে দেওয়ার আরও একটা কারণ—শাহজাদা যখন মনের মতো মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রিয় বিষয় ধর্মাধর্ম নিয়ে গভীরে কথাবার্তা বলেন—তখন তিনি চান না—আর অন্য কেউ সেখানে এসে হাজির হোক।

ফাদার রথ বললেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এখনো ছবির মতো সব চোখে ভাসছে। আমি বড় জোর চব্বিশ পঁচিশ।

শাহজাদা দারা না বলে পারলেন না, ফারসিতে এমন চোস্ত দখল হলো কী করে?

—দেখুন শাহজাদা, ফারসি আজ দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট এলাকার লেনদেনের ভাষা। বন্দরে বন্দরে ব্যাপারীরা এ ভাষা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়াও ইউরোপের জ্ঞানীগুণীরা ফারসিতে লেখা বইপত্তর নিজেদের ভাষায় তর্জমা করছেন। তাই তাঁদের ফারসি শিখতে হচ্ছে। এর ভেতর আমরা যারা যীশুকে হিন্দুস্থানের দেহাতে নিয়ে যেতে চাই—তাদের কি ফারসি না শিখলে চলে? হিন্দি না জানলে হয়? তাছাড়া হিন্দুস্থানের মানুষজনের কথাবার্তায় ইউরোপের নানান্ ভাষার কিছু কিছু কথা তো ঢুকেই যাচ্ছে। এ জন্যে হিন্দুস্থানে ব্যবসা করতে আসা বিদেশী বণিকদের কোম্পানিগুলোকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কী বলেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শাহজাদা বললেন, হ্যাঁ, ফতেপুর সিক্রিতে—যা বলছিলেন।

—আকবর বাদশা বিদ্যার গৌরবে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মে আজাদি ছিল তাঁর মূলকথা। হিন্দুর তীর্থকর তিনি উঠিয়ে দেন। পার্শিদের সূর্যপুজোয় যথেষ্ট অনুরাগ দেখাতেন বাদশা। গোঁড়া মুসলমানরা সে জন্যে বাদশাকে গোপনে নাস্তিক বলে নিন্দা করতেন।

—এসব কথা সবাই জানেন ফাদার।

—সবাই যা জানেন না—কিংবা ভুলে গেছেন—তাই আমার মুখ থেকে শুনুন শাহজাদা। শুধু হিন্দু বা পার্শি নয়—সব ধর্মশাস্ত্রের সার কথা জানতে আকবর বাদশা ব্যাকুল ছিলেন। পর্তুগিজদের ধর্মের ভাব জানতে তিনি কবি ফৈজিকে নিউ টেস্টামেন্ট খাঁটি ফারসিতে অনুবাদের অনুমতি দেন। পর্তুগিজরা তখন গোয়ার কুঠি থেকে ব্যবসা করছে। সেখানকার ফাদার বড়লকো একোয়া ভিভাকে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে নেমন্তন্ন করে আনালেন। আমরা তো ভাবছি —এই বুঝি বাদশা খৃস্টান হয়ে যাবেন।

এক রাতে ফাদার বড়লকো বাদশার ইবাদতখানায় দর্শন দিলেন। সেখানে তখন ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান, ইহুদি, পার্শি মহা মহা পণ্ডিত হাজির। তাঁরা বলছেন—তাঁর তাঁর নিজের ধর্মই সেরা। তাই নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতাও দিলেন সবাই। যে যাঁর মতো। তারপর শুরু হয়ে গেল পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কাতর্কি। একে অন্যের ধর্মের অনেক দোষও ধরলেন। কিন্তু কেউই

নিজের মতই যে ঠিক—তা প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারলেন না।

মুসলমানেরাই খৃস্ট ধর্মের দোষ ধরলেন বেশি বেশি। আমি শুনেই চলেছি সেদিন। কথা বলিনি। বাদশার মুখ দেখছি বারবার। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেছেন। ফাদার বড়ল্কো তখন বললেন, এইসব লোক আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে মিথ্যা বলছেন। কোরান যদি সত্যিই ঈশ্বরের মুখের কথা হয়ে থাকে—তাতেই যদি ওঁদের বিশ্বাস থাকে—তাহলে এখানে একটি আগুনের কুন্ড জ্বালানো হোক—আমি আমার ধর্মশাস্ত্র হাতে সেই কুন্ডের ওপর দিয়ে হেঁটে আসবো। মুসলমানরাও তাঁদের কোরান হাতে করে সেই কুন্ডের ওপর দিয়ে হেঁটে আসুন। তাহলে কোন্‌টি সত্য সেই অগ্নিপরীক্ষাতেই জানা যাবে।

—তারপর ?

—ফাদারের একথায় মুসলমানরা রাগে অন্ধ হয়ে গেল বলা যায়। তারা ফাদার বড়ল্কোকে যা ইচ্ছে তাই গালাগালি দিতে লাগলো। কিন্তু আর কিছুই করতে পারলো না। আকবর বাদশা তাতে খুবই অসন্তুষ্ট হন।

শাহজাদা দারাশুকোর মনের ভেতর তোলপাড় হচ্ছিল। ধর্ম নিয়ে, মানুষ নিয়ে, মানুষের মানুষী ভালোবাসা নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা অনেক। কিন্তু মনের ভেতরটা গোছানো নয়। তাই সব জিজ্ঞাসা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনি কোনোক্রমে বলতে পারলেন, তার মানে—সত্য কোনো ধর্মের একচেটিয়া নয়—তাই তো ?

কথাটি ঠিকই ধরেছেন শাহজাদা। আপনি নওজওয়ান। আপনি যে-কথাটি ডঙ্কা বাজিয়ে বলতে পারেন—আমার এই বয়সে খৃস্টান হয়ে হিন্দুস্থানে সে কথা বলা কঠিন।

—কথাটি তো ঠিক ?

—অবশ্যই ঠিক।

দারাশুকো অনেক দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ব্যাকুল হয়ে চায় কেন ?

ফাদারের বয়স হয়েছে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। তিনি স্নেহভরে নিজের মুখখানি শাহজাদার মুখের কাছাকাছি এনে নিজের চোখ তাঁর চোখে রাখলেন। তারপর খুব সাদাসিধে ভাষায় বলে উঠলেন, সব ধর্মের উদ্দেশ্য এক। সবাই তার প্রিয়তমকে চায়। এটাই মানুষের ধর্ম।

শাহজাদা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। নিজের মনকেই বললেন, তাহলে রানার জন্যে আমি যে মরে যাই—তাকে যে আমি চাই—এই চাওয়াটাও ধর্ম ? সবাই তার প্রিয়তমকে চায়। সব ধর্মের উদ্দেশ্যই এক।—একথা ভাবতে ভাবতেই দারার বুকের ভেতর তীরভূমিতে আছড়ে পড়ে ছুটে আসা ঢেউয়ের মতোই কী এক অজানা আনন্দ চারদিকে ফুলকি তুলে ছড়িয়ে পড়লো। দারাশুকো জানতে চাইলেন, একই মানুষ একই সঙ্গে অনেককে চাইতে পারে ? অনেককে ভালোবাসতে পারে ?

—মানুষের ধর্মই ভালোবাসা। সেটাই তো স্বাভাবিক শাহজাদা। ভালো না

বাসাই তো অস্বাভাবিক।

শাহজাদা যেন এক গুরুভার থেকে এইমাত্র মুক্তি পেলেন। আমার যে একসঙ্গে অনেককে ভালো লাগে। নাদিরাকে আমি ভালোবাসি। রানাকেও বাসি। রানাদিদের এক একটি ভঙ্গি, হেসে ওঠা, রাস্তার নাচনি জীবনের অবিশ্বাস থেকে রানার যে অস্থির হয়ে ওঠা—সবই আমায় জাগিয়ে তোলে—প্রেমে, করুণায়, সোহাগে ওর ব্যথার জায়গায় সেবার প্রলেপ মাখিয়ে দেবার ইচ্ছায়। আবার নাদিরার শান্ত, স্থির, অচঞ্চল মুখশ্রী, কণ্ঠস্বরের নিচে ওর অনিশ্চিত প্রথম জীবনের জন্যে আমার মায়া হয়। আহা! ফের যদি নাদিরার বালিকা জীবন ফিরে আসতো! তাহলে নাদিরার সেই বয়স থেকেই ওকে আমি স্বস্তি, নিশ্চিন্তি, মর্যাদা, প্রাচুর্য—একজন শাহজাদীর যোগ্য আবহাওয়া যুগিয়ে যেতাম। ও যদি একটু দেমাকি হয়ে—রুক্ষ হয়ে কিছু বেতমিজিও দেখাতো—তাও আমার ভালো লাগতো। মনে হতো—সর্বক্ষণের ভীতুর খোলস থেকে বেরিয়ে এসে নাদিরা তার অধিকারের পতাকা বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে।

—শাহজাদা। আমি উঠি এখন?

—আসুন। আপনি বিশ্রাম করুন গে। কাল সকালের শাহী ডাকচৌকিতে আপনার জন্যে জায়গা করা আছে। আপনি ক'দিনেই নিশ্চিন্তে সুরাট পৌঁছে যাবেন।

ফাদার হাইনরিশ রথ উঠে যেতে শাহজাদা একবার তাঁর মহলের বাইরে অন্ধকার ঢাকাপথে এসে দাঁড়ালেন। পেছনে ফিরলে তাঁর বিরাট ঘরে উজ্জ্বল আলোর ভেতর ধনুকাসনে মস্ত যোগীকে দেখা যায়। মানুষটি অযোধ্যা থেকে এসেছেন। পদ্মাসনে বসে সঠিক নাদ কিভাবে ছাড়তে হয় তাই শেখাবেন। দু'দিন হলো ওই এক অবস্থাতেই আছেন। জলস্পর্শ করেননি। গতকাল রাতে শুধু একবার একটি কথা বলেছেন। নাদ আর বেদের ভেতর তফাৎ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, বাদশা আর তাঁর হুকুমের ভেতর যা তফাৎ ঠিক তাই। বাদশা হলেন নাদ। আর তাঁর হুকুম হলো বেদ।

শাহজাদা নাদ-এর সঙ্গে সুলতান-উল-আযকরের কী একটা মিল যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। দু'হাতে কান চেপে ধরলে গায়েবী দুনিয়ার নির্জন দরগা থেকে এক অবিরাম আওয়াজ উঠে আসে। ওই যোগী বলেছিলেন, নাভি থেকে আওয়াজ উঠে এসে সারা চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধ্বনির কোনো ক্ষয় নেই।

ভালোবাসারও কোনো ক্ষয় নেই। আমায় জাগিয়ে তুলতে না পারলেও আমাকে ঘিরে নাদিরা বেগমের ভালোবাসা তো এই দুনিয়ার বাতাসের ভেতর থেকে যায়। আলোয়, ধুলোয়, অন্ধকারে, হাওয়ায় সে ভালোবাসার গুঁড়ো মিশে যায়।

শরিয়তে কিংবা শাহী খানদানে একজন শাহজাদা এক বেগম থাকতে আরও বেগম নিতে পারেনই। কথাটা একবার কহানির ধাঁচে দারাশুকো নাদিরা বেগমের কানে তুলেছিলেন। ভাবখানা যেন স্রেফ কথার কথা।

বেগম অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে শাহজাদাকে বলেছিলেন, আরও বেগম.

তো থাকতেই পারে। কিন্তু হজরত। আওরত হিসেবে আমার একটা কথা আছে।

—কী কথা নাদিরা?

—দুনিয়ার কোনো আওরত খুশি মনে তাঁর খসমকে অন্য আওরতের হাতে তুলে দিতে পারে না।

—তাই কি?

—হ্যাঁ খোদাবন্দ। শেরের মুখে খসমকে দেবো—তবু অন্য আওরতের হাতে নয়।

শাহজাদা দাঁড়িয়ে পড়েই বিড়বিড় করে বললেন, আশ্চর্য! দুই আওরতই এক আগ্রায় দুই জায়গায় থাকে। দু'জন দু'জনকে দেখেছে। একজন জানে না—তার দেখা নাচনিই তার খসমের ওপর ভাগ বসাতে এসেছে। আরেক আওরত জানে, তার আশিকের পহেলা দাবিদার এই শাহজাদা-বেগম। আর আমি? দু'জনকেই ভালোবেসে বসে আছি। মানুষের ধর্মই ভালোবাসা। সবাই তার প্রিয়তমকে চায়। সব ধর্মের উদ্দেশ্যই এক। সেটাই স্বাভাবিক। না ভালোবাসতে পারাই অস্বাভাবিক।

আচ্ছা এমন হয় না? আমি, নাদিরা, রানাদিল আগ্রা দুর্গে আমার এই শাহজাদা মহলে তিনজনে একসঙ্গে আছি। রানার নাচ দেখে সাবাসি দিয়ে উঠছেন নাদিরা বেগম। নাদিরা বেগমের ওড়না ঢাকা মুখের ছাঁচ দেখে রানাদিল তারিফদারির ভঙ্গিতে বলে উঠছে, কী সুন্দর। মানুষ এত সুন্দর হয়? তারায় ভরা আসমান যেন কিসের ব্যথায় ভেঙে পড়বে ভেবে—আমি আগ্রা দুর্গের সামনে বুরুজের কাছাকাছি গিয়ে অন্ধকারে মুখ তুলে তাকিয়ে আছি—এমন সময় দুই ছায়া হয়ে অন্ধকার থেকে দু'জন বেরিয়ে এলো। একজন নাদিরা—অন্যজন রানাদিল। দু'জনেরই এক কথা। দু'জনই চায়—কী হবে এই শাহী দিয়ে। ফকিরি কি শাহীর চেয়ে কম কিছু? দু'জনই প্রায় গলা মিলিয়ে বলে উঠবে—শাহজাদা। আমরা আউলিয়াদের কথা শুনতে চাই। মিঞা মীরের কথা বলুন। আপনি সেই যে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পান—সেকথা বলুন।

আমি বলবো, তোমাদের ভালো লাগে?

ওরা একসঙ্গে বলে উঠবে, বলুন। বলুন হজরত। কাফিপুরায় শীতের রাতে আপনি সেই যে তাঁর আস্তানায় গিয়েছিলেন—সেকথা বলুন।

শাহজাদা দারা একা একাই হেসে উঠলেন। তা কি হয় জীবনে। জীবনে অমিল রং-ই রং। তিনি নিজের মহলে ফিরে এলেন। সুখদোলার বাঁ দিকে যোগীবর তখনো ধনুকাসনে। ডান দিকে সাফিনৎ-উল-আউলিয়ার থাক থেকে একটি পাতা কী করে যেন উড়ে এসে মেঝের বনাতে পড়েছে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন শাহজাদা।

নিজেরই হাতের লেখা। তিনি চিনতে পারলেন। শাহজাদা এক অদ্ভুত পীরের দেখা পেয়েছিলেন। লাহোরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল দারাশুকোর। তাঁরই কথা বিশদে লেখা। কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না তিনি—এই নাম না জানা মহান মানুষটির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা তিনি

এই সাফিনৎ-উল-আউলিয়া কেতাবে দেবেন কিনা ? নিজের অস্থির ভেতরটা ধাতে আনতে দারাশুকো নিজেরই লেখা পড়তে লাগলেন। নতুন করে পড়াও এক অভিজ্ঞতা। পীর আর তাঁর কথাবার্তা ঠিক এভাবে সাজানো—

—আপনি কাকে গুরু বলে মানেন ?

—নিজেকে।

—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের ?

—নিজের সম্প্রদায়ের।

পড়তে পড়তে শাহজাদার মনে পড়লো, এই সাধক তাঁকে (দারাকে) ছাড়া কাউকে পুরুষ বলে ভাবেন না। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, একথা বলছেন কেন ?

জবাবে সেই পীর বলেছিলেন, ঈশ্বরকে মানে এমন আরিফ ছাড়া কাউকে আমি পুরুষ বলে মনে করি না।

পড়তে পড়তে শাহজাদার অনেক পুরনো কথাই মনে ভেসে উঠলো। একবার তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কার কাছে শাস্ত্র শিখেছেন ?

পীর বলেছিলেন, মুল্লা আর পণ্ডিত—দু'জনকেই আমি মেরে ফেলেছি। কাজেই কাদের কাছে শিখবো ?

লাহোরের গায়ে রাভির তীরে এই পীরের আস্তানায় কয়েকবারই গিয়েছেন শাহজাদা। মানুষটি কখনো খেতেন না। ঘুমোতেন না। যখনই আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতাম—আমার চোখ জলে ভরে যেতো।

তখন তিনি আমায় বলতেন, তোমায় আমি খুব ভালোবাসি। স্নেহ করি। শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কখনো তোমায় মায়ার বাঁধনে জড়াবো না।

এমন অনেকদিন হয়েছে—আমি অজানা পাহাড়ী পথে একা একা পাহারা ছাড়াই হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। শীতের রাত। অজানা জায়গা। তখন আমার মনে পড়েছে—পীর সাহেব তো আমায় আগাম হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি আমায় সব জানতেন।

খোলা পাতার এক জায়গায় নাস্তালিক লিপিতে লেখা নিজেরই সেই সময়কার দিনলিপি শাহজাদা চিনতে পারলেন। পড়তে পড়তে দারাশুকোর ভেতরটা কান্নায় কান্নায় ভরে উঠলো—

যখনই আমার মনে যে-ভাব জাগতো—তিনি আমাকে তা বলে দিতেন। একদিন রাতে আমি তাঁর পা টিপে দিচ্ছি। তখন আমার মনে আমার হুজুর মরহুম মিঞা মীরের কথা ভেসে উঠলো। পীর বললেন, শাহজাদা—তোমার নসিব বেশিদূর উঠবে না। বলে—পীর তাঁর বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কয়েক পা হাঁটলেন। শেষে মিঞা মীরের দেহ নিয়ে আমার সামনে দেখা দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে পীর সাহেব আবার স্বাভাবিক হলেন।

পড়তে পড়তে এক অজানা আনন্দে শাহজাদার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কেন জানি—চোখেও জল এসে গেল। কী মানুষের দেখা পেয়েছিলাম। আবার পড়তে লাগলেন দারা—

আশ্চর্যের কথা—বনের পশুপাখি, গাছপালা, পাথর ও'র সঙ্গে কথা বলতো। একবার আমি কোনো একটা ব্যাপারে ও'র পরামর্শ নিতে যাই। তখন কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। সেদিন আমরা দু'জনই ছিলাম। আমার ঘোড়া গাছের ডালে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। হঠাৎ সেই ঘোড়া কথা বলতে আরম্ভ করে দিলো। পীর আমাকে যে-পরামর্শ দিয়েছিলেন—তাতে আমার ঘোড়া সায় দিলো। পীর একটু হেসে বললেন, তোমার ঘোড়া ঠিকই বলে দিয়েছে!

একদিন রাতে দেখলাম—একটা জোনাকি আসমানে অনেক উঁচুতে উড়ছে। আমি তাঁকে তা দেখালাম। তিনি হিন্দিতে একটি কবিতা বলে উঠলেন। তার মানে অনেকটা—তুমি আমার আশিয়ানার আগুনের একটি ফুলকি মাত্র! কবিতা বলেই পীর তাঁর হাত দুটো তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে জোনাকিটি তার হাতে এসে বসলো।

শাহজাদা দারাশুকো এবারও ঠিক করতে পারলেন না—নাম না জানা এই পীরের কথা তিনি সাফিনৎ-উল-আউলিয়ার ভেতর দেবেন কিনা?

শীতের শেষে হিন্দুস্থানের বুকে ঘুরে বেড়ানো চার বিদেশী পাখি এখন এই সকালবেলায় বেগম-কি-সরাইয়ের খোলা উঠোনে বসে নিজেদের জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করছে। দানিয়েল বললো, আগার লোক তো এলো না?

জাঁ-ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার যার নাম—যে কিনা এই চারজনের উড়নচণ্ডী দলটির কাপতান—ছোটো করে বলতে গিয়ে হিন্দুস্থানের সরাইগুলোর রসুইকাররা যাকে এই মাসখানেকের ভেতর মুখে মুখে স্রেফ ট্যাভারনি সাহেব বানিয়ে ফেলেছে—সেই তাগড়া, টগবগে, সবসময় ফুর্তিবাজ মানুষটি কিন্তু কোনো সাড়া দিলো না। নিচু হয়ে ডান পায়ে বোঁচকা বাঁধার মাঝখানে চাপ দিয়ে সে রাম গিঁট দিতে লাগলো। ঝুঁকে পড়ে। লম্বাটে, লাল দাড়ি তখন ডান হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেছে।

বেগম-কি-সরাই শাহজাদা-বেগম জাহানারার হুকুমে তৈরি। অনেকটা জায়গা নিয়ে। চারদিকে দেওয়াল। ভেতরে পঞ্চাশ ষাটখানা কুঁড়েঘর। মেহমান এলে ভেতর থেকে তিরিশ চল্লিশজন করে মরদ আর আওরত বেরিয়ে আসে। দূরে সফরের রাহী, মুসাফির, ব্যাপারী বা শাহী-লোকজন এলে ওরা মুরগি, মাংস মাখন, তিল তেল, শাল, চালানি যোগায়। তনখার বদলে। রান্না করো খাও যাও। জিরোতে হয় উঠোনে জিরোও। ঘুম এলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। চারপাই পাতা আছে। থাকতে কিছু লাগে না। শুধু খাবার দাবারের দাম দিতে হয়।

ট্যাভারনিয়ার এবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখলো। কয়েকজন আরব বণিক পশ্চিমমুখো হয়ে সকালের নামাজ সারতে ব্যস্ত। সরাইয়ের বেঁধে রাখা দুম্বা কেটে রাঁধার জন্যে দুই আফগান রসুইকার ওদের গলার দাঁড় খুলছে। মলিয়ের একটা বিশাল কাঠবাদাম গাছের গোড়ায় বসে। হাতে স্কেচ বুক। তার দেখা হিন্দুস্থানি দুনিয়ার ছাপ তুলে নিচ্ছে এঁকে এঁকে। রসুইঘরের একজন গুর্জর কামিন মলিয়েরের চোখের সামনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ানো। চোখে মুখে তার

অবাক হয়ে যাওয়া ফুটে বেরুচ্ছে। আলেকজান্ডারকে দেখা যাচ্ছে না। কোন ঘরে হয়তো কোনো মুসাফিরের নাড়ি দেখছে মন দিয়ে।

ট্যাভারনিয়ার এবার কাপতানি গলায় হাঁক পাড়লো। এরপর তো রোদ চড়ে যাবে। যাও তো মলিয়ের—আগার লোক এলো না কেন? একবার বেরিয়ে দ্যাখো—

গুর্জারি মেয়েটির ছবি আঁকতে আঁকতেই মলিয়ের বাদামতলা থেকে বললো, কোথায় দেখবো?

ছোটভাই কিছু কামচোর আছে। তার ওপর প্রায়ই ভোগে। কোনো কিছু করতে বললে আগে ভাগেই দানিয়েল নয়তো আলেকজান্ডারকে দেখিয়ে দেয়। ট্যাভারনিয়ার রীতিমত তেতে উঠে বললো, এটা প্যারিসের সিন নদীর গায়ের চেনা সাঁলো নয় জানি। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। সন্ধের আগে পনেরো ক্রোশ রাস্তা ভেঙে নারানপুর পেঁছিতে হবে—খেয়াল আছে? পথে আবার তাপ্তির দুটো শাখানদী পেরনো আছে—

হাতের স্কেচ বইটা নামিয়ে পটাং করে উঠে দাঁড়ালো মলিয়ের। চব্বিশ পঁচিশ বছরের নওজওয়ান। সেও সমান তেতে উঠলো। এত বড় হিন্দুস্থানে কোথায় দেখবো? কোন দিকে বেরিয়ে দেখবো? তার চেয়ে দেখা যাক না আরেকটু। আগা সাহেব যখন বলেছে—তখন ঠিকই তার লোক এসে যাবে। আগাসাহেবের কথার নড়চড় হয় না।

কথাটা মনে লাগলো ট্যাভারনিয়ারের। সত্যিই তো—কোনদিকে বেরিয়ে—কোথায় খুঁজবে? এমন নয় যে লোকটি আগেভাগেই তাদের চেনা। যার আজ ভোরে বেগমর্কি-সরাইয়ে এসে ট্যাভারনিয়ারদের সফরসঙ্গী হওয়ার কথা তিনি যে সে লোক নন। আগা সাহেব দানেশমন্দ খাঁয়ের কথামত—আকবর বাদশার আমলে হিন্দু-মুসলমান—দুই ধর্মেরই রহস্য বুঝতেন এমন পয়লা সারির হাতে গোনা পণ্ডিতদের ভেতর একজন ছিলেন দামোদর ভট্ট। তাঁরই নাতি—বামন ভট্ট। তাঁকেই দানেশমন্দ খাঁ মাসমাইনেতে ট্যাভারনিয়ারের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন। বামন মহাপণ্ডিত, সুরসিক, পরিশ্রমী। ফারসি, সংস্কৃত তো জানেনই। ইংরাজি, ফরাসি, আরবিতেও তাঁর দখল আছে। শরিয়ত, বেদ থেকে শুরু করে নীল, সোরা, চিনি, রেশমেও তিনি সিদ্ধ। ওলন্দাজ কোম্পানির কুঠিতে তিন বছর থেকে দাদন খাতার দেখাশুনোও করেছেন একসময়। কবি ফৈজির সঙ্গে বসে দামোদর ভট্ট নিউ টেস্টামেন্টের ফারসি অনুবাদে ব্যস্ত থাকতেন শেষ বয়সে। সে সময় নাতি বামন ভট্ট তাঁর পিতামহকে এ-বই সে-বই এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতেন নাকি। সবই আগা দানেশমন্দ খাঁয়ের মুখে শোনা। সেই বামন ভট্ট এখনো এসে পেঁছিলেন না। ট্যাভারনিয়ার অস্থির হয়ে পড়লেন। মাসখানেক হয়ে গেল হিন্দুস্থানে এসেছেন। এখন লম্বা সফরে এমন একজন বিশ্বাসী সঙ্গী চাই—যিনি হিন্দুস্থানের ভাষা বুঝে দোভাষী হতে পারবেন। বিপদ হলে আগাম হুঁশিয়ারি দেবেন। দরকারে পরামর্শ দিয়ে কেনাকাটায় ঠকে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবেন। আবার সেখানে লাভের আশা—

সেখানে ঝুঁকতে বলবেন। হিন্দু মুসলমান-দু'পক্ষেরই পালা-পার্বণ, ধর্ম, উৎসব—সবকিছুতেই ট্যাভারনিয়ারদের ওয়াকিবহাল করে তুলবেন। আগা দানেশমন্দ খাঁয়ের বিবেচনায় এ কাজে বামন ভট্টের চেয়ে সেরা লোক তামাম হিন্দুস্থানে আর একজন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অধীর হয়ে দানিয়েল বেগম-কি-সরাইয়ের ঘেরা দেওয়ালের বাইরেটা একবার ঘুরে এসে বললো, নাঃ! কেউ তো আসছে না। দানেশমন্দ খাঁ খেলাপি করলো না তো?

মাসখানেক ধরে দেখছি তো। আগাসাহেব বর-খেলাপির মানুষ নন।—বলে ট্যাভারনিয়ার সরাইয়ের উঠোনে বাদামগাছতলার ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। ক'বার দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়ে কী দরিয়া-বন্দর কী ডাঙা-গঞ্জ সব জায়গাতেই সব দেশেই এই আগা ধরনের মানুষ দেখে আসছে ট্যাভারনিয়ার। কাভাইরো, তুসকানি, মাসকাট, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, ইস্পাহান—সব জায়গাতেই আগার মতো মানুষ গ্র্যান্ড সেনিওর, রিয়াল, ডুকাট, রোজ নোবেল, মোহর, আশরফির থলে হাতে বসে থাকেন। ব্যবসায় ব্যাপারীদের হুন্ডি দেন। রাস্তা-ঘাটে চোর-ডাকাতের তো অভাব নেই। হুন্ডি সঙ্গে নিয়ে শহর বন্দর এলাকায় গিয়ে ভাঙিয়ে নেওয়া যায়। একটিও মোহর ঘর থেকে বের না করে আগা সাহেবের নামে হুন্ডি কেটে ঢাকা থেকে সুরাট অব্দি যে কোনো জায়গায় রেশম, নীল, চুনি, হীরে, সোনা কেনা যায়। দূর বলে ঢাকার ওপর কাটা হুন্ডিতে সবচেয়ে বেশি কেটে নেয়। শতকরা দশ তনখা। কিন্তু সুরাট, আমেদাবাদ, বুরহানপুরের ওপর হুন্ডিতে কেটে নেয় শতকরা আড়াই তনখা। আরেকটু দূরে বলে এলাহাবাদ, পাটনার ওপর কেটে নেয় শতকরা সাড়ে চার তনখা। আগা হিসেবে বন্দর সুরাটে লেনদেনের ব্যাপারে দানেশমন্দ খাঁয়ের কথাই শেষ কথা। এমন মানুষ বর-খেলাপিতে যাবেন কেন? ওঁর এই হুন্ডি ব্যবসাতেও ঝুঁকি বিরাট। হুন্ডি কাটার পর পথেই যদি মাল হারায় বা লুট হয় কিংবা কোনো কারণে নষ্ট হয় তো লাগানো তনখার সবটাই জলে যাবে।

আগাসাহেব দানেশমন্দ খাঁয়ের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দেন সুরাট গির্জার চ্যাপলেন হেনরি লর্ড। সেই আগার কথামতই ট্যাভারনিয়ার সুরাট থেকে বুরহানপুর, সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রা যাবার পথ ধরেছে। নয়তো সুরাট থেকে আমেদাবাদ হয়েও আগ্রা যাওয়া যেতো।

দানেশমন্দ বললেন, বুরহানপুর দিয়ে আগ্রা গেলে তিনশো উনচল্লিশ ক্রোশ রাস্তা। আর আমেদাবাদ হয়ে আগ্রা যেতে চারশো পনেরো ক্রোশ। শেষের রাস্তায় ছিয়াত্তর ক্রোশ বেশি ভাঙতে হবে। তাছাড়া বারবার তাপ্তি পড়বে। এক জায়গায় তো নর্মদা রীতিমত চওড়া। তার চেয়ে বুরহানপুরের পথ ধরুন সাহেব। মোট বার তিনেক তাপ্তির ক'টা সরু সরু শাখানদী পড়বে। ও পথে অনেক দীঘি পাবেন। পিয়াসা মেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। নাহান্—ধোলাইয়েরও সুবিধে খুব।

পথের এমন দিশারী কি ফালতু কথা বলে ভোগাতে পারেন? কক্ষণো না।

এইসব সাত পাঁচ ভেবে ট্যাভারনিয়ার হাতে চোখ ঢেকে মাথা তুলে সূর্য কোথায় মাথা তুলে তা দেখতে গেল। দেখেই চোখ নামিয়ে বুঝলো, মলিয়ের ভুল বলেনি।

ঘের-দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে শক্তসমর্থ একজন ন্যাড়া মাথা খালি গা মানুষ বেগম-কি-সরাইয়ের উঠোনে ঢুকছেন। কাঁচাপাকা লোমে ভর্তি উদোম বুকের ওপর একখানি সরু কাপড় ফেলে বাঁ কাঁধে রাখা। লম্বা লম্বা খালি পা ধুলোয় ভর্তি। ট্যাভারনিয়ারকে দেখে লোকটি ঝুঁকে বললেন, মঁসিয়ে—আমিই বামন ভট্ট।

হিন্দুস্থানে ট্যাভারনিয়ারকে এই প্রথম একজন মঁসিয়ে বললো। জবাবি ঝুঁকে নিয়ে ট্যাভারনিয়ার বললো, পথে আটকে গিয়েছিলেন?

—না তো। আমি আসছি বরদোলি থেকে। সেখানেই তো আগাসাহেবের চিঠি পেলাম।

—কবে রওনা দিয়েছেন?

—কাল সন্ধেবেলা। কেন দেরি হয়ে গেল?

অবাক হয়ে ট্যাভারনিয়ার বামন ভট্টের মুখে তাকিয়ে বললেন, না না। দেরি হয়নি। কাল সন্ধেবেলা রওনা হয়েছেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—ঘোড়ায় এলেন?

—নাঃ। আমার কোনো ঘোড়া নেই। তবে ওলন্দাজদের কুঠিতে থাকতে ঘোড়া দাবড়াতে শিখেছিলাম। কাল সন্ধেবেলা পায়ে হেঁটেই রওনা দিয়েছি। মাঝরাতে পূর্ণা নদীতে খেয়া ছিল না। মাঝিকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলতে হলো।

শুনে ট্যাভারনিয়ারের মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো। বরদোলি থেকে বেগম-কি-সরাই পনেরো ক্রোশ রাস্তা এক রাতে হেঁটে এলেন?

—সন্ধে লাগতেই হাঁটা ধরেছিলাম কাল। পরিষ্কার রাস্তা। দু'ধারে গম, ধান, জওয়ারের ক্ষেত। মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় দেখি বলোর কাছাকাছি—তখন দশ ক্রোশ এগিয়ে এসেছি—মাঠের ভেতর একটা পোড়ো কিল্লা দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে ছোট্ট একটা ঝরনার মতো নদী। জলের ওপর জাগা পাথরে পা দিয়ে সাবধানে পার হলাম।

দানিয়েল, মলিয়ের, আলেকজান্ডার, ট্যাভারনিয়ার—সবাই শুনছিল। পরিষ্কার ইংরাজির সঙ্গে ফরাসি দু'একটা দানাদার শব্দ। হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণের গলায় বেশ শোনাচ্ছিল। ট্যাভারনিয়ার বললো, আমরা তো ঘোড়ায় যাবো।

বেশ তো। আমার জন্যেও একটা ঘোড়া দেখুন তাহলে—

বাদশার মাথার উষ্ণীষ ফুলের টোপর নয়। তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শাহজাহান। দরবার-ই-খাসে আজ এই গ্রীষ্মের দুপুরে বসে তাঁর মনে হলো—আমি কার জন্যে হিন্দুস্থানের এই শাহী জোরদার করে চলেছি। বাবর যে হিন্দুস্হান পেয়েছিলেন—তার চেয়ে আজকের হিন্দুস্হান অনেক বড়। কিন্তু বড় দিয়েই বা কী হবে? কোন কাজে লাগবে? বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ছাড়াই তো আকবর বাদশা শাহী চালিয়ে গেছেন। তাতেই তাঁর নাম দরিয়া পেরিয়ে ইংলিশস্তান, ফ্রানসিসি দেশে পেঁাছে গেছে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ছাড়াই আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার নাম ইরান, তুরানে পেঁাছেছে।

দরবার-ই-খাসে এখন কেউ নেই। শুধু শাহজাহান বাদশা একা মসনদে বসে। দু'চারজন দাখিলা ছাড়া কেউ জানেও না—বাদশা এখন এখানে বসে। তিনি খোলা অলিন্দ দিয়ে আগ্রার আসমানে তাকিয়ে আছেন। সেখানে একটু একটু করে লাল ধুলো জমা হচ্ছে। হয়তো আজই প্রথম বছরের আঁধি ঝড় উঠবে। বাতাস সেই সকল থেকেই তেতে আছে।

কিছুদিন ধরে রাজধানী আগ্রা থেকে একটু একটু করে শাহজাহানাবাদে সরে যাচ্ছে। দাদাসাহেব আকবর বাদশা তাঁর তৈরি রাজধানী ফতেপুরসিক্রিতে আঠারো বছর কাটিয়ে ফের রাজধানী আগ্রায় নিয়ে আসেন। আমি শাহজাহান-বাদে কতদিন থাকবো? আল্লা! তেরি রেজা!

দক্ষিণে দৌলতাবাদ এখন মুঘল দুর্গ। দিল্লি থেকে এই দৌলতাবাদেই রাজধানী উঠিয়ে এনেছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ রক্ষা হয়নি। ফের তাঁকে দিল্লিতে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। শাহজাহান-বাদে রাজধানী কি পাকাপাকি থাকবে? সেখানে যমুনার তীর ঘেঁষে হুমায়ুন বাদশার মকবরার মুখোমুখি লাল কিল্লা মাথা ঠেলে উঠছে। সেখানকার দরবার-ই খাসে চাঁদোয়ার সোনালী সুতোর কাজ এখনো শেষ হয়নি।

আসমানের অনেকটা জুড়ে লালচে ধুলোর আভাস। সেখানে যেন ফারসিতে কে বড় করে লিখেছে—কান্দাহার। উঃ! সেই কান্দাহার আবার! সেদিকে তাকিয়ে চোখ বুজে ফেললেন বাদশা শাহজাহান কান্দাহার, কাবুল, বলখ—পরপর তিন রাজ্য পাহাড় ঠেলে যেন শেষ পর্যন্ত হিন্দুকুশের গিরিখাতে হারিয়ে গেছে। তারপরেই উসুরি পাহাড় আর অক্ষু নদীর মাঝ বরাবর বদক্শান। হেলমন্দের শাখা নদী অর্গন্ধবের তীরে কিল্লা কান্দাহার। ফসলে তো বটেই—ইরান তুরানের ভেতর দিয়ে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ডাঙায় ডাঙায় এই কান্দাহার হয়েই হিন্দু-স্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এই কান্দাহার নিয়েই ইরানের সফাবি শাহ আর মুঘল বাদশাদের ভেতর প্রায় শ'খানেক বছর ধরে মরিয়া টানাপোড়েন চলেছে। হিন্দুস্থান আর কান্দাহারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে থল-চোটিয়াল পাহাড়ের পর পাহাড়। বালুচ রেগিস্থান। কান্দাহারের উত্তরে কাবুল আর গজনির পাহাড়। উত্তর পশ্চিমে হিরাট শহর। কান্দাহার হাতছাড়া হলে

কাবুল-গজনি হয়ে হিন্দুস্থানের ব্যবসা বাণিজ্য মার খায়।

খুবই বালক বয়সে আজকের শাহজাহান বাদশা—সেদিনকার সুলতান খুর্রম তাঁর দাদাসাহেব আকবর বাদশাকে আফসোস করে বলতে শুনেছিলেন, আমি তখন নেহায়েত বালক—তখন ইরানিরা কিল্লা কান্দাহার কেড়ে নেয়।

সেও তো প্রায় আশি সন হয়ে গেল। আমার যখন মোটে দু'বছর বয়স—তখন কান্দাহারের ইরানি সুবেদার সর্ফাব শাহর সঙ্গে গদ্দারি করে এই কিল্লা আকবর বাদশার হাতে তুলে দেয়। সুবেদারের নাম ছিল মুজঃফর হোসেন মির্জা।

পনেরো ষোলো বছর আগে ইরানিরা আবার কান্দাহার কিল্লা কেড়ে নিলো। আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা কিছুই করতে পারেননি। তখন তিনি আমাকে নিয়েই হিমশিম খাচ্ছেন।

সেই কিল্লা কান্দাহার ফের হিন্দুস্থানের হাতে এসেছে। ইরানি কিল্লাদার আলী মর্দান খাঁ কান্দাহার আগ্রার হাতে তুলে দিয়ে মুঘল দরবারে আমির হয়েছে তখন। সেই কান্দাহার হাতে রাখা এখন বড় কঠিন হয়ে পড়েছে।

আগে মনে করতাম—কবে আহমেদনগর, বীজাপুর, গোলকুণ্ডা আগ্রার কাছে মাথা নোয়াবে? ওরা মাথা না নোয়ালে হিন্দুস্থানের শাহীর যেন বা কিছু বাকি থেকে যায়। বাকি থেকে গেল। এখন মনে হয়—কান্দাহার, বলখ্, বদকশানে শাহী ধ্বজ না উড়লে শাহীর অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়।

কিল্লা কান্দাহারে যাতে আর কোনোদিন ইরানি ফৌজ না পেঁছিতে পারে—সেজন্যে মোহর আশরফির পরোয়া না করে কিল্লা কান্দাহারের পাহারাদার দুই কিল্লা বস্ত আর জমিনদারকে জোরদার করেছি। আগ্রা কিংবা শাহজাহানাবাদে বসে বাদশাহী নিয়ে পড়ে থাকলে কান্দাহারকে কবজায় রাখা যায় না। দরবারের ওয়াকেনবীশ আবদুল হামিদ লাহেরী ঠাট্টা করে লিখেছে—

রোজ বে-তাব ও শম বেখাব্।

কান্দাহার হারিয়ে শাহ সফীর দিনে আরাম—রাতে ঘুম নেই।

কিন্তু আমি খোদ হিন্দুস্থানের বাদশা। কান্দাহার নিয়ে আমারও তো সব-সময়ই হারাই হারাই দশা। জোর গুজব—ইরানি ফৌজ ধেয়ে আসছে।

—হজরত—

—কে?—বলে চমকে চোখ চাইলেন শাহজাহান। চেয়ে দেখেন—একটি ছায়ামূর্তি তাঁকে কুর্নিশ করে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

—ওঃ। তুমি। পাঁচ সনে ইজফা পেয়ে পেয়ে এখন তো তোমার বিশ হাজারি জাত—

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর। আপনার পহেলা শাহজাদা এখন দশ হাজারি ঘোড়সওয়ারের মনসবদার।

—হ্যাঁ দারা। তুমি, শাহজাদা সুজাঙ্গীর—শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর—ছোট শাহজাদা মুরাদ বকস্ এখন আমার হাত থেকে হিন্দুস্থানের ভার ভাগ করে যতই নেবে—ততই আমি হালকা বোধ করবো।

—সব ভার আপনারই আব্বা হুজুর। আমরা শুধু আপনার পাশে থাকতে

পারি মাত্র। —বলতে বলতে দারা দেখলেন বাদশা খোলা অলিন্দ দিয়ে লাল হয়ে ওঠা আসমানের দিকে তাকিয়ে। শাহজাদা নিজের একটি কথা বলতে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন-- অনেক ভাগ্যে আব্বা হুজুরকে একা পাওয়া গেছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে চুপ করে গেলেন।

শাহজাহান বাদশা আচমকাই শুরু করলেন। বললেন, দ্যাখো দারা। আমরা মুঘলরা কোত্থেকে কোথায় এসেছি!

শাহজাদা কিছু আন্দাজ করতে না পেরে চুপ করেই থাকলেন।

—উত্তরে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবি—পাহাড়ী পথ ধরে আমরা কোত্থেকে এসেছিলাম। বাবর, হুমায়ুন, আকবর বাদশারা হিন্দুস্থান নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন? আব্বা হুজুরের হাতছাড়া হয়েছিল কান্দাহার। আল্লাতালাকে শও শুকর গুজর করি। কান্দাহার আবার আমাদের হাতে ফিরে এসেছে। কিন্তু বলখ, বদকশান আজও হিন্দুস্থানের বাইরে। আমরা তো ওদিক থেকেই এসেছি একদিন। হিন্দুকুশের গহীন পাহাড়ী পথ দিয়ে এগোলে তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ। একদিন কি তৈমুরের দেশ তাঁরই মুঘল বংশের হাতে আসবে না? তোমার শরীরেও তো তাঁরই খুন বয়ে চলেছে—

শাহজাদা দারা বুঝলেন, আব্বা হুজুর এখন শাহী খোয়াবে বিভোর হয়ে আছেন। তাগদের খোয়াব। তৈমুরও একদিন খোয়াব দেখতেন—তাঁর বংশধররাই সারা দুনিয়া ভাগ করে নিয়ে শাহী কায়েম করবে। হিন্দুস্হানের বাদশার এই খোয়াবি দশার ভেতর শাহজাদা দারা তাঁর নিজের কথাটি পাড়লেন। পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি আর একবার শাদি করবো।

—বেশ তো। ভালো কথা। একজন শাহজাদা ফের বিয়ে করবে—এ আর এমন কী কথা।

—মেয়েটি ভালো নাচে—

বাদশা হেসে বললেন, নয়তো তুমি ভুলবে কী করে। কার মেয়ে? কোথাকার মেয়ে?

শাহজাহান ভাবলেন, কোনো আফগান কি ইরানি মনসবদারের মেয়ে হবে। নয়তো কোনো রাজপুতানি নগদি মনসবদার কোনো রাজপুত রাজার মেয়ে।

দারাশুকো তাঁর জীবনের সবটুকু সাহস একত্র করে বললেন, আগ্রারই মেয়ে। আপনি নাম শুনে থাকবেন।

—কে? —বলে রীতিমত নড়ে বসলেন শাহজাহান। এখন দরবার-ই-খাসে কেউ নেই।

—রানাদিল, আব্বা হুজুর?

—কে? সেই রাস্তার নাচনিটা? তোমার সাহস দেখে তো আমি অবাক হচ্ছি শাহজাদা—

দারাশুকো কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে বললেন, ভালো নাচে। হোক না রাস্তার নাচনি। ইনসান তো বটে।

—হিন্দুস্হানের পহেলা শাহজাদার লম্বা উমরে রাস্তার পাশে অমন অনেক

নাচনি এসে দাঁড়াবে দারা। ওসব দেখলে চলে নাকি। ভালো লেগেছে—তা ভালো। নাচ দ্যাখো। আরও ভালো নাচ দেখতে চাও তো নাচিয়ে গুলরুখ বাইকে খবর দাও। মজলিশ বসুক।

—আব্বা হুজুর। আমি রানাদিলকে জান আর দিল দিয়ে ভালোবাসি। আমি তাকে শাদি করবো।

হো হো করে হেসে উঠলেন শাহজাহান। তারপর বললেন, শাদি! ফৌজের লোক গিয়ে ওকে তুলে এনে নর্মদার ওপারে পাঠিয়ে দিক। সেখানে গিয়ে কোঠি নিক। নাচ-গান করে রুটি কামাক।

—তাহলে হজরত আমি জহর খাবো। যমুনার পাড়ে আমার লাশ পাবেন।

—দারা। —বলে চেঁচিয়ে উঠলেন শাহজাহান। কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর হিন্দুস্থানের বাদশা শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমার পহেলা শাহজাদা দারা। তোমায় ঘিরে আমার অনেক আশা। তুমি সুফীদরবেশদের ভালোবাসো। তোমার ভেতর কোনো জাহিরি নেই। দু'টি সুন্দর ফুটফুটে ছেলের বাবা হয়েছো। তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়।

—রানাদিলকে না পেলে আমি জহর খাবো।

বাদশা শাহজাহান অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। শেষে বললেন, বেশ। তোমার ইচ্ছাই সফল হোক।

শাহজাদা দারা পলকে যেন নেচে উঠলেন ভেতরে ভেতরে। বাইরে তিনি স্থির। চোখের পলক পড়ছে না। সেই দশাতেই তিনি ফের বাদশাকে কুর্নিশ করলেন।

—তোমাকে না দেওয়ার আমার কিছুই নেই দারা।

—জানি আব্বা হুজুর।

—তুমি আমায় একটা জিনিস দেবে?

—কী? হুকুম করুন হজরত।

—তোমার তাগদ। হিন্দুস্হান এখন তোমার তাগদ চায়। কিল্লা কান্দাহার হাতছাড়া হওয়ায় ইরানি ফৌজ মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসছে। তুমি ফৌজ নিয়ে এগিয়ে যাও। সময়মত অর্গন্ধবের তীরে ওদের আটকাও। ঘামাসান লড়াইয়ে তোমায় জিতে ফিরতে হবে।

—তাই হবে বন্দেগান।

বাদশা শাহজাহান কোনো কথা না বলে দারাশুকোর মুখে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলে যখন ছোট থাকে—তখন ঝাঁপিয়ে কোলে ওঠে। একটু বড় হতেই সে সুলতান হয়ে ওঠে। তখন আর তাদের বুকে বুক লাগানো যায় না। আদর করা যায় না। ওদের বুকের ভেতর তখন শাহজাদা হয়ে ওঠার খোয়াব ডালপালা মেলেছে। তারপর ঘোড়া দাবড়াতে শিখেই ওরা আওরতে মজে। তখন সারা দুনিয়া একদিকে—অন্যদিকে সেই আওরত একা। আমি তো কোনো আওরতে এভাবে মজিনি—যাতে কিনা দুনিয়ার একদিকে সবাই—আব্বা হুজুর হিন্দুস্হান, শাহী—আরেকদিকে শুধুই—রানাদিল। ওরাই ঠিক? না, আমিই ঠিক? সেদিন আমিও দারার মতোই শাদিসুদা একজন শাহজাদাই ছিলাম। কিন্তু সেদিন আমি

অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম—কোনো আওরতের জন্যে নয়—স্রেফ হিন্দুস্থানের জন্যে—শাহীর জন্যে—মসনদের জন্যে।

সিরোঞ্জ থেকে রাজধানী আগ্রা একশো ছয় ক্রোশ রাস্তা। আগ্রার দেওয়ানখানার হিসেবমত পঁয়ত্রিশ মঞ্জেল। তবে সারা হিন্দুস্থানে দেহাতে দেহাতে ক্রোশের মাপেরই চলন বেশি। সারাদিন রোদে পোড়া হয়ে গতকাল সন্ধে সন্ধে ট্যাভারনিয়ারের দলটিকে নিয়ে বামন ভট্ট সিরোঞ্জের এই সরাইতে এসে হাজির হয়েছেন। কাল সন্ধেবেলা সরাইখানার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ট্যাভারনিয়ারদের পাঁচ পাঁচটা ঘোড়াকে খুব জ্বালিয়েছে। ঘোড়ার লাথ খেয়ে একটা কুকুর তো সারারাত চেঁচিয়েছে। ভেড়ার মাংস খেয়ে ওদের চারজনের ঘুমে সেই চিৎকারে কোনোই ব্যাঘাত হয়নি। কিন্তু বামন ভট্টর একদম ঘুম হয়নি। সরাই থেকে ময়দা, চাল, মাখন, শাক সবজি নিয়ে নিজেই রেঁধে খেয়ে চারপাই টেনে শুয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু কুকুরটার চিৎকারে চোখ বুজতে পারেননি। বারবার ভেবেছেন —কিরকম কুকুররে বাবা! হিন্দুস্থানে থাকিস! অথচ ঘোড়া দেখিসনি নাকি কোনোদিন? শেষ রাতে তিনি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই কখন ঘুম থেকে উঠে ট্যাভারনিয়ার শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো—তা তিনি টেরও পেলেন না।

সিরোঞ্জ বেশ বড় শহর। ঘুরতে ঘুরতে ট্যাভারনিয়ার দেখলো, বাসিন্দাদের বেশিরভাগই বেনিয়া। কতক বাড়িঘর ইট আর পাথরের। মান্ডিতে রাঙানো কাপড়ের বিরাট বিক্রি। টুকরো কাপড়কে সবাই বলে ছিট। এসব কাপড় ট্যাভারনিয়ারের চেনা। হিন্দুস্থানে আসার পথে ইরানে, তুরস্কে সাধারণ মানুষের গায়ে এসব কাপড়ের জামা দেখেছে সে। এ কাপড় যতই ধোয়া যায়—ততই খোলতাই হয়ে এর রং।

ঘুরতে ঘুরতে মসলিন কাপড়ের পট্টিতে গিয়ে পড়লো ট্যাভারনিয়ার। খোঁজখবর নিয়ে জানলো, এই মসলিন রফতানি করার উপায় নেই। যতটা হবে—ততটাই আগ্রার দেওয়ানখানায় চলে যায়। এ কাপড় গায়ে দিলে গা দেখা যায়। বাদশা বা আমিরদের হুকুমে এই মসলিনের পোশাক পরে মেয়েদের নাচতে হয়। সিরোঞ্জ-এ একটা নদী আছে। তার তীরে কিছু সাধুর দেখা পেল ট্যাভারনিয়ার। কোনো সাধু এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনোজন বা কাটা মাটির ভেতর মাথা সমেত বুক অব্দি গুঁজে শূন্যে পা তুলে আছে।

বেলাবেলি ফিরে এসে ট্যাভারনিয়ার দেখলো সরাইতে বামন ভট্ট একা বসে। দানিয়েল ওরা কখন বেরিয়েছে ঘুরতে। কেউ ফেরেনি। ট্যাভারনিয়ারকে দেখেই বামন বললেন, সবার জন্যে ভাত চাপাতে বলেছি ভাথিয়ারাকে। তেতে পুড়ে ফিরবে সবাই। তখন ভাতকে মনে হবে অমৃত।

—আলেকজান্ডার ভাত খায় না।

—আজ খাবে দেখবেন। গরম পড়ছে। এখন ভাতই শরীরে সয়। আপনি বরং ঘোড়াগুলো দেখুন। আমি যা পারি দিয়েছি ওদের।

ট্যাভারনিয়ার উঠলো না। সে বললো, শহর ঘুরতে ঘুরতে নদীর পাড়ে

গেলাম। অন্য জায়গার মতো এখানেও দেখলাম—কিছু হিন্দু নিজেদের ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে কষ্ট দিলেই কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

বামন ভট্ট নিস্পৃহ গলায় বললেন, কারও কারও বিশ্বাস—এ জন্মে কষ্ট করলে পরজন্মে রাজার কপাল নিয়ে জন্মানো যায়।

—কষ্ট ভোগ করে অবসন্ন শরীরে মন মূর্ছা যায়। তখন এসব ভগবান পাগল অশিক্ষিত ফকির ভুলভাল বকে। আর সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে গপগপ করে গেলে। এদের সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে—

বামন ভট্ট কোনো জবাব দিলেন না। সুরাট থেকে আগ্রা রওনা হয়ে পথে ট্যাভারনিয়ার আর তার ভাই দানিয়েলের সঙ্গে হিন্দুদের ভগবান নিয়ে অনেক কথা হয়েছে বামন ভট্টের। বামন তাঁর বুদ্ধিমত জবাব দিয়েছেন। ট্যাভারনিয়ার তার কৌতূহলমত প্রশ্নই করে গেছে।

ট্যাভারনিয়ার বললো, এই যে দিনে তিনবার চান করা—এমন চান ইউরোপের শীতে করলে নির্ঘাত মৃত্যু।

এবার বামন ভট্ট চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, দেখুন সাহেব—আমাদের ধর্ম আমাদের—আপনাদের ধর্ম আপনাদের। আমরা তো বলিনি—আমাদের ধর্ম আপনারা নিন। আমরা ওসব আপনাদের ওপর চাপিয়েও দিইনি। ঈশ্বরে যাবার রাস্তা অনেক। সব ধর্ম নিয়েই ঈশ্বরে যাওয়া যায়। আপনাদের ধর্মকে তো মিথ্যা বলিনি।

কথাটা বড় ভালো লাগলো ট্যাভারনিয়ারের। মনে মনে সে আগা দানেশমন্দ খাঁকে ধন্যবাদ জানালো। বামন ভট্টের মতো খাঁটি একটি হীরে তিনি আমায় বেছে দিয়েছেন। আমি হিন্দুদের শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃত জানি না। কিন্তু বামন ভট্ট আমার চোখের সামনে অনেক দরজা খুলে দিচ্ছেন।

সিরোঞ্জের এই সরাইখানায় এখন নানারকম রান্নার গন্ধ বাতাসে। দু'জন পোলিশ ব্যাপারী জীবনে প্রথম দুম্বার মাংস চাখবে বলে রান্না চাপিয়েছে। তাতে হিন্দুস্থানী মশল্লা পড়ে ভারি সুন্দর গন্ধ বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছে। তার ভেতর ভাথিয়ারারা সারি সারি ভাতের হাঁড়ি উল্টে ফ্যান গালছে। তারও খিদে চনমনানো সুবাস বাতাসে। কখন যে দানিয়েল ওরা ফিরবে? মলিয়ের নিশ্চয় স্কেচবই খুলে কোনো গাছতলায় বসে গেছে।

—আচ্ছা। আপনারা গোরু নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেন কেন? গোরু যেন ভগবান। তার লেজ ধরে, সেদিন দেখলাম, এক ছোকরা তার মায়ের সৎকার করে নদীতে নামছে—বেগম-কি-সরাইয়ের পর সেই এক গাঁয়—

—শাস্ত্রকাররা অনেক ভেবেই এই বিধান দিয়ে গেছেন। গরমকালে সারা দেশ খাক হয়ে জ্বলে যায় সাহেব। গোরুর খাবার থাকে না। তারপর সেই গরমে হিন্দু মুসলমান সবাই যদি গোরু খেতে থাকে তো সারা দেশের গোরু ফুরিয়ে যাবে যে! এমন গরম দেশে গোরুর মাংস শরীরের পক্ষে ভালোও নয়। একবার তো জাহাঙ্গীর বাদশা ফরমান দিয়ে তামাম হিন্দুস্থানে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দেন।

—কেন ?

—গোরু ফুরিয়ে যাবে তাই।

কথাটা তো খুব ভুল বলেননি বামনভট্ট। সরাইখানার দোরে রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে দানিয়েল ঢুকলো। সুরাট থেকে এতটা পথ আসতে হাড় জিরজিরে গোরুর পাল প্রায়ই চোখে পড়েছে ট্যাভারনিয়ারের। দানিয়েলের পেছন পেছন মলিয়ের।

—আলেকজান্ডার কোথায় ?

—পেছনেই আসছে—

সবাই মিলে খেতে বসলে বামনভট্ট আগে আচমন সারলেন। সরাইয়ের দেওয়া থালার পাশে পিতৃপুরুষকে অন্ন দিলেন। দিলেন তাতে জলের ফোঁটা ছিটিয়ে। সবই দেখছিল ট্যাভারনিয়ার। সারা সরাইয়ের কুটিরে কুটিরে মুসাফিরদের জটলা। ভাতের হাঁড়ি ঘিরে। ট্যাভারনিয়ারের মনে হলো—হিন্দুস্থান নামে এই দেশটায় যেসব কাণ্ডকারখানা দেখে আচমকাই মনে হয়—বিদঘুটে, অন্ধ বিশ্বাস—সেগুলোই একটু খতিয়ে দেখলে মনে হবে—তাদেরও একটা মানে আছে। ঘোড়ার পিঠে সুরাট থেকে সিরোঞ্জ অব্দি এতটা পথ আসতে নানান জায়গায় নানান জিনিস চোখে পড়েছে ট্যাভারনিয়ারের।

হিন্দুস্থানে আদি বাসিন্দা হিন্দুরা নিজেদের নিয়ে মেতে আছে। জপ-তপ, পুজো-পার্বণ, উৎসবেই তারা মাতোয়ারা। ভোরবেলা পুবদিকে সূর্য উঠলে তারা হাতজোড় করে সূর্যকে নমস্কার করে। হিন্দুকুশ, সমরখন্দ, অর্গন্ধব নদীতীর, কাস্পিয়ান বনভূমি, উজবেগ গিরিপথ, ইরানি মরুভূমি এলাকা—সব জায়গা থেকে মানুষের পর মানুষ এখানে এসেছে। তারা এসে রাজ্যপাট করে একের পর এক এই হিন্দুস্হানের ভেতর মিশে গেছে। মিলিয়ে গেছে। তাদের কাবাব-বিরিয়ানি, কুর্তা, আজানের সুর, ধর্ম এদেশের বুকের ভেতরের নিজের জিনিস হয়ে গেছে। এরাই ফৌজ। এরাই বাদশা। এরাই হুকুম। এরাই শাস্তি। বাদশা কোথায় ফৌজ পাঠিয়ে লড়াই করলেন—কোন জায়গা দখল করলেন—তা নিয়ে এদেশের মানুষের কোনো মাথাব্যথা নেই। হিন্দুস্হান চলেছে নিজের মতো। আপন খেয়ালে।

ওদের খাওয়ার মাঝামাঝি আলেকজান্ডার এসে হাজির। ধুঁকতে ধুঁকতে বললো, ওরে বাবা ! এ গরম আর সহ্য করতে পারছি না।

সরাইয়ের দোরে বিরাট এক মাটির কলসি। সেটা দেখিয়ে বামন ভট্ট বললেন, তেঁতুলের জল রয়েছে। খেয়ে নিন। গরম হালকা লাগবে।

কাঠের বারোয়ারি হাতায় তেঁতুল জল তুলে খানিকটা খেল আলেকজান্ডার। খেয়ে বসে থাকতে থাকতে শরীরটাও তার শান্ত হলো। সেদিকে তাকিয়ে ট্যাভারনিয়ার বললো, আপনারা দেখছি খানিকটা করে চিকিৎসাও শিখে রেখেছেন।

—এর ভেতর কোনো শেখাশিখি নেই। হিন্দুস্হানে মাঠে ঘাটে তেঁতুলগাছ। তাই তার ব্যবহার। আয়ুর্বেদেই আছে—

—আয়ুর্বেদ ?

—হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্র।

—মুসলমানেরও তো চিকিৎসা শাস্ত্র আছে।

—আছেই তো সাহেব।

—আপনারা পূবমুখো হয়ে প্রার্থনা করেন। মুসলমানরা পশ্চিমমুখো হয়ে নামাজ পড়েন। আপনাদের শাস্ত্র সংস্কৃতে—ওদের আরবিতে। কেউ তো কাউকে বোঝেও না।

—শাস্ত্রের কোনো জাত নেই। তাছাড়া আকবর বাদশা তো ঢালাও ব্যবস্থা করে গেছেন।

ট্যাভারনিয়ার লক্ষ্য করেছে—হিন্দুস্থানে মানুষজন কোনো কথা বলতে গিয়ে কথায় কথায় আকবর বাদশাকে টেনে আনে। সে জানতে চাইলো, কী রকম? এখানেও আকবর?

—আকবর নয়। বলুন আকবর বাদশা। তাঁর উজিরে আজম আবুল ফজল—দরবারের কবি ফৈজিকে দিয়ে তিনি ঢালাওভাবে হিন্দুর শাস্ত্র ফারসিতে অনুবাদ করান। যাতে কিনা হিন্দু মুসলমান নিজেদের ভালো করে চিনতে পারে—যাতে কিনা দু'তরফের ভেতর হিংসা উবে গিয়ে সেখানে ভালোবাসা বাসা বাঁধতে পারে। আমার ঠাকুর্দা সমেত পয়লা সারির ন'জন সংস্কৃত পণ্ডিত আবুল ফজল, ফৈজি, বদাউনি, নজীব খান, সুলতান থানেশ্বরীকে সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদে সাহায্য করেন। রামচন্দ্রের মতো দুসরা সারির হিন্দু পণ্ডিতরা হৃদয় রহস্য বুঝতেন। রামকিষণ, বলভদ্র মিশ্রের মতো তিসরা সারির পণ্ডিতরা দর্শন বুঝতেন। মহাদেব ভীমনাথের মতো হিন্দু বৈদ্যরা ছিলেন চৌথা সারিতে। সবচেয়ে শেষের সারিতে ছিলেন বিজয় সেন, জ্ঞানচাঁদের মতো বিজ্ঞানীরা। এ ছাড়াও রামদাস, তানসেনের মতন গাইয়েরা বাদশার দরবারে গান শোনাতেন।

গানের কথায় ট্যাভারনিয়ারের মনে পড়ে গেল—কালই রাতে সরাইয়ের রসুইকারদের একজন এমন সুরেই গাইছিল—যে সুর কিনা তাকে মনে পাড়িয়ে দিচ্ছিল—এই এই সুর আমি বন্দর আব্বাসে এক তুর্কি আমিরকে গাইতে শুনেছিলাম। বিশাল মধ্য এশিয়া যেন কয়েকশো বছর ধরে একটু একটু করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে হিন্দুস্থানের শরীরের ভেতর মিশে গেছে। এই হিন্দুস্থানকে কি আমি চিনতে পারবো? চিনে তার বুকে কি আমি হীরে চুনির কারবার করতে পারবো? কী বিশাল! কী রঙিন! কী বিচিত্র!

শও সন হয়ে গেল কান্দাহার নিয়ে মুঘল আর সাফাবি শাহদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি ঝগড়া। কান্দাহারের পারসি কিল্লাদার আলি মর্দান খাঁ আগ্রার হাতে কান্দাহার তুলে দিয়ে রাতারাতি শাহজাহানের দরবারে আমির বনে যাওয়ায় ইরানের শাহ আব্বাস রাগে ফেটে পড়লেন। সুযোগ বুঝে শাহজাহান বাদশা কান্দাহার তো বটেই—কাছাকাছি বস্ত আর জমিনদবারও শক্তপোক্ত করে তুললেন। ডেরা গাজী খান আর ডেরা ইসমাইল খান—এই দুই জায়গা জুড়ে দিয়ে তিনি কান্দাহারকে করলেন হিন্দুস্থানের এক নয়া সুবা। তাঁর সম্বচ্ছরের খাজনা দাঁড়ালো পনেরো লক্ষ তনখা।

এত সব করেও শাহজাহানের ঘুম নেই।

১০৪৮ আল হিজরির জামন্দা সুয়েম-ভর-শীতের মাসে মুঘল ফৌজের মাথায় লাহোর থেকে শাহজাদা দারাশুকো কাবুল রওনা হলেন। জোর খবর—পারসি ফৌজ কান্দাহার থেকে নিচে ছুটে আসছে। দারা এ সুযোগ হারাতে চান না। তিনি জানেন—তিনি যদি কিছু চান—তা না দেবার নয় বাদশা শাহজাহানের। তিনি আব্বা হুজুরের চোখের মণি। আজ যদি কান্দাহারে বাহাদুরি দেখাতে পারি—তাহলে আমাকে বাদশার কিছুই অ-দেবার থাকবে না। পাহাড়ী পথ দিয়ে চলেছে মুঘল ফৌজ। ঘোড়সওয়ারের দল তুষার-পেছল পাথরের ওপর দিয়ে ঘোড়া সামলে নিয়ে চলেছে। হাতিদের ওসবে বিশেষ ভ্রুক্ষেপ নেই। কী তুষার—কী রোদ—সবই যেন সমান। লাহোরের ভার নায়েব নাজিমের হাত দিয়ে শাহজাদা গজনির পথে রওনা হয়েছেন। সন্ধের আগে খাইবারের তিনটি পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে যাওয়া দরকার। অথচ এই ভর দুপুরেই অবিরাম তুষার পড়ে পড়ে সূর্য ঢেকে ফেলেছে। পেয়ারের হাতি ফতে-জংয়ের পিঠে গাদেলায় বসে একটি কথা তাঁর মনে এলো। আমরা আমাদের যে যার পাওয়ার জিনিস পাবো বলে কী বিপুল কাণ্ড কারখানা বাধিয়ে বসি। আব্বা হুজুর কিছুতেই কান্দাহার হাতছাড়া করবেন না। তাই এই অভিযান। আমি রানাদিলকে শাদি করার কথাটি পাকা করে নিতে কান্দাহারে বাহাদুরি দেখাতে চলেছি। আমার আর আব্বা হুজুরের এই দুই চাহতের বোঝা বইছে পদাতীরা, বন্দুকীচিরা, ঘোড়সওয়াররা, মীর আতশের লোকজন, বেলদাররা। তুষার পেছল পাহাড়ীপথ ভাঙতে ভাঙতে।

কিলিচ খাঁকে পাঠানো হয়েছে সিধে কান্দাহারে। তিনি ওখানে পৌঁছে পারসিদের কাজ কর্মের ওপর লক্ষ্য রাখবেন। দারাশুকো একবার পেছনে তাকালেন। পদাতির দল চানা চিবোতে চিবোতে মাথা নিচু করে পথ ভেঙে ওপরে উঠে আসছে। আজ ওরা এই ভিজে আবহাওয়ায় রাঁধতে পারেনি। অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে লাহোর। পরশু মুঘল ফৌজ পেশাওয়ার ছেড়ে জালালাবাদের পথ ধরেছিল। কাল দুপুরে এই ফৌজ জালালাবাদ পেছনে ফেলে কাবুলের পথ ধরেছে।

সামনের আসমান আগাগোড়া ঘন কুয়াশা হয়ে পাহাড়ের মাথায় নেমে এসেছে। এই আসমানের দিকে তাকিয়ে দারা যেন নিজেকেই বিড় বিড় করে বললেন, শুধু নিজেরটাই বুঝলে! কান্দাহারে বাহাদুরি দেখিয়ে শাহী সাবাসি পাওয়ার সময় নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াটাই আসল হয়ে দাঁড়ালো? সবই রানাদিল? বাজির কথা মনে নেই দারাশুকো? তোমার বাজি? শাহজাদী জাহানারার কথা? তিনি যে তোমারই দিকে তাকিয়ে আছেন দারা। শাহী সাবাসি পাওয়ার মুখে তুমিই দারা বাদশাকে দিয়ে আকবরি বাধা ভেঙে ছত্রশালের হাতের সঙ্গে তোমার বাজির হাত মিলিয়ে দিতে পারো। শুধু তুমিই পারো সেই কঠিন কাজ।

দারা আসমান থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন। নানা রঙে রাঙানো ফতে-জংয়ের মাথায় আঁকা শুভ চিহ্নগুলো সবই তুষারে তুষারে ধুয়ে গেছে। শাহজাদার মনে হলো—আমরা কি সত্যিই এগোচ্ছি? বহুদিন আগে আগ্রা দুর্গের শাহী মক্তবে

দৈলভি সাহেব আফলাতুনের তর্কশাস্ত্র পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, দুনিয়ায় বড় বড় স্থায়ী জিনিসগুলো জায়গা বদলায় না। আমরাই শুধু তাদের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘুরে কখনো মনে করছি—এগোচ্ছি। কখনো মনে করছি—পিছোচ্ছি। আসলে আমরা আমাদের জায়গাতেই থেকে যাচ্ছি। তাই কি? এখন কি আমরা কাবুলের দিকে যাচ্ছি না? যদি না-যাই তো কোথায় যাচ্ছি? তবে কি পিছিয়ে লাহোর চলেছি? সব গুলিয়ে গেল শাহজাদার। পাহাড় পর্বত নদীনালা ছাড়াও তো দুনিয়ায় আরও অনেক বড় বড় জিনিস আছে। ভালোবাসা, নফরতি, বিস্মৃতি, বে-চ্যায়নি। এদের পাশ দিয়ে আমরা কি এগিয়ে যাই? না, আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরিই করি স্রেফ? তাহলে মৃত্যু কী? কেন জন্ম? জন্মালে কেন এই যন্ত্রণা? চেয়ে না পাওয়ার যন্ত্রণা? চাহত জিনিসটা কী? জীবনের জন্যে এত লালচ কেন?

কনকনে বাতাসের এক ঝাপটায় তুষার কুচিগুলো উড়ে পাশের খাদে গিয়ে পড়লো। আমি যদি শাহজাদা না হয়ে আগ্রা দুর্গের গায়ে যমুনা ঘেঁষে বসা সন্ধ্যা বাজারের ব্যাপারী হতাম—তাহলে এতক্ষণে এমন শীতভিজে দুপুরে আফগানি কম্বল মুড়ি দিয়ে চোখ ভরে ঘুমোতাম। সন্ধে সন্ধে ঘুম দিয়ে উঠে রাজধানীর লালচকে গিয়ে ঘুরে ঘুরে রইসি মানুষজন দেখতে পারতাম। কোনো উচ্চাশার যন্ত্রণা থাকতো না। বোঝা থাকতো না। আসলে বোধি, মেধা—এসবই মানুষকে শেষ অব্দি কুরে কুরে খায়।

খাইবার পেরিয়ে তিনদিনের মাথায় জালালাবাদের পাহাড়ী পথে সূর্যকে পেলেন শাহজাদা। এখানে সহ্য হওয়ার মতো শীত। সেই সঙ্গে আরামের রোদ্দুর। দেখতে দেখতে কাবুল। ক'দিনের ভেতর কাবুল ফৌজি শহর হয়ে উঠলো। ভিজে স্যাঁতসেঁতে দশা থেকে রোদে এসে পদাতি থেকে ঘোড়সওয়ার সবাই যে যার ভিজে জিনিসপত্তর শুকিয়ে ভাজাভাজা করে নিতে লাগলো।

দারাশুকো ঘুরে ঘুরে ফৌজের মানুষজন, হাতিঘোড়া, উট, বারুদ, বন্দুক সরেজমিনে দেখেন আর সুন্দর পাহাড়ের মাথায় আরও সুন্দর দিগন্ত দেখে ভাবেন—লড়াই মানেই তো এই সব জায়গায় বারুদ ঠেসে দিতে হবে। পাথর ফাটানো গোলার আওয়াজ, যন্ত্রণায় হাতির পাঁজর ফাটানো চিৎকার আর ফৌজের আল্লা হু আকবরে সারা দিগন্ত ভরে যাবে। সব জেনে শুনেও আল্লাতালা আমাদের দিয়ে এসব করান কেন বুঝি না।

পাঁচটি দিন কাবুলে কাটিয়ে শাহজাদা দারাশুকো রোদ ঝলমলে পরিষ্কার ভোরে গজনির পথ ধরলেন। লাহোর থেকে কাবুল যেমন ওপরের দিকে ঠেলে ঠেলে ওঠা—কাবুল থেকে গজনি তেমনি দক্ষিণে নেমে আসা। পাহাড় হলেও ডাঙা সমান সমান জায়গাই বেশি। গজনির গা দিয়েই হেলমন্দ বয়ে গিয়ে কান্দাহার আর তার চারপাশ সুফলা করেছে। মুঘল ফৌজের আফগান সেপাইরা লড়াই করতে এসে নিজেদের সুবায় ফিরতে পেরে খুব খুশি। সারাদিন কুচ করে এগিয়ে সন্ধেয় তাঁবু ফেলা। তারপরেই শুরু হয়ে যায় আফগান সেপাইদের গোল চাঁদ সমান রুটি সেঁকা আর রবাব বাজিয়ে গান গাওয়া। শুনতে শুনতে

শাহজাদার মনে হয়—এই পথ দিয়ে মুঘলরা হিন্দুস্থানে গিয়েছিল। আশ্চর্য! হিন্দুস্থান হয়ে গেল আমাদের স্বদেশ।

ওই যে মাঠে রাখালরা ভেড়া চরাচ্ছে—ওরাই একদিন মুঘলদের স্বজাতি ছিল। ওই যে উজবেক ঘোড়া-ব্যাপারীরা ঘোড়া নিয়ে চলেছে কাবুল বাজারে—ওরাই একসময় মুঘলদের কাছাকাছি আত্মীয় ছিল। এখন এরা হিন্দুস্থানের বাসিন্দা মুঘলদের কাছে বিদেশীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ভূগোল কী আশ্চর্য পাল্টে যায়।

কাবুল থেকে গজনির পথে খোলা প্রান্তরের ভেতর মুঘল ফৌজ চলেছে। যেন বা চলন্ত আগ্রা। কী নেই ফৌজে! রাতারাতি সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্যে বেলদার বাহিনী। আবার তোপের গোলা যদি ফুরিয়ে যায় তো এমন সব কারিগরের বাহিনী রয়েছে—যারা পাথরের চাঙ কেটে গোলার চেহারা দিতে পারে পাথরকে।

আর একদিনের রাস্তা পেরলেই মুঘল কিল্লার শহর—আটক পড়বে। দুর্গের শহর এই আটক দাঁড়িয়ে আছে কাবুল নদী আর সিন্ধু নদের মোহানায়। এখান থেকেই আগ্রা সারা তল্লাটের ওপর নজর রাখে। শাহজাদা চোখ বুজেই যেন দেখতে পেলেন—এই দুই নদীপথ ধরে কত যুগের সভ্যতা, সঙ্গীত যেন এশিয়ার এই মোহানায় এসে মিশেছে। তাতে লেগে আছে ওই তাতার রাখালদের মুখের হাসির লাবণী। আর তাবত এই ইতিহাস, দর্শনকে ভ্রূকুটি করে দাঁড়ানো আটকের ওই জবরদস্ত মুঘল কিল্লা—যে কিনা কোনো সভ্যতারই ধার ধারে না—জানে শুধু তাগদ, দখল, হামলা, জয়।

ওদিকে আগ্রার পথে কুঁয়ারি-কি-সরাই পেছনে ফেলে ধউলপুরে সন্ধে সন্ধে এসে হাজির হলো ট্যাভারনিয়ারের দলটি। আজ সারাটি দিন দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে গেছে দানিয়েলদের। মালয়ের তো সমানে বমি করে চলেছে। আর মাঝে মাঝেই হেঁচকি তুলছে।

সামনেই চম্বল। বামন ভট্ট বললেন, এখানে থামা চলবে না। আমরা নদী পেরিয়ে মনিয়া-কি-সরাইতে গিয়ে উঠবো। সেখানেই থাকবো রাতটা। ভোর হলেই তো রাজধানী আগ্রা আর মোটে একদিনের রাস্তা।

ট্যাভারনিয়ার বললো, ধউলপুরেই থেকে যাই না রাতটা?

—না সাহেব। পথে যা আজ ঘটলো—তারপর এদিকে মুঘল সেপাইরা দৌড়োদৌড়ি জুড়ে দেবে কাল ভোর থেকে। কাজের ভেতর ওরা শেষে আমাদের না গেরেফতার করে চালান দিয়ে দেয়। আসল অপরাধী তো ধরতে পারবে না।

—তাহলে চলুন।

নৌকো নিলো পুরো একটি আশরফি। চম্বল পেরিয়ে পুরো এক ক্রোশ রাস্তা আর ফুরতেই চায় না। শেষে আলেকজান্ডার মলিয়েরকে কাঁধে নিলো।

মলিয়ের চলতেই পারছিল না। সিরোঞ্জ ছাড়ার পর চুক্তিবন্দী ভাড়ার ঘোড়া ওরা ছেড়ে দিয়েছে।

মনিয়া-কি-সরাই বেশ বড়। আর ব্যবস্থাও ভালো। কাছাকাছি একজন বৈদ্য পাওয়া গেল। তিনি এসে কী এক পুরিয়া খাইয়ে দিতেই মলিয়েরের বমি বন্ধ হলো। হেঁচকিও কমে এলো। কয়েকজন ওলন্দাজ নীল-ব্যাপারীর হৈ-হট্টগোল ছাড়া সারা সরাই নিশুতি রাতের সঙ্গে সঙ্গে নিঃঝুম হয়ে এলো।

আর একদিনের পথ আগ্রা। তারপর সেখানে পৌঁছলেই দেখতে পাওয়া যাবে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে শক্তিশালী শাহী—মুঘলশাহী। মনিয়া-কি-সরাইতে পাশাপাশি দুখানি বেশ বড় কোঠা নিয়েছে ট্যাভারনিয়ার। তার আর তর সইছে না। কখন ভোর হবে। তারপরই তো আগ্রা যাওয়ার রাস্তা। মোটে একটা দিনের রাহাগিরি ফুরলেই হিন্দুস্থানের রাজধানী।

ট্যাভারনিয়ারের কোঠাঘরে তার পাশেই আলেকজাণ্ডার ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে দানিয়েল। পাশের কোঠায় বামন ভট্টের সঙ্গে মলিয়েরের জায়গা হয়েছে।

আজ যা গেল সারাটা দিন তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। আজ ভোরে কী কুক্ষণে যে তারা কুঁয়ারী-কী-সরাই থেকে রওনা হয়েছিল। দুই খিলানের ওপর সেতুর নিচে কুমারী নদী বয়ে চলেছে। ভোরবেলা নদীর স্বচ্ছ জল দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি ট্যাভারনিয়ার। সে তার ডাইরিখানা খুলে বসলো।

গোটা গোটা হরফে পাতার ডানদিকের ওপরে লিখলো—

১৬৩৯, ২২শে ফেব্রুয়ারি।

আজ ভোরে কুঁয়ারী-কি-সরাই থেকে বেরিয়ে বামনভট্ট বললেন, সরাইয়ের কাছাকাছি শাহী তসিলদারের কাছে একবার আপনাদের কাগজপত্র দেখানো দরকার। কেননা আমরা সরকার আগ্রার মহলে ঢুকবো এবার। এখান থেকেই বিদেশীদের কাগজপত্র দফায় দফায় শাহী আমলার দস্তখত করিয়ে নেওয়াই নিয়ম।

দেহাতি এলাকা। শাহী আমলা বলতে এখানকার তসিলদারকে পাওয়া গেল। তাই-ই সই। মুঘল শাহী ভীষণ কাগুজে। কাগজে ওদের বড় বিশ্বাস। ছোট একটি মসজিদের পাশে কুমারী নদী বয়ে চলেছে। তার তীরে এক হরিতকি গাছের ছায়ায় রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল তসিলদার। তাকে ঘিরে কয়েকজন খালি গা হিন্দু। একজনের ন্যাড়া মাথার পিছনে কয়েক গাছি চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। সে কয়েক আশরফি তসিলদারের সামনে ধরতেই তসিলদার ছোঁ মেরে সেগুলো তুলে নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো, জাহান্নমে যাও—

অমনি লোকগুলো হাসতে হাসতে বেগে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা দেখে আমার কেমন অদ্ভুত লাগলো। আমাদের কাগজপত্র সই সাবুদ করিয়ে বেরিয়ে এলাম হরিতকিতলা থেকে। কুমারী নদীর ওপর সেতু পার হচ্ছি। ভোরের রোদে আলাদা কী এক শান্তি থাকে। তার ভেতরও মনটা অস্থির হয়ে উঠলো আমার। কয়েক আশরফি গচ্চা। তার ওপর দাঁত খিঁচুনি। তব হাসি মুখে বেরিয়ে যাওয়া? কেমন খটকা লাগলো।

ব্যাপারটা বামনভট্টকে বলতেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। শেষে বললেন, আকবর বাদশা বিধান দিয়ে গেছেন—কোনো বিধবার সায় না থাকলে তাকে তার স্বামীর চিতায় সহমরণে পাঠানো যাবে না।

—একটু খুলে বলুন।

তারপর বামন ভট্ট যা বললেন তা রীতিমত ভয় ধরিয়ে দেয়। হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর মৃতদেহকে কোলে নিয়ে একই চিতায় মারা যায় তো ধর্মের দিক থেকে তা খুব পুণ্যের। এই সহমরণে শাহী আমলার সায় চাই। কোনো আমলাই ঘুষ না নিয়ে সায় দেয় না।

—সায় না দিয়ে সেই বিধবাকে বাঁচাতে পারে না ওরা ?

—অনেক অসুবিধা আছে সাহেব। স্বামীর চিতা এড়িয়ে পালিয়ে আসা হিন্দু বিধবা তো ধর্মদ্রোহী। মুসলমান হয়ে অন্য ধর্মের দ্রোহীকে আশ্রয় দেওয়া সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখবে না। এদেশে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই তো হিন্দু। একজন মুসলমান আমলা অতটা ঝুঁকি নেবে কেন ? তার চেয়ে ঘুষও পাওয়া গেল—আপদও বিদায় হলো।

—এত বড় দেশ। অন্য কোথাও তো পালাতে পারে সেই বিধবা।

—পারে। পালায়ও। বেশিদূর যেতে পারে না। ডোমদের ঘরে আশ্রয় পায়। জীবনটা শেষ হয় অপমানে। বেবুশ্যে হয়ে। আমাদের দেশে বিধবারা বড় নিরুপায়। রাস্তায় দেখেননি—গোবর ঘেঁটে এক বিধবা অজীর্ণ গেঁহুদানা খুঁজছে ?

—হ্যাঁ। দেখেছি। সিরোঞ্জ থেকে উজিয়ে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে দেখি সাদা থান পরা এক বিধবা গোবর ঘেঁটে কী খুঁজছে ?

—হ্যাঁ। ওটাই ওর ব্রত। ওই অজীর্ণ গেঁহুদানা জোগাড় করে তারই রুটি খেয়ে ওই বিধবা বেঁচে আছে। কোথাও কোথাও তো কেউ বিধবা হলে আত্মীয়রা তাকে গলা টিপে খুন করে। তারপর লাশ গায়েব করতে মাটি চাপা দেয়। ওই টিকিওয়ালা যে ব্রাহ্মণকে দেখলেন, সেই এই সহমরণে সবচেয়ে লাভবান হবে।

—কিরকম ?

—বিয়ের রাতের সাজে সহমরণে যেতে হয় সদ্য বিধবাদের। সব চুকে-বুকে গেলে ওই ব্রাহ্মণই সবার আগে ছাই ঘেঁটে বিধবার যা-কিছু গয়নাগাঁটি পাবে তাই নিয়ে যাবে।

মলিয়ের আনন্দে লাফিয়ে উঠলো প্রায়। আমি সহমরণের ছবিটা এঁকে নেবো।

এই দুর্লভ ছবি আঁকতে পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে মলিয়েরের মুখে আর হাসি ধরে না। তা দেখে আমার পৈশাচিক লাগলো। বামনভট্ট পথে থামতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষে আমিই বললাম, সামনেই তো ধউলপুর। না হয় সন্ধে সন্ধে যাওয়া যাবে। কাছেই তো। দেখে যাই—ব্যাপারটা।

নিমরাজি হয়ে বামন আমার মুখে তাকালেন। বললাম, রাজি হয়ে যান।

শ্মশানটা কোথায় ? মলিয়ের ছবি এ'কে নেবে। বড্ডো ইচ্ছে ও'র—

—কোথায় আবার! দেহাতে শ্মশান মাত্রেই নদীর পাড়ে। এই কুমারীর গায়েই হবে কোথাও।

বিশেষ খ'ুজতে হলো না আমাদের। নদীর গা ধরে খানিকটা উজিয়ে দেখলাম—অনেক মানুষের ভিড়। একটি উ'চু মতো জায়গায় বিধবাটিকে সাজানো হচ্ছে। বিয়ের রাতের সাজে। কপাল জুড়ে সি'দুর। চুল খোলা। বয়স বেশি নয়। তিরিশের ভেতরই হবে। জায়গাটায় যেন মেলা বসে গেছে।

আমরাও কিছুদূরে এক গাছতলায় বসলাম। মলিয়ের ছবি আঁকার তোড়জোড় শুরু করলো। বামনভট্ট কোথায় গিয়েছিলেন। এসে বললেন, ও বাবা! বিধবার অনেক গুণ! স্বামী থাকতেই এখানকার এক মুসলমান দর্জি'কে মন দিয়ে বসেছিল। দর্জি'টি ভালো সেতার বাজায়। তাকে বিয়ে করে পালাবার জন্যে ও ওর স্বামীকে খুন করে। বিষ দিয়ে। তারপর ছেলেটিকে গিয়ে নাকি বলেছিল—এবার আমি মুক্ত। চলো, পালাই আমরা।

সব শুনে ছেলেটি ভয়ে সি'টিয়ে যায়। সে বলে, না। আমি তোমায় বিয়ে করবো না। তোমায় নিয়ে পালাবোও না। তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও।

তাতেই নাকি বিধবাটি স্বামীর ঘরে ফিরে যায়। গিয়ে বলে, আমি সহমরণে যাবো। তাতে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। কী পুণ্যবতী। সবাই এসে ওর পা ছ'ুয়ে প্রণাম করে যাচ্ছে।

আমি বললাম, সেই সেতার বাজিয়ে মুসলমান দর্জি'টি কোথায় ?

বামনভট্ট আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই তো—

তাকিয়ে দেখি, ভিড় থেকে কিছুদূরে এক যুবক আলাদা দাঁড়িয়ে। চোখে সুর্মা। মুখে বিষাদ। বেশ দেখতে ছেলেটি। গায়ের কুর্তা-কামিজ অগোছালো। ডান হাতের আঙুলে মেজরাফ।

॥ ষাট ॥

নিজের চোখে না দেখলে এসব আমি বিশ্বাস করতাম না। কুমারী নদীর তীরে যেন উৎসব লেগে গেল। মলিয়ের তার স্কেচবুকে পুরো দৃশ্যটা এ'কে নিচ্ছিল। এগিয়ে দেখি শুকনো একটা ডোবার তলায় বেশ বড় করে গর্ত করে চিতা সাজানো। তার ওপর সেই মেয়েটির স্বামীর মড়া শোয়ানো। ন্যাড়া মাথায় টিকি দুলিয়ে চার পাঁচজন লোক সেই চিতায় আগুন দেবার তোড়জোড় করছে। চার পাঁচজন আওরত—বেশ বয়স হয়েছে—পরিপাটি সেজে সেই চিতা ঘিরে নাচছে গাইছে —হাত ধরাধরি করে। মুসলমান নওজওয়ান দর্জি ভিড় থেকে একটু দূরে দূরেই। দেখলাম, বামন ভট্ট ফিরে ফিরে তাকেই দেখছেন।

যে আওরত বিধবা হয়ে আজ সহমরণে চলেছে—সেই তো ওই মুসলমান সেতারী নওজওয়ানের প্রেমে পড়ে বিষ খাইয়ে নিজের স্বামীকে খুন করেছিল। নওজওয়ান নিশ্চয় খুব ভালো সেতার বাজায়। বিধবা হওয়ার আগে মেয়েটির

হয়তো বিশ্বাস ছিল—ওই সেতারী তাকে বিয়ে করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের স্বামীকে খুন করেই ওই আওরত নাকি তার আশিক ওই নওজওয়ানকে গিয়ে বলেছিল, চলো—তাড়াতাড়ি এখন থেকে পালাই। পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করবো। ধরা পড়লে আমায় সহমরণে যেতে হবে। চলো—

বিপদ দেখে নওজওয়ান আর বিয়ে বসতে রাজি হয়নি। তক্ষুণি ওই আওরত তার আত্মীয়স্বজনকে গিয়ে বলেছে—যোগাড়যন্ত্র করো। আমি সহমরণে যাবো।

অমনি ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সবই আমি ভিড়ে ভেসে ওঠা কথাবার্তা শুনে লিখছি। হলফ করে বলতে পারি—এর একটি কথাও আমার বানানো নয়।

প্রচুর তেল-ঘি ঢালা হলো চিতায়। ওই আওরত চিতার চারদিক ঘুরে ঘুরে আত্মীয়-স্বজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বিদায় নিলো। এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে সে সেই মুসলমান নওজওয়ানের কাছে এগিয়ে এলো। আওরতের মুখে কোনো বেদনা, যন্ত্রণা বা অস্বস্তির চিহ্ন নেই। সে বেশ স্পষ্টই চেঁচিয়ে বলছে—পাঁচ-দুই-পাঁচ-দুই।

বামন ভট্টকে বললাম, ও কী বলছে?

বামন বললেন, ওই আওরত এর আগে পূর্ব জন্মে এই স্বামীর সঙ্গে পাঁচবার এমন সহমরণে গেছে। আর দু'বার সহমরণে যেতে পারলেই সাতবার হয়—হলেই মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে পাকাপাকি স্বর্গে যেতে পারবে।

আওরতের হাতে কেউ পান দিচ্ছিল। কেউ দিচ্ছিল সুপুরি। কারণ আর কিছু নয়, যে যার প্রিয়জনকে স্বর্গে পান-সুপুরি পাঠাচ্ছে। ওই আওরতের হাত দিয়ে।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আওরত সেই নওজওয়ান সেতারীর গলা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে চিতার ধারে তাকে নিয়ে এলো। এনে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো। দিয়েই নিজেও সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনে ঝাঁপ দিলো।

প্রচুর তেল ঘিতে চিতা তখন দাউ দাউ। ভাষায় লেখা যায় না সে দৃশ্য। নওজওয়ান সেতারী ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আওরত তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। আর টিকি দুলিয়ে পুরোহিত তিনজন বাঁশের গোঁজা মেরে মেরে ওদের চিতার ভেতরেই চেপে ধরে রাখছে।

আর লিখতে পারলো না ট্যাভারনিয়ার। তার মনে পড়লো, সে দৃশ্য দেখে মলিয়ের কেমন হড় হড় করে বমি করে ফেললো। সবই আজকের দিনের বেলার কথা। তারপর থেকেই মলিয়ের হেঁচাক তুলেই চলেছে।

ধউলপুর পেছনে ফেলে এই মনিয়া-কি-সরাইতে উঠে তবে ট্যাভারনিয়ারদের ডেরা ফেলা। আজ এই রাতে বিদেশী মুসাফিরের রোজনামচায় হিন্দুস্থানের কোনো এক সাধারণ নদীতীরে একটি দিনের কথা পাকাপাকি উঠে গেল। তাতে কে সেতার বাজাতো—কে ফের বিয়ে বসার জন্যে নিজের স্বামীকে বিষ দিলো—এসব কোনো বড় কথা নয়।

ওদিকে শীতের শুরুতে গজনি পৌঁছেই শাহজাদা দারাশুকো যা বুঝলেন, তা হলো, আগ্রা বা লাহোরে বসে আব্বাহুজুর যা খবর পেয়েছেন—তা একদম গুজব। ইরানি ফৌজ আদৌ আসছে না। আসবে কী করে? ইস্পাহানের পশ্চিম সীমান্তে তুর্কি ফৌজের বিরুদ্ধে শাহ-সফী সেপাই সাজাতে ব্যস্ত। গজনিতে ডেরা ডাণ্ডা ফেলার আগেই শাহজাদা দারাশুকো ফৌজকে হুকুম দিলেন, তাঁবু তোলো।

এই রবিউল-আউয়াল মাসটি দারার খুব পছন্দের। পাথুরে ধুলো ওড়ানো হিন্দুস্থানের এই উত্তর সীমান্ত নতুন শীতে শান্ত গম্ভীর হয়ে ওঠে। কাবুল হয়ে এরকমই এক শান্ত, শীতকাতুরে বিকেলে শাহজাদা দারা লাহোর দুর্গের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হাতির পিঠে গাদেলায় বসেই তিনি হিন্দুস্থানের বাদশাকে দেখতে পেলেন। দেখে বড় মায়া হলো দারার। এ-ই কি হিন্দুস্থানের বাদশা? কোনো দিন নিজের বড় ছেলেটিকে তিনি কাছছাড়া করেননি। অনেক দিন পর শাহজাদাকে দেখে বাদশার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

দারাশুকো আর থাকতে পারলেন না। কেতা মাফিক তাঁর বসে থাকার কথা। দুর্গ থেকে মানুষজন বেরিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানাবে। তারপর তাঁর হাতির পিঠ থেকে নামার কথা। শাহজাদা দারা নিজেই মাটিতে নামলেন। নেমে সিধে চওড়া ধাপের সিঁড়ি টপকে টপকে একদম বাদশার কাছে গিয়ে হাজির।

বাদশা শাহজাহান চল্লিশ স্তম্ভের চেহল সেতুন দিয়ে খাড়া করা যেন এক অতিকায় চাঁদোয়া মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যে চাঁদোয়ার নিচে থাকতে পেরে তামাম হিন্দুস্থান নিশ্চিন্ত। চল্লিশটি সেতুন মিলে শাহজাহান নিজেই এক অলৌকিক সেতুন। সেই স্তম্ভ একা হিন্দুস্থানের ভার মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত শক্ত। এত কঠিন। কিন্তু তাঁর চোখে জল?

দারা দৌড়ে উপরে ওঠে বাদশার পায়ে কদমবোসি করতে গেলেন।

বাদশা তাঁকে দু'হাতে নিজের বুকে টেনে তুললেন।

—হজরত! আপনি কাঁদছেন?

শাহজাহান কোনো কথা বলতে পারলেন না খানিকক্ষণ। তারপর অনেক কষ্টে বললেন, তোমায় কতদিন দেখিনি।

আব্বা হুজুরের বুকে কতকাল মাথা রাখেনি সে। যাঁর দোয়ায় এ দুনিয়ায় আসা—তাঁর গায়ের গন্ধ বুঝি আলাদা? একসময় আব্বা হুজুর যখন বাগী হয়ে জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে হিন্দুস্থানের মাঠে-ঘাটে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—তখন দু'একদিন—আব্বা হুজুরের নসিব যখন হেসে উঠতো—সুলতান দারাশুকো তখনকার শাহজাদা খুর্রমের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখেছে—কখন আব্বাহুজুর তাকে তাঁবুর ভেতরকার সুখদোলায় শুইয়ে দিয়েছেন।

এবারই প্রথম বাদশা শাহজাদাকে এতদিনের জন্যে দূরে পাঠিয়েছিলেন। এর আগে কখনো এতদিন তিনি দারাকে কাছছাড়া করেননি। ছেলেকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে এমন করে কাঁদছেন—দারার মনে হলো—যেন হারানো ছেলে তিনি ফিরে পেয়েছেন।

—আমি তো আপনাকে রোজ কাসীদের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি বন্দেগান।

—উঁহু। বন্দেগান নয় দারা। বলো—আব্বা হুজুর।

শাহজাদা সিধে বাদশার মুখে তাকালেন। এই ক'মাসে বাদশার নাকের পাশে যেন গভীর হয়ে সময়ের দাগ পড়েছে। সে কি শুধু কান্দাহার? সে কি বিজাপুর? না, তাবতশাহী?

শাহজাহান বললেন, তুমি এখন চব্বিশ। তোমার মুখে আমি সাচ্চাই দেখতে পাই। দেখতে পাই পেয়ার ভালোবাসার চামেলি পাপড়ি। যা কিনা ইদানীং ইনসানের মুখ থেকে মুছে গেছে।

শাহজাদা সারা হিন্দুস্থানের তাগদের ফোয়ারার দিকে তাকালেন। এই মানুষটির কথাই হিন্দুস্থানে শেষ কথা। ইনিই ইচ্ছা। ইনিই অনিচ্ছা। সেই মানুষ আমার জন্যে এতখানি উতলা? এর ভেতর বাদশা কোথায়? সবটাই তো আব্বাহুজুর।

দূরে নিচে গর্জান ফেরত মুঘল ফৌজ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। শহর লাহোর ছাড়িয়ে সে ফৌজের শেষটা দেহাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই শেষ দিক থেকে ইনসান আর জানোয়ার—সব সারি ভেঙে যে যার ছাউনির দিকে চলতে শুরু করলো। কেন না, সামনেই সন্ধ্যা। লাহোরে শীত সন্ধের পর জাঁকিয়ে আসে।

একসময় বাদশা শাহজাহান দেখলেন, ফৌজিসারি ভাঙতে ভাঙতে—যে-যার ছাউনিমুখো হওয়ায় তাঁর সামনে শুধু শাহজাদা দাঁড়িয়ে। আর তাঁর পেছনে শাহজাদার পেয়ারের হাতি ফতে-জংকে ঘিরে রিসালার কিছু ঘোড়সওয়ার। বাদশা ভালো করে তাকালেন শাহজাদার মুখে। ওখানে তিনি তেরো বছরের সুলতান খুর্রমকে খোঁজার চেষ্টা করলেন। তাজা কিশোর। শাহজাদা সেলিমের ছেলে। কিশোর খুর্রম তখন আল্লাতালার কাছে দোয়া করে চলেছে। একই কথা। দাদাসাহেব আকবর বাদশাকে ভালো করে দাও খোদা। আব্বাহুজুর শাহাজাদা সেলিমের সুমতি দাও খোদা। তিনি যেন তাঁর আব্বাহুজুরের বিরুদ্ধে বাগীপনাহ্ ছেড়ে দিয়ে দাদাসাহেবের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ান। কী সরল—কী নিষ্পাপ ছিলাম। তাগদই কি পাপকে ডেকে আনে?

দারা বাদশার মুখে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর মন এক অজানা কষ্টে ভরে গেল। আট নয় সন হয়ে গেল—আম্মিজান নেই। এই বিশাল হিন্দুস্থানে অন্তহীন তাগদের ভেতর একা এই মানুষটি বাদশা হয়ে ঘোরাফেরা করছেন। কোনো দোস্ত নেই তাঁর। কোন সঙ্গী নেই। সঙ্গীর মত সঙ্গী। সারা হিন্দুস্থান ওঁর দিকে তাকিয়ে। সবাই শুধু চায়। কেউ কিছু ভালোবেসে দেয় না এই মানুষটিকে। আমি যে আমি—যাকে ঘিরে ওঁর এত আশা—সেই আমিও

রানাদিলকে শাদি করার কড়ার করে তবে কান্দাহার রওনা হয়েছিলাম। আমিই বা কী দিয়েছি এই নিঃসঙ্গ বাদশাকে? নিঃসঙ্গ আব্বা হুজুরকে? তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি অনিচ্ছুক 'হ্যাঁ' আদায় করে নিয়েছি শুধু, দিইনি কিছুই।

শাহজাদা শান্ত গলায় বললেন, ভেতরে চলুন আব্বাহুজুর।

বাদশা শাহজাহানের মনে হলো, এই মাত্র আমার বড় ছেলে আমার ভার নিলো। ভালোবাসায়। স্নেহ ভরে। তার ভেতর তাগদের কোনো দাগ নেই। ইরাবতী—যাকে চলতি কথায় সবাই বলে রাভি—সেদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসছিল। দারার কাঁধে হাত রেখে বাদশা পাথরের ঢাকা পথের নিচে এসে দাঁড়ালেন। এখানে আর কেউ নেই। বাদশা কোনো সাক্ষী না রেখেই প্রাণভরে নিজের নওজওয়ান ছেলেকে বুকে চেপে ধরলেন।

শাহজাদা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না: মানুষ ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে বড়বেলায় পা দেয়। সেই সময়টায় সে নিজেও দীঘল হয়ে ওঠে। তখন সে একজন আলাদা মানুষ। আমি এখনো আমার ছেলে সুলেমান-শুকোকে কোলে নিতে পারি। কিন্তু বুক ভরে ভালোবাসার ইচ্ছা জমাট হয়ে উঠলেও আব্বাহুজুর আমাকে আর কোলে তো দূরের কথা—যখন তখন বুকেও নিতে পারেন না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনসান নিজেকে শুধু সহবত মোতাবেক সংযত, দমন করতেই পারে। ইচ্ছার দুয়ার হাট করে খুলে দিতে পারে না। ছোটবেলা স্বপ্ন দেখায়। বড়বেলা সেই সব খোয়াবের টুটি টিপে ধরে। মাটির দুনিয়ায় যাতে পা থাকে সেই দিকে বয়স খুব লক্ষ্য রাখে।

দারাশুকো দেখলেন, হিন্দুস্থানের বাদশা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢাকা পথ দিয়ে দুর্গের সেদিকেই চলে যাচ্ছেন—যেখানে সন্ধ্যায় মজলিশে শাহজাহানের জন্যে কিঙ্গিনা বেজে ওঠে।

নাদিরা আগ্রায়। বাজি আগ্রায়। রানাদিলও আগ্রায়। নিজের গা থেকে কাবুল-গজনির ধুলো ঝেড়ে ফেলে যে শাহজাদা জানা জগতে ডুব দেবেন—সে উপায়ও নেই। এই ক'মাস—মানে শীতের শেষ থেকে নতুন শীতের শুরুতে পৌঁছে শাহজাদা নাগাড়ে ফৌজি ওঠা-বসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না কিছুতেই। গত ক মাসে তিনি হাতির পিঠে লাহোর থেকে কাবুল হয়ে গজনি গেছেন—আবার ফিরেও এলেন। এই লম্বা পাড়ির সব সময় তিনি বিরাট এক ধাঁধার সামনে দুলেছেন।

আমি কি তাগদদার শাহজাদা হয়ে শাহী ধ্বজ কেল্লায় কেল্লায় ওড়াবো?

আমি কি নাদিরা অন্তপ্রাণ হয়ে মমতাজমহলের শাহজহানের মতোই আরেক শাহজাহান হয়ে থাকবো?

আমার সামনে কোন পথ? শাহী? না, ফকিরি? সাফিনৎ-উল-আউলিয়া ক'বছর ধরে লিখে চলেছি। চারশো এগারোজন পীর-ফকিরের জীবন—তাঁদের ত্যাগ-সাধনা—আমি সম্পূর্ণ করে হিন্দুস্থানের সামনে তুলে ধরতে পারবো না?

না, আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আশিয়ানার শেষ কথা—রানাদিলের হাত ধরে হিন্দুস্থানের রাস্তায় হারিয়ে যাবো?

মনসবদারি অঙ্গিয়া, কুর্তা ছেড়ে শাহজাদা গরম জলে পা ডুবিয়ে বসলেন। একজন শাহজাদা হয়ে পয়দা হলে তাঁর পায়ের সামনে সারা হিন্দুস্থান খোলা ময়দান। সেখানে তাঁর নেচে কুঁদে সারাটা জীবন দাপিয়ে বেড়াবার কথা।

যেমন কিনা বাংলা মুলুকে শাহজাদা সুজাঙ্গীর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আগ্রার আশপাশের ফৌজি ছাউনিতে ছাউনিতে শাহজাদা মুরাদ।

আমি কেন দেহাতের এক মামুলি ইনসান হয়ে পয়দা হলাম না খোদা? তাহলে তো আমাকে ঘিরে হিন্দুস্থানের বাদশার মতো একজন আব্বাহুজুরের কোনো খোয়াব, আশা থাকতো না। দিব্যি খিরকা গায়ে দিয়ে হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। রানাদিলের হাত ধরে জামা মসজিদের সামনে দিয়ে নাচতে নাচতে গেলেও কেউ ফিরে তাকাতো না।

বেশ রাতে শাহজাদা দারা খোলা অলিন্দ দিয়ে সামনের আকাশে তাকালেন। ওপরে তাকালেই আসমান। ওখানে যাওয়া যায় না? আমি এই হাতি, ঘোড়া, কামান বন্দুক, কিল্লা-সামান বুরুজ দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে পড়েছি। আমার বিরক্তি এসে গেছে।

পরদিন খুব ভোরে শাহজাদা দারা রাভির গা ধরে চেনা রাস্তায় গিয়াথপুরে গিয়ে পড়লেন। সামনেই আলমগঞ্জ। তার পাশ দিয়ে এগোলেই রাস্তাটা সেতু পেরিয়ে কফিপুরায় পেঁাছেছে। এ রাস্তা বড় সুখের ছিল একদিন। বড় আনন্দে। ক'বছর আগে এই পথ দিয়েই আব্বা হুজুর আমায় মিঞা মীরের কাছে নিয়ে যান প্রথম। কিন্তু তিনি তো আর নেই।

ফিরতে গিয়েও ফিরতে পারলেন না দারা। এ পথ যেন তাঁকে ডাকে। তিনি ভোরের পহেলা রোদে রাভির গা ধরে মিঞা মীরের সেই আস্তানার দিকে চললেন। নিশ্চয় সে কুঁড়ে এতদিন মালিকের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

যতই এগোন দারা—ততই তাঁর বুক কাঁপতে থাকে। শেষে সেই কুঁড়ের চাল চোখে পড়লো তাঁর। আশ্চর্য। কিছুই তো বদলায়নি? মিঞা মীরের আস্তানার উঠোনে পা দিয়ে ধড়াস করে উঠলো বুকটা। তবে কি তিনি ফিরে এসেছেন? উঠোনে একটি ভিজে পিরান মেলে দেওয়া। কুঁড়ের ভেতরে কে খুব সুরেলা গলায় গাইছেন।

হঠাৎ গান থেমে গেল। ভেতর থেকে গলা ভেসে এলো, কে?

দারা চুপ করে রইলেন। মাঝারি লম্বা একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন। চওড়া কাঁধ। কিন্তু কোথাও কোনো মেদ নেই। শান্ত চোখ। তিনি দারার দিকে ভালো করে তাকালেন, কে আপনি?

—আমি একজন ফকির।

—ফকিরদেরও পরিচয় থাকে!

—আপনি বের করুন। কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়।

মানুষটি তখনও একমুখ হেসে বললেন, এবার তোমায় চিনেছি। এসো।

বোসো—বলে দারাকে তিনি হাত ধরে টেনে নিজের পাশে বসালেন। বসিয়ে বললেন, আমি কে জানতে চাইলে না তো ?

—আপনি মুল্লা শা—

—বদকশানি। মুল্লা শা বদকশানি বলেই আমি পরিচিত।

—আপনার কথাই হুজুর মিঞা মীর বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। প্রায় পঁচিশ বছর আগে বদকশান থেকে এখানে এসে ওঁর মুরিদ বনেছিলাম। উনি চলে যেতে কাশ্মীর থেকে নেমে এসে লাহোরে এই কাফিপুরায় মাঝে মাঝে থেকে যাই। এখানে এলেই টের পাই—এখানে যেন হুজুর আজও আছেন—

দারা তাকিয়ে দেখলেন, গভীর বিশ্বাসী মানুষটির দুই চোখেই কখন জল নেমে এসেছে। হঠাৎ মুখ নামিয়ে দারার চোখে তাকিয়ে বললেন, মোল্লাদের চোখে আমি কাফের। কিন্তু আমি যাঁর মুরিদ—সেই হুজুর আমার পথ দেখিয়ে গেছেন। আমি জানি আমি তাঁর পথেই আছি। তুমি তো শাহজাদা।

বেশ লাজুক গলায় দারা মাথা নিচু করে বললেন, হ্যাঁ।

—প্রায়ই তো কাশ্মীরে যেতে হয়—?

—তা হয়।

—তাহলে ওখানে গেলে আমার আস্তানায় চলে আসবে।

এমন সময় দুই মুরিদ রাভি থেকে চান করে উঠে এসে দাঁড়ালো—একদম আস্তানার সামনে—কুঁড়ের উঠোনে। তাদের দেখে মুল্লা শা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই ঠান্ডায় তোমাদের চান করতে বলেছে কে ?

—বাঃ। আপনি যে আরও ভোরে—আরও ঠান্ডায় চান করলেন দেখলাম।

—আমার কথা বাদ দাও। চানের সঙ্গে খোদার কী সম্পর্ক ? ঈশ্বরের পথ শুধুই কষ্টের নয়। আমি চান করি আমার অভ্যেসে। আমি তোমাদের চোখ বুজে ধ্যান করতে বলিনি—এক পায়ে দাঁড়িয়ে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতেও বলিনি। আগে তো দিলের গিঁটগুলো খুলতে হবে—

শিষ্য দু'জন গা মোছার জন্যে উঠোনের গাছটার আড়ালে চলে গেল।

তখন শাহজাদা দারা বললেন, নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে আমি ঈশ্বরের রহস্যের সন্ধান চাই—আপনার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম। দয়া করে এগিয়ে আসুন। আমার কানে কানে বলে দিন ঈশ্বরের রহস্য। আমি সত্যকে খুঁজে ফিরছি—

মুল্লা শা সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, তোমার মনের কামনা আমি জানি দারা। তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তোমায় টেনে নিয়ে এলাম।

—জানেন। অনেকদিন আগে হুজুর আপনার কথা বলেছিলেন—

—কী বলেছিলেন ?

—মিঞা মীর বলেছিলেন, আমার মুরিদদের ভেতর যদি-মাত্র একজনও ঈশ্বরের পথে সঠিকভাবে গিয়ে থাকে—সে মুল্লা শা—

মুল্লা শা দারার মুখে গভীর দুই চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, বিশ্বাসী

আর অবিশ্বাসী—এই দুটো কথা অতি ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছে। বিশ্বাসী ঈশ্বরের কাছে পেঁছেছে। কিন্তু তাঁকে জানতে পারেনি। বা দেখেনি। আর অবিশ্বাসীরা? যাঁকে দেখা যায় না—বা জানা যায় না—তাঁর কাছে ওরা পেঁছয় না। প্রকৃত বিশ্বাসী ঈশ্বরকে লাভ করেছেন—দেখেছেন—জেনেছেন। সেই প্রকৃত বিশ্বাসীই খাঁটি মানুষ। আর যিনি নাস্তিক—তিনি ঈশ্বর লাভ করেননি—তাঁকে দেখেননি। বা জানেনও না।

শাহজাদার মনে হলো—ঈশ্বরের রহস্য জানতে হলে—বুকের ভেতরটা পাপড়ির মতো মেলে ধরতে হলে গুরু চাই। ধ্যান, স্মরণে আচারের বাড়াবাড়ি দেখে মানুষের মন বিদ্রোহ করে। সুফীরা তা বুঝতে পেরেছেন। পীরেরা হলেন ঈশ্বরের মশালধারী। ঈশ্বরই তাঁর পছন্দের পীর বেছে দেন।

মুল্লা শা বললেন, দ্যাখো দারা! আমি সব নিয়ম ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে বোঝার জন্যেই শুধু এখন আমি ধ্যানে বসি।

শাহজাদা দেখলেন, মুল্লা শার কাজকর্ম করে দেবার কেউ নেই। রেঁধে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ঘরে আলো জ্বলারও কিছু নেই। দারা বললেন, রাতে অন্ধকারে অসুবিধে হয় না?

—আলোর চেয়ে অন্ধকারই ভালো দারা। অন্ধকারেই আমি ধ্যানে বসি। যদি অনুভব করো তো দেখবে—অন্ধকারই ব্রহ্মাণ্ডের আলো। অন্ধকারের ভেতরেই প্রাণ বয়ে চলেছে। দ্যাখো দারা—ঝরনার তাজ থেকে ঝরে পড়ে নানান আলো। এ ব্যাপারে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু আমি বলবো না। জানো—সব ধর্মের মূল কথা এক। ঈশ্বর বলেছেন—আমি নিজেই গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার। যখন আমি নিজেকে জানতে চাইলাম—তখনই দুনিয়া পয়দা করলাম। দারা—

—আজ্ঞে—

—তুমি আসল পথ আঁকড়ে থাকো। ধ্যান-উপাসনা যে তোমায় করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তুমি ডুবে আছো ঈশ্বরের আহ্লাদের ভেতর—অনন্ত আনন্দে ভেতর। তোমার ওসব দরকার নেই দারা। এই আনন্দ নামাজের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কারণ, এই আবেশের সময় ঈশ্বর সাধকের খুব কাছে থাকেন। যদি এই আবেশের সঙ্গে অলীক কিংবা মায়াবী কিছু জড়িয়ে যায়—তাহলে প্রার্থনা কোরো না। কেননা, তাহলে নামাজ বা প্রার্থনায় দাগ পড়ে যায়—

দারা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। আমি ঈশ্বরের আহ্লাদে আছি। আবার মায়াবী রানাদিলেও আছি। তাই কি ইদানীং আমার বুকের ভেতরকার দোয়া আসমানে পেঁছয় না? আমার মোনাজাতে কি দাগ ধরে যায়?

মুল্লা শা বলছিলেন, তেমনি আবেশ বা উল্লাস যদি খাঁটি হয়—তাহলেও নামাজের দরকার নেই দারা। কেননা, ঈশ্বরের আহ্লাদে আর কিছু মেশানো ঠিক নয়। সত্যকে দেখার চেষ্টা করো। উচ্ছ্বাস থেকে সরে এসো। গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও। শরীয়ত হলো পথের জন্যে। আবার পথ হলো সত্যের জন্যে।

শাহজাদার মন অনেকদিন ধরেই অস্থির হয়ে পড়েছিল। কথাগুলো সেখানে

গিয়ে প্রলেপের মতো মিশে যেতে লাগলো। সব সময় একটা হায় হায় ভাব দারাকে তাড়িয়ে ফিরছিল। আজ অনেকদিন পরে স্থায়ী এক শান্তি তাঁর মনের ভেতর যেন শুয়ে আছে মনে হলো।

—তোমার ভেতরকার আমি আমি ভাবটা যতই মুছে যাবে ততই তাঁর আলো তোমার ভেতরে ফুটে উঠবে দারা: ইমান তিন কিসমের। পহেলা ইমান—ঈশ্বর পয়গম্বর। দুসরা ইমান—তাঁর জন্যে আরাধনা। তিসরি ইমান হলো আমি আমি ভাবটা মুছে দিয়ে তাঁর আলো বুকের ভেতর ফুটিয়ে তোলা।

সামান্য কুঁড়ে ঘরের বাইরে উঠোনে শীতের রোদ ঝকঝক করছিল। সেদিকে তাকিয়ে মুল্লা শা বললেন, আমি আমি ভাব কেটে গেলেই দেখবে কোথায় আছো?—কতদূরে আছো?—এখন সময়টাই বা কী?—এ সবই তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে।

শাহজাদা মুল্লা শার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না। আমার পয়দায়িসের এক সন আগে এই মানুষটি বদকশান থেকে লাহোরে চলে আসেন মিঞা মীরের কাছে। তখন নাকি ওঁর বয়স ছিল পঁচিশ। তার মানে বছর পঞ্চাশেকের মতো বয়স হবে। কী নওজওয়ানি ভরা দুই চোখ। মাথার চুল কুচকুচে কালো। পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা চিসতিয়াদের ভক্ত ছিলেন। চিসতিয়ারা নির্জনে আরাধনা করেন। মুল্লা শা কাদিরী। তিনি তো আরাধনা, উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা—কোনোটা নিয়েই আমায় বিশেষ কিছু বললেন না। স্রেফ বললেন, ঈশ্বরের আহ্লাদের আবেশে ডুবে থাকো। তাহলেই হবে।

মুল্লা শা বললেন, দারা! আমি তোমার ওপর খুব আস্থা রাখি।

দারা খুব বিনয়ী গলায় বললেন, আশীর্বাদ করুন—আমি যেন নানা আঘাতের ভেতরেও আমার বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে পারি।

—তোমার বাসনাই পূর্ণ হবে দারা।

দারা মেঝেতে বসে পড়ে মুল্লা শার পায়ে মাথা রাখলেন। মুল্লা শা তাঁকে দু'হাতে তুলে ধরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, যে-ই কাদিরী হবে—আমি তাদের ভার তোমার ওপর ছেড়ে দেবো। আশীর্বাদ করি—তুমি ঈশ্বরের দর্শন পাও। তুমি সত্যকে ভালোবাসতে শিখেছো। ঈশ্বর তোমায় কৃপা করুন দারা। ঈশ্বরের রহস্য নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখো। বাইরে বলবে না। যাদের ঈশ্বর কৃপা করেননি—ভালোভাবেই বুঝতে পারবে—তারা কাছাকাছি এলেও তোমায় জাগিয়ে তুলতে পারছে না। নিজের কাজ সবচেয়ে আগে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রেমিককে ঈশ্বর সর্বদাই কৃপা করেন।

দারাশুকো মুল্লা শার বুক থেকে—গা থেকে আশ্চর্য এক খুশবু পাচ্ছিলেন। সেই সুঘ্রাণে ডুবে যেতে যেতে জানতে চাইলেন, হুজুর। আদর্শ মানুষ কে?

—যাকে কি সাধারণ—কি অন্তরঙ্গ—কেউই তিরস্কার করে না—যে ইসলামের নীতি অনুসরণ করে চলে। সৎসঙ্গ থেকেই ইসলামের রহস্য জানা

যায়। সংযত থাকবে। তাহলেই মনকে এক জায়গায় করতে পারবে। সবাইকে ভালোবাসো। তবে যাদের সঙ্গে চিন্তা বা মতের মিল পাবে না—তাদের এড়িয়ে চলবে।

শাহজাদা বুঝতে পারছিলেন, মুল্লা শা এক একটি কথায় তাঁর চরিত্রের ভুলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছেন। রাভির গা ধরে অনেকটা দূর এখান থেকে দেখা যায়। শীতের খন্দ নিয়ে ব্যাপারীরা গিয়াথপুরের দিকে চলেছে। ওরা নৌলাফ মহল পেরিয়ে লাহোরের বড় মাণ্ডিতে গিয়ে বসবে।

মুল্লা শা বললেন, দ্যাখো দারা—যাঁরা উঁচুতে উঠেছেন—তাঁরা প্রেমের মহিমা অনুভব করবেন। ঈশ্বরের মহিমা—করুণা সবসময় মনে রাখবে। তাঁকে বুক ভরে ডাকো। তাহলে মানুষের ভেতরকার যে অন্ধকার মানুষকে ঈশ্বরের আনন্দের আবেশ মেলে—আহ্লাদ থেকে সরিয়ে রাখে—তা তোমার থেকে দূরেই থাকবে। কখনো হতাশ হয়ো না। লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাও দারা। আমি আছি তোমার পাশে।

কথা বলতে বলতে মুল্লা শা শাহজাদাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর ছাড়া কাপড় নিয়ে রাভির দিকে চললেন। বোধহয় ধোবেন। দারাশুকো তাঁর সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালেন, হুজুর। আপনি ধ্যানও করছেন—আবার কাপড় ধুতেও চলেছেন? আমায় দিন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি। দুই কাজ একসঙ্গে সম্ভব নয়।

মুল্লা শা দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, জানো দারা—একদিন আমি ধ্যানে থাকতে থাকতেই এমন কাপড় ধুতে রাভিতে নামছি—ঠিক তখন তোমারই মতো একজন মানুষ এসে তোমারই ওই কথাগুলো বলেছিল—

—সে কে?

—জানি না। নদী থেকে উঠে এসে বললো, আমায় দিন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি। দুই কাজ একসঙ্গে সম্ভব নয়। আমি তাকে বললাম, দুটি কাজই আমি পারি। তা শুনে জলের মানুষটি আবার জলেই মিলিয়ে গেল।

সেদিন দুপুরে দুপুরে একা একাই শাহজাদা দারা কেল্লায় ফিরলেন। লাহোরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। কোনোরকম ঘোড়সওয়ার, পাহারা, জুড়ি ছাড়াই। ক'মাস ধরে কাবুল-গর্জান করে তাঁর চেহারা শ্রী এখন যা—তাতে কে বলে দেবে ইনিই শাহজাদা দারা। তাই বেশ স্বাধীনভাবেই দারাশুকো ঘোরাঘুরি করলেন। কেল্লায় ফেরার আগে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন, সাধারণ মানুষ কত স্বাধীন। কোনো পাহারা নেই। কোনো কেতা নেই। পোশাকও কত সুন্দর। শাহজাদার মতো বাড়তি কিছু নেই তাদের পোশাকে। খাবার ইচ্ছে হলে রাস্তার গায়েই সরাইখানা। যা ইচ্ছে খাও। গরমাগরম।

এই রাস্তার কথাই বলে থাকে রানাদিল। এই রাস্তাই তার পছন্দ। কতদিন হলো আগ্রা ছেড়েছি। বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল। কেমন আছে রানাদিল? কেমন আছে নাদিরা? কেমনই বা আছে আমার ছেলেরা? কিছুই জানি না।

আমি যে সবাইকে ভালোবাসি। নাদিরাকে বাসি। রানাদিলকেও বাসি। এই ভালোবাসাই কি মায়া ?

কিল্লা লাহোর রীতিমত জবরদস্ত। সুবেদারের সদর। আবার আগ্রা থেকে বাদশা এখানে এলে এই লাহোর দুর্গই হয়ে ওঠে হিন্দুস্থানের রাজধানী। কেননা তখন যে এখানেই বাদশার তখত-রওয়ান থাকে। এখানেই আমির ওমরাহ, মনসবদার সুবেদাররা আসতে থাকেন। তাই এখন লাহোর দুর্গকে ঘিরে সর্বক্ষণের ভিড়।

দূর থেকে কিল্লার ফটকে ভিড় দেখে পায়দল শাহজাদা ভাবলেন নিশ্চয় কোনো সুবেদার বা বড় জাতের মনসবদার এসেছেন বাদশার সঙ্গে দেখা করতে। কাছাকাছি এসে ভুল ভাঙলো দারাশুকোর। হাতির পিঠের ঢাকা গাদেলা থেকে নামছেন বাজি—শাহজাদী জাহানারা।

দারা দৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাজি—বলে চুপ করে গেলেন শাহজাদা। আমার বড় বোন এত সুন্দরী ? আগে তো কখনো খেয়াল করিনি।

দুর্গের বাঁধানো চাতালে পা দিয়েই জাহানারা বললেন, আগ্রায় আব্বা হুজুর নেই। তুমি নেই। থাকা যায় রাজধানীতে ?

—চলে এসে বেশ করেছো বাজি।

—ছোটে ভাই—

—বাজি ?

—এখন তো তুমি লড়াকু শাহজাদা।

দারা খুশিতে বিনয়ে মাথা নামালেন।

—তুমি গজনি অব্দি ঘোড়া দাবড়ে গ্যাছো।

—এমন কিছু নয় বাজি। চলো। ভেতরে চলো। সফরের ধুলো, জ্বালা আগে কমুক।

—তেমন কষ্ট হয়নি আমার ছোটে ভাই। দিব্যি চলে এসেছি। গাদেলা ভালোই ছিল।

—হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগমের গাদেলা কখনো খারাপ হয়। একটা কথা বলবে বাজি ?

বড় ফটক পেরিয়ে কিল্লার ভিতরে ঢোকার মুখে শাহজাদী দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী দারা ?

—মায়াবী কাকে বলে ?

—ওঃ। এই কথা। এই ধরো না—তোমার দুখানি চোখ খুবই মায়াবী। তুমি আমার ছোট ভাই। আমার তো তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বসে বসে।

—আমার কথা ছাড়ো। মায়া কী জিনিস ?

—যা না দেখে থাকা যায় না। যা না ভেবে পারা যায় না। এই মজবুরিই মায়া।

—তার মানে যার ভেতর তোমার ভালোবাসা আছে। তাইতো ?

—অবশ্যই দারা।

—তাহলে যাতে ভালোবাসা আছে—তা কি আমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা করতে পারি?

শাহজাদী জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। শেলের মতো ক'টি কথা তাঁর মনে বিঁধে আছে। সেখানে সামান্য খোঁচা লাগলে খুন ঝরে যেন জাহানারার। মুঘল শাহজাদীর তসবিরদানে চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না।

—একথা লিখলেন কী করে বুন্দেলারাজ ছত্রশাল? রাজার হাতের লেখাই বা অত আঁকাবাঁকা শিথিল কেন? ও চিঠি লেখার সময় তিনি কি তাঁর ভেতরে ছিলেন না? যিনি আমায় 'দেবী' বলে চিঠি শুরু করেন—কল্পনা করেন আমিই তাঁর সংযুক্তা—যিনি আমায় অমন মনরাঙানো কাঁচুলি পাঠাতে পারেন—তিনি কী করে ওই চিঠি লিখতে পারেন? আমার সারা দুনিয়া খাক হয়ে গেল। আমার সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্তে নিঃশেষ।

জাহানারা মুখে বললেন, ছোটে ভাই। অনেক—অনেকদিন পরে আবার সেই ছোটবেলার মতো শুধু তুমি আর আমি একসঙ্গে।

দারা বুঝলেন, বাজির মনে ভালোবাসা নিয়ে কোথায় একটা গিঁট বেঁধে আছে। তিনি ছত্রশালের কথা জানেনও। আর জানেন বলেই নিজেকে খুই অপরাধী মনে হলো দারার। আমি গর্জনি রওনা হবার আগে আব্বা হুজুরকে দিয়ে রানাদিলকে বিয়ে করার কথাটা কড়ার করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আকবর বাদশার বিধান যে মুঘলকুমারীর কোনো দিনই বিয়ে হবার নয়—তাই কথাটাই পাড়িনি। আমি তো তবু নাদিরাকে বিয়ে করেছি। মানুষ সময়ে বড় স্বার্থপর হয়ে ওঠে। শাহজাদা মুখে বললেন, হ্যাঁ বাজি। সে কবে কতদিন আগে পোড়ো রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম।

—দ্যাখো দারা। আজ আমাদের ভাইবোনের সামনে আস্ত একটা দুর্গ। তার পাশে বয়ে চলেছে পুরো একটা নদী।

—হাসালে বাজি। দুর্গ-নদী এসব তো আস্তই হয়।

—তাই বুঝি?—বলে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন জাহানারা। দারা তাঁর বড়বোনের অমন অন্যমনস্ক মুখ দেখে আঁতকে উঠলেন। আজ সকাল থেকে এতক্ষণ তিনি ছিলেন মুল্লা শার সরল, সহজ অথচ জ্ঞানী আবেশে। সে আবেশে মগজের ভেতরকার সব দুয়ার খুলে যায়। আর এখন? দারা বুঝতেই পারছিলেন, গভীর কোনো জায়গায় শাহজাদীর শরীরের ভেতরকার খুন বাধা পেয়ে ঠেলে ফুলে উঠছে। বেরবার পথ পাচ্ছে না।

হঠাৎ জাহানারা দু'হাতে দারাশুকোর পিঠের ওপর নিজের শরীরের ভার রেখে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

—বাজি—বলে দারা ঘুরে দাঁড়ালেন। দিদিকে ধরলেন, কী হয়েছে? আমায় বলো। বলতেই হবে—

জাহানারার গলা বুজে এলো। কোনো কথা বলতে পারলেন না। কিল্লার

খোলা ফটকের সামনে মুঘল খানদানের কোনো শাহজাদা শাহজাদী এভাবে নিজেদের ছুঁয়ে—জাপটে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। এটা বে-তমিজি। যারা দেখছে—তাদের মুখে কথাটা ঘুরে ঘুরে সারা হিন্দুস্থানে শেষে চর্চা হবে।

দারা বললেন, ভেতরে চলো বাজি—

—আমি বরবাদ হয়ে গেছি দারা। বরবাদ—

॥ একষট্টি ॥

বিকেলে নিজের ছোট ভাইয়ের মুখোমুখি হতে লজ্জা পাচ্ছিলেন জাহানারা। লাহোরের ঠাণ্ডা বাতাস দুর্গের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। নিচে তাকালে বাঁয়ে রাভির ঝকঝকে জল। দুর্গের সামনেকার খোলা ময়দানে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান অনেক দূরে নতুন ভর্তি হাতিদের সালাম নিচ্ছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে দারাশুকো বললেন, কাল বাজি তোমায় কফিপুরায় নিয়ে যাব।

—গিয়ে কী হবে দারা। তিনি তো আর নেই।

—তিনি না থাকুন— মিঞা মীরের সেরা মুরিদ মুল্লা শা ওখানে এসে রয়েছেন। দেখা হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তোমার ভাল লাগবে।

—মুল্লা শা এখানে?

—হ্যাঁ।

—কাশ্মীরে থাকেন শুনেছিলাম।

—শীতের সময়টায় লাহোরে কফিপুরার আস্তানায় নেমে আসেন। বসন্তের শুরুতে আবার কাশ্মীর ফিরে যান।

—তাই বুঝি! ওঁর আব্বা হুজুর বদকশানের রুস্তমের কাছাকাছি আর্কসার কাজি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সম্ভবত মুল্লা আবিদ মহম্মদ। যে সনে আমার পয়দায়িস সেই সনেই মুল্লা শা হিন্দুস্থানে এসে মিঞা মীরের মুরিদ হন।

—তুমি তো অনেক জান বাজি!

—সারা হিন্দুস্থানের সবকিছু আমায় টানে দারা। এখানকার গান, এখানকার খাবার, এখানকার মহাকাব্য, এখানকার পুরাণ-ইতিহাস—সবকিছুতেই আমি আগ্রহ পাই। আমাদের দাদাসাহেব—পরদাদাসাহেব—সবাই চিসতিয়াদের ভক্ত। আর মুল্লা শা হয়ে গেলেন কাদিরী।

—কাদিরী কি চিসতিয়া তা নিয়ে মাথা ঘামাই না বাজি। তবে মানুষটি ঈশ্বরের। আমার তো মন ভরে আছে ওঁর সঙ্গে কথা বলে।

—আমি একবার যাব ওঁর কাছে—

—বেশ তো বাজি। কালই চল। কাছে গিয়ে বসলে তোমার অস্থির অস্থির ভাব একদম কেটে যাবে।

কালকের চেয়ে আরও ভোরে কফিপুরায় এসে হাজির হলেন শাহজাদা দারা। সঙ্গে শাহজাদী জাহানারা। সকালের রোদে মুল্লা শার আস্তানা হা হা করে

হাসছে। শীতের ভোরে একটা দুটো সাহসী পাখি রাভির খরস্রোত থেকে কুঁচো মাছ ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছিল।

এমন সুন্দর সকালে জাহানারার মন অন্যদিকে যাবার কথা। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না ছত্রশালের চিঠির বরফ ঠাণ্ডা সুর। মুঘল শাহজাদীর তসবিরদানে চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না।

কারও কাছে আমার কোনও নিন্দামন্দ শুনেছেন কি তিনি? কেন তিনি সেই নিন্দায় বিশ্বাস করলেন? শাহজাদা আওরঙ্গজেব কি কিছু বলেছে? শাহজাদী রৌশনআরা? হাজার সাধু এসেও যদি তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলত আমি বিশ্বাস করতাম না— যতক্ষণ না তোমার মুখে শুনতাম ছত্রশাল। ওরা যে দারার দুশমন —আমারও। এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক জাহানারা নিজের হাতের আঙুল কামড়ে ধরলেন। চৌহান বীর কি আমায় ভুলে গেলেন? তিনি তো আমায় তাঁর সংযুক্তা নামে ডেকেছিলেন। আমার মন দুঃখে ভরে যাচ্ছে। ভোরের সূর্যকে লাগছে অস্তসূর্য। মুঘল শাহজাদীর তসবিরদানে চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না। —তুমি একথা লিখলে কেন? মনে হচ্ছে—একখানা লোহার হাত আমার বুকে এসে আঘাত করলো।

—ছোটে ভাই! আমি বরবাদ হয়ে গেলাম। বিলকুল বরবাদ।

কাল থেকেই একথা বলে আসছে বাজি। ভালবাসায় একজন সরে গেলে অন্যজনের জীবনে বরবাদি এসে পড়ে। একজন মানুষের জন্যে আরেকজন উতলা হলে সেখানে ভালবাসা আসে। বুন্দেলারাজ ছত্রশাল ওকথা লিখতে গেলেন কেন? তিনিও তো বাজির জন্যে উতলা। কথায় কথায় বাজি যা বলেছে —তা থেকে এই কথাটাই তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমন সময় সামান্য কুড়ে ঘরের আস্তানার পাশ দরজা সরিয়ে মুল্লা শা বেরিয়ে এলেন। আজ যেন তাঁকে দারাশুকোর আরও উজ্জ্বল লাগল। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, হুজুর! ইনি আমার বাজি—

—বলতে হবে না দারা। শাহজাদী জাহানারাকে হিন্দুস্থানে কে না চেনে?

—আপনি চিনবেন? —বলে মৃদু করে হাসলেন জাহানারা।

—চাক্ষুষ এই পহেলা দেখছি তোমায়। কিন্তু তোমায় আমি জানি অনেকদিন জাহানারা।

—আপনাকেও আমি জানি অনেকদিন। আপনার কথা অনেকদিন শুনেছি। চোখে দেখিনি কখনও।

—রহস্যবিদ্যা তোমার গভীরে শাহজাদী। বলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফের মুল্লা শা বলে উঠলেন, তুমি অসাধারণ। তুমি দীন হয়ে ভালবাসতে পারো। ভালবাসার জন্যে যে কাঙাল হতে পারে— সে-ই তো সেরা।

জাহানারা কোনও কথা বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করলেন। দারা দেখতে পেলেন, বাজির দুই চোখ জলে ভরে গিয়েছে। মুল্লা শা কোনও কথা বললেন না। তিনি চুপ করে তার ডান হাতখানি জাহানারার মাথায় রাখলেন। শীতের ভোরের কফিপুরা তখন ঝলমলে রোদে পুরোপুরি জেগে উঠছিল। তার

ভেতর জাহানারার মাথার ওপর মুল্লা শার হাত যেন সারা দুনিয়া স্তব্ধ করে রেখেছে।

—তুমি রহস্যে অধিকারিণী জাহানারা। তুমিই একদিন আমার হয়ে কথা বলবে—

ছলো ছলো চোখে শাহজাদী মুখ তুললেন। মুল্লা শার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় তিনি বললেন, একদিন মক্কার দিকে মুখ করে তন্ময় হয়ে আছি।

দারা কোনওদিন বাজির এমন মুখ দেখেননি। বাজি কথা বলছে এমনই করে—যেন কতকাল মুল্লা শার সঙ্গে তার জানাশুনো।

জাহানারা তখন বলছেন, মক্কার দিকে মুখ করে বসেছি। সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছি। মনে মনে হজরত মহম্মদকে ডাকছি। কতক্ষণ এভাবে বসে আছি খেয়াল নেই। জেগে আছি? না, ঘুমিয়ে পড়েছি? তাও খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি—চোখের সামনে হজরত মহম্মদ আর তাঁর চার বন্ধু। হজরত মহম্মদের পাশে— আপনি—তাঁর পায়ে মাথা রেখে আছেন।

—আমায় দেখে চিনলে? আমায় তো তুমি চিনতে না।

—একটা আন্দাজ ছিল।

—সেই আন্দাজের সঙ্গে এখন মিলছে?

জাহানারা চোখ তুলে মুল্লা শার দিকে তাকালেন। যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি মিলে যাচ্ছে। তা হজরত মহম্মদ আপনার কাছে আমাকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন তুমি এই তৈমুরীকে কেন আলো দিলে?

—তুমি কী বললে?

—বললাম, ঈশ্বরের অশেষ করুণা।

মুল্লা শা কোনও কথা না বলে জাহানারার মুখে তাকিয়ে রইলেন। খানিকবাদে বললেন, তুমি যে কারও জন্যে কাঙাল— তা আমি জানি।

জাহানারা তন্ময় চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। তারপরই বলতে লাগলেন, আমার ছোটে ভাই দারাশুকোর মুখে আপনার সুনাম শুনি। আমার ইচ্ছে ছিল — ছোটে ভাইয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও যেন আপনার গুণগান করতে পারি।

—আমি কেন জাহানারা? গুণগান করবে তাঁর। কাঙাল হয়েছ আজ একজনের জন্যে। একদিন এই কাঙালী সেই তাতে বর্তাবে।

—আমি আর আমার ছোটে ভাই দারার দেহ দুটি হলেও আমাদের আত্মা একই। আমার মন বলছে— একই আত্মার মতো আমাদের দু'জনেরই মোনাজাত আপনার দিকেই যেন যায়।

পূর্ণ চোখে মুল্লা শা জাহানারার চোখে তাকালেন। একদিকে বাজি। অন্যদিকে হুজুর। দু'জনেরই মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন দারাশুকো। আজকের সকালটি বড় আশ্চর্য। সূর্যের এই আলোরও যেন কোনও আলাদা মানে আছে। ঈশ্বরের মশাল কাঁধে হেঁটে চলেছেন পীর। শুধু পীরই পথ দেখাতে পারেন।

শাহজাদী জাহানারা থেমে থেমে বললেন, আমি চিসতিয়া পথের পথিক

হয়ে পড়ছিলাম। বড় বড় চিসতিয়া পীর বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁরা একদম একা নির্জনে থাকতে চান। আমার বয়স এখন সাতাশ। আর দেরি না করে আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।

—বেশ। তাই হবে। কাশ্মীরে আমাদের খানকায় এস। বসন্তে সে-মঠ তোমাদের ভালই লাগবে।

দারা অবাক হলেন। হুজুর মুল্লা শার সামনে এসে বাজি কি ছত্রশালের কথা ভুলেই গেলেন!

গজনি-কাবুল ফেরত শাহজাদা দারাশুকোকে আগ্রা থেকে এগিয়ে এসে লাহোরে অভিনন্দন জানানো যেমন ছিল বাদশা শাহজাহানের মনের ইচ্ছা—তেমনি এটাও সত্যি যে, আগ্রা থেকে রাজধানী শাহজাহানাবাদে সরিয়ে ঝক্কিও তিনি এড়াতে চেয়েছেন। তাছাড়াও শাহজাহান বুঝতে চাইছিলেন ইরানিদের মতলবটা আসলে কী? কান্দাহার দখল? না, আগ্রার ওপর সবসময় মানসিক চাপ চাপিয়ে রাখাই ইরানিদের আসল ইচ্ছা?

আগ্রার দেওয়ানখানা থেকে দেওয়ান-ই-আম— সবই শাহজাহানাবাদে সরিয়ে নেওয়া মানে বিশাল ঝঞ্ঝাট। এই ঝামেলা থেকে ঝাড়া হাত পা হয়ে থাকাও ছিল বাদশার লাহোরে এসে থাকার বড় কারণ। কিন্তু ইচ্ছা করলেই ঝাড়া হাত-পা হয়ে থাকা যায় না।

হিন্দুস্থানের বাদশার মাথার ভেতর যেমন বিজাপুর-গোলকুণ্ডা রাখতে হয়—তেমনি রাখতে হয় ইস্পাহান, ইরাক, আর্মেনিয়া, কান্দাহার, বল্‌ক এবং বদকশান। এত বড় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নানা খাতে বয়। পাহাড়ী রাস্তা, ডাঙায় ডাঙায় রেগিস্থানের ভেতর দিয়ে উটের পিঠে পিঠে—আবার দরিয়ায় ভেসে ভেসে নানান দেশের বন্দরে গিয়ে মালপত্তর কেনাবেচা। নীল, মোরা, কাপড়, রেশম, পশম—কত কী। এর সঙ্গে মিশে আছে মুঘল ঘরানার আদি এক খোয়াব। আমরা মুঘলরা যে দেশ থেকে এসেছিলাম—সেই সমরখন্দ, সেই ফয়গনা, সেই চাঘতাই বনপথ, সেই উসুরী উপত্যকা—তৈমুরী খানদানের সেই সব আদি দুনিয়া আর কতকাল হিন্দুস্থানের বাইরে থাকবে?

বাদশা শাহজাহানের মগজও এইসব চিন্তায় ভেতরে ভেতরে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। তাজমহল উঠছে। লালকেল্লা সম্পূর্ণ হয়ে এল বলে। নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ সেজে উঠেছে। বুন্দেলখণ্ড শান্ত। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর মাথা নামিয়েছে। কিল্লা কান্দাহার জবরদস্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে।

এখন ইরানিরা কী চায়?

সে খবরও এসেছে। ইরানের শাহ সফি ইরাক আর আর্মেনিয়া থেকে তুর্কিদের হটিয়ে দিয়ে এবার কান্দাহারের দিকে তাকিয়েছেন। লাহোর দুর্গের দেওয়ান-ই-খাস দরবারে বসে আছেন বাদশা। সময় সন্ধ্যা। পাথরের দুর্গের বাইরে লাহোরি শীতের ঠাণ্ডায় বাতাস কেটে কেটে যাচ্ছে। আগেনগারের আগুনে

তাপে গা সেঁকে নিয়ে এক একজন মনসবদার উঠে দাঁড়িয়ে বাদশার মবারকে নিজেকে দাখিল করেছেন।

কান্দাহার হিন্দুস্থানি পশমের এক বিরাট বাজার। সেখান থেকে পশম কিনতে দুনিয়ার ব্যাপারীরা এসে জড় হয়। কাশ্মীরের পশম ব্যাপারী বাদশাকে সব খুলে বলেছে। যে করেই হোক কিল্লা কান্দাহার হাতে রাখতে হবে। নয়তো হিন্দুস্থানের পশম বাইরের বাজারে মার খাবে।

তাদের চাপেই আজকের এই দরবার। এদের সঙ্গে সারা হিন্দুস্থানের রেশম-শেঠদের চাপ যোগ হওয়ায় দেশ জুড়ে যুদ্ধের সাড়া পড়ে গেছে। বাদশার হুকুম হল: রুস্তম খাঁয়ের তাঁবে এগিয়ে থাকা বিরাট এক ফৌজের দল খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়বে। শাহ সফি কান্দাহারের দিকে এগিয়ে এলে হেলমন্দের তীরে তাকে লড়াই দেবে। কিছুতেই তাকে হেলমন্দ পেরিয়ে আসতে দেওয়া হবে না।

বড় বড় শাহী মনসবদারের ভেতর দেওয়ান-ই-খাসে শাহজাদা দারাও বসে-ছিলেন। ফৌজি হুকুমনামা পড়া হয়ে গেলে দরবার কেমন মিইয়ে গেল। ঠিক এই সময় বাদশা হুকুম দিলেন, কিছু দিওয়ান শোনা যাক!

এমন গুরুগম্ভীর দরবারের মাঝে দিওয়ান? বড় বড় লড়াকুর তো অবাক হওয়ার পালা। হিন্দুস্থানের সামনে এত বড় বিপদ। আর এখন কবিতা? সৈদ খাঁ বাহাদুর, খোদ রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গ, অম্বর-রাজ মির্জা রাজা জয়সিংহ, যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহের তো চোখ কপালে। তাঁরা গোপনে নিজেদের ভেতর চাওয়াচাওয়ি করে নিলেন। এসবের কিছুই শাহাজাদা দারার চোখ এড়াল না। তিনি খুশিই হলেন। আব্বা হুজুর তাহলে যুদ্ধ যুদ্ধ করে একদম পাগল হয়ে পড়েননি। ধাতে আছেন। সেই শাহজাহানই আছেন। বাদশা শাহজাহান যেমন থাকেন আর কি। লড়াইয়ে, মজলিশে, হুকুমে, ফরমানে মোড়া এই আব্বা হুজুরকে তাঁর এইজন্যে এত ভাল লাগে।

পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা মুখে মুখে হিন্দি দোহা বানাতেন। আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান—দারা লক্ষ্য করেছেন—রসদ যোগানদার বনজারা চৌধুরীদের দিব্যি হিন্দিতে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। দরকারে ভুলচুকের সন্দেহ দেখা দিলে আব্বা হুজুর ওদের কায়েতী হিসেবপত্তর যাচাই করে দেখেন।

কবিতার কথায় কবি হরিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বয়স হয়েছে। আকবরি দরবারের হিন্দি কবি নরহরি মহাপাত্রের নাতি। গলাটি সুন্দর। গায়ে লাহোরি শীত আটকাতে দিলওয়াড়ি পশমের লম্বা কুর্তা। দাঁড়িয়ে উঠেই হরিনাথ গাইলেন—

অব্ কে কবি খদ্যোৎ সম, জঁহ তঁহ করে প্রকাশ—

পদটি শুনে বাদশা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে শাহজাহান বললেন, আজকালকার কবি সব জোনাকি পোকা। যেখানে সেখানে ঝিকমিক করে—

খোদ বাদশার সমঝদারি পেয়ে কবি হরিনাথ যেন উল্লসে উঠলেন। তিনি মুখে মুখে যা বাধান দিলেন—তার মানে দাঁড়ায়—কবিতার আকাশে সূর্য সমান

সুরদাস, চন্দ্রমার সমান তুলসীদাস, এমনকি কেশব দাসের যুগও আজ অতীত। এখন জোনাকিদের দিন।

এসব কথায় বাদশা বড় খুশি হলেন। বাদশারও সেই একই মত। এখন জোনাকিদের দিন। তিনি হুকুম দিলেন—হরিনাথকে নগদ এক লক্ষ দাম দেওয়া হোক। আর দেওয়া হোক একটি আরবি ঘোড়া। সেই সঙ্গে একটি বেহেদের হাতি।

কবি কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে কুর্নিশ করলেন বাদশাকে। দরবারে সবাই জানেন—হাতি বা ঘোড়া কোনওটাই ছা-পোষা কবি হরিনাথের কোনও কাজে আসবে না। সবাই জানে হাতি বা ঘোড়া কে পুষতে পারে। শাহজাদা দারা চোখ না বুজেই দেখতে পাচ্ছিলেন—দরবার থেকে বেরিয়েই কবি কী করবেন। কী করতে পারেন—

শাহী ঘোড়া বা হাতি কেনার জন্যে ফৌজি রসদ যোগানদারদের ফড়েরা দুর্গের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। লাহোর জুড়ে হঠাৎ নবাবদের ছড়াছড়ি। তাদের ভেতর এখন এই খেলাতের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তারাই ছুটে আসবে হাতি ঘোড়া কিনতে। আনাড়ির হাত থেকে যত সস্তায় হাতিয়ে নেওয়া যায়।

আরও কয়েকটি হিন্দি চৌপাই আওড়ে কবি হরিনাথ বসলেন। এক সময় দরবার ভাঙল। রেওয়াজমাফিক বাদশা না উঠলে কেউ তাঁর জায়গা ছেড়ে বেরতে পারেন না। শাহজাহান তাঁর রওয়ান-তখত ছেড়ে পেছনে অল্প আলোয় ঢাকা পথে মিলিয়ে যেতেই শাহজাদা দারা উঠে দাঁড়ালেন।

একে একে মানীজন সব বিদায় নিতে দারা দেখলেন একাই দেওয়ান-ই-খাসের ফাঁকা দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানটায় দরবার বসে তা কি বিরাট। এই নিস্পৃহ পাথরের চাতাল বাদশা এলেই যেন জেগে ওঠে। তখন দেশ-মানুষের নসিব নিয়ে কত গুরু-গম্ভীর সব হুকুম জারি হয়। পাথরের তাতে কিছুই যায় আসে না।

দারা একমনে হিন্দুস্থানের বাদশার রওয়ান-তখত দেখতে লাগলেন। ওই আসনে বসে একজন মানুষ কত মানুষের ভাগ্য স্থির করে থাকেন। আমি নিজেই তো সেই কবে আগ্রা দেখেছি। ছেলেদের দেখি না কতদিন। দেখি না নাদিরাকে। রানাই বা কেমন আছে রানী হাভেলিতে। মুজরো নিয়ে নাচার জন্যে আবার পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়েনি তো!

—দারা—

চমকে ফিরে তাকালেন দারা। খোদ বাদশা তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

ঝুঁকে দারা বললেন, হজরত।

—তোমায় একা পাব বলে আমিই ফিরে এলাম।

—আপনি ডাকলেই তো আমি যেতে পারতাম।

—নাঃ। আমিই এলাম। তোমায় ঘিরে আমার অনেক আশা। অনেক খোয়াব দারা।

—সবই আপনার মেহেরবানি আব্বা হুজুর।

—আমি চাই—তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। শাহীর হুকুম, শাহীর বাকি সবই তুমি আমার সঙ্গে থেকে জানবে—শিখবে। তুমি ধর্মভীরু—তুমি সাচ্চাই বোঝ। তুমি আমার পহেলা শাহজাদা। তোমার জন্যে আমি গর্বিত।

দারা চুপ করে থাকলেন।

—তোমার ভেতর আমি আমার ছোটবেলা—বড় হয়ে ওঠা দেখতে পাই। তাতে পাপের কোনও দাগ ছিল না। তোমার ভাবের দিওয়ানাপনাহ যাই হোক, ধর্মের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুরাদের জাহেলীপনা নয়—কিংবা সুজার শিয়া শিয়া করে মেতে ওঠাও নয়। আমি তোমার ওপর খুব নির্ভর করি দারা—বলতে বলতে বাদশা শাহজাহান তাঁর বাঁ হাতখানি দারার পিঠে রাখলেন।

রেখে বললেন, কান্দাহার এখন হিন্দুস্থানের সব চেয়ে বড় চিন্তা—। অবিশ্যি কিল্লা দখলে রাখতে আমরা আটঘাট বেঁধেই এগোচ্ছি। আচমকা হামলায় জবরদস্ত এই কিল্লার কিছু করতে পারবে না ইরানিরা।

—বন্দেগান। একটা কথা বলি ?

—বলো।

—হিন্দুস্থান তো ছোট নয়।

—কে বললে ছোট!

—আপনার শাহীর পক্ষে বেশ বড়ই বলা যায়।

—শাহী কারও জন্যে নয় দারা। শাহী গড়ে ওঠে ইতিহাসের দরকারে। শাহী মিলিয়ে যায় খোদাতলার ইচ্ছায়। দুনিয়ায় কত শাহী মাথা ঠেলে উঠল। আবার মিলিয়েও গেল। এক দিনকার শের আজ চুহাও নয়।

—ইতিহাসের দরকারে আমাদের মুঘলশাহী তো আছে আব্বা হুজুর।

—হ্যাঁ। শওসন হয়ে গেল মুঘলরাই এখন হিন্দুস্থানি শাহী। ইতিহাসে দুটি জিনিস হয়। সময়ের সঙ্গে কোনও শাহী ছোট থেকে কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে আসে। নয়তো বড় থেকে আরও বড় হয়ে ওঠে। এছাড়া শাহীর সামনে আর কোনও পথ নেই। সবই ইতিহাসের দরকারে দারা—

—আমি তো কাবুল হয়ে গজনি ঘুরে এলাম।

—কী বলতে চাইছো ?—বলে বাদশা সোজা দারার চোখে তাকালেন।

—এত বড় দেশ হিন্দুস্থান। তারপরেও কি ইতিহাসের দরকারে আমাদের কান্দাহার না হলে নয় হজরত ?

—কী বলছো দারা। কান্দাহার ছাড়া হিন্দুস্থান চলতে পারে না। ইরান তুরানের ব্যাপারীরা ওখানে হিন্দুস্থানি জিনিসপত্তর সওদা করতে আসে। ভুলে যেও না—মুঘল ইতিহাসের ভোরবেলায় বাবর বাদশা, হুমায়ুন বাদশার ঘোরা-ফেরার ময়দান ছিল কাবুল, গজনি, হিরাট, কান্দাহার। ওদিক থেকেই মুঘলরা হিন্দুস্থানে পা বাড়িয়েছিল। দাদাসাহেব আকবর বাদশা বালক বয়সে অনেকদিন থেকেছেন কাবুলে। ইতিহাসের দরকারকে তুমি অস্বীকার করতে পার না দারা।

শাহজাদা দারা এতক্ষণ হিন্দুস্থানের বাদশার মুখে তাকিয়ে ছিলেন। ইতিহাসের দরকার কথাটা বলার সময়—তাঁর মনে হল—বাদশার মুখে যেন

বাড়তি খুন এসে থানা গাড়ল।

—আর ক'দিন বাদেই আমরা কাশ্মীর যাব।

—আমরা ?

—হ্যাঁ। তুমি, জাহানারা—দু'জনেই আমার সঙ্গে কাশ্মীর যাবে।

—ভীষণ শীত ওখানে আব্বা হুজুর।

—শীত কমে আসবে এবার। বুলবুলিরা বেরিয়ে পড়বে।

—অনেকদিন আগ্রা যাওয়া হয়নি আব্বা হুজুর।

—সে তো যাবেই। একবার কাশ্মীর গিয়ে দেখতে হবে—স্কার্দু, গিলগিট, চিত্রল—এসব পাহাড়ী রাস্তায় আমাদের পাহারা আচমকা ইরানি হামলা হলে কতটা সামলাতে পারবে।

শাহজাদা আর কিছুই বললেন না। তিনি বুঝলেন, হিন্দুস্থানের বাদশার মগজ এখন শাহীর খোয়াবে ভরপুর হয়ে আছে। ইতিহাসের দরকারে সেখানে শাহী বড় থেকে আরও বড় হয়ে উঠতে চাইছে। সেই শাহী খোয়াবের ভেতর আছে আরও তাগদ, আরও খুন, আরও হামলা। দারা যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাবেন—তুষার পেছল পাহাড়ী পথ দিয়ে ভারি কামান টেনে তুলছে পদাতি ফৌজি সেপাইরা। জানোয়ারের অভাবে ফৌজি ইনসান কাঁধে দড়ি বেঁধে খাড়াই ধরে ভারি গজনল ঠেলে তুলছে। তাতে কিছু ইনসান যদি শেষ হয়েই যায়, পাহাড়ী খাদে পড়ে হারিয়েও যায়—তাতেই বা কী। বাদশার খোয়াব মিটলেই হল।

সেদিনই রাতে শাহজাদা দারাশুকো তাঁর গত কয়েক বছরের খাটুনি এক জায়গায় করে সাজাতে বসলেন। হুকুম, হামলা, ফরমানের ফোয়ারা এই লাহোর দুর্গ। তারই একটা কোণে অভ্রের আলোয় শাহজাদা তাঁর সাফিনৎ-উল-আউলিয়ার পাতাগুলো নিয়ে বসলেন।

তারিখ মোতাবেক আউলিয়াদের জীবনী পর পর সাজান। শুরুতে তিনি একটি মুখবন্ধ লিখতে লাগলেন—

আমি পীরদের সেবক—ভৃত্য দারাশুকো, হানিফি, কাদিরী—শাহজাহানের সন্তান। ১০৪৯ অল্‌হিজরিতে এই গ্রন্থ লেখা শেষ হল। এ লেখা শুরু করার আগে সুফীদের জীবন নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবতাম। তখন একদিন দেখি হজরত রসুলাল্লা দাঁড়িয়ে আছেন।

চিন্ত দুনিয়া আজ খুদা গাফিল সুদান—সংসারে মজে থাকা কাকে বলব ? পোশাক ? হীরে জহরত ? কিংবা বেগম বেটায় মজে থাকা ? না। তা নয়। খোদার এবাদতে গাফেলি করাই দুনিয়াদারি।

কলমের কালি শুকোতে দেওয়ার জন্যে শাহজাদা খোলা অলিন্দ দিয়ে আকাশে তাকালেন। চারশো এগারোজন সুফী সাধক-সাধিকার জীবনী। আমি যেখানে যেটুকু আভাস পেয়েছি—সন তারিখ পেয়েছি—তা আমার বিশ্বাস মতো সাজিয়েছি। ভুল থাকতে পারে। কিন্তু আমি জেনেশুনে ভুল করিনি কোনও।

অনেকদিন পরে নিজেকে খুব হালকা লাগতে লাগল দারাশুকোর। বাইরের আকাশে তখন শীত আর অন্ধকার গলাগলি করে লাহোরের ওপর নেমে আসছিল। নিচে মানুষের শহর। সেখানে মানুষের ক্ষমার পাশাপাশি মানুষেরই লোভ বাসা বেঁধে আছে। জীবন এখানে আরেকটি সকালের অপেক্ষায় অন্ধকারে, ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। শাহজাদা দারাশুকো ভাবলেন, আমি কি সাফিনৎ-উল-আউলিয়ায় চিসতিয়া, কাদিরী, সোহরাওয়ার্দি, নকসবন্দী—নানান ধারার সুফী সাধকদের —সাধিকাদের জীবন ঠিক মতো তুলে ধরতে পেরেছি? আব্বা হুজুর ইতিহাস বলতে বোঝেন, একটি শাহীর কুঁকড়ে যাওয়া—নয়তো সেই শাহীর বড় থেকে আরও বড় হয়ে ওঠা। কিন্তু মানুষের ইতিহাস তো মানুষের হৃদয়ের সৌরভ —ভালবাসা, ঈশ্বর চিন্তার ইতিহাস। ঈশ্বর বড় মজার জিনিস। রহস্যময়। যন্ত্রণাময়। আনন্দময়। সেজন্যেই তাঁকে নিয়ে মেতে থাকতেও এত আনন্দ।

আকবর বাদশার আমলের মাঝামাঝি অব্দিও মুঘল শাহীর দাপট বা এক্তিয়ার বলতে বোঝাত কেবল—সুবে বিহার, ইলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমির, দিল্লি, লাহোর, মুলতান, কাবুল। এই সব সুবাতে বাইরে মুঘল শাসন ছিল শিথিল। শাহীর মাঝামাঝি থেকে আকবর বাদশা শক্ত হাতে লাগাম ধরেন। এখন কামরূপ থেকে কান্দাহার—কাশ্মীর থেকে গোলকুন্ডা—সব জায়গাতেই মুঘল হুকুম মানে হুকুমই—অন্য কিছু নয়। জমানা বদলে গেছে। বাদশার হাতের কবজায় এখন সারা হিন্দুস্থান।

সুবাগুলোর ভেতর লাহোরকে আদি সুবা বলা যায়। সেখানকার শুধু সরকার দোয়াবে জলন্ধরেই ষাটটি মহল। পরিমাপ ফল ৩২৭৯৩৯৫ বিঘা। শাহী খাজনা ১২৩৩৬৫২১২ দাম। তা এই লাহোর সুবার সদরও লাহোর।

আগ্রা থেকে এতটা উজিয়ে এসে লাহোরে আরও একটি ব্যাপার দেখার ছিল বাদশার। সুবে লাহোরের উজির-ই-কুল আফজল খান অল্পদিন হল মারা গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এখনও নতুন কাউকে বসান হয়নি। সকালবেলার রোদে সারা লাহোর ঝলমল করে উঠতেই বাদশা শাহজাহান মরহুম আফজল খানের দফতরের সবাইকে দরবারে ডেকে পাঠালেন।

শীতের লাহোর দিনের বেলায় বড় আরামের। শাহজাদা দারাশুকো জানতেন উজির-ই-কুল আফজল খাঁয়ের দফতরের সবাইকে আব্বা হুজুর দরবারে ডেকেছেন। দারা দুর্গের সামান বুরুজে দাঁড়িয়ে রাভির বয়ে যাওয়া দেখছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, সুবে লাহোরের শাহী দেওয়ানের কর্মচারীরা সবাই সার দিয়ে দরবারে চলেছে।

দফতরের কাজের লোকদের সেই সারির ভেতর একজনের এগিয়ে যাওয়া দেখে শাহজাদার চোখ আটকে গেল। যেমন সুশ্রী—তেমনই অভিজাত বিশিষ্ট ভঙ্গি মানুষটির চলায়। শাহজাদা থাকতে পারলেন না। মানুষটি কে জানার জন্যে তাঁর বড় আগ্রহ হল। দারা গিয়ে দরবারে বসলেন।

আফজল খানের দফতরের এক এক জন এগিয়ে এসে নিজের নাম বলছেন। বাদশাকে কুর্নিশ করে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এঁদের ভেতর দারার চোখে

লেগে যাওয়া মানুষটিও একসময় বাদশা শাহজাহানের সামনে এসে তাঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন।

রীতিমত লম্বা সুশ্রী মানুষটির মাথার পাগড়ির বাইরে কাঁচাপাকা বাবরির ঝালর। টিকাল নাকের দু'পাশে দু'টি শান্ত গম্ভীর চোখ। ঠোঁটে সবসময় এই মাত্র হাসি মুছে নেওয়ার অদৃশ্য দাগ। ষাট পেরিয়েছেন।

বাদশার সামনে কুর্নিশ করে মানুষটি নিজের নাম না বলে কোমর থেকে পাকানো একখানি কাগজ বের করলেন। দরবারে সবাই রীতিমত কেঁপে উঠল। একি বেতমিজি? নিজের নাম না বলে ওকি বের করা হচ্ছে।

ততক্ষণে কাগজখানি মেলে ধরে মানুষটি প্রায় গান গেয়ে উঠলেন। শাহজাদা লক্ষ্য করলেন, বাদশার কুঁচকে যাওয়া ভ্রূ সমান সমান হয়ে এল। হিন্দুস্থানের বাদশার প্রশস্তিতে রুবাইয়াত। সুরের সঙ্গে কথার সুন্দর মেল।

গান থামিয়ে মানুষটি শিকাস্তা ভঙ্গিতে আঁকা রুবাইয়াত এক পা এগিয়ে বাদশার হাতে দিলেন। তারপর কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। সারা দরবার একদম নিশ্চুপ। বাদশা রুবাইয়াতটি আগাগোড়া পড়লেন। তারপর মানুষটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, কে লিখেছে?

—হজরত। আপনার গুণগানে এই রুবাইয়াত আমি লিখেছি।

সন্দেহের চোখে বাদশা তাকালেন। আপনি লিখেছেন? এই শিকাস্তা লিপির কাজ আপনার আঁকা?

—হ্যাঁ বন্দেগান। আপনি আসছেন জেনে লিখেছি—এঁকেছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বাদশা জানতে চাইলেন, এখানে কী করেন আপনি?

উজির আফজল খাঁয়ের খাস মুন্সী ছিলাম। আমার নাম—মুন্সী চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ।

বাদশা একটু অবাকই হলেন। হিন্দু? ফারসি রুবাইয়ে তো বেশ দখল। তিনি জানতে চাইলেন। পয়দায়িস?

—হজরত। এই লাহোরেই আমি জন্মেছি। বাবা ছিলেন পণ্ডিত ধর্মদাস। বড় ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। মুল্লা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটির কাছে পড়েছি। আগা আবদুর রসিদ খিয়াফত খান, বারাণসী দাসের কাছে নাস্তালিক—শিকাস্তা—দুই লিপিতেই হাত পাকিয়েছি।

শুনতে ভালই লাগছিল শাহজাহানের। মানুষটি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহও বাড়ছিল। হিন্দু-ই-ফারসি দান? ফারসি জানা হিন্দু? তিনি জানতে চাইলেন, আফজল খাঁয়ের দফতরে। এলেন কী করে?

—হজরত। অনেক হাত ঘুরে তবে আমার এখানে আসা। মরহুম আফজল খাঁও আমায় খুব খাতির আদর করতেন। বাইরে বেরলে তিনি আমাকে হাতির পিঠে গাদেলায় তাঁর পাশেই বসাতেন। চাকরি জীবন শুরু হয়েছিল মীর আবদুল করিমের দফতরে—

—কোন্ আবদুল করিম?

—হজরত। তাজমহলের নকশা যাঁর—সেই আবদুল করিম। তবে ওখানে বেশিদিন থাকিনি। আমি দিওয়ান, রুবাই, চৌপাই, দোহা লেখা মানুষ। আমার পাথর, মাপজোক, নকশা এসব অত ভাল লাগতো না। আমার বড়ো ভাই উধোভান ছিলেন আকিল খাঁয়ের মুন্সী। উধোভানের কথায় মুল্লা আবদুল সাকুর আমার একটা কাজের জন্যে আফজল খাঁয়ের দফতরে সুপারিশ করেন। সেই থেকে—

—চন্দ্রভান। আপনি এখন থেকে আমার সভায় মুন্সী হলেন—। রোজদিন দরবারে হাজির থেকে দিনের সব ঘটনা লিখে রাখবেন।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ ফের কুর্নিশ করলেন বাদশাকে। হজরত! সবই আপনার মেহেরবানি।

—জ্ঞান নিয়ে কী করতে হয় বলুন তো চন্দ্রভান?

—জ্ঞান সঞ্চয় করে রাখতে হয়। জীবনের দরকারে কাজে লাগাতে হয়। ব্যবহার নাহলে জ্ঞান ফলশূন্য গাছের শাখার মতো হজরত।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল দারাশুকোর।

তখন মুন্সী চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বলছিলেন, জ্ঞান অল্প হলেও তার ব্যবহার হলে সবচেয়ে ভাল। যদি অনেক জ্ঞান থাকে—অথচ তার ব্যবহার নেই—তাহলে তার কোনও দাম নেই।

শাহজাদা লক্ষ্য করলেন, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের এসব কথা বাদশার মনে ধরেছে। নয়তো অমন একমনে তাকিয়ে থাকবার পাত্র নন শাহজাহান। বাদশা জানতে চাইলেন, জওয়ানির জন্যে আপনার পরামর্শ কী?

—জওয়ানির শুরুয়াতে মনের ভেতর অনেক উৎপাত লেগে যায়। মেজাজ অস্থির হয় বন্দেগান। সেই জওয়ানরাই সাবাস—যারা তাদের জওয়ানি কাটায় ধীর স্থির হয়ে—অন্যকে ক্ষমা করে—শান্তভাবে। যদিও পেয়ার মহব্বত মানুষের খুব দরকারি। বিদ্বান বা মূর্খ—কেউই এসব এড়াতে পারেন না। তবে যিনি বেশি নিস্পৃহ থাকবেন—তিনিই বেশি সুখী হবেন। সাদি পড়লেই এ কথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের একথা শেষ হতেই শাহজাদা দারাশুকো দেখলেন—তাঁর আব্বাহুজুর তাঁরই দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন। দারার চোখ কেঁপে গেল। তিনি মুখ নামিয়ে নিলেন। আব্বা হুজুর কি আমাকে শেখাতে চান—কী ভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করব? কী ভাবেই বা জওয়ানি কাটাব? হঠাৎ তিনি বাদশার গমগমে গলা পেয়ে মাথা তুললেন।

শাহজাহান তখন একেবারে অন্য ব্যাপার নিয়ে পড়েছেন। তিনি বলছিলেন, ফি বছর নানান সুবা থেকে মুসলমান ছাত্ররা কাশীতে পড়তে যায়। হিন্দু আইন—চিকিৎসা শাস্ত্রের আইন সংস্কৃতে লেখানো হল। হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে মুসলমান ছেলেরা ধর্মশাস্ত্র পড়ছে—দর্শন পড়ছে। এ ব্যাপারে কাশীর ব্রাহ্মণরা পুরোপুরি স্বাধীন।

—হজরত! তার ফলে তো হিন্দুস্থান জ্ঞানে, শিক্ষায়, ধর্মে, মানুষের শুশ্রূষায়

দিনকে দিন আরও ধনী হয়ে উঠছে। এ সবেরই মূলে আপনাদের খলিফা সমান মুঘল খানদানের মেহেরবানি।

শাহজাদা দারাশুকো অবাক বিস্ময়ে আব্বা হুজুরকে দেখছিলেন। ইনিই হিন্দুস্থানের বাদশা। ইনিই হিন্দুস্থানে বিচারে, শাস্তিতে, পুরস্কারে, সাবাসিতে শেষ কথা। এ মানুষের কোনও তল পাওয়া যায় না। কখনও মুঘলদের ফেলে আসা চাঘতাই বনপথের খোয়াবে ইনি বিভোর হয়ে থাকেন। পরিষ্কার বলেন, মুঘল ইতিহাসের ভোরবেলায় তাঁর দাদাসাহেব—পরদাদাসাহেব যেসব জায়গায় ঘোরাফেরা করেছেন—সেসব জায়গা হিন্দুস্থানের মুঘল শাহীর ভেতরে আসুক। আবার কখনও এই মানুষই আমি গজনি থেকে ফিরলে চোখ ভাসিয়ে কেঁদে আমায় জড়িয়ে ধরেন। যেন আমায় চিরকালের মতো হারিয়ে বসেছিলেন। ইতিহাসের দরবারে কিল্লা কান্দাহার এই মানুষের হাতে থাকা দরকার। ইতিহাস নাকি শাহীর ছোট থেকে ছোট হয়ে যাওয়া—নয়তো বড় থেকে আরও বড় হয়ে ওঠা। সেই মানুষই সাচ্চা জ্ঞানের জন্যে হিন্দুর আইন, ধর্ম, চিকিৎসা, দর্শন শাস্ত্রে মুসলমান পড়ুয়াদের সড়গড় করে তুলছেন। আব্বা হুজুর কি নিঃশব্দ আকবর?

শাহজাহান তখন বলছিলেন, সত্যি সত্যি ওরা কতটা পড়ছে—কতটা শিখছে—কতটাই বা ওদের শেখানো হচ্ছে—এ ব্যাপারে আমি একেবারে অন্ধকারে। অথচ দেওয়ানখানা থেকে ঢালাওভাবে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এ জন্যে—আপনি একবার দেখবেন ব্যাপারটা—?

—আপনার হুকুমই আমার শক্তি বন্দেগান।

॥ বাষাট্ট ॥

লাহোর থেকে উত্তরে ঠেলে উঠতে উঠতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছিল। বাদশার কাফেলা যতই এগোয় ততই শীতের মুঠো আলগা হয়ে যাচ্ছিল। জম্মু ছাড়িয়ে পীর পঞ্জল গিরিপথের সামনে এসে দাঁড়াতেই শাহজাহান দেখলেন, বাঁয়ে নৌশেরার দিক থেকে আকাশে কালো কালো বিন্দুর ঝাঁক এগিয়ে আসছে। বাদশা বুঝলেন, বুলবুলির ঝাঁক—নতুন পাকা গেহুঁর খেত থেকে হঠাৎ আকাশে উঠে পড়েছে—হিন্দুস্থানের বাদশার লম্বা কাফেলা দেখতে। পাখিরাও জানে, মানুষের কাছাকাছি থাকলে খাবার পাওয়া যায়।

আগু পিছু ঘোড়সওয়ারদের পাহারার মাঝখানে ফিল-ই-ফতের পিঠে গাদেলায় বাদশা শাহজাহান। তাঁর পাশাপাশি ফতে-জংয়ের পিঠে শাহজাদা দারাশুকো। তাঁর সঙ্গে একই গাদেলায় শাহজাদী জাহানারা। ওঁদের পেছনেই তিন কাতার উটের পিঠে বাছা বাছা কয়েকজন বন্দুকচী। সঙ্গে পদাতীর দল। তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে দাখিলা-হাজিরার দল। একেবারে শেষে আবার ঘোড়সওয়ার বাহিনী।

গাদেলায় বসে দুলতে দুলতে শাহজাদা আর শাহজাদী দেখতে দেখতে

যাচ্ছিলেন—শীতের বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে চলেছে কাশ্মীর। সামনে বিখ্যাত বসন্ত। দিন বাড়তে বাতাসে আরামের গরম। দুই পাহাড়ের মাঝখানে আকাশ ছোঁয়া সব গাছের গা থেকে তুষার ঝরে যাওয়া নতুন রোদে তারা সবুজ হয়ে ঝকঝক করে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে জাহানারা বললেন, ইরানের এইসব বুলবুলি হিন্দুস্থানকে নিজেদের দেশ করে নিয়েছে—

শাহজাদা দারা নিজের বড় বোনের মুখে ফিরে তাকালেন। বাজি খুবই সুন্দরী। জেদি। আবার আব্বা হুজুর ভার দিলে শাহীর যে কোনও ভারি কাজ ঠিক তুলে দিতে পারেন। এই বাজি এখন শাহী কাফেলার সঙ্গী হয়ে কাশ্মীরের রূপ দেখে সব ভুলে আছে। থাকুক। ভুলেই থাকুক। দারা বললেন, বাজি! আমরাও তো চাঘতাই বুলবুলি। শও সন হয়ে গেল হিন্দুস্থানকে নিজেদের দেশ করে নিয়েছি।

শাহজাদী জাহানারা একথায় যেন কী বলে শুরু করতে যাবেন। এমন সময় —বাদশা শাহজাহান বলে উঠলেন, সামনেই পীর পঞ্জালের সব পাহাড়।

আগে আগে ঘোড়সওয়ারদের বাছাই ঘোড়াদের পায়ের খটাখট। তাদের পেছন পেছন হাতি। দু'ধারে খাড়াই পাহাড়। তাদের মাথা সিধে আকাশে উঠে গেছে। অনেক নিচে সবে বরফ ফাটানো নীল জলের ধারা খুশির দমকে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ী ধাপ পেরিয়ে যাচ্ছে।

বাদশা বললেন, এইসব পাহাড়, গিরিপথ কী নিয়ে সেদিন পার হয়েছিলেন বাবর বাদশা? ভাবলে অবাক লাগে।

সূর্য মাথায় মাথায়। যত রোদ্দুরই দিক সে সূর্য—সারাটা শীত জবুথবু পড়ে থাকা কাশ্মীর এখন তার সবুজ দিয়ে, পাহাড় পর্বতের গা জুড়ে জেগে ওঠা লতানে গাছপালার শরীর দিয়ে তার সবটুকু তাত শুষে নিচ্ছিল। এর ভেতর হাতি, ঘোড়া, উট, বাদশা, শাহজাদী, রিসালাদার—সবই যেন রাস্তার ধারের বিরাট কোনও নটংকী দলের লবকুশ মাত্র। কেননা, এখানে জানোয়ার আর ইনসানের চেয়ে পাহাড়, সেই আকাশে উঠে যাওয়া প্রবীণ সব গাছ, গভীর গভীর পাহাড়ী খাল, দিগন্ত অব্দি ঠেলে ওঠা কোনও অদৃশ্য কারিগরের বিছিয়ে রাখা সবুজ উপত্যকা, অনেক নিচে বরফ ফেটে বেরিয়ে পড়া নীল জলের হ্রদ অনেক —অনেক বড়।

শাহজাদা দারা মনে মনে বললেন, শুধু বাবর বাদশাই বা কেন? পাঠান, ঘোরি, সৈয়দ, মুররাও তো এসব পথ দিয়েই হিন্দুস্থানে এসেছিল। তখন কী বা ছিল তাদের। এখন যেমন কামান, বিশাল ফৌজ, তোপ, বন্দুকচী—হাতের ইশারায় আগ্রার দেওয়ানখানা জড় করতে পারে—তখন কী বা করা যেত! না রসদ—না বারুদ। কঠিন শীত। কঠিন পাহাড়। পা পিছলে হারিয়ে যাবার বিশাল খাদ।

দুই পাহাড়ের চূড়ার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া আলোয় বাদশার কাফেলা এগিয়ে চলেছে। আকবরি আমল থেকেই হিন্দুস্থানের বাদশারা ফাঁক পেলেই কাশ্মীরে ছুটে এসে থাকেন। কখনও শাহীর ঝক্কি-ঝামেলায় প্রলেপ লাগাতে কাশ্মীর তার

নিসর্গের সবুজ নির্যাস বাদশার হৃদয়ে মাখিয়ে দিয়ে থাকে। আবার বাদশারাও কখনও এইসব পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন—এত উঁচু, এত পেছল সব পথ—কী করে পেরিয়ে গিয়ে আমাদের বাবা দাদাদের জীবনের ভোরবেলাকার জায়গাজমি, দেশ জায়গা—সমরখন্দ, উসুরি, চাঘতাই বনপথ, ফরগনা, খোরাসান, বলক্, বদকশানের দখল নেব—নিলেও দখলে রাখব কী করে? কোন উপায়ে? এত দূরে। এত কঠিন। কী ভাবে?

তখনই বাদশাদের বুকে স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা বাজে। এর চেয়ে কি আগেকার সেই যাযাবর ঘোড়সওয়ারি জীবনই ভাল ছিল? তখন ছিল না শাহী। ছিল না কেল্লা। ফৌজ। নজরানা। দেওয়ানখানা। কিন্তু ছিল দাপটে ঘোড়া দাবড়ে ছুটে বেড়াবার প্রান্তরের পর প্রান্তর। কেড়ে নেবার—ভোগ করার ছোট ছোট আহ্লাদ—ছোট ছোট আনন্দ।

বাদশা শাহজাহান পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই পীরপঞ্জল পেরলেই আমরা সপুর হ্রদের পাড়ে গিয়ে পড়ব।

শাহজাদী জাহানারা বলে উঠলেন, তার বাঁয়েই ঝিলম। আরেকটা পাহাড়ের মুন্ডু পেরলেই কিষেণ গঙ্গা বয়ে চলেছে।

শাহজাদা দারাশুকো মনে মনে বললেন, ওখানেই তো মুল্লা শার থানকা। পথের হদিশও বলে দিয়েছেন হুজুর। কিষেণ গঙ্গার গায়ে পাহাড়ি গুম্ফায় মুল্লা শার আস্তানা। তাঁর একবার মনে হল—ডাঙা জায়গা—যেমন আগ্রা, শাহজাহানাবাদ, দিল্লিতে থাকতে মনে হয়—সেখানে সবকিছুর ভেতর মানুষই বুঝি সবচেয়ে বড়—তাগদদার। আর যতই দরিয়া, পাহাড়, আসমানের কাছাকাছি যাওয়া যায়—ততই মনে হয়—মানুষই বুঝি ওসবের ভেতর সবচেয়ে নিরুপায়—ছোটমটো বে-কামিল চিজ।

দু'দিন বাদে ঠিক এমন সময়ে সপুর হ্রদের তীরে উঁচু টিলার ওপর মুঘল কোঠিতে বসে বাদশা শাহজাহান মহাল সপুরের ফৌজদারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দূরে সাদা পাথরের বিরাট পাগাড়। তার সামনে দিয়ে ঘোড়ার দলকে ঝিলমে চান করিয়ে নিয়ে ফিরছে সওয়ারের দল। এই কোঠিতেই একসময় এসে বসতেন আকবর বাদশা। জাহাঙ্গীর বাদশাও কাছাকাছি রাজৌরিতে গিয়ে মারা যাবার আগে এই মুঘল কোঠিতেও তাঁর শেষ শিবিকা ফেলেছিলেন।

হ্রদ সপুরকে ঘিরে মহাল সপুর। এরই পাশাপাশি নামী সব মহাল হল গিয়ে নৌসেরা, পুঞ্চ, রাজৌরি, পীরপঞ্জল। আরও উত্তরে উঠলে একে একে পড়বে চিত্রল, স্কাদু, গিলগিট। দু'ধারে খাদ। তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু সরু পাহাড়ী রাস্তা। পাশাপাশি দুটি হাতি সব জায়গা দিয়ে যেতে পারে না। এইসব পথ দিয়েই হিন্দুস্থানের ওপর বাইরের হামলা হয়েছে। আবার এইসব পথ দিয়েই রেশম-পশমের পসরা নিয়ে ব্যাপারীরা গিয়ে কাবুল, কান্দাহার, হিরাটের বাজার ধরে। এই পথেই যুগে যুগে সুফী-সন্ত ভবঘুরেরা এসে হিন্দুস্থানে জড় হয়েছেন। আশ্চর্য লাগে শাহজাহানের। খোদার কী অপূর্ব

মর্জি। একই পথে হামলা, কারোবার, ধর্ম।

ওয়াজিরি উপজাতির সর্দারের ছেলে আকিল খাঁ দু'বছর হল এখানে ফৌজদার। অল্প বয়স। সাহসী। সে সামান্য ঝুঁকে বাদশাকে জানাল, এই কোঠির নিচে মাটির তলায় বরফ দিয়ে তিন মাসের মাংস জমিয়ে রাখতে কোনও অসুবিধা নেই। গেঁহু বাজরা তো হামেশাই রাখা যাবে।

বাদশা হিসেব নিচ্ছিলেন, খুব খারাপের খারাপ ইরানি হামলা হলে তাদের সপুরের ওপারে ঠেকিয়ে রাখতে কতদিনের রসদ এখানে মজুদ করা যায়। আবার এ হিসেবও তাঁর মনে খেলে যাচ্ছিল—শাহী ফৌজ গিলগিট দিয়ে উত্তরে বদকশানের দিকে এগিয়ে গেলে সপুরের মুখল কোঠি নয়া জোগান আসা অব্দি কতদিনের রসদ যুগিয়ে যেতে পারে।

বাদশা কখনই খুব খোলা জায়গায় বসতে পারেন না। কেননা, তিনি যে কোনও সময়েই দূরের বন্দুকবাজের নিশানা হয়ে উঠতে পারেন। তাই শাহজাহান বসেছেন কিছুটা ঢাকা ঘেরা জায়গায়। তাঁর মুখোমুখি খোলা জায়গার দিকে পিছন ফিরে বসেছে ফৌজদার। শাহজাহান এই তরুণ ওয়াজিরি ফৌজদারের কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ তুলেই দেখতে পাচ্ছিলেন—চুনা পাথরের সাদা পাহাড় পেছনে রেখে নানা রঙের সব ফৌজি ঘোড়া চান শেষে কেশর ফুলিয়ে এলোমেলো ছোটাছুটি করে যাচ্ছে।

বাদশার ওখানে বসাটা যাতে আরামের হয়—সেজন্যে সামান্য যা শীত—তা তাড়াতে আগেনগারে বারে বারেই লকড়ি পড়ছিল। হঠাৎ শাহজাহানের চোখ আটকে গেল। একই বাঁদি—বেশ বয়স হয়েছে—ওড়না, ঘাগরা, গায়ের মোটা পশমের জুলপি সামলে বারবার এসে কাঠ দিয়ে যাচ্ছে আগুনে। বেশ অনেকটা ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা এই বাঁদির—কাঠ দিয়ে ফিরে যাওয়াও অনেকটাই ঝুঁকে।

বাদশা রীতিমত অবাক—বিরক্তও হলেন। হিন্দুস্থানের শাহী কেতামাফিক বাদশার খিদমতে এত বয়সের বাঁদি লাগানোর কথাই নয়। বরং বেছে বেছে কম বয়সীদেরই বাদশার কাজে দেওয়া হয়।

ফের সেই বাঁদি আরেক প্রস্থ লকড়ি দিতে এলে শাহজাহান রীতিমত ঘুরে বসলেন। একে এখানে দিয়েছে কে?

ফৌজদার তো হকচকিয়ে গেল। এর আগে সে কখনও বাদশার এত কাছাকাছি আসেনি। যা-কিছু দেখা তা দূরে থেকেই। ওয়াজিরি নওজওয়ান ঘাবড়েও গেল।

বাদশা ফের কী বলতে পারেন। বয়সী বাঁদি ঘুরে দাঁড়াল। পরিষ্কার গলায় বলল, গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা।

বাঁদি আগ বাড়িয়ে কথা বলে? কালে কালে কী হল? বাদশা চেঁচাবেন? না, সব ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। তিনি দেখতে পেলেন—শাহজাদা দারা আর শাহজাদী জাহানারা খোলা মাঠের সবুজ মাড়িয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। এই তাতারি বুড়ি তো কম নয়! না কুর্নিশ—না তসলিম!

বাঁদি বলে উঠলো, ফৌজদার সাহেব জানেন না। আলমপনা! আমি নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছি—আপনার খিদমতে আসব বলে। আমাদের সর্দারনী

আমায় পাঠিয়েছেন—তাঁকে বলেই আমার আসা।

শাহজাহান চমকে উঠলেন। এমন মাজা ফারসিতে তাতারনী কথা বলছে কী করে? কোনও পাহাড়ী টানই নেই গলায়। ওড়নায় মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা। যেটুকু এপাশ থেকে দেখা যায় তাও কাঁচাপাকা চুলের গুছি ঝুঁকে পড়ায় মুখখানা বোঝার উপায় নেই।

এর মাঝে জাহানারা, দারা এসে একই সঙ্গে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। শাহজাহানের যেন মনে হল—বয়সকালে তাতারনী বেশ সুন্দরীই ছিল। তাছাড়া এই ছোকরা মতো ফৌজদারকে শাহী রাগ থেকে আড়াল করার চেষ্টাও আছে বাঁদির গলায়। হিন্দুস্থান এত বড় দেশ। তার ভেতর দেওয়ানখানার বাঁদি-গোলাম-দাখিলা-হাজিরার বাহিনীটি এই একশো বছরে অতিকায় অজগরের চেয়েও বেড়ে উঠেছে। তার কোন কোথায় একটি দুটি সুন্দরী গোলাপ চোখের বাইরে থাকতে থাকতে বুড়িয়ে গেল—তার হিসেব কেউ রাখে না।

ওয়াজির্রি ফৌজদার তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। ঢাকা চাতালের মাঝামাঝি ঘুরে দাঁড়ানো বাঁদির পা থেকে মাথা—আগাগোড়াই ঢাকা। শুধু ওড়না উপচে মাথার এক গুছি চুল। আর খোদ বাদশা তার দিকে তাকিয়ে। শাহজাদী জাহানারা বুঝতে পারলেন না—এগিয়ে যাবেন কিনা? শাহজাদা দারা যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন।

আবারও বাদশা কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। এবার তাতারনী সিধে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখের ওড়না কাঁধে ফেলে দিল। আমি নিজেই একাজ বেছে নিয়েছি হজরত—

শাহজাহান সাবেক অভ্যেস বসে আর বসে থাকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি?

শাহজাদা দারার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বাদশা-বেগম—

শাহজাদী জাহানারা ফিসফিস করে বললেন, নুরজাহান বেগম!

খোদ বাদশাই প্রায় বলে বসছিলেন—মুলকে-মালিকা—। কী কষ্টে যে ঠিক সময়ে নিজেকে সামলে নিয়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন। তখত-রওয়ানে বসতে বসতেই তিনি ভুলতে পারছিলেন না—এই আওরত একসময় তাঁর কপালে পাকাপাকিভাবে লিখে দিয়েছিলেন—দুর্ভাগ্য। এই বাদশা-বেগমের জন্যেই তিনি রাজমহল থেকে নাসিক ছুটে বেড়িয়েছেন। কোথাও দু'দণ্ড তিষ্ঠোতে পারেননি। আজকের আগেনগারে ঘন ঘন লকড়ি জোগানো ওই দু'খানি হাতই টানা এগারো বছর ধরে হিন্দুস্থানকে শাসনে রেখেছিল। বাঁদির বেশে দাঁড়ানো এই আওরতের নামেই কাটানো সাবেক মোহর আজও হিন্দুস্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে হাত বদল হয়। নিজের ভাইঝি আরজুমন্দের সঙ্গে ইনিই আমার বিয়ে দেন—এই ভেবে—বাকি জীবন হিন্দুস্থানের সর্বেসর্বা হয়ে কাটিয়ে দেবেন।

সর্বেসর্বা! সর্বেসর্বা! বার দুই মনে মনে একথা বলে শাহজাহান আর ওই দুই চোখে সরাসরি তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। নিজের চোখ নামিয়ে

নিলেন। পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে ভীষণ মন দিয়ে পাহাড়ী বিষ-পিঁপড়েদের যাতায়াত দেখতে লাগলেন খুব তন্ময় হয়ে।

নূরজাহান বেগম বললেন, হ্যাঁ আমি! দক্ষিণে জয়ী হয়ে ফিরে সেদিনকার শাহজাদা খুর্‌রম যাকে দু'লাখ টাকা নজরানা দিয়েছিলেন—সেই বেগম নূরজাহান আমি!

বাদশা নিজের মনকেই বললেন, হ্যাঁ। তখন আপনি হিন্দুস্থানের শাহেনশা জাহাঙ্গীর বাদশার আতালিক—অভিভাবক।

দাঁড়িয়ে থাকা নূরজাহানের দু'চোখ তখন সপুর হ্রদের সামনে তাকিয়ে। তিনি পলক না ফেলে বললেন, হজরত! আপনার সেই নজরানা দেবার কথা আপনার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা তাঁর তুজুকে লিখে রেখে গেছেন। সেখানে আপনারই আব্বা হুজুর লিখে গেছেন—আমিই আপনার ওয়ালেদা-ই খোদ। আসল মা।

একথার পর বাদশা বিষ পিঁপড়ের সারি আরও মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। দুপুরবেলার পরিষ্কার পাহাড়ী বাতাসে নূরজাহান বেগমের কথাগুলো কেটে কেটে ছড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ। মনে পড়েছে বাদশার। গর্ভধারিণী যোধাবাঈ সমেত মায়ের সমান আর সবাইকে মিলিয়ে মোট দিয়েছিলাম ষাট হাজার টাকা। আর আপনাকে দু'লাখ। তাগদের চাহিদা সবার ওপরে। সেদিন সেজন্যে আপনাকে দু'লাখ দেওয়া। আপনার ওয়ালেদা-ই খোদ হয়ে ওঠা।

এবার শান্ত চোখে মুখ তুলে চাইলেন শাহজাহান। আপনার তো একাজ করার কথা নয়।

—নয়ই তো। আমি নিজের থেকে বেছে নিয়েছি।

—আপনার তো সব শাহীবাগে যুঁই, বেলি, গোলাপ দেখে বেড়ানোর কথা।

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। দেখছিলামও তাই। লাহোর দুর্গ ছাড়ার পর—

—লাহোর ছাড়লেন কেন?

—উঃ! সেখানে তিষ্ঠনো কঠিন হয়ে উঠেছিল। ময়ূরগুলোকে দেখার কেউ নেই। আপনার আব্বা হুজুর চিরকালের মতোই চলে গেছেন। শীতে ময়ূরগুলো সারা দুপুর চেঁচায়—কেউ আর ফিরেও তাকায় না।

—করে কী লোকগুলো?

—বসে বসে স্রেফ তনখা গোনে।

—আর—

—আর কী? বলুন—

—ওখানেই তো শাহজাদা শারিয়ারকে পৌস্তের শরবত খাওয়ানো হয়। যদি জানতাম দুর্গের কোন কুঠুরীতে বেচারা সব ভুলে গিয়ে চোখ চেয়ে বসে আছে —

দারা দেখলেন, বাদশার চোখ ছোট হয়ে এল। ওপরের ঠোঁট নিচের পাটির দাঁতে বসে যাচ্ছে। বাদশা বললেন, তারপর আপনি ডালের সামনে নিশাতবাগে চলে এলেন।

—তাই হুকুম হয়েছিল বন্দেগান। নিশাতবাগে গোলাপ দেখতে চলে এলাম কাশ্মীরে। সেখানে ধাপে ধাপে গোলাপ বসানো। লাহোরের সুবেদারের তাই-ই হুকুম হয়েছিল। ওখানে ময়ূর নেই। কিন্তু শীত—উঃ! কি ভীষণ শীত!

—কেন? আপনার চিন্তা কিসের? আপনার তো শাহী খাজানাখানা থেকে মাসোহারা রয়েছে।

—বন্দেগান। মাসোহারা মানে তো কিছু আশরফি। আশরফি দিয়ে তো আগুন জ্বালানো যায় না হজরত। আগুনের জন্যে চাই লকড়ি। তা সে লকড়ির যে কাশ্মীরে কী দশা তা আপনি নিজের চোখে দেখে যান। ওই ফৌজদার সাহেবই বলুন না কেন। আশরফি মেলে তো লকড়ি মেলে না এদেশে।

বাদশার সামনে অমন ফরফর করে কথা বলাটাই এক মহা বেতমিজি। নওজওয়ান ওয়াজিরি ফৌজদার আর বিপদ বাড়াতে চান না। তিনি কঠিন চোখে মাথা ঘুরিয়ে যে হুকুমের নিঃশব্দ আভাস দিলেন তাতেই কাজ হল। ফৌজদারের চোখে চোখ পড়তেই নূরজাহান বেগম মাথার ওড়না তুলে নিয়ে ঝুঁকে কুর্নিশ জানালেন। তারপর প্রায় পা টেনে টেনে পাথরের দেওয়ালের আড়ালে চলে গেলেন।

—এখানে কী কাজে আছে?

বাদশার এ কথায় ফৌজদার জানাল, সপুর হ্রদের তীর ধরে বাগিচা বানানো শুরু হবে। গরম পড়লেই কাজে হাত পড়বে। সে জন্যেই নিশাতবাগ থেকে এই আওরতকে এখানে আনা।

বাদশা এবার কঠিন করে ফৌজদারের মুখে তাকালেন। আর যেন এখানে লকড়ি দিতে না আসে। কালই ওকে নিশাতবাগে ফেরত পাঠাও।

বাদশার একথার সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদার নিজেই সপুর হ্রদের মুখোমুখি এই মুঘল কুঠির অন্দরমহলে ছুটে গেলেন। নতুন গরমে বারমুল্লার দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি প্রায়ই আকাশে ছররা তুলে দক্ষিণে অনন্তনাগের দিকে ছুটে চলেছে। তাদের দিকে মাথা তুলে তাকাতেও লজ্জা হল দারার। এসব বুলবুলি ইরান থেকে প্রথম আনিয়েছিলেন বাদশা-বেগম নূরজাহান।

সন্ধের দিকে সপুর হ্রদ ভাসিয়ে চাঁদ উঠল—পীর পঞ্জলের দুই পাহাড়ের মুন্ডুর মাঝখানে। কালো পাহাড়ের মাঝে ঘিয়ে আকাশে গাঢ় হলুদ চাঁদের জলছাপ। আজই দুপুরের পর বাদশা শাহজাহান কয়েকজন মনসবদার আর ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে সরেজমিনে স্কার্দু যাবার পাহাড়ী পথ দেখতে গেছেন। এসব মনসবদার ফৌজ নিয়ে চিত্রল, স্কার্দু, গিলগিটে বসে আছেন। যদি ইরানিরা আসে।

মুঘল কুঠির চাতালে বসে দারা টের পাচ্ছিলেন, গরম পড়তেই শীতের পাখিরা যে যার দেশে ফেরার পথ ধরেছে। ওরা রাতে রাতেই বেশি ফেরে। তাই মাঝে মাঝেই হলুদ জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একটানা সাঁই সাঁই আওয়াজ। কালই হয়তো সেদিনের বাদশা-বেগম নূরজাহান অনন্তনাগ রওনা হয়ে যাবেন। তাঁকে ফিরে যেতে হবে নিশাতবাগে। যাঁর নামে মান্ডিতে মান্ডিতে মোহর ফেরে—যাঁকে

একসময় খোদ জাহাঙ্গীর বাদশাও খুশমেজাজে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—সেই তিনি আজ শীতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে লকড়ির আর্জি'টা বাদশাকে সামনা-সামনি জানানোর জন্যে আগেনগারে নিতান্ত বাঁদির মতোই লকড়ি জুগিয়ে যান ! তাগদ ! তুমি শাহেনশা ! কিন্তু তোমার এই দুর্দশা !

চোখের সামনে পীর পঞ্জলের গা ধরে আবছা অন্ধকারে উঠে যাওয়া পাহাড়ী পথ হারিয়ে গেছে। এমনই কত পাহাড়—কত জ্যোৎস্নামাখা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে আমাদের চোখের বাইরে এই পথ নদীর মতো বয়ে গেছে—দেশে দেশে—কত লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গকে ছুঁয়ে দিয়ে। পৃথিবী পৃথিবীই থাকে। মানুষ শুধু বদলে বদলে যায়। যুগে যুগে।

ভগবানকে পাওয়ার রাস্তাও কি এমনই ? এমনই আবছামত হারিয়ে যাওয়া ? ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা তো চিরকালের। সেই রাস্তার ভবঘুরে মুসাফিররা তো এমনই এক রাস্তা দিয়ে যুগে যুগে চলেছেন। তাঁরা ভগবানের কাছে যাওয়ার রাস্তার সালিক। এত বড় দুনিয়ার মালিক ভগবান। তাঁর করুণা এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় ছাড়িয়েও পেরিয়ে যায়। সেই করুণার পাশে আমার ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট আহ্লাদ নিয়ে বড় অনুতাপ হয়। কী করে কাটাচ্ছি জীবনটাকে নিয়ে ! জীবন জাগার মতো জেগে থাকা। আমাদের চোখ ঘুমোয়। কিন্তু হৃদয় জেগে থাকে। হৃদয় কখনও ঘুমোয় না।

এত বড় হিন্দুস্থানে কত ধর্ম। কত মত। এর ভেতর পথ করে ভগবানে পাড়ি দেওয়া কী কঠিন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি রসুলাল্লার প্রেমিক। তাঁর কথা ভাবাও কত মধুর। একটু বড় হয়ে দারা সুফীদের কথা পড়তে শুরু করেছেন। তারপর তো বরাত জোরে তিনি মিঞা মীরের কাছাকাছি আসতে পারেন। শেষে আজ তিনি সপুর হ্রদের তীরে এসে হাজির। এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে কিষেণ গঙ্গা একবেলার রাস্তা। সেখানে পাহাড়ী গুম্ফায় মুল্লাশার খানকা। সে আস্তানায় তিনি যাবেনই।

এত বড় দুনিয়ায় কোনও কিছু কি জোর দিয়ে বলা ভাল ? এই যে বলা হয়—ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মে মুক্তি নেই—একথা কি ঠিক ? ইসলামেই সত্য—আর অন্য কিছুতে নয়—একথাও কি ঠিক। কত ধর্ম, কত মানুষ—কত পথ। সব ধর্মেই তো বড় মানুষের দেখা পাওয়া যায়। সব ধর্মেই নিশ্চয় মুক্তি আছে। সত্য বিশেষ কোনও ধর্মের একচেটিয়া হতে পারে না কিছুতেই। সব জাতি—সব দেশেই মহাপুরুষ এসে থাকেন।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল দারার। বাজি তখনও ওঠেননি। খবর নিয়ে শাহজাদা জানলেন, আব্বা হুজুর ফেরেননি। দারার মনে হল—গর্জনিতে আমি আব্বা হুজুরের। হিরাটে আমি হাতির পিঠে মুঘল ফৌজের। আগ্রা দুর্গে আমি নাদিরা বেগমের। রানী হাভেলিতে আমি রানাদিলের। কিন্তু এখন ? এখন আমি এই খোলা আকাশের। এখন আমি একজন সালিক।

কোমরবন্ধ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠলেন শাহজাদা।

ঝিলমের ওপর পায়ে চলা সেতু পেরিয়ে গিয়ে দারাশুকোর মনে হল—উঃ ! এই তাহলে মুক্তি ? বিকেল পড়ে এলে তিনি দেখলেন, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। তাঁর ঘোড়ার পা থেকে কিষেণগঙ্গার জল এক রশিও নয়। হুজুর মুল্লা শার কথামত কিষেণগঙ্গার গা দিয়ে একটা কাঁকুরে রাস্তা চলে গেছে সিরদির দিকে। নদী এখানে পাহাড় থেকে নেমে এসে ছন্ন মতো। চওড়া নয়। তবে পাগলাপারা। অবিরাম দলা পাকিয়ে ঘূর্ণী হয়ে যাচ্ছে। তাতে কোনও থামা নেই।

ঘোড়া থেকে নেমে নিতান্ত সাধারণ দেহাতি মানুষজনেরই মতো দারা সামান্য জলে নামলেন সাবধানে। পরিষ্কার জলের নিচে নুড়ি। ঘোড়াকে মুখ নামিয়ে জল খাওয়ালেন। তারপর নিজের জন্যে দুই হাতের আঁজলায় জল তুলে নিলেন ? রোদ পড়ে এসেছে। মাথার সামনেই পীর পঞ্জল পাহাড়ের ভাই-বোন পাতানো পর্বত তার চুড়ো নিয়ে সিধে আকাশে উঠে গেছে।

জল মুখে দিতে যাবেন শাহজাদা। হঠাৎ দেখলেন, আঁজলার ভেতর থেকে হুজুর মুল্লা শা তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন—হাসি হাসি মুখে। জল মুখে দেওয়া হল না দারার।

দু'হাতের ফাঁক দিয়ে আঁজলার জল নদীতে ফিরে গেল।

শাহাজাদা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মুখে তাকালেন। তাকিয়ে দেখেন ঘোড়ারই পাশে হুজুর মুল্লা শা দাঁড়িয়ে—হাসি হাসি মুখে। দারাকে দেখে বললেন, তুমি আসছ জানতাম। তাই পাহাড় থেকে নেমে এলাম। তোমায় নিতে এসেছি।

কিষেণগঙ্গা উজানে অনেক সরু। সেখানে আনতাবড়ি পাথর পড়ে ধাপে ধাপে পা ফেলার জায়গা। ঘোড়া সমেত দারাশুকো দিব্যি পেরিয়ে গেলেন। খসে পড়ার আগে আকাশ লাল করে সূর্য তার লালি এখানেও পাঠিয়েছে। কত কালের পাহাড়ী পথ—বুনো গাছপালা—সব লালচে হয়ে উঠল। দুনিয়া তৈরি হওয়ার সময়কার সব পাথরের চাঙ দু'পাশে—তার মাঝখানে নুড়ি খসা পথ ধরে ঠেলে উঠে মুল্লা শার সঙ্গে সঙ্গে দারাশুকো এক গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক খুব ভোরবেলা যেমন হয় তেমনই। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে চাঁদ আসেনি। নিচের মাঠে মাঠে গোধূলি। দারাশুকো ঘোরের ভেতরেই যেন বললেন, হুজুর ? এখনই ?

—হ্যাঁ। এখনই।

—কিন্তু—

দারার এ কথায় মুল্লাশা রুমি আওড়ে উঠলেন। সুরেলা গলায়। কী মিঠাজ। গুম্ফার ভেতরে বাসা বেঁধে থাকা পাখিরা ডানা ঝাপটে উঠল। হুজুর থেমে বললেন, হৃদয়ের আসল মন্দিরকে অবহেলা করে মুর্খরাই বাইরের মন্দিরের গুণগান করে—। এস—

দারা গুম্ফায় ঢুকতেই দেখলেন—সারাটা জায়গা বেশ পরিষ্কার। পাহাড়ের

কোন অজানা জায়গার ফাঁক থেকে অনেক উ'চুর আলো এসে চু'ইয়ে চু'ইয়ে যেন ঢুকেছে এখানে। কেননা কোনও অন্তর্দানি ছাড়াই গুম্ফার ভেতরটা দেখা যাচ্ছে।

—কেউ দরবেশ হয়ে দুনিয়া ঘুরে ঈশ্বর খোঁজে। কেউ বা স্বার্থসিদ্ধি থেকে এক পা সরে আরেক পা ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পায়। মোটে দুই পা। দ্যাখো দারা। নিয়মে অনিষ্ট। ভয়ে নয়—ভালবাসায় ঈশ্বর। এসো।

দারা গিয়ে একটা ঢিবিমত জায়গায় বসলেন। সেই কোন সুদূর কাস্পিয়ান দরিয়ার দক্ষিণের জেলা শহর জিলানের আবদুল কাদির জিলানিকে দিয়ে সুফী সড়কে কাদিরিদের শুরুয়াত। তাঁর আব্বা হুজুরকে সবাই ডাকতেন জঙ্গি দোস্ত। এসব প্রায় ছ'শো বছর আগের কথা। কথায় কথায় মিঞা মীর একদিন বলেছিলেন। আজ আমি সেই কাদিরি হতে দীক্ষা নিতে চলেছি। এই আবদুল কাদির ছিলেন পীর-ই-পীরান। পীরের মধ্যেও পীর।

এবার শাহজাদা মুল্লা শার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সে মুখ যেন কোনও ভাবের ঘোরে রয়েছে। তিনি যেন নিঃশব্দে ভাবের ঘোরে গেয়ে চলেছেন। যে গানের শেষ নেই।

—দ্যাখো শাহজাদা। খিরকা গায়ে দিলেই সুফী হওয়া যায় না। আবার বেগম আওলাদ নিয়ে ঘর সংসার করলেই যে সুফী সন্ত হওয়া যাবে না তাও নয়। হজরত মহম্মদ রোজা, হজ, নামাজ, জাকাতের বিধান দিয়েছেন। তবু তিনি সংসার ত্যাগের বিরোধী ছিলেন। তুমি শাহী শাহজাদা থেকে—সংসারে থেকেও অনেক কিছু করতে পার।

দুনিয়ার সবাই বিশ্বাস করেন—ঈশ্বর বা আল্লা এক। তিনিই সবার ওপরে। এই দুনিয়া তাঁরই তৈরি। একদিন এ দুনিয়া ধ্বংস হবে। মানুষ তার সৎ কাজের সাবাসি পাবে—কুকাজের দণ্ড ভোগ করবে। এই যদি সার হয় তো কে বিশ্বাসী —কে অবিশ্বাসী—কে মুসলমান—কে মুসলমান নয়—এ বড় কথা নয় দারা। যতদিন না বিশ্বাস অবিশ্বাস এক হয়ে যায়—ততদিন আসল মুসলমানের আবির্ভাবই হয় না। সব ধর্মেই সত্য আছে। এই কথাটি মনে রাখবে। একশো চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে শুধু একটি কথা বলার জন্যে। তাঁরা সবার মনে একটি কথাই পে'ছৈ দিয়েছেন। তা হল—'আল্লা' বল। তাঁর নাম কর। ভালবেসে কর। তাহলেই হবে।

—হুজুর। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি এ নাম শুনতে পাই। অনেক মসরাব—অনেক ঘাটে ঘুরে জল খেয়েছি আমি।

—নিজের আমিকে মুছে ফেলো। দেখবে মনে হচ্ছে—সবই তিনি—আমি কিছু নই। সবসময় মনে হবে—আহা। কী আনন্দ। আমি তুমির ভেদ ঘুচে যাবে। মনে হবে—আমি সেই আমি। হামহু, ওয়াজাহু হামহু সমা হামহু—তুমিই সব মুখ—সব কান—সব চক্ষু।

—হুজুর। এই চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখি। বালিকণায় আলোর ভেতর সূর্যকেই দেখতে পাচ্ছি। নোনা জলের ফোঁটায় ফোঁটায় দরিয়াকেই দেখতে পাই।

মুল্লা শা হাসিমুখে দারার মুখে তাকালেন। তাঁর দু'খানি হাত ধরে দু'কানের পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এবার নাকের ডগায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব ভুলে যাও। কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

অনেকদিন পরে দারাশুকো সেই হারিয়ে যাওয়া অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। আস্তে আস্তে সে ধ্বনিতে কান ভরে উঠতে লাগল।

—এবার হবস-ই-দমে এস। ডান নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁ কান দিয়ে ছাড়। যা শুনেছ এতদিন ভুলে যাও। যা দেখেছ ভুলে যাও।

দারা দেখলেন, সেই ঘণ্টাধ্বনিতে তাঁর সারা মাথা ভরে উঠছে। বড় মিষ্টি সে ধ্বনি। যেন বা তাঁর একটা সুঘ্রাণও আছে। সারাদিনের ঘোড়া দাবড়ানোর কোনও ব্যথাই নেই শরীরে। বরং আগের চেয়ে হালকাই লাগছে।

মুল্লা শা এবার তাঁর ঠোঁট শাহজাদার কানের কাছে এসে বললেন, আল্লা। আল্লা—মনে মনে বলে চলো—আল্লা। এই সুলতান-উল-আযকরে বসে নির্জনে বলে চলবে একটি নামই। তা হল আল্লা। আল্লা—

কতক্ষণ এভাবে ছিলেন শাহজাদা—তা তাঁর মনে নেই। একসময় মনে হল—আল্লার চেয়ে মধুর কোনও কথা নেই। একসময়—তিনি দেখলেন—সব শব্দ ছাপিয়ে একটি শব্দই সারা দুনিয়াকে ঢেকে ফেলছে। সারা আসমান সে নামে ভরে যাচ্ছে। কোনও সুঘ্রাণ ফুলভারে বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছে। বুঝিবা বুকই ফেটে যাবে।

দারা চিৎকার করে উঠলেন।—আর পারছি না। পারছি না। আমার বুক যে ভারি হয়ে হয়ে উঠল। বুক ফেটে যায়—

মুল্লা শা বললেন, আজ এই অব্দি থাক। দারা। আজ থেকে তুমি কাদির।—একটু থেমে থেকে মুল্লা শা গান জুড়ে দিলেন। গানের কথা আলাদা করা যায় না। একসময় দারা দেখলেন, তিনিও সেই সুন্দর সুরে মুল্লা শার গলায় গলা মিলিয়েছেন। কী কথা যেন আছে এই গানে। কিন্তু নিজেও তা জানেন না দারা। তবু গাইছেন।

আলোয় ভরে গেছে গুম্ফা। গুম্ফার হাতায় চাঁদের আলোয় বড় বড় পাথরের ছায়া। মুল্লা শার পায়ে ঘুঙুর। কখন বাঁধলেন। টের পাইনি তো। সেই ভাবের গানের ঘোরে তিনি নাচতে লেগেছেন। শরীর কত হালকা। নাচতে নাচতে তিনি গুম্ফার এক দেওয়ালে চলে যাচ্ছেন। আবার আরেক দেওয়ালে ফিরে আসছেন। পলকে। কী হালকা। আমিও কি পারি ?

দারাশুকো নাচতে গেলেন। তাঁর নিজের পায়েও যেন অদৃশ্য কোন ঘুঙুর বেজে উঠল। চাঁদের আলোয় ধোয়া নির্জন গুম্ফায় হুজুর আর তাঁর মুরিদ নাচতে লাগলেন। কথা-না-বোঝা সেই গান সঙ্গে। কী আনন্দ দারার। হালকা শরীর। যেন গানের সঙ্গে উড়ে চলেছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, তাঁর দুই ঠোঁটের কোণ যেন খুলে যাচ্ছে। নাকের পাটা ফুলে যাবার জোগাড়। আর চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে। এ আনন্দ ধরে রাখা যায় না। এত বেশি। এত মধুর। এত ভারি।

দু'জনেই থামলেন একসময়।

মুল্লা শা তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে শ্যাওলামত কী এনে দারার হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও। সারাদিন ঘোড়া দাবড়ে অনেক পথ এসেছ। কিছুই খাওনি নিশ্চয়।

—না। খাইনি।

—জল খাচ্ছিলে। তাও তো আমি বাদ সাধলাম। আসলে সময় বয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি আগ বাড়িয়ে তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম। আজ দিনটি বড় ভাল ছিল। তাই দীক্ষা দিলাম।

—কী খাচ্ছি ?

—ভাল লাগছে ?

—বড় ভাল লাগছে—

—এ হল গিয়ে পাহাড়ের শরীর থেকে জন্মানো এক রকমের প্রাণ—

—প্রাণ ?

—হ্যাঁ দারা। বলতে পারো পাহাড় ফাটিয়ে এরা গজায়। শিলায় জন্মায় বলে এদিককার পাহাড়ী রাখালরা বলে শিলাজাত। ওরা তো এই খেয়ে সারাদিন ভেড়া চরায়। খিদে পায় না কোনও। অল্প খেলেই শরীর ঠাণ্ডা। আমরা পাহাড়ে এসে ওদের কাছ থেকেই এই শিলাজাত খেতে শিখেছি।

—সত্যিই তো। আমার আর খিদে নেই। নয়তো সুলতান-উল-আযকরে বসে এমনই হালকা পলকা হয়ে গেলাম—এমনই আনন্দ হল—ধরে রাখতে পারছি না—বুক ফেটে যায় যায়—আসন থেকে উঠতেই খিদেয় কাবু হয়ে যাচ্ছিলাম।

—জানি।

—ঘোড়াটা সারাদিন কিছু খায়নি। শুধু খানিকটা কিষেণগঙ্গার জল পড়েছে পেটে—

—ওকে আগেই খাইয়ে দিয়েছি। দেখবে এস—

মুল্লা শার সঙ্গে গুম্ফার বাইরে বেরিয়ে এসে দারা দেখলেন, যেন তাঁর ঘোড়াই নয়। বুঝি বা কোনও শাহজাদা। জ্যোৎস্নার ভেতর সাদা রঙের—একা দাঁড়িয়ে। চারদিকে আকাশে উঠে যাওয়া কালো পাহাড়। তার ভেতর ঘোড়াটার গলার লাগাম খোলা—তবু সে জায়গা বদলায়নি।

ওপরের আসমানে তাকিয়ে দারা বলে ফেললেন, এই ঘোড়ার ডানা থাকলে ওর পিঠে আসমানে চলে যেতাম—

—গিয়ে কোনদিকে যেতে ?

দারা ভেবে দেখলেন। তাও তো সত্যি। কোনদিকে যাবেন ? মুখে বললেন, তা তো জানি না।

—একথা কি জানো—আসমানে উঠলে তার কোনও দিক নেই। সবটাই আসমান। নিরেট। ভরাট।

মুল্লা শা বললেন, সব দিকেই পথ। যেমন কিনা ঈশ্বরে যাবার অসংখ্য পথ আছে।

কিষেণগঙ্গার গায়েই নাঙ্গা পর্বতের গুম্ফার মুল্লা শায়ের খানকা। সেই আস্তানা থেকে ভোরবেলার রোদে বেরিয়ে এলেন দারা। বেরিয়েই তাঁর চোখ ঝলসে গেল। দূরে অনেক নিচে কিষেণ গঙ্গার জলে রোদ পড়ে আলোয় আলোময়। নাঙ্গা পর্বতের গা ধরে বসন্তের বন ফুলে ফুলে পাহাড়ী প্রজাপতির ওড়াউড়ি। সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদার মনে হল—এই কি ঈশ্বর? এই সুন্দরই কি আল্লাতালা?

কাল সারারাত অন্ধকারে তিনি হুজুর মুল্লা শার পাশে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা শুনেছেন। হিন্দুস্থানে ইসলাম কেন যে নতুন চেহারা পেয়েছে—সেকথাই মুল্লা শা বলেছেন কাল রাতে। হজরত মহম্মদের বাণী সম্বল করে লড়াকু মুসলমানরা দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনে ইসলাম জয়ীর ধর্ম। তাই সেখানে সেখানকার মাটির—সেখানকার মানুষের মন পায়নি ইসলাম। ইরান, তুরস্ক, মিশর, সুদানে মুসলমানরা রাজ্য বানিয়েছে। সেখানকার সবকিছু ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে সবকিছুই ইসলামি হয়ে গেছে।

কিন্তু হিন্দুস্থানে অন্যকথা। বাইরে থেকে মুসলমানরা এখানে এসে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। হিন্দুস্থানের বাইরের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের আর কোনও যোগ থাকেনি। ফলে এখানকার আদি বাসিন্দাদের ধর্মের সঙ্গে ইসলামের মাখামাখিতে যা দাঁড়িয়েছে—তা অন্য কোথাও আর দেখা যায় না। কাল রাতে হুজুর মুল্লা শা বলছিলেন, দ্যাখোই না—মিঞা মির এসেছিলেন শিস্তান থেকে। এসে পঁয়ষট্টি বছর কাটিয়ে গেলেন লাহোরের কফিপুরায়। আমি এসেছি সেই কোন বদকশান থেকে। আমারও কতদিন হয়ে গেল হিন্দুস্থানে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর। আমরা দু'জনই কাদিরি। কোন সেই কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে জিলান-এ জন্মান আমাদের বড় হুজুর আবদুল কাদির—প্রায় ছ'শো বছর আগে। ইরান তুরানের কাদিরির চেয়ে হিন্দুস্থানের এই কাদিরিরা, আমরা কত বদলে গেছি—তো হিন্দুস্থানের সঙ্গে মাখামাখিরই দরুন।

অনেক কথাই কাল রাতে বলেছেন হুজুর। হজরত মহম্মদের জন্মের দেড়শো বছরের মাথায় বাগদাদে পেঁছে গিয়েছিল হিন্দুস্থানের চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, গ্রহনক্ষত্রের সংস্কৃত বইপত্তর—অনুবাদের জন্যে—গবেষণার জন্যে। সংস্কৃত থেকে আরবিতে অনুবাদ আকছার হতে থাকে। খলিফা হারুন-অল-রসিদের সময় হিন্দুস্থানের একদল পন্ডিত বাগদাদে গিয়েছিলেন। আরবের জ্ঞানীরাও এদেশে আসতে থাকেন।

বাগদাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে সুফী ইবন্ মনসুর অল-হাল্লাজ বলেছিলেন—আনাল-হক্—আমিই ঈশ্বর। হিন্দুস্থানের ঋষিরাও সেই কবে বলে গিয়েছেন—আমিই ব্রহ্ম। সেই হারুন-অল-রসিদের যুগেও এই চিরসত্য মুসলমান জগৎকেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। হিন্দুস্থান থেকে গিয়ে কঙ্ক পন্ডিত বাগদাদে খলিফা হারুন-

অল-রাসিদের দরবার আলো করেন। ইনি মুসলমান জগতকে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত অনুবাদ করে উপহার দেন। হাল্লাজ বলেছেন—মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজের ছায়ায়—নিজেরই অন্তহীন প্রেম ঢেলে। তাই মানুষ নিজের ভেতর ঈশ্বরের ছায়া দেখতে পায়। তাই ঈশ্বর ফেরেস্তাদের হুকুম দিলেন,—আদমকে ভজনা করো।

ঈশ্বরের কাছাকাছি থেকে সেই আবেশে—উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন হাল্লাজ। সেই উল্লাস কি আজকের এই ভোরে চারদিকে এই রোদের আলোয় কিষেণগঙ্গার বুকে ছড়িয়ে পড়েনি? গোঁড়া উলেমারা সুফী হাল্লাজের কথা বুঝতেই পারেননি সেদিন। হাল্লাজের রক্তে বাগদাদের মাটি ভেসে গেল।

দারাশুকোও আজ ভোরে এক নতুন জীবনে স্নান করছিলেন। আমি এক আশ্চর্য দেশের শাহজাদা। এই হিন্দুস্থানের জমিন বড় পাক। বড় আদরের। সুফী কবি আমির খসরু তো বলেছেন—জ্ঞানে বিজ্ঞানে হিন্দুস্থান দুনিয়ার সব দেশের ভেতর সেরা।

কাল অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে মুল্লা শা বলেছিলেন—এবার এতই ঠান্ডা পড়েছিল যে—কিষেণগঙ্গা তার শুরুয়াতে বেশ অনেকটা পথ জমে গিয়ে স্রেফ বরফ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের মুখে সেই বরফ গলতে শুরু করায় ভাটিতে এবার কিষেণগঙ্গার বুকে জল বেশি।

কিষেণগঙ্গা গিয়ে পড়েছে ঝিলমে। হুজুর বলছিলেন—উজানে এগিয়ে গিয়ে পেরলে সেই জমাট বাঁধা কিষেণগঙ্গার আধো-গলা বুক দেখা যায়। ওখান দিয়ে পেরলে মুঘল কোঠিতে ফেরার রাস্তাও নাকি অনেক কম।

আজই রাত থাকতে হুজুর মুল্লা শা তাঁকে নিয়ে হবস্-ই-দমে বসেছিলেন। বলছিলেন, সুলতান-উল-আজকর-এর সময় শরীরের সব দুয়ারকে সংযমে আনতে হবে। নির্জনে বসে সারা মনকে তাঁর চিন্তায় ডুবিয়ে দিলে সে কী এক ঘণ্টাধ্বনিতে তামাম দুনিয়া ভর্তি হয়ে যায়।

ঘোড়ায় উঠে বসলেন শাহজাদা। নাঙ্গা পর্বতের গা ধরে কিষেণগঙ্গার তীরের দিকে নামছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল—এই পাহাড়—এই নদী—এই আসমানের পাশে মানুষের তাগদ জিনিসটা কত ছোট—কত সামান্য। এর জন্যে আব্বা হুজুরের এত ছুটোছুটি? আজ চিত্রল, কাল গিলগিট, পরশু কান্দাহার! অথচ দ্যাখো—শীত একা এসে আস্ত একটা নদীর বুক জমিয়ে দিল। এ কি কোনও বাদশা পারেন? এই তো এককালে যে নূরজাহান বেগমের নামে বাজারে মোহর বেরিয়েছিল—সেই তিনি আজ শীতের কষ্টে হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে আরও বেশি করে লকড়ির আর্জি জানাচ্ছেন। তাঁরই কাছে হিন্দুস্থানের বাদশা একসময় আর্জি জানাতেন। তিনি কাশ্মীরে এলে একসময় তাঁর হাতির পায়ের সামনে কার্পেট পেতে দেওয়া হত।

দুপুরের দিকে দারাশুকো এসে কিষেণগঙ্গার সেই আধো-গলা জমাটভাঙা বুকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সে এক দৃশ্য। পাহাড় থেকে বরফের গড়ানে এক খোলা পাগড়ি যেন নেমে এসেছে। জায়গায় জায়গায় বরফ গলে গিয়ে সবে

জল হওয়ার শুরু। এখানে এখনও বেশ কঠিন শীত। মল্লা শার দেওয়া পশমিনা দিয়ে দারা তাঁর গলা বুক ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। এদিককার পাহাড়ী ছাগলের লোম থেকে তৈরি এই পশমিনা রীতিমত শীত আটকায়।

দারাশুকো একজায়গায় দেখলেন—শীতের মুখে ভেসে যাওয়া এক নীলগাই একদম অক্ষত অবস্থায় গলা বরফের ভেতর থেকে একটু একটু করে ফুটে উঠছে। কয়েকমাসের জমাট মৃত্যু তুষার সাদা বরফে কোনও দাগই ফেলতে পারেনি। মৃত্যুর কাছে অমন সাহসী জানোয়ার তার চার পা তুলে এতদিন আত্মসমর্পণ করে ছিল। এবার বসন্তের বাতাসে বেরিয়ে এলে কয়েক ঘড়ির ভেতর আগাগোড়া পচে যাবে।

মরা নীলগাইটার নিচে অনেক গভীর অব্দি কিষেণগঙ্গার বুক দেখা যায়। বরফ ফাঁক হয়ে গেলেও সেখানে তখনও বরফ গলা জল ঢোকেনি। ঘোড়ার পিঠে বসে শাহজাদা যেন দুনিয়ার বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলেন। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কে আর নদীর জল সরিয়ে তার বুকের গভীর দেখতে পারে। যদি তেমন শীত পড়ে—যদি তেমন বরফ পড়ে—যদি তেমন করে আবার বরফ গলে—তবে—তবেই না। আল্লাতালার এই বরফ—পাহাড়—নদী—রোদ—শীত মানুষের চেয়ে কত কত বেশি তাগদ ধরে। আমরা এদের পাশেই থাকি—অথচ একবারের জন্যেও খেয়াল করি না।

যাঁরা খেয়াল করেন—তাঁরাই তো আল্লাতালার কাছের মানুষ। এইসব মানুষের ঘাটে ঘাটে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আমি কি আমার আমিকে মুছে ফেলতে পেরেছি? জানি না। ভেতরকার এই আমিকে একদম মুছে ফেলতে না পারলে তাঁর সঙ্গে আমি মিলব কী করে?

সন্ধের মুখে মুঘল কুঠিতে ফিরে শাহজাদা দেখলেন, আব্বা হুজুর সরজমিনে পাহাড়ী পথের পাহারা যাচাই করে ফিরে এসেছেন। কেননা হিন্দুস্থানের বাদশার পেয়ারের হাতি ফিল-ই-ফতে সপুর হ্রদের সামনে একা দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে যেন এক দৈত্য।

কুঠিতে ঢুকেই শাহজাদা বুঝলেন, বাজি শাহজাদী জাহানারা যেমন উল্কার মতো এসেছিলেন—তেমনই উল্কার মতোই ফের আগ্রার পথে পাড়ি দিয়েছেন। আব্বা হুজুরের সঙ্গী-সাথী মনসবদাররাও ফের যে যাঁর জায়গায় চলে গেছেন। নয়তো তাঁদের হাতি-ঘোড়াগুলোর দেখা পাওয়া যেত হ্রদের তীরে।

মুঘল কুঠিটি পাথরের। দেওয়ালে কাঠ। ঘন করে বসানো। এক চত্বর থেকে আরেক চত্বরে যাওয়ার দরজাগুলো তোরণ ঢঙে। তোরণের মাথায় কাঠের খিলানে খোদাই করে একদম অন্য লিপিতে কী লেখা। শাহজাদার দিনরাতের হাজিরা এখানকারই বাসিন্দা। বুড়ো। শাহজাদা খোদাই লিপিতে তাকিয়ে আছেন দেখে সে বলল—হুজরত! ওগুলো বৌদ্ধ লামাদের সব সংকেত—

—সংকেত?

—হ্যাঁ খোদাবন্দ। অনেক আগে এ কুঠি ছিল লামাদের। তাদের সময়ে তাদের ভাষায় অনেক কিছু লেখা ছিল।

—কী ভাষা ?

—জানি না। শ্যুনেছি সংস্কৃত।

দারা মনে মনে ভাবলেন, এ কুঠি তাহলে একসময় বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের ছিল। হয়তো এখানে একদিন ধ্যান হত। হত হবস্-ই-ন্দম-এর চর্চা। ডান নাক দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সেই প্রাণবায়ু নিয়ে স্তম্ভের চর্চা হত। আকবর বাদশাই নাকি কাশ্মীর জয় করে প্রথম এই কুঠির দখল নেন। প্রায় দুশো বছর আগে কাশ্মীররাজ জৈন অল-আবদিন শাহ্ আরবি, ফারসিতেই নয় শুধু—সংস্কৃত—এমনকি তিব্বতিতেও কথা বলতে পারতেন। তিনি নিজে আরবি ফারসি থেকে সংস্কৃতে অনেক অনুবাদ করেছেন। হিন্দুস্থান দেশটাই এমন। খোদাকে শও শুকর গুজর। তাঁর মেহেরবানি না হলে এখানে আমি পয়দা হতাম না। মুঘল খানদানের পত্তন এখানে হত না। এই মুঘল কোঠিতেও আমার আসা হত না। হত না মুল্লা শা-এর খানকায় যাওয়া। জৈন অল-আবদিন শাহ্ কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী, সংস্কৃত মহাভারত—মুল্লা শা কাল রাতে এসব বলছিলেন, ফারসিতে অনুবাদ করান। তিনি নাকি জিজিয়া তুলে দেন। গো হত্যাও বন্ধ করেন। তিনিই হয়তো হিন্দুস্থানের মূল সুরটি ধরতে পেরেছিলেন। যেমন বুঝেছিলেন আকবর বাদশা, গিয়াসুদ্দিন বলবন। সুলতান নাসিরুদ্দিন।

হিন্দুস্থানের সঙ্গে ইসলামের মাখামাখি, মিশেল—আমি কি সঠিকভাবে ধরতে পারব ? এত বড় দেশ। এত মানুষ। কত রকমের তাগদের টানাপোড়েন। ব্যবসা-বাণিজ্য। কবিতা। তাঁদের কাপড়। উপাসনা। জৌনপুরি তানকারি। অঙ্গরাখা ? রেশমের ওপর বুরহানপুরী সুতোর ফুলকারী। এত সবের ভেতর হিন্দুতে ইসলামে মিশেল-মাখামাখি, সিজিলমিছিল কোথায় কোন বুনটে কালের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে কোথায় মিলেমিশে এক নতুন জিনিস হয়ে গেল—তার খোঁজ কে রাখে। কে-ই বা তার কদর করে আলাদা করে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষের ধারা তার সুফল পায়—পুষ্ট হয় তাতে। আমি এই পুষ্টির কথা—মুঘলের কথা লিখে যাব। যেসব পীর, হুজুর, আল্লাতালার কাছের মানুষ এই মুঘল কালের বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্যে যুগে যুগে রেখে চলেছেন—আমি সেই পীরসন্তদের কথা লিখে রেখে যাব আগামীকালের জন্যে।

ইসলামে আল্লাতালার সঙ্গে ভক্তের যোগ যেন প্রভু আর বান্দার সম্পর্ক। শরিয়তি কট্টর মুসলমানরা এই পথেই ভাবেন। সুফীরা ভাবেন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের সুতো হল ভালবাসা—প্রেম। সনাতনী হিন্দুরাও এই এমন যোগ সহজ চোখে দেখেন না। দুই গোঁড়া সড়কের মাঝে পড়ে সুফীরা দু'হাতে শুধু ভালবাসাই বিলিয়েছেন। কে মুসলমান—কে মুসলমান নয়—কে বিশ্বাসী—কে অবিশ্বাসী—তা তাঁরা দেখেননি। আমি এঁদের কথা লিখে যাব।

আশেক এ-ইয়ার অম
মারা বা মুসলমানি দর কার নিস্ত।

আমির খসরু লিখে গেছেন—আমি সখার প্রেমে বন্দ হয়ে আছি।

ম্‌সলমানিতে আমার কোন দরকার নেই।

হর রগ এ-মন তার গশ্‌ত

হাজ্জত এ-জ্‌ন্নার নিস্ত ॥

আমার শরীরের সব শিরা তার হয়ে গেছে। তাই যজ্ঞের উপবীত নিইনি। দরকারই হয়নি।

খ্‌লকে গোয়েদ কি খসর্‌

ব্‌ত-পরস্তি মি ক্‌নদ।

আরে আরে মি-ক্‌নম

বা খ্‌লক এ-আলম কার নিস্ত ॥

লোকে বলবে খসর্‌ প্‌তুল প্‌জো করে হিন্দ্‌ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্‌তুল প্‌জো তো আমি করিই। সংসারের লোকের মতামতের কোনও ধার আমি ধারি না।

কাল প্রায় সারাটা রাত ম্‌ল্লা শা অন্ধকারে শ্‌য়ে শ্‌য়ে ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, কাব্যে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করেছেন। কখনও হাফিজ কখনও র্‌মী কখনও বা খসর্‌ আউড়ে চলেছেন অন্ধকারে গ্‌ম্ফার নির্জনে। কখনও বা খলিফা য্‌গের বা বাগদাদে মস্তান বারমান পরিবারের শাসনের কথা—কখনও বা হাল্লাজের মতো নির্ভীক স্‌ফীর কথা বলেছেন। বলেছেন গজ্জালির কথা। এক সময় বলছিলেন —ক্‌রআনের অনেক কথাই বেদে আছে। হিন্দ্‌স্থানে এসে দ্‌ই মনের লেনদেনের দর্‌ন ইসলামে কোথায় যেন খ্‌ব স্‌ক্ষ্মভাবে আল্লাতালাকে ভালবাসার স্‌রটি মিশে গেছে। এই স্‌র হিন্দ্‌স্থানের স্‌র। সেই স্‌রই স্‌ফীরা তুলে ধরেছেন। আল্লাতালার সঙ্গে সম্পর্ক প্রেমের, ভয়ের নয়।

সপ্‌র হ্রদের তীরে চাঁদ উঠেছে। তার সামনে ম্‌ঘল ক্‌ঠির একদিকে হিন্দ্‌স্থানের বাদশা শাহজাহানের জন্য হ্‌ক্‌ম আর হ্‌ক্‌ম বরদারিতে দাখিলাদের আনাগোনায় সরগরম। আরেকদিকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিষেণগঙ্গা পেরিয়ে আসা শাহজাদা। যাঁর ব্‌ক আজ কী এক আনন্দে ফেটে যাচ্ছে। তিনি নিশ্চুপ হয়ে মনে মনে কবিতা আওড়াচ্ছেন। ভাবছেন—ম্‌ঘলরা আসায় একদিন এখান থেকে ধ্যান ফেলে লামারা চলে গিয়েছিলেন। পড়ে রয়েছে তাঁদের ভাষায় খোদাই করা লিপি—কাঠের ওপর সংকেতে। ও সংকেতের ভেতরের কথা কে উম্ধার করবে?

জানলা দিয়ে দারা বাইরে তাকালেন। বাদশার পেয়ারের হাতি একা একা হেঁটে চলেছে। কয়েকটা ঘোড়া শব্দ করে পা বদলালো। এই দ্‌নিয়ায় নরম আলোর মতো আল্লাতালার ভালবাসার আবেশ সবসময় ছড়িয়ে পড়ছে। মহাস্‌ফী জালান বলেছিলেন, প্রাণের আক্‌লিবিক্‌লি অতি পবিত্র রহস্য। সবাইকে বলা চলে না। কিন্তু এ আবেগ যে ব্‌কে ধরে রাখতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে। তাই যদি খোদাকে মাশ্‌কা ভাবি তো তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও—গর উরস অশ খ্‌বান্দা অম আয়ের অম মা গির—

মাশ্‌কা থেকে যা আসে তা সবই স্‌ন্দর। খ্‌ব মধ্‌র। একথা ব্‌ঝলে দেখবে

মিষ্টি আর তেতোতে কোনও ফারাক নেই। তুমি গাল দিয়েছ। ভালই করেছ। আমি তাতেও খুশি। ও গালও মিষ্টি লাগে। সুন্দর মুখ থেকে যা আসে তাই মিষ্টি। তোমার ঠোঁট যে চিনি মাখানো। তাই সব মিষ্টি লাগে। তাঁকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়। তিনি আজিজ। প্রিয়তম। মুসলমান যদি সত্যকে চিনত—তাহলে দেখত পুতুল পুজোতেও সত্য আছে। যদি পুতুল পুজারী ধর্মকে জানত—তবে বুঝতে শিখত সে সত্যকে কোথায় হারাচ্ছে। সে যে মুর্খের মতো পুতুলকেই দেবতা মনে করে। সেই জন্যে কাফের বলে তার নিন্দা হয়।

শাহজাদা দারাশুকোর মন এই মুর্খামিতে বিরক্ত। সে মুর্খ মুসলমানই হোক আর হিন্দুই হোক। তিনি মনে মনে বলে উঠলেন—মারা বা উমুয়াম-ই-ইনু হার দো কোয়াম্ করে নিস্ত্—এই দুই দলের মুর্খ সাধারণকে নিয়ে আমার কোনও দরকার নেই। বাছাই মানুষই হিন্দুস্থানে এই দুই মনের লেনদেনকে সুফলা করে তুলতে পারবে।

আমি বহুর ভেতর এককে দেখতে পাই। এই আমার তৌহিদ। এই ওয়াহিদাইয়া আমার রাস্তা। দারাশুকো গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন। যেন এখন সুরই শেষ কথা। সে সুরে কোনও বাণী নেই। বুকের ভেতরের আলো থেকে উঠে আসা এ সুর। এর কোনও বাণী দরকার হয় না। এখনও এই দুনিয়া শুধু আল্লাতালা আর তাঁকে নিয়ে। মাঝখানে কেউ নেই।

শাহজাদা যেন ভুলেই গেলেন—তাঁর নাদিরা বেগম আছেন? আছে দুই ছেলে। রানাদিল। একজন আব্বা হুজুর। আর কান্দাহার।

দারাশুকোর বুকের ভেতরকার সুরে মুঘল কুঠির পাথরের মেঝে, কাঠের দেওয়াল গমগম করে উঠল।

দাখিলা এসে দুয়ারে দাঁড়াল। বাদশার তলব।

শাহজাদা দারাশুকো নাঙ্গা পর্বতে হুজুর মুল্লা শার গুম্ফায় শিলাজাত খেয়েছিলেন গতকাল রাতে। ঘোড়ার পিঠে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছনোর পর। তারপর থেকেই তিনি এক অদ্ভুত তুরীয় দশায় আছেন। মুল্লা শার কথাগুলো তাঁকে ঈশ্বরে যাবার রাস্তায় ভবঘুরে সালিক করে তুলেছে। আকাশে বাতাসে বসন্তের বাহার। সেই সঙ্গে গুম্ফায় বসে হবস-ই-দমের চর্চা। ডান নাক দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ফুসফুসে ধরে রাখা। শেষে বাঁ নাক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। সুলতান-উল-আযকরে বসে দুই কানের পাশে দুনিয়া জুড়ে অবিরাম মধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা। শেষে জিভ না নেড়ে আল্লা নামের জিকরে ডুবে থাকতে থাকতে জানা দুনিয়া থেকে একদম আলাদা হয়ে যাওয়া। যেতে যেতে বুঝতে পারা—ওই নামই চোখ—ওই নামই কান—ওই নামই মুল। ঈশ্বর আর আমার মাঝখানে আর কেউ নেই তখন। শুধু সে আর আমি। সে এক অদ্ভুত আহ্লাদের আবেশে ডুবে থাকা। বাণীশূন্য এক সুরের সঙ্গে হালকা পলকা হয়ে নেচে ওঠা। বাতাসে তখন শুধুই ফুলের সুঘ্রাণ। সে সুরে কোনও কথা নেই।

তারপর এই সারাদিন ধরে ঘোড়া দাবড়ে সন্ধের মুখে তবে মুঘল কুঠিতে ফেরা। যে কুঠি কিনা একসময় লামাদের ধ্যানের ঘর ছিল। যার কাঠের দুয়ার খিলানে খোদাই করে লেখা তাদের ধর্মের গূঢ় কোনও সংকেত। ঈশ্বর অভিযানে যাবার গোপন সংকেত।

একটি হরফ ওই সংকেতের ভেতর চিনতে পেরেছেন শাহাজাদা। ওঁ।

এই সংকেত তিনি রাজধানী আগ্রায় ফৌজি রসদ যোগানদার হিন্দু শেঠদের হাভেলির গোড়ায় ঢুকতে গিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন—রাজা জয়সিংহের কপাল-তিলক। সম্ভবত ভগবানের শুরুয়াতের ধ্বনি। সংকেত, আভাস এই ওঁ!

আব্বা হুজুরের তলবে এক কঠিন দশা হল দারাশুকোর। এমন সুন্দর আঁধার হয়ে আসা সন্ধেরাত। সপুর হ্রদের কুল হলুদ জ্যোৎস্নায় আসমান বুকে ধরে শুয়ে। তার গা ধরে শাহী হাতি ঘোড়াদের আনমনা চলাফেরা। ঘোড়াসওয়াররা তাঁবু গেঁড়ে তাঁবুর বাতায় আগুন জেবলেছে। রাতের রুটি সেঁকা চলবে। তারই ভেতর এক এক দেশের এক এক ফৌজি তার তার নিজের দেশোয়ালি তার যন্ত্র খুলে গলা ছেড়েছে সবে। টানা শীতের পর বসন্তের শুরুতে দুনিয়ার যেন মুক্তি। সবটাই যেন ভগবানের নিজের হাতে আঁকা ছবি। এর ভেতর হিন্দুস্থানের বাদশার তলব।

তা-য়ে বসা পাখির মতোই রীতিমত অনিচ্ছায় শাহজাদা নিজেকে তুলে নিয়ে চললেন বাদশার মবারকে। তিনি জানেন—বাদশা মানে কঠিন কঠিন ইচ্ছা, যে মানুষটি তাগদে খোয়াবে সফল করে থাকেন নিত্যদিন। আর তাঁর চারপাশ ঘিরে রয়েছে একটুর জন্যে ইচ্ছাপূরণ না হওয়া সব মানুষের দল। যাদের কিনা ইচ্ছাপূরণ হয়ে যেতে পারত বাদশার একটি আঙুলের ইশারায়। হয়তো দু'একজনের। কালেভদ্রে। বাদশার খেয়াল খুশিতে। মর্জি হল তো হল। নয়তো নয়।

শাহজাদা জানেন—এই দুনিয়া দুই ভাগে ভাগ করা। একভাগে পড়েন তাঁরাই—যাঁদের খোয়াব, শখ, আহ্লাদ পূর্ণ হতেই থাকে। এঁরা এই দুনিয়ায় সংখ্যায় খুবই কম। আরেক ভাগে রয়েছে দুনিয়ার বেবাক মানুষ। যারা খোয়াব দেখে—শখের কথা ভাবে—কিন্তু প্রায় কিছুই তাদের পূর্ণ হয় না। তাই এই দুনিয়ার একটা বিরাট দিক শুধুই বিষাদে ভরা। বালক-বয়সে মনে হত—রোজ সকালে নতুন আলোর সঙ্গে পৃথিবীও নতুন হয়ে ফুটে ওঠে। এখন শাহজাদা দেখছেন, কই কোথায়? কিছুই তো ফুটে উঠছে না। পৃথিবীকে মনে হত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার জায়গা। এখন দেখছেন—তা তো নয়। ঈশ্বরের জন্যে সহজ সরল রাস্তা তো কেউ নিচ্ছে না। বিশেষ করে যাঁদের তাগদ আছে—তাঁরা তো ঈশ্বর নিয়ে কিছুই বলেন না। অথচ ঈশ্বর বিষাদের নয়—আশাভঙ্গের নয়—ঈশ্বর মধুর এক আনন্দের আবেশ। পরপর দু'টি চত্বর পেরলে তবে বাদশার মবারকে পেঁছানো যাবে। পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা কাশ্মীরে এলে এই মুঘল কোঠিতেই উঠতেন। সেসব বসন্ত-দিনের সন্ধে রাতে এমন বাতাসই রয়ে যেত।

শাহজাদা এগোচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, আব্বা হুজুর নিশ্চয় কান্দাহার নিয়ে চিন্তিত। এই বুঝি শাহ সফির ইরানি সৈন্যরা এসে পড়ল। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, গজনি—সবই আব্বা হুজুরের চোখে তাঁর বাপ দাদাদের ইতিহাসের ভোরবেলায় খেলাধুলো করে বেড়াবার জায়গা। ওসব জায়গা যে করেই হোক হিন্দুস্থানের শাহীর এক্তিয়ারে আনা চাই। সেজন্যে দরকার হলে পাহাড় টপকে কামান ঠেলে তুলতে হবে। হাতি পার হবে হেলমন্দ। উটের কাতার নদী ডিঙোবে।

মুঘল কোঠির দক্ষিণমুখো দোতলার চাতালে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান তাঁর তখত-রওয়ানে বসে থাকেন। বাদশার আগে পেছনে অভ্রের বাতিদানে অবিরাম গুঁড়ো কর্পূর ঢেলে যাওয়ায় আলো পরিষ্কার আর উজ্জ্বল।

শাহজাদা কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই গম্ভীর চোখে বাদশা বললেন, ইরানি হামলা আমরা তো সব জায়গায় সামলাতে পারব না—।

চমকে গেলেন দারাশুকো। একেই তো কান্দাহার নিয়ে গত দু'বছর বাদশা ব্যতিব্যস্ত। তার ওপরে আবার কোথায় কোথায় ইরানিরা হামলা করে বসল তিনি তো কিছুই জানেন না। আব্বা হুজুর সবে গিলগিট, স্কার্দু হয়ে ফিরেছেন। ফৌজি সরেজমিন সেরে তাঁর এই ফেরা। সিন্ধুর দিক দিয়ে রেগিস্থানের ভেতরে ইরানি ফৌজ হামলা করেনি তো? হয়তো বুজে আসা বন্দর থাট্টায় এসে ইরানি ফৌজ হাজির। শেষমেশ দারা বলেই ফেললেন,—খোরাসানের নিশাপুরে?

—না। এখানে—বলেই বাদশা একখানি গোটানো হাতে তৈরি চীনা কাগজ হঠাৎ মেলে ধরলেন। ধরে গম্ভীর মুখে জানতে চাইলেন,—দেখেছ?

শাহজাদা দারা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। দেখে চিনতে পারলেন। আকা আবদুর রসিদ দৈলেমির কাছে সামনের সারিতে বসে আছেন মহম্মদ দারাশুকো। চীনা কাগজে আঁকা ছবিটি। দৈলেমি হাতের লেখা শিল্পে যাকে বলে পয়গম্বর। তাঁর কাছেই দারা নস্ক আর নস্তালিক লিপিতে লিখতে শিখেছেন। এ ছবির ভেতর ইরানি হামলা কোথায়?

অবাকই হলেন শাহজাদা।

শাহজাহান বললেন,—চিনতে পার?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমার শিক্ষকের কাছে আমি শিখছি। দৈলেমি সাহেব আপনার দরবারি শিল্পী। হিন্দুস্থান জুড়ে তাঁর নাম।

—জানি। ছবিখানি কে এঁকেছে—

—দেখি—বলে শাহজাদা আবারও সেই চীনা কাগজখানির ওপর ঝুঁকে পড়লেন। হাতে তৈরি কাগজের ওপর রং তুলির কাজ। কে এঁকে থাকতে পারেন। ভাল করে দেখলেন শাহজাদা। একজনের আঁকা নয়। রেখাগুলি রীতিমত দৃঢ়। এ ধরনের আঁকা পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার সময় থেকে চলে আসছে। একজন শিল্পী রেখা টেনেছেন। তাতে রং দিয়েছেন আরেকজন।

—বন্দেগান। একজন এ ছবি আঁকেননি।

—ঠিকই ধরেছ।

—রেখা দেখে মনে হয় জগন্নাথ টেনেছেন। আর রং দিয়েছেন ওস্তাদ খ্বাজা আবদুল সামাদ শিরীন কালম্—হলুদ রঙের ছড়াছড়ি। খ্বাজা আবদুস সামাদ হলুদ রংটা বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসেন।

—আমিও তো তাই বলছি। দৈলেমি সাহেবের মুখখানি একেবারে হলুদ করে আঁকা—

একটু ঘাবড়ে গেলেন শাহজাদা। ইরানের সিরাজ থেকে এসেছেন শিল্পী আবদুল শামাদ শিরীন কালম্। জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে। অনেকে তাঁকে শুধু সিরাজি সাহেব বলে থাকেন। ওস্তাদ আঁকিয়ে। কিছুদিন আগে ওলন্দাজ ইলচি তাঁর কিছু ছবি কিনে নিয়ে গেছেন। চড়া দামে—

দারা দেখলেন, বাদশার মুখের ভঙ্গি বেশ শরিফ। তিনি সাহস করে বললেন, —হজরত। এর ভেতর ইরানি হামলা?

—হামলা নয়? আলবত হামলা! হিন্দুস্থানের শাহজাদা দৈলেমি সাহেবের কাছে নস্তালিকে লেখা শিখছেন। এ ছবি কোথায় থাকবে?

—শাহী মুরাক্কায়—

—শাহী কিতাব ঘরে চেঙ্গিসনামা, জাফরনামা, ফারসি-রামায়ণের পাশে, ফারসি নলদমন কথার পাশে শাহী মুরাক্কায়—নয়তো শাহী কারনামাহ্-তে থাকবে। আগামী দিনের মানুষ এসে যখন কিতাবঘরে দেখবে—তখন কী বলবে তারা?

একদম ঘাবড়ে গেলেন দারাশুকো। তিনি বুঝতেই পারছেন না—হিন্দুস্থানের বাদশা কোনদিকে বলবেন। কী বলবেন। ছেলেদের ভেতর সবচেয়ে কাছাকাছির মানুষ হয়েও দারাশুকো তাঁর আব্বা হুজুরের কোনও থই পাচ্ছেন না। কোনও কোনও সময় বাদশা শাহজাহানের কোনও তল পাওয়া যায় না।

বাদশাই বললেন, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে আগামী দিনের রসিকরা বলবেন—বাদশা শাহজাহান ইরানি হামলা সামলে কান্দাহার কিল্লা হাতে রাখতে যখন ব্যস্ত—তখন হিন্দুস্থানের লালকিল্লার দেওয়ান-ই-খাসের চাঁদোয়ার কাজে শাহী ফারসি জবানে, আদব কায়দায়, তমিজ-সহবতে, তাজমহল—এমনকি তসবিরেও রেখায় রঙে ইরানিরা ঢুকে পড়েছিল—এর চেয়ে বড় হামলা আর কী হতে পারে দারা?

শাহজাদা দেখলেন হিন্দুস্থানের বাদশার রসিক চোখ হাসছে। হাসছে সেই বিখ্যাত মুখ। এতক্ষণে দারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এ সেই বিরাট ফৌজের মাথায় বাদশা নন। এ হলেন গিয়ে সমঝদার শাহজাহান।

বাদশা নিজেই বলতে লাগলেন, আগেকার সেই ইস্পাহানও নেই—সিরাজও নেই। মুসাফিরদের মুখ থেকে যা খবর পাই—তুর্কি, আরব, আফগান হামলায় আলি কাপু প্রাসাদ, চাহিল সেতুনের আর কিছু নেই। খিলানগুলো ভেঙে পড়ছে। মসজিদ-ই-জামির মিনাকারী টালিগুলো খুলে খুলে মোল্লার দল ফ্রানসিসি আর ইংলিশস্তানি ব্যাপারীদের কাছে বেচে দিচ্ছে। ইস্পাহানে একসময় —শুনেছি প্রায় তিনশো হামাম ছিল।

—সব শাহী—সব সভ্যতা একদিন এভাবেই মিলিয়ে যায় আব্বা হুজুর।

বাদশা তাঁর বড় ছেলের মুখে ঘুরে তাকালেন। তারপর বললেন,—একসময় ইস্পাহানে প্রায় দশ লাখ মানুষ বাস করত। এখন সেখানে গেঁহুর খেত।

—আব্বা হুজুর। একদিন আকবর বাদশার ফতেপুর-সিক্রির দশাও তাই হবে।

শাহজাহানকে আজ যেন তুজুক আর খোয়াবে পেয়েছে। তিনি বলেই চলেছেন।—সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা দারা—এই হামলা—এই লুট চালিয়েছে মুসলমানরাই। তাই যুগে যুগে ফারসি কবি, আঁকিয়ে, কারিগর সবসময় হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন—পাড়ি দিয়েছেন দিল্লি, আগ্রা—

—হজরত। আপনিই তো বলেছিলেন—ইতিহাস কখনও কুঁকড়ে যায়—তখন তাগদ কমে আসে—এলাকা ছোট হয়ে পড়ে। আবার ইতিহাস যখন ছাতি ফুলিয়ে বাড়তে থাকে তখন তাগদ পড়তির পথে—এলাকা বাড়ে—শাহীর সীমানা জঙ্গল, পাহাড়, নদী ছাড়িয়ে যায়।

শাহজাহান কোনও কথা না বলে দারার মুখে তাকিয়েছিলেন।

দারা বললেন, আমাদের মুঘল ইতিহাসে তৈমুরকেই দেখুন বন্দেগান। দুনিয়ার হিরে চুনী সমরখন্দে জড় করলেন। কানিবুল বাগে ফোয়ারা বসিয়ে ছয় নাতির বিয়ে দিলেন একই সন্ধ্যায়। তাঁর খোয়াব ছিল তাঁরই নাতিরা দুনিয়াটা ভাগ করে নিয়ে শাহী চালাবে! আজ তাঁর সে স্বপ্ন কোথায়?

বাদশা বলে উঠলেন—আমিও তো খোয়াব দেখি। দেখে থাকি। তোমরা শাহজাদারা একদিন হিন্দুস্থানের এই শাহী চালাবে—

—ও কথা ভাবার সময় আসেনি আব্বা হুজুর। আপনি এখনও বহুদিন সহি-সলামত থাকবেন।

বাদশা হাসলেন। কোনও কথা বললেন না। এখানে এখন শুধু শাহজাদা দারা। হাতের কাজগখানি ফের মেলে ধরে দেখতে লাগলেন শাহজাহান। দেখতে দেখতে বললেন, আমার দাদাসাহেব আকবর বাদশা কাগজের ওপর রং তুলি দিয়ে আঁকার শুরুয়াত করেন। তাঁর সময় থেকেই শাহী কিতাবখানায় আগেকার সব তুজুক ফিরে লিখিয়ে তাঁর পাশে পাশে নস্তালিক লিপির কাজ শুরু হয়।

শাহজাদা দারা চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর হুকুমে একখানি মুরাক্কা বাঁধানো হয়েছে। ছোট ছোট প্রায় চল্লিশখানা ছবি নিয়ে সেই মুরাক্কা। তাতে আছে বাদামি পাখি, বুনো ঘুঘু, বুড়ো ফকিরের দুখানি ছবি—এক হাতে একখানি বই, অন্যটিতে জপের মালা, শাহজাদা সেলিমের দুখানা ছবি। দারা ঠিক করেছেন—এবার আগ্রা ফিরে মুরাক্কাখানি তিনি নাদিরা বেগমকে উপহার দেবেন। কিছুই দেওয়া হয় না নাদিরাকে।

বাদশার চোখে আজ স্বপ্ন মাখানো। তিনি মুখ তুলে বললেন, হিন্দুস্থানের ছবির এই যাদু একদিন ব্যাপারীদের পাহাড়ী পথ ধরে চীনে গিয়েছিল। তার সঙ্গে মিশে গেল ইরানের প্রতিভা—

আজ কী হয়েছে বাদশার ? অবাকই হলেন দারা। যে-মানুষ উঠতে বসতে বোঝেন ফৌজ, কামান, হাতি, হামলা—সেই মানুষ ছবির দিকে তাকিয়ে—সেই মানুষ প্রতিভা কথাটি বলতে গিয়ে সুদূরে তাকিয়ে থাকেন—যেন বা সভ্যতাকে একটি তিতির পাখির মতোই নিশানার ভেতর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন।

—সেই প্রতিভাকে বাবর বাদশার দরবারি শিল্পীরা হিন্দুস্থানে নিয়ে এলেন। আমি লালকিল্লায় দেওয়ান-ই-খাসের চাঁদোয়ায় এঁদের বাদ দিয়ে কাদের দিয়ে চীনা টালির মিনাকারী করাবো বলতে পারো ? এঁদের বাদ দেওয়া মানে তো প্রতিভাকে অস্বীকার করা—প্রতিভাকে বিকাশের রাস্তা না দেখিয়ে গুমখুন করা। তাই না কী ? হিন্দুস্থানের বাদশা হয়ে সে কাজ আমি পারি ? তা করলে সময়ের কাছে আমি কি কৈফিয়ত দিতাম ?

শাহজাদা দারা নিজেও নস্তালিক লিপিতে একজন শিল্পী। এসব কথায় বাদশার জন্যে তাঁর বুকটা ফুলে উঠছিল। আমি ধন্য। আমি এমনই এক আব্বা হুজুরের আওলাদ। আমি ধন্য। আমার সফিনৎ-উল-আউলিয়ার কাজ শেষ। তার পাতায় পাতায় লিপির কাজ আমারই। কিছুদিন হল আমি কুর-আন লিখছি। হরিণের চামড়ার ওপর—সোনার জল দিয়ে। কাজটা শেষ হলে আব্বা হুজুরকে দেখাতে হবে। আব্বা হুজুরের মন বনেদি। সমঝদারের সাবাসি পেতে গেলে সে-কাজ আমায় আরও মন দিয়ে করতে হবে।

দারার ভয় ছিল আব্বা হুজুর না ফের আজকের সন্ধেটা কান্দাহার কিল্লার ফৌজ মোতায়েনের কথা দিয়ে ভরে ফেলেন। তার বদলে শাহজাহান বলছিলেন সভ্যতার কথা—প্রতিভার কথা।

—সমরখন্দের ক্যানিবুল বাগে ফোয়ারাগুলো কবেই বালিতে বুজে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে দারা। ইস্পাহান—সিরাজ আবু পোড়ো নগরী। কে জানে ? আগ্রা কোনদিন না ওরকম পোড়ো হয়ে পড়ে—

—তা হবার নয় আব্বা হুজুর। ইরানিদের মতো হিন্দুস্থানে মুঘলরা কোনওদিন কোনও ব্যাপারে কখনও ঢিলে দেয়নি। মুঘলদের কেউ কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় পায়নি হজরত।

একথায় বাদশা শাহজাহানের মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলছো ? আমরা কখনও ঘুমোইনি। একথা সত্যি। মুঘল চোখ ঘুমোতে পারে—মুঘল হৃদয় জেগে থাকে। একটা কথা কি জানো—তোমাদের আম্মিজান প্রায় বলতেন, ইরানিরা বড় ষড়যন্ত্রী—ঘোঁট পাকায়—

—আম্মিজান ? তিনি একথা বলতেন ?

—হ্যাঁ দারা। নিজেদের ভেতর ঘোঁট পাকিয়েই তো ওরা বাইরের হামলাকে ডেকে আনল। আরবি, তুর্কি, আফগান—সব হামলা।

বাদশা উঠে দাঁড়ালেন।—কাছে এসো দারা—

এখন এখানে কোনও উজির নেই। নেই কোনও ওয়াকেনবীশ। বাদশার সঙ্গী দরবারি মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ কদিন হল বাদশারই হুকুমে সমতলে নেমে গেছেন। আগ্রা ফেরার পথে বাদশা তাঁকে সঙ্গী করে নেবেন। বাদশার হয়ে অনন্তনাগে

তিনি এক রাজপুতরাজের সভায় দুতিয়ালি করতে গেছেন। আব্বা হুজুরের এই হিন্দু-ই-ফার্সি দানু কাছাকাছি থাকলে প্রতিভা আর সভ্যতার কথায় মানুষটি রসিকতায় দিওয়ান আউড়ে ফুলঝুরি হয়ে ফুটে উঠতেন। যদিও চন্দ্রভান দরবারি মুন্সি—কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ সময়ই কাটে শাহজাদা দারাশুকোর সঙ্গে। আব্বা হুজুরের চেয়েও প্রায় বছর কুড়ির বড় বয়সে। কিন্তু কী সহজেই না তাঁর সঙ্গে সাদি থেকে হাফিজ দিব্যি আউড়ে যান। দারার যেন মনে হয়—তিনি আর চন্দ্রভান সমবয়সী। তাজমহলের নকশা থেকে খলিফা আমলে বাগদাদের বারমাল পরিবার—সব কিছুতেই চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের সমান আগ্রহ।

শাহজাদা বাদশার কাছাকাছি এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন।

—শোন দারা। সভ্যতাই বলো—আর প্রতিভাই বলো—আমি এখন ইরানি হামলা নিয়ে সবচেয়ে উদ্বেগে আছি।

—কিন্তু আব্বা হুজুর—আমার তো মনে হয় ইরানের শাহ সফি এখন তুর্কিদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

—যতই ব্যস্ত থাকুন—হাত খালি হলে ওঁরা কিল্লা কান্দাহারের দিকে ঘুরে দাঁড়াবেন।

শাহজাদা কোনও কথা বললেন না। তাঁর মগজের ভেতর কিষেণগঙ্গার বুকের বরফ খসে যাওয়া হলহলে শুকনো গর্তটার জলছবি এক পলকের জন্যে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। দারা বুঝলেন, সিংহ কখনও তার ধর্ম থেকে সরে আসে না। তাগদের কাছাকাছি যা কিছু—তার ভেতর কোনও অনুতাপ, ত্যাগ, করুণা থাকে না। সেখানে দেখা দেয় দখল, অধিকার, কবজা করার জন্যে ছিনিয়ে নেওয়া, হামলা।

দারা অস্ফুটে বললেন,—আব্বা হুজুর—

—তোমায় তৈরি থাকতে হবে দারা। হিন্দুস্থান কান্দাহার ছাড়তে পারে না।

শাহজাদা কোনও কথা বললেন না। তাঁর মনে পড়ল—জমে যাওয়া কিষেণগঙ্গার বুকে পাহাড়ের এক নীল গাইয়ের স্তব্ধ, অটুট মৃত্যু। এ বছর নাকি স্কার্দু, গিলগিট ছাড়িয়ে আরও উত্তরে—বদকশানের পথে লিদার নদীর আগাগোড়াই বরফে জমে গিয়েছিল।

অনেক রাতে দারাশুকো নিজের সুখদোলায় জেগে উঠলেন। সারা মুঘল কোঠিতে তখন সব আলো নিভে গেছে। ঢাকা পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি সপুর হ্রদের দিকে তাকালেন। বসন্তের প্রথম পূর্ণিমা বোধহয় আজ। জ্যোৎস্নায় যেন দিনের আলো। তার ভেতর ফৌজি পাহারা মশাল হাতে জায়গা বদলাচ্ছিল। এমন পূর্ণিমায় মশালের কোনও মানে হয় না। কিন্তু কে বোঝাবে হপ্তচৌকির সেপাইদের।

শাহজাদা নিজের ঘরে এসে তাঁর নস্তালিক লিপির আঁকিবুকি কাটা কারনামাহ-র মতো বাঁধাই খাতাখানি খুলে বসলেন। তারপর লিখতে লাগলেন—লিখতেই লাগলেন—

অবশেষে ১০৪৯ অল হিজরির ধু-অল হিজ্জাহর ২৯তম দিনে আমি একজন সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন···আমি এই তাগদ, দখল, হামলা, আশরফি, হিরে-জহরতের দুনিয়ায় একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। বিরক্তি এসে গিয়েছিল। আধ্যাত্মিক আলোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। এখন বহাল—উপলব্ধির দুয়ার আমার কাছে খুলে গেল। আমি যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম।

এই মহান কাদিরিদের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে ইসলামের বাইরের দিক আর এই ফকিরের ওপর কোনও ছাপ ফেলতে পারে না। আমি—ফকির দারাশুকো এখন একটু একটু করে রহস্যকে দেখতে পাচ্ছি। এই কাদিরি পীরদের আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমি এই দুনিয়ায়—জীবনের পরেকার দুনিয়াতেও ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে পারব।

আমি টের পাচ্ছি—আমার কথাবার্তা কাদিরি পীরদের মতো হয়ে আসছে। কাদিরিরা ছাড়া আমাকে অন্য কিছু আকর্ষণ করে না। এদের জন্যেই আমার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটে এসেছে। আমার হৃদয় তাদের মরমী বাখানে ভরে উঠেছে। আমি পুরোপুরি বাঁধা পড়ে গেছি।

এই অব্দি লিখে শাহজাদা থামলেন। দারা ঠিক করতে পারছেন না—ওসব কথা কি লিখবেন? না লিখেই ফেলবেন।

শেষে লিখলেন, এঁদের সম্পর্কে আমার কোনও দ্বিধা বা ভ্রান্তি আর নেই। আমি অন্তরে বিশ্বাস করি—এঁদের সাধনার রাস্তা—দান আমায় মোক্ষ এনে দেবে।

এখানে এসে দারা আবার থেমে গেলেন। সাধনায় সিদ্ধি। কিন্তু সাধন ক্রিয়ার কথা লুকিয়ে রাখতে হয়। বলতে হয় না। আমার বুক ফাটানো সুখ—আনন্দের কথা লেখা ঠিক হবে না। এসব তো গূঢ় কথা।

শাহজাদা ঠিক করলেন—বরং ওদের মহান জীবনের কথা লিখি। লিখি অলৌকিক সব ঘটনা।

॥ চৌষট্টি ॥

সাধারণ মানুষের চোখে এই দুনিয়া তিনরকমের। যে জায়গায় অনেক গভীর গর্ত—সেখানে পানি ভরাট হয়ে দরিয়া তৈরি হয়ে যায়। যে জায়গায় মানুষ ঘর বাঁধে—চাষ করে—গান গায়—বসতি বানায়—সে জায়গা না-গর্ত না-উঁচু এমনই এক ডাঙা। আর যে জায়গা অনেক উঁচু হয়ে আসমানকে ছুঁতে চায়—পাহাড় হয়ে চুড়ো যেখানে মেঘ ফুঁড়ে আকাশে ওঠে—তাই হল গিয়ে কবিতা—

বলতে বলতে মানুষটি তাঁর সামনে বয়ে যাওয়া কর্ণফুলির বুকে তাকালেন। আরাকানের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে এ নদী মহিষখালের কাছে সাগরে গিয়ে পড়েছে। বর্ষার পরেকার কর্ণফুলি পাহাড় ধোয়া পলিতে হলুদ পারা। তারই সামনে হরিতকীতলায় মাটির ঘর—চাঁচাড়ির দেওয়াল—ওপরে

নল ঘাসের চাপড়ায় তৈরি চাল। সেদিকে পিঠ ফিরে নলঘাসেরই তকলিতে বসে যে-মানুষটি এসব কথা বলছিলেন—তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালে কর্ণফুলির উজানে ঢলে পড়া সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে এখন। এই সূর্যেরই লালি যেন এখন মানুষটির দুই চোখের কোণে। কাঁচাপাকা দাড়িতে ঢাকা মাঝবয়সী মানুষটির মুখখানি আগাগোড়া কী এক স্বপ্নে ভরা।

তিনি চোখ তুলে সামনের যে-মানুষটির দিকে তাকালেন—তার বয়স অনেক কম। বেশ চনমনে চেহারার যুবকই বলা যায়। নাকের নিচে বাহারি গোঁফ। ঠোঁটে হাসি। যুবকটি হেসে বলল, হুজুর। আপনি কবি দৌলত কাজি। আরাকানের এই জমিন আপনাকে পেয়ে ধন্য। আপনি কবির চোখেই দুনিয়ার তসবির তুলে ধরলেন—

মাঝবয়সী দৌলত কাজি যুবকের কথার মাঝখানেই বলতে লাগলেন, দ্যাখো আলাওল—তুমি সৈয়দ বংশের ছেলে। তুমি নতুন দিনের কবি। আমি তোমার চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়া মানুষ। এই কর্ণফুলির তীরে বসে তোমায় একটা কথা বলি। তোমার সঙ্গে আমার একটা মিল আছে।

সৈয়দ আলাওল অবাক হয়ে এমন করেই দৌলত কাজির মুখে তাকাল যাতে কিনা তার অধীর ভাবটি সহজেই ধরা পড়ে যায়। দৌলত কাজি স্বপ্নালু চোখে একবার সামান্য হেসেও ফেললেন। হরিতকী তলায় তকলিতে বসেই দেখা যায়—দূরে দূরে পাহাড়ের কোলে নাবি জায়গা-জমিতে বর্ষার ধান চারা ডগডগিয়ে উঠেছে। মাঠ ফেরত আরাকানি মেয়ে-পুরুষ—কাঁধের বাঁকে ঘর-গেরস্থালির সঙ্গী পোষা গরুর জন্যে বেছে বেছে কাটা সরেস ঘাসের গুছি। এ-দেশে বর্ষার পর থেকে ধান কাটা অব্দি সবাই গোরুকে বেঁধে রেখে বসেই খাওয়ায়।

—অস্থির হবার কিছু নেই আলাওল। আমাদের দু'জনের ভেতর মিল একটাই।

খুব বিনয়ী হয়ে সৈয়দ আলাওল বলল, হুজুর। আপনি বিরাট কবি। সেই তুলনায় আমি একজন না-চিজ ইনসান মাত্র!

—না আলাওল। তা তুমি নও। জীবনের নানা ওঠা পড়ায় ভাসতে ভাসতে এই অল্পবয়সেই তুমি কবি হয়ে উঠেছ। তোমায় বলি—গত একশো দুশো বছর ধরে বাংলায় যা কিছু কবিতা লেখা চলছে—তার বীজে রয়েছেন খোদ খোদা—ঈশ্বর। সেখানে যেন এই সাধারণ মানুষ চাপা পড়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর যেমন আছেন—তেমনই মানুষের জওয়ানিও আছে—ভালবাসা আছে—আছে তার হাসিকান্না, খোয়াব—নয় কি?

—আলবত হুজুর। আমি তো ওইসব আরাকানি মেয়ের চোখে গোধূলি-বেলায় সন্ধ্যা নেমে আসার ছায়া দেখতে পাই। এই দেখা কি পাপ হুজুর?

—কখনওই নয় আলাওল। কবি তো মানুষের রূপে মুগ্ধ হবেই। এতে তো কোনও গুণাহ নেই। নয়তো সে কিসের কবি। আমি ইউসুফ-জুলেখা পালার কবিদের সেইসব ধানাই-পানাইয়ের কথা বলছি না। রাধার ভেতর হিন্দুরা পেয়ারের আর্থারি কথা—খোদাকে যেমন পায়—তেমনি নিজের মাশুকার—

ভালবাসার জনের জলছবিও তো দেখতে পায়—

—লাখো কথার এক কথা বলেছেন হুজুর। খোদায় যাবার রাস্তায় মাশুকার টান ভালবাসাই যদি মালুম না হয় তো ওপথের মুসাফির হওয়ার মজা কোথায়।

—আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে আলাওল। আগ্রায় জাহাঙ্গীর ছিলেন। এলেন শাহজাহান। হিন্দুস্থানের মুঘলশাহী এখন সিন্ধু থেকে শ্রীহট্ট। তাই বা কেন? কান্দাহার থেকে কামরূপই বলব। বাংলার সুবেদার এখন সুজাঙ্গীর। কর্ণফুলি দিয়ে পাল তুলে বড় দরিয়ায় পড়তে—আমাদের এই সুলতানপুর থেকে মাত্র এক জোয়ারের পথ। তারপরেই তো দরিয়ার মুখে বাঁ হাতে কুতুবদিয়ার চর। আর ডানহাতে ওপরের দিকে উঠলে মেঘনার মোহানায় সন্দীপ, হাতিয়া, ভোলা, দক্ষিণ শাহবাজপুরের সব আলিসা চর। সেখানকার হাওয়া আমার খুনে। সেখানকার হাওয়া আমার হাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে একদিন। আকবরশাহীর একদম শেষাশেষি আমি পয়দা হই।

সৈয়দ আলাওল বলে উঠল, সবটাই আমার শোনা কথা। ফরিদপুরের ফতেহাবাদ থেকে আব্বা হুজুরের সঙ্গে আসছিলাম। আমি তখন খুবই ছোট। মেঘনার মোহনায় ভোলা আর হাতিয়ার মাঝামাঝি ফিরঙ্গি পর্তুগিজ নদী-ডাকাত পড়ল। হারমাদদের হাতে আব্বা হুজুরের এন্তেকাল হল। আরাকান রাজ ফিরঙ্গিদের কাছ থেকে আমায় কিনে নেন। এই হারমাদির কথা আমি আমার 'পদ্মাবতীতে' লিখছি হুজুর—

—লেখো আলাওল। লেখো। যেকথা বলছিলাম—তোমার পদ্মাবতী আমায় যেটুকু শুনিয়েছ—আমি আমার লোর-চন্দ্রাণী—সতী ময়নামতী যতটা লিখেছি—দু'জনেই আমরা মানুষের পেয়ার মহব্বতের হাসিকান্নাটুকু তুলে ধরতে চেয়েছি—

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন কবি দৌলত কাজি। এই সুলতানপুরের বাতাসে সমুদ্রের ধারাধারি জায়গার না-শীত না-গরম। বেলা এখন রীতিমত দীঘল। সূর্য ডোবার আগেও বেশ খানিকক্ষণ ধরে তার আলোয় রঙের খেলা খেলে।

একসময় গমগম করে কথা বলে উঠলেন দৌলত কাজি। দুনিয়ার যেমন একজন খোদা দরকার—তেমনি দুনিয়া আবাদে মানুষও চাই—যে মানুষের কান্না থাকবে। হাসি থাকবে। খোয়াব থাকবে। দুশো বছর ধরে আমাদের পুঁথিগানে—হিন্দুদের সব মঙ্গল-পালায় ভগবানের এতই দাপট—মানুষের রোজকার কথা সেখানে আমলই পায়নি আলাওল। এমন একটা পালা লেখো তো যেখানে ওই সন্দীপের চরে পর্তুগিজ মানোয়ালকে তাড়িয়ে ফতে খান সুলতানী করে। ফতে খানকে সাবাড় করে ফের আরেক পর্তুগিজ—গঞ্জালেস আসে। আরাকান রাজের সঙ্গে গঞ্জালেসের গদ্দারি। সন্দীপ, হাতিয়া, ভোলা, দক্ষিণ শাহবাজপুর জুড়ে গঞ্জালেসের শাহী মাথা তোলে। সেদিন ফিরঙ্গি পর্তুগিজ হারমাদরা বলত—হিন্দুস্থানে লুটের আশরফি আমাদের মাস মাইনে—তার সুদে বাঙলা আমাদের জায়গির! তা দিলাল খাঁ এসে সেই গঞ্জালেসদের সাবাড় করল।

আলাওল বলল, এখন তো শুনেছি দিলাল খাঁ সন্দীপে বসে একদিকে মুঘলদের সঙ্গে—অন্যদিকে মগদের সঙ্গে দোস্তির হাত বাড়িয়েছেন।

—আমিও শুনেছি। বাঙলার সুবেদার শাহ সুজাকে তিনি ভেট পাঠিয়েছেন। সুবেদার সুজাজাঙ্গীরও দিলাল খাঁকে নজর দিয়েছেন। কিন্তু আলাওল আমি তো সন্দীপের চরের মেজাজ জানি। কোত্থেকে কী হবে—সব বিগড়ে বসে থাকবে দিলাল খাঁ। এদিককার চরে—কুতুবদিয়া, মহিষখাল, সন্দীপ, হাতিয়ায় শান্তি কখনও পাকা হয় না আলাওল। এইসব চরের জমিনে যেমন ফসল ওঠে—তেমনি থাকে তার ভেতর জিদ্দি—গোঁ। আমি নিজেই তো সন্দীপে ফতে খাঁয়ের নৌবারায় ছিলাম। ফতে খাঁকে আমি সামনে থেকে দেখেছি। এই ভাল তো এই আগুন।

—আপনি ?

—হ্যাঁ আলাওল। মেঘনার মোহানায় নৌকো নিয়ে খাঁড়ি ধরে হারমাদদের ধাওয়া করেছি একসময়। তার দাম দিচ্ছি এখন। একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ি। বলতে বলতে দৌলত কাজি একদম অন্য জায়গায় চলে গেলেন। বললেন, হয়তো জীবনটাই কেটে যেত কুতুবদিয়া আর হাতিয়ার ভেতর বৈঠা বেয়ে। সুফী কবি জায়সির গান শুনে মজে গেলাম। এই কর্ণফুলিতেই। এখন ভাবি—

বলে একদম থেমে গেলেন দৌলত কাজি। কোনও কথা নেই খানিকক্ষণ।

সৈয়দ আলাওল বলে উঠল, কী ভাবেন ?

—ভাবি—বলে আলাওলের মুখে তাকালেন দৌলত কাজি। ভাবি—শাহ জালালের মতো আউলিয়া শ্রীহট্টে এসেছিলেন—সেই কোন্ ইস্পাহান থেকে। তখন এদেশে মুসলমান কোথায়। হাতে গোনা যেত। আরাকানে এসেছিলেন জায়সির মতো সুফী কবি। হিন্দুস্থানে মুসলমান বাড়ল আকবর শাহীর শেষদিক থেকে, বলতে পার—আমার এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন জুড়ে। এখন পথে-ঘাটে—নদী-নালায় বেরলেই মুসলমানের মুখ দেখা যায়। বলতে পার ওইসব আউলিয়ার প্রেমের কথায়—দরবেশ জীবন দেখে হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হল—এখনও হচ্ছে—কিন্তু শান্তি কোথায়! হারমাদরা মানুষ ধরে ধরে পিপলির গোলাম বাজারে নয়তো তমলুকের হাটে নিয়ে তুলছে। মগরা ভরার নৌকো ভরে মেয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে—হাটে হাটে বিয়ের কনে বিক্রিবাটা করে ফিরছে। সন্দীপের দিলাল খাঁ, ঢাকার শাহসুজা, আরাকান-রাজ কিংবা আগ্রার শাহজাহান বাদশা এইসব বন্ধ করতে পারেন না ?

সৈয়দ আলাওলের মনটাও সন্ধ্যার মুখে ভার হয়ে এল। সে অস্ফুটে বলে বসল, যাঁদের ফৌজ আছে—কামান আছে তাঁরা পারেন না কেন হুজুর ?

—আশরফির খেলা আলাওল। আশরফির খেলা। কে বন্ধ করবে ? সুবেদার ফৌজদার, মনসবদার—সবাই আশরফিতে মজে আছে। তারপর আছে পরপর নিজের নিশানা। আগ্রা চায় চট্টগ্রাম মাথা নোয়াক। তাই সে দিলাল খাঁকে ঘাটাবে না। দিলাল খাঁ হারমাদদের ঘাটাবে না। তার নিশানা মতো—হারমাদে খটাখাট লেগে থাকুক। তাহলে সন্দীপকে কেউ ঘাটাবে না। আর আমাদের আরাকান রাজ ? আমার তো মনে হয় তিনি এইসব দরিয়ায় ইচ্ছে করেই মগদের পোষেন।

সৈয়দ আলাওল অস্থির হয়ে পড়ল।—হুজুর! এর চেয়ে আপনি চন্দ্রাণীর সেই ভোরবেলার জায়গাটা পড়ুন।

—কোনটা?

—সেই যে—

নবচুত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুতল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কলকল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥

মুগ্ধ আলাওলের মুখে তাকিয়ে কবি দৌলত কাজি বললেন, তোমার ভাল লেগেছে?

—যেন বা জয়দেব শুনছি—

দৌলত কাজি অবাক হলেন। বললেন, তুমি জয়দেব জানলে কোত্থেকে? শুনেছো?

—বাঃ! হুজুর? ভুলে গেলেন! আমি যে কুতুবদিয়ার চরে বৈষ্ণব মঠে ছিলাম তিন তিনটি বছর। বসন্তকাল এসে পড়ার কথা বলছেন আপনি—আমি শুনতে পাচ্ছি—ঘুঙুর, করতাল, বাঁশির ডাক—

—তুমি কবি আলাওল—তাই এতসব শুনতে পাও। এর ভেতর সংস্কৃত গানের সুর ধরা পড়েছে। জয়দেব আমাকেও টানে। বৈষ্ণব মঠে কী করতে আলাওল?

—মঠের চর জায়গায় চাষবাস তুলেছি হুজুর। নিন্—আপনি পড়ুন এবারে —আলো কমে এল।

—পড়তে পারব কি? আসলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে যে বামনের বিয়ে হয় তাকে ভাললাগার কথা নয় চন্দ্রাণীর। লোরকে দেখে চন্দ্রাণীর ভাল লেগে গেল। কিন্তু লোরের তো বউ আছে। ময়নামতী। সে তো কোনও দোষ করেনি—

সৈয়দ আলাওল অবাক চোখে কবি দৌলত কাজিকে দেখছিল। এই মানুষটি তাঁর তাজা বয়সে ফতে খাঁয়ের নৌবারায় ছিলেন। মেঘনার মোহনায় মানোয়েল, গঞ্জালেসের হারমাদি রুখতে খাঁড়ি ধরে ফিরিঙ্গিদের ধাওয়া করতেন। আসলে কবিতা কার ভেতর কোথায় লুকিয়ে থাকে কে বলতে পারে!

অন্ধকার হয়ে আসা কর্ণফুলির বুকে তাকিয়ে দৌলত কাজি বললেন, আমি ভাল বুঝছি না আলাওল। দেশের এই অবস্থা!

—দেশের এমন দশা সব যুগেই থাকে হুজুর। তার ভেতরেই তো কবি লিখে চলেন। কবে শান্তি নেমে আসবে—তারপর আমি কলম ধরব—তা তো হয় না হুজুর—।

—সাধারণ মানুষজনের ভাব-ভালবাসা নিয়ে লিখব—অথচ সেই মানুষের দশা দেখেছো। বড় নৌকো ভরে একদল লোক বান্দরবন, খাগড়াছড়ি থেকে তীর্থ করতে গিয়েছিল, নবদ্বীপে। ফিরেছে মাত্র একজন—

—বাকিরা?

—যাবার বেলায় বাঙলার সুবেদারকে তীর্থ বাবদে ওদের কর তো দিতেই হয়েছে। ফেরার বেলায় হারমাদরা ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে পিপলির হাটে বেচে দিয়েছে। এই তো দশা! মানুষ কি গোরু-ছাগল? তাহলে আগ্রায় কিসের শাহী? ঢাকায় শাহ সুজার কিসের সুবেদারি? সন্দীপে দিলাল খাঁ কী করতে আছেন? কার জন্যে আমি গান বাঁধব? কার জন্যে আমি লিখব? কে শুনবে? কে পড়বে বলতে পার আলাওল? আগ্রায়, ঢাকায় তো দেখছি ইবলিশের আখড়া খোলা হয়েছে—আমার তোমার মতো মানুষের জীবনের কোনও দামই নেই—আমরা গোরু-ছাগল?

সৈয়দ আলাওল কোনও কথা বলতে পারল না। ঘোর হয়ে সন্ধ্যা এল। তকলি তুলে কবি দৌলত কাজি উঠে দাঁড়ালেন। এবারে ঘরে যাবেন। ঘরে তার কেউ নেই। বিবি নেই। এই বর্ষার আগের বর্ষায় তিনি মারা গেছেন। একমাত্র ছেলে আরাকান রাজের সেনাপতি আসরাফ খাঁয়ের ফৌজে সেপাই। বড় দরিয়ার দিক থেকে চর কুতুবদিয়া, চর সন্দীপের বাতাস ডাঙার ওপর ভেসে আসছিল।

ঘরের দিকে ফেরার সময় দৌলত কাজি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, চন্দ্রাণী ময়নামতীর কথা আমার বোধহয় শেষ করা হবে না। লোর-চন্দ্রাণী তুমিই সম্পূর্ণ কোরো আলাওল। তোমার তাজা মন। তাজা কলম। তুমিই পারবে। আমি আর ক'দিনই বা আছি—

সৈয়দ আলাওল কোনও কথা বলতে পারল না। তার কানের কাছে খুব চাপা সুরে ঘুঙুর, করতাল অবিরাম বেজে চলেছে। একজন কবির সারাজীবনের কবিতার ভার আরেকজন কবিকে নিতে হচ্ছে। এ বড় গুরুভার। আলাওল কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকল। নিজের অজান্তেই গম্ভীর হয়ে পড়ল। ঠিক এই সময়ে আরাকান পাহাড়ের চূড়ার ফাঁকে চাঁদ এসে অন্ধকার আকাশে দাঁড়াল। হলুদ। প্রায় গোল।

আকাশের নিচে মানুষের এই পৃথিবীতে কেউ কারও জন্যে থেমে নেই। মেঘনা, পদ্মা, যমুনা, আড়িয়াল খাঁ, কর্ণফুলির জল যার যার নিজের ঢেউয়ে জল ভাঙে। তীরের গাছপালা নিজের মতো করে বেড়েই চলেছে। পাখিরা সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। ভোর হলেই তারা বেরিয়ে পড়ে। এর ভেতর মানুষজন যে যার মতো করে আগুন জেবলে ভাত চাপিয়ে দেয়। চোখ টেনে এলে খানিক ঘুমিয়েও নেয়। হয় ঘুমিয়ে পড়ার আগে—নয়তো ঘুম থেকে উঠে মানুষ ভাত খায়। নিজের ঘরের চালের নিচে বসে। তারপর মনে ফুর্তি থাকল তো গান ধরে। নয়তো নিজেও গান বাঁধে কিংবা শুনতেও থাকে। তাতে তার স্বপ্ন মিশে যায়। কিংবা স্বপ্নভঙ্গের কথা উঠে আসে। খাওয়া দাওয়া, জেগে থাকা, ঘুমিয়ে পড়ায় সূর্য আর চাঁদের নিচে মানুষ তার দিনরাতের প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলে। এরই ভেতর স্বপ্ন দেখা কিংবা ভাঙা স্বপ্নের ওপর দিয়ে নিজের মনটাকে বুলিয়ে নেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। যারা পারে তারা কিছু অন্যরকম। এরাই মসজিদ তোলে, মন্দির বানায়, গাছ বসায়, কাটা হয়, বাঁশ চেঁছে ডালা

বোনে। কবিতা লেখে। তীর্থে যায়। কেউ কেউ আসমানে তাকিয়ে থাকে। যদি ভগবানকে দেখা যায়। ভগবান ওপরে থাকেন। এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। দেখা যায় না তাকে। দেখা যায় অন্ধকারকে। কেননা তখন কিছু দেখা যায় না। যখন দেখা যায়—তখন নাকি আলো। অথচ খোদ আলোকেই কি দেখতে পাই।

এমনই গাছপালা—নদী-নালায় সাজানো মাটির পৃথিবীতে আজ যেন আসমান থেকে কোনও ফেরেসতা নেমে এসেছে। সুলতানপুর থেকে জায়গাটা কিছু ভিন্ন। সামনেই লাকসামের পাহাড়। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঘন বেতবন। বেতফল খাবার জন্যে পাহাড়ী টিয়ার ঝাঁক এসে পড়েছে। আর পাহাড়ের গা সবুজ হয়ে আছে বর্ষার জলে লকলকিয়ে ওঠা লতায় ঢাকা গাছপালা।

ফেরেসতার বয়স বড়জোর পঁচিশ। চলায়ফেরায় রীতিমত ছন্দ। গায়ের আঙ্গরাখাখানি বেশ দামি। কোমরবন্ধে একটি দামি খাপ। খাপের বাইরে ভেতরকার ছোরার বাট দেখে বোঝা যায় মালিকটি কোনও যে-সে লোক নন।

তাজা বয়সের এমন সুন্দর নওজওয়ান এমন দামি পোশাকে সাধারণত বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শুধু রূপকথার গল্পে। পথ হারিয়ে—কিংবা রাজ্যপাট হারিয়ে—নয়তো কোনও সুন্দরী কন্যার খোঁজে। ইউসুফ-জুলেখা পালায় ইউসুফ এরকমভাবে খুঁজতে বেরিয়েছিল জুলেখাকে।

কিন্তু লাকসাম পাহাড়ের পায়ে বেতবনের ধারে ভুলুয়া গাঁয়ে আশ্চর্য সুন্দর যে নওজওয়ান এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি রক্তমাংসের মানুষ। লালচে গাল। সামান্য কটা চোখ। মাথার কোঁকড়া চুলের বাবরিটি বর্ষা শেষের থমথমে বাতাসে একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। পায়ের দিককার মখমলের ডোরিয়া বনবাদাড়ের চোরকাঁটায় ভর্তি হয়ে গেছে। অবিকল রূপকথার রাজপুত্র।

তা রাজপুত্র এখন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। সেইভাবেই তিনি এক দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। বেলাশেষে বাতাস প্রায় নেই বললেই চলে। রাজপুত্র রীতিমত ঘেমে উঠেছেন। কোথাও যে একটু বসে বাঁ পায়ের জুতোর ভেতর থেকে পোড়া মাটির টুকরোটা বের করে নেবেন—তেমন বসার জায়গাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল—এক নওজওয়ান দীঘিতে ছিপ ফেলে চুপ করে বসে আছে। বেশ দীঘল চেহারা। খালি গা। চোখ ফাতনায়। মাছের আশায়।

রাজপুত্র এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ডান পা এগিয়ে দিয়ে বললেন, জুতোটা খুলে দে—

ফাতনা থেকে মুখ তুলে তাকাল জওয়ান মতো ছেলেটি। বয়স এই বিশ বাইশ। তাগড়া চেহারা। রীতিমত বিরক্ত চোখে সে বলে উঠল, এ কেমন ব্যাভার? আমি কেন আপনার জুতো খুলে দিতে যাব? কোথাকার শা'জাদা এলেন।

—কী? কথার ওপর কথা? জুতো খুলে দ্যাখ—পায়ে কী ফুটছে। হাঁটা

যাচ্ছে না। লাগছে ভীষণ—বলতে বলতে রাজপুত্র ফের তাঁর ডান পা এগিয়ে দিলেন।

এবার সেই তরতাজা তাগড়া জোয়ান দৌগুণি বিরক্ত হল। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভাল জ্বালা ! আমি কেন তোমার জুতো খুলতে যাব ? তুমি কে ?

রাজপুত্রটি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ডান হাতে কষে এক চড় কষালেন তাগড়া ছেলেটিকে। গালের ওপর। ছেলেটি অমনি পটাং করে উঠে দাঁড়াল।

রাজপুত্র রাগে থরথর করে কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই বললেন, কোথাকার শাহজাদা আমি এবার টের পাবি তুই—

রাজপুত্রের কথা শেষ হতে না হতেই তাগড়া জওয়ান ছেলেটি বেশ জোরেই তার ছিপের এক ঘা কষিয়ে দিল ভালভাবেই রাজপুত্রের ডান হাতে।

—কী ? রাগে যেন ঝনঝন করে বেজে উঠলেন রাজপুত্র। কোমর থেকে ছোরা বের করে তিনি তাগড়া ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আঁশফল, হরিতকী সব গাছের মোটা গুঁড়ির পায়ে বিন বিন করছে ঘাস। ঘন, সবুজ, মোটা পাতির। তারা জানলো না—তাদের কয়েক রশির ভেতর লাকসাম পাহাড়ের ছায়ায় এই ভুলুয়া গাঁয়ে দীঘির পাড়ে এই মাত্র কী ঘটে গেল।

রাজপুত্র দেখলেন, তাঁর হাত, আঙ্গরাখার আস্তিন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এমন সময় ঘোড়ার পায়ের টগাবগ। তাগড়া ছেলেটি ঝাঁকুনি দিতে দিতে দীঘির ঘাটেই নেতিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে ঘোড়ার খুরে ঘাসবন, বেতবন, আঁশফলতলা ছিঁড়ে খুঁড়ে ধুলো ধুলো। একটা আরবি ঘোড়ার পিঠ থেকে অসম্ভব গম্ভীর দেখতে একজন লোক খোলা তলোয়ার হাতে পলকে নেমে এল। এসেই বলল, হুকুম করুন শাহজাদা—

বাঁ হাতের চেটোয় মাথার চুলের থাক ঠিক করতে করতে সেই সুন্দর নওজওয়ান শান্ত গলায় বললেন, না। তার আর কোনও দরকার হবে না। তার চেয়ে নায়েব-নাজিম—আপনি একবার দেখুন তো—যে তাড়িটা খেলাম খানিক আগে—তাতে কিছু মেশানো ছিল কিনা ?

—হুজরত ! গাছি যখন তালগাছ থেকে নামাল—তখন তো আমি সামনে দাঁড়িয়ে—

—তবু একবার খোঁজ নিন নায়েব-নাজিম। আমি তো এমন বেসামাল হয়ে যাই না—বলতে বলতে বাঁধানো ঘাটলায় তাকালেন সেই সুন্দর নওজওয়ান। ছিপটা পড়ে আছে। তার পাশে পড়ে আছে ছিপের মালিক।

—আপনি বাঙলার সুবেদার শাহজাদা সুজাগীর। আপনার তাড়িতে কে কী মেশাবে ? তবে আপনি বাঁশের কচি কঞ্চি নিংড়ে যে-কয়েক ফোঁটা বাঁশের রস মিশিয়েছিলেন—তাছাড়া আর তো কিছু মেশানো হয়নি।

সুবেদার শাহজাদা সুজা নিজের মনে মনেই বললেন, তাহলে কচি কঞ্চিটাই খুব তেজি ছিল। সুজাগীরের সামনে তখন বাঙলার সুবেদারের নায়েব-নাজিম

ফিরোজ খাঁ মস্তান দাঁড়িয়ে। জমা আর হাসিল উশুলে নায়েব-নাজিম যেমন দড় —তেমনি দড় সুবেদারের সংগী হয়ে পাখি শিকারে।

এরকমই এক শিকারে বেরিয়ে পড়েছেন শাহজাদা আজ দিন সাতেক। ঢাকা থেকে বেরিয়ে কালীগঞ্জের কাছাকাছি সুজাংগীর মেঘনা পেরিয়েছেন। তারপর বানিয়াচংয়ের খাড়ি ধরে দক্ষিণে বেগমগঞ্জ অব্দি এ-নদী সে-নদী ধরে নেমে আসেন। তারপর লাকসামের ফৌজদারের ঘোড়া নিয়ে এই শান্ত বেতবনে পাখি শিকার—তালগাছের তাড়ি খাওয়া—এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো।

সুজাংগীর একটা ঢিবি দেখে বসলেন। তারপর ডান পায়ের জুতো খুলে বের করলেন পোড়া মাটির সেই টুকরোটি—যা কিনা সকাল থেকেই শাহজাদাকে খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য করছিল। লালচে টুকরোটা হাতে নিয়ে সুজাংগীরের মনে হল—মাত্র এই টুকরোটির জন্যে একটা তাগড়া ছেলে এভাবে মারা গেল ? বাঙলার সব ভাল। ফসল দেয়। অঢেল ফলফলারি। মাছের কোনও অভাব নেই—যদিও আমি মাছ একদম খাই না—তবু মানতেই হবে—এখনকার বাসিন্দারা বড়ই বেতমিজ। নয়তো বাঙলার সুবেদার হিসাবে আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। পায়ের জুতো খুলে দিতে বলা তো বিশেষ খাতিরদারি—আলাদা করে কদর জানানো। তা এই ছেলেটা অমন তমিজ হারিয়ে চটে উঠল কেন ? না চটলে তো প্রাণটা যেত না।

পায়ের জুতো ঠিক করে উঠে দাঁড়ালেন সুবেদার সুজাংগীর। আরেকটু বাদেই সন্ধ্যা নামবে। দীঘির জলে সারি সারি তালগাছের ছায়া। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, নায়েব-নাজিম।

—হুকুম করুন বন্দেগান।

—তাড়িটা ভালই ছিল মনে হচ্ছে। আরেকটু দেখা যায় না ?

—আপনি সুবেদার শাহজাদা। বাঙলা আপনারই সুবা। সামান্য তালের তাড়ি—তা কি আর পাওয়া যাবে না।

—তাহলে দেখুন না একবার—

—কিন্তু—

—কী ফিরোজ খাঁ মস্তান।

—এই তো খানিক আগে খেলেন।

হো হো করে হেসে উঠে শাহজাদা হঠাৎ আঁশফলতলার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। শাহজাদা থেমে যেতেই ফিরোজ খাঁ মস্তানও সেদিকে তাকালেন।

সব ক'টি গাছের গুঁড়ি মানুষে ঢাকা পড়ে গেছে। শ'খানেকের ওপর লোক জড় হয়েছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। নায়েব-নাজিম চোখের ইশারায় ঘোড়সওয়ারদের সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে বলে পড়ে থাকা ছেলেটির লাশের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাশ ফিরে থাকা মাথাটি হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে মুখখানা দেখেই বলে উঠলেন, আরে! এ যে মুবারক—

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তাড়িতে ঢিলেঢালা শাহজাদা সুজা যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন। কোন মুবারক ?

নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ মস্তান সঙ্গে সঙ্গেই কোনও জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর হাতের ভেতর মুবারক নামে খুব চেনা এক যুবকের মৃত-মুখ। খালি গা। তলপেট জুড়ে ভলকে ভলকে রক্ত। আর পেছনেই আঁশফলতলা, হরিতকীতলা জুড়ে লাকসাম পাহাড়ের ছায়ায় ভুলুয়া গাঁয়ের বেশ কিছু মানুষের নির্বাক মুখ। ওরা সুবে বাঙলার সুবেদার শাহজাদা সুজাঙ্গীরকে চিনতে পেরেই এত চুপ। মাঝখানে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে জনা বারো ঘোড়সওয়ার। যেন বা বাঙলার সুবেদারকে বাঁচাতে ঢাল।

বছরের এই সময়টায় বাঙলাদেশের দেশ গাঁয়ে খুব ঘাম দেয়। তার ভেতর সূর্য ডুবু ডুবু। শাহজাদা সুজাঙ্গীরই শুধু এখনও বুঝে উঠতে পারেননি—একটা খুন মানে কতখানি খুন। তাঁর বারবারই মনে হচ্ছিল—কাঁচ কাঁণ্ড বড় তেজি ছিল। নয়তো তার নিঙড়ানো রসে তালের তাড়ি সারা শরীরে এতখানি আগুন ধরিয়ে দেয় কী করে ?

শাহজাদা সুজা ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, কে মুবারক ?

ফিরোজ খাঁ মস্তান প্রায় ফিসফিস করে বললেন, বন্দেগান ! যার বাবাকে আজই দুপুরে আপনি ডোখোল পাখি মারতে গিয়ে বাঁশবাগানে প্রায় মেরেই ফেলছিলেন—

শাহজাদা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সেই হুরী— ? তারই খসম এই বে-নসিব ?

নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ মস্তান বাঙলার মাটিতে জল-হাওয়া খাওয়া পাঠান। দিল্লিতে পাঠান শাহী তচনছ হয়ে গেলও তার কিছু কিছু ধারা হিন্দুস্থানের এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। খোদ বাঙলা মুলুকেও বহুদিন পাঠান তাঁবে ছিল। সেইসব সুলতানী খানদানের খুন নিয়ে ফিরোজ খাঁ মস্তান বহু ঘাটের জল খেয়ে আজ মুঘলশাহীতে বাঙলার সুবেদারের নায়েব-নাজিম। তিনি চাপা গলায় বললেন, আপনি একজন সুবেদার শাহজাদা। আপনার হাতে খুন হয়েছে এই ভুলুয়া গাঁয়েরই এক তাজা নওজওয়ান। আপনি সুবে বাঙলার সুবেদার। আপনাকে এখুনি সুবেদারের মানানসই হাবভাব করতে হবে। নয়তো সামনে খতরা। ওই ক'জন ঘোড়সওয়ার দিয়ে সারা ভুলুয়াকে সামলানো যাবে না। ভুলুয়া খেপলে আমরা ঝড়ের মুখে কুটো হয়ে ভেসে যাব হজরত—

—কী ? শাহজাদা সুজা কাউকে ডরায় না—বলে বাঙলার সুবেদার যেন ঠেলে উঠলেন। ফিরোজ খাঁয়ের মনে পড়ল, সকাল থেকেই শাহজাদা শিকারে বেরিয়ে তালের তাড়ি খেয়ে চলেছেন। মেঘনা পেরবার পরই বেগমগঞ্জে এসে শাহী শরাব ফুরিয়ে যায়। তারপর থেকেই এমন গরম রোদের ভেতর তালের তাড়ি

গ্লাসে ঢালা। তাতে একটি কাঠি ডুবিয়ে রসের গাদ গ্লাসের নিচে নামিয়ে দিয়ে কণ্ঠি নিঙড়ে রস মেশানো। শেষে ঢকঢক। শাহজাদা এক চুমুকেই প্রায় সবটা খেয়ে থাকেন।

ফিরোজ খাঁ শান্ত গলায় বললেন, শাহজাদা! আপনি বাঙলার সুবেদার -

বিচিত্র হেসে সুজা বললেন, তাই বুঝি। ভুলে গিয়েছিলাম। —বলেই শাহজাদার মনে হল—তাঁর হাত-পা অবশ লাগছে। কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আলগোছে। সবই আবছা—হাত গলে বেরিয়ে যাবার মতো। এই মাত্র নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ বলেছিলেন—সামনে বিপদ—খতরা। নাকের নিচে শাহজাদা বারবার নেশার এক খিঁচুনি সামলেও বুঝতে পারছিলেন না—বিপদ কোথায়? ঠিক কোন জায়গায়? সামনে? —সামনে তো ঘোড়সওয়ারের দল। তাদেরও সামনে? কতকগুলো মানুষের কালো কালো মাথা। সব চোখ একরকম—একাকার হয়ে যাচ্ছে শাহজাদার চোখে।

ফিরোজ খাঁ মস্তান সুবেদার শাহজাদা সুজার প্রায় গায়ে লেপটে গেলেন বলা যায়। গত ক'বছরের সুবেদারিতে শাহজাদার দিনরাতের সঙ্গী এই ফিরোজ খাঁ। শিকারে, শাসনে, ফুর্তিতে নায়েব-নাজিমকে হাজির থাকতেই হয়। ফিরোজ খাঁ বললেন, হুজরত! বেশি চেঁচাবেন না। আজই দুপুরে মেঘনার হাওড়ের কাছে ডৌখোল পাখির ঝাঁকে গুলি ছুঁড়লেন—মনে আছে?

—খুব মনে আছে।

—পাখিগুলোর ঝটাপটি শুনে আপনি হাওড়ের গায়ে ছুট দিলেন—

—হঁ্যা। তলতা বাঁশের ঝাড়ের তলায়।

—তখন আপনি পাখি দেখতে ছুটে গিয়ে ফের যখন গুলি চালালেন—

—কয়েকটা ডৌখোল তখন ছররা খেয়েও পালাবার তালে ছিল যে ফিরোজ।

—হঁ্যা। সেই গুলি একটুর জন্যে এক হাসিন জেনানার গায়ে লাগেনি হুজরত। সে ওখানে হাওড়ের জল নিচ্ছিল কলসিতে—

—আমি কী করে জানব—ওখানে মেয়েরা জল নিতে যায়।

—আপনার জানার কথা নয় শাহজাদা। এই ভুলুয়ায় আমি অনেকবার এসেছি। এখানকার অনেকেই আমার চেনা। গুলির শব্দে হাসিন জেনানাটি পালাচ্ছে। তার মাটির কলসি আপনার গুলি লেগে দু'ফাঁক। আর আপনি পাখি ফেলে—

—কী করি ফিরোজ—বলে একটু কুঁকড়ে গেলেন শাহজাদা। শেষে বললেন, অত সুন্দরী। আমি আর পারিনি নিজেকে সামলাতে—

—তাই বলে বাঙলার সুবেদার এক গেঁয়ো জেনানার পেছন পেছন ছুটবে?

—ভাগ্যিস তুমি আমায় ধরে ফেলেছিলে। থামিয়ে দিয়েছিলে।

—ভাল করে শুনুন হুজরত। সেই জেনানার খসম ওই মুবারককে আপনি একটু আগে খুন করে বসে আছেন।

শাহজাদা সুজা এবার যেন কিছু ধাতস্থ হলেন। চাপা চলায় জানতে চাইলেন, এখন উপায়—?

ফিরোজ খাঁ মস্তান ফিসফিস করে কী যেন বললেন। সূর্য ডোবে ডোবে। আঁশফলতা, হরিতকীতলায় জমে ওঠা মানুষজনের চোখে-মুখে সেই আলোর লালি।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা সুজা নিজের মাথায় রেশমের কোমরবন্ধ খুলে বেঁধে নিলেন। তারপর দু'হাতে মুবারকের লাশ কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ফিরোজ। পথ দেখাও।

খোদ বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা দু'হাতে মুবারকের লাশ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পাশে নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ মস্তান। ওঁদের পেছন পেছন জমে ওঠা মানুষের সে ভিড় এখন যেন মিছিল। ভুলুয়া, কেদারমণি, লাকসাম পাহাড়ের বাঁ দিককার গাঁগুলোর মানুষজনও এই মিছিলে সামিল। তাদের শেষে শাহী ঘোড়সওয়ারের দল।

আশশ্যাওড়ার জঙ্গল, ভিজে বাঁশতলা, পুকুরপাড় ধরে চলেছেন সুজা। সুবেদার হয়ে তাঁকে কখনও এমন ভার বইতে হয়নি। কিন্তু তিনি এমনই একজন মানুষ—যে কিনা সময়মত যে কোনও অবস্থার ভেতর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

ফিরোজ খাঁ মস্তানের পাশে পাশে একজন দাখিলা মশাল ধরিয়ে নিয়েছে। সে-ই পথ দেখাচ্ছে। শাহজাদার মনে হচ্ছে—পথ বুঝি আর ফুরোবার না। তাড়ির ঘোর কাটেনি। পা কিছু টলছে। সেই অবস্থাতেই সুবেদার সুজাঙ্গীর ফিসফিস করে নায়েব-নাজিমকে বললেন, ওই খুবসুরতিকে আমার চাই কিন্তু—

সামনের দিকে তাকিয়ে ফিরোজ খাঁ চাপা গলায় বললেন, লাশ যেন পড়ে না যায়। শক্ত করে ধরুন।

—তা ধরছি। কিন্তু যা বললাম তা যেন মনে থাকে ফিরোজ—

—লাশ সামলে হাঁটুন হজরত।

সুজাঙ্গীর পাঁজাকোলে ধরা মবারকের লাশ সামলে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন, নায়েব-নাজিমের চোখে কোনও পলকই পড়ল না। তিনি সামনে তাকিয়ে যেভাবে হাঁটছিলেন—সেভাবেই হেঁটে চলেছেন। নেশার ভেতরেও শাহজাদার সন্দেহ হল—তাহলে সত্যি সত্যিই বড় কোনও খতরার ভেতরে পড়ে গেছি।

বড় এক দীঘির পাড়ে এসে মিছিল থামল। সুজা দেখলেন, বিশাল বিশাল মশালের আলোয় খোলা চত্বরে আগুনের এলাহি কারবার। বড় বড় আগেনগারে ছাঁচে বসানো মাটির কাজ পুড়ছে। পোড়া মাটির অঢেল নকশা এদিক ওদিক ছড়িয়ে। ত্রিশূল হাতে গেরুয়াধারী ক'জন সাধু ফেজ মাথায় দাড়িওয়ালা একজন মানী মুখের সঙ্গে পোড়া মাটির নকশা নিয়ে কী কথা বলছেন।

মানী মুখের মানুষটির খালি গা। গলায় তাবিজ। বেশ সুস্থ সমর্থ চেহারা। তিনি বসেছেন একখান বেশ উঁচু করে কাটা নারকেল গুঁড়ির ওপর। তাঁকে ঘিরেই গেরুয়াধারীরা কী বলছেন। বিশাল উঠোন মতো জায়গায় মাঝামাঝি মাথা মাটির ঢিবি। ঢিবির দু'ধারে বসে দুই কারিগর সন্ধ্যার বাতাসে মশালের আলোয় ছোট টালির ওপর পোড়ামাটির নকশা এঁটে দিচ্ছে।

বেশ কয়েকখানা উঁচু বারান্দার ঘর গেরস্থালির ঘেরে এই উঠোন মতো জায়গাটি। একটেরে মাচান বেয়ে ওঠা ধুঁদুললতা পরিষ্কার দেখা যায়। এক গেরুয়াধারী বলে উঠলেন, মন্দিরের গায়ে নকশা-টালি বসানোর সময় আপনি যদি দেখে দিতেন—

—ওরাই পারবে—বলে মানী মানুষটি মুখ তুললেন। আরও যেন কী বলতেন তিনি। শুধু মুখ দিয়ে তাঁর অস্ফুটে বেরিয়ে এল, নকশা তো রয়েইছে—বলতে বলতে থেমে গিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এ যে চোখের সামনে বাঙলার সুবেদার।

গেরুয়াধারীদের সরিয়ে দিয়ে মানুষটি বেরিয়ে আসতেই নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ মস্তানের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, কী ব্যাপার?—বলতে বলতেই শাহজাদা সুজাঙ্গীরকে তিনি নির্দেশ করলেন। করে মাথা তুলেই তাঁর চোখে পড়ল—সারি সারি কালো কালো মাথা। কয়েকখানা মুখ চেনা লাগল। আবারও তিনি বলতে যাবেন—কী ব্যাপার?—মনে মনেও তিনি কোনও কূল-কিনারা করে উঠতে পারছেন না। একবারও তাঁর নজরে এল না—সুবেদার শাহজাদা সুজাঙ্গীরের দু'হাতের পাঁজাকোলে কী রয়েছে। বরং পেছনের কালো কালো মাথার ওপর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ারদের দেখে তিনি দ্বিগুণ অবাক হলেন।

নায়েব-নাজিম ফিরোজ খাঁ মস্তান এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, আজ আপনার কাছে কোনও মসজিদ বা মহল বানানোর বরাত নিয়ে আসিনি ওস্তাদ রহমত খাঁ—

রহমত খাঁ মানুষটির বয়স হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় শরীর ভাঙেনি। তিনি এমন অসময়ে ঢাকা থেকে সদলে খোদ সুবেদারকে এসে হাজির হতে দেখে রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। কেননা, তলব পেয়ে রহমত খাঁয়ের নিজেরই তো ঢাকায় গিয়ে হাজির হওয়ার কথা—যদি কোনও জরুরি কাজ থেকে থাকে।

শাহজাদা সুজা ওরই ভেতর দেখলেন, মশালের আলোয় সবুজ ধুঁদুল মাচানের পাশে সেই খুবসুরতি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পাশে এক বুড়ি মতো জেনানা। আহারে! ও কি জানেও না—আজই আমার হাতে ওর কী সব্বোনাশ হয়ে গেছে। এমন ফুল এখানে পড়ে থাকতে পারে না। ঢাকার গুলিস্তানেই ওর জায়গা হওয়া দরকার।

ফিরোজ কিছুতেই কথাটা ভাঙতে পারছেন না। পেছনে মানুষের মিছিলও একদম বোবা। শাহজাদা নিজেই এগিয়ে এলেন। এই আপনাদের মুবারক—

ওস্তাদ রহমত খাঁ অবাক হয়ে দেখলেন, বাঙলার সুবেদারের কোলে মুবারক? তার মাথাটি ঘাড়ভাঙা পাখির মুণ্ডুর মতোই ঝুলে পড়েছে।

রহমত খাঁ এগিয়ে এলেন। আমার মুবারক? আমার ব্যাটা? কী ব্যাপার? কী হয়েছে হুজরত? বলেও জওয়ান ছেলের শরীর তিনি একা তুলতে পারলেন না। খোদ সুজাঙ্গীর, ফিরোজ খাঁ আর রহমত খাঁ—তিনজনে মিলে ধরাধরি করে ধুঁদুল মাচানের নিচে তাকে শুইয়ে দিল।

—বেহুঁশ কেন মুবারক ? কী হয়েছে মুবারকের ?

মিছিল থেকে কিসের এক রব উঠতে যাচ্ছিল। ফিরোজ খাঁয়ের ধমকানির গলায় তা মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল। শিকার ফেরত শাহজাদা দীঘিতে হাত-পা ধুতে নেমেছিলেন—

রহমত খাঁ ভূতে পাওয়া গলায় বলে উঠলেন, হ্যাঁ। মুবারক তো মাছ মারতে বসে থাকে দীঘিতে—এই অবধি বলে চেঁচিয়ে উঠলেন রহমত খাঁ। মশালের আলোয় তিনি দেখতে পেয়েছেন—ছেলের বুক, তলপেট রক্তে মাখামাখি—ও কী ? খুন কেন ? কিসের খুন ?

ফিরোজ খাঁ মস্তান দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন, নওজওয়ানির তাজা খুন। চিনতে পারোনি—খোদ বাঙলার সুবেদার এসে দাঁড়িয়েছেন ঘাটে। মুবারক বেঁচে নেই ওস্তাদ। কিন্তু একথাও না বলে পারছি না—বেঁচে থাকতে বেতমিজির একশেষ করে গেছে। সহবত জানতোই না। কার সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হয়। তাই—

এই তাই কথাটি ওস্তাদ রহমত খাঁয়ের মাথার ভেতর গিয়ে বিঁধে গেল। তিনি বহুবার ঢাকায় গিয়ে শাহী বরাত নিয়েছেন। দেশ গাঁয়ে তাঁর হাতে নকশা মতো মসজিদ-মন্দির উঠে থাকে। কিন্তু শাহী ফরমানেও তিনি ঢাকায়—জাহাঙ্গীরনগরে গিয়ে বড় মসজিদের এবাদত-চাতালে পোড়ামাটির কাজ করে এসেছেন। সেজন্যেই তিনি জানেন—এই তাই কথাটির কী মানে। একবার ওকথাটি বলা হয়ে গেলে শাহী কেতায় আর কোনও কথা থাকে না—থাকে না কোনও ওজর বা কৈফিয়ত।

সারাটা উঠান এক অদ্ভুত ছবি এখন। পোড়ামাটির নকশা পোড়াটালিতে জুড়ে দেওয়া বন্ধ। গেরুয়াধারীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে। মশালগুলো দাউ দাউ। ভুলুয়ার মানুষজন চুপচাপ যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কোনও কথা নেই তাদের মুখে। মুবারকের কাঁচা বিবিটি কোনওরকম কান্নাকাটি না করেই ধুঁদুলতলায় শোয়ানো মুবারকের লাশের পাশে এসে এই মাত্র বসে পড়ল। কোনও হায়া নেই। খোলা চুলের ভেতর মুখখানিতে বড় বড় দুটি চোখ। শুকনো। চোখ বড় বড় করে দেখছে।

শাহজাদা সুজা বললেন, একসময় তো পাথরের কাজও করতেন।

ওস্তাদ রহমত খাঁয়েরও কান্না শুকিয়ে গেছে। মুবারক এখন ধুঁদুলতলায় ঘুমিয়ে আছে। একবার 'তাই' বলে দেওয়ার পর আর কিছুই করার নেই। আগ্রার দেওয়ানখানা এখান থেকে অনেক দূরে। বাদশা আরও দূরে। তিনি কি শাহজাহানবাদে ? না কাশ্মীরে ? আজ ভোরে কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল ? ভেবে পেলেন না রহমত খাঁ। মুখে বললেন, এখন অনেক দিন ওসব করা হয় না।

কথাটা আন্দাজেই পেড়েছিলেন শাহজাদা সুজা। তিনি বেশ আগ্রহভরেই বললেন, দেখুন না। সাদা পাথরের একখানি তখত আমার খুব শখ ছিল।

—তেমন কিছু নেই বোধহয় হজরত।

—তাহলে বরাত নিন। যত আশরফিই লাগুক—আমি খুশি হয়েই দেব।

—পাথরের কাজ আমি ভুলেই গেছি বন্দেগান।

সারা উঠোন কেঁপে উঠল। যে যেখানে ছিল—কারও চোখেই পলক পড়ল না। এভাবে কথা বলার মানে একটাই। তুমি সুবেদার হও আর যে-ই হোক—তোমার বরাত আমি নেব না।

সুবে বাঙলার নায়েব নাজিম পাঠান ফিরোজ খাঁ মস্তানের চোখের পাতা এবার কেঁপে উঠল। শাহজাদা সুজাঙ্গীর কখন কী করে বসেন বলা যায় না। কাছাকাছি কোনও শাহী চৌকিও নেই যে জরুরি ডাকে এক রিসালা ঘোড়সওয়ার পাওয়া যাবে বিপদের মুখে। শিকারে বেরিয়ে এ তো এক মহা ফ্যাসাদ। গুলি করার আগের মুহূর্তেও শাহজাদার মুখে মোলায়েম হাসি ভাসে।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুবারকের বিবি ধুঁদুলতলা থেকে উঠে এল। মাথার ঘোমটার আড়াল খসে গেছে। যেন বা রূপকথার কোনও হুরী। সবার সামনে দিয়ে যাবার সময় সে শাহজাদার চোখ টানল। যতক্ষণ না মুবারকের বিবি বারান্দায় উঠে অন্দরে মিলিয়ে গেল—ততক্ষণ শাহজাদা সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

সারা উঠোনে টঁু শব্দটি নেই। অন্দরের ভেতর থেকে চাপা কান্নার রেশ এবার একটু একটু আসছে। সুজা ভাবলেন, তবে কি খুবসুরতি অন্দরে গিয়ে কাঁদতে বসল? তাহলে তো মুশকিল হল। কী বলবেন তিনি—কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছেন না।

এমন সময় ঝকঝকে সাদা পাথরের একখানি বাহারি তখত খোলা ডুলিতে বসিয়ে অন্দর থেকে টানতে টানতে বেরিয়ে এল মুবারকের বিবি। এই একখানাই আছে—

পরিষ্কার গলা মুবারকের বিবির। যে গলায় কোনও আড় নেই।

ওস্তাদ রহমত খাঁও অবাক হলেন। তিনি নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন এই তখত-এর কথা। মুবারক তাঁর বড় আদরের আওলাদ। তারই জন্যে অনেকদিন আগে রহমত খাঁ একটু একটু করে এই পাথরের তখত বানিয়েছিলেন। মুখে বললেন, হ্যাঁ। ছিল বটে একখানি। কিন্তু মনেও পড়েনি আমার।

শাহজাদা সুজা এগিয়ে গেলেন। মশালের আলোয় সাদা পাথরের ওপর কাজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঠেসান দেবার জায়গায় ঢালু ঢাল। দু'খানি হাত রাখার জায়গায় পাথরে খোদাই বাঘের থাবা। তখত-খানি দেখতে দেখতে শাহজাদার চোখে পড়ল—মুবারকের বিবির কোমর—গঠন গাঠন। চিবুকের উদ্ধত ভাবটি বড্ডো মন টানে। এ জেনানা আমার চাই-ই চাই। এই ভুলুয়ায় আমায় ফিরে আসতেই হবে। আমার রাজধানীতে যোগ্য জায়গায় তুমি থাকবে খুবসুরত।

মুখ তুলে সুজাঙ্গীর বললেন, আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। এখন যদি আপনার পাশে না দাঁড়াই তো রসুলুল্লার কাছে কী জবাবদিহি করব? এই তখত-এর জন্যে আপনি যে দাম চাইবেন তাই-ই আমি দেব।

ওস্তাদ রহমত খাঁ কোনও কথা বললেন না।

এতক্ষণে ফিরোজ খাঁ মস্তান হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নয়তো খানিক আগে

ওস্তাদ তো আসলে শাহজাদার মুখের ওপরেই এক রকম না বলে দিয়েছিলেন। তখনই শাহজাদা সুজা যে কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারতেন। এখন যা চলছে —তাকে বলা যায় এক রকমের দরাদরি। ভাগ্যিস মুবারকের বিবি অন্দর থেকে তখততখানি বের করে এনেছিল।

শাহজাদা সুজাঙ্গীর ফের বললেন, আমার অনেকদিনের শখ আজ পূর্ণ হল। খুব পছন্দ হয়েছে আমার—

ফিরোজ খাঁ বুঝলেন, মুবারকের বিবিকে শাহজাদার খুবই মনে ধরেছে। নয়তো একখানি সাদামাটা তখত নিয়ে এত হাউস!

ওস্তাদ রহমত খাঁ বললেন, মুবারকের জন্যে বানিয়েছিলাম।

সারা উঠোনে মশালগুলোর আগুনই শুধু নাচছে। নয়তো বাকি সবাই চুপচাপ। রহমত খাঁ আবার মুখ খুললেন, হজরত! এই তখত আপনার মবারকে আমার সামান্য নজর বলেই মনে করবেন। আপনি নিয়ে যান। এক কানাকড়িও দাম লাগবে না বন্দেগান—

শাহজাদা সুজা চেয়েছিলেন, কিছু দিয়ে না পারেন—কোনও কিছু কেনার অছিলায় আশরফি ঢেলে দিয়ে তিনি মুবারকের খুন যতটা পারেন মুছে ফেলার চেষ্টা করবেন। এছাড়া আর কোন্ পথে তিনি ছেলে হারানো বাবাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতে পারেন? এখন দেখছেন—সে পথও যে বন্ধ হয়ে যায় যায়। একজন প্রজা যদি শাহী মবারকে কিছু নজর দিতে চায় তো তার দাম দিতে যাওয়া মানে তাকে অপমান করা। সুজাঙ্গীর অস্থির হয়ে পড়লেন। সব রাস্তা বন্ধ।

এমন সময় সাদা পাথরের পাশে দাঁড়ানো মুবারকের বিবি সহবত বা কেতার কোনওরকম তোয়াক্কা না করেই রিনরিনে গলায় বলে উঠল, শাহজাদার পসন্দের তারিফ করি।

সারা উঠোনের আরও অবাক হওয়ার ছিল। না ডাকলে কোনও জেনানা এভাবে এগিয়ে এসে শাহী মবারকে কথা বলে না। এই-ই রেওয়াজ।

উঠোনে দাঁড়ানো মুবারকের আব্বা হুজুর ওস্তাদ রহমত খাঁ বলে উঠলেন, সবেরা—

সবেরা কিছুতেই পিছপাও নয়। শাহজাদা সুজাও অবাক। এই কচি বেওয়াটিকে তাঁর ভাল লাগাও আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

সবেরা বলে উঠল, এ তখত আপনি আপনার ছেলেকে দিয়েছিলেন আব্বা হুজুর। এ তখত ছিল আপনার ছেলের। এখন এ তখত আমার—

কারও মুখে কোনও কথা নেই। অন্দরমহলের চাপা কান্নাও বুঝি থেমে গেছে।

শাহজাদা সুজাঙ্গীর এগিয়ে এসে সবেরার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। সবেরা বারান্দায়। নিচের উঠোনে শাহজাদা। খুব মোহন ভঙ্গিতে হেসে সুজা জানতে চাইলেন, বেশ তো। কত দাম?

সবেরা চোখের পলক না ফেলে একবার শুধু বলতে পারল, দাম?—তারপরই সে এতক্ষণের চেপে রাখা কান্নায় গমক দিয়ে ভেঙে পড়ল।

বারান্দা থেকে গড়িয়ে নিচেই পড়ে যেত সবেরা। সময়মতো শাহজাদা সুজা ছুটে ওপরে উঠে সবেরাকে ধরে ফেললেন। তাঁর দু'হাতের ভেতর মুবারকের বেওয়ার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সুজা বুঝতে পারছিলেন, খুবসুরতি জ্ঞান হারাল। কিন্তু তিনি কী করবেন এখন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সবেরার গা দিয়ে বুনো গন্ধ—হয়তো ধুঁদুলের।

এই উঠোনের বাইরে সুবে বাঙলার মাঠঘাট এখন অন্ধকার। কাছেরই গাছপালা, বসতবাড়ির সঙ্গে একই অন্ধকারে লাকসাম পাহাড়ও মিশে আছে। এই অন্ধকারের নিচেই এদিককার বহতা মেঘনা এখন বর্ষার পর কানায় কানায়।

ওস্তাদ রহমত খাঁ দেখলেন, কখন ধুঁদুলের একটি হলুদ ফুল মুবারকের লাশের ওপর ঝরে পড়েছে। অন্ধকার আস্তে আস্তে সারা হিন্দুস্থানে আসল রাত নিয়ে এল।

ঠিক এমনই এক রাতে রাজধানী আগ্রা তখন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আগ্রা দুর্গে মিলাদ শরিফের মজলিশ তখনও ভাঙোন।

ঠিক এই সময়ে দুর্গের বাইরে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। দু'জনেরই কথাবার্তায় কেমন মনমরা ভাব। দুর্গ থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়া আলোয় একজনকে বেশ লম্বা চওড়াই দেখাচ্ছিল। অন্যজন খানিক মোটাসোটা। দু'জনের কথাবার্তা অনেকটা এরকম—

—শেখজাদা একথা মানতেই হবে—আলী মর্দান আলো দিয়ে সাজিয়েছে কিন্তু চমৎকার! দূর থেকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে—দেখুন।

—আপনি দেখুন। আমার মন ভরছে না শুধু আলোয়। এমন আলো তো আকবর বাদশার আমলেও হয়েছে শুনেছি। জাহাঙ্গীর বাদশার আমলেও তো দশেরা, রাখীবন্ধন, দেওয়ালির রাতে এমন আলোর রোশনাই হতে দেখেছি চন্দ্রভানজি।

—চুপ। চুপ। ওকথা মুখে আনবেন না শেখজাদা। এখন শাহী হুকুমে রসকষ নেই কোনও।

—থাকবে কোত্থেকে! সব রোশনাই এখন শুধু শবেবরাত, মিলাদ শরিফে এসে ঠেকেছে চন্দ্রভানজি। ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া ধরে জাঁহাপনা এগোচ্ছেন। এ আমলে রসিকের জায়গা নেই। বাদশাকে কবিতা শোনাতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম।

—আপনি সেলিম চিস্তির বংশধর। খাঁটি সুফী। ভাবের পাগল মানুষ আপনি। শেখজাদা পাগলা সৈদা বলেই আপনাকে সবাই জানে। আপনি গেছেন এক আকাটকে কবিতা শোনাতে!

—শুনুন না। আমি তো সদ্য সদ্য লিখে নিজের কবিতায় মজে আছি। ভাবলাম—বাদশা যখন ডেকেছেন—সেই সুযোগে পড়ে শোনাই—

—আপনিও যেমন!

—শুনুন না। পড়লাম—

—চিন্তদানী কড়া-ই-গুলেগুন মুসাফ্ফা-ই-জৌহু
হুসন্-রা পরবর-দিগর ওয়া ইশক-রা পয়গম্বরী।

গোলাপের মতো লাল পদ্মরাগমণির লালচে ছটায় জ্বলন্ত সুরা যে কী তা জানা আছে কি? সুরার এই রূপকে জাগিয়ে তোলেন পয়গম্বর—তিনিই প্রেমের দূত।

হারাম শরাবের সঙ্গে আল্লা-পাক—আল্লার রসুল হজরত পয়গম্বরের নাম? জাঁহাপনা শাহজাহান তো খেপে উঠলেন। অনেক কষ্টে বোঝালাম—এই শরাব বাজারি শরাব নয়। দিলের পেয়ালায় ইশক-ই-হাকিকি—আল্লার প্রেম। তাও কি বোঝেন! শেষে গোস্তাকি মাফ চেয়ে তবে বাঁচি।

—আমার কী দশা হয়েছিল তাহলে শুনুন। তবে আপনার সঙ্গে কিছু ফারাক আছে। শাহজাদা দারা তো খুব হাউস করে আমায় কবিতা শোনাবার জন্যে বাদশার কাছে নিয়ে গেলেন। আমিও আপনার মতোই এক সুফীয়ানী কবিতা পড়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম। কবিতার কথা মনে রাখতে পারিনা আমি। ভাবটা এরকম ছিল: কাবা? না, মন্দির? এই দুইয়ের ভেতর সংশয়ে আমি বহুদিন আনাগোনা করতে করতে শেষে মন্দিরেই ঢুকে পড়লাম।

শুনেই তো শাহেনশা আগুন।—এমন বেইমানকে তাঁর শাহজাদা হাজির করেছে? ও কবিতায় তো ইসলামকে অপমান করা হয়েছে। কাফের চন্দ্রভান কাবা শরিফ থেকে বেরিয়ে বুতখানায়—মন্দিরে ঢুকে পড়ল?

ওঃ! নিজের আব্বা হুজুরকে বোঝাতে গিয়ে শাহজাদা দারা তো হিমশিম খেলেন। বড় বড় বুজুর্গ সব এলেন। সবার ঘাম ছুটে যাবার দশা!

শেখজাদা পাগলা সৈদা অন্ধকারের ভেতর মুখ থমথমে করে দুর্গের বাইরে টানা তক্তাপোলের মুখে বসে ছিলেন। নিশুতি রাতে দুজনেরই মাথা, গলা মোটা খসখসে সুফী পশম চাদরে ঢাকা। আকাশে কুয়াশা। তাতে দু'একটি তারার ফুটকি। মাথার ওপরে দুর্গের অলিন্দ থেকে, মিলাদ শরিফের মজলিশ থেকে দু'একখানা বয়েত-এর ভাঙা টুকরো অন্ধকারে এসে ছড়িয়ে পড়ছিল।

পাগলা সৈদা বললেন, চন্দ্রভানজি। আপনি ফারসিতে নামী কবি। সাহসী যোদ্ধা। চন্দ্রভান 'ব্রাহ্মণ' বললে একডাকে আগ্রা-দিল্লি-ইলাহাবাদে সবাই চেনে। আপনার এই দশা। তো সাধারণ মানুষের অবস্থাটা একবার ভাবুন।

কবি চন্দ্রভান অন্ধকারের ভেতর যেন নিজেকেই বলতে লাগলেন। শাহেনশা শাহজাহান নিজেই নিজেকে উপাধি দিয়েছেন—দ্বিতীয় তৈমুর। আবু হানিফার মতো ইমামরা বাদশাকে এই জমানার ইমাম মেহদি বলে তাতিয়ে তুলে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। বাদশাও হই হই করে ইসলামের ত্রাণে নেমে পড়েছেন। আশ্চর্য। হিন্দুস্থান তো এমন ছিল না।

পাগলা সৈদা এবার ফেটে পড়লেন। আকবর বাদশার ইলাহি সাল বাতিল। ফের শাহী দফতরে ইসলামি হিজরি সাল ফিরে এসেছে। মুসলমান বিবি নিলে হিন্দুকে এখন ধর্ম—না হয় বিবিকে ছাড়তে হবে। দেওয়ান-ই-তন দফতরে রাজা মণিদাস রীতিমত ভাল কাজ করছিলেন। এমন উঁচুপদের হিন্দুকে দেওয়ান-

খানায় মুসলমানদের পাছে কুর্নিশ করতে হয়—তাই রাজাকে অন্য জায়গায় বদলি করা হল। রাজা রঘুনাথকে আজীবন উজির সাদুল্লার পেশদস্ত হয়েই কাটাতে হল। টোডরমলের ভাগ্য কোনও হিন্দুর হয়নি। জাহাঙ্গীর বাদশা খেয়ালি মানুষ। ধর্ম ধর্ম বাই উঠলে মন্দির ভাঙার পুণ্য করার বাতিক তাঁর দেখা দিত। নইলে তিনি মন্দির বানাতে বাধা দেননি। শেষ বয়সে ধর্মের রোগ বাড়লে তিনি হুকুম দেন—যেসব মন্দির তৈরি হচ্ছে—সেগুলো যেমন আছে তেমন থাকুক। হিন্দুস্থানের কী হল বলুন তো?

কবি চন্দ্রভান বললেন, ওসব মন্দির বানানো শেষ করতে বাদশা শাহজাহানের কাছে আর্জি পেশ হয়। বাদশার হুকুম—আগে যেটুকু তৈরি হয়েছিল—তাও ভেঙে ফেলো।

কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই। শেখজাদা পাগলা সৈদা ভাবের পাগল। তিনি আস্তে আস্তে নিশুতি রাতের অন্ধকারে গেয়ে উঠলেন—ফারসি কোন বয়েত। যার মানে—সব অন্ধকার করে দিয়ে শেষে খানিক আলো জেবলে আর কী হবে!

কবি চন্দ্রাভান শান্ত গলায় বললেন, এক এক সময় কী মনে হয় জানেন? বাদশা যখন ভাল তো ভালর ভাল। একেবারে বাদশা দারাশুকো। আবার বাদশার যখন ধর্ম ধর্ম বাই উঠল তো বাতিকের একশেষ। তখন তিনি একেবারে বাদশা আওরঙ্গজেব। বাদশা যদি এক আশরফি—তো তার একপিঠ দারা—আরেক পিঠ আওরঙ্গজেব।

এইবার বুঝি মিলাদ শরিফের মজলিস ভাঙল। শেখজাদা পাগলা সৈদা হন হন করে যোগীপুরার রাস্তায় মিলিয়ে গেলেন। কবি চন্দ্রভান ধরলেন গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়ক।

॥ ছেষট্টি ॥

গরমের দিনে আগ্রায় থাকলে শাহজাদা দারার ঘুম ভাঙে খুব ভোর ভোর। কেননা, নারোয়ার জঙ্গলের দিক থেকে পাখির ঝাঁক রাত থাকতেই লোকালয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ডানার সাঁই সাঁই আওয়াজ শুয়ে শুয়েই কানে আসে। আজও সেই একই আওয়াজে শাহজাদার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠতে যাবেন। দেখলেন, নাদিরা বেগম অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

নাদিরার মুখ দেখে শাহজাদার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাগ করে কি ভালবাসা যায়? না, ভালবাসা বিরাট এক চাদর?—যা কিনা একই সঙ্গে নাদিরা আর রানাদিলকে জড়িয়ে নিজেও গায়ে দিতে পারেন দারা।

ঘুমন্ত নাদিরার পাশে আসন করে বসে ভাল করে বেগমের মুখে তাকালেন দারাশুকো। মুহব্বত কি রোশনি—মুহব্বত কি রাহে—পেয়ারের আলো পেয়ারের তীর্থ। নাদিরা ভালবাসার পথ ধরে আমার ভালবাসা পেতে চায়। সাধিকা রাবেয়া নিজেকে ঈশ্বরের দাসী মনে করতেন। দাসীগিরি করে তিনি তার বদলে করুণা আর পেয়ার ছাড়া কিছুই আশা করতেন না। খোদার

কাছে নিজেকে তুলে ধরে তিনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছেন। সাধিকা রাবেয়ার চাহত ছিল : হে ভগবান! তুমি আমায় নরকের ভয় দেখিও না। তোমার প্রেম বুকে নিয়ে—তোমার বিরহ ছাড়া অন্য কোনও ভয় নেই আমার—স্বর্গের মোহে, আমাকে লোভ দেখিয়ো না। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও কামনা নেই। আমার স্বর্গ তোমার নাম। আমার নরক তোমার বিরহ। এখানে বুদ্ধি যুক্তি খাটে না। খোদা! যদি দোজখের ভয়ে তোমার উপাসনা করি তাহলে তুমি আমাকে অনন্ত দোজখে ফেলে দাও। যদি বেহেসতের লোভে তোমার পুজো করি তাহলে আমাকে চিরকালের জন্যে বেহেসত থেকে বঞ্চিত করো। যে সংসারে কিছুই চায় না—সে-ই পূর্ণ। সকিনৎ-উল-আউলিয়ায় কি রাবেয়ার কথা লিখব?

নাদিরাও তো আমার কাছে কিছুই চায় না। চায় শুধু আমাকে। নিতান্ত দীনভাবে। তার বদলে আমিই বা কী দিতে পেরেছি নাদিরাকে? মেবারের রানী মীরাবাঈ কৃষ্ণমূর্তিকে ভালবেসেছিলেন—সর্বস্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। আমি দাসী মীরা। আর আমি রাজমহিষী নই। নই বাদশা-বেগম।

শাহজাদা দারাশুকো খোলা অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। যমুনার চর জায়গায় আলো ফুটি ফুটি। তার ভেতর ঘোড়ার পিঠে রৌশনআরা। আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। নলবনের ভেতর বালি আর সামান্য জলে রৌশন যেন বা চলন্ত মূর্তি হয়ে ছুটছে। পাশে পাশে কমবয়সী এক গোলাম ছুটছে। পাছে শাহজাদী পড়ে যান। পড়লেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। খালি গা গোলামটি রীতিমত তাগড়া। এই ভোরের বাতাসেও নিশ্চয় ঘেমে উঠেছে। রৌশনআরা ঘোড়াকে মারার বদলে হাতের চাবুক গোলামের গায়ে বসিয়ে দিলেন। গোলামটি এমনি আনন্দে —আহ্লাদে লাফ দিয়ে হেসে উঠল। এই-ই বোধহয় রৌশনমহলের গোলামদের শেখানো হয়েছে। রৌশনের সবই আজব। দারা শুনেছেন—তাঁর ছোট বোনটির ভাঁড়ারে সবসময় চারজন তাগড়া মরদ মজুত থাকে। শেকলবাঁধা অবস্থায়। এই-ই নাকি শাহজাদীর দস্তুর।

এখন আগ্রায় ভোরবেলা। ওই গোলামের ভেতর নিজেকে রৌশনের জন্যে তুলে ধরার চাহত থাকলে একদিন যে খোদাতালায় পৌঁছতে পারবে। যদিও ঘুমিয়ে না থাকে তো গোলাম হয়েও নওজওয়ান একদিন বেহেসতে পৌঁছতে পারবে। পিঠে সারা গায়ে চাবুকের দাগ একদিন তিলক হয়ে ফুটে উঠবে। খোদায় পৌঁছতে হলে কিছু না চেয়ে দাস হতে হয়। জ্ঞান হলে ধর্ম হয়—কিন্তু ভক্তি হলেই তবে ঈশ্বর হয়। দাসে ভক্তি থাকে। দাসে সমর্পণ থাকে।

এখন রাজধানী আধখানা আগ্রায়। আধখানা শাহজাহানাবাদে। তবে মাণ্ডি বল, হামাম বল, চক বল—সবই এখনও আগ্রায়। শাহজাহানাবাদ জমে উঠতে শতাব্দীর আরও আধখানা চাই। নয়তো নয়।

ভোরবেলাতেই শাহজাদা দারাশুকো বেরিয়ে পড়লেন। মাণ্ডিগুলো যেন জেগে উঠেছে। যমুনার ওপার থেকে ঘর-গেরস্থালির কাজের মানুষ ভিজে পায়ে এপারে এসে উঠছে। মিশকিনদের দল কিছু খাবারের আশায় কালকের রাতের বাড়তি বাসির জন্যে সরাইগুলোর দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আটজনের

বাহের দলের সুখদোলার ভেতরে বসে সবই দেখতে পাচ্ছিলেন দারাশুকো। রানী হাভেলির দুয়ারে এসে দারা বেরিয়ে এলেন। অমনি পাহারার দল কুর্নিশ করে সরে দাঁড়াল। দারা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখতে পেলেন হাভেলির পেছনে যমুনার চরে আরবি ঘোড়ার দল। দারা জানেন, এরা কোথায় চলেছে। শাহী হুকুমে ঘোড়সওয়াররা তৈরি হচ্ছে—কিল্লা কান্দাহারে এসপার ওসপারের জন্যে। তামাম হিন্দুস্থানের মাথার ঘা এখন কান্দাহার। বাদশা শাহজাহান এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কান্দাহার দেখতে পান।

বেশি ভেতরে যেতে হল না। বারমহলের দেউড়ি পেরিয়েই রানাদিলের দেখা পেলেন দারাশুকো। এ কী চেহারা হয়েছে রানার? চেনাই যায় না। রানাদিল দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে খাঁচার কাকাতুয়াকে আঙুর খাওয়াচ্ছিল। দারার দিকে পেছন ফিরে। একমনে।

শাহজাদা দেখলেন, রানার পায়ের গুছি শুকিয়ে যেন কাঠি কাঠি। কাকাতুয়াকে খাবার দিতে তোলা হাতখানি যেন বা শুকনো গোলাপডাল। এদিককার গালের পাশটি রুক্ষ চুলে এসে পড়ায় ঢেকে গেছে।

দারাশুকো চাতালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, রানা—

চমকে ফিরে তাকাল রানাদিল। তার হাত থেকে রসে টসটসে আঙুরগুলো মেঝেতে পড়ে গেল। চোখে অবিশ্বাসের আলো। আর অমনি কাকাতুয়াটা পরিষ্কার গলায় ডেকে উঠল, দারাশুকো—দারাশুকো—

শাহজাদা বুঝলেন, তিনি গত বছর কান্দাহার পাড়ি দেওয়ার পর রানাদিল এ কাকাতুয়া এনেছে। তাঁর নাম ধরে ডাকাও শিখিয়েছে রানাদিলই। না-জানি কাকাতুয়ার গলায় শাহজাদার নাম ফিরতে শুনে পাহারার সেপাইরা হেসে কতটা কুটিপাটি হয়েছে।

হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে শাহজাদা ফের ডাকলেন, রানা—এসো—

রানাদিল এক পাও এগোল না। মাথা নামিয়ে নিল। দারাশুকো বুঝতে পারলেন না—রানাদিল কাঁদছে? না, আনন্দে হাসছে? না, একদম চুপই করে আছে?

এবার দারা এগিয়ে গিয়ে হাত দু'খানি ধরলেন। কথা বলবে না? এ কী করেছ নিজের? আরশিতে দেখেছ একবার?

এবারও রানাদিল কোনও কথা বলল না। দারা টের পেলেন—তাঁর দু'হাতের ভেতর রানাদিল কাঁপছে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন শাহজাদা। কী হয়েছে? বলবে তো—

—কিছুই হয়নি।

খুবই শান্ত গলা। দারা ভয় পেয়ে গেলেন। কৈফিয়তের গলাতেই বললেন, কান্দাহার কি এখানে। গজনি? সে কতদূরের পথ। শাহী ফৌজ নিয়ে হামলায় বেরুনো যে কী ঝক্কির—সে তুমি বুঝবে কোত্থেকে?

রানাদিল এবার মুখ তুলে বলল, তাতো হবেই! মাসের পর মাস আমি গোয়ালিয়রের দিকের পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। এই বুঝি তুমি ফিরে এলে—

কোথায় ! বর্ষার পর শীত এল। শীতও চলে গেল একদিন। আমি মান্ডিতে মান্ডিতে ঘুরে কিলা কান্দাহারের খবর একটু একটু করে জোগাড় করেছি। তোমার কোনও খবর পাইনি।

—হিরাট, গজনি, জালালাবাদ—সে সব কি এখানে রানা।

জল-ভরা চোখে মুখ তুলল রানাদিল। আমি একা একা আগ্রার এদিক ওদিক করে বেড়িয়েছি। একদিন তো সাকেত ছাউনিতেও গিয়ে হাজির হলাম। যদি কোনও খবর থাকে—

—তুমি আমায় অ্যাতো ভালবাসো রানা ?—বলেও রানাদিলকে সহজ করে তুলতে পারলেন না শাহজাদা। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের জন্যে কাঁদে। পাওয়ার ইচ্ছায় এই কান্না। আবার খোদাতালাকে পাওয়ার জন্যে মানুষ কাঁদে। সে কান্নাতেও চোখের জল থাকে। এই দুই কান্নায় ফারাকটা কোথায় ? মানুষের ভেতর আমরা ঈশ্বর খুঁজি বলেই কি এই কান্না ? তাই কি বুকের ভেতর দুই কান্না একাকার হয়ে গিয়ে এক হয়ে যায়।

দারাশুকো দু'হাতে রানাদিলকে জড়িয়ে ধরলেন। রানাদিল কোনও বাধা দিল না। আবার তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে কোনও সাড়াও দিল না। দারা জানতে চাইলেন, কী হয়েছে ?

প্রথমে কিছুই বলল না রানাদিল। অনেক পরে বলল, তোমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে—আমায় চাও।

—আমি সবসময় তোমায় চাই।

—না শাহজাদা। শুধুই তোমার কাজের ফাঁকে-ফোকরে সময় পেলে তবে তুমি ছুটে আসো।

—কী করব বল। আমি শাহীর কাজ বাদই দিলাম। আমি যে শাদিসুদা ইনসান। আমার বেগম ব্যাটা—দুইই আছে।

—এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে কেন ?

—বাঃ! আমি হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা। আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান তো আমার চেয়েও কম বয়সে পহেলা শাদি করেন।

—অ্যাতোই যদি পিছুটান তো—আমায় নিয়ে আনন্দ করলে কেন দারা !

—আনন্দ !আনন্দ বলে আনন্দ ! তুমি আছো জেনে আমি সারাদিন আহ্লাদে থাকি রানা। সবসময় মনে হয়—তুমি আছো। তুমি আছো। আমার জন্যে তুমি আছো। —বলতে বলতে মনে পড়ল শাহজাদার—এই দুনিয়ায় তাঁকে শুধু দারা বলে ডাকে—কে কে ? এমন করে তাঁর গা থেকে শাহজাদা, সুবেদারের খোলস টেনে খুলে দিয়ে ডাকেন—হিন্দুস্থানের বাদশা, বাজি শাহজাদী জাহানারা—আর রানাদিল। —আর ডাকতেন আম্মিজান—হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম। নাদিরা কোনওদিন আমায় শুধু দারা বলে ডাকেনি। হ্যাঁ ডেকেছেন আরও দু'জন। মিঞা মীর আর মুল্লা শা। রানার গলায় দারা কথাটা এত ভরপুর হয়ে বেজে ওঠে—তখন মনে হয় এই দুনিয়ায় পয়দা হওয়া কত আনন্দের—কত মধুর। পয়দা না হলে অমন ডাকাটি তো শুনতে পেতাম না।

রানাদিলের গলা চিরে গেল। সে বলল, আনন্দ ? কোথায় আনন্দ ?

মেঘ সরে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আকাশের মুখ বদলায়। শাহজাদা জানেন, রানাদিলও মনের ভেতরকার মেঘ বদলে বদলে ঘন ঘন বদলে যায়। তিনি বললেন, বাঃ। তুমি নিজেই তো এইমাত্র বললে—আনন্দ—

—ভুল বলেছি শাহজাদা। তুমি আমাকে নিয়ে যা করেছ—তাকে বলা যায়—ভোগ !

দারাশুকো খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়ানো একটি আনপড় মেয়ের পক্ষে ভোগ কথাটি বেশ জটিল। ওকথা রানার পক্ষে শেখাও বেশ কঠিন। আমি বেশ ক'মাস আগ্রায় ফিরতে পারিনি। এর ভেতর আমায় না দেখে দেখে রানাদিল অনেক শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। ভোগ কথাটার ভেতর অনেক যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। দারাশুকোর বুকের ভেতর ভোগ গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে অতলে নেমে যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, তুমিও তো আমায় ভোগ করেছ রানাদিল। করোনি ?

—তুমি তো নাদিরা বেগমের হাত ফেরত ব্যবহার করা মরদ। আমি তো আগে কোনওদিন এসব করিনি শাহজাদা। তোমার কাছেই আমার যা-কিছু শেখা। আমি আনকোরা। আমার পাতলা কোমর, উঁচু বুক তোমার ভাল লাগে। লাগে না ?

জ্ঞানে আনন্দ থাকে। তাই এতদিন জানতেন শাহজাদা। এখন জানলেন, জ্ঞানে যন্ত্রণাও থাকে। সে যন্ত্রণায় হিংস্র, নিষ্ঠুর সত্যও থাকে। রানাদিল কি তার নিজের শরীরটাকে সম্পত্তি মনে করে ? জায়গীর ? যে জায়গীরের উসুলে জমাও আছে—হাসিলও আছে। নিজেকে শাহজাদার রানাদিলের শরীরের তহশিলদার মনে হল।

সবে সকাল আগ্রায়। বর্ষা চলে গেছে। বর্ষার আকাশের চেয়েও ভারি মনে শাহজাদা আগ্রা দুর্গে ফিরে চললেন। আমি আর রানায় যাব না। রানায় বড় কষ্ট। বড় যন্ত্রণা। যন্ত্রণা আরও বেশি হয়—যখন নাদিরার ঘুমন্ত মুখে তাকাই। এর চেয়ে আমার আল্লাতালাই ভাল। সেখানে সবাই আনকোরা—অথচ কোনও ভোগ নেই। আছে আনন্দ। যে আনন্দে চোখে জল এসে যায়।

শাহজাদার সুখদোলার বাহেরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তেমন তেমনই বলা আছে ওদের। জানান দেবার দরকার নেই—এ সুখদোলায় কে আছেন। সাধারণ দোলার বাহের মতোই ওরা দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়সওয়ারের দল উত্তরে চলেছে। চলেছে বড় কামান। ভাগ ভাগ করে খুলে নিয়ে। আর চলেছে রেঁড়ির তেল, গেঁহু বোঝাই গো-গাড়ির সারি। পয়লা মজুত লাহোরে। তারপর আরও উত্তরে—আরও—

হিন্দুস্থানের আসমানে লড়াইয়ের পাঁয়তাড়ার ধুলো উঠে গিয়ে জমছে। দুনিয়া গড়া বড় কঠিন। ভাঙা সহজ। এমন দুনিয়ায় কী করে যে মিঞা মীর, মুল্লা শার মতন মানুষ পয়দা হন ? আশ্চর্য ! তোমরা আমার হুজুর। তোমরা

আমার আলেম। দিশারী। আমি তোমাদের মুরিদ। আমায় তোমরা পথ দেখাও। না রানাতে শান্তি। না নাদিরায়। আমি তোমাদের জীবনের কথা লিখে যাব। হিন্দুস্থান সেসব মহাজীবনের কথায় ভরভরন্ত হয়ে উঠবে একদিন। ওই যে কামানের গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে খালি গায়ে চানা চিবনো আধপেটা মানুষের দল—ওদের আমি পথের খোঁজ দেব। দু'মুঠো চানার জন্যে এ জীবন নয়। এ-জীবন মহাজীবন। কেউ ফেলে দেবার নয়। কেউ মাথায় তুলে রাখার নয়। সবাই তাঁরই কাছে যাবার রাস্তার পথভোলা পথিক—সালিক। সবাইকে একদিন অন্ধকার পর্দা ছিঁড়ে আলোয় গিয়ে পড়তে হবে। তাঁরই আলোয়।

আমি ফের সেই মধুর—অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি শুনতে চাই। বন্ধ দুয়ার সুখ-দোলার ভেতর শাহজাদা দারাশুকো দু'হাতে দুই কান চেপে ধরলেন। সাধন ক্রিয়ার কথাও লেখা দরকার। আমার পরেকার মানুষ জানুক—এই দুনিয়ায় পথ আছে। তাঁর পথই আসল শাহী সড়ক।

এসবের ভেতর সুবেদারী, হিসারের ফৌজদারী, কোয়েল সরকারের রাহদারী—সব—সবই যেন বোঝা লাগে শাহজাদার। এই দুনিয়ায় আমার চাই নির্জনে বসার সামান্য একটু জায়গা। সেখানে বসে আমি শরীরের নবদ্বার সংযত করে তাঁকেই আমার মন দেব। সে দেওয়ায় কী আনন্দ। আমি ভুল করেছিলাম। এতদিন ভাবছিলাম—রানাদিলের জন্যে আমার আকুলি-বিকুলি—চাহত—রানা-দিলকে দেখতে পাওয়ার আনন্দ—নাদিরার জন্যে কষ্ট—সবই বুঝি ভবঘুরের মতোই আমি বয়ে নিয়ে চলেছি তাঁরই পথের মুসাফির হয়ে। তাঁর পথের সঙ্গে এই দুনিয়ায় ভালবাসার পথ মিলিয়ে বসেছিলাম।

এদিকে দেওয়ান-ই-খাসে বাদশার জরুরি তলব পেয়ে উজির সাদুল্লা খাঁ ছুটে এসেছেন। তিনি ছিলেন দেওয়ানখানায়। ওখান থেকেই মনসবদারদের—বিশেষ করে দক্ষিণের নগদি মনসবদারদের তনখা, বারুদ, গেঁহু, তাঁবু যায়। সারাদিন তাই ফৌজি রসদের যোগানদাররা ভিড় করে থাকে দেওয়ানখানায়। রসদ জুগিয়ে শাহী খাজানাখানা থেকে তারা যে-যার পাওনা গন্ডা বুঝে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কাপজপত্তরে এতক্ষণ জড়িয়ে ছিলেন সাদুল্লা খাঁ। এবার বনজারারা জায়গা মতো রসদ পেঁছে দিয়েই যে যার পাওনা পেয়ে যাচ্ছে। কারণ আর কিছুই নয়। আগ্রার হুকুমে দক্ষিণের বাছাই বাছাই ফৌজ হিন্দুস্থানের উত্তরে চলেছে। নিশানা—কান্দাহার যাতে হাতছাড়া না হয়। তাই তাবত রসদ গিয়ে মজুদ হচ্ছে কিল্লা লাহোরে—আরও এগিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে।

আজ দর্শন ঝরোকায় দর্শন দিতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েই বাদশা শাহজাহান এসে বসেছেন দেওয়ান-ই-খাসে। বসেই উজির সাদুল্লা খাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাদুল্লা খাঁ আগেকার আসফ খাঁ নন। আসফ খাঁ উজির থাকতে আগাম ভেবে নিয়ে জাহাঙ্গিরী আমলে শাহজাদাদের ভেতরেও নাক গলাতেন। হাজার হোক তখনকার একজন শাহজাদা—খুররম তাঁর জামাই ছিলেন। সাদুল্লা খাঁয়ের

তেমন কোনও চোরা টান নেই। তিনি নিয়ম মেনে চলা উজির। তাছাড়া মুঘল শাহী বাড়তে বাড়তে তার কাগুজে চেহারাও বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাদুল্লা খাঁ শাহী কাগজের বাইরে যাবার মানুষ নন।

আগ্রায় এখন বর্ষার পরেকার চাপা গরম। দুর্গের বাইরে ঠা ঠা দুপুর। বাইরের রোদের আলো দুর্গে ঢুকে নরম হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারাটা দেওয়ান-ই খাসে। মাথার ওপরের সোনার সুতোর কাজ করা চাঁদোয়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা সেতুন। সেসব সেতুনের গায়ে বসানো পাথরে পড়েই আলোর এই নরম হয়ে ছড়িয়ে পড়া।

কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই সাদুল্লা খাঁয়ের কাছে শাহজাহান জানতে চাইলেন, তামাম হিন্দুস্থানে সেরা কাপড়ের সুতো কোথায় তৈরি হয় ?

সাদুল্লা খাঁ ঘাবড়ে গেলেন। চারদিকে তাকালেন। ওয়াকেনবিশ কলম হাতে মসনদের কয়েক হাত দূরেই পায়ের কাছে বসে। বাদশার চোখের কোণে লালচে আভাস। সাদুল্লা খাঁয়ের মনে পড়ে গেল। তিনি অনায়াস গলায় বললেন, হরনালা জাঁহাপনা।

—হরনালা কোথায় ?

—হজরত ! সরকার বুরহানপুরের এক ছোট্ট এলাকা হরনালা। বুরহাপুরী তাঁতীদের কাপড়ের নাম সবাই করে। এত ভাল যে মুঘল শাহীর অন্দরমহলের জামদারখানার আঙ্গিয়া, ডোরিয়া সবই ওই কাপড়ে তৈরি হয়। আর সেসব কাপড়ের সুতো হরনালা দেয়। ওখানে এজন্যে শাহী খাস তাঁতও বসানো আছে।

—এই তো ! সবই আপনি জানেন।

একথায় সাদুল্লা খাঁ রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। বাদশা যখন হেসে হেসে কথা বলেন—তখন বুঝতে হবে কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে। একটু বাদেই শাহজাহান কঠিন এক হুকুম হয়ে দেখা দেবেন। তবুও সাদুল্লা খাঁ যেটুকু জানেন তার সবটাই উগরে দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, দক্ষিণের সুবেদারও ওখানে তাঁত বসিয়ে নিজের দরকারি কাপড়, খেলাত, বাদশাকে নজর পাঠাবার সরতাজ, কোমরবন্ধ বরাত দিয়ে বানিয়ে নেন। বুরহানপুরে হরনালার সেরা সুতোয় তৈরি কাপড়ের সবটাই মুঘল খানদানের নিজের ব্যবহারের জন্যে খোদাবন্দ।

বাদশা শাহজাহানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি চোখের পলক না ফেলে কথা বলে থাকেন। যাকে বলেন—তার মুখে না তাকিয়ে—তার পেছনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মুখ থেকে কামানের মতোই কথা দাগতে থাকেন। সে এক অসম্ভব দশা। তাতে যে পড়েছে—সে জানে।

শাহজাহান জানতে চাইলেন, এখন দক্ষিণে সুবেদার কে ?

সাদুল্লা খাঁ বুঝলেন, বড় বিপদ সামনে। তবু যতটা পারা যায় শান্ত গলায় বললেন, হজরত। দক্ষিণে চার সুবার ওপর সুবেদার-ই-আজম বলা যায়—আওরঙ্গজেব বাহাদুর।

—দু'মাসও হয়নি তাকে শেষ কী চিঠি লেখা হয়েছিল ?

একথার সঙ্গে সঙ্গে পলকে সব মনে পড়ে গেল সাদুল্লা খাঁয়ের। জাঁহাপনা যদি বলেন তো দেওয়ানখানায় সে-চিঠির বয়ান আছে। এখুনি নিয়ে আসতে পারি। ইজাজত দেন তো কাউকে পাঠিয়েও আনা যায়।

—তার দরকার হবে না।—বলেই বাদশা বাঁ হাতে ওয়াকেনবিশকে হুকুম দিলেন।

ওয়াকেনবিশ পুরনো পাতাটি বেরই করে রেখেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সেখান থেকে পড়তে শুরু করে দিলেন—

দরবার থেকে বারবার তোমাকে বিশেষ ভাবে লেখা হচ্ছে যে—বুরহানপুরে বাদশাহী তাঁতের অতিরিক্ত আর দু'একটি ছাড়া যেন অন্য তাঁত সেখানে খোলা না হয়।

এখানে দরবার মানে বুঝতে হবে—খোদ বাদশা। এটাই মুঘলশাহীর চিঠি-চাপাটির দস্তুরি। বাদশা আবার বাঁ হাত নাড়লেন। ওয়াকেনবিশ থেমে গেলেন। শাহজাহান বলে উঠলেন, নতুন তাঁত খোলার পর আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—শাহজাদা বাদশাহী তাঁতের সঙ্গে দুশমনির চেষ্টায় আছে—

সাদুল্লা খাঁ বলতে যাচ্ছিলেন—না হুজরত। আওরঙ্গজেব বাহাদুর তেমন কোনও দুশমনির চেষ্টায় নেই। তেমন কোনও মতলবও শাহজাদার নেই। কিন্তু সাদুল্লা খাঁ সেসব কিছুই বলতে সাহস পেলেন না। একবার যখন বাদশার মনে সন্দেহ ঢুকেছে—তখন স্রোতের উলটো মুখে সাঁতরাতে যাওয়া বোকামিই হবে। দাক্ষিণের সঙ্গে আগ্রার এই ভুল বোঝাবুঝি আজকের নয়। এই তো কিছুদিন আগে বাদশা কোত্থেকে জানলেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেব শাহী কাঠ দিয়ে বন্দর সুরাটে একখানা নতুন জাহাজ বানাচ্ছেন। আওরঙ্গজেব বাহাদুর লিখে জানালেন, আমি সুরাট বন্দরে কোনও নতুন জাহাজের ফরমায়েস দিইনি। মোগল খাঁয়ের আমলের একটি জাহাজ সিন্ধুর থাট্টা বন্দরে ভেঙে যাওয়ায় ফকরালা পরগনার লোকদের হাতে পড়েছিল। ওই ভাঙা জাহাজ খালসা-ই-শরিফা বা খাস শাহী সম্পত্তি। বাদশার কাছ থেকে ইনাম হিসেবে আমি ওই জাহাজখানা পেয়েছিলাম। কিছুদিন হল সালামৎ রস নামে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে ভাঙা জাহাজখানা সুরাট বন্দরে আনিয়েছি। ওখানকার মুৎসুদ্দি আমার হুকুমে দরকারি মেরামতি শুরু করেছে। এই মেরামতি যদি বাদশার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় তো কাজ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এখন অব্দি মাত্র কয়েকখানি তক্তা মেরামতিতে ব্যবহার হয়েছে।

অনেকটা এরকমই ছিল সে-চিঠির বয়ান। বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে এটুকুই মনে পড়ল সাদুল্লা খাঁয়ের। শাহজাদা আওরঙ্গজেব সে জাহাজের মেরামতি বন্ধ করে দেন শেষ পর্যন্ত। এক একসময় সাদুল্লা খাঁয়ের মনে হয়—দাক্ষিণে এমন বাহাদুর শাহজাদাকে সুবেদার করে পাঠানো কেন? যদি পাঠানোই হল তো তাঁকে নিয়ে বাদশার মনে সন্দেহের এমন মেঘ জমে ওঠে কেন ঘন ঘন? নওজওয়ান আওরঙ্গজেবই তো বুন্দেলখণ্ডে ঝুঝর সিংকে শায়েস্তা করলেন—তাই বুন্দেল আজ শান্ত। সুবেদারীতে কামিয়াব বলেই তো বাদশা তাঁকে দাক্ষিণে পাঠিয়েছেন। পাঠাবার পর এই সন্দেহ? তবে কি বাদশার মনে কোথাও এমন

এক ধারণা শক্ত হয়ে জমে আছে—যে যায় দক্ষিণে সে-ই আগ্রার দুশমন হয়ে ওঠে! নিজে একসময় হয়েছিলেন বলেই কি? সেদিন শাহজাদা খুর্রম মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতেই দক্ষিণে সুবেদার হয়ে এসেছিলেন। আজ দাক্ষিণে আওরঙ্গজেব বাহাদুর সুবেদার হওয়ায় বিজাপুর গোলকুণ্ডা তো আগ্রার কাছে মাথা নামিয়েছে। তাহলে বাদশা কি আজ এই নওজওয়ান শাহজাদার আরশিতে সেদিন-কার নিজেকে দেখতে পান? দেখতে পান কি আগামীদিনের কোনও বাগীপনাহ্-এর আগাম আভাস?

শাহজাহান সাদুল্লা খাঁয়ের মুখে তাকালেন। জানতে চাইলেন, বুরহানপুরে শাহী তাঁতের দারোগা কে এখন?

—মীর নসির।

—কোন মীর নসির?

—দরবারি হাসি-মশকরায় খুব নাম ছিল—সেই নসিরা।

শাহজাহানের মুখে হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন, ও, সেই নসিরা! খুব হাসাতো বটে। শাহী তাঁতের দারোগাগিরি করেও সে এখন দক্ষিণী সুবার ওয়াকেনবিশ।

—সেইভাবেই নসিরাকে আপনি দক্ষিণে পাঠিয়েছেন। শাহী তাঁতের দারোগাগিরি করবে আবার দক্ষিণে সুবেদারীর হালচালও আপনাকে জানাতে পারবে।

—'হুঁ' বলে গুম হয়ে গেলেন বাদশা। সারা দেওয়ান-ই-খাসে কোনও শব্দ নেই আর। খানিক পরে বাদশা নিজেই বললেন, বুরহানপুরে পৌঁছেই নসিরা কিছু শিকায়ত পাঠিয়েছে।

—হজরত! মীর নসিরের অভিযোগের বয়ান দেওয়ানখানায় পাঠানো হয়েছে। পেয়েই আমি আপনার হুকুম মতো শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে সেসব শিকায়েতের কৈফিয়ত চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।

—জবাব এসেছে?

—হ্যাঁ হজরত। শাহজাদা আমাকে লিখেছেন। আমার সঙ্গেই আছে—বলে উজির সাদুল্লা খাঁ তাঁর কোমরবন্দ থেকে একখানি গোটানো কাগজ বের করতে করতে বললেন, আপনাকে দেখাব বলেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি—

শাহজাহান কাগজখানি হাতে নিলেন। সুবে খান্দেশে এমন কাগজ পাওয়া যায়। তাতে পরিষ্কার শিকস্তা ভঙ্গিতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব লিখেছেন—

মীর নসির বাদশার কাছে শিকায়ত এনেছে—আমার কর্মচারীরা বুরহানপুরের বাদশাহী তাঁতের জন্যে দড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম জোগাতে অবহেলা করে। মীর নসিরের অভিযোগ আর এই অশোভন ব্যাপার সম্বন্ধে খোঁজ করে যাতে এমন আর ফের না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে বাদশা আমাকে হুকুম দিয়েছেন। আপনি জানেন, মীর নসিরের লেখা ব্যাপার আর বাদশার কাছে আমার কর্মচারীদের গাড়িমসি কল্পনারও বাইরে। আমার কর্মচারীদের সম্বন্ধে যে যা লেখে বা বলে তাই-ই বিশ্বাস করে ওসব ব্যাপারের জন্যে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করাই

যদি এখন দরবারের নিয়ম হয়ে থাকে—তবে সেখানে আমার কিছু বলার বা লেখার কোনও মানে হয় না।

পড়তে পড়তে শাহজাহান নিজের মনে মনেই বললেন, পাকা বাঁধুনি!

— অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে—তাতে যতদিন হরনালা আমার জায়গীরের ভেতরে আছে—ততদিন এই ঝগড়া শেষ হবার নয়। কেননা হরনালাতেই সবচেয়ে ভাল সুতো পাওয়া যায়। শাহী তাঁতখানার দারোগার মনগড়া মিথ্যে শিকায়তও দরবারে বেশ বিকোয়—তাই সে কখনওই শিকায়ত জানানো বন্ধ করবে না। সে দড়ির মামলায় রং ফলিয়ে তার সঙ্গে আরও দু'চারটে মিথ্যের ভাঁজ দিয়ে আমার ওপর বাদশার মন বিষিয়ে দেবে।···যদি বাদশার হুকুম হয় তো হরনালাকে খালসা-ই-শরিফা বা বাদশাহী খাসমহলের সামিল করে আমি পাইনঘাটের দেওয়ানের দখলে ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তার বদলে অন্য জায়গা নিতে পারি। তাহলেই বাদশাহী তাঁতখানার দরকারি সরঞ্জাম দারোগার মর্জিমাফিক পাওয়া যাবে। দারোগার মিথ্যে আর চুকলির রাস্তাটাও বন্ধ হবে। বাদশা মবারকে সরেস কাপড় তৈরি হবে—শুধু এজন্যেই আমি এখানে তাঁতখানা খুলেছি। যদি তিনি চান তো আমি নিজের তাঁতখানা বন্ধ করে দিতে পারি। এসব কথা আশা করি আপনি বাদশার কানে তুলবেন।

উজির সাদুল্লা খাঁকে লেখা চিঠি পড়া শেষ। এবার বাদশা সাদুল্লা খাঁয়ের মুখে তাকালেন। এই উজিরকে আমার শাহজাদারা এত লম্বা লম্বা চিঠি লেখে। আমায় লেখে না। আমি একজন আব্বা হুজুর। কিন্তু বাদশা। শাহজাদাদের চিঠির ভাষায় আব্বা হুজুর হয়ে দাঁড়িয়েছি এখন—দরবার নয়তো বাদশা। আমার মনে কোনও চাহত নেই? নেই কোনও প্রার্থনা? আছে শুধু হুকুম। নয়তো—ইচ্ছা। যা কিনা আসলে সেই হুকুম!

শাহজাহান মুখে বললেন, এই চিঠি বেশ আঁটঘাট বেঁধেই লেখা।

—শাহজাদা এই অল্প বয়সে একজন কামিল সুবেদার তো বটে। তিনিই তো এমন চিঠি লিখবেন হজরত।

—উঁহু। আমার তা মনে হয় না—

উজির সাদুল্লা খাঁ তাকিয়ে রইলেন।

বাদশা বললেন, আমার তো মনে হয় এমন পাকা বয়ানের চিঠির পেছনে সেই ইরানিটা আছে—

—কার কথা বলছেন জাঁহাপনা?

—দক্ষিণে সুবেদারের সেই দেওয়ান—

—ওঃ! মুর্শিদকুলী খাঁ। না বন্দেগান। আমার মনে হয় এমন জোরাল অথচ সরল চিঠির বয়ান শুধু আপনারই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরেরই হতে পারে। হাজার হোক আপনারই খুন তাঁর বদনে বয়ে চলেছে। নয়তো এ বয়ান তিনি কোথায় পেতেন?

বাদশা শাহজাহানের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি খুব শান্ত গলায় বললেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে লিখে পাঠান—বুরহানপুরে তার তাঁতখানা আপাতত

বন্ধ করে দিক।

উজির সাদুল্লা খাঁ চমকে তাকালেন বাদশার মুখে। মুখে কিছু বলতে পারলেন না। বাদশার মুখের কথাই হুকুম। হিন্দুস্থানে শেষ রায়। কিন্তু এভাবে দক্ষিণের সুবেদারের বসানো তাঁতখানা বন্ধ করে দেওয়ার মানে তো শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে দিনের আলোয় টেনে এনে সবার সামনে বে-ইজ্জতি করা।

কোনও কথা না বলে সাদুল্লা খাঁ পিছোতে পিছোতে কুর্নিশ করে দেওয়ানি-ই-খাসের এক সেতুনের আড়ালে মিলিয়ে গেলেন। একটু পরেই ওয়াকেনবিশ ও উঠে গেলেন বাদশার হাতের ইশারায়।

এবার দেওয়ান-ই-খাসে একেবারে একা বসে আছেন বাদশা শাহজাহান। তিনি দুপুরের আগ্রার চড়া রোদকে রঙিন নরম আলো হয়ে দেওয়ান-ই-খাসের পাথরে পাথরে ছড়িয়ে পড়তে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, ইয়া আল্লা! তেরি রেজা! সবই তোমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছাই তোমার হুকুম। তোমার ইচ্ছাই তোমার দুনিয়া জোড়া ফরমান।

সমরখন্দে কানিবুলে বাগে ফোয়ারা বসিয়ে তৈমুর তাঁর ছয় নাতিকে একই সন্ধ্যায় বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল—সেই ছয় নাতি দুনিয়া ভাগ করে নিয়ে যে যার শাহী চালাবে। দেশে দেশে উড়বে মুঘল ধ্বজ।

আমিও চাই—দারা, সুজা, আওরংগজেব, মুরাদ—চার ভাই মিলেমিশে একদিন হিন্দুস্থানের শাহী চালাক। কিন্তু সবই সেই তৌহিদের ইচ্ছা। দারাশুকো ফকির-দরবেশ নিয়ে মেতে আছে। তার সুবেদারী কে দেখে! সুবায় সুবায় নায়েব নাজিমরাই সুবা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুজাংগীর সেই যে বাংলায় গেল—আর ফেরার নাম নেই। তার দুই শখ। শিকার আর আওরত। মুরাদ যেন বা বুনো তিতির। সবসময় চোখ লাল করে আছে। ঝুঁটিটি বাগিয়ে। আর থাকল আওরংগজেব। সে যে আমারই মতো চিঠি লিখছে। যেমনটি আমি একসময় জাহাঙ্গীর বাদশাকে লিখতাম। বাগী হওয়ার ঠিক আগে।

॥ সাতষট্টি ॥

দু'জন তাতার বাঁদি নিয়ে নাদিরা বেগম খানিক আগে নাহান্-এ ঢুকেছেন। বাঁদিরা শাহজাদা বেগমকে মুলতানি মাটি দিয়ে আগাগোড়া ঘষবে। বারবার গরম জলের ধোঁয়ায় সারাটা শরীর ভাপিয়ে হালকা করে তুলবে। শেষে ইস্পাহানি আতর মাখিয়ে নাদিরা বেগমের গায়ে তারা সাদিয়া, ডোরিয়া তুলবে। সাত বছরের সুলেমান শুকো নিহাদ বানুকে কোলে নিয়ে দুর্গের নিচে রাজধানী আগ্রা দেখাচ্ছে। নিহাদের এক বছরও হয়নি। সে কিছুই বোঝে না। আমি লিখছি দেখে ওদের ছেড়ে রেখে নাদিরা বেগম আজ সকাল সকাল নাহান্-এ ঢুকেছে। নাহান্ থেকে বেরবে পরীটি হয়ে। আমারই জন্যে। শুধু আমারই জন্যে।

একথা ভেবে লিখতে বসা শাহজাদা দারাশুকোর খুব অপরাধী লাগল নিজেকে। আমি নাদিরার চোখ এড়িয়ে কখনও আফগান ওমরাহ্, কখনও বা

ইরানি ঘোড়া ব্যাপারীর জাল সাজিস নিয়ে রাজধানীরই আরেক প্রান্তে চলে যাই। রানী হাভেলিতে। রানাদিলকে দেখতে। রানাদিলের সঙ্গে থাকতে—সময় কাটাতে। সেই আমারই জন্যে আরেকজন সুন্দরী থেকে আরও সুন্দরী হয়ে উঠতে এইতে ঢুকেছে। যেমন কি না আমিও যে জাল সাজিসই নিয়ে রানী হাভেলিতে যাই না কেন—আমারও খেয়াল থাকে—ওই সাজে যেন আমায় সুন্দর দেখায়—নওজওয়ান লাগে।

শাহজাদার সামনে সকিনৎ-উল-আউলিয়ার কাগজের থাক। পাতায় পাতায় কাদিরীদের কথা লেখা। দারা দেখলেন, বাঁদি এসে নিহাদ বানুকে কোলে করে নিয়ে গেল। সুলেমান শুকো খোলা অলিন্দে দাঁড়িয়ে নিচের আগ্রা দেখছে। আগ্রা দেখা কখনও কারও ফুরোয় না।

আমি যেভাবে খোদার সামনে নিজেকে তুলে ধরি—আমার জন্যে নাদিরার চাহাত-এর ভেতরেও কি সেই একই তুলে ধরা থাকে? যেমন কিনা নিজেকে আমি রানাদিলের সামনে তুলে ধরি—রানার জন্যে আমার চাহাত-এর ভেতরেও কি সেই একই তুলে ধরা থাকে?

সকিনাৎ-উল-আউলেয়ায় দারা গুরুর গুরু দাদাপীর মিঞা মীরের জীবনী ছাড়াও তাঁর মুরিদদের কথা লিখেছেন। এই কাদিরী ধারার সুফীদের কথা বলতে গিয়ে শাহজাদা চিস্তি, নকশাবন্দীদের কথাও বলেছেন। রমজানের পর এখন দুপুরঘেঁষা রোদ রাজধানী আগ্রাকে খাক করে দিচ্ছে। আমি এই লেখায় পীর-ই-পীরান মিঞা মীরের মুরিদদের দু'ভাগে ভাগ করেছি। যাঁরা সকিনৎ-উল-আউলিয়া লেখার আগেই মারা গিয়েছেন—তাঁদের কথা এক ফিরকায় রেখেছি। অন্য ফিরকায় রেখেছি তাঁদেরই কথা—যাঁরা এই সকিনৎ-উল-আউলিয়া লেখার সময় বেঁচে আছেন।

জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন, খোদাতালা তোমাকে এই পথ দিয়ে এনেছেন, অপরাধীর মতো তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে নয়—বরং অতিথির মতো তোমার ওপর মেহেমানির মেহেরবানি করাই তাঁর ইচ্ছে। কাদেরিয়ার রাস্তা বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়া নয়। এ পথে কঠোর সন্ন্যাসের অগ্নিপরীক্ষা নেই। প্রেম-ভালবাসা, দিলদারি, আয়েস, অখণ্ড আনন্দই এই রাস্তার রাহীর নিত্যসম্পদ।

শাহজাদা কাদিরী হবার পর, লক্ষ্য করেছেন, ইসলামের বাইরের দিক দেখে আর তাঁর মন ভরে না। আমার কথাবার্তা কাদিরী পীরদের মতো হয়ে উঠেছে। কাদিরীরা ছাড়া আমাকে অন্য কিছু আকর্ষণ করে না। খোদাতালার দিকে এই পথে এগিয়ে যেতে যেতে আমি পূর্ণ হয়ে উঠছি। আমি এ-পথে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে গেছি।

শাহজাদা হঠাৎ দেখলেন, তাঁর সাত বছরের ছেলে সুলেমান শুকো কখন দুর্গের কোন ঢাকা পথে মিলিয়ে গেছে। এখন অন্দরমহলে কেউ নেই। এখন তাঁর সামনে শুধু সকিনৎ-উল-আউলিয়ার কাগজের থাক। এই দু'বছর ধরে লেখা এখন ভাল করে বাঁধাই হলে তবে মুরাক্কার চেহারা পাবে। হাতে নিয়ে পড়তে সুবিধা হবে তখন। আগামী দিনের মানুষ জানবে—কাদিরী ধারার দাদা-পীর

মিঞা মীরের কথা। তাঁর মুরিদ মুল্লাশার কথা।

শাহজাদা উঠে দাঁড়ালেন। খোলা অলিন্দে এসে দেখলেন—যমুনার ওপারে তাজমহলের চারদিকের মিনার মাথা ঠেলে উঠেছে। সূর্য আগুনের গোলা হয়ে সেদিকে সামান্য ঢলেছে। আমি শাহজাদা দারাশুকো। আমি এখন আঠাশ। আজ আমার সাকিনৎ-উল-আউলিয়া লেখা শেষ হল।

শাহজাদা আজ প্রায় দু বছর ধরে এ-লেখা লিখে আসছিলেন। এখন মনে হচ্ছে—কী যেন নেই। কী যেন নেই। বড় হালকা লাগছে। শরীরের একটি দিক যেন নেই। কোন দিক্? দারার মনে হল—যেন বা ডানদিকের হাতই নেই। পা নেই। চোখ নেই।

হঠাৎ নিচে তাকিয়ে শাহজাদা ঝুঁকে পড়লেন। অন্দরমহলের এই আড়াল ছাড়া অলিন্দ থেকে দেওয়ান-ই-খাসের লাগোয়া মতিবাগ দেখা যায়। বাজি শাহজাদী জাহানারা এই দুপুরবেলা ওখানে কী করছেন?

ভাল করে দেখার জন্যে দারা একটু সরে এসে দাঁড়ালেন। বেদানা গাছের চিকন চিকন পাতার ছায়া ফুলকারি কাজের মতোই বাজির গায়ে পড়েছে। তিনি একা গাছতলায় বসে। তাঁর চোখ খাক হয়ে জ্বলে যাওয়া আসমানে। শাহজাদার বুক থেকে একটা ভারি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমার আকবরের বিধান উলটে দেওয়ার কথা। আমি এখনও কোনও লড়াইয়ের মতো লড়াই ফতে করিনি যে, কথাটা আব্বা হুজুরের সামনে পাড়ব। সামনে আবারও কান্দাহার। দেখা যাক কী হয়। সবই তাঁর ইচ্ছা। বাজি কি ছত্রশালের কাছ থেকে অনেকদিন কোনও চিঠি পাননি?

জাহানারা জানেনও না—তাঁর প্রাণের ছোট ভাই ওপর থেকে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। একটি ব্যাপারে দারা অবাক হলেন। এখন তো বাজির ওখানে থাকার কথা নয়। এখন দুপুরবেলা। সূর্য আরও খানিকটা ঢলে পড়লে তবে আব্বা হুজুর খেতে বসবেন। তাঁর শখের খাবার-দাবার তো বাজির দেখাশুনোয় তৈরি হয়ে থাকে। এই সময়টায় বাজি আবদারখানায় ঘোরাফেরা করেন। আব্বা হুজুরের প্রিয় পোলাউ, মালঘোবা দমপোক্ত—সবই বাজি দেখিয়ে দিলে তবে রসুইকাররা রান্না করে।

শাহজাদার মনে হয়—আগ্রা দুর্গে সবই আছে। হৃদয় নেই। বাজি আব্বা হুজুরের খাওয়া দাওয়া দেখবেন—আব্বা হুজুরের রঙ্গতামাশায়, শলাপরামর্শে থাকবেন—অথচ তাঁর মন কী চায়—তা কি একবার হিন্দুস্থানের বাদশা চোখ তুলে দেখতে পারেন না?

শাহজাদার চোখ পড়ল লাহোর যাবার রাস্তায়। সে-পথে এই রোদের ভেতর ঘোড়াদের গা ভিজে গিয়ে পিঠের রং ঝকঝক করে উঠেছে। রাজা যশোবন্ত সিংহের ঘোড়সওয়াররা চলেছে লাহোর। কান্দাহারের জন্যে পাঁয়তারা। কান্দাহার! উঃ! কান্দাহার! হিন্দুস্থানের বুকে বিষফোঁড়া এই কান্দাহার। একশো বছরের বিষফোঁড়া। সেই পরদাদা আকবর বাদশার আমল থেকেই আছে।

এই শাহী—এই আগ্রা দুর্গের দরবারি ওমরাহের দল, সুবেদার, মনসবদার, জায়গীরদার—বিশাল ফৌজ—ঘোড়সওয়ারের দল—সবই দারাশুকোর মনে হয় বিশাল এক জুলুমের মৌরসি ব্যবস্থা।

আগ্রা বা শাহজাহানাবাদ নামেই রাজধানী। আসলে তো ফৌজি ছাউনি। ফৌজের দরকারেই এখানে সব কিছু। দোকানপাট। লোকলশকর। মাণ্ডি। সরাইখানা। সব। সবই ফৌজ চাহিদা বুঝে গড়ে উঠেছে। মুঘল কথাটা এখন শুধু নামেই আছে। হিন্দুস্থানের বাইরে থেকে সাদা রঙের মুসলমান কেউ এলেই সে মুঘল। হোক না সে তুর্কি! কিংবা ইরানি! অবশ্য ফিরিঙ্গিদের কথা আলাদা। তারা আর ক'জনই বা!

নসিব ফেরাতে আসা কিছু লোক আস্তে আস্তে দরবারে আমির হয়ে ওঠে। এই ওমরাহদের মাসোহারা নির্ভর করে বাদশার মর্জির ওপর। মর্জি হল তো বাদশা মাসোহারা বাড়িয়ে দিলেন। আবার কমিয়েও দিতে পারেন বাদশা। তাই মেনে নেয় দরবারের ওমরাহরা। এরাই ঠাটে বাটে শাহীর একটা ছবি তুলে ধরে জনমনে। কতগুলো ফাঁপা মানুষ। এক একজনের গাদাগুচ্ছের বিবি। দেনার দায়ে জেরবার। তবু ঠাটে থাকা চাই। বিরিয়ানি। আতর। বছরে দু'বার বাদশাকে ভেট পাঠাতে হয় ওদের। ভেটে টান পড়লে আমিরি যায়। এই তো শাহী! এরা বেশিরভাগই আফগান, ইরানি, উজবেগ, তুর্কি। মারা গেলে ওদের বিবি বাচ্চা পথের ভিখারি। কেননা, সারা হিন্দুস্থানে বাদশাই সব সম্পত্তির মালিক। সেই ওমরাহই বুদ্ধিমান—যদি সে বেঁচে থাকতে বাদশাকে ধরে তার ছেলের জন্যে একটা কোনও কাজ জুটিয়ে দিতে পারে।

রাজপুত রাজারা আগ্রাকে মেনে নিয়ে যে যার রাজত্বে এক একজন বাদশা। বাইরে থেকে হামলায় লড়াইয়ে আগ্রাকে ঘোড়সওয়ার জুগিয়ে যাওয়াই ওদের কাজ। হিন্দুস্থানের ভেতর লড়াই হামলাতেও এরা ফৌজ নিয়ে বাদশার পাশে এসে দাঁড়ায়। সেজন্যে বাদশাকে আশরফি যুগিয়ে যেতে হয়। দারার এক একসময় মনে হয়—সারা হিন্দুস্থানের সবরকম কাজকর্ম চলে ফৌজি দরকারে—স্রেফ ফৌজি দরকারে। এর ফাঁকে-ফোকরে কিছু ছবি আঁকা—কিছু গানবাজনা। এখানে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই। দম নেবার বাতাস নেই। দম নিতে হলে যেতে হবে কিষেণগঙ্গার তীরে পাহাড়ি গুম্ফায়—মুল্লাশার খানকায়। সেখানে অদ্ভুত মধুর এক গান ভাসে। সে গানের কথা বোঝা যায় না। সুরে দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। পা নাচ তুলে নেয় পাথর থেকে।

নসিবের কী অদ্ভুত খেলা! হিন্দুস্থানের মুঘলশাহীর ভেতর সবচেয়ে তাগদদার ইনসান হলেন বাদশা শাহজাহান। তিনিই তাগদের ফোয়ারা। তাঁরই পহেলা শাহজাদা হয়েও আমি এই ফাঁপা জুলুমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। বরং বলা যায় আমিও এই জুলুমি থেকে ফয়দা লুটি। সুবেদারি! শাহজাদিয়ানা! আমার এই সব কিছুতেই ওই ফাঁপা জুলুমি আশরফি জুগিয়ে চলেছে।

শাহজাদা দারাশুকোর মনে হল—এ জীবন নিয়ে আমি কী করব? শাহীর পহেলা শাহজাদা হয়ে আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশার শাহী খোয়াবের হাত ধরে চলতেই হবে। বাজি দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। পাছে মসনদ নিয়ে আরও দাবিদার বাড়ে, তাই মুঘল শাহজাদীর শাদিতে বারণ। বাঃ! মুঘল শাহজাদীর আব্বা হুজুর শাদিসুদা তো বটেই—তার জন্যে এর পরেও রয়েছে হারেম। শাহজাদাদেরও কোনও অসুবিধে নেই। যত বাধা শাহজাদীর বেলায়—।

আমি জানি সুলতান-উল-আযকর, হবস্-ই-দম্ আমায় অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যায়। সেই দুনিয়ায় মধুর শব্দ করে অবিরাম ঘণ্টা বেজে চলেছে। কিন্তু সেখানে আমার যাবার উপায় নেই। আমাকে ঘিরে যে বাদশার প্রচুর আশা। বিশাল সব খোয়াব। আমি সেই সব খোয়াবে একটি ঘটি মাত্র। শাহজাদা নই। সুবেদার নই। আওলাদ নই। এমনকি ইনসানও নই। স্রেফ ঘটি। মুঘলরা প্রবল ইচ্ছায়—প্রচণ্ড সাহসে—ঘামাসান লড়াই'যর ভেতর দিয়ে নিজেদেয় খোয়াব ফতে করে তোলে। আমি সেই ফতেবাজির বারুদের খাবার মাত্র।

দক্ষিণে চার সুবার ওপর সুবেদার-ই-আজম হয়ে আছে আমারই ছোটো ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর! সেদিন দরবারে কোন্ এক ওমরাহ বলছিলেন, আওরঙ্গজেবের নাকি এই সুবেদারিতে মন নেই। তার মন পড়ে আছে মক্কায়। ওমরাহ কী কাজে যেন দৌলতাবাদে যান। সেখানে সুবেদার-ই-আজম আওরঙ্গজেব তাঁকে বলেছে—আমার মন পড়ে আছে ফকিরিতে। এ সুবেদারি আমার না-পসন্দ।

শাহজাদা দারাশুকোর মনে অন্য এক দারা উঁকি দিল। নর্মদার ওপারে খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা, আমেদনগর—চার সুবার মাথার ওপর বসে আওরঙ্গজেব কী করছে? কী-ই বা করছে ওর সেই ইরানি দেওয়ান মুরশিদকুলি খাঁ? সারা শাহী জুড়ে মৌরসি জুলুমের সবচেয়ে খুশি সাগরিদ আওরঙ্গজেব। আর সে কি না বলে সুবেদারি ছেড়েছুড়ে দিয়ে ফকির হয়ে যাবে! মক্কা চলে যাবে।

বাহারে কিসমত! আমি ইসলামের বাইরেকার জাহিরী থেকে মুক্ত হয়ে খোদাতালার কাছে যাওয়ার পথের মুসাফির হয়ে দিনরাত ভাবছি—এই শাহী আমার বুকে পর্বত হয়ে চেপে বসেছে। বসছে। কবে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। আর আওরঙ্গজেব বাহাদুর চার সুবার ওপর মনের সুখে সুবেদারি করে স্রেফ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মজে থাকছে—আর বলছে—ফকিরি নেব। বাঃ!

এসব ভাবলে মনটা বিষিয়ে ওঠে। অথচ মন রাখা চাই সাদা আসমানের মতোই। নইলে সেখানে সেই ভালবাসার খোদাতালার ছায়া তো পড়বে না।

একটা ছবি দেখে শাহজাদার ভারি মন হালকা হয়ে এল। গোয়ালিয়রের দিককার রাস্তা দিয়ে কালো লম্বা পাঁচজন মানুষ আসছে। হাড় জিরজিরে গোগাড়ি চড়ে। ওদের গায়ের জামাকাপড় দেখে কে বলবে ওরা হাবসি বাদশার তরফে ইলচি হয়ে শাহজাহান বাদশার দরবারে ভেট নিয়ে দেখা করতে এসেছে।

একেবারে ভিখারির দশা। গোগাড়ির পেছন পেছন জনা দশ গোলাম হেঁটে আসছে। হাবসি দেশ থেকে ওদের সঙ্গে করে আনা হয়েছে।

গত ক'দিনই হাবসি দেশের এই ইলচিরা আগ্রায় হাসি-মশকরার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। হাবসি বাদশা ওদের নগদ কিছু না দিয়ে জনা বত্রিশ গোলাম বাঁদি সঙ্গে দিয়ে হিন্দুস্থান পাঠান। বলা ছিল—মক্কায় গোলামদের বেচে দিয়ে যা পারে তাই নিয়ে বসরা থেকে সুরাটের ব্যাপারী জাহাজ ধরবে। মক্কায় নাকি ওরা দর পায়নি। তাই গোলাম বাঁদিদের নিয়ে সুরাটের জাহাজে ওঠে। বাদশা শাহজাহানের জন্যে ভেট হিসেবে সঙ্গে ছিল কয়েকটি তাগড়া জেব্রা, হাতির দাঁত আর ষাঁড়ের শিং। জাহাজে খেতে না পেয়ে কিছু জেব্রা মারা যায়। চামড়া ছাড়িয়ে রেখে তাদের দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হয়। ফেলে দেওয়া হয় কিছু গোলামকেও। তারাও না খেতে পেয়ে মারা যায়। অবশ্য গোলামদের চামড়া ছাড়িয়ে রাখা হয়নি।

মানুষ নিয়ে কী ভয়ঙ্কর হিংস্র ব্যবসা। দারা আর যা শুনেছেন—তা হল —সুরাটে নেমে হাবসি বাদশার এই ইলচিরা বাকি গোলামদের নিয়ে হাঁটাপথে আগ্রা এসে হাজির হয়েছে। এখন মুশকিল দেখা দিয়েছে—বাদশা শাহজাহান এদের ইলচি বলে বিশ্বাসই করছেন না। কেননা, অনেক সময় নসিব ফেরাবার মতলবে জাল ইলচি এসে হাজির হয়। যাবার সময় যা ভেট পায় তাই বেচে দিয়ে হিন্দুস্থানের বাজার থেকে সুন্দরী বাঁদি কিনে নিয়ে ফেরে। ফেরার পথে চড়া দরে বেচে দিয়ে তারা নিজের দেশে ফিরে সুলতানি ফলায়। এদের কেনাবেচায় কোনও শুল্ক নেই। তাই সবটাই লাভ বলা যায়।

হাবসি দেশের ইলচি একবার শাহজাদাকেও বলেছিলেন, রেখে দিন না ক'জন তাগড়া হাবসি গোলাম। দরকার মতো এদের খোজা করে নিতে পারবেন। পাহারায় খুব জুতসই হবে। শাহজাদা শিউরে উঠেছিলেন। তিনি এসব নৃশংস ব্যাপারে নেই।

হাবসি ইলচির সে কী ঝুলোঝুলি। এই আটটি গোলাম—আপনার মবারকে আমাদের সামান্য নজর। আপনি বাদশার সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দিন।

শাহজাদা গোলামদের দেখছিলেন আর ইলচির কথা শুনছিলেন। গোলামে ইলচিতে পোশাকে বিশেষ ফারাক নেই। দু'তরফেরই গায়ে কিছু নেই। কোমরে কুর্তা ছেঁড়া। একবার মনে হয়েছিল দারার—হিন্দুস্থানে আসার পথে না খেতে পেয়ে মরেনি বলে এই গোলামরা এখনও বেঁচে। মরলে কি এদেরও গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বাকিটা দরিয়ায় ফেলে দিত ইলচিরা? যেমন দিয়েছে জেব্রাগুলোর।

দারা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। কে বলবে এরা ভিন দেশি শাহের ইলচি! দেখতে ভিখারির মতো। বাদশার মবারকে এদের নজর দেবার জিনিস বলতে জেব্রার কিছু চামড়া, ষাঁড়ের একজোড়া বিশাল শিং, হাতির দাঁত আর জনা কয়েক হাবসি গোলাম।

ভেট, নজর—এসব নিয়ে মানুষের কী হিংস্র, লোভী রেওয়াজ। এসব নিয়েই তো শাহী। আর আমিও সেই শাহীর একজন শাহজাদা। শুধুই শাহজাদা নয়,

আমি একজন সুবেদারও বটে। বাদশার আদরের ফৌজদার-ই-হিসার।

গোলামরা আমার দিকে তাকিয়ে। যদি আমি ওদের ভেট হিসেবে নিতে রাজি হই তো বর্তে যায়। অন্তত দুটো খেয়ে বাঁচে। আমি ভাবি—আমার কী এত আছে যা পাহারা দিতে ওদের প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে খোজা করতে হবে।

রানাদিল ঠিকই বলেছিল। এস দারা—আমরা রাস্তায় নামি। রাস্তায় মানুষের ভিড়ে নাচতে নাচতে মিশে যাই। ওই ভিড়ের ভেতর কোনও শাহী নেই। নেই শাহজাদা। মাথার ওপর আসমান। আর নিচে পায়ে ঘুঙুরের বোল। পা নাচে মেতে উঠবে। নাচ কি রানাদিলের কোনও এবাদত? উপাসনা? যা দিয়ে রানা তার শরীরকে—শরীরের সুরকে প্রার্থনার মতো তুলে ধরে?

শুধু তাগদ, চতুর বুদ্ধির জোরে কেউ যদি কোনও দেশের সর্বেসর্বা হন—তো সে দেশে মগজের জায়গা কোথায়? কোথায় জায়গা হৃদয়ের? ভক্তির? ভালবাসার? পরদাদা আকবর হয়েছিলেন বাদশা। কোনওরকম পড়াশুনো ছাড়াই। কিন্তু এই দুনিয়াই ছিল তাঁর আলেম। দিশারি। তিনি যেমন ছিলেন তাগদদার—তেমনি মগজদারও বটে। দুশমনকে দুরস্ত করেই তাকে তিনি বানিয়ে নিতেন চিরদিনের দোস্ত। যা তিনি জানতেন না—তা তিনি জেনে নিতেন সেরা মগজ থেকে। বড় কবি, বড় রসিকরা ছিলেন তাঁর সব সময়ের বন্ধু। বই পড়ে শোনানা হত তাঁকে। তিনি মিশতেন ভিনদেশি মুসাফির, ফকির, লড়াকুদের সঙ্গে। এর চেয়ে বড় শেখার পথ আর কোথায়?

শাহজাদার মনে হয়—এশিয়ার দেশে দেশে যাঁরাই শাহ হবেন পরে—তাঁদের ছোটবেলার সঙ্গে পড়াশুনোর কোনও যোগ নেই। ঘোড়া দাবড়ানো, হাতির জুলুস, ফৌজি হামলা, হারেমের সহজ অওরত আর আশরফির আস্ফালনের সঙ্গেই জান-পহচান হয় শুধু। দেশের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, খোদাতালার সঙ্গে যেন আড়া-আড়ি চলে। তাই শাহ হবার পর তিনি শুধু বোঝেন দখল—নয়তো নিতান্তই অবহেলায় ফেলে দেওয়া। তাঁর ভেতরে থাকে না গভীর কিছু জানার জন্যে আকুলি বিকুলি। এর ভেতর থেকে আকবরের মতো বাদশা কেমন করে বেরিয়ে এলেন? আশ্চর্য।

গত বছর উজবেকরা আগ্রায় পাঠিয়েছিল তাদের ইলচিদের। জনা পাঁচেক উজবেক এল ঘোড়ায় চড়ে। তারা বাদশা শাহজাহানকে নজর দিল কয়েকমুঠো নীলা। দেওয়ান-ই-খাসের ভেতরকার আলো পড়ে সে সব নীলা জ্বল জ্বল করে উঠল। বাদশার হুকুম হল—তাজমহলের ভেতরকার চাঁদোয়ায় গাঢ় নীল রং দরকার। মিহি করে ওসব নীলা গুঁড়ো করা হোক। তারপর তাজের চাঁদোয়ায় তা লাগানো হবে। আব্বা হুজুরের ধ্যানজ্ঞান বলতে—কিল্লা কান্দাহার তাজমহল আর লালকিল্লা। অমন সুন্দর নীলাগুলো গুঁড়িয়ে ফেলার কথায় কেউ একটা রা পর্যন্ত করল না। উজবেক ইলচিরাও তেমনই। তারা তাদের থাকবার জায়গা আগ্রা দুর্গের মোরি দরওয়াজার চেয়েও নোংরা করে ফেলল। এতই কিপটে—দেওয়ানখানা থেকে ওদের যে রোজিনা দেওয়া হত—তা জমাত ওরা—আগ্রার বাজার থেকে পছন্দসই জিনিস কিনে নিয়ে যাবে বলে। পাছে রোজিনার আশরফি

ভাঙিয়ে পরটা কিনতে হয়—তাই ওরা নিত্যদিন ঘোড়ার মাংস খেত। তাও বাজারের নয়। নিজেদেরই হাড় জিরজিরে এক ঘোড়া মেরে—প্রায় মাসভর তার মাংস খেয়েছিল ওরা।

ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল শাহজাদার। এই দুর্গ—জমি আর দখলের ওপর গড়ে ওঠা এই আগ্রা দুর্গ—মগজ বা হৃদয়ের চিহ্ন নেই। এমন এক বিশাল ফৌজি ব্যাপার ঘিরে যে মসনদ—যার ফাঁকে-ফোকরে নামমাত্র গান—ছিটেফোঁটা ছবি আর তাগদ দেখাতে বড় বড় মসজিদ, কিল্লা, মাণ্ডি, সড়ক, হামাম, ছাউনি, হারেম—তার কোথায় আমি নিঃশ্বাস নেব খোদাতালা? তার কোথায় আমি তোমায় ভালবাসব? তার কোন পথ ধরে আমি তোমার দিকে মুসাফির হব?

মাসখানেক হয়ে গেল—খবর এসেছে ইস্পাহানের ইলচিমশায় হিন্দুস্থানের সীমান্তে এসে পেঁছেছেন। শিরে কিল্লা কান্দাহার। এই সময়েই তো ইস্পাহানের ইলচিমশায়কে খানদানি সওগাত জানানো দরকার। তিনি এসে নিজের চোখে দেখে যান—কান্দাহার হাতে রাখতে হিন্দুস্থানের মতো বড় শাহী কতটা তৈরি। হিন্দুস্থানকে ঘাঁটালে কতটা খেসারত দিতে হবে। তার মানে—ওপর ওপর সওগাত—আর তলে তলে তোপ, গোলা, হাতি, বন্দুকচী।

আগ্রা দরবারের ইরানি ওমরাহরা খবরটা শুনেই রটিয়ে দিয়েছে—অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারেই ইস্পাহানের ইলচিমশায় হিন্দুস্থানে আসছেন। ইরানিদের এমন একটা হামবড়াই ভাব আছে—নিজের জাতের কোনও ব্যাপারকে তিল থেকে তাল বানানোই তাদের স্বভাব। ওরা রটিয়ে দিল ইরানি ইলচিমশাইকে দরবারে নিয়ে আসার আগে যেন তাঁকে হিন্দুস্থানি কেতায় সেলাম করতে শেখানো হয়। তা না হলে হঠাৎ তাঁকে দিয়ে সেলাম করানো যাবে না। ইরানিরা এমনিতে উদ্ধত—তার ওপর তিনি ইরানের শাহের ইলচি।

দিন তিনেক হল সেই ইলচিমশাই রাজধানীতে পা দিয়েছেন। তাঁকে বেশ জাঁকজমকে সওগাত জানানো হয়েছে। মাণ্ডির ভেতর দিয়ে তাঁর আসার পথের দুধার সাজানো হল। সবই দেখেছেন দারা। ঘোড়সওয়াররা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ইলচিমশাইকে সেলাম দিল। কাড়ানাকাড়া বাজিয়েদের সামনে রেখে ওমরাহরা ইলচিমশাইকে আনতে গেল। দুর্গের দুয়ারে তোপ দাগা হল তাঁর সম্মানে।

আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সোজাসুজি ইলচিমশায়ের হাত থেকেই তাঁর পরিচয়পত্র নিলেন। অন্যসময় এ চিঠি কোনও ওমরাহ হাতে নেয়। তারপর তা খুলে বাদশার চোখের সামনে ধরে থাকেন। ইরান বলে কথা।

কেতামাফিক বাদশা ইলচিমশায়কে কুর্তা, পাগড়ি, সোনারুপোর জরির কাজ করা শিরোপা, কোমরবন্ধ নজর দেবার হুকুম করলেন। এসব হয়ে গেলে ইলচিমশায়কে জানানো হল : এবার তিনি ইরানের শাহর নজর দেখাতে পারেন।

ইলচিমশায় বের করলেন—পঁচিশটি তাগড়া ইরানি ঘোড়া, বিশটি উট, চমৎকার গোলাপজল, পাঁচ ছ'খানি পারসি গালচে। আব্বা হুজুর নজর দেখে

খুব খুশি হলেন ? প্রতিটি জিনিস তিনি নিজে খুব যত্ন করে দেখলেন। ইরানের শাহের খুবই প্রশংসাও করলেন।

এখন হিন্দুস্থানে গোলাম-বাঁদির বাজার খুব সস্তা যাচ্ছে। কেননা, গুর্জরে, খান্দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। বাদশার হুকুম হল—ইলচিমশাই ফেরার পথে ইচ্ছে হলে পছন্দসই গোলাম-বাঁদি কিনে নিয়ে যেতে পারেন। পঞ্চাশটি পর্যন্ত কোনও শুল্ক দিতে হবে না। তবে একদম কচি-কাঁচা ছেলেমেয়ে কেনা চলবে না।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক চলছিল। এবার দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে ইলচিমশায়কে যেতে হবে। সেখানে গিয়েই যত গোল বাধল।

বাদশা দেখলেন—ইরানের ইলচিকে হিন্দুস্থানি কেতায় কিছুতেই কুর্নিশ করানো যাচ্ছে না। শাহজাদা দারা আগাগোড়াই আব্বা হুজুরের পাশাপাশি ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন—ইলচিমশাই কিছুতেই মাথা নোয়াবেন না।

তখন বাদশা শাহজাহান একটা উপায় বের করলেনও। বলা হল, ইলচিমশায় অনেক রাস্তা এসেছেন। বিশ্রাম করুন। সন্ধ্যায় ফের দরবার বসবে দেওয়ান-ই-খাসে। বাদশার তাই ইচ্ছে।

ইচ্ছে মানেই হুকুম। সন্ধ্যায় দেওয়ান-ই-খাসে সব আলো জ্বলে উঠল। বাতাসে চামেলি আতরের সুঘ্রাণ। চাঁদোয়া মাথায় ধরে দাঁড়ানো সব সেতনের গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

আব্বা হুজুর হুকুম দিলেন, আমখাসের দিকে দরবারে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হোক। শুধু সামান্য ফাঁক থাকবে এক জায়গায়। সে ফাঁক এমনই নিচু যে তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে গেলে ইলচিমশাই বাধ্য হয়ে মাথা হেঁট করবেন—তখন সেটাই হয়ে দাঁড়াবে বাদশাকে তাঁর সেলাম। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন শাহজাহান। সওগাত জানাতে। তাতে উদ্ধত ইরানি ইলচির হিন্দুস্থানি কেতায় কুর্নিশ না করার ঘমন্ডও গুঁড়ো হয়ে যাবে। আব্বা হুজুর হয়তো ভেবে রেখেছিলেন, বলবেন—অতটা মাথা হেঁট করে কুর্নিশ করাটাও হিন্দুস্থানি কেতা নয়।

কিন্তু ইলচিমশায়ের খুবই ঘমন্ড। মগজদারও বটে। বাদশার চাল বুঝে তিনি ওই পথের কাছে এসে বাদশার দিকে পেছন ফিরে নিচু হয়ে ঢুকলেন।

বাদশা শাহজাহান তো রেগে লাল হয়ে বললেন, হায় আল্লা ! আপনি কি মনে করলেন এখানে আপনার মতো গাধার আস্তাবল আছে যে ওভাবে ঢুকলেন ?

ইলচিমশায় বললেন, অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আমি গাধাই বটে। আমার চেয়ে মগজদার ইনসান ইরানের শাহী দরবারে আরও অনেক আছেন। কিন্তু যিনি যেমন বাদশা তাঁর কাছে তেমনই ইলচি পাঠানো উচিত বলে আমাকেই তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আমি তখন আব্বা হুজুরের মুখে তাকাতে পারি না। শাহী কেতায় গভীর কোনও মগজের খেলা নেই। এমন হালকা জয়-পরাজয় নিয়ে বড় বড় শাহীর

বাদশা, উজির, সুবেদার, সিপাহ-সালাররা মাথা ঘামান। ভাগ্যিস আগ্রার রাস্তায় সাধারণ মানুষ উঁচুতলার এই খেলো হারজিতের কথা জানেন না। এইভাবেই শাহী চলে। তাই তো মনে হয় শাহজাদা দারাশুকোর। এর ভেতর থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তাও নেই আমার। আমি বড়ই বেনসিবি ইনসান। কোথায় যাব আমি? আমার মুখ চেয়ে নাদিরা। সুলেমন শুকো। নিহাদ বানু। রানাদিল। আর এই উঁচুতলার হালকা হৃদয়হীন ঘমণ্ডীর ভেতর শুধুই পাক খাচ্ছি।

রাতে ইলচিমশায়ের সঙ্গে খেতে বসে আব্বা হুজুর দেখলেন, ইরানি ইলচি খুব বেশি করে হাড় চিবুচ্ছেন। দেখে শাহজাহান বললেন, কুকুরগুলোর জন্যে কিছু রাখুন।

ইলচিমশায় পোলাউ দেখিয়ে বলসেন, ওই তো রেখেছি।

হিন্দুস্থানের বাদশা যে পোলাউ খেতে খুব ভালবাসেন তা সবাই জানে—আর ঠিক ওই সময় আব্বা হুজুর পোলাউ খাচ্ছিলেন।

বাদশার মুখ কালো হয়ে উঠল। দস্তরখানায় এই শাহীখানায় আমিও সঙ্গী ছিলাম। দারার মনে পড়ল, তিনি তখন আব্বা হুজুরের দিকে দমপোক্ত দুনিয়াজা এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাদশার মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। এগিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম—হে চতুর ইলচি। তুমি পদে পদে হিন্দুস্থানের বাদশাকে ঘায়েল করছ। কিন্তু তুমি তো জানো না—ঠিক এই সময় হিন্দুস্থানের ফৌজ কিল্লা কান্দাহার—খোরাসানের রাজধানী নিশাপুর, হিরাট, গজনি—সব জায়গায় সরাইখানায়, মাণ্ডিতে কাসিদ ছড়িয়ে দিয়ে খবর জোগাড় করছে—আর ফৌজি সেপাইরা মাটি খুঁড়ে কামান বসাচ্ছে।

আব্বা হুজুর জানতে চাইলেন, ইস্পাহান ভাল? না, আগ্রা ভাল?

ইলচি বললেন, বিল্লা! বিল্লা! ইস্পাহানকে আগ্রার ধুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

তার মানে আগ্রায় এত ধুলো যে তার সঙ্গে ইস্পাহানের তুলনা করতে যাওয়াই বাতুলতা। দারার মনে হয়—যিনি ইলচি হবেন তাঁর গম্ভীর হওয়া দরকার। এতটা চতুর হয়ে কোনও লাভ নেই? বরং মগজদার হওয়া দরকার। এতটা রঙ্গ শোভা পায় না।

শাহজাহানের মতো অমন খেয়ালি বাদশাকে কথায় কথায় রাগিয়ে তোলা কোনও ইলচির পক্ষে বুদ্ধির কাজ নয়। শাহজাদার সন্দেহ ইলচিমশায় যখন আগ্রার কোনও সরু অলিগলিতে ঘোরাফেরা করবেন—তখন বাদশার হুকুমে তাঁকে লক্ষ্য করে পাগলা হাতি লেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। নয়তো আব্বা হুজুর সেদিন খানাপিনার পর অমন অসময়ে ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতিকে ডেকে পাঠালেন কেন?

রাজধানী আগ্রায় দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে বসে হিন্দুস্থানের সেরা গান, কবিতার রসিক সমঝদাররা ইদানীং নিজেদের ভেতর কথা বলার সময় প্রায়ই তিনটি নদীর নাম করে থাকেন। এই তিন নদী হল—ইরাবতী, তাপ্তি, গোদাবরী। লোকে ইরাবতীকে বলে রাভি।

তা নদীর নাম কেন? নদী তো গান গায় না। কবিতাও লেখে না। ওদের দেখে গান বা কবিতা আসতে পারে। আসলে রাভি, তাপ্তি, গোদাবরীর নাম করে রসিকজন মুঘলশাহীর তিন বড় কবিকে বোঝান।

রাভির তীরে লাহোরে মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের জন্মকর্ম। বাদশা শাহজাহান তাঁর কথা বলতে গেলে বলেন হিন্দু-ই-ফারসি দান। ফারসি জানা হিন্দু। একদিকে তিনি কবি। অন্যদিকে তুখোড় মুন্সি—আমলা। বাদশার সঙ্গী ওয়াকেনবিশ। আবার শাহজাদা দারারও ঘনিষ্ঠজন। হাফিজ নিয়ে মাঝে মধ্যে দু'জনে তোলপাড় হয়ে থাকে। জাহাঙ্গীর বাদশা মরার সময়েই চন্দ্রভান রীতি-মত যুবক।

সাতপুরা পাহাড় থেকে নেমে আসা তাপ্তির তীরে নাসিকেই কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর শুরু। সেখান থেকে তিনি বারাণসীতে আসেন। অবশ্য নাসিকের তাপ্তি তো একসময় গোদাবরীর বুকে মিশে গেছে। কবীন্দ্রাচার্য মানষুটি দাপটিয়া। লম্বা চওড়া শরীরের কোমরে সবসময় চাদর জড়ানো। সে চাদরের আধখানা পথ অবধি নেমে এসেছে। আরেকখানা লাল রেশমি চাদর আলখাল্লার মতো গায়ে জড়ানো। এই অবস্থাতেই তিনি ওমরাহদের সঙ্গে—এমনকি বাদশার সঙ্গেও দেখা করতে আসেন। আগ্রার রাস্তায় তাঁকে হেঁটে যেতে যেমন দেখা যায় তেমনই দেখা যায় তিনি পালকিতে যাচ্ছেন।

গোদাবরীর তীরে জন্ম জগন্নাথের। সংস্কৃত ছন্দে আজকের হিন্দুস্থানে তাঁর কাছাকাছি কেউ নেই। আশ্চর্যের কথা—আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ফারসিতে আর ইসলামে তাঁর দখলের কথা শুনে জাহাঙ্গীর বাদশা জগন্নাথকে ডেকে এনে সভাকবি করেন। বছর পনেরো প্রায়—তিনি শাহজাহান বাদশারও সভাকবি। শাহজাহান তাঁকে পণ্ডিতরাজ খেতাবও দিয়েছেন। শাহজাদা দারার ঘনিষ্ঠ এই কবির দু'ছত্র কবিতার দরুন আজ বাদশা শাহজাহান লোকের মুখে মুখে—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো…হয়ে উঠেছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ উপস্থিত লাবঙ্গী নামে খুব সুন্দরী এক যবনীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাই মাঝে মাঝেই তাঁর ছন্দও নাকি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায় জগন্নাথ লাবঙ্গীকে বিয়ে করবেন। তাকে নিয়ে কবিতাও লিখছেন।

রাভি, তাপ্তি, গোদাবরীকে নিয়ে শাহী দরবার বেশ মশগুল হয়ে আছে। ফারসি রুবাই, রসলহরী, ভাষ্য আর টীকায় দেওয়ান-ই-খাসের মেঝের বনাত মাঝে মাঝেই ঢাকা পড়ে যায়। তার ভেতর কবিকে সাবাসি দিতে ওমরাহরা বলে উঠছেন—মার হাব্বা! মার হাব্বা। রাজপুত মনসবদাররাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরাও বলছেন। সাধু! সাধু! সারা দরবারে একজনই শুধু

চুপচাপ। ভাল গান, ভাল রুবাইয়ে তিনি পাকা সমঝদারের মতো সামান্য মাথা নাড়েন। তিনি—বাদশা শাহজাহান।

এমন দরবার বড় টানে শাহজাদা দারাশুকোকে। তিনি নিজেও রাভি, তাপ্তি, গোদাবরীর চোরাটান মনে মনে টের পান। আগ্রায় থাকলে এদের টানে শাহজাদার দরবারে যাওয়া চাই। অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে দারা ঢাকা পথ পেরিয়ে যেই না হাযাত বকস্ বাগের গা ধরে নিচে নামবেন—নেমে দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে গিয়ে বসবেন—অমনই কবীন্দ্রাচার্যের মুখে পড়ে গেলেন। গায়ের লাল রেশমি চাদর আলথাল্লা হয়ে ঝুলছে। আগ্রা দুর্গের পাথুরে গলিতে বাঁক নেবেন বলে কবীন্দ্রাচার্য মোড় ঘুরেছেন।

শাহজাদাকে দেখে মানুষটি থেমে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন। এই মানুষটির সঙ্গে তৌহিদের পাশাপাশি একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিয়ে কথা বলতে বড় ভাল লাগে শাহজাদা দারার। মনে হয় পরতে পরতে অজানা দুনিয়ার দুয়ার খুলতে থাকে। মনের ভেতর কোন গভীরে অন্ধকারের মাঝখানে বিশাল এক স্ফটিক পাহাড় সাদা হয়ে জেগে ওঠে। তার চূড়োয় লাল হয়ে ফুটে ওঠে বুকেরই এক ফোঁটা রক্ত। এই কবীন্দ্রাচার্যই ক'দিন আগে দারাকে বলেছিলেন, হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি এত বছর থেকেও কেউ কাউকে ভাল করে জানল না। তাই তো সব বিরোধ। কেউ খতিয়ে দেখেনি—দু'জনই একেশ্বরবাদী। আপনাদের তৌহিদের মতো আমরা হিন্দুরাও তো অদ্বৈতবাদী।

শাহজাদা কথার শুরুতেই বললেন, আমাদের দু'জনকেই সত্যকে খুঁজে বের করতে হবে।

—সত্য কারও একচেটিয়া নয় শাহজাদা। —বলেই কবীন্দ্রচার্যের মন বলল, এই মগজদার ঝলমলে নওজওয়ান শাহজাদাকে ঘিরেই তামাম হিন্দুস্থানে বিশাল এক সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাবে। সে বিপ্লব বুদ্ধির জগতের। সুলহ্-ই-কুল —যা কি না আকবর বাদশার সর্ব ধর্মে সহিষ্ণুতা—তা আকবর বাদশা পেয়েছিলেন—কেন না তাঁর জীবনের ভিত্ গড়ে উঠেছিল নানান্ ওঠাপড়ায় মহাকাব্যের মালমশলা দিয়ে। আর এই তাজা শাহজাদার জীবনের ভিত যেন একটি টলোমলো কবিতার লেশ দিয়ে গড়া। শাহজাদা সবসময় আবেগে টগবগ করছেন। তিনি নিজেই শাহজাদাকে বেদান্তের কথা বলে থাকেন। তাই অদ্বৈত-বাদী কথাটি বললে শাহজাদা ধরতে পারেন।

কবীন্দ্রাচার্য ফের বললেন, জ্ঞান হল অন্ধ। বিশ্বাস হল পঙ্গু। সত্যের সন্ধানে দুইয়েরই দরকার।

শাহজাদা বললেন, বহু দেবতায় বিশ্বাসীদেরও ঈশ্বর আছেন। তাই বলি —একটি ধর্মই সত্য—আর সব মিথ্যা—এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই।

দারা কথা বলছিলেন—আর তাঁর হাতের নাড়াচাড়ায় আঙুলের আঙটি ঝক-ঝক করে দুর্গের পালিশ পাথরে ঝিলিক খেলছিল। সে-হাতে তাকিয়ে কবীন্দ্রাচার্য বললেন, মাফ করবেন শাহজাদা। একবার যদি একটু স্থির হতেন—

—কেন?—বলে শাহজাদা হাতখানি এগিয়ে ধরলেন।

কবীন্দ্রাচার্য দেখলেন, দারার আঙুলের আঙটিতে দেবনাগরী হরফে খোদাই করে লেখা—প্রভু!

কবীন্দ্রাচার্য কোনও কথা বলতে পারলেন না খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে বললেন, এর চেয়ে ফারসিতে লিখিয়ে নিতে পারতেন—আল্-রব্—

—একই তো কথা। তাই না? প্রভু মানে ঈশ্বর। আবার আল্-রব্ মানেও তো ঈশ্বর। আমি না হয় হিন্দুস্থানের আদি বাসিন্দাদের ভাষায় লিখিয়ে নিলাম—প্রভু। তার চেয়ে বেশি কিছু তো নয়। মথুরার কেশব রাইয়ের মন্দিরের জন্য পাথর পাঠালাম—

—পাঠিয়েছেন?—বলেও বিশ্বাস হচ্ছিল না কবীন্দ্রাচার্যের।

—পাঠাব না কেন। মন্দিরের ভাঙা জায়গা এবার আশা করা যায়—মেরামত হয়ে যাবে।

কবীন্দ্রাচার্য তখন তখনই কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, জানেন শাহজাদা—ফৈজি বলেছিলেন, সেকেন্দার শাহকে ঈশ্বর দিয়েছেন আরশি। আকবর বাদশাকে দিয়েছেন সূর্য। সেকেন্দার আরশিতে দেখেন নিজেকেই। আর আকবর বাদশা সূর্যের ভেতর সত্যকে দেখেন।

শাহজাদা দারা গম্ভীর হয়ে বললেন, পরদাদাসাহেব সেই আকবর বাদশার ইলাহি সাল আজ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী বলব কবীন্দ্রাচার্য।

কবীন্দ্রাচার্য বললেন, সাবেক মানুষেরা বলছেন—আকবরের আমলের পর চল্লিশ বছরও পেরয়নি—অথচ চারদিক থেকে দম বন্ধ হয়ে এসেছে। বাদশা শাহজাহান নিজেকে দুসরি তৈমুর খেতাব দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু কোথায় সেই তৈমুরি জ্ঞানের আলো বলতে পারেন? কোথায় সেই দিল আর মগজের গাঁটছড়া?

দারা কোনও কথা বলতে পারলেন না।

কবীন্দ্রাচার্য বললেন, আবু হানিফার মতো অন্ধ ইমামরা বাদশাকে বলছেন—আপনি এই জমানার ইমাম মেহেদি। তাই শুনে বাদশা শাহজাহান তেতে উঠে ইসলামের ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। মন্দির ভেঙে মসজিদ তোলা হচ্ছে।

—আপনিই বাদশার কানে কথাগুলো তুলুন না কবীন্দ্রাচার্য।

—উলেমাদের মাথার ওপর মুল্লা আবদুল হাকিম। তিনি তো বলেছেন—ইসলামের আইন অনুযায়ী অন্য কারও সম্পত্তির ওপর মসজিদ বানানো নিষিদ্ধ।

—চলুন দরবারে। আপনি বলবেন। সঙ্গে আমিও বলব কবীন্দ্রাচার্য।

—কিন্তু বাদশা কি আজ শোনার মতো অবস্থায় থাকবেন?

—কেন? এ-কথা বলছেন কেন?

—আপনি শোনেননি শাহজাদা—

—কী বলুন তো—

—আজ শয়তানপুরার দিকে এক গলি দিয়ে ইরানের ইলচিমশায় আসছিলেন—

—বলুন। থামলেন কেন? তারপর?—দারার বুকের ভেতর রক্ত চলকে

উঠল। তিনি নিজেকেই মনে মনে বললেন, যা ভেবেছিলাম। এই তো শাহী!

—এমন সময় পাগলা হাতি ক্ষেপে গিয়ে উলটোদিক থেকে ছুটে আসে।

—আর কেউ ছিল না তখন ওখানে?

—দেওয়ানখানায় শুনে এলাম—ফিল-ই-বর্কসির রাশ ফসকে হাতিটা ক্ষেপে ছুটে যায় সামনের দিকে—

শাহজাদা মনে মনে বললেন, ফিল-ই-বর্কসি। সে তো তুচ্ছ। বাদশা নিজে চাইলে পাগলা হাতির রাশ কে সামলাবে? আর—আর হাতিকে পাগল করতে কতক্ষণ?

কবীন্দ্রাচার্য বললেন, শেষমেশ ইলচিমশায় অবশ্য দারুণ বুদ্ধির কাজ করেছেন। বর্শা ছুঁড়ে মেরেছেন। সিধা হাতির কপালে।

—যাক্। তাহলে ইলচিমশায় বেঁচে গেছেন।

—হ্যাঁ। বর্শা বিঁধে যাওয়ায় হাতি থমকে দাঁড়ায়।

শাহজাদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে ঢুকে পরপর দু'বার ভীষণ অবাক হলেন তিনি।

মসনদে কাত হয়ে বসে হিন্দুস্থানের বাদশা। তাঁর মুখে ভিনদেশি ইলচিকে লক্ষ্য করে পাগলা হাতির এই ছুটে যাওয়ার কোনও ছাপই পড়েনি। বরং তিনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কোন সূক্ষ্ম শ্লেষের স্বাদ নিচ্ছেন তারিয়ে তারিয়ে।

নিজের জায়গায় বসতে বসতে শাহজাদা দেখলেন, কবীন্দ্রাচার্যও তাঁর জায়গায় বসছেন। তাঁকে দেখতে দেখতে দারার চোখ এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। তিনি এবার আগের চেয়ে দোগুণী অবাক হলেন। ইরানের ইলচিমশায়ও মন দিয়ে কবি জগন্নাথের ফারসি রুবাই শুনছেন। শুনে তার ভেতরকার তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বাদ যেন বাদশার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে উপভোগ করছেন। একইভাবে। আশ্চর্য। কয়েক ঘড়ি আগে এঁদের ভেতর একজন অন্যজনকে চিরকালের জন্যে খতমের ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। সে-ব্যাপারে কোনও ছায়াই নেই—দু'জনের কারও মুখেই। এর নাম কূটবুদ্ধি। যা কি না দেশ চালায়। শাহী বজায় রাখে।

কবীন্দ্রাচার্য যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন কেউ ভাবতে পারেননি তিনি কী বলবেন। কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়ালেন কবি। তাঁর বড়সড় চেহারার আভা যেন চারদিকে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলতে শুরু করলেন—

আজ আমি কোনও রুবাই, দোহা কিংবা চৌপাই পেশ করতে বাদশার মবারকে আসিনি। এই মুঘলশাহীর শেকড় হিন্দুস্থানের জমিনে শও সন হয়ে গেল ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যের ব্যাপারে আলাদা কথা। একজন গায়ক কিংবা কবি দরবারে এসে তাঁর আসল কথায় পৌঁছবার আগে ভণিতার জন্যে সময় পেয়েই থাকেন। সেটাই যে কোনও শাহীর কিংবা সুলতানদের রেওয়াজ। তাই কবীন্দ্রাচার্যর কথায় কেউ কিছু দেখতে পেলেন না। সবাই কান খাড়া করে বসলেন—দেখা যাক আসল কথা কী বলেন কবীন্দ্রাচার্য।

কবীন্দ্রাচার্য বলতে লাগলেন—

এই শুও সনে হিন্দুস্থানের মানুষকে তার সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি মুঘল-শাহী ফারসি ভাষা উপহার দিয়েছে। বাদশাদের আগ্রহেই হিন্দুস্থানের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ—সব কিছু ফারসিতে পাওয়া যায় এখন। একদিন এ দেশের ধন্বন্তরী বাগদাদের খালিফাদের সওগাত পেয়ে সেখানে গিয়ে হিন্দুস্থানের চিকিৎসা বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন। খোদ বাদশা শাহজাহান সেই হিন্দুস্থানি চিকিৎসার আইনশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ মুসলমান ছাত্রদের পড়বার জন্যে মেজরগল বৃত্তি দিয়ে বারাণসী পাঠাচ্ছেন বেশ অনেকদিন ধরে—

শাহজাহান সোজা হয়ে বসলেন। একবার শাহজাদা দারার মুখে তাকিয়ে বললেন, কী বলতে চান কবীন্দ্রাচার্য— ?

—হজরত ! সবই কি বদলে গেল ক'বছরে ?

—কী রকম ?

—আকবর বাদশার আমল থেকেই রাখীবন্ধন, দেওয়ালি মানানো হয়। আজ সেসব দিনে আর কোনও রোশনাই নেই। উৎসব হয় না কোনও। এখন শুধু শবেবরাত আর মিলাদ শরিফেই রোশনাই হয়।

কবীন্দ্রাচার্য বাদশারও খুব প্রিয় মানুষ। তবু শাহজাহানের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তাই দেখে শাহজাদা দারা চোখের ইশারায় কবীন্দ্রাচার্যকে উসকে দিলেন। মানে—থামলেন কেন ? বলে যান—

মুসলমান বিবি নিলে হিন্দুকে আজ শাহী ফরমানে বিবি নয়তো ধর্ম ছাড়তে হয়। একজন মুসলমান হিন্দু বিবি নিলে তাকে তো কোনও কিছুই ছাড়তে হয় না।

ইরানের ইলচিমশায় যে-ফারসি বোঝেন—সে-ফারসি এ-ফারসি নয়। ইরান থেকে হিন্দুস্থানে এসে ফারসির জন্মান্তর ঘটেছে। তিনি কবীন্দ্রচার্যের দু'চারটি কথা ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাছাড়া আগ্রায় আজ দিনটি তাঁর আদৌ ভাল কাটেনি। উজির সাদুল্লা খাঁ মারফত বিশেষ রেয়াত নিয়ে বাদশার দরবার থেকে তিনি উঠে গেছেন।

তাতে শাহজাহানের অস্বস্তিও কাটল। হাজার হোক ভিনদেশি ইলচি। তাও আবার ইরানের। এবার শাহজাহানের ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল। তিনি সহজ গলায় বললেন, তারপর ?

—জাঁহাপনা। রাজা মণিদাস—

—থামলেন কেন কবীন্দ্রাচার্য। বলে যান—এমন ভঙ্গিতেই বলে উঠলেন বাদশা শাহজাহান—সারা দেওয়ান-ই-খাসের দরবার গম গম করে উঠল। শাহজাদা দারাশুকো ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। নিজের শাহীর পাশটানা দোষের কথা শুনতে আব্বা হুজুরের এত আগ্রহ ?

শাহজাহান ভাবছিলেন, বলুন না কবীন্দ্রাচার্য। কত বলবেন। আমিও শুনতে চাই। আবার পহেলা আওলাদ শাহজাদা দারাশুকো একাই কি পরধর্ম-সহিষ্ণু ? আমি কি হিন্দুস্থানের বাদশা নই ? যদি বাদশা হয়ে থাকি তো আমি মুসলমানের বাদশা যেমন—তেমনই হিন্দুরও বাদশা। দেখুক দারা—

সারা দরবারে সবাই নির্বাক। চাঁদোয়া ধরে দাঁড়ানো—পাথর বসানো সেতুনগুলো সিধে ছাদে উঠে গেছে। তার ভেতর কবীন্দ্রাচার্য ফের গম গম করে উঠলেন। রাজা মণিদাস দেওয়ানখানায় নিজের কাজের জোরে উঁচুতে উঠেছিলেন। তাঁকে দেখে নিচের মুসলমান তেপনচিদের কুর্নিশ করতে হয় বলে মণিদাসকে ইলাহাবাদে বদলি করা হল? আফসোসের কথা—এখানেই অবিচারের শেষ নয় বন্দেগান। রাজা রঘুনাথের মতো তুখোড় কর্মী মানুষকে শুধু হিন্দু বলেই উজির সাদুল্লা খাঁয়ের পেশদস্ত হয়ে কাটাতে হল। তিনি যদি মুসলমান হতেন—তাহলে কি তাঁর ওপরে ওঠার রাস্তা এভাবে বন্ধ থাকতে পারত জাঁহাপনা? আপনিই বলুন! বাদশা আকবরের দরবারে টোডরমলের ভাগ্য যতখানি খুলেছিল—আর কোনও হিন্দুর ভাগ্যে তো তা হয়নি।

শাহজাহান তাঁর বড় ছেলের মুখে তাকালেন। শাহজাদার মুখে কোনও কথা নেই। চোখে পলক পড়ছে না। বাদশা বুঝলেন, তাঁর এই বড়ছেলেটি এখন ভেতরে ভেতরে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। অধীর কোনও ভাবনায় শাহজাদাটি টালমাটাল হয়ে পড়ে।

কবীন্দ্রাচার্য বললেন, এমনিতে মুঘল শাহী সমদর্শী বলে হিন্দুস্থানের আম-আতরাফ মানুষজন তাদের বাদশাকে লাখ সেলাম জানিয়ে এসেছে। ভক্তি করেছে। ভালবেসেছে। কিন্তু হজরত, এসব কি ফরমান জারি হয়েছে দেওয়ানখানা থেকে? এই ফরমানের পর আমরা কোথায় যাব? হিন্দুস্থানের বাইরে তো আমাদের কোনও দেশ নেই।

শাহজাহান ঠিক ধরতে পারছিলেন না। বললেন, কোন ফরমান?

—আবু হানিফার মতো ইমামরা মাতিয়ে তুললে জাহাঙ্গীর বাদশা মাঝে মধ্যে মন্দির ভাঙার হুকুম দিতেন। তাঁর হুকুমে আধখানা তৈরি মন্দির গড়া বন্ধ হয়ে গেল। আর আপনার হুকুমে হজরত—অর্দ্ধ বলেই থেমে গেলেন কবীন্দ্রাচার্য।

দেওয়ান-ই-খাসের কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওমরাহরা দেখলেন, তেজস্বী এই কবির দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। গায়ের ওপরের দিককার লালচে রেশমি চাদর মেঝের বনাতে অনেকটাই খসে পড়েছে।

শাহজাদা দারা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, থামলেন কেন কবীন্দ্রাচার্য? বাদশার দরবারে আপনি বুক খুলে কথা বলুন। আপনি হিন্দুস্থানের শাহেনশার দরবারের অহঙ্কার।

চোখের জল মুছে ফেলার কোনওরকম চেষ্টা না করেই কবীন্দ্রাচার্য বললেন, বাদশা শাহজাহানের ফরমান জারি হয়েছে—আধা তৈরি সব মন্দির ভেঙে ফেলতে হবে। শুধু তাই নয়, নতুন কোনও মন্দির বানানো চলবে না। জাঁহাপনা! শুধু বারাণসীতেই ছিয়াত্তরটি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে—

আর কথা বলতে পারলেন না কবীন্দ্রাচার্য। তাঁর গলা বুজে এসেছে। বাদশা যেন তাঁর মসনদে বসতে পারছেন না। সামান্য উঠেছেন মনে হল। অমনি সারা দরবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাদশা ফের বসলেন। অমনি সারা দরবার বসে পড়ল।

—জাঁহাপনা। আপনার একথা অজানা নয়—ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক অন্যের সম্পত্তির ওপর কোনও মসজিদ বানানো যায় না। কিন্তু আপনার এই আইনি শাহীতে—কী বলব—কোথাও কোথাও তাও হচ্ছে।

একবার মনে হল—বাদশা কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি মুখ খুললেন না।

কবীন্দ্রাচার্য বলতে লাগলেন, একটি ধর্মই সত্য। আর সব মিথ্যা। একথা ভাবার কোনও কারণ নেই।

শাহজাদা দারা বলে উঠলেন, আলবাত নেই।

কবীন্দ্রাচার্য বললেন, দুনিয়ায় কোরানের তৌহিদের মতোই একমেবাদ্বিতীয়মে যাঁরা বিশ্বাস করেন—তাঁরা সবাই মনে করেন ঈশ্বর এক। বেদান্তের অদ্বৈতবাদীরা তাই মনে করেন। কিন্তু হজরত! এই হিন্দুস্থানে বহু দেবতায় বিশ্বাসীরাও আছেন। তাঁদেরও ঈশ্বর আছেন। শুধু একটি ধর্মই সত্য—এ তো হতে পারে না। তাহলে প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে গিয়ে—কাশীতে ফুল চড়াতে গিয়ে একই দেশে একদল মানুষ শাহীর কাছ থেকে ভিন্ন ব্যবহার পাবেন কেন? আকবর বাদশা শাহী খাজানাখানার তসিলদার, ক্রোড়িদের হাত থেকে সাধারণ মানুষজনকে বাঁচাবার জন্যে খরচ-ই-দে, মালবার মতো জুলুমি কর তুলে দেন। হিন্দুদের তীর্থকর তুলে দিয়ে দেশসুদ্ধ মানুষজনের কাছ থেকে ধন্য ধন্য সাবাসি পেলেন। জাহাঙ্গীর বাদশা ফের তা বসালেন। আর আপনি? আপনার মতো সমদর্শীর আমলে প্রয়াগে ডুব দিলেই—কাশীতে বেলপাতা ফেললেই আমদের কর দিতে হবে?

কবীন্দ্রাচার্যের গলায় কী ছিল। সারা দরবার দেখল, বাদশা শাহজাহান, শাহজাদা দারাশুকো দু'জনের চোখ দিয়েই জলের ফোঁটা গড়িয়ে নেমে এসেছে। এমন দৃশ্য কখনও দেখা যায় না। আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে এখন সারা হিন্দুস্থানের আম আমদানি হয়েছে। বাতাসে তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে। সেই সুঘ্রাণ খানিকটা যেন দেওয়ান-ই-খাসেও ছড়িয়ে পড়ল।

বাদশা শাহজাহান একবার শাহজাদা দারার দিকে তাকালেন। তারপর রীতিমত ফরমানি গলায় ঘোষণা করলেন, আজ থেকে প্রয়াগে—কাশীতে সবরকম তীর্থকর রদ হয়ে গেল।

সারা দরবার উঠে দাঁড়িয়ে তারিফদারিতে ভেঙে পড়ার জোগাড়। দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে নরম আলোয় সবার অজান্তে ইতিহাস নিজের জাল বুনে চলেছে। ওরই ভেতর যে একদম কথা না বলে একদম চুপচাপ দাঁড়িয়ে—চোখে জল—মুখ এক ফেটে পড়া হাসিতে থমথমে—তিনি স্বয়ং কবীন্দ্রাচার্য। তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। গোদাবরী তাঁপ্ত মিলে যায় যায়। রাভি আজ দরবারে আসেননি।

ঠিক এই সময় বাদশার বাঁ হাতের নাড়াচাড়া দেখে সারা দরবার আগের মতো হয়ে গেল। যে যার জায়গায় এসে বসলেন। জগন্নাথ কবীন্দ্রাচার্যকে বলতে যাচ্ছিলেন, আপনি যা আজ করলেন তার কোনও তুলনা নেই। সারা দেশের মনের কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এসব কথা তাঁর বলা হল না।

শাহজাহানের হাতের ইশারায় দু'জন দাখিলা বিরাট থালায় করে খেলাতের আশরফি, কোমরবন্ধ, উষ্ণীষ নিয়ে বাদশার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। শাহজাহান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন কবীন্দ্রাচার্য—আসুন। আপনার জন্যে সারা হিন্দুস্থান ভ ত গর্বিত—

একটু আগে যে এই মানুষটিই গমগমে গলায় সারা দেওয়ান-ই-খাস ভরিয়ে তুলেছিলেন কে বলবে! কুর্নিশ করে তিনি বাদশাকে তসলিম জানালেন।

শাহজাহান নিচে নেমে এসে কবীন্দ্রাচার্যর কোমরে নিজের হাতে কোমরবন্ধ বেঁধে দিলেন। দেওয়ান-ই-খাসে আজ যেন একের পর এক ইতিহাস ঘটে যাচ্ছে। তাই মনে হল শাহজাদা দারার। খেলাত, খেতাব, ইজফা—কোনওটাই খোদ বাদশা নিজের হাতে কখনওই এগিয়ে দেন না। কদাচিৎ শাহজাদাদের ব্যাপারে বাদশা স্বয়ং এগিয়ে এসে দিয়ে থাকেন। কিন্তু আজ যে কী হয়েছে—কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না দারা। বাদশার চোখে জল। বাদশা নিজে এক ধাপ নেমে গিয়ে খেতাবির কোমরে কোমরবন্ধ পরিয়ে দিচ্ছেন। কী ব্যাপার? শাহজাদা নিজের চোখের জল আঙ্গিয়ার আস্তিনে মুছতে মুছতে তাঁর আব্বা হুজুরের গলা শুনতে পেলেন।

—আজ থেকে আপনি মুঘল দরবারে সবার কাছে আলা-তালিম-ইয়াফতা—সর্ববিদ্যানিধান বলেই পরিচিত হবেন—

ওমরাহরা, দেওয়ানখানার আমলারা, যে পাঁচ ছ'জন মনসবদার ছিলেন—তাঁরাও সবাই মিলে বাদশার খাতিরদারির সাবাসি দিতে লাগলেন। আবারও শাহজাদার চোখে জল এসে গেল। এই বাদশাই কি আজ আগ্রার এক গলিতে পাগলা হাতি লেলিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন? বিশ্বাসই হয় না। ফের আব্বা হুজুরের গলা।

—কবীন্দ্রাচার্য। আজ থেকে শাহী খাজানাখানা আপনাকে মাসে দু'হাজার তনখা মেজরগল দেবে—শাহীর তরফে আপনাকে এই সামান্য কদরদারি আশা করি আপনি গ্রহণ করবেন।

চোখের ওপর থেকে গায়ের আঙ্গিয়ার আস্তিন সরিয়ে শাহাজাদা দারা দেখতে পেলেন, কবীন্দ্রাচার্য আবারও বাদশা শাহজাহানকে কুর্নিশ করতে ঝুঁকলেন। অমনি আব্বা হুজুর দু'হাতে কবীন্দ্রাচার্যকে ধরে ফেললেন, থাক। থাক কবীন্দ্রাচার্য। আপনি হিন্দুস্থানের বাদশার দরবারের আলা-তালিম-ইয়াফতা—সর্ববিদ্যানিধান। হিন্দুস্থানের জন্যে আপনার এত চিন্তাভাবনা বৃথা যাবে না।

শাহজাদা দারার মনে হল, পরদাদা সাহেব আকবর বাদশার সুলহ্-ই-কুল যেন আজ আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশার দরবারে নেমে এসেছে। সুবিচারকে আশ্রয় করে সবধর্মে মুঘল শাহী সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে ফের। মন্দির বানাতে বাধা নেই কোনও। আর ভাঙা হবে না মন্দির। প্রয়াগে কুম্ভস্নানে ডুব দিতে কোনও কর লাগবে না। দেওয়ালির রাতে আগ্রা দুর্গকে আবার আলো দিয়ে সাজানো হবে। মুসলমান বিবি নিয়েও হিন্দু হিন্দুই থাকতে পারবে। একটি ধর্মই সত্য—আর সব মিথ্যা—এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। জোর করে কোনও ধর্ম

চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তৈমুর সমরখন্দে উলুগবেগ মাদ্রাসার পত্তন করেন। সেখানকার জ্যোতিষ, দর্শন, সঙ্গীতের মক্তবের আদলে এবার আগ্রায় গড়ে উঠবে কোনও শাহজাহানী মাদ্রাসা। তাতে হিন্দুস্থানের সেরা মনীষীরা আসবেন।

রাতে নিজের মহলে ঢুকে অবাক হলেন দারা। এত তাড়াতাড়ি তো নাদিরা বেগম শুয়ে পড়েন না। সুলেমান শুকো ফৌজি টাট্টুর খেলা দেখতে গেছে। নিহাদ বানু আগে শুয়ে পড়ে। নাদিরাও তার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েনি তো!

যমুনার দিকটায় অন্ধকার। আর অন্দরের ভেতর-ঘর আলোয় আলোময়। যেন বা অন্য দিনের চেয়ে আজকের আলো বেশি জোরাল লাগছে শাহজাদার। তিনি কোনওরকম ঘণ্টা না বাজিয়েই ভেতরে চলে এলেন।

এসেই শাহজাদা নিজের চোখে হাত চাপা দিলেন। তাকাতে পারছেন না দারা। এ-ঘরে সাত সাতটা অভ্রের পাত এক সঙ্গে আলোর হোলি খেলতে নেমেছে। যমুনার দিককার অন্ধকার তীরে ঝাঁকাল গাছের মাথায়, পাখিদের বাসায় বাসায় মাঝেমধ্যে পাখির ছানাদের কান্নাকাটি। দিনের তাতের পর বাতাস এই সন্ধে রাতে বেশ হালকা পাতলা। সুখদোলায় ঘুমন্ত নিহাদ। দূরে খোলা অলিন্দের সামনে নাদিরা বেগম দাঁড়িয়ে। পেছন ফিরে। যমুনার দিকে তাঁর মুখ।

—কী ব্যাপার?

নাদিরা বেগম ঘুরে তাকালেন। মুখে এক রহস্যময়ীর হাসি। কিছু না।

—কিছু না? বলেও নিজের হাতে নিজের চোখ ঢাকলেন দারা। তাকানো যায় না। শাহজাদা রেগে জানতে চাইলেন, এসব কী?

হাসি হাসি গলায় নাদিরা বেগম বললেন, শাহজাদা! এসব তো শুনেছি মরদদেরই পছন্দ। আপনিও তো মরদ—

—উঃ! কে বলেছে আমার পছন্দ? গায়ে কী দিয়েছ ওসব?

—আপনি একজন শাহজাদা। আপনি জানেন না—এ হল গিয়ে বুরহানপুরী মসলিন? গায়ের সঙ্গে মিশে থাকে। বুরহানপুরের শাহী তাঁত থেকে এসেছে—

—আমি তাকাতে পারছি না নাদিরা। যাও—ডোরিয়া কামিজ পরে এসো।

নাদিরা বেগমের মুখ কালো হয়ে গেল। কেন? আমায় মানায়নি? আমাকে ভাল লাগছে না আপনার?

এ যেন অন্য নাদিরার গলা। কেমন ধারালো—ঠেলে ওঠা। কোথায় সেই চাপা, শান্ত স্বর। মাথার একঢাল চুল তাতারনীদের মতো চুড়ো করে বাঁধা। ঠোঁটে, গালে বাড়াবাড়ি রকমের রঙের আভা। এসব কোনও দিনই দরকার হয় না নাদিরার—তা কি সে জানে না? এমনিতেই শাহজাদা বেগম রীতিমত সুন্দরী। গলার নিচে আর তাকানো গেল না।

—কী পরেছ? যাও নাদিরা আঙ্গরাখা পরে এসো—

—কেন? বললাম তো। শাহী খানদানে আপনাদের যারা নেচে দেখায়—

তাদের তো এই বুরহানপুরী মসলিন পরতে হয়। তাই না? এই পরে নাচলে শুনেছি আপনাদের চোখের আরাম হয় শাহজাদা।

—কে বলেছে তোমায়? আমি বলেছি?

—উঁহু। আপনি বলবেন কেন!

নাদিরা বেগম এবার একদম কাছাকাছি এসে কথা বলায় চড়া গন্ধটা পেলেন শাহজাদা দারা। তখনই তাঁর চোখ পড়ল মেঝেতে গড়িয়ে যাওয়া একটি সিরাজির সুরাধারে।

সেদিকে তাকিয়ে দারা জানতে চাইলেন, সবটা খেয়েছ?

নাদিরা হাসি হাসি মুখে ডানদিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বোঝালেন, হ্যাঁ সবটাই।

কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না শাহজাদা। নাদিরার কথা ঠিক কিনা বুঝতেই তিনি ঝুঁকে সুরাধারটি কুড়িয়ে নিতে যাবেন—অমনি নাদিরা বেগম বললেন, থাক।

দারা থেমে গেলেন। নাদিরা বেগম বললেন, আমিও নাচতে পারি শাহজাদা। দেখুন—বলেই কয়েক প্রস্থ ঘুঙুর সমেত ডান পা এগিয়ে দিয়ে বিশাল এক ঝনৎকার তুললেন নাদিরা।

—থামো নাদিরা। আগে জামদারখানায় গিয়ে আঙ্গিয়া, কুর্তা পরে এসো।

এবার বাঁ পায়ের ঘুঙুরে জমক তুলে নাদিরা বেগম রীতিমত শানানো গলায় বলে উঠলেন, না। আমি এই মসলিনেই নাচব। রানাদিল কী পরে নাচে: বলুন না আমার সরতাজ! এই আব-ই-রভান পরেই তো নাচে।

॥ উনসত্তর ॥

আগ্রার মান্ডিতে মান্ডিতে ইরানের শাহের খবরাখবর যেন বাতাসের আগে আগে উড়ে আসে। সিরাজ বা ইস্পাহানের খবর আগ্রার বাজারে এমনভাবেই নাড়াচাড়া হয়—যেন সিরাজ বুঝি আগ্রারই পাশের কোনও শহর। নয়তো ইরানের শাহ সাফি আর্মেনিয়া আর ইরাক থেকে তুর্কিদের তাড়িয়ে দেখার পর সত্যি সত্যিই কিল্লা কান্দাহারের দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন—এ খবর আগ্রার লালচকের ফুলওয়ালি কিংবা শয়তানপুরার সরাইয়ে কাঠকয়লার কাবাবওয়ালারা জানবে কোত্থেকে?

হিন্দুস্থান আর ইরানির মাঝখানে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, রেগিস্থান পড়ে আছে। সেসব পেরিয়ে ইরানি শাহীর এমন ফৌজি গুপ্ত খবর কী করে যে হিন্দুস্থানের বাজারে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে তা কেউ বলতে পারে না। শাহ মন্ত্রীর হুকুমে সেনাপতি রুস্তম খাঁ সুজী ফৌজ নিয়ে খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে এগিয়ে এসেছেন। সেখানে বসে তিনি শাহ সাফির জন্যে অপেক্ষা করছেন। শাহ এলেই দুজনে কান্দাহারের দিকে এগোবেন।

আসলে রমজান মাসেই হিন্দুস্থানের ফৌজি কাসিদরা আফগানিস্থানের মান্ডিতে মান্ডিতে ছড়িয়ে পড়ে এ-খবর জোগাড় করেছে। তা এতটা পথ

ডিঙিয়ে আগ্রার দেওয়ানখানায় এসে পেঁছিতেও খুব একটা দেরি হয়নি। সেখানকার ফৌজি রসদ দফতর থেকেই খবরটা বনজারাদের মুখে মুখে ছড়িয়েছে।

খবর শুনে হিন্দুস্থানেও যুদ্ধের সাড়া পড়ে গেল। খোদ বাদশা এখন লাহোরে। আগের বারের মতো এবারও তিনি শাহজাদা দারাকে মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার করেছেন। দারা আগে কখনও কোনও যুদ্ধ করেননি। লড়াইয়ের ময়দানেও কখনও তিনি থাকেননি।

তাই বাদশা শাহজাহান শাহজাদা দারার সঙ্গে পাঠালেন সৈদ খাঁ বাহাদুর, রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জং, আম্বেরের মির্জা রাজা জয়সিংহ আর যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে। বিশাল বাহিনী। তার মাথার ওপর শাহজাদা দারাশুকো।

রমজানের পর লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশাওয়ার দিনের বেলা সূর্যের তাতে আগুন হয়ে থাকে। রাতের দু' দণ্ড পেরিয়ে দুনিয়া ঠাণ্ডা হয়—আরও দু' দণ্ড পেরিয়ে ভোর পেরিয়েই ঘর আগুন হয়ে ওঠে। এই সারাটা পথ বছর তিনেক আগে শাহজাদা একবার কুচ করে গেছেন। পথটা তাঁর জানা। আগা-গোড়াই পাথর আর পাথর। মাঝে বলতে কিছু ন্যাড়া গ্রাম। পথে জালালাবাদ-কাবুল সড়কে একদল ভেড়া ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অর্গন্ধব নদীর আগে জিরিয়ে নেবার কোনও জায়গা নেই। আর আছে হেলমন্দ নদী। তা সে কিল্লা কান্দাহারের কাছাকাছি। কিল্লাকে সামনে রেখে হেলমন্দের তীরে ঝাঁকড়া কিছু গাছের নিচে দিনের বেলায় ছায়া পাওয়া যায়।

শাহজাদা দারার আগে আগে চলেছেন রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জং। তাঁর বন্দুকচীর দল বেশির ভাগই তাতারি। কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর মাথা—মীর আতশরা প্রায় সবাই-ই মোটা মাইনের ফ্রানসিসি। ওরা এই গরমে হাঁফিয়ে উঠেছে। শাহজাদা তাঁর পেয়ারের হাতি ফতে-জং-এর পিঠে গাদেলায় বসে দূরবীন চোখে দিয়ে দেখতে পেলেন—ফ্রানসিসি গোলন্দাজরা গরমে তিষ্ঠতে না পেরে বড় বড় তরমুজের বুক কেটে তার রসে রুটি ভিজিয়ে চিবোতে শুরু করে দিয়েছে।

শাহজাদার হাতের ইশারায় একজন দাখিলা পেছনের হাতির পিঠ থেকে সরোঠা কাত করে ঠাণ্ডা জিরাপানি ঢেলে একটি জেড পাথরের পাত্র শাহজাদার সামনে এসে ধরল। সবটা একবারে গলা দিয়ে নামিয়ে এই মুঘল বাহিনীর সিপাহসালার দারাশুকো পেছন ফিরে পুবে কাশ্মীরের চিত্রল গিলগিটের দিকে তাকালেন।

নাঃ! ওদিক থেকে ধুলো উড়িয়ে কেউ আসছে না। ওদিকের আসমান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু পাহাড়ের ওপর পাহাড়। দারা সামনের দিকে তাকালেন। একজোড়া করে পানিপথের ষাঁড় একটি করে কামান টেনে নিয়ে চড়াই-উতরাই ভাঙছে। এখন প্রায় বারোটি কামান চলেছে। সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ষাঁড়। একেবারে শেষে একটি তামিল পাওয়া হাতি। যখন কোনও ষাঁড় পেরে উঠছে

না—তখনই ওই হাতি এগিয়ে গিয়ে শুঁড় দিয়ে টেনে তুলছে বা ঠেলে দিচ্ছে ওদের বোঝা।

দারা ফতে-জং-এর পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর পদাতী সেপাইদের। এরা আগ্রা-ফতেহাবাদ এলাকার দেহাতি মানুষ। ফৌজি উর্দি বলতে বুকে আর হাঁটুর নিচে মোটা সুতোয় বোনা পুরু কাপড়ের পটি। কোমরে ছোরা আর হাতে লাঠি। যার যার পিঠে নিজের নিজের তৈজস। তাতে ছাতু নয়তো চানা। সন্ধে সন্ধে কুচ থামলে যে যার রান্না বসাবে কয়েক দলে ভাগ হয়ে। নয়তো চানা চিবিয়েই রাত কাবার করে দেবে। ওই সময় ষাঁড়ের সঙ্গে হাতিও পাবে ঘি আর গুড় মেশানো ময়দা। সঙ্গে মকাই গুঁড়ো। অভাবে মাড়োয়ার দানা গুঁড়োনো ছাতু।

এই দেহাতি সেপাইদের শাহজাদা দারা চেনেন। এরা দু'টি খাবার লোভে ফৌজে ভর্তি হয়েছে। কাউকে বা জোর করে ভর্তি করা হয়েছে। এরা সাধারণ দেহাতি। গোলা ফাটতে শুরু করলে এরাই আগে পালায়। তিনি লাহোর ছেড়েছেন ষোলোদিন হল। এর ভেতরেই পাহাড়ী পথের সামান্য আড়াল পেয়ে কয়েকজন ফৌজ থেকে পালিয়েছে। ধরাও পড়েছে জনা তিনেক। একজনকে বুকে পিঠে পাথর বেঁধে খাদে ফেলে দেওয়ার কথা জানতে পেরেই শাহজাদা ফৌজি কানুন রদ করে হুকুম দিয়েছেন—এবার থেকে অমন ধরা পড়লে তাদের শাহজাদার বরাবরে হাজির করতে হবে। ওই তিনজনের বাকি দু'জনকে তিনি উটের কাতারে উট চান করাবার ভার দিয়েছেন। তাদের কাছেই জানা গেছে—খাদে পড়ে প্রাণ হারানো ওই বেনসিবি সেপাই ছিল পেশায় নাপিত। গঙ্গা, তীরে ঘাট কামিয়ে আর সংসার চালাতে পারছিল না বলেই খাবার লোভে—মাস মাইনের —তনখার লোভে ফৌজে এসে ভর্তি হয়েছিল। কাউকে কাউকে তো শাহী সড়ক থেকে আচমকা পাকড়াও করে আনা হয়েছে। কেউ কেউ যে যার বাড়িতে খবরটা পর্যন্ত দিয়ে আসার সুযোগ পায়নি। কোথায় সেই বাবর বাদশার ফৌজ—যার প্রতিটি সেপাই মরণপণ করে হিন্দুস্থানে মুঘল ধ্বজ উড়িয়ে দিয়েছিল! আর কোথায় এই শাহী ফৌজ!

রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জংয়ের ফৌজে বেশির ভাগই ভাড়াটে লড়াকু। তাতার, উজবেগ, ইউসুফজাই, তুর্কি সেপাইরা খাবার রুটি আর মাসোহারার তনখার জন্যে আগ্রার হয়ে ইস্পাহান-সিরাজের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছে। এ লড়াইয়ের কোথায় ন্যায়? কোথায় ধর্ম? এ লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিয়ে কেউ তো গাজি হয় না। এ লড়াই তো ইরানের বাদশার সঙ্গে হিন্দুস্থানের বাদশার লড়াই। কোনও ন্যায়ের পতাকা উড়িয়ে দেবার জন্যে তো এ-লড়াই নয়।

কান্দাহার যাবার পথে দারা দশ ক্রোশ পেছনে ফেলে এসেছেন শহর-ই-সফা। তারও বারো ক্রোশ পেছনে ছিল কলাত-ই-খিলজাই। এরকম কত নাম এই আফগানিস্থানে ফৌজের ধুলো ওড়ানো পথের পেছনে পড়ে থাকল। দুপুর এমনও পুরোপুরি হয়নি। নামগুলো একটু আধটু গুলিয়ে যাচ্ছিল দারাশুকোর। তবু তিনি মনে রাখতে পেরেছেন আব-ই-তাজি, কারবাগ। আরও অনেক পেছনে

পড়েছিল সিন্ধু আর কাবুল নদীর সঙ্গমে মুঘলদের আটক দুর্গ।

শাহজাদার বারবার মনে হয়—কেন দুর্গ? কেন ফৌজ? আমিই বা এই বিশাল ফৌজের সিপাহ-সালার কেন? শুধু একটি কারণে। জং ফতে করে ফিরতে পারলে আব্বা হুজুরের কাছে আমার না চাওয়ার কিছু থাকবে না। তখন হিন্দুস্থানের বাদশাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলা যাবে বাজির প্রাণের কথাটি। ভালবাসা ইনসানকে খোদাতালা চিনিয়ে দেয়। ইনসানের জন্যে ইনসানের আকুলিবিকুলি—চাহত মানুষকে ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে যায়। সারা শাহী জুড়ে এত আহ্লাদ—এত ফুর্তি—আর তার ভেতর শাহজাদীরা সংসার ধর্মের ব্যাপারে একদম ভুখা থেকে যাবে? এমনই ভাবতে ভাবতে দারাশুকো ফের কাশ্মীরের চিত্রল থেকে গড়িয়ে নেমে আসা পথের দিকে তাকালেন।

কই? কেউ তো এল না। মুল্লা শা কি আমায় ভুলে গেলেন?

এই বিশাল ফৌজের রসদ বয়ে চলেছে বিরাট দুই বনজারার দল। গেঁহু, নুন, মকাই, গোস্ত, রেড়ির তেল, বারুদ, সোরা, সোহাগা—যা কিছু দরকার হতে পারে একটি বাহিনীর—সবই হাতের কাছে মজুদ। শাহজাদার মনে হল—আমি কি একই সংগে সমানভাবে ভালবাসতে পারি নাদিরাকে—রানাদিলকে? দু'জনই তো পাশাপাশি আমার বেগম হতে পারে। দু'জনকেই তো আমি সমানভাবে চাই। একজন স্তব্ধ, নিশ্চুপ। অন্যজন উচ্ছল।

দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই একজন মরদ অনেক বেগম নিতে পারে। কাশী, প্রয়াগে তো এক একজন হিন্দু গংগার জল ছুঁয়ে একসংগে অনেক আওরতকে শাদি করতে পারে। প্রাচীন ব্যাবিলন, ইরানে একজন মরদের কত বউ থাকবে—তার কোনও হিসেব ছিল না। আমি এখন যে-পথ দিয়ে চলেছি—এ-পথও তো সেই প্রাচীন ইতিহাসের পথ—যার দু' পাশের দেশে আওরতের কোনও দামই ছিল না—। আফলাতুন, আরিস্টটুর গ্রিসে একসময় বেগমকে বেচে দেওয়া যেত। এমনকি দানও করা যেত। মহাভারতেই বা কী আছে! আমি কি আজকে নাদিরাকে দান করে দিতে পারি? ভাবা মাত্র শাহজাদা হাতির পিঠে গাদেলার ভেতর কুঁকড়ে গেলেন। মানুষে মানুষে সম্পর্কের কি কোনও দাম নেই? আশ্চর্যের কথা সেই সাবেক দুনিয়ায় একজন জেনানা একই সংগে অনেক খসমকে রাখতে পারত।

পয়গম্বর হজরত মহম্মদ দুনিয়ার এ অবস্থা দেখলেন। দেখলেন——আওরতের কোনও দাম নেই। কোরআনে তাই বলা হল: দুটো, তিনটে কিংবা চারটি বিয়ে করা যাবে, কিন্তু তার বেশি নয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হল: সবার সঙ্গে সমানভাবে মিলতে না পারলে একটিমাত্র বিয়ে করবে। সবার সঙ্গে ন্যায় বিচার করতে না পারলে মোটে একটি বিয়ে করবে।

ন্যায় বিচার মানে কী? বেগমদের সবার জন্যে সমান রুটি-গোস্ত? সমান সুখদোলা? সমান সোনাজহরত? না এর পরেও সমান ভালবাসা? ভালবাসায়—টান-ভালবাসার চোরাটানে কি কেউ সব বিবির সঙ্গে সমান হতে পারে? পয়গম্বর এক হাতে চার বিয়ে অব্দি বিধান দিয়ে অন্য হাতে তা যেন নিষেধই

করেছেন। এক বেগমের বেশি বেগম রাখা হজরত মহম্মদ যেন চাননি। তা যেন সভ্য সমাজের ইচ্ছে নয়। পয়গম্বর এক বিয়ের দিকেই যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের দিকে মনটা চলে গেল শাহজাদার। তিনি মনে মনে বললেন, দশরথ, অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীমদের একের বেশি বেগম ছিল। তেমনই রামচন্দ্র আর তাঁর ভাইদের, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রোণ—সবারই এক বিয়ে—এক বেগম। আকবর বাদশাও এই বিধান দেন।

ওই তো ঘোড়া ছুটিয়ে কে আসছে। চিত্রলের দিক থেকে এক দলা ধুলোর মেঘ ছুটে আসছে—যার ভেতর ঘোড়া সমেত সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে না। বাকি প্রান্তর ঝকঝকে রোদে খাক হয়ে যাবার দশা। শাহজাদা তাঁর হাতিকে আস্তে চালাতে বললেন।

লাহোর থেকে কান্দাহার রওনা হওয়ার সময়েই শাহজাদা দারা তাঁর বিশ্বাসী এক দাখিলার হাত দিয়ে একখানি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন কাশ্মীরে। মুল্লা শার কাছে। তাতে তিনি বলেছিলেন—হুজুর। এ লড়াই যেন ফতে করতে পারি।

সব কথা তিনি চিরকুটে লিখতে পারেননি। তাড়া ছিল। সংকোচ ছিল। মনের ভেতর তখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিলেন শাহজাদা। যে করেই হোক বাজি শাহজাদী জাহানারাকে ফুলে ফলে সার্থক করে তুলতে হবে। বারবার এই একই পথে ঘোড়া, লোক-লশকর নিয়ে অভিযানে যেতে কার ভাল লাগে। কিল্লা কান্দাহার নিয়ে একটা এসপার ওসপার হয়ে যাক। যা হবার হোক। চিরদিনের মতো কান্দাহারের নসিব ঠিক হয়ে যাক। এই সব ভেবেও শাহজাদা চিরকুটখানি পাঠিয়েছিলেন।

চিত্রলের পাহাড়চুড়ো মানে এখানে নয়। সে সেই দিগন্তে আঁকা ছবি বলা যায়। ঘোড়সওয়ারকে ঘিরে ধুলোর মেঘ—তাও এখানে নয়। যতদূরে চোখ যায় —সব পরিষ্কার বলে অনেক দূরের জিনিসও দেখা যায়।

সেই চলন্ত ধুলোর মেঘ কাছাকাছি আসতে সূর্য ঢলে পড়ল। ততক্ষণে ফতে-জং হাঁটার বেগ কমিয়েও পাথুরে পথ ভাঙতে ভাঙতে তিন-চারটে বড় বড় ছাই রং পাথরের টিলা পেরিয়ে এসেছে। বিশাল প্রান্তরের ভেতর কোনও মানুষ নেই। খাদ নেই। পরিষ্কার রোদে লাল রঙের পাথর জ্বলে যাচ্ছে যেন। মাঝে মাঝে ছাই রং পাথুরে কিলা। জ্যান্ত জিনিস বলতে মুঘল ফৌজ। হাতি, উট, ঘোড়ার গলার গলঘণ্টের টুংটাং। মানুষের কথাবার্তা। নানান ভাষায়। আর কামান টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘড় ঘড়। সেই সঙ্গে পানিপথের ষাঁড়গুলোর লেজ মুচড়ে পাহাড়ী মাছি তাড়ানোর ছিপটি আওয়াজ যেন। এর ভেতর মুল্লা শার জবাবের জন্য শাহজাদা অস্থির হয়ে পড়েছেন।

দেখতে দেখতে একটা ধুলোমাখা ঘোড়া এসে দাঁড়াল। তার পিঠেও ধুলো-মাখা একটা জিনিস। দাখিলাটি ঘোড়া থেকে নেমে তার কোমর থেকে একখানি চিরকুট এগিয়ে দিতে দিতে পড়ে গেল।

অন্য সওয়াররা এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল।

শাহজাদা তাঁর শাহী ছাতার ছায়ার নিচে, খোলা আসমানের সামনে ভাঁজ

করা চিরকুটখানি আলোয় মেলে ধরলেন। পরিষ্কার নাস্তালিক ঢঙে লেখা—

শাহজাদার হাত থেকে যে তীর বেরবে তা তাঁর নয়—ঈশ্বরের।

দারা চিরকুটখানি বুকে ঠেকালেন একবার। তারপর কান্দাহারের দিককার আকাশে তাকালেন। তখন সূর্যের আলো কিছু যেন নরম হয়ে পড়েছে। দারার একবার মনে হল—খোদ মুল্লা শা যেন আসমানের ভেতর থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিশাল ফৌজের কোনও থামাথামি নেই। যেন বা চলন্ত হিন্দুস্থান চলেছে। নানান রঙে। নানান শব্দে। এই বিরাট দুনিয়ায় নিজের খানকায় বসে মুল্লা শা সবদিকে তাকিয়ে আছেন। আমি চলেছি ইতিহাসের পথ ধরে। এই রাস্তার রাহি ছিল একদিন আফগান, তুর্কি, মোঙ্গলরা। তারা এই পথ দিয়েই হিন্দুস্থানে গিয়ে উঠেছিল। আমি সেই পথেই উলটো মুখে চলেছি। যাব কিল্লা কান্দাহার।

দূরে দিয়ে দিয়ে প্রায় দিগন্তের কাছাকাছি গাঁয়ের রেখা দেখা যায়। পাহাড়ের ঢল বেয়ে খানিক নেমে গেলে নাবিতে কিছু গাছপালা। সেই সব গাছপালা ঘিরে ছোট ছোট ঝুপড়ি। ভেড়ার পাল। শীতের শেষে গেঁহুর বিচুলি গাদা করা। তারা ছায়ায় একটি আফগানি কুকুর ভীম গলায় ডাকছে। এমন গম্ভীর ডাক—যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। আশপাশে কেউ নেই। কুকুরটা খানিকক্ষণ অন্তর ভীষণ গম্ভীর ডাক ডেকে চলেছে।

পৃথিবীর গায়ে কত ছবি তৈরি হচ্ছে। কত ছবি মিলিয়ে যাচ্ছে। সব একসঙ্গে কেউই দেখতে পায় না। যদি দেখতে পেত—তাহলে পাশাপাশি এই দু'খানি ছবি তাদের চোখে পড়ত। একদিকে চলেছে ফৌজের গম্ভীর চালে এগিয়ে চলা। আরেকদিকে ফৌজের সব রকমের আওয়াজ থেকে দূরে নির্জন ঘরগেরস্থির মাঝে এক আফগানি কুকুরের গম্ভীর ডাক।

কুকুরটি পাহাড়ী। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা। কিন্তু গলাটি ঘেরে বেশ মোটা। তার ওপর লালচে সাদায় বুটি তোলা একটি স্বাস্থ্যবান কুকুরের মাথা। পড়ন্ত বেলায় সে আবার ডেকে উঠল—ভৌ-উ-উ-উ—

এবার খানিক দূরে ঝুপড়িগুলোর বাইরে একটা পিপুল গাছের নিচে বড় ইঁদারায় চাকা ঘুরিয়ে জল তুলতে তুলতে এক আওরত চেঁচিয়ে বলল, যাই—

ধীরে সুস্থে জল তুলে আওরত মাথার ওপর পেট মোটা কলসিটা বসিয়ে ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে এল। পরনে আফগান জেনানাদের মতোই কুর্তাকামিজ। গলায় বদকশানি কালো পাথরের মালা। ডান হাতে রুপোর একটি বালা মাত্র। মাথাটি কাঁচায় পাকায় ভর্তি হলেও চুল অনেক।

ঝুপড়ির সামনেই চাষ তোলার পরেকার ন্যাড়া এবড়ো খেবড়ো জমিতে সিম বরবটি জাতের ফসল তোলার পরেকার মরা শুঁটকো লতা। তার পাশেই জল রাখার বড় জালা। তাতে কলসির জলটুকু ঢেলে দিয়ে আওরত চেঁচিয়ে ডাকল, শুনছ? কোথায় গেলে?

—খাইবারকে খেতে দাওনি? ডেকে ডেকে হদ্দ হল।

কোনও জবাব পেল না আওরত। পাশাপাশি তিন চারখানা ঝুপড়ি থেকেও

কোনও আওয়াজ নেই? বোঝাই যায় কুকুরটির নাম খাইবার। পাহাড়ী শীত যুঝবার জন্যে তার সারা গায়ে ঢেউ তোলা অঢেল লোম।

এবার তোজি পায়ে আওরত ঝুপড়ির ভেতর থেকে প্রায় ঘুমন্ত দশায় এক মরদকে টেনে বের করল। লোকটিরও গায়ে আফগানি গলাকাটা মেরজাই। নাভির নিচে আফগান দেহাতি ঢঙে এক প্যাঁচের কাপড়। প্রায় ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ানো ছেলের মতোই মরদটি বলল, কী করতে হবে বল?

হাল ছেড়ে দিয়ে আওরত জলের জালার পাশে বসে পড়ল। বসেই কপাল চাপড়ে বলল, তুমি আমার ছেলে? না, মরদ? সব আমি বলে বলে করাব? খাইবারকে খেতে দিয়েছ?

মরদ মাথা নাড়ল।

—তাহলে? সারা শীত এই দু' খানা হাতে গেঁহুর ক্ষেতে কাজ করেছি। রাত থাকতে উঠে বরফ কেটে সাফ করেছি। আগেনগার তৈরি রেখেছি ঘরের কোণে—কাঠকুঠো সারাদিন ধরে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোগাড় করে। এখন এই মরদের ভরসায় এতদূরে এসে না ভেসে যাই—

মরদটি ভাল করে তাকাল তার আওরতের দিকে। এই আওরতের মুখখানি এ-দেশি নয়। গায়ের রংও তাই। বড় বড় দুই চোখ মাথার কাঁচাপাকা চুলের ঢালের সঙ্গে সঙ্গে বয়সে বেড়েছে। দৃষ্টি কিছু নরম। কিন্তু জেদে তেজে চিবুক যেন শক্ত আর ধারাল। মরদটি শান্ত গলায় বলল, এতদিন তো ভেসে যাওনি মীনা বাঈ।

—নাও। ওসব ভাবের কথা রাখ। এবার খাইবারকে দু'টি খেতে দাও সফি—

—তুমিই দিয়ে দিলে পার।

—আমি এখন এঁটো ধরব না।

হা হা করে হেসে উঠল সফি। সেই হাসি যেন দেখতে পাচ্ছিল মীনা বাঈ। তেজাল, গমক তোলা—প্রাণে, আস্থাতে ভরভরাট। এখনও তোমার আহ্লাদিয়ানা যায়নি সফি। ঠিক সেইরকম হাসছ। যেন এইমাত্র সাকেত ছাউনিতে গিয়ে ঘোড়-সওয়ারদের ভার নেবে।

মীর সফি কোনও কথা বলল না। একা একাই ঝুপড়ির ভেতর গিয়ে এখানকার খন্দের সঙ্গে সেদ্ধ করা আধভাজা গেঁহুর সরাইখানা খাইবারের সামনে ধরল। খিদেয় মরিয়া হয়ে উঠেছিল—তাই লেজ শক্ত করে একটা সরল-রেখার মতো টান টান হয়ে খাইবার তার খাবারের সঙ্গে এক হয়ে গেল—বুকটা সরাই সমান সমান পাথুরে মাটিতে ঠেকিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী বলল, হেলমন্দের পাড়ে তোমার দেশোয়ালিরা টিকতে দিল না আমাদের। আমি কাফের? না, জংলী? তাই নিয়ে তাদের কত ভাবনা।

মীর সফি মন দিয়ে খাইবারের খাওয়া দেখছিল। আর মীনাক্ষী দেখছিল সফিকে। সেই ধুমধুমার গড় থেকে কাবুল-কান্দাহার রাস্তার গায়ে এই নাম নেই কোনও এমন ঝুপড়িতে ঘর গেরস্থালি—সে কতদিনের পথ? —সে কত দূরের

পথ ? সফির মাথার চুল কমে এসেছে। তাতে খাঁটি আফগান। লালচে খোঁচা খোঁচা চুল। বরফ সাদা গায়ে দেহাতি ধুলোর পুরু পরত।

মীর সফি বলল, আমার সঙ্গে এতকাল থেকেও তোমার ছোঁয়া বাছা গেল না মীনা বাঈ।

—কী করব ? একবার খাওয়া দাওয়ার পর আবার এঁটো নিয়ে নাড়াঘাঁটা করব ?

—করলে কী হয় ?

একথায় মীনাক্ষী সরাসরি তাকাল সফির মুখে। খুব অসুবিধে হয় তোমার ?

—না। না। সেকথা বলিনি।

—কী দরকার এভাবে একসঙ্গে থাকার সফি ? তোমার বয়স হল। আমারও তো হয়েছে। এবার আমায় ভেসে যেতে দাও। তোমারও তো সাধ মিটিয়ে ঘর গেরস্থি করা হল না। স্রেফ আমার জন্যে।

মীর সফি চেঁচিয়ে উঠল। এ কী ? এক্ষুনি চললে নাকি। কোন্ দিকে যাবে।

—এখন তো আর বয়স নেই। যেদিকেই যাই না কেন—কোনও ভয় নেই আর।

উঠে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী মাটির জালার মুখ খুলে ঘড়ার বাকি জলটুকু উপুড় করে ঢালল।

সফি বলল, কোথায় যাবে ?

—জানি না সফি। আমার কাছে আগ্রাও যা—লাহোরও তাই। হিরাট যা—কাবুলও তাই।

—তখন যদি বলতে এই মানুষটিই তোমার সেই সনাতন—তাহলে—

—তাহলে ? তাহলে কী করতে সফি ?

—তুমি যার—তার কাছে তোমায় জমা করে দিতাম। ভালই থাকতে। শাহী ফিল-ই-বকসির ঘর করতে সুখে। এভাবে হেলমন্দ আর কাবুল নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে হত না তোমায়। ঝুপড়ির চেয়ে আগ্রা দুর্গের কোঠায় থাকা তো অনেক সুখের। তখন বলনি কেন—ও-ই তোমার সেই সনাতন।

—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল সফি। তাছাড়া—

—তাছাড়া কী মীনা বাঈ ?

হেসে ফেলল মীনাক্ষী। এখনও হাসলে তাকে সুন্দরীই লাগে সফির। মীনাক্ষী বলল, জবাবটা তো তুমিই দিয়ে দিলে সফি।

মুঘল ফৌজের এককালের আহেদি মীর সফি এখনও খাস হিন্দুস্থানের এমন মেয়েলি হাসিতে সব গুলিয়ে ফেলে। সে কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কী ?

—আমি যে ততদিনে তোমার মীনা বাঈ হয়ে উঠেছি সফি। দু'জনে যমুনার চরে খাটা-খাটুনি করে নানান ফুলের চাষ করি। তখন কি আমায় আবার পুরনো খসমের হাতে তুলে দিতে পারতে ?

—পারতাম কিনা দেখতে—

—তাছাড়া আমি কি বনজারাদের গেঁহু কি ময়দার বস্তা ? যেকোনও গুদামে

তুলে দেওয়া যায় ? আমি একজন ইনসান। আমার মন বলতে কি কিছু নেই ?

মীর সফি যেন কী বলতে যাচ্ছিল। মুখ তুলে। হঠাৎ কী দেখে তার চোখ জ্বলে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, দ্যাখো—দ্যাখো মীনা বাঈ—

সন্ধে তখনও আসেনি। সূর্য এখন একটা লাল গোল জিনিস হয়ে কতদূরে ভাসছে। খাইবার তার খাওয়া শেষ করে জায়গায় বসেই জিরোচ্ছে।

মীনাক্ষী চোখ তুলে দেখল, বিকেল হয়ে আসা আফগান দিগন্তের একদিক থেকে আরেকদিক অব্দি সারাটা জুড়ে ঘোড়সওয়ার চলেছে। মাঝে মাঝে উঁচু মতো হাতির মাথা। উটের ঢেউ তোলা গলার ছায়া। বহুদূরে। এখান থেকে মনে হবে পাথুরে রাস্তায় তেতে ওঠা বালির মায়া।

মীর সফি অস্ফুটে বলল, ফৌজ—

মীনাক্ষী বলল, হিন্দুস্থানের ফৌজ। আগ্রার ফৌজ। সন্ধেবেলা ওরা যেখানে তাঁবু ফেলবে—সেখানকার রসুইখানা থেকে বেশি রাতে নাখদ ডালের খুশবু ছড়িয়ে পড়বে। মনসবদারদের জন্যে রাঁধা পোলাও, দুনিয়াজার গন্ধে গন্ধে সারা পাহাড়ের কুকুর গিয়ে হাজির হবে। সেবারে যখন শাহজাদা দারা এ-পথে গেলেন—তখন দেখেছিলে না—

ধমকে উঠল মীর সফি। আমাদের খাইবারকে বেঁধে রেখ।

মীনাক্ষী অস্ফুটে বলল, তা রাখব।

সফি দেখল, তার মীনা বাঈয়ের চোখের কোণ কুঁচকে যাচ্ছে। নসিবের খেয়ালে ব্রহ্মপুত্রের তীরের এই আওরত একবার যমুনার চরে ঘরগেরস্থি সাজাল। আরেকবার হেলমন্দের তীরে। তাও সইল না। এখন হিন্দুকুশ থেকে গড়িয়ে আসা পাহাড়ী নাবিতে ঝুপড়িই তার আস্তানা। অনেক কম বয়সে মা হয়েছিল বলে এখনও শক্তসমর্থ। ইঁদারায় চাকা গড়িয়ে জল তোলে। এক একদিন চাঁদের আলোয় বসে মোটা আফগানি রুটি গড়তে গড়তে পুবদেশী সুরেলি গান গায় আপন মনে। ঘুমের ভেতর আজও খোয়াব দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—বিষ্ণু, বিষ্ণুরে—!

মীর সফির ঘর-গেরস্থিতে ঢুকে আজ বছরের পর বছর মীনাক্ষী দু'পায়ের ওপর আছে। খাটো তবে খাও—এই করে সংসার চলছে বলে মীনাক্ষী এই এতগুলো বছরে প্রায় একই রকমের ছিপছিপে আছে। গায়ের রংটা পুড়ে ছাই ছাই। সেই সঙ্গে মাথাটি কাঁচাপাকা। জেদি চিবুক। আর পাঁচজন আওরতের মতোই মীনাক্ষীকে ঘোরাফেরা করতে দেখে মীর সফির মনে হয়—মীনা বাঈ খুব তাজ্জব কিসমের জেনানা। যখন যেখানে যায়—তখন সেখানকার হয়ে যায়।

মীর সফি দিগন্ত জুড়ে মুঘল ফৌজের কুচ করে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবে—একদিন ভেবেছিলাম, সারা হিন্দুস্থানের মার খাওয়া সব ইনসানকে এককাট্টা করে আগ্রার এই জুলুম শাহীর শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলব। জুলুম শাহীর হাতিয়ার তো এই ফৌজ। এই ফৌজকেই সাবাড় করে দেব। শাহীর গারদে বন্দি সব কয়েদিকে খালাস করে এনে নয়া ফৌজ বানাব। নয়া শাহী হবে।

সেখানে তাগদকে জুলুমে না লাগিয়ে ইনসানের উপকারে লাগানো হবে।

সবই খেয়াল! কাকে সাবাড় করব? নিজেই দিনে দিনে বুড়োপার দিকে এগিয়ে চলেছি। কতদিন একটা ভাল ঘোড়ার পিঠে যতদূরে দেখা যায়—সেই অব্দি দাপিয়ে ছুটে যাইনি। অথচ একসময় আমি মীর সফি—মুঘল ফৌজের আহেদি। ফৌজি ঘোড়ার খেলা দেখাতাম। যে-খেলা দেখতে দেখতে বুক শুকিয়ে আসে। তখন আরবি ঘোড়ার কেশর ঢেউ হয়ে ফুলে উঠত। লাল রুমালে বাঁধা আমার মাথার আফগান পাগড়িও বাতাস কেটে কেটে ঢেউ দিত।

—ও কী? ও কী করছ মীনা বাঈ?

মীনাক্ষী তখন কাঠ চেরাইয়ের সবেধন কুড়ুলখানা নিয়ে পাথুরে প্রান্তরের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। সারা প্রান্তর লাল হয়ে সূর্যাস্তের জন্যে তৈরি। তার ভেতর মূর্তিমতী অন্ধকার হয়ে মীনাক্ষী ছুটে চলেছে। মুখে তার কিসের আওয়াজ বোঝা যায় না। অনেকটা যেন জোর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেভাবে ঘোড়সওয়ারের দল মুখে শব্দ করতে করতে দুশমনের ফিকা পর্দার ওপর সব সমেত আঘাত করে—ঠিক সেইভাবে। দূরে—বেশ দূরে চাঁদের আধখানা ঢঙে মুঘল ফৌজ পথ ভাঙছিল। সেদিকে তাকিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সফি মীনাক্ষীর পিছু নিল।

—থামো। থামো মীনা বাঈ—

কে থামে! মীনাক্ষী তখন ঘোর হয়ে আসা আলোর ভেতর পাতলা বাতাসে পাই পাই করে ছুটছে। তার মুখের থুতুর সঙ্গে রাজধানী আগ্রার দেহাতি গালাগালের তুবড়ি ফাটছে।

—আরে পাগল! ওরা যে অনেক দূরে। তুমি সারারাত দৌড়েও পৌঁছতে পারবে না মীনা বাঈ—থামো বলছি। থামো—

এ দৌড় দেখার কেউ নেই। এ গালাগাল যাদের দেওয়া—তারা কোনওদিন শুনতে পাবে না। মীনাক্ষীকে ধরবার জন্যে যে ছুটছে—সে নিজেও ওই জুলুম শাহী ফৌজকে পারলে সাবাড় করতে চায়। কিন্তু সবটাই অন্ধকার করে আসা এক পাথুরে প্রান্তরের নিষ্ফলা নাটক।

এর ভেতর যে কিছুই বুঝতে পারেনি সে হল গিয়ে খাইবার। বাকি ঝুপড়িগুলোর বাসিন্দারা এখনও ফেরেনি। তারা কেউ পাথর ভাঙে। কেউ বা দূরে দূরে মাঠে গেছে কেটে নেওয়া গেঁহুর নাড়াগুলো চেঁছে কেটে আনবে বলে। জ্বালানি হবে। খাইবার গম্ভীর গলায় ডাকতে লাগল। কাছেই ছাই ছাই টিলায় সে ডাক আছাড় খেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

মীনাক্ষীকে দুহাতে জাপটে ধরে ফেলল মীর সফি। কেন শুধু শুধু হয়রান হও।

মীনাক্ষী কোনও কথা বলতে পারল না। তার হাতে তোলা কুড়ুলখানা শব্দ করে পড়ে গেল। অন্ধকারে সেখানা কুড়িয়ে নিতে নিতে সফি দম হারানো মীনাক্ষীর পাশেই বসে পড়ল। কাল কাঠকুটো কাটার সময় কোথায় পাব আরেকখানা কুড়ুল!

মীনাক্ষী বেদম অবস্থায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, কেন আমায় বাঁচালে ?

আকাশ থেকে পড়ল সফি। কোথায় বাঁচালাম মীনা বাঈ ? দম নেই তোমার। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর কাবুল নদীর সোঁতায় যে-জল আছে তাতে গিয়ে চান করে নেব দু'জনে—

—কেন ? কেন আমায় সেদিন মরতে দিলে না ?

—কোথায় মীনা বাঈ ? কেন মরতে দেব তোমায় ?

—ধুমধুমায় জীবনটা গেলে ঘরদুয়ারি পাইকান বউ হয়ে মরে যেতাম।

হো হো করে হেসে উঠল সফি। সেই পুরনো কথা! সে তো কবেকার ব্যাপার!

—আমি ভুলি কী করে সফি। আমার যে সব গেছে।

এই 'সব' কথাটায় কী ছিল। সফিও যেন তা টের পেল। ততক্ষণে চারদিক জুড়ে কালো অন্ধকার চেপে বসেছে। এই হল গিয়ে পাথুরে আফগান প্রান্তরের সন্ধ্যা। তার ভেতর দু'জনেই দেখতে পেল, দুটো গোল নীল আলো দুলতে দুলতে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।

সফি চাপা গলায় ডাকল, খাইবার—

গোল নীল আলো দুটো একদম কাছে এসে দাঁড়াল। মীনাক্ষী খাইবারকে কোলের ওপর টেনে নিল। খাইবার আদর খেয়ে লতিয়ে পড়ল বলা যায়। ছোট একটা বাছুরের সমান হবে খাইবার। তার গায়ে হাত রেখে মীনাক্ষী বলল, আমাদের তিনজনকে নিয়ে এই সংসার! আশ্চর্য!

মীর সফি কোনও কথা বলল না। সারাদিনের গরম বাতাস রোদে পুড়ে পুড়ে এখন খানিক হালকা—খানিক ঠান্ডাও বটে। অনেকদূরে কোথায় ফুটকির মতো একটা আলো জ্বলছে। কারও ঘরগেরস্থি হবে। কিংবা খুব কোনও নিকট-জনকে কারা হয়তো গোর দিচ্ছে। এখানে এই প্রান্তরে কোনও নতুন প্রাণ আনতে পারেনি সফি। যখন পারা যেত দু'জনের কেউই গা করেনি। এখানে জন্ম হয় নিঃশব্দে। মৃত্যুও নিঃশব্দে।

সফি আস্তে আস্তে বলতে লাগল, এই তো দুনিয়া! এখানে কার ভরসায় সংসার করা! তুমি আর আমি যে আসমানের নীচে দিব্যি ঝুপড়িতে মেতে আছি —তা সম্ভব হয়েছে—কারণ, এখানে আগ্রার লম্বা হাত এখনও পৌঁছয়নি। ফৌজি জুলুম আমাদের এখানে পৌঁছলে আমরা তিষ্ঠতে পারতাম না মীনা বাঈ। দুনিয়ার কোনও তসিলদার, ক্রোড়ি, মুকদ্দর আজও আমাদের সন্ধান পায়নি। পেলে তাদের খরচ বইতে হত আমাদের। বেগার খাটতে আমাদের ডাক পড়ত। ফৌজি কামানের চাকা গর্ত থেকে ঠেলে তোলার জন্য গরু ছাগলের মতোই ফৌজ আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

মীনাক্ষী আপনা আপনি বলে উঠল, তার ভেতর খাইবার কোথায় হারিয়ে যেত।

কয়েকদিনের ভেতর দিনের তাত যখন অসহ্য হয়ে উঠল—তখন বিকেল

পড়তেই আসমানে মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত আঁধি দেখা দিতে লাগল। আঁধির সময় সারা তল্লাটে আকাশে একটা পাখিও চোখে পড়ে না। সারা প্রান্তর ঝেঁটিয়ে সব ধুলো গিয়ে মাঝ আসমানে ঝুলে থাকে। বাতাস নেই। উটগুলো মুখ তুলে তুলে কী যেন শোঁকে। তারপরই চারদিক অন্ধকার করে বেমক্কা ধূলিঝড় শুরু হয়ে যায়।

আজ আঁধিতে পড়ে শাহজাদা দারার ফতে-জং অব্দি বেহাল হয়ে পড়েছে। ক'দিন আগে অর্গন্ধব নদী পেছনে ফেলে ফৌজ এগিয়ে এসেছে। সন্ধের মুখে মুখে আঁধি থামল। আঁধির পরেই এখানে বাতাস ঠান্ডা হয়ে আসে। শাহজাদার হুকুম হল—আরও দুই ঘড়ি ঠান্ডায় ঠান্ডায় এভাবে এগিয়ে তবে তাঁবু ফেলা হবে।

অর্গন্ধবের একটা ছুটকো নদীর সোঁতা পেরবার পরই দারা তাঁর গাদেলায় বসে দেখতে পেলেন, উলটো দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে। বুঝলেন, সামনে এগিয়ে থাকা ফৌজ থেকে কোনও জরুরি খবর আসছে।

খানিকবাদে শাহজাদার হাতির কাছাকাছি মির্জা রাজা জয়সিংহের ঘোড়া এসে দাঁড়াল। মুঘল শাহীতে ফৌজি ধাপে জয়সিংহ রীতিমত উঁচু সিঁড়ির মানুষ। মুঘলরা যেসব সামন্তের ওপর ভরসা করে লড়াই হামলায় এগিয়ে যায়—জয়সিংহ তাদের ভেতর সবচেয়ে উঁচু আর দামি।

সেই জয়সিংহ হাতির কাছাকাছি নিজের ঘোড়ার পিঠে সামান্য ঝুঁকে কুর্নিশের বিনয় দেখাতে চাইলেন। বয়স হয়েছে জয়সিংহের। লোহার বুটি বসানো ছিনা-আড়ালের মোটা পটি ঘামে ভিজে গেছে। খুব জরুরি কিছু না হলে তিনি এতটা পথ নিজেই ঘোড়া দাবড়ে আসতেন না। শাহজাদা তাঁর হাতি থামালেন।

হাসি হাসি মুখে রাজা জয়সিংহ বললেন,—শুনলাম, আপনি আরও দু'ঘড়ির মতো এগোতে বলেছেন, আর না এগিয়ে রাতটা এখানে কাটালেই ভাল ছিল শাহজাদা—

নিজেকে বশে রাখতে পারলেন না দারা। বেশ রুক্ষভাবেই বলে উঠলেন, কেন? আগ্রার কি সেরকম কোনও ফৌজি কানুন বেঁধে দেওয়া আছে নাকি?

কথাটা এমনিতে কটাক্ষ। বাদশা শাহজাহান শাহজাদা দারাকে এই লড়াইয়ের সিপাহ-সালার করে পাঠালেও জবরদস্ত চার ফৌজি মনসবদারকে তাঁর চারদিকে এঁটে দিয়েছেন। পাছে শাহজাদা লড়াইয়ের ময়দানে কোনও ভুল করে বসেন—তাই। তাই দারার এই অভিযানে ফৌজ নিয়ে সঙ্গী সৈদ খাঁ বাহাদুর, রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জং, এই মির্জা রাজা জয়সিংহ আর যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ। এমন চার মুরুব্বি থাকতে তাঁকে নামকেওয়াস্তে সিপাহ-সালার করে পাঠানো কেন? আগ্রা থেকেই খোদ বাদশা তাঁর এই বড়ছেলের অভিযানে শতেক নিষেধের না জুড়ে দিয়েছেন। তাতেই গোড়া থেকে শাহজাদা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন।

মুঘল ফৌজে রাজা জয়সিংহের জায়গা আলাদা। তা রীতিমত কদরদারি

খাতিরদারির জায়গা। তিনি কোনও শাহজাদার কাছ থেকেও এমন চালের কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। দারার কথার ভাঙ্গিতে মনের ভেতরে নিভে গেলেও ওপর ওপর তা বুঝতে দিলেন না রাজা জয়সিংহ। মুখে বললেন, বড় খুশখবরি নিয়ে এসেছি শাহজাদা—আগে মুখ মিঠা করান—

শাহজাদা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললেন, কিরকম ?

—আজ রাতের মতো আমাদের এখানে তাঁবু ফেললেও চলবে।

—বলুন না খবরটা কী ?

—আমাদের আর না এগোলেও চলবে—শাহজাদা।

—আহ্! আপান যে আগ্রার গানেওয়ালাদের মতো আলাপ-ভানে মেতে গেলেন দেখছি—

রাজা জয়সিংহ কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। অপমানে তিনি ঘোড়া থেকে প্রায় পড়ে যান। আশপাশের ঘোড়সওয়ারদের কানেও যেন কে গরম সীসা ঢেলে দিল। মানী মানুষের অপমান ফৌজ মানুষরা দেখতে পারে না—বিশেষ করে তিনি যদি হন রাজা জয়সিংহের মতো পাঁচ ছ'হাজারি কোনও মনসবদার।

রাজা শান্ত গলায় বললেন, হিরাটের সরাইখানা থেকে আমাদের কাসিদরা শুনে এসেছে—শাহ সফি আর নেই—

—কী—প্রায় ঝুঁকে পড়লেন শাহজাদা। গাদেলার টাল রাখতে মাহুত শাহজাদার ঠিক উলটোমুখে নিজের শরীরের ভার দিয়ে ঝুলে বসল।

—হ্যাঁ শাহজাদা। শাহ সফি খোরাসানের রাজধানী নিশাপুর অব্দি পৌঁছতেও পারেননি।

—তাহলে ?

—কাশান শহরে এসেই শাহ সফির এন্তেকাল হয়েছে।

—খবরটা যাচাই হয়েছে ?

—হ্যাঁ শাহজাদা। দুশমনি এলাকা নিশাপুরের সরাইখানায় বসে আমাদের কাসিদ ওই একই খবর পেয়েছে। ইরানি ফৌজিরা সেখানে নাস্তা করতে বসে ওই একই খবর নিয়ে চর্চা করছিল। তাছাড়াও গঞ্জ-গোলা যেসব জায়গায় আমাদের কাসিদ ছড়ানো—তারা সবাই এ-খবর এনেছে।

—তবু আমরা এগোব মির্জা রাজা।

॥ সত্তর ॥

এগোবেন ? বলে অবাক হয়ে তাকালেন রাজা জয়সিংহ। তিনি কোনওমতে বলতে পারলেন, মরহুম শাহ সফির ওয়ারিশ শাহ আব্বাস নেহায়েত বাচ্চা। তলোয়ার ধরতে তার এখনও অনেকদিন লাগবে শাহজাদা!

রাজার কথায় এবার শ্লেষ ছিল। তার মানে এখন এগিয়ে আর কী হবে? শিশু শাহ আব্বাস আগে তলোয়ার ধরতে শিখুক।

শাহজাদা দারা ফস করে জবলে উঠলেন যেন। আপনারা লড়াইয়ের সাবেক রাস্তা ধরে চলে থাকেন মির্জা রাজা। এখন লড়াই অন্য পথে চলে। ফৌজ আরও দু'ঘাড়ি ঠান্ডায় ঠান্ডায় কুচ করে তবে তাঁবু ফেলবে। এখন অনেক আগাম ভেবে তবে ফৌজ এগিয়ে যায়—

মির্জা রাজা জয়সিংহ এবার অবাক হয়ে শাহজাদার মুখে তাকালেন। তিনি বলতে চাইছিলেন—যে লড়াই আর হচ্ছেই না—সে জন্যে আমরা কেন ঝুটমুট এগোব? সারাদিন তো অনেক কুচ করা হল। এবার মানুষজন, হাতি ঘোড়া উট জিরোক।

রাজার মুখ দেখে শাহজাদা হো হো করে হাসলেন। নির্জন অন্ধকার প্রান্তরে সেই মুঘল হাসিতে সাবেক লড়াকুর বেপরোয়া জংবাজির ভাব যেমনি মেশানো—তেমনি মেশানো মির্জা রাজার মতো উঁচু ধাপের একজন নামী সামন্ত-মনসবদারকে তুচ্ছ করার ভঙ্গি। হাসি থামিয়ে দারা গম্ভীর হয়ে বললেন, শাহ আব্বাস লায়েক হয়ে ফের যাতে হামলা না করে—সেজন্যেই ফৌজ এগিয়ে যাবে—

—গিয়ে?

ইরানি ফৌজ আর লড়াই দেবে না জেনে দারার যেন আশাভঙ্গ হয়েছে। ভেতরে ভেতরে সেজন্যে তাঁর ক্ষোভও জমা হচ্ছিল। তিনি বললেন, হিন্দুস্থানের ফৌজ আগ বাড়িয়ে ইরানে ঢুকবে—

মির্জা রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, বাদশার সেরকম কোনও ফরমান আমাদের সঙ্গে নেই।

—নেই তাতে কী হল? জংয়ের ময়দানে সব কি ফরমান মোতাবেক চলে? হিন্দুস্থানের ফৌজ এবার ইরানে ঢুকে সিস্তান, ফরাহ, হিরাট শহর দখল করে নেবে। তাহলেই কাবুল-কান্দাহার নিরাপদ থাকবে।

—মাফ করবেন শাহজাদা। হিন্দুস্থানের ফৌজ যদি লড়তে লড়তে ইরানে ঢুকে পড়ত—যদি লড়াইয়ের ভেতর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ওসব জায়গা দখল নিত—তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু দুশমন যেখানে আগ বাড়িয়ে কোনও লড়াই দেয়নি—

—দেয়নি তো কী হয়েছে মির্জা রাজা? নিশাপুরে তো ইরানি সেনাপতি রুস্তম খাঁ জুজি ফৌজ নিয়ে এগিয়ে এসে বসেই আছেন। শাহ সফির এন্তেকাল নাহলেই তো ছবি অন্যরকম হত। হিন্দুস্থানই না-হয় কালকের কথা ভেবে এগিয়ে গিয়ে লড়াই দেবে। তাহলেই দুশমন তার ডেরা থেকে বেরিয়ে আসবে। তখন আমরা তাড়া করে যাব। ধাওয়া করে গিয়ে সিস্তান, ফরাহ, হিরাট দখল করবে আমাদের ফৌজ।

অন্ধকার আসমানের নিচে কতদূর যে এই ফৌজ ছড়িয়ে আছে—তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই কোনও। ঘোড়সওয়ার বন্দুকচী হাতি কামানের সারি, উটের কাতার, পদাতী, বেলদার—আকাশের নিচে এ এক বিশাল অজগর।

শাহজাদা দারা আর মির্জা রাজার ভেতর কথার তলোয়ার যেন একে অন্যকে ঘষে দিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি মাহুত, ঘোড়সওয়ার সব নির্বাক মূর্তি মাত্র।

মির্জা রাজা জয়সিংহ রাজপুতের গোঁ নিয়ে বললেন, না। তা হয় না শাহজাদা। তা হবে না। হিন্দুস্থানের ফৌজ আর এক কদমও এগোবে না।

নিরুপায় শাহজাদা জানতে চাইলেন, কেন?

—বাদশা শাহজাহানের তেমন কোনও ফরমান নেই আমাদের সঙ্গে। সিধে হুকুম তাঁর—আগ বাড়িয়ে কোনও লড়াই দেওয়া যাবে না।

—ফরমানে তাই আছে? দেখান—

—এই দেখুন—বলে মির্জা রাজা কোমরের গোল শিঙার ভেতর থেকে পাকানো লম্বা একখানি কাগজ বের করে তার পাক খুলতে লাগলেন। হাতির ওপর থেকে সে কাগজে আলো ফেলেই দারা দেখতে পেলেন, তাতে বাদশার পাঞ্জার মোহর। বাদশা আঁটঘাট বেঁধেই ফৌজ পাঠান।

চারিদিকে জমানো মাখন রঙের হাতির দাঁত। যেন বা সেগুলো কোনও গাছ। চারদিকে তাকিয়ে ট্যাভারনিয়ারের মনে হল—তিনি যেন হাতির দাঁতের কোনও জঙ্গলে এসে পড়েছেন। যে জঙ্গলে গাছের মতোই হাতির দাঁত গজায়। দাঁতগুলো বেশ বিরাট। তাহলে হাতিগুলো কত বড় ছিল?

নীল আকাশের নিচে যতদূরে তাকানো যায়—মাখন রঙের বাঁকানো বাঁকানো হাতির দাঁত এক মানুষ সমান উঁচু হয়ে মাটিতে দাঁড়ানো। আসলে যেন ওসব হাতির দাঁতই নয়! সেরকম দেখতে কোনও গাছ। তবে সে-গাছে একটিও পাতা নেই।

একবার আশংকা হল ট্যাভারনিয়ারের—তবে কি আমি দুনিয়ার সর্বকালের মরা হাতিদের গোরস্থানে এসে হাজির হয়েছি? যেখানে তাদের দাঁত মাটিতে বসিয়ে দিয়ে যার যার স্মৃতি-ফলক বানানো হয়েছে?

এ আমি কোথায় এলাম? সত্যিই কি এই দুনিয়ায় হাতি নামে কোনও জানোয়ার আদৌ আছে? না, সবই রূপকথার বইতে পড়া গল্প? আমি তো সারা ইউরোপ চষে বেড়িয়েছি। সেখানকার কোনও অপেরার স্বপ্নের দৃশ্য নয়তো এটা? যেমন দেখেছি এক সময় মস্কোভিতে—কিংবা ভিয়েনায়—নয়তো প্রাগে?

ট্যাভারনিয়ারের বয়স এখন সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। ইদানীং একটা রোগে পড়েছেন তিনি। যে সব জিনিস তিনি জেগে থেকে নিজের চোখে দেখেন—এক এক সময় মনে হয়—ওসব তো আমি স্বপ্নে দেখেছি। আবার যা তিনি স্বপ্নে দেখেন—জেগে থাকা অবস্থায় তাঁর মন বলে—ওসব তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন আমি জেগে। আসলে সবই গুলিয়ে যাচ্ছে ট্যাভারনিয়ারের।

এবার নিয়ে বেশ বার কয়েক হল তাঁর এই হিন্দুস্থানে আসা। সেই প্যারিস—সেই ইস্পাহান—বন্দর আব্বাস, হরমুজ, সুরাট। মৌসুমী বাতাসের সঙ্গে পাল খাটিয়ে ভেসে আসা। এ কী আশ্চর্য হাতির দাঁতের বাগান। যতদূর দেখা যায়—

শুধুই হাতির দাঁত। মাখন রঙের ফিকে হলুদ।

সেই বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্যারিসের বাসিন্দা জাঁ ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার বুঝতে পারলেন, দরিয়ার পর দরিয়া পার হয়ে হিন্দুস্থানে এসে এলাচ, দারচিনি, নীল, রেশম, সোরা নিয়ে নানান অংক মগজের ভেতর কষতে কষতে মাথাটা গরম হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আছে হীরা, চুনী, পান্নার পছন্দ-পাগল কারবার। লাখ লাখ টাকার লেনদেন। এর দরুন স্বপ্ন হয়েও ব্যবসা চলে আসে ঘুমের ভেতর। তাই তিনি নিশ্চিত করে বুঝতে পারলেন না—স্বপ্ন দেখছেন? না, সত্যি সত্যিই সব চোখের সামনে ঘটছে।

মালের জাহাজ ছেড়েছে বন্দর আব্বাস থেকে। তাতে সাতশোর মতো আরবি ঘোড়াই যাচ্ছে হিন্দুস্থানের শাহী ফৌজের জন্যে। ইরানি তীরভূমি পেরবার পর পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠলেন ট্যাভারনিয়ার। কোথায় হাতির দাঁতের বাগান। সব ভোঁ ভাঁ।

যতদূর চোখ যায়—মৌসুমী বাতাসে তোলপাড় বিশাল কালো দরিয়ার বুক। হিংস্র মাতামা। জল ভেঙে ভেঙে সাদা ফেনার যাতায়াত অবিরাম। তার মাথায় মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে অতিকায় এক তিমির কালচে মাথা—সেই মাথায় দন্তুর হাঁ-মুখ—কেমন হাসি হাসি—যেখান দিয়ে খুব সহজেই একটা ডিঙি নৌকোকে গপ্‌ করে গিলে খেতে পারে তিমিটা।

তিমির সাদা সাদা দাঁত ভাঙা ঢেউয়ের জলের গুঁড়োয় আবছা হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্নের হাসির মতোই এক হাসি ভেসে উঠল ট্যাভারনিয়ারের মুখে। তিনি এই দরিয়া দিয়ে বারবার যাতায়াত করেও এবারই প্রথম এমন তিমির মুখোমুখি হয়েছেন। তিমিটা কি ডুব সাঁতার দিয়ে এসে এই জাহাজের নিচেই ভেসে ওঠার চেষ্টা করবে? তাহলে তো ঘোড়াগুলো সমেত জাহাজটা উলটে যাবে। যাবে ঘোড়াগুলো ভেসে।

এই তিমি সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ায়। এর নাড়ির ভেতর একরকমের থকথকে চর্বি আছে—যা কিনা একশো বছর ধরে সুরভি ছড়ায়। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিস বলা যায়। ইরানের শাহ আব্বাসের মসনদের বাঁ হাতায় খানিকটা এই চর্বি রাখা থাকে। দরবার বসলে তা থেকে সবসময় সুগন্ধি বেরয়। কিন্তু কে এই তিমিকে মারবে? কে করবে শিকার? একটা তিমি মানে রাজ ঐশ্বর্য। ওর পেটের ভেতরকার নাড়ি থেকে সুগন্ধ চর্বি জোগাড় করতে পারলে কে আর হিরে বেচতে বেরয়?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, যেদিকেই তিনি মাথা ঘুরিয়ে বাতাস টানেন—সেদিক থেকেই সুগন্ধে তাঁর নাক ভরে যায়। তবে কি আমি তিমিটার পেটে চলে গেছি? তাহলে কখন তিমিটা আমাদের জাহাজের নিচে ডুব দিয়ে জাহাজটাই উলটে দিল? টেরই পাইনি।

ঘুম ভেঙে গেল ট্যাভারনিয়ারের। এ আমি কোথায় শুয়ে আছি? উঠে বসলেন ট্যাভারনিয়ার। নিশুতি রাত। পাড় বাঁধানো চওড়া চলাচলের রাস্তায় এতক্ষণ তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। নিচে শীতালক্ষ্যার জল বয়ে চলেছে। জায়গাটা

ঢাকায় ঢুকবার মুখে। এখান থেকে ঢাকা এখনও ছ ক্রোশ রাস্তা। দিনে দিনে তিনি এসেছেন। একাই। কেন না, দানিয়েল, মলিয়ের আর আলেকজান্দার থেকে গেছে পথে—রাজমহল পেরিয়ে এক ছোট্ট গঞ্জ এলাকায়। সেখানে ট্যাভারনিয়ার কিনেছিলেন কিছু রেশম। গাঁয়ের তাঁতীদের কাছে। বেশ সস্তায়। সেসব বুঝেসুঝে নেবার জন্যে ওদের পেছনে রেখে আসা। ট্যাভারনিয়ার একা চলে এসেছেন ঢাকা যাবেন বলে। ঢাকায় ঢোকার মুখে আজ সারাদিন তিনি ঘন বুনোটের রেশম চাদর কিনেছেন। কেনাকাটা করে জিনিসপত্তর তাঁতীপাড়ায় রেখে এই রাতের বেলায় শীতালক্ষ্যার তীরে এসে বসেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাতির দাঁতের বন—তিমির নাড়ির সুগন্ধির ঘ্রাণ—সবই খোয়াবের খেলা।

একা একাই হেসে ফেললেন ট্যাভারনিয়ার। এবার নিয়ে এই তিনদফা তাঁর হিন্দুস্থান ঘুরতে আসা। মাথার ভেতর নানান দরিয়ার ঢেউয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের হাতির দাঁত, তিমির সুগন্ধি চর্বি, রেশম, মসলিন, পশম—সব কিছু একাকার হয়ে আছে। এবারই তো বন্দর আব্বাস থেকে সুরাট পাড়ি দেবার সময়—মালাবারী জলদস্যুরা তাঁদের জাহাজের পিছু নেয়। ওদের ভুল বোঝাবার জন্যে ট্যাভারনিয়ারদের জাহাজ থেকে গোটা আটেক আরবি ঘোড়া দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হয়। জলে কয়েক মুহূর্ত সে কী তোলপাড়। অতবড় জানোয়ারগুলো আকাশের দিকে চার পা তুলে বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করছিল!

এসব ছবি আমার মাথার ভেতর ছিল। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম শেষে অতিকায় তিমি? আশ্চর্য! ট্যাভারনিয়ার শীতালক্ষ্যার তীরে গাঁগুলোর দিকে তাকালেন। হিন্দুস্থানে সবাই সন্ধে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে কেন? দূরে কোথায় অন্ধকারের ভেতর ঢোল বাজিয়ে অনেকে গাইছে।

আজ খিদে নেই জাঁ ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ারের। সুবে বাঙলার চেহারা অন্যসব সুবার চেয়ে অনেক সতেজ আর সবুজ। কেনাকাটা করতে বসলে এখানকার মানুষজন গাছের কলা, গরুর দুধ, বাড়ির মিঠাই খেতে দেয়। না খেলে ওদের অপমান হয়। তাই ঘরে ঘরে খেয়ে ট্যাভারনিয়ারের আজ পেট ভর্তি।

তিনি নদীর পাড় থেকে উঠে গাঁয়ের ভেতরে চললেন। শীতের বেশি দেরি নেই। জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে কুয়াশার মিশেল। সরু সরু মাটির রাস্তা। তাও কোথাও কোথাও মেতে ওঠা ধানের বিয়েনকাঠিতে ঢাকা পড়ে গেছে। দূরে দূরে ঘর-গেরস্থালির আলোর ফুটকি। বাড়ি বাড়ি কলাগাছ। এই গাছের ফল সারা হিন্দুস্থানের এক এক জায়গায় এক এক রকম। হিন্দুস্থানের এসব দেহাত এলাকায় মানুষের ঘরগেরস্থির ঘর আর গাইবাছুর রাখার ঘরে খুব একটা উনিশ-বিশ নেই। ট্যাভারনিয়ারের মনে হল—মানুষ আর গাইবাছুর নিজেদের ভেতর ঘর অদলবদল করলেও কারও কোনও অসুবিধা বা সুবিধা হওয়ার কথা নয়।

যেখানটায় শীতালক্ষ্যার তীরে এই গাঁয়ের তাঁতীরা থাকতে দিয়েছে—সে-ঘরটা বেশ বড়ই বলা যায়। আসলে এটা তাঁতঘর। এখন মাকুগুলো খোলা হয়েছে

সারাইয়ের জন্যে। নয়তো নাকি সারারাত ধরে কাজ চলে। ঘরের কোণে চর্বি-জ্বালানো আলোটা উসকে শিখাটা বড় করে নিলেন ট্যাভারনিয়ার। সন্ধেরাত থেকে ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ হালকা লাগছে। শীতালক্ষ্যার বাতাসে বেশ হিম হিম ভাব ছিল। হিন্দুস্থানের শীতকে তিনি বিশেষ গা করেন না, বিশেষ করে সুবে বাঙলায় শীত বলতে যা বোঝায়—ট্যাভারনিয়ারের ধারণা তা বড়জোর প্যারিসের বসন্ত।

মোটা বাঁধাই খাতাখানি খুলে লিখতে বসলেন ট্যাভারনিয়ার। কয়েকদিন হল কিছুই লেখা হয়নি এ-খাতায়। এবার প্যারিস ছেড়ে আসার সময় ইতিহাস-ঘেঁষা পণ্ডিত মানুষ স্যামুয়েল বারবার বলেছেন—যা-ই দেখুন না কেন—অল্প কথায়—দরকারে সংকেতে সব লিখে রাখবেন মুঁসিয়ে। নয়তো একদিন দেখবেন সব ভুলে গেছেন! এমনভাবে লিখুন—দেশে ফিরে খাতায় লেখা কথাগুলো দেখলে যেন সব মনে করতে পারেন।

রোজনামচার কায়দায় কিছু কিছু কথা সব সময়েই লিখে রেখে থাকেন ট্যাভারনিয়ার। তবে এতদিন সে সব কথার বেশিরভাগই ছিল নানান দেশের আশরফি, ডুকাট আর হিরে চুনী নিয়ে।

এবার সুরাটে পা দিয়েই তিনি যা যেমন মনে আসছে—অল্পকথায় লিখে রাখছেন। দেশে ফিরেই স্যামুয়েলকে দেখাতে হবে। গোড়াতেই তিনি লিখলেন উইপোকার কথা। কিন্তু খানিক লিখে বুঝলেন কথাগুলো আর উইপোকায় আটকে থাকছে না। শুরুটা ঠিক এভাবে—

হিন্দুস্থানে উইপোকা কেউ দমন করতে পারে না। এমনকি বাদশাও নয়। এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করতে গেলে চাই নিজেদের বন্দর—যেখানে দরিয়ায় লম্বা পাড়ি দিয়ে এসে জাহাজ জিরোতে পারবে। মানে তাকে সারিয়ে টারিয়ে নিয়ে ফের রং করা যাবে। পর্তুগিজরা গোয়ায় তা করতে পেরেছিল বলেই হিন্দুস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা সবচেয়ে আগে এগিয়ে যায়। তাদের দেখে ওলন্দাজরাও তাই করে। সেজন্যে ওলন্দাজরা এখন অনেক এগিয়ে। কিন্তু ইংরেজরা জাহাজ জিরোবার মতো নিজেদের কোনও বন্দর করতে পারেনি বলেই—তারা আজও হিন্দুস্থানে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু ওলন্দাজরাও পিছিয়ে যাবে—যেমন পিছিয়ে পড়ছে পর্তুগিজরা। কারণ, আর কিছুই নয়—নিজেদের বন্দর থাকলেও পর্তুগিজ আর ওলন্দাজরা পিছিয়ে পড়ছে—শুধু একটি কারণে। দরিয়ায় লম্বা পাড়ি দিয়ে ফিরে এখানকার জাহাজঘাটায় সারাইয়ের জন্যে যখন জাহাজ বসিয়ে দেওয়া হয়—তখন লাখ লাখ উইপোকা এসে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কাঠ কুরে খেতে শুরু করে দেয়। এর ফলে জাহাজের আয়ু ফুরিয়ে আসে। সুতরাং ইউরোপের ভবিষ্যতের কোনও শক্তিকে যদি হিন্দুস্থানে চুটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়—তাহলে তার জাহাজ জিরোবার বন্দর তো চাই-ই—আরও চাই উইপোকা দমনের দাওয়াই।

এবার তাঁর মনে পড়ল ময়ূরের কথা। তিনি লিখলেন—

বিদেশি যিনিই হিন্দুস্থানের ভেতর দিয়ে যাবেন—তিনি যেন কোনও সময়েই

ময়ূরের ছড়াছড়ি দেখে উত্তেজিত হয়ে না পড়েন। বিশেষত জেন্টু এলাকায় ময়ূরকে আলাদা চোখে দেখা হয়। ওখানে ময়ূর মারলে নির্ঘাৎ অশান্তি। কিন্তু মুসলমান বসতি এলাকায় ময়ূর মারলে কেউ কিছু বলবে না। ময়ূর দেখতে যেমন সুন্দর—খেতেও সুস্বাদু। ছাল ছাড়াবার পর মাংসটা সাদা মতো দেখতে। এরা খুব চালাক হয়। তাড়া করে ধরা অসম্ভব। তবে সন্ধে হলেই অন্ধকারে ওরা গাছের ডালে উঠে বসে থাকে। বিশেষ দেখতে পায় না। তখন পাতলা কাঠের ওপর আঁকা ময়ূরের সামনে একটা আলো জ্বালিয়ে নিয়ে সবসুদ্ধ গাছের ডালের দিকে এগিয়ে দিতে হবে। আঁকা ময়ূর দেখে আসল ময়ূর কথা বলতে এগিয়ে আসবে। সেই সময় সরু দড়ির ফাঁসে ময়ূর ধরা পড়ে। মনে রাখতে হবে—সবটাই করতে হবে সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংবা সন্ধেরাতের পর।

এবার ট্যাভারনিয়ারের মনে বিশেষ একটা ঘটনা ছবি হয়ে ফুটে উঠল।

সেদিন ছিল ১২ আগস্ট। ১৬৪২। এই তো কদিন আগের কথা। আমরা পাটনা শরিফ পেরিয়ে এসে গন্ডকের শনিচরী ঘাটে ভাড়ার বজরা বেঁধেছি। বর্ষার শেষে গন্ডকের জল একদম গৈরিক। এ সময় এখানে রফতানির সোরা নদীজলে ধোয়া হয়। সেরা সোরা কেনার সময় এটাই। সকাল থেকে কেনাকাটা ভালই হল। আরও কিনতাম। কিন্তু গন্ডকের উজানে একটি মাত্র রাস্তা—যা-কিনা বন্ধ করে দেওয়ায় আমরা উজানের গাঁগুলো ঘুরে আরও সোরা কিনতে পারলাম না। বেলাবেলি খেয়ে নিলাম সবাই। দানিয়েল হিন্দুস্থানি খিচুড়ি ভালই রাঁধে। রাঁধার কথা এজন্যে আসছে—কারণ, শনিচরী ঘাটের মতো মাঝারি বসতি এলাকায় যা দু-চারটে সরাই সবই লোকজনে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাই লোকালয়ের মুখে তাঁবু খুলে নিজেরাই রান্নার জোগাড় করি। অবশ্য মলিয়ের রান্নার চেয়ে নিজের ছবি আঁকাতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে খেতে খেতেই পথচলতি মানুষজনের মুখে শুনলাম—বাদশা শাহজাহানের শালা শায়েস্তা খাঁয়ের বেগম এদিকে এসে পড়ায় তাঁর পাহারার ঘোড়সওয়াররাই সরাইখানাগুলোর দখল নিয়েছে। গন্ডকের উজানি গাঁগুলো বেগমসাহেবা দেখতে বেরনোয় ওদিককার রাস্তাটি সাধারণের জন্যে এখন বন্ধ।

আমরা তো খাওয়াদাওয়া করে তাঁবুতে গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তাঁবুর পেছনে সে কী মড়মড় আওয়াজ! যেন অনেক করাতি মিলে বড় বড় গাছ কেটে নামিয়ে দিচ্ছে। বিকেল হবে হবে।

আমরা পড়িমড়ি করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি সে এক দৃশ্য। কুড়ি বাইশটি হাতি একসঙ্গে শুঁড় তুলে গাছের পর গাছ টেনে মড়মড় করে ভাঙছে। ওইসব বিরাট জানোয়ার—দলবেঁধে তারা যেন যুদ্ধে নেমেছে। তাদের পায়ের দাপাদাপি—বুক ফাটানো আতঙ্কের চিৎকার—গাছগুলোর শব্দ করে ভেঙে পড়া—সে যেন এক সত্যিকারের ভূমিকম্পের অভিনয় চলছে। সে এক অসহ্য ভূমিকম্প। দৃশ্য হিসেবে এঁকে রাখার মতো। মলিয়ের তো দূরে খাতা নিয়ে বসল। বিশ-বাইশটি হাতির একসঙ্গে চারটি করে পায়ের ধামসানো—দাপাদাপি—তা যেন বুকের ভেতর গিয়ে এক যুদ্ধের গান হয়ে ওঠে।

ব্যাপার কী ?

দূরে দাঁড়ানো ভিড় থেকে জানলাম—শায়েস্তা খাঁয়ের বেগমসাহেবা চলেছেন ঢাকায়। সেখানে সুবেদার শাহজাদা সুজার সঙ্গে নিজের মেজো মেয়ের বিয়ের কথা পাড়বেন। পথে গণ্ডকের এই শনিচরী ঘাটের বসতি থেকে তাঁকে উপযুক্ত উপহার—ভেট দিয়ে তেমন সংবর্ধনা জানানো হয়নি বলেই রাগে রাগে বেগমসাহেবা হাতির দঙ্গল দিয়ে এই ভাল ভাল গাছের বাগান মাটিতে মিশিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।

শনিচারী ঘাটের বসতি এলাকা ছোটই বলতে হবে। সেখানে বাদশা শাহজাহানের শালা সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের বেগমসাহেবার এসে পড়া একটা বড় ঘটনা। তাই সন্ধের মুখে সরাইখানার দাওয়ায় বসে বড় ঘরের অনেক ছোট কাহিনী কানে এল।

শাহী খানদানে বাঁদির পেটে যদি বিয়ে করা বেগমের পেটের বাচ্চার আগে বাচ্চা জন্মায় তো সেই বাঁদির ছেলেকেই বড় ছেলে মনে করা হবে—আর সে-ই পাবে সব। এজন্যে নাকি সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের বড় মেয়ের অন্দরমহলে গত একমাসে আটজন বাঁদির গর্ভপাত করাতে হয়েছে। কেননা, বড় মেয়ের এখনও কোনও বাচ্চা হয়নি।

সুবে বাঙলায় যাঁরা আসবেন—গোমাংস, মাছ, পাখির মাংসের অভাবে পড়তে হবে না তাঁদের। প্রচুর পাওয়া যায়। খাবার জলেরও কোনও অভাব নেই। তবে আমি মোষের মাংস খেতে বারণ করব। খেয়ে দেখেছি। খেলেই আমাশা হয়।

লিখতে লিখতে ট্যাভারনিয়ার শীতালক্ষ্যার বুকে তাকালেন। ছোট ছোট ডিঙিতে দপদপানো আলো। বছরের এ সময়টায় প্যারিসে সিনের বুকেও অমন আলো জ্বলে। দানিয়ুবেও তাই দেখেছি। দুনিয়ার সব নদী একই ধারায় বয়। জন্ম পাহাড়ে। লয় সাগরে। ট্যাভারনিয়ার লিখতে লাগলেন—

হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মস্কোভি, তুরস্ক, ইতালি, স্পেন—যেখানেই গেছি—দেখেছি—দিনকে দিন খাবার দাবারে দারচিনির চল বেড়েই চলেছে। কিন্তু ফলন বলতে সেই এক সিংহল। দরও আগুন। তার ওপর জাহাজে করে নিয়ে যেতে যেতে খোলের স্যাঁতসেঁতে ভাবটা যদি সে দারচিনিতে লেগে যায় তো দর কমে যাবে।

তাই কিছুদিন ধরে ভাবছি—কোচিনের কাছাকাছি চাষীরা একরকম দারচিনি চাষ করে। ঠিক চাষ করে না। কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছে চাষের। ওখানে একরকম বুনো দারচিনি আপনা আপনি জন্মায়। বলা যেতে পারে—গরিব মানুষের দারচিনি। দামও খুব কম। অথচ স্বাদে—চেহারায় একদম আসলের মতো। তবে বেশিদিন ঘরে রাখা যায় না। রাখলে দারচিনির ভাবটা উবে যায়। ভাবছি কোচিনের এই বুনো দারচিনি ইউরোপের বাজারে চালান দেব। কেমন হয় ?

এবার ট্যাভার্নিয়ার খাতার পাতা উলটে একদম ওপরে লিখলেন—১৬৪২ সনের ১৯ আগস্ট দিনটি বড় আনন্দে কেটেছে আমাদের। ঠিক কুঠি নয়—আবার দুর্গও নয়—অথচ বেশ জবরদস্ত ভাবেই ওলন্দাজরা ঘরবরা আর পুনপুন নদীর সংযোগে উঁচু ডাঙায় তাদের ডেরা বেঁধেছে। এলাহাবাদ থেকে চারদিন চার রাতের পথ জলে ভাসতে ভাসতে ওখানে এসে আমরা ঠেকি। সারা পথে বন্দুক-ধারী, ঘোড়াদাবড়ানো, সশস্ত্র মুসলমান ফাকিরদের সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে সারা হিন্দুস্থানে তিরিশ লক্ষের মতো ফকির-সাধু-দরবেশ সব সময় ঘুরে বেড়ায়। তা ওলন্দাজরা আমাদের পেয়ে খুব আদর যত্ন করল। যত রকমভাবে আনন্দ উপভোগের আয়োজন করা সম্ভব এ দেশে করল সবই তা। বার কয়েক পুনপুনের বুকে ঘুরতে বেরলাম আমরা। ইউরোপের সবজি খেতে যতরকমের তরিতরকারি হয় তার সবগুলোই এ সময়ে পরিবেশন করা হল নানা পদে তা রান্না করে। খাওয়ানো হল কয়েকরকমের স্যালাড, বাঁধা-কপি, অ্যাসপারাগাস, মটরশুঁটি—বিশেষ করে জাপান থেকে আনা এক ধরনের সিমের বীজ—তাও। ওলন্দাজরা তাদের এখানকার ক্ষেতে-খামারে ইওরোপের সব রকম শাক, তরিতরকারি, ডাল ফলাতে খুব উৎসাহী। খুব যত্ন করে ওসব এখানে আবাদ করে চলেছে। তবে এ সত্ত্বেও পারেনি আর্টিচোক ফলাতে। আমরা খেতে বসে দেখছিলাম—উঁচু ডাঙায় বসানো দুটি ঘুরন্ত কামানের সামনে সব সময় ওলন্দাজ কামানচীরা বসে আছে।

শাহজাদা দারা কান্দাহার রওনা হয়েছিলেন প্রচণ্ড রোদের ভেতর। বালি গরম। পাথর গরম। হাতির পিঠে চামড়ার গাদেলা পর্যন্ত গরম ছিল তখন। আর এখন? শীতের মুখে মুখে লাহোর বড় মনোরম। বাতাস বিকেল পড়তেই যেন হিম কুড়োবার জন্যে পাহাড় থেকে রাভির তীরে নেমে আসে।

সেই তীর ধরেই লাহোরে মুঘল দুর্গ। এখন আগের চেয়ে সূর্যের আলো অনেক নরম। রবি আউয়ল মাসের সাত তারিখ। গিয়াথপুর আর আলমগঞ্জের দিকে সূর্য খানিকটা হেলেছে। দুপুর পেরলেও বিকেল আসতে বেশ দেরি।

লাল মাকরানা পাথরের সারাটা দুর্গ যেন নরম রোদেও জ্বলজ্বল করে উঠল। দুর্গের সামনের কালো পাথরের প্রাকার ছাড়িয়ে অনেকটা নেমে এলে তবে ছাই ছাই রঙের পাথরের চাতাল। পেয়ারের ফতে-জংয়ের পিঠ থেকে নেমে শাহজাদা দারাশুকো দেখলেন—দূরে প্রাকারের কালো পাথরে দাঁড়িয়ে খোদ বাদশা। শাহজাদা জানেন—ওখানে যিনি দাঁড়িয়ে তিনি এখন শুধুই আব্বা হুজুর শাহজাহান। আর কিছু নন তিনি। স্রেফ একজন আব্বা হুজুর—যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পহেলা ছেলেকে বুকে নেবেন বলে।

দারা যেন বাদশার সেই বিখ্যাত দুই চোখ এতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছিলেন। লালচে মুখের ভেতর ভেসে থাকা দুই নীল-ঘেঁষা চোখ। তাতে এতক্ষণে অবশ্যই জল এসে দাঁড়িয়েছে। ধাপ টপকে টপকে শাহজাদা দারা ছাই ছাই চাতালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন অনেক নিচে শাহী সড়কে কান্দাহার ফেরত বিশাল মুঘল

ফৌজ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে উটের দল বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে। বাতাসে ভেসে তাদের গলার আওয়াজ ওপরে উঠে আসছিল। যেন কতকালের চাপা কান্না। শাহজাদা মনে মনে বললেন, বাজি। আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। এবারও হল না।

লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে প্রাকারের দিকে এগোতে এগোতে দারা বিড়বিড় করে বললেন—বার বার দু'বার। দু'বারই অভিযান হল। সেই খাইবার। জালালাবাদ। কাবুল অর্গন্ধব ডিঙানো। হেলমন্দের তীরে গিয়ে হাজির হওয়া। কিন্তু আশ্চর্য! দু'দুবারই কান্দাহারের জন্যে আমায় কিছুই করতে হল না। দুশমনই হাজির হল না। পর পর দু'বার।

কালো পাথরের প্রাকারে শাহজাদা পা দিতেই দুর্গের সামান বুরুজ থেকে একই সঙ্গে নাকাড়া, ঢোল, সানাই, দিগর বেজে উঠল। প্রাকারে পা দেওয়া মানেই বাদশার মবারকে হাজির হওয়া।

দারাশুকো কোমর অব্দি ভাঁজ হয়ে কুর্নিশ করতে লাগলেন। বাদশা শাহজাহান আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এই ছেলের মুখ না দেখলে তাঁর বুক ঠাণ্ডা হয় না। কেউ কি জানে—গত চার পাঁচ মাস হিন্দুস্থানের বাদশা নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সুখদোলায় উঠে বসে পশ্চিমমুখো হয়ে বারবার এবাদত জানিয়েছেন। খোদা! দারাকে সুস্থ আস্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনো। এই আমার দোয়া—

বাদশাকে এগিয়ে আসতে দেখে দারাশুকো নিজেই ছুটে এগিয়ে এলেন। শাহজাহান তাঁকে দু'হাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন। বাদশার পিঠের ওপর দিয়ে দুর্গের ভেতর তাকিয়ে শাহজাদা বুঝলেন, লড়াই ফতে করে ফিরলে যে আদর-খাতিরের আয়োজন হয়—বাদশা নিজে তার আয়োজন করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঠিক এই সময় শাহজাদার সম্মানে পর পর তিনবার তোপ দাগা হল। সেই আওয়াজের ভেতর শাহজাহান বললেন, তুমি জয়ী হয়ে ফিরেছ—

দারা মনে মনে বললেন, মুল্লা শা বলেছিলেন—আমাদের ছোঁড়া তীর সবই ঈশ্বরের।

আবারও তোপের আওয়াজ। দুর্গের পাথুরে দেওয়ালে সে আওয়াজ আছড়ে পড়ে যেন দোগুণী আওয়াজ তুলল।

শাহজাদা অনেক সাহস করে বললেন, সিস্তান, ফারাহ, হিরাট আমাদের কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল হজরত। তাহলে ভবিষ্যতে কিল্লা কান্দাহার নিয়ে আগ্রাকে আর মাথা ঘামাতে হত না।

বুকের ভেতর ছেলেকে আরও আঁকড়ে ধরে বাদশা জানতে চাইলেন, তুমি কতদূর এগিয়েছিলে?

—আলমপনা! আপনার হুকুম মতো গজনির ওপারে যাইনি।

—ঠিকই করেছ। রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জং আর সৈদ খাঁ বাহাদুর জাফর জং তিরিশ হাজারি ফৌজ নিয়ে তো কিল্লা কান্দাহারে থেকেই গেল।

দারা কোনও কথা বলতে পারলেন না।

॥ একাত্তর ॥

এবারও হল না বাজি। এবারও হল না—

শাহজাদার একথায়—শাহজাদী জাহানারা কোনও জবাব দিলেন না। তিনি যেমন লিখছিলেন তেমনই লিখে চললেন। সাদা সুন্দর কাগজে। পালকের কলমটি এক এক সারি হরফের শেষে যেই ফের নতুন সারিতে নেমে আসছিল— অমনি বাজির হাতখানি এক মধুর ভঙ্গিতে ফের হরফের পর হরফ ফুটিয়ে তুলছিল। তাতে লাবণ্যের সঙ্গে এক অসাধারণ তৈমুরির মনের জেদও মিশে যাচ্ছিল।

এটা শাহাজাদী জাহানারার অন্দরমহল। একমাত্র শাহজাদা দারা কোনওরকম জানান না দিয়েই এখানে চলে আসতে পারেন। তাঁর বাজির দিনরাতের হাজিরা কোয়েল নামে বাঁদিটি এইমাত্র ঘরের কোণে জল ছেটানো কিছু সেঁউতি রেখে দিয়ে গেল। তার সুবাস যতই তীব্র হচ্ছিল ততই দারাশুকো মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলেন—বাইরে দুপুরে আগ্রার অস্থির গরমে মান্ডি এলাকায় পা রাখা কঠিন হয়ে উঠলেও রাজধানীর চারদিক থেকে ফুলের পসারিরা মাঠ ভেঙে— যমুনা ভেঙে লালচকের দিকে পাড়ি জমিয়েছে এতক্ষণে। সন্ধে সন্ধে বাতাসে শীতের আগাম দিন এসে পড়ে আজকাল। রাতে তো শীত শীত করেই। যত গরম এই দুপুরে। আর তখনই সারা রাজ্যের ফুল রওনা হয় রাজধানী।

—কাকে চিঠি লিখছ বাজি ?

জাহানারা বড় চোখে ফিরে তাকালেন ছোটে ভাইয়ের মুখে। নিশ্চয় তোমাদের ছত্রশালকে নয় !

দারা তাঁর দিদির এই গম্ভীর মুখে তাকাতে পারলেন না। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, তা জানি বাজি। বলেও দারার মনে হল—ছত্রশালের ও-চিঠিতে বাজি যেন এখন এক জখমি আওরত।

—এই দ্যাখো—বলে চিঠিখানি এগিয়ে দিলেন জাহানারা।

সুন্দর নস্তালিক ঢঙে লেখা। চিঠিখানি শাহী দেওয়ানখানায় যাবে। গঙ্গার গা ধরে হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে নীল চাষীরা ইংলিশস্তানি ব্যাপারীদের কাছ থেকে বড় কম দাদনে চাষে নামছে। মাঠ থেকে ধুলোমাখা নীলের মণ উঠছে মাত্র বত্রিশ তনখায়। আর সেই নীল লন্ডনের জন কোম্পানি ছেচল্লিশ তনখা মণে জাহাজে তুলছে। এভাবে দেহাত ঠকুক তা চায় না মুঘলশাহী। তাই দেওয়ানখানায় তেপনচিরা এগিয়ে গিয়ে দাদনের পরিমাণ বাড়াবার ব্যবস্থা করুক। এজন্যে গাওয়াইয়া—মানে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে হিন্দুস্থানি মহাজনদের কাছে ইংলিশস্তানি ব্যাপারীদের হুন্ডি দেখানো যেতে পারে। কাজে সুবিধার জন্যে বাজেয়াপ্ত করা একখানি হুন্ডি এই চিঠির সঙ্গে দেওয়া হল। তাতে দেখা যাবে—মহাজনের সঙ্গে তনখার কারবারে নীলের মণ বলা হচ্ছে ছেচল্লিশ তনখা !

—এতদিকেও তোমার নজর বাজি ?

—ছোট ভাই। তুমি শাহী ইচ্ছায় কান্দাহার, হিরাট কর। আর আমি আগ্রা থেকে বেরিয়ে সরেজমিনে সব দেখে এটুকু করতে পারব না? তাতে যদি দেহাতিদের নসিব কিছু ফেরে—

—তুমি অনেক কিছু পার বাজি। কিন্তু একটা কথা বলি—জন কোম্পানিকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে একটা বিপদও হতে পারে—

—বিপদ ? কী বিপদ দারা ?

—ধরো, ওরা যদি দাদনের পরিমাণ বাড়াবার চাপাচাপিতে অস্থির হয়ে শেষে ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে অন্যত্র যায়—

—অন্যত্র ? নীল আর কোথায় পাবে। আগ্রা, ফতেহাবাদ, ফৈজাবাদ এলাকার দেহাতি চাষীরাই শুধু নীল বোনে।

—বাজি। নীল এখন হিন্দুস্থানের বাইরেও বড় দরিয়ার পারে খুদে খুদে দ্বীপে বোনার চেষ্টা চলছে। সুবে বাংলা থেকে তেমন খবরই এসেছে দেওয়ানখানায়।

—আগে বুনুক তো। তিন চার মরসুমের ফসল উঠুক আগে তখন দেখা যাবে।

—দাদন বাড়াবার চাপে ধরোই যদি ইংলিশস্তানি ব্যাপারীরা ডেরাডাণ্ডা তুলে নেয় হিন্দুস্থান থেকে তো—তার বদলে মুঘলশাহী থেকে আমরা কি দেহাতী চাষীদের কিছু দিতে পারব ? আগাম ? দাদন ? দান ?

শাহজাদী জাহানারা মুখ তুলে তাঁর ছোটে ভাইয়ের মুখে তাকালেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, আকবরি আমলে তো নীরস চাষে শাহী খাজানাখানা থেকে তনখা ঢালা হত।

—সেসব পাট কবেই চুকেবুকে গেছে বাজি। এখন ঢালা হয় কিল্লা কান্দাহার জবরদস্ত করতে।

—শুনেছি আব্বা হুজুর বলখ্—বাদকশানেও ফৌজ পাঠাবেন।

—তবে তো হয়েই গেল। একেই এই দেহাতি মানুষগুলোর রুজি রোজগার বলতে কিছুই নেই। পেটের জ্বালায় ডালরুটির জন্যে হন্যে হয়ে ফৌজে গিয়ে ভর্তি হয়। যাও বা নীলের চাষ করে খাচ্ছে—ইংলিশস্তানি ব্যাপারীরা ব্যবসা গুটিয়ে নিলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হবে ওদের।

সমস্যাটা যে কঠিন—তা এখনও বোঝাই যায় ভাই বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে। কেউ কোনও কথা বলতে পারছেন না। একটু পরে শাহজাদা দারা বলে উঠলেন, দু'দুবার কান্দাহার ছুটলাম লড়াই করতে। তাছাড়াও আব্বা হুজুরের সঙ্গে হামেশা লাহোর, মুলতান, ইলাহাবাদ করছি তো—কী বলব বাজি—মঞ্জেলের পর মঞ্জেল এগোচ্ছি—মনে হচ্ছে সুবা কে সুবা কোনও মানুষজন নেই। সুবেদার, ফৌজদার যদি শুনল—তার এলাকার ভেতর কারও কিছু জমেছে তো চড়াও হও সেই দেহাতি মানুষের ওপর। লুটেপুটে তাকে ফকির করে দাও। মিশকিন বানিয়ে ফেল তাকে। ভিক্ষের মালা হাতে সে বেরিয়ে পড়ুক। দেহাতকে

দেহাত বিলকুল ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

এতবড় শাহীর—বলতে গেলে হিন্দুস্থানের বাদশার পরেই সবচেয়ে বেশি তাগদ যাঁর হাতের মুঠোয়—সেই শাহজাদী-বেগম জাহানারা নিরুপায় মুখে তাঁর ছোটে ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে আছেন এখন। কিছুই করার নেই তাঁর। বাদশা শাহজাহানের মাথায় সবসময় ঘুরছে লাল কিল্লার চাঁদোয়ার সোনার সুতোর কাজ, তাজমহলের মিনারের সামানবুরুজ—ঘুরছে জামা মসজিদের চাতাল কোন পাথরে তৈরি হবে তার নকশা। তাঁর ফৌজ দোবারা কিল্লা কান্দাহারে হামলা রুখতে ছুটে গেছে। এখন হিন্দুস্থানের গা ধরে অক্ষু নদীর কোলে বলখ্-বদকশানে ফৌজ পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। কোন দেহাতে কোন দেহাতি খেতে না পেয়ে—লুটেরার লাঠির ঘায়ে রাস্তায় ভিক্ষের মালা হাতে বেরিয়ে পড়ল মিশকিন হয়ে—সে খবর কে রাখে। সে খবর নেবার সময়টা তিনি পাবেনই বা কখন। সেই সময়টায় বাদশা শাহী হাতিদের ইয়াদদস্ত করবেন। হাতিরা ভাল আছে কিনা—তাদের খাবারে ঠিকমত ঘি, চিনি পড়ছে কিনা—তা দেখতে হবে না?

হায় শাহী! হায়রে শাহী! ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা দারাশুকো বলে উঠলেন—দেহাতি এই মানুষগুলো বেশিরভাগই হিন্দুস্থানের আদি বাসিন্দা। এই হিন্দুরা ফৌজে গিয়ে সারাদিন কুচ করার পর ছাতু মেখে সন্ধেবেলা সামান্য ঘিয়ে ডান হাতের আঙুলের ডগা ডুবিয়ে নেয়। সেই আঙুলে ছাতু খেতে খেতে ঘিয়ের গন্ধ পায় সামান্য। তাই সই। তাতেই তৃপ্তি। বলব কি বাজি—শাহী ফৌজদার, মুকদ্দরদের হাতে মার খাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যেই এরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। মুসলমান হলে এই জুলুমির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমাদের নসিব এমনই বাজি—ওরা জানলই না—ইসলাম কত উদার। জুলুম থেকে রেহাই পেতে ওদের মুসলমান হতে হল।

—সাধে কি পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীন-ইলাহির খোয়াব দেখেছিলেন ছোটে ভাই! এই জুলুমশাহী ইসলামেই কালি মাখাচ্ছে।

—জান বাজি, পরদাদা সাহেবের দরবারে একদিন মিহরাজ-ই-জিসমানী নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতর মহাতর্ক চলছে। এমন সময় আকবর বাদশা এক পায়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এ অবস্থায় আমি আমার অন্য পা মাটি থেকে ওঠাতে পারি না। তাহলে কেমন করে হজরত বেমালুম নিজের দেহখানি উড়িয়ে নিয়ে সশরীরে বেহেস্ত গেলেন?

স্থির চোখে জাহানারা বললেন, তুমি কী বলতে চাও?

—আকবর বাদশা ভুলে গিয়েছিলেন—তিনি হিন্দুস্থানের মালিক হলেও হজরত রসুলুল্লা যেখানে—সেখানে উঠতে পারেননি।

—দ্যাখো দারা, হজরত মানুষের শরীরে, কী সূক্ষ্ম শরীরে নিমেষের ভেতর সপ্তম স্বর্গে গিয়ে খোদাতালার সঙ্গে দেখা করে ফের নিজের গরম লেপের ভেতর ফিরে আসেন—এই নিয়ে ইসলামের পুঁথিপত্রে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। মোল্লারা বিশ্বাস করেন মিহরাজ-ই-জিসমানী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এটা মেনে

চলাই ইমানের অংগ। যারা অন্যরকম বিশ্বাস করে—তারা নাস্তিক, তার্কিক, ধর্মদ্রোহী, স্বাধীনচিন্তার পথিক মোতাজেলা।

বলতে বলতে জাহানারা দেখলেন—বাইরের ধূপ থেকে উঠে আসা আগুনে গরম যেন অন্দরমহলের ভেতর দারার সুন্দর মুখকে ঘিরে আভা হয়ে ঝলসাচ্ছে। চোখের চাহনি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কোনও বিশ্বাসের কথা বলতে যাবার আগে ছোটেভাই এমনটি হয়ে যায় তা তিনি নিজেদের ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন।

শাহজাদা দারা যেন ঘুম থেকে উঠে এইমাত্র চোখ মেলেছেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, বাজি! তুমি জান—সত্য কতদূর—সত্য কতখানি—এই নিয়ে আমি রিসালা-ই-হকনুমা লিখে চলেছি।

জাহানারা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—খোদার হুকুমে আমি একাজে নেমেছি। —বলতে বলতে শাহজাদা দারা উদাত্ত গলায় প্রায় গেয়ে উঠলেন—

হস্ত আজ কাদের মর্দা আজ কাদেরী।
আঁচে মা গোপ্তেম্ ফাসেহেম্ ওয়া আস্ সালাম্

—মনে কোরো না বাজি—রিসালা-ই-হকনুমা একজন সামান্য কাদেরীর লেখা। আসলে খোদ যিনি কাদের—সেই সর্বশক্তিমান আল্লা—এই খেলা তাঁরই বাণী বলে জানবে।

জাহানারা কোনও কথা বললেন না। তিনি জানেন, আসলে দারার জীবন, মন, চিন্তা, সংস্কার, বিশ্বাস পাহাড়ী ঝরনার মতো উৎসাহ, আশায় ভরপুর। সদ্য ঈশ্বর রহস্যে ডুব দিয়ে নাদান বালকের মতো দারা নতুন জামা কিংবা সুন্দর খেলনা পেয়ে অধীর হয়ে পড়েছেন। তাঁর সারাটা মন আনন্দে ছাপিয়ে উঠেছে।

শাহজাদা বললেন, হজরত হারার গুহায় বসে সুলতান-উল-আযকর, হবস্-ই-দম অভ্যেস করায় তাঁর শরীরের ধর্মই অন্যরকম হয়েছিল। গাওয়াইয়া চাও বাজি?

এবারও জাহানারা কোনও কথা বললেন না। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, তাঁর চারটি ছোটে ভাইয়ের ভেতর এই ভাইটির গা থেকে অন্য এক সুবাস বেরয়। সুবাস ওপরের ধাপের চিন্তা নিয়ে মগজ মশগুল থাকলে তবেই শরীর থেকে বেরয়।

—তবে শোনো। হজরত রসুলাল্লার শরীরের ওপর কখনও মাছি বসেনি। কিংবা মাটিতে তাঁর ছায়াও পড়েনি কখনও। কারণ আর কিছুই নয়। মাটি, জল, আগুন আর হাওয়ায় আমাদের শরীর গড়ে উঠলেও হবস্-ই-দমের দরুন মহাপুরুষরা স্থূল শরীরকে বায়ুর মতো করে ফেলেন—অথচ তা দেখাও যায়। বাজারের গোলমালের ভেতরেও সাধকরা আল্লার নাম ভ্রমরগুঞ্জনের মতো—পিঁপড়ের সারি বেঁধে চলার শব্দের মতোই শুনতে পান।

শাহজাদী জাহানারা কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। কী এক ভয়ে তাঁর মন ভরে গেল। শাহীকে ঘিরে কাঠ মোল্লাদের ভিড়। তার ভেতর

সত্যানিষ্ঠ, সরল এই ছোটে ভাইটি না হারিয়ে যায়। মহতব বাগের কালচে গোলাপের মতোই নিঃসঙ্গ, সুন্দর এই নওজওয়ান শাহজাদা হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। কিন্তু তার আগেই না দুনিয়ার গরম আঁচে গোলাপটি খসে পড়ে।

ভাইবোন নিজেদের অজান্তে কয়েক পা এগিয়ে খোলা অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিচে বিকেল-ঘেঁষা আগ্রার শাহী সড়ক নানান মানুষ আর সুখদোলা, ঘোড়া, উটে ভর্তি। মাঝে মাঝে ফৌজি মনসবদার। তার আগুপিছু পাহারাদার ঘোড়সওয়ার। সেদিকে তাকিয়ে দু'জনেরই চোখ ভারি হয়ে এল।

শাহজাদী জাহানারা হঠাৎ বলে উঠলেন, তাহলে আমরা কী করতে পারি ছোটে ভাই?

—আমি তো কোনও পথ দেখি না। একশো বছর ধরে গড়ে ওঠা এই মুঘলশাহীর গা ধরে অনেক শ্যাওলাও গজিয়ে উঠেছে।

—তুমি জুলুমের কথা বলছ দারা?

—শুধু জুলুমশাহী কেন বাজি। কাঠমোল্লাদের একগুঁয়েমি—সত্যকে শুধু নিজেদের ঝোলায় লুকিয়ে রাখার মিথ্যে ঘমণ্ড। সব—সব। এক এক সময় তো আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এতদিন ছিল কিল্লা কান্দাহার। তোমারই মুখে শুনলাম—বলখ, বদকশানও আব্বা হুজুরের খোয়াবে ভর করেছে। এই তো চিরকালের শাহীর স্বভাব। দখল। বড়—আরও বড় হয়ে ওঠা। যার কোনও শেষ নেই বাজি।

—তাহলে কী করব দারা? তুমি আমার ছোটে ভাই হলেও আমি তোমার মুরিদ।

—ছিঃ। একথা বলে লজ্জা দিও না বাজি।

—তাহলে দেওয়ানখানায় কি এ-চিঠি পাঠাব?

—পাঠাও। তবে এক্ষুনি ইংলিশস্তানি ব্যাপারীদের ঘাঁটিয়ে কোনও দরকার নেই।

—বেশ। তাই হবে।

—জান বাজি—আজকাল সারা আগ্রা দুর্গ থেকে আমি একটা গন্ধ পাই।

—কিসের গন্ধ দারা?

—যেন অনেক মানুষ—অনেক মানুষের ইচ্ছা, ক্ষোভ, আহ্লাদ—সব কিছু দুর্গের চাতালের নিচে চাপা পড়ে আছে—সে-সবের গন্ধ। কোথাও যেন সুন্দর কিছুর বেড়ে ওঠার জায়গা এটা নয়।

—আমারও ভয় করে দারা। আমি যখন শিবিকায় বসে জামা মসজিদে যাই—পরিষ্কার দেখতে পাই—হায়াত বক্স বাগের ফোয়ারার পাশে দাঁড়ানো রৌশন-আরার চোখ আমার দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ছে।

—কেন? কেন?

—সে চোখে কোনও শান্তি নেই দারা। নেই কোনও আহ্লাদ।

—এক জায়গায় দেখেছিলাম—সেখানকার শিশিরবিন্দুতেও শান্তি।

—কোথায়? কোথায় দারা?

—কাশ্মীরে। কিষেণগঙ্গার সামনে পাহাড়ী গুম্ফায়—মুল্লা শার খানকায়।

—ওঃ। —বলে চুপ করে গেলেন জাহানারা।

—আমি যখন শাহ সফির বিরুদ্ধে লড়তে কান্দাহারের দিকে এগোচ্ছি তখন আমি মুল্লা শাহের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। জবাবে তিনি লিখলেন—যখন তুমি দুশমনের দিকে তীর ছুঁড়েছ—তখন সে-কাজ তোমাকে দিয়ে হয়নি—ঈশ্বর নিজেই সে-কাজ করেছেন। কিছুদিনের ভেতরেই ইরানের শাহ এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে আর উঠতেই পারলেন না। তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে বিষ দিয়েছিল। তাতেই তিনি কাসানে পেঁছে মারা যান।

জাহানারা যেন কোনও সুখস্মৃতির ভেতর দিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন। মুখে এক অদ্ভুত আনন্দ। আস্তে আস্তে বললেন, আমি ওঁকে চিঠি লিখতাম। উনিও আমায় জবাব দিয়েছেন।

—বাজি! হুজুর তো বলতেনই—তুমি এক অসাধারণ আওরত। ঈশ্বরের রহস্য তুমি গভীরভাবে জানো।

—একটা কথা বলি দারা। একদিন মক্কার দিকে মুখ করে চোখ বুজেছি। সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছি মুল্লা শাহর দিকে। মন চাইছিল হজরত মহম্মদকে। এইভাবে কতক্ষণ আছি তার কোনও খেয়াল নেই। এই সময় পরিষ্কার দেখতে পেলাম পয়গম্বর হজরত মহম্মদ আর তাঁর চার বন্ধুকে। কাছেই দাঁড়ানো মুল্লা শাহ। পয়গম্বর মুল্লা শাহকে বললেন, মুল্লা শাহ—তুমি ওই তৈমুরিকে কেন আলো দিয়ে ভরিয়ে দিলে? জানো দারা, ঈশ্বরের করুণার কোনও শেষ নেই। নয়তো আমার দয়ার গুরুর হাত দিয়ে আমার মতো সামান্য আওরতকে সারা জীবনের চাওয়া সেই পয়গম্বরকে দেখিয়েছিলেন। ছোটে ভাই। তোমার কথাতেই আমি তো মুল্লা শাহর কাদিরীতে দীক্ষা নিয়েছি। তোমার মতো আমিও তাঁর গুণগান করি। তোমার আর আমার শরীর দুটি—কিন্তু আত্মা একটি।

বাজির একথায় শাহজাদা দারার দু'চোখ জলে ভরে গেল। তিনি বহুকষ্টে চোখ তুলে বড় বোনের মুখে তাকালেন।

জাহানারা কোনওমতে বলতে পারলেন, আমাদের বাপদাদারা কেউই এই পথে ঈশ্বর সন্ধানে নামেননি দারা। এই পথে কেউ সত্য খুঁজতে বেরননি। তৈমুর বংশে একমাত্র আমরা—এই ভাই আর বোনই খুশনসিবি বলতে পার—কথা শেষ করে বড়বোন এগিয়ে এসে নিজের ওড়না দিয়ে ছোটে ভাইয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

আগ্রায় বিকেল পড়ে এল বলে। একটু বাদে হামামগুলোর দুয়ারে দুয়ারে যুঁই, বেলি ফেরি হয়ে ফিরবে। নিচের মানুষের স্রোতকে দুর্গের খোলা অলিন্দ থেকে মনে হয়—বুঝি বা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এইভাবেই চলেছে। সেদিক থেকে চোখ না সরিয়ে দারা বললেন, দ্যাখো বাজি তোমায় একটা কথা বলি। তুমি মানুষটি কিন্তু এই শাহীর বড় বড় বদলি, খেতাব, খেলাত, ইজফা—

—কী বলতে চাও খুলে বলো ছোটেভাই।

—মানে আর কী মুঘল শাহীর বড় বড় হুকুম—ফরমানের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে আছ।

—থাকলামই বা। আব্বা হুজুর যেমন চাইবেন তেমন তো করতেই হবে আমাকে।

—আবার তুমি কাদিরীও বটে।

—বটে কেন? নিশ্চয়ই আমি একজন কাদিরী। আমি যে 'শাহরিয়া' লিখে চলেছি—তাতে মুল্লা শাহর কাদিরীদের কথা স্পষ্ট বলেছি।

—তোমায় অনেকে কী বলে জান?

—কী দারা?

শাহজাদা দারাশুকো হালকা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, শাহজাদা দারাশুকোর বড়বোন শাহজাদী জাহানারা—অনেকের মতে—ফাতিমা-উজ্-জামানি।

—যাঃ।—বলে লজ্জায় মাথা নামালেন জাহানারা। সে যে খুব বড় সম্মানের জায়গা। খাতিরদারি কদরদারির জায়গা।

—কিন্তু বাজি। কাদেরিয়ার রাস্তা তো কাঠ মোল্লার রাস্তা নয়। দিলদারি—আয়েস—পেয়ারের রাস্তা।

শাহজাদী জাহানারা কিছু বুঝতে না পেরে দারার মুখে তাকালেন। তাঁরা দু'জন পিঠোপিঠি ভাইবোন। দু'জনই জওয়ান। বলা যায় রীতিমত নওজওয়ান। তাছাড়াও মুঘলশাহীতে তাঁরা দুজনই হিন্দুস্থানের বাদশার সবরকমের হুকুম, ফরমান, তাগদের সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষ।

শাহজাদী জাহানারা তো কাউকে সুবেদার, মনসবদার করার ব্যাপারে বাদশাকে সলাহ্ দিয়ে থাকেন। ফ্রান্সিসি, ইংলিশস্তানি, ওলন্দাজ, ইরানিরা কেমন ব্যবহার পাবেন—তাও ঠিক করে দিয়ে যাবেন এই জাহানারা। শাহজাদা দারা সুবেদার তো বটেই—কখনও কখনও বাদশা শাহজাহানের তরফে লড়াই হামলায় মুঘল ফৌজের সিপাহসালার হয়ে যাবেন।

দু'জনের কেউ-ই যে-সে লোক নন। বড়বোন তাই অবাক হয়ে তাকালেন ছোটেভাইয়ের মুখে। ছোটেভাই বললেন, এ কী করে রেখেছ মাথাটা?

অবাক হয়ে মাথায় হাত দিলেন জাহানারা।

—শাহীর শাহজাদী-বেগম হয়ে এই কী লেবাস করে রেখেছ। এই কি শাহজাদী-বেগমের আঙ্গরাখা?

চমকে উঠলেন জাহানারা। তার পরই ভয়ংকর লজ্জায় তিনি যেন মুষড়ে পড়লেন। দিনরাতের হাজিরা—কোয়েল তার মালকিনের জন্যে কখন একখানি মুকুর, কিছু গুগ্গুল আর নখ রাঙানোর রক্তচন্দন রেখে গিয়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিলেন জাহানারা। দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ—সবাই আজ বড় হয়েছে। সবারই জওয়ানী এসেছে। সবাই শাদিসুদা শাহী সুবেদার।

ওদের বিয়েতে কনে-বরণ, কনে-সাজানো—সবই করেছেন জাহানারা। কিন্তু কবে থেকে যেন নিজে সাজতে ভুলে গেছেন। দারার মনে হল এই পাথুরে আগ্রা

দুর্গে পিপাসার জল ছাড়া যে মানুষটি বেঁচে আছেন—তিনি আর কেউ নন—সে আমার বাজি—সে আমারই বাজি।

দারা খুব শান্ত গলায় বললেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শাহী ফৌজের সবচেয়ে বড় শোভা তো আমাদের ছত্রশাল।

জাহানারা কোনও কথা বললেন না।

দারা আবার বললেন, নর্মদা পেরিয়ে একবার তো রাজধানীতে এসে তিনি দরবারে কুর্নিশ জানিয়ে যেতে পারেন।

—হয়তো নর্মদা পেরবার হুকুম নেই।

—তা কী করে হয় বাজি। তিনি তো মুঘলশাহীর খুবই কদরের সামন্ত রাজা।

—মুঘল শাহীর সবই আজিব ছোটেভাই। খাতিরের মানুষ ছত্রশাল—কদরের মানুষ ছত্রশাল—কিন্তু তিনি হয়তো দৌলতাবাদ দুর্গের বাইরে ফৌজ নিয়ে নান্দের অব্দি টহল দিচ্ছেন। রাজপুত লড়াকু খুব মন দিয়ে তাঁর কাজ করে থাকেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দারার মনে হল—বাজির গলায় অভিমান গাঢ় হয়ে বেজে চলেছে। এই দুর্গে বাদশা থেকে শাহজাদা—সবার জন্যে বয়সের ফুর্তির রাস্তা খোলা। শুধু একটি দুয়ার বন্ধ। সেখানে কঠিন পাথর নামানো। সে-পথে জল গলে না। সে-পথ পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার কঠিন বিধানে বাধা।

—আমার মনে হয় বাজি—ও চিঠি তোমার ছত্রশাল লেখেননি।

—কি! —বলে চমকে তাকালেন জাহানারা।

—হ্যাঁ। আমার মন যা বলছে তাই-ই ঠিক। ছত্রশালের মতো একজন সামন্তরাজের হাতের লেখা অতটা কাঁপবে কেন?

জাহানারার মনও অনেকদিন ধরে এই একই কথা বলে চলেছে ভেতরে ভেতরে মুঘল শাহজাদীর তসবির—মুরাক্কায় চৌহান রাজপুতের তসবির শোভা পেতে পারে না। একথা ছত্রশাল কিছুতেই লিখতে পারেন না। তবে কি ছত্রশালকে লেখা আমার চিঠি ছোটভাই আওরঙ্গজেব বাহাদুরের কোনও কাসিদের হাতে পড়ল? সেখানেই কোনও অজানা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

দারা বললেন, এ আমাদের ছোটে ভাইয়ের কীর্তিও হতে পারে বাজি। জানোই তো শাহজাদা আওরঙ্গজেব দুনিয়াটা দেখে থাকে ঠিক উলটো করে।

—তাই কি?

দারা আর কোনও কথা বললেন না। জাহানারার মনে পড়ল, ফতেপুর সিক্রির গায়ে সেকেন্দ্রায় পরদাদা সাহেব আকবর বাদশার সমাধিতে দরজার ওপর ওপর রুপোর তৈরি একটি ঘোড়ার ক্ষুর বসানো আছে। তারই নিচে সোনার জল করে পাথর কুঁদে লেখা আছে—

ভগবান! পৌত্তলিক দুশমনদের শাস্তি দাও।

ওই কথা কটি দেখে জাহানারার মনে হয়েছিল—ওই বিধর্মীদের মধ্যে রয়েছে

ঈশ্বর বিশ্বাসী—তারা আমাদের মুঘলশাহীর প্রহরী। পুরো ব্যাপারটাই কেমন উলটো-পালটা লাগে শাহজাদীর।

তবে কি শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর চায় না—তাঁর বাজি কোনও হিন্দু রাজপুত্র এঁকে ভালবাসুক। তবে কি বলক্-এর কঠিন কঠোর নজবত খাঁয়ের সংগে আমার ভাবভালবাসায় ওঁদের কোনও আপত্তি নেই। বরং সায় আছে। প্রবল সায়।

আমি কী তাহলে ? আমার কোনও ইচ্ছা নেই ? সব ইচ্ছাই শাহীর ভিত—বনেদ শক্ত করতে। মুঘল শাহজাদীরা কি স্রেফ শাহীর ভালর জন্যে কোরবানি যাবে ? হঠাৎ চোখ তুলে জাহানারা দেখলেন—ছোটেভাই দারা যেমন কোনও জানান না দিয়েই এসেছিলেন—তেমনই কোনও জানান না দিয়েই নিঃশব্দে চলে গেছেন। সারা আগ্রা অন্ধকার করে লাল গোল সূর্য এইমাত্র যমুনার ওপারে খসে পড়ল। এক্ষুনি আগ্রা আলোয় আলো হয়ে যাবে।

দারার শেষ কথাটি জাহানারার মনে গুনগুন করে গান হয়ে উঠল। ছত্রশালের মতো একজন সামন্তরাজের হাতের লেখা অতটা কাঁপবে কেন ? এই কথা কটিই বহুকালের অনাবৃষ্টির মাঠে টুপটাপ করে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে নেমে আসতে লাগল।

শাহজাদী-বেগম জাহানারা কোয়েলের রেখে যাওয়া মুকুরখানি মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তখনই কোয়েল ঘরে ঢুকে অভ্রের বাতিদানটি উসকে ধরিয়ে তুলল। তারপর কাছে এসে কুর্নিশ করে বলল, মুলুকে মালিকা। একটা কথা বলি।

জাহানারা কোনও কথা না বলে মুখ তুলে তাকালেন। কোয়েল কখনও দিন-রাতের হাজিরা—বাঁদি। আবার কখনও সখনও প্রায় সঙ্গিনী।

—আপনি ভোরের বকুলের মতো সুন্দরী।

জাহানারা কোনও কথা না বলে ডান পা এগিয়ে দিলেন। কোয়েল সংগে সংগে মেঝেতে বসে পড়ল। বসে রক্তচন্দনের পাথরখানা পাশে রেখে সেই পা নিজের কোলে নিল।

॥ বাহাত্তর ॥

গরমকালের নিশুতিরাতের জ্যোৎস্নাতেও গরম থাকে। বড় দরিয়ার গা থেকে তেঁতুলিয়া, মাতলা, সপ্তমুখী, রায়মংগল, ভৈরব, রূপসার মতো সব মাথাচাড়া দেওয়া নদী খাঁড়ি ধরে সুবে বাংলায় বনজংগল ভেঙে যেন লোকালয়, গাঁ, গঞ্জ ছুঁয়ে যাবার জন্যেই বয়ে চলেছে। সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে কারও যদি দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি সব কিছু একসংগে দেখতে পাওয়ার মতো চোখ থাকত—তবে তার এমনই মনে হত।

বড় দরিয়া অবধি ধেয়ে যাবার মতো নয়—বরং বলা যায় শান্তশিষ্ট এমন একটি নদীর নাম বুড়া ভৈরব। আসলে খাঁড়ির পর খাঁড়িতে খেলে বেড়ানো ওই

পাগলা ভৈরব থেকেই এই বুড়ো বেরিয়ে এসেছে। এসে এর ঘর ওর গেরস্থালির ভেতর দিয়ে বাড়ির ছোট মেয়েটির মতোই সরকার যশোহরের ভেতর দিয়ে সে বয়ে চলেছে। শীতে কাবু—বর্ষায় ঘোলাটে এই বুড়ো ভৈরবের বুকে গাছপালার পাতালতার ফাঁক-ফোকরে জ্যোৎস্না গলে গলে গিয়ে পড়ছে।

নির্জন, নিস্তরঙ্গ বুড়োর গা ধরেই পায়ে চলতি পথ চলে গেছে কোট চাঁদপুর, চাঁচর ছাড়িয়ে রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীতলায়। কবেই সেই যশোরেশ্বরীকে তুলে নিয়ে গেছেন আকবর বাদশার আমলে সুবে বাংলার সুবেদার রাজা মানসিংহ —প্রতাপাদিত্যকে হারিয়ে—তাও প্রায় সত্তর বছর হয়ে গেল। তারপর বাদশা হলেন নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর। আকবর বাদশার আমলে সবে বাংলা চাঘতাই ধ্বজের নিচে এলেও সেখানকার পাঠান জমিদাররা প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। চল্লিশ বছর হতে চলল—জাহাঙ্গীর বাদশা ইসলাম খাঁকে পাঠিয়ে বাংলা সুবাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করেছেন। কিন্তু কোথায় শায়েস্তা! বাংলা সুবা যে-কে সেই। আগ্রা-দিল্লি অনেক দূরে। সুযোগ পেলেই নদীনালায় ফালা ফালা এই বাংলা ফের তিড়বিড় করে ওঠে।

এখন আগ্রায় শাহেনশা শাহজাহান বাদশা। ঢাকায় সুবে বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা। তাজমহল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে চাঁদোয়ার সোনালি-সবুজ সব কাজ চলছে ক'বছর ধরে। লাল কিল্লা বানানো সারা। দিল্লিকে এখন কেউ বিশেষ আর দিল্লি বলে না। বলে জাহানাবাদ। তা নয়া রাজধানী জাহানাবাদে জামা মসজিদ বানানোও প্রায় সারা হয়ে এল। তার চাতালে একসঙ্গে এক লক্ষ নমাজি বসতে পারবেন। সেকথা ভেবেই বাদশার হুকুমে পাথর বসছে। গঙ্গার বুক বেয়ে বড় বড় বজরায় সুবে বাংলার নীল, চিনি, সোরা, রেশম পাটনা ছুঁয়ে ইলাহাবাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ছে।

নিশুতিরাতেও জ্যোৎস্না যেন গরম। বুড়ো ভৈরবের গা ধরে একজন শক্ত-সমর্থ মাঝবয়সী পথিক কোটচাঁদপুরের দিকে এগোতে এগোতে গায়ের উড়ানিখানি খুলে কাঁধে নিলেন। গায়ের মেরজাইয়ের ওপরের দিকের বাঁধুনি খুলে ফেলে কাঁধের পৈতে দিয়েই গা চুলকে নিলেন তিনি।

মুখ দেখা যায় না পথিকের। যেখানে গাছপালা নেই সেখানে তাঁর শরীরের দীর্ঘছায়া নাবি পেরিয়ে প্রায় ভৈরবের কূলে গিয়ে পড়ে। তাঁর চোখ জোড়া এই অন্ধকার আর আলোর খেলার ভেতর জ্বলজ্বল করছে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পথিক দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর পায়ের ফাঁক দিয়ে দুটি বনমোরগ ছুটে পালাল। দূরে যেন বনশুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত। পথিক একা একাই বলে উঠলেন, আগে এখানে একটা গাঁ ছিল।—তারপর তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন—এখানে গেরস্থবাড়িতে তুলসীমঞ্চে বসানো সন্ধ্যাপ্রদীপ সারা রাত ধরে জ্বলত এক সময়। অসময়ের পথিক পথ চলতে সে আলো পেত।

এগোতে এগোতে পথিকের মন বলল, বসতি মুছে যাবার পর এখানে বোধহয় কোনওখানে মানুষজন মানত করতে আসে। তাদের মানত করা মুরগিগুলো এখন বনমোরগ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে বনজঙ্গল বেড়ে যাওয়ায় শুয়োর

এসে জুটেছে। অথচ এখানে দিনের বেলায় মেয়েরা ভৈরবে নাইতে নামত। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় আলো দিত।

চারিদিকে ঝোপেঝাড়ে এমনভাবেই জোনাকি পোকাগুলো জ্বলছে—মনে হবে বুঝি বা বনে আগুন ধরে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল পথিকের। গোল হলুদ চাঁদ—আজ কি পূর্ণিমা—ঘিরে রামধনু। নিশুতি রাতে চাঁদের রামধনু। লম্বা পথের রাহি এই পথিক। তিনি বহু দূর থেকে আসছেন। আজ নিয়ে চার রাত তিনি চাঁদকে ঘিরে এই রামধনু দেখলেন।

পথিক ডান হাত গায়ের মেরজাইয়ের ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে বুকের ওপর পৈতে আঁকড়ে ধরলেন। চাঁদের রামধনু বা চন্দ্রশোভা—যা-ই হোক না কেন—নিশুতি রাতে মহাকাশে এই শোভা দেখা নাকি ভাল নয়—অমঙ্গলের।

চোখ নামিয়ে ফের হাঁটতে লাগলেন পথিক। ধুলো ভর্তি পায়ের সঙ্গে চোরকাঁটা বোঝাই খেটো ধুতি ঘষে ঘষে মাঝবয়সী মানুষটির গা-পা কেটে ছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। ক'দিন আগে এই অমঙ্গলের ছবিটি প্রথম তিনি দেখতে পান—এমনই নিশুতি রাতে একেবারে অন্য জায়গায়।

সুবর্ণরেখার পাড়ে। পিপলিপত্তনের আকাশে। পিপলি হয়ে তিনি বালেশ্বরে ফিরছিলেন। তারপর দেখেছেন বর্গ-ভীমার তীরে। সামনেই বর্গভীমার মন্দির। তমলুকের আকাশে। শেষ দেখেছেন ক'দিন আগে। গঙ্গার তীরে। সাঁকরাইল পেরিয়ে শিবপুরের কাছে। মগদের কেল্লার কাছাকাছি এসে।

এই চন্দ্রশোভা দেখা নাকি বড় অমঙ্গলের। নিশুতি রাতে চাঁদের এই রামধনু উঠে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারেই হেসে ফেললেন পথিক। অমঙ্গলের বাকি আর আছেটা কী! সারাটা রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। মানুষজনের দেখা নেই। সেই বালেশ্বর থেকে পিপলি, তমলুক, শিবপুর হয়ে সুবে বাংলার গা ছুঁয়ে বড় বড় সব নদী—দরিয়া চলে গেছে—মৈমনসিংয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর মগটোলা হয়ে চাটগাঁ অব্দি। এই তীর ধরে কোথায় গেল হাটবারের সব হাট, মেলা সংক্রান্তির স্নানের ভিড়। মেয়ে-পুরুষ। বাচ্চা-বুড়োরা।

কোটচাঁদপুর এসে গেছে। গাছপালা দেখেই চেনা যায়। সারা কোটচাঁদপুর ঘুমোলেও তাঁতীরা তো জেগে থাকবে। কোথায় সেই খটাখট শব্দ? বেলতলা, বুড়ো ভৈরবের ঘাট পেরিয়ে তিনি জহ্নু বন্দ্যোঘটির সাবেক টোলে এসে পড়লেন। অনেককাল হল এ টোল উঠে গেছে। বন্দ্যোঘটি কুলে এই টোল ছিল সবচেয়ে পুরনো। জহ্নু এই পথিকের পূর্বপুরুষ। পুরনো টোলের ভিটে আগাছায় হারিয়ে গেলেও বন্দ্যোঘটি জহ্নুর বসবার উঁচু বেদীটি এখনও আছে—হারিয়ে যায়নি আগাছায়। প্রায় দেড়শো বছর আগে ওখানে বসে জহ্নু তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। পথিক মনে মনে হাসলেন। সে কি আজকের কথা! তখন খোদ চৈতন্যদেব তো বালক মাত্র। নগণ্য নিমাই।

বন্দ্যোঘটি বাড়িটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে। পর পর তিনটি বেলগাছের ছায়ায় গরমের দিনে ওই বড় উঠোন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মানুষজন এসে একসময় এখানে জিরিয়ে নিত। তারপরই বিশাল এক বুনো তেঁতুল গাছের ছায়ায় দুর্গা-

মণ্ডপ। বারবাড়ি। পথিকের দশপুরুষ ধরে এ বাড়িতে বসবাস—ওঠানামা, বুড়ো হওয়া—মরে যাওয়া।

পথিক থমকে দাঁড়ালেন। পৈতৃক বাড়িতে ঢুকবার সময় তাঁর চোখে পড়ল বন্দ্যোঘাটি বাড়ির গোহাল একদম খাঁ খাঁ করছে। জাবের খোঁদলে জ্যোৎস্না পড়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ওখানে গাইবাছুর নেই অনেকদিন। তারপরই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঢেঁকির তিনখানি বিরাট কাঠ পর পর উঠোনে পড়ে আছে। তাদের গা থেকে পাড় দেবার কেঠো মুগুর খুলে নিয়েছে কে।

এবার পথিক দেখলেন—তাঁর অতি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ সব ঠাকুর্দা—বলভদ্র, শ্রীপতির পোড়ো ঘরবাড়ির কোনও দরজা-জানলাই নেই। সেখান থেকে অন্ধকার কালো কালো গর্ত যেন তাঁকে খেতে আসছে। কপাটগুলো কারা যেন খুলে নিয়ে গেছে।

শেয়াল কুকুরও কি নেই কোটচাঁদপুরে! থাকলে তো একটা চিৎকার করত। ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় তিনি দুর্গামণ্ডপের ভাঙা ধাপে বসতে যাবেন। এমন সময় নজরে পড়ল খালি মণ্ডপের মেঝে থেকে চাপা আলো আসছে।

নিজেদেরই বসতবাড়ি। তবু কেমন ভয় ধরে যায় মাঝবয়সী এই পথিকের। তিনি পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। জ্ঞানমতো গত দুশো আড়াইশো বছর এখানে ঘটে সংকল্প করে বন্দ্যোঘাটি বাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। ভাসানের পর নানা বছরের মায়ের হাতের খড়্গ এখানকার চাটাই বেড়ায় গুঁজে রাখা আছে—তা জানেন এই পথিক।

ওপরে উঠে তিনি তো অবাক। রেড়ির শিখাটি অচঞ্চল। তার সামনে খোলা খাতার পাশে খড়ের বিড়েয় মাথাটি রেখে একজন পুরুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হাতের আঙুলে পালকের কলমটি যেমন ধরা ছিল লেখার সময়—তেমনই ধরা আছে। শিখার আগুন পড়লেই তো খড়ের বিড়েয় আগুন ধরে যাবে। পথিক বিপদ বুঝে ছুটে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রাঘব চিরটা কালই ঘুমকাতুরে!

কাছে গিয়ে দেখলেন—কুলপঞ্জী লিখতে লিখতে রাঘব কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কুল পঞ্জীটি সাবধানে ঘুমন্ত রাঘবের হাতের তলা থেকে তুললেন পথিক। তাতে সদ্য লেখা ক'টি পংক্তি পড়ে পথিকের তো চক্ষুস্থির। এ করেছে কী রাঘব! নিজেদের কুলেই তো অপবাদ অর্সাবে। জেনেশুনে কেউ কি তা লিখে রাখে? কালির বাটিটি দূরে সরিয়ে রাখলেন তিনি। পাছে পড়ে যায়!

রাঘবের লেখা পংক্তি ক'টি এখন এই নিশুতি রাতে রেড়ির আলোয় জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে পথিকের মুখে।

চাঁদস্য পিতৃভদ্রকালে মুং যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিবাহ

অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ মগেন নীতা।

পথিক বলে উঠলেন, হ্যাঁ। রাঘবের আট ছেলের ভেতর চতুর্থ চাঁদ সম্বংশে বিয়ে করে। কিন্তু বউমাকে মগেরা যে…। —উঃ! বলে মনে মনে গজরে

উঠলেন পথিক। সেধে কেউ নিজের বংশে মগদোষের কথা পাকাপোক্ত করে লিখে রাখে।

পরের পংক্তিতেই—

চাঁদবিনোদ রাজারাম যদু মধু মগেন নীতা।

পথিক কুলপঞ্জীখানি বাঁ হাতে নিয়ে ঘুমন্ত রাঘবের মুখে তাকালেন। কতদিনের দাড়িতে সারামুখ ঢেকে গেছে। ঘুমন্ত চোখদুটি কোন সুদূরে। খালি গা। তাতে পৈতেটি লেপটে আছে। পরনের কাপড়খানি শতচ্ছিন্ন। সত্যিই তো রাঘবের চার ছেলে—চাঁদবিনোদ, রাজারাম, যদু, মধুকেও মগেরা ধরে নিয়ে গেছে হাট থেকে। কেবল তাই নয়। তার তিন মেয়েকেও মগেরা ধরে নিয়ে গেছে। কুলপঞ্জীতে একটু পরেই রাঘব লিখেছে—

ততঃ স্বরূপা—মণিরূপা—কর্পূরমঞ্জরী এতাঃ কন্যা
মগেন নীতা সর্বনাশান্ধানিঃ।

এই ক'টি কথা কুলপঞ্জীতে পড়তে পড়তে পথিক ধপ করে মণ্ডপের ধুলোয় বসে পড়লেন। সেই পিপলিপত্তন থেকে কোটচাঁদপুর অব্দি এই লম্বা পথের কোথাও কেউ এই পথিককে এমন ভেঙে পড়তে দেখেনি। নিশুতি, নিস্তরঙ্গ এই রাতে কোনও সাক্ষী নেই বলেই কি পথিকের আর কোন আড় থাকল না। বসে পড়তেই তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। হ্যাঁ। সাক্ষী আছে। রেড়ির তেলের দেড়খোর ওপর নিষ্কম্প শিখাটি।

পথিক প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, লিখবে না কেন? ঠিকই লিখেছে রাঘব। আমিও তো একদিন লিখে রেখেছি—

ততো বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যা মগেন নীতা
সর্বনাশান্ধানিঃ।

পথিকের গাঢ় কান্নাভেজা গলায় সারা মণ্ডপ গমগম করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত রাঘব উঠে বসল। দাদা? কখন এলেন? এই ফিরলেন?

পথিক তখন তখনই কোনও কথা বলতে পারলেন না। তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

রাঘব কিছু অবাকই হলেন। দাদা রামচন্দ্রকে সারা কোটচাঁদপুর কেউ কোনওদিন এমন ভেঙে পড়তে দেখেনি। অবশ্য সে কোটচাঁদপুর এখন আর কোথায়! টোল, যজমানি, চাষবাস, গরুবাছুর, সম্বচ্ছরের পুজো-পার্বণ সবই এই মানুষটি একা সামলে এসেছেন। তাছাড়া সমাজ যাতে বেচাল নাহয়—সেজন্যে এ-মানুষটিকে কেউ কোনওদিন হাসতে বা কাঁদতে দেখেনি। মনের ভাব দাদা চিরকালই মনে রেখেছেন। অবশ্য সে সমাজই বা আজ কোথায়!

রামচন্দ্র একটু পরে যেন তাঁর নিজের ধাতে ফিরে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, কুলপঞ্জীতে আমিও একদিন লিখে রেখেছিলাম রাঘব—

এ কথায় ছোটভাই রাঘব যেন বর্তমানে ফিরে এল। অমনি তার মুখে কী এক স্থায়ী বিষাদ ফিরে এল। সে কোনও কথা বলল না।

রামচন্দ্র বললেন, পিপলিপত্তন অব্দি গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও কারও

কোনও খোঁজ পাইনি। পাওয়াও যাবে না কোনওদিন রাঘব।

মাস তিনেক আগে শীত থাকতে আপনি যখন রওনা হলেন—তখনই আমি জানি—কারও আর খোঁজ পাবেন না দাদা।

দাদা রামচন্দ্র ফাঁকা দৃষ্টিতে এত বড় বন্দ্যোঘাটি বাড়ির উঠোনে তাকালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ। মগরা, ফিরিঙ্গি হারমাদরা তো পিপলিতে—তমলুকে গিয়ে তুলে নেওয়া মানুষজন বেচে দিচ্ছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ব্যাপারীরা আশরফির থলে নিয়ে বসে আছে। কেনাবেচার বাজার বসেছে।

—দিল্লির বাদশা কী করেন বল তো!

—কী আর করবেন! শুনলাম—হিমালয় পেরিয়ে তাঁর বাপঠাকুর্দার দেশ সমরখন্দ—বোখারায় ফৌজ পাঠাবেন। তাই সারাটা পথে গাঁ কে গাঁ সোনাদানা আশরফির খোঁজে ফৌজদারের সেপাইরা লুট করেছে। জানলা-দরজার কপাট অব্দি লোপাট।

যেন কোনও পুরাণের কথা হচ্ছে। এইভাবে রাঘব বললেন, পাঠানরাও তো একদিন শাসন করেছে এই সুবে বাংলা। সুলতান ছিলেন হুসেন শা।

—ওরে বাবা! কার কথা বলছ রাঘব। —বলে দু'হাত মাথায় ঠেকালেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন, হুসেন শাহ তো নৃপতি কুলতিলক। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ মগদের চাটগাঁ থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন। সেখানে নগর বসালেন—পরাগলপুর। সেসব এখন রূপকথা রাঘব। গত দেড়শো বছরে হিন্দুস্থানে এখনকার মতো হতদশা কখনও হয়নি। বাদশা নেবেন খাজনা। তাঁর সুবেদার, ফৌজদার, মুকুন্দর জোঁকের মতো বসে আছে। মগ বা হারমাদরা এসে আমাদের গরু ছাগলের মতো তুলে নিয়ে যাবে। তা আটকাতে পারে না। কিন্তু কেড়েকুড়ে সব কিছু নিয়ে যাবার বেলায় বড় গোঁসাই!

ছোটভাই রাঘব এখন পুরোটাই পুরাণ-কথায় থাকতে ভালবাসে। কেননা তার হালফিলে ফিরে আসার মতো কোনও আকর্ষণ আর নেই সংসারে। সে আস্তে আস্তে বলল, আপনি চলে যাবার পর গোহাল ফাঁকা করে গাইবাছুর নিয়ে গেছে মুকুন্দর। ঢেঁকিঘরে ঢুকে মজুদ তিল তিসিও তুলে নিয়ে গেল। শেষে বড় ঠাকুর্দাদের পোড়ো বাড়িগুলোর দরজা জানলাও—

রামচন্দ্র বললেন, দেখেছি।

—ঠাকুমা বলতেন—তিনি তাঁর অতি বৃদ্ধ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছেন—শের শা বাদশা হয়ে সারা হিন্দুস্থানে ইনসাফ ফিরিয়ে আনেন।

—ইনসাফ। ন্যায় বিচার! সেসব কবেই হিন্দুস্থান থেকে উবে গেছে রাঘব।

—শের শা বর্ধমান থেকে সড়ক-ই-আজম বানাতে নামলেন। হিন্দুস্থানের সেরা শাহী সড়ক। তা দেখাশুনো করতেন নাকি ব্রহ্মজিৎ গৌড়।

—ওসব সুখের কথায় কাজ কী রাঘব। আমার একটি মাত্র সন্তান—বিষ্ণু-প্রিয়া—বলতে বলতে আর কথা বলতে পারলেন না রামচন্দ্র। তাঁর গলা বুজে এল। শেষে অনেক কষ্টে বললেন—হয়তো গোয়ার বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে—

এ কথায় রাঘবের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

রামচন্দ্র বললেন, তোমার প্রথম চার ছেলে বিয়ে হয়ে সুবে বাংলার নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তারা আর কোটচাঁদপুরে ফিরছে না। বাকিরা—

এবার রাঘব আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। নিশুতিরাতের ফাঁকা দুর্গামণ্ডপে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। চার চারটে জওয়ান ছেলে দাদা। হয়তো পর্তুগিজরা কিনে নিয়ে খ্রিস্টান করেছে। এতদিনে তারা হারমাদদের চাবুকের নিচে পড়ে দাঁড় টানছে। আর—

মুখ তুলে রামচন্দ্র তাকালেন। আর—

—যদি তা না হয়ে থাকে তো আর বেঁচেই নেই হয়তো তারা। —বলতে বলতে সব কথা কান্নার ভেতর গুলিয়ে ফেলল রাঘব। তবু তার ভেতরেই বলল —হাত ফুটো করে লোহার কাঠি পরিয়ে আমসত্ত্বের মতোই মরদ গাদি দিয়ে ওরা গোলাম বেচতে যায় কোচিন, বন্দর আব্বাস—বসরায়। পাখিদের খাবার দেবার মতোই ওদের মুখের কাছে চাল ছড়িয়ে দেয় দাদা—বলতে বলতে রাঘব পাগল হয়ে কাঁদতে লাগল। একদম হাউ হাউ করে। কেউ শোনার নেই সে কান্না। কেউ থামানোর নেই। সামনে শুধু বড়ভাই বন্দ্যোঘাটি রামচন্দ্র। সংস্কৃত বাড়ির টোল চালানোর ভাষা। তা তিনি জানেনই। তাছাড়াও ফারসিতে তিনি চোস্ত। রাঘবের ছোটবেলায় রামচন্দ্র তাঁকে হাফেজ আওড়ে শুনিয়েছেন কত।

রামচন্দ্র তাঁর ভাইকে থামালেন না। দুনিয়ার ওয়াকিবহাল মানুষের মতোই বসরা কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, সেই বসরা তো। যেখান থেকে হিন্দুস্থানের বাদশা বছরে হাজার পঁচিশ আরবি ঘোড়া আমদানি করে থাকেন। —বলতে বলতে হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর নিজে নিজেই একসময় বললেন, বেশ ঠাণ্ডা গলায়—বাদশা তাঁর ফৌজের জন্যে ঘোড়া আনেন। আর তার বদলে সে-দেশের বাজারে হিন্দুস্থানের মানুষ চালান যায়—গোলাম হতে। একশো বছর হয়ে গেল মুঘল শাহীর বয়স। আজও তার তেমন নৌবারা নেই—বজরা নেই—যা দিয়ে চাটগাঁয় ক'টা মগের সালতি আর ছিপের আড়ত গুঁড়িয়ে দিতে পারে। এত বড় মুঘল শাহী কি মগদের তাড়িয়ে আরাকানে ফেরত পাঠাতে পারে না? সেখানে পর্তুগিজদের সঙ্গে সাট রয়েছে আরাকানের রাজার। আগ্রা কি ওদের ধুলো করে দিতে পারে না!

কথা বলতে বলতে দুই ভাই মণ্ডপে রাখা প্রতিমা বানানোর দুখানি বৃহৎ কাষ্ঠে উঠে বসেছিলেন। এ মণ্ডপে কয়েক বছর হল পুজো নেই।

—আমি এ জীবন নিয়ে কী করব দাদা?

ছোট ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে কোনও জবাব দিতে পারলেন না রামচন্দ্র।

রাঘব বলল, বিষ্ণুপ্রিয়াকে চানের ঘাট থেকে যেদিন মগরা তুলে নিয়ে গেল—তারপর সেই যে বৌদি বিছানা নিলেন—আর ওঠেননি।

রামচন্দ্র একথায় যেন চোখ চেয়ে নিজের বউকে দেখতে পেলেন। বললেন, মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।

—কিন্তু আমার ?—বলে উঠে দাঁড়াল রাঘব। স্বরূপা, মণিরূপা, কর্পূরমঞ্জরী লুট হবার পর আপনার বউমা পাগল হয়ে গেল। সারাদিনরাত বুড়ো ভৈরবের ঘাটে গিয়ে ওরে কর্পূরী! ফিরে আয়! —বলে কাঁদত।

কর্পূরমঞ্জরীর মুখখানি রামচন্দ্রের মনে ভেসে উঠল। ঢলঢল হাসি হাসি মুখখানি এখনও তাঁর মনে বড় উজ্জ্বল। রাঘবের তিন মেয়ের ভেতর সবচেয়ে ছোট। বড় আদুরি ছিল সারা বাড়ির। রামচন্দ্র ছবির মতো সবই দেখতে পাচ্ছিলেন। একদিন বউমা বদ্ধ পাগল দশায় কখন বেরিয়ে পড়েন। আর ফেরেননি।

রামচন্দ্র ভূতে-পাওয়া গলায় বললেন, এই দুনিয়াটাই এখন আস্ত একটা গারদ লাগে আমার।

রাঘবের চোখে জল নেই আর। সে বলল, আমার আপনার বয়স হয়েছে। বেগার খাটার জন্যে শাহী ফৌজ আমাদের টেনে নিয়ে যাবে না।

রামচন্দ্র বললেন, মগ বা হারমাদরাও আমাদের তুলে নিয়ে যাবে না। গোলাম বাজারে আমাদের বেচে দিয়ে কানাকড়িও দাম পাওয়া যাবে না। সারা দেশ খাঁ খাঁ করছে।

রাঘব দাদার কথায় জুড়ে দিল—শুধু ফৌজদারের মানুষজন খাসি মুরগি মারছে। মাটি খুঁড়ে সোনার মোহর লুকিয়ে রাখছে। আগ্রা থেকে কোটচাঁদপুর অব্দি শুধুই জুলুমশাহী—তানাশাহী।

রামচন্দ্র নিরুপায়ের গলায় বললেন, এই হতদশায় জেনেশুনে আত্মঘাতীও হতে পারি না। আত্মহত্যা মহা পাপ।

—পাগল হলে সব ভুলে যাওয়া যেত দাদা।

—সে ভাগ্য করে আসিনি রাঘব।

কথা বলতে বলতে এখানে এসে তাঁরা দু'জনই বোবা হয়ে গেলেন। মাঝবয়সী দু'ভাই একে অন্যের মুখে তাকিয়ে। দু'জনই জানেন—কাজের দুনিয়ায় দু'জনই কৃতী মানুষ। কিন্তু কৃতিত্বের কোনও রাস্তা নেই। ফুটে ওঠার কোনও পথ নেই। যা আছে—তা হতমান হবার অন্তহীন সুড়ঙ্গ। গরু ছাগলের মতো সন্তান লুট হয়ে যাবার যন্ত্রণা। চোখ খুললে সুখের কিছু দেখার নেই। চোখ বুজে থাকলে সারা অন্ধকার কালো যন্ত্রণা হয়ে দেখা দেয়। কোথাও যাবার নেই। কোথাও থাকার নেই। শুয়ে থাকা যায় না। বসে থাকা যায় না। দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অথচ এর ভেতর বেঁচে থাকা আছে। ঘুমিয়ে পড়া আছে। ধুতি মেরজাই পরা আছে। আছে গৃহদেবতার অন্নভোগ। পুষ্পাঞ্জলি। স্নান।

অথচ সবই অর্থহীন মনে হয়।

ওঁদের এই বোবা-দশার ভেতর সময়মত ভোর হয়ে এল। রামচন্দ্রের মনে হল—এই নিদারুণ জুলুমশাহীর ভেতর উঠোনে পূর্বপুরুষের ওই বুনো তেঁতুল গাছটিতে সময়ের যন্ত্রণা বা আহ্লাদের কোনও দাগ লাগেনি। ভোরের বাতাসে ফিনফিনে তেঁতুলপাতা তিরতির করে কাঁপছে। গাছটার গা থেকে সাত ভাই পাখির দল ভোরের পহেলা আলোয় ছররা হয়ে আকাশে উঠে গেল।

এই তেঁতুলগাছের মাথার ওপরেই কাল রাতে চাঁদের রামধনু রামচন্দ্র দেখতে পান।

॥ তিয়াত্তর ॥

সতেরোটি সরকার নিয়ে সুবে বাংলা। কিন্তু তার মাথার ওপর সূর্য সতেরো কায়দায় আলো ফেলে না। ফেলে সেই একই কায়দায়। যে-কায়দায় ভোর রাতের আঁধার ফিকে হতে হতে আকাশের নিচে একটু একটু করে নদীর বুক, গাছের মাথা, দুর্গামণ্ডপের চুড়ো জেগে ওঠে। তারপর একসময় মানুষজনের ঘর-গেরস্থ তার সুখ দুঃখ নিয়ে চারদিকে মানুষেরই পতন আর অপার মহিমা ছড়িয়ে ভেসে ওঠে।

ঠিক সেই একইভাবে আজ বুড়ো ভৈরবের তীরে কোটচাঁদপুরে সকাল হল। বন্দ্যোঘটি বংশের বড়ভাই রামচন্দ্র বাড়ির লুটে নিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের খোঁজে পিপলিপত্তন অব্দি গোলাম বাজার চুঁড়ে তবে কালই নিশুতি রাতে ফিরেছেন অনেকদিন পরে। ফিরে দেখেন—বংশের মগদোষ খোলাখুলি কবুল করে কুলপঞ্জী লিখতে লিখতে তারই ওপর মনের দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছে—ছোট ভাই রাঘব।

কোটচাঁদপুর সরকার যশোহরের একটি মহাল। মোট পরিমাণ ফল ৮৩:০ বিঘা। আকবর বাদশার আমলে স্থির হয়েছিল—লড়াই-হামলার সময়—মহাল কোটচাঁদপুর আগ্রাকে দেবে ২০০ ঘোড়সওয়ার আর ১০০১ জন পদাতী। হিন্দুস্থানের বাদশার হিসেবের ভেতর এভাবে আলাদা করে কোটচাঁদপুরের নাম থাকায় এখানকার বুড়োরা—গুঁড়োরা—সবাই একসময় রীতিমত গর্ব বোধ করত। চাট্টিখানা কথা! বিপদ আপদে বাদশার মবারকে কোটচাঁদপুরের ডাক পড়ে। ঘোড়সওয়ার কিংবা পদাতী দিতে না পারলেও মহান কোটচাঁদপুর শাহী খাজানাখানায় পুরো মূল্য ধরে দিত—ফৌজদারের হাত দিয়ে। কড়ায়-ক্রান্তিতে। আশরফিতে—মোহরে।

এসব কথা এখন গল্পগাছা। এখন শুধুই দুঃসময়। তাই তো মনে হয় বন্দ্যোঘটি রামচন্দ্রের। কোথাও যাবার উপায় নেই। এখানে থাকাও যায় না। সারা দুনিয়াটাই আস্ত একখানা গারদ। তিনি দুর্গামণ্ডপের ধাপ ধরে উঠোনে নেমে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটভাই রাঘব নেমে এল। কী খাবেন দাদা? বাড়িতে তো উনুন জ্বলে না আপনি যাওয়ার পর থেকে—

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র হাসলেন। বললেন, কে বলবে আমরা জহ্নু, বলভদ্রের বংশধর! তাঁদের টোলে একশোর ওপর ছাত্র পড়ত। বাড়ির শিশু আর বাছুরের ডাকে এই উঠোন একসময় জমজমাট হয়ে থাকত। আখার আঁচ নিভত না কোনওদিন।

—দুটি পেয়ারা পেড়ে দিচ্ছি এখন। বলে উঠোনেরই কোণে একটি পেয়ারা

গাছের নিচুর ডাল টেনে পেকে আসা দু'তিনটি পেয়ারা পেড়ে আনল রাঘব। বেশ গোল আর হলুদ পারা।

খিদে পেয়েছিল রামচন্দ্রের। তিনি পেয়ারায় কামড় দিয়ে ফাঁকা গোহালের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নিয়ে বললেন, জান রাঘব! আমাদের অতি বৃদ্ধ পিতামহ বন্দ্যোঘাটি শ্রীপতির নাম ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে পাবে। তিনি রীতিমত সাধক মানুষ ছিলেন শুনেছি। তা পেয়ারা নামের এই নয়া ফলটি তিনি খেতেন না। তাঁর বিচারে এটি ছিল ম্লেচ্ছ ফল।

—তা তো তিনি বলতেই পারেন। দরিয়ার ওপার থেকে পর্তুগিজদের আনা এ ফল।

—নাও। খাও এটা রাঘব। তুমিও কিছু খাওনি কাল থেকে মনে হচ্ছে—

—আমার খিদে মরে গেছে দাদা।

—ওভাবে মৃত্যুকে ডেকে আনা যায় না রাঘব। খিদে সহ্য করতে করতে একসময় প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে তোমাকে দিয়েই আবার খাওয়াবে।

দু'ভাই হাঁটতে হাঁটতে বন্দ্যোঘাটি পরিবারের বাস্তুভিটের শুরুতে এক গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। এ-গাছটাও রাঘব হিন্দুস্থানে নতুন। পর্তুগিজরা এনেছিল।

—আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহ শ্রীপতির চেয়ে অনেক উদার কোনও রসিক মানুষ এ-গাছের ফুলের দিকে তাকিয়ে নাম দিয়েছিলেন কৃষ্ণকলি।

রামচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, সংকটে, দুঃসময়ে তিনি যেমন সম্ভবামি যুগে যুগে—তেমনই দুর্দিনে কিছু ভালও ঘটে রাঘব। পেয়ারার পেছন পেছন পর্তুগিজরা নিয়ে এল কামরাঙা। আমাদের কবিরাজির নানান ক্বাথে এখন কামরাঙা না হলে চলে না। অন্ন সেবায় নিত্যসঙ্গী এখন ওদেরই আনা আলু।

—যাই বলুন দাদা সবই ভাল কিন্তু ঘটছে না। তামাকও তো ওরাই এনেছে এদেশে। অমন অলস নেশা—আর দুটি নেই।

—আকবর বাদশা সেদিন বুঝতেই পারেননি—ওদের মতলবটা কী? আগ্রায়—লাহোরে গির্জা বানাতে দিলেন।

—জাহাঙ্গীর বাদশা তো অতিষ্ঠ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছিলেন। এটা খেও না—ওটা খাওয়া বারণ—শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, খাওয়া-দাওয়ায় নিষেধ নেই এমন কোনও ধর্ম আছে বলতে পার?

কোটচাঁদপুরের এই বন্দ্যোঘাটি পরিবার ঠিক টুলো পণ্ডিতের পরিবার নয়। সংস্কৃতের পাশাপাশি ফারসিতেও রামচন্দ্র-রাঘবেরা দুরস্ত। কেননা, টোল চালাতে চালাতে বলদ জুতে ছ'খানা হালের জমি জিরেতে ও'দের চাষ হয়ে আসছিল এতদিন। জমি জায়গা থাকলেই মাঝেমধ্যে মুন্সেফ-ই-মুন্সেফানের দরবারের শুনানি-আর্জিতে যেতে হয়। তাই চলতি দিনের সঙ্গী ফারসিতেও ও'রা সড়গড় করে নিয়েছেন নিজেদের। দিল্লি আগ্রা লাহোরের খবরাখবর ওঁরা রেখে থাকেন।

সারা কোটচাঁদপুর যেন খাঁ খাঁ করছে। কথা বলার মানুষ যেন ওঁরা দু'ভাই মোটে। গাছ আছে। নদী আছে। পাখি আছে। গোহাল আছে। মণ্ডপ আছে।

ঘরবাড়ি আছে। কিন্তু গাই-বাছুর নেই। দুর্গা নেই। মানুষজন নেই। আকাড়া ক্ষেতে ঠোঁট ঘষে ব্যথা করে ফেলে ঘুঘুর দল। সাত ভাই পাখির দল। একদানা ধান কি কলাই কিছুই জোটে না। লাঙল পড়েনি।

পেয়ারা কটা ফুরিয়ে যেতে যেতে রামচন্দ্র আর রাঘব চাঁচলের দিককার রাস্তায় এসে পড়লেন। এই রাস্তার গায়ে গায়েই বুড়ো ভৈরব। তার বুকের ওপর তিনচারটি বড় বজরা বিশাল পাল খাটিয়ে বাতাসের সঙ্গী হয়েছে। ভেড়ামারা, রেসিজুদ্দিনপুর, ধলনগর হয়ে এসব নৌকো আসছে। ধান বোঝাই দিয়ে। যাবে গঙ্গা দিয়ে পাটনা। রামচন্দ্রর মনে হল মাঝের নৌকোটি বোধহয় চিনি নিয়ে চলেছে। যাবে সেই দক্ষিণে। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর অব্দি। সুবে বাংলার চিনি দরিয়া পেরিয়ে দূর দূর দেশেও যায়। এ চিনি নিশ্চয় ঝিনাইদহের আখ চাষীদের চিনি। মনের ভেতরটা টন টন করে উঠল। কোটচাঁদপুরের ধানও একসময় পাটনা যেত। এখানকার কাপড় একসময়—হাওড়ার ঘুসুড়িতে যেত।

বুড়ো ভৈরবের বুকে লগি ঠেলে ঠেলে মাছমারার দল ফিরছে। এরা বেশির ভাগই এই সেদিনও হিন্দু ছিল। হিন্দু হয়ে জন্মানোটা যেন অভিশাপের মনে হয় রামচন্দ্রের। ক্রোড়ি, তসিলদার হিন্দু পেলে জমা হাসিল করেই ছাড়বে। খরচ-ই-দে, মালবা দেওয়ানখানার ফরমানে উঠে গেলেও ওরা ঠিক আদায় করবে। তার ওপর জোলা, মালো, কামার, কুমোর মানুষজনের ওপর সমাজের শতেক বাধা নিষেধ। সামান্য কলমা পড়ে নিলেই যদি এক লাফে ফৌজদার, সুবেদারের জাতে উঠে জাতভাই হওয়া যায়—যদি তসিলদার, মুকুন্দরদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তো যত তাড়াতাড়ি মুসলমান হয়ে যাওয়া যায় ততই তো ভাল।

এখনও বাতাস গরম হয়ে ওঠেনি। মাছমারারা সারারাত জলে জলে ঘুরে, ফিরছে। বন্দ্যোঘটি দুই ভাইকে দেখে ওদেরই একজন মাথা নিচু করে বলে ফেলল, পেন্নাম—

হাসতে হাসতে রাঘব তাকে থামাল। এটা কী হল অতুল ?

—ওই যাঃ। ভুল হয়ে গেল। আদাব—

—তাই বল। তা তোমার নাম কী এখন ?

—অতুল আলি নস্কর—

—কী মাছ পড়ল ?

—খাবেন তো দিয়ে যাই। ভাল রিঠে। নদীর রিঠে।

—না। ও তুমি নিয়ে যাও। কোটা, বাছা, রান্নার ঝামেলিতে আর নেই—

অতুলের সঙ্গী মুকুর মণ্ডল—এখন মুকুর আলি মণ্ডল। সে সব খবরাখবর রাখে। সে অতুল আলিকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্র ওদের থামালেন। বললেন, মাছ বেচলে কোথায় ?

—যশোর নগরে। দড়াটানার মোড়ে। বটতলায়।

—ওখানে নগর বসেছে বুঝি আজকাল।

অতুল আলি বলল, হ্যাঁ। পেয়াদা, কাছারি, কাজি, আদালত, ফৌজদার—

সবই তো আজকাল ওখানে। মনুরগির দরটা বড় চড়া।

—কেমন শন্নি ?

—এক তনখায় বিশটা। সে তুলনায় একটা একটা পাঁঠা এখনও সস্তা দেখলাম—একশো দামের ওপর ওঠেনি।

—ফিরিঙ্গি পর্তুগিজরা খনুব পাঁঠা খাচ্ছে তাহলে বল ?

—না কর্তা। ওরা শনুয়োর খেয়ে শেষ করে দিল। তুলে নিয়ে গিয়ে খায়। মাগনা খাওয়ার ওস্তাদ। মাছ তো ধরেই। সালতি—ছিপের তো কোনও অভাব নেই ওদের। ছিপ বলা যায় ওদের ঘোড়া।

অতুল আলি, মনুকুর আলি থেমে পড়তে সাবেক হিন্দন—নয়া মনুসলমানদের এই মাছমারার পনুরো দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। তা দশ বারো জন হবে। নীলগঞ্জের বাঁওড়ে নৌকো বেঁধে রেখে ওরা ভৈরবের গা ধরে রোজ কোটচাঁদপনুরে ফিরে আসে ভোর ভোর। আজই বোধহয় যশোর নগরীতে মাছের খোটিতে মাছ তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়েছে ওদের।

ওদেরই একজন ভিজে, আদনুড় গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, মনুসলমান হয়ে ভাবলাম—ফৌজদারের সেপাইয়ের হাত থেকে বাঁচলাম। তা দেখছি সে দানোর হাত থেকে নিস্তার নেই।

রামচন্দ্র বন্দ্যোঘটি দেওয়ানখানার লোক নন। কিন্তু গ্রাম দেশের মাননুষজনের আর্জি ওপরে পাঠাবার জন্যে সময়ে সময়ে ফারসিতে লিখে দিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর ওপর ওদের খনুব বিশ্বাস।

—কেন ?

—আপনি দেশে ছিলেন না। শনুননু আপনার ছোটভাইয়ের মনুখ থেকে।

—তোমরাই বল না।

—তাঁতীদের ভেতর তমিজনুদ্দিনকে তো চেনেন। থাপি জমির উড়নুনি, চাদর, পাগড়ি, ওড়না বানানোর ওস্তাদ। কটা আশরফি জমাতে পেরেছিল, তিন বছর হাড়ভাঙা খাটনুনি খেটে। তা ক্রোড়ি লেঠেল পাঠিয়ে কেড়ে নিয়ে গেছে। তমিজনুদ্দিনকে দিয়েই মাটি খনুঁড়িয়ে।

—মাটি খনুঁড়ে কেন ?

—তমিজনুদ্দিন মাটি খনুঁড়ে লনুকিয়ে রেখেছিল এক হাঁড়ি আশরফি। কথাটা পাঁচ কান হয়ে গিয়ে—

রামচন্দ্র কিছনু বলতে পারলেন না। এদেশে আশরফি হলে কেউ ঠাটবাট করে না। বরং লনুকিয়ে ফেলে সাধারণ মেরজাই গায়ে দিন কাটিয়ে দেয়। পাছে ফৌজদারের কানে উঠলে বিপদে পড়তে হয়।

রামচন্দ্র অনেক কষ্টে বলতে পারলেন, মগরা তো আছেই—

সঙ্গে সঙ্গে অতুল আলি নস্কর ছড়া কাটল—

একে মঘা

তায় আগা

তার মানে মগরা তো যখন তখন ছোঁ মেরে বসতে পারে। তার ওপর আছে

গাঁয়ে গঞ্জে ক্রোড়ি, মুকন্দরের দল। এরা দেওয়ানখানার লোক। আদায় উসুলে আসে। এরা বেশিরভাগই ইস্পাহানি। ওদের নামের আগে প্রায়ই আগা কথাটা থাকে। রামচন্দ্র ভাবলেন, লুটতরাজে দুপক্ষেরই হিন্দু-মুসলমানে কোনও বাছবিচার নেই। পড়াশুনো করা মানুষ বন্দ্যোঘটি রামচন্দ্র। তিনি পড়েশুনে জানেন—সাবেক কালের মগধ থেকে বৌদ্ধরা হিন্দুদের তাড়া খেয়ে আরাকানে পালিয়ে যায়। সেখানে আশপাশের পালিয়ে আসা নাক চাপা মানুষজনের সঙ্গে বিয়ে-শাদি হয়ে গত পাঁচ ছশো বছরে এই মগদের পত্তন। ওরাই চাটগাঁ হয়ে সুবে বাংলার খাঁড়িতে—নদীতে লুট চালিয়ে চলেছে। দোসর পর্তুগিজ। খদ্দেরও পর্তুগিজ। কারোবারের জিনিস বলতে সুবে বাংলা থেকে লুট করা ছেলেমেয়ে —মরদ-মাদী—ছোড়া-ছুঁড়ি।

—মাটি খুঁড়িয়ে তবে লুকোনো আশরফি নিয়ে গেল ?

—নেবে না কেন! বাদশা যে আবার লড়াইয়ে যাচ্ছেন।

—এই না দোবারা কান্দাহার হল।

—তাতে কী! বাদশা যখন—ইচ্ছে হলেই হল। এবার লড়াই নাকি হিন্দুস্থানের মাথায়—

—মাথায় ? কী বলছ অতুল আলি ?

—অত বুঝি নে। যা শোনলাম—তাই বলছি। হিন্দুস্থানের মাথায় কী এক হিন্দু পাহাড় আছে—

রামচন্দ্র বুঝলেন, হিন্দুকুশ। মুখে বললেন, হ্যাঁ—

—সেখানেই লড়াইটা হবে। সেই যুদ্ধের তোড়জোড়ে অনেক হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক লাগবে। লাগবে সেপাইদের চাল ডাল গম ঘি। হাতির চিনি। ঘোড়ার ছোলা। তাঁবু, কম্বল—কত কী—

আর কথা বাড়ালেন না রামচন্দ্র। ওদের যেতে দিলেন। এবার তিনি ছোট-ভাইয়ের মুখোমুখি হলেন। রাঘবের পরনে ঢোট্ট খেটে সমুদ্রগড়ী ধুতি। খালি গা। চোখের নিচে রাত জাগার কালি। সারা মুখ কাঁচা-পাকা দাড়িতে ভুল ভুল করছে।

—কী খেয়ে আছ রাঘব ?

—কেন ? একথা বলছেন কেন ? খাওয়া-দাওয়াটা কি আমার আপনার কাছে এখন খুব বড় ব্যাপার !

রামচন্দ্র জানেন—খাওয়া-দাওয়া এখন দুভাইয়ের কাছে খুব বড় ব্যাপার নয়। জীবন শুরু হয় আশায়—আহ্লাদে। এখন জীবনের সামনে কোনও আশা নেই। আহ্লাদ নেই। এখন অন্তহীন কোনও ইঁদারায় ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা।

কোটচাঁদপুরের রাস্তায় দুধারের লতাপাতা হাত বাড়িয়েছে। বোঝাই যায় মানুষজনের চলাফেরা কমেই চলেছে। মেঠো পথ চিবোল ঘাসে ঢেকে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র বললেন, শুধু কয়েকজনের কুলে নয় রাঘব—সারা সুবে বাংলার ভাগ্যে মগদোষ ঘটেছে!

রাঘব কোনও কথা বললেন না। তার মুখে তাকিয়ে রামচন্দ্র ফের বললেন,

তা নয়তো কী। মাঠভর্তি ধান, আখ—গাছে গাছে ফলপাকুড়—জলে মাছ—কোনওটার অভাব নেই। হিন্দুস্থানের শুকনো দিককার ফৌজদাররা এদিকে বদলি হলে আর ফিরে যেতে চায় না। কথায় বলে বাংলায় ঢোকার পথ একশোটা। বেরবার পথ একটা। তার মানে বেরবারই পথ নেই। দেখে এলাম—হুগলি অঞ্চলেই আট ন'হাজার ফিরঙ্গি বাসা বেঁধেছে। দেশে ফেরার নাম করে না।

রাঘব তেরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কোথায়—কোনদিকে যাব বলতে পারেন, আপনি গেলেন পিপলিপত্তন। বাস্তুভিটে ফেলে চলে যেতে পারিনে। আপনার পথ চেয়ে কাটিয়েছি এতদিন। মাঠে ছাড়া গাই গরুর দুধ আর গাছের নোনা খেয়ে দিন গুনতাম। এখন বলতে পারেন—কোনদিকে? কোথায় যাব?

বন্দ্যোঘাটি রামচন্দ্র ফারসি জানেন। জানেন সংস্কৃত। উত্তর মীমাংসায় তিনি সিদ্ধবাক একরকম। সাদি, হাফিজও তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু ছোটভাইয়ের একথার তিনি কোনও জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে রাঘব হন হন করে চাঁচলের দিককার রাস্তা ধরল। এই পথ দিয়ে এক সময়—মান সিংহের ফৌজ রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী মন্দির অব্দি গিয়েছিল।

রাঘবের পথ ধরেই রামচন্দ্র এগোলেন। রাঘব এইমাত্র গেছে। কিন্তু হন হন করেই গেছে। তার টিকিটিও চোখে পড়ে না। রামচন্দ্র ভাবছিলেন—দেশটার কী হয়ে গেল। সারা দেশের কপালে মগদোষ! সারা দেশের কপালে মুঘল দোষ! সারা দেশের কপালে ফিরঙ্গি দোষ!

গত পঞ্চাশ বছরে তিনি এই কোটচাঁদপুরে বড় হয়ে উঠেছেন। আগে একশোজনে বড়জোর এক কি দুজন মুসলমান দেখা যেত। আকবর বাদশা গেলেন। এলেন জাহাঙ্গীর বাদশা। তিনিও চলে গেলেন। এলেন শাহজাহান বাদশা। গাঁ দেশে শীতের ভোরে, গরমের বিকেলে আউল বাউলের পাশাপাশি দরবেশ-ফকিররাও ক্ষেতের আলে নাচতে নাচতে—গাইতে গাইতে দিগন্তে পিঠ রেখে দেখা দিয়ে আসছেন। ঈশ্বরের কথা—আল্লার কথা তাঁদের গান হয়ে সন্ধ্যার শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে কতকাল ধরে মিশে যাচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষজন অনেকেই উদার ইসলাম নিল। নিচ্ছে। ভালবেসে। আবার অনেকে জাতে উঠতেও মুসলমান হচ্ছে। হয়ে যেই দেখছে সুবিধে তো নেই—তাহলে মুসলমান হতে গেলাম কেন—ভেবে আঙুলও কামড়াচ্ছে।

এখন তাই কাছারিতে—গঞ্জে—বুড়ো ভৈরবের ঘাটে—তসিলের আদায় উসুলে উঠতে-বসতে নয়া মুসলমানদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কোটচাঁদপুরেই দুটি নতুন মসজিদ উঠেছে।

রোদের তাত বাড়তে রামচন্দ্র বিরাট এক বকুল গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। পঞ্চাশ বছরেরও আগে—আগ্রায় তখন আকবর বাদশা—রামচন্দ্রের পিতাঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—এই বকুলগাছটা নাকি চাঁচল অব্দি রাস্তা হওয়ার সময় শের শার সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌড়ের হুকুমে বসানো। অনেক পুরনো গাছ। বড় হয়ে রামচন্দ্র দেখেছেন—কাছাকাছি গাঁয়ের নাম ব্রহ্মপুর। আবার ব্রহ্মপুরের ঠিক উলটোদিকে বুড়ো ভৈরবের ওপারে একটি গ্রাম আছে যার নাম গৌড়জিৎ।

এখন এই বয়সে এমন চিড়বিড়িয়ে ওঠা গরমে তিনি কোথায় যাবেন—তা জানেন না রামচন্দ্র। বকুলের ছায়াও যেন এক বিরাট আশ্রয়। সামনে পেছনে কোটচাঁদপুরের মাঠঘাট এখন জ্বলন্ত সবুজ। পথে ঘাটে লোক নেই। এখন রমজানের মাস। সন্ধে হলে চাঁদের আলোয় আগে এই কোটচাঁদপুরেই ভৈরবের ঘাটে সারাদিন রোজা রেখে অনেকে ইফতারে বসত। রামচন্দ্র রাঘবেরা সেই ইফতারে গাছের নোনাটা, ডাবটা পাঠিয়ে দিতেন। ভিজে মুগ, নারকেল, ডাবের জলের পানা, শশা—সব দস্তুরখানায় সাজিয়ে বসা হত। সেসব সন্ধ্যা আর আসে না কেন? সেসব মানুষজন কোথায় গেল?

রামচন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে কোটচাঁদপুরের পোড়া-মা তলায় এসে হাজির হলেন। এখানেই বসতি কিছু ঘন। এখানেই এক চাপে তিল তেলের ঘানি, শাঁখের কারিগরদের আড়ত, সোনালি সুতোর পাড় বসায় যারা, একচাপে তাদের ঘরগেরস্থি।

ছবির মতো সেসব ঘরবাড়ি পরিষ্কার রোদে দাঁড়িয়ে আছে। গোলপাতার চালে ধুঁদুলের লতা বেয়ে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে দেখা যায় কারও বা উঠোনে ঝিঙে মাচার নিচে পোষা কুকুর আর হাঁস পাশাপাশি শুয়ে বসে—ধুঁকছে—রাস্তার দিকে তাকিয়ে। একজনও মানুষ নেই ঘরে—উঠোনে—বারবাড়িতে। এখানেও নিশ্চয় মগদোষ লেগেছে। দেখে মনে হবে—বাড়ির সবাই খানিক আগে দলবেঁধে কীর্তন শুনতে গেছে।

পোড়া-মা তলায় এসে সত্যিই ধন্দে পড়লেন বন্দ্যোঘাটি রামচন্দ্র। এই বয়সে কোটচাঁদপুরের মাঠঘাট ছেড়ে ঠিক কোনদিকে যাবেন! দুপুর হয়ে এলো। গাছ-পালার আড়ালে পড়ে গেছে বুড়ো ভৈরব। নদীপথে নৌকোয় ভেসে পড়া যায়। নয়তো চাঁচল অব্দি গিয়ে যশোরেশ্বরীর ফাঁকা ভাঙা মন্দির আসার আগেই বাঁ হাতে শিলাইদহর রাস্তা ধরা যায়। সামনে কোনও আশা নেই। নেই কোনও আহ্লাদ। অথচ জীবন অনেকখানি হয়ে গেছে। হয়ে গিয়ে মগদোষে ফুরিয়েও এল আচমকা। দেশের এই দশাই কি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ রাষ্ট্রবিপ্লব? যেমন হয়েছে একদিন সাবেক হিন্দুস্থানের ষোড়শ জনপদে।

দিল্লিতে জাহানাবাদে নয়া দেওয়ান-ই-খাসের শান্ত ঠাণ্ডা ছায়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন শাহজাদা দারাশুকো। আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় যেমন গাছের ছায়া—লতাবিতানে সাজানো হামাম—জাহানাবাদে এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। শাহজাদা দেখতে পেলেন—একজন উজবেক আমির চলেছেন ছয় বেহারার পালকিতে। পান চিবোতে চিবোতে। তাঁর পাশে পাশে একজন গোলাম ছুটে ছুটে চলেছে। রুপোর পিকদানি হাতে।

মাঝেমধ্যে অগোছালো চেহারার ভবঘুরে। দেখেই ওদের চিনতে পারেন দারা। প্রায়ই এরা কোতোয়ালের সেপাইদের হাতে ধরা পড়ে। দেহাতি ছেলে-ছোকরারা ফৌজে ভর্তি হবার জন্যে দূর দূর জায়গা থেকে জাহানাবাদে এসে থাকে। আসলে জাহানাবাদ ফৌজি আস্তানা বলা যায়। প্রায় চল্লিশ হাজার

ফৌজ নয়া রাজধানীকে ঘিরে তাঁবু ফেলে বসে আছে।

এখানে সবকিছুই যেন হিন্দুস্থানের দেহাতি মানুষজনের মাথা ঘুরিয়ে দিতে তৈরি হচ্ছে। জুম্মা মসজিদের গম্বুজ, মিনার আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। বাকিটা লাল বেলে পাথরের। টিলার মাথা কেটে মসজিদ উঠেছে।

আগ্রায় যমুনার গা ঘেঁষে লতায়-পাতায়—গাছগাছালির ছায়ায় বিরাট এক এক হাভেলিতে এক একজন বড় মানুষ থাকেন। জাহানাবাদে এখনও তা সম্ভব হয়নি। এখন জাহানাবাদে বেশির ভাগ বড় বাড়ি পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বানানো। তার ফাঁকে-ফোকরে এক এক চাপে চাটাই বেড়ার ঘর। মাটি আর চুনের পোঁচড়া দিয়ে। দেখতে ছিমছাম। বাতাসও খেলে। কিন্তু প্রায়ই আগুন লেগে যায়। ওসব ঘরেই ফৌজি নায়েক, রিসালাদাররা থাকে। স্রেফ রাতটুকুর জন্যে। নয়তো সারাদিন জাহানাবাদকে ঘিরে নয়া রাজধানীর বাইরে প্রান্তর জুড়ে বিশাল চৌহদ্দিতে ফৌজি মহড়া চলছে কিছুদিন ধরে।

কিসের এত মহড়া? ভেবে পান না দারাশুকো। আবার কোন খোয়াবে মেতে উঠলেন বাদশা। কিছুদিন ধরেই তিনি লক্ষ করছেন—দেওয়ানখানার এক হুকুমনামায় সুবে বাংলা থেকে সোরা রপ্তানি বিলকুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাটনার ওলন্দাজ কুঠিয়াল ক'দিন ধরে এই ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করে গেল দেওয়ানখানায়। তার কুঠি গঙ্গার বুকে নৌকো থেকেই বাংলার সোরা কিনে ঘাটে মজুদ করে। তারপর তা গো-গাড়িতে সুরাট অব্দি গিয়ে বন্দর আব্বাসের জাহাজ পায়।

হঠাৎ দারার কানে একটি আওয়াজ পেঁছিতেই তিনি ভাল করে কান পাতলেন। আবার যদি সে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। একটু পরেই ফের সেই আওয়াজ। গুম গুম। শাহজাদা নিচে তাকালেন। লালাকিল্লায় এসে তিনি নিচে চাতালে বাঁধা তুর্কি ঘোড়াটিকে বেছে নিয়েছেন। একবার ভাবলেন—নিজেই ঘোড়া দাবড়ে দেখে আসবেন—কোত্থেকে ওই চাপা গুম গুম আওয়াজ আসছে। তারপর ঠিক করলেন—লালাকিল্লার সামানবুরুজে উঠবেন। সেখান থেকে জাহানাবাদের সবটা তো বটেই—আরও দূরে দূরে জায়গা পরিষ্কার দেখা যায়।

দুপুরের চড়া রোদে উটের দল অব্দি কাবু হওয়ার জোগাড়। সামানবুরুজের কাছাকাছি লালাকিল্লার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শাহজাদা সারা জাহানাবাদকেই দেখতে পেলেন। উটের মাথার ওপর—গলায় ভিজে ঘাসের চুবড়ি বেঁধে দিয়েছে সারবানরা। রমজান মাসের এই ভর দুপুরে গরমে উট খেপলে তাকে সামলানো কঠিন। অত বড় জানোয়ার চারদিকে তছনছ করে ছুট লাগাবে।

দূরে জুম্মা মসজিদের গম্বুজ, মিনার দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে খোলা প্রান্তরে এক এক জায়গায় থোকা থোকা তাঁবু। এরকম তাঁবু ছড়িয়ে আছে পানিপথ যাবার রাস্তার দুধারে। তাঁবুকে ঘিরে সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তাদের আশ-পাশে সেপাইদের জটলা, কাঠের আঁচে রান্নার ধোঁয়া।

দূরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে এক জায়গায় শাহজাদার চোখ আটকে গেল। মাটি থেকে উঁচু হয়ে বেশ অনেকটা জুড়ে কালো মতো কী স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ানো।

দারা চিনতে পারলেন। আগ্রার শাহী পিলখানার বেশ কিছু হাতি জাহানাবাদে চলে এসেছে। তাদেরই একটা দল। জংপুরার দিককার প্রান্তর জুড়ে কুচ করছে। ওদেরই একজন চার পা শূন্যে তুলে মুহূর্তে গড়ান খেয়েই উঠে দাঁড়াল।

যা ভেবেছিলেন শাহজাদা—তাই। কয়েকটা হাতি নিয়ে দূরে জংপুরার দিককার ফাঁকা প্রান্তরে লড়াইয়ের তালিম দেওয়া হচ্ছে। লালকিল্লার সামান-বুরুজ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। হাতিদের কানের কাছে বন্দুক থেকে গুলি করে আওয়াজটার সঙ্গে হাতিকে সইয়ে নেওয়া হচ্ছে। লড়াইয়ের ভেতর কোথাও কোনও অচেনা আওয়াজ হল তো কথা নেই—হাতি অমনি ঘাবড়ে গিয়ে হয়তো নিজের দিককার পদাতীদের গুঁতিয়েই লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে। তাই তার কানের কাছে বন্দুক থেকে গুলির আওয়াজ করে—পটকা ফাটিয়ে লড়াইয়ের ময়দানের আওয়াজের সঙ্গে সহজ করে নেওয়া হচ্ছে। সামনে লড়াই থাকলেই এমনটি করা হয়ে থাকে।

এই তো কান্দাহার গেল। আবার? আবার কোথায়? ভেবে পেলেন না শাহজাদা দারা। তাঁর চোখের সামনে আব্বা হুজুরের চোখ দুটি ভেসে উঠল। সে চোখে কোনও পলক পড়ে না। সে চোখে কোনও হাসি নেই। কৌতুক নেই। সে চোখ শুধু এক খোয়াবে ডুবে থাকে—যে খোয়াব বার বার মনে করিয়ে দেয়—খাইবার, সমরকন্দ, গিলগিট, চিত্রলের ওপার থেকে আমার দাদাসাহেবের দাদাসাহেব এসেছিলেন। তাঁর খুলে দিল তৈমুরি অভিযানের বল্গা ছাড়া ঘোড়ার ছুটে যাওয়া, দখল, অধিকার—বাতাসে চাঘতাই ধ্বজ তুলে ধরা।

জংপুরার দিককার প্রান্তরে ফের চোখ গেল শাহজাদার। শাহী হাতিদের সামনে আগুন ধরানো হয়েছে। আগুন, আগুনের তাপকে বড় ভয় হাতিদের। লড়াইয়ের সময় ফাটা-নল কামান থেকে তোপ বেরিয়ে গিয়ে অনেক সময় আশপাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। এমনকি পলতে বন্দুক চালাতে গিয়ে কোনও কোনও আনাড়ি বন্দুকচী নিজের দাড়িতেই আগুন ধরিয়ে বসে। তখন সেই বন্দুকচী ভয়ে দৌড়োদৌড়ি করে নিজেকেই চলন্ত জ্বলন্ত আগুন করে বসে। তাই দেখে ভয় পেয়ে হাতি পিছিয়ে আসে—কিংবা ছুটতে ছুটতে লড়াইয়ের ময়দানের বাইরে চলে যায়। তাতে অনেক সময় জেতা লড়াই হারে গিয়ে দাঁড়ায়।

শাহজাদা তাড়াতাড়ি সামানবুরুজ থেকে নেমে এলেন। এক্ষুনি একবার আব্বা হুজুরের কাছে যাওয়া দরকার। তাঁকে বলতেই হবে—কেন লড়াই? লড়াই বা কেন?

॥ চুয়াত্তর ॥

শাহজাহান তখন গোসলখানায়।

অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে শাহজাদা দারা গোসলখানার দিকে এগোচ্ছিলেন। আগ্রা আস্তে আস্তে আকবর বাদশার নাম পেয়ে আকবরাবাদ হয়ে উঠেছে। এই দিল্লিও নয়া রাজধানী সুবাদে আব্বা হুজুর শাহজাহানের নামে জাহানাবাদ

হয়ে উঠছে একটু একটু করে। পঞ্চাশ বছরের ওপর গাছপালা লাগাতে লাগাতে আকবরাবাদে এখনকার এই গরমের হলকা টেরই পাওয়া যায় না। কবে যে জাহানাবাদ গাছে গাছে তেমন সবুজ হয়ে উঠবে কে জানে।

শাহজাদার গায়ে বুরহানপুরি হরনালা সুতোয় বোনা হালকা সুতির আঙরাখা। পায়ে চিতার চামড়ার বিনামা জুতো। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে দারার গলার মুক্তো-মালাটি বুকের ওপর লাফিয়ে উঠে শুয়ে পড়ছে।

গরম বাড়িতে লালকিল্লার পাথুরে দেওয়াল আস্তে আস্তে তেতে উঠছে। খোলা অলিন্দ সামনে পড়তেই দারা দেখলেন—লাহোর যাবার শাহী সড়ক দিয়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার ধুলোর রেখা টেনে দিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছে। ধুলো আর হালকা বাতাস থেকে বাঁচতে তাদের নাক, মুখ, কান মোটা কাপড়ে ঢাকা।

শাহজাদা জানেন—পুরনো দিল্লির ধ্বংসস্তূপের ওপর এই জাহানাবাদ গড়ে উঠছে। গায়েই যমুনা। এক ফালি চাঁদ হয়ে জাহানাবাদ দুদিক থেকে যমুনাকে যেন ধরতে চাইছে। তার এক দিকে নৌকো করে ওপারে যাওয়া যায়। আরেক দিকে বাড়ির পর বাড়ি—শাহী সড়ক ধরে লাহোরের দিকে এগোতে এগোতে দেখা যাবে—বাড়ি যেন আর ফুরোয় না। হাভেলির পর হাভেলি। সাজানো গোছানো। যতবার লাহোর গিয়েছেন শাহজাদা, ততবার এটা তাঁর চোখে পড়েছে।

লালকিল্লাও আধখানা চাঁদ হয়ে দুপাশ থেকে যমুনাকে ছুঁয়েছে। যমুনার অন্য সব দিক নালা কেটে জল ভরা। তা পেরিয়ে এগিয়ে আসা কঠিন। কুচে যোগ দিতে আসা রাজা মির্জা জয়সিংহের ঘোড়সওয়াররা নালার ওপারে তাঁবু ফেলেছে। ওখানটায় জলের গা ধরে শাহী বাগ। তারই উলটো দিকে জাহানাবাদের দুই শাহী সড়ক এসে মিশেছে।

জলের নালা আর যমুনার মাঝামাঝি বিশাল বেলে জায়গায় শাহী ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে তাদের তেজ যাচাই করা চলছে। পছন্দসই তেজি ঘোড়া হলে ওদের দাবনায় হিন্দুস্থানে বাদশার মোহর দেগে দেওয়া হবে।

জাহানাবাদের বেশির ভাগ ঘরবাড়ির দরজা-জানলা এখন বন্ধ। বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস জুড়িয়ে এলে তবে দরজা-জানলা খুলে যাবে। ইট-পাথরের বাড়ি আর ক'টাই বা! বেশিরভাগই তো মাটি আর খড়ে তৈরি। কিল্লার ওপর থেকে ওসব বাড়ি দেখে বড় সুন্দর লাগে শাহজাদার। মাটির দেওয়ালে চুনের প্রলেপ। দেখতে সত্যি সুন্দর।

এইসব সুন্দর বাড়ির ভেতর প্রচুর ছোট ছোট চালাঘর। ওগুলো সেপাই, গোলামদের সস্তার আস্তানা। ওইসব অসংখ্য চালাঘরে প্রায়ই আগুন লাগে। তখন মনে হবে সারা জাহানাবাদে বুঝি বা আগুন ধরে গেছে। ওসব চালাঘরে গোলাম, ফৌজি সেপাই, দর্জি, কারিগরদের আস্তানা। একবার আগুন লাগলে ওরা নিরুপায় হয়ে ছোটাছুটি করে। জলের জন্যে। জল সেই যমুনায়। অনেকটা নিচে নেমে তবে সে জলের দেখা পাওয়া যায়। গত বছরই এক আগুনে এমন ষাট হাজার চালাঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। জাহানাবাদ কি আসলে রাজধানী

শহর ? না, গায়ে গা লাগানো অনেকগুলো গ্রাম।

শাহজাদা উঁচু গলিপথ পেরিয়ে ঢাকা সুড়ঙ্গ ধরে গোসলখানার দিকে এগোবেন। এমন সময় লাহোর যাবার শাহী সড়কে তাঁর চোখ আটকে গেল। সাত আটখানি পালকির এক শিবিকা চলেছে সম্পন্ন গেরস্থ বাড়ির সামনে দিয়ে। খোলা অলিন্দ দিয়ে সবই দেখা যায়। জাহানাবাদে দেওয়ানখানার কোন উঁচু আমলার বাইরেকার ঘরের জানলায় খসখস টাঙানো। গোলামরা চৌবাচ্চায় জমানো জল এনে খসখস ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমলাটি নিশ্চয় দুপুরের নাস্তা সেরে মাটির নিচের সবচেয়ে দামি ঘরে ঘুমোচ্ছে। সেখানে আরামের ঠান্ডার ভেতর তার মাথার ওপর অবশ্যই টানা পাখা থেমে নেই। শাহজাদার নিজের জন্যেও জাহানাবাদে এমন একটি হাভেলি তৈরি সারা—যার মাটির নিচে অন্তত চারখানি ঘর তৈরি হয়েছে। সেখানে সারাটা গরমকাল নিশ্চিন্তে বসে পড়াশুনো —ভাবনাচিন্তা করা যাবে। মাটির ওপরের ঘরগুলোর জানালা দরজাতেও খসখস বসে গেছে। শাহজাদা থাকলে সেখানে সর্বক্ষণ গোলামরা খসখসে জল ছিটিয়ে দিতে থাকে।

দারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই সাত আটখানি পালকির শিবিকার পহেলা পালকি থেমে পড়াতে সারা শিবিকাটি থেমে দাঁড়াল। এক একটি পালকিতে ছ'জন করে বেহারা। ওই সম্পন্ন আমলার গেরস্থবাড়ির এত অতিথি? তাহলে দু'চার আশরফি জমেছে! না, তা নয়।

কেননা, অতিথিদের গোলামরা কেউ তো এগিয়ে গিয়ে গেরস্থবাড়ির দরজায় মসলিনের দড়ি ধরে টানল না। দড়ি টানলে ঘণ্টা বেজে উঠত। তখনই ভেতর থেকে কেউ না কেউ জানলার খসখস তুলে দেখে নিত—কে ডাকছে। সেসব কিছুই হল না। পালকিগুলোর শিবিকা ঘিরে বেহারা আর গোলামদের ছুটো-ছুটি। এমন সময় দারা দেখলেন, পহেলা পালকি থেকে একখানি আশ্চর্য সুন্দর পা বেরিয়ে এল। কোনও জেনানার। রানাদিলের পা দেখেও এক একসময় চোখ ফেরাতে পারেন না শাহজাদা।

এবার পায়ের মালিক পালকি থেকে বেরিয়ে এসে নিচু হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল! অমনিই বেহারারা মাটিতে ঝুঁকে পড়ল। পেছনের পালকিগুলো থেকেও কয়েকজন জেনানা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। নিশ্চয় পায়ের চুটকি কিংবা নাকছাবি কি অন্যকিছু গা থেকে ছিটকে রাস্তায় খসে পড়েছে। রাস্তায় এভাবে নিজেদের মুখ দেখায় না জেনানারা। ওদের চিনতে পারলেন শাহজাদা। ওরা শয়তানপুরায় ঘর বাঁধা জেনানা নয়। ওরা কাঞ্চনবালা। বড় কোনও ওমরাহর বাড়ি মুজরো নিয়ে নাচগান করতে চলেছে। নিশ্চয় সেই ওমরাহর হাভেলিতে আজ কোনও উৎসব। এই জেনানারা খুব সুন্দরী হয়। নাচে ভাল। কারও কারও গানের গলাও খুব সুরেলি।

গোসলখানার দিকে এগোবেন শাহজাদা। এমন সময় সেই গলিপথের মুখে দারাকে কুর্নিশ করে যিনি দাঁড়ালেন—তিনি ইংলিশস্তানের ইলচি গেব্রিয়েল ব্রাউটন।

দারা হেসে তাঁকে দু'হাতে তুলে ধরলেন।—আপনি তো আর শুধু ইলচি নন।

ব্রাউটন দীর্ঘদিন মুঘলশাহীর সঙ্গে ওঠাবসা করেন। আকবরাবাদ-জাহানাবাদ—দু'জায়গাতেই কঠিন অসুখ-বিসুখে তাঁর ডাক পড়ে থাকে। হয়তো এখনই তিনি হারেমে জেনানামহলে কারও চিকিৎসা করে ফিরছেন। ব্রাউটন ভাঙা ফারসিতে বিনয় করে যা বললেন—তা সাজালে এরকম দাঁড়ায়, হ্যাঁ। মুঘল শাহীতে আমি একজন বিদেশি হেকিমও বটে।

শাহজাদা জানেন, এই ফুর্তিবাজ ইংলিশস্তানের ইলচির মনের দুঃখটা কোথায়। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তাঁর কষ্টের শেষ নেই। এ ব্যাপারে কথা তুললে ব্রাউটন থামতেই চান না। আর এখন ঘটলও তাই।

শাহজাদা বললেন, জাহানাবাদেও কি আগ্রার মতোই মনোমত খাবার মিলছে না?

ব্রাউটন দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাঝবয়সী বিদেশিটি বেশ লম্বাই চওড়াই। মাথার সোনালি চুল লম্বা হয়ে গাইয়েদের মাথার বাবরি হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে কিছু মুটিয়ে গেছেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। হিন্দুস্থানের রাজধানীতে তিনি একজন ইলচি ছাড়াও রীতিমত পসার জমানো একজন হেকিমও বটে। শাহী খাজানাখানায় তিনি মাসে হেকিমির জন্যে দশ আশরফি করে পেয়ে থাকেন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে থাকেন ভেট হিসেবে। রুগীরা দিয়ে থাকে। আর দেয় আমির ওমরাহেরা। কারণ, সবাই জানে ব্রাউটন শাহজাহান বাদশার ঘনিষ্ঠ মানুষ।

ব্রাউটন বললেন, আমি খারাপ আয় করি না শাহজাদা। খরচেও আমি পেছপাও নই। তবুও এক একদিন এমন অবস্থা দাঁড়ায়—ভাগ্যে কোনও খাবারই জোটে না।

—কী বলছেন ব্রাউটন? এ তো আমাদের মুঘলশাহীর পক্ষে লজ্জার কথা!

—না। ওভাবে কথাটা নেবেন না শাহজাদা। যদি সত্যি ছবিটা তুলে ধরি তো বুঝতে পারবেন। বেশির ভাগ দিন বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না। যাও বা পাওয়া যায় তা বড় মানুষদের খাওয়া দাওয়ার পরেকার উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু নয়। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গী বলতে মদ। তাও জাহানাবাদের একটিমাত্র দোকানেই পাওয়া যায়। আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ মদ প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। দেশি আঙুর থেকে হিন্দুস্থানে বেশ ভাল মদ তৈরি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ বাইরের দোকানে বিক্রি হয় না। জেন্টুদের শাস্ত্রে—মুসলমানদের শরিয়তে মদ খাওয়ায় কড়া নিষেধ।

হো হো করে হেসে ফেললেন দারা। এর আর কী করা যাবে ব্রাউটন! এটা যে হিন্দুস্থান!

—সামান্য কিছু মদ আমি আমেদাবাদে—গোলকুণ্ডায় খেয়েছি—তাও ওলন্দাজ আর ইংলিশস্তানিদের বাড়িতে অতিথি হয়ে—কিন্তু সেসব মদের স্বাদ ভাল নয়। ইস্পাহান থেকে বন্দর আব্বাসি হয়ে 'সিরাজি' আসে সুরাটে। সে সিরাজি জাহানাবাদ পৌঁছতে আরও ৪৬ দিন। ওলন্দাজরা ক্যানারির মদ নিয়ে

আসে সুরাটে। দুটো মদেরই দাম এত চড়া—মুখে দিলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় শাহজাদা।

শুনতে শুনতে শাহজাদার মনে হল—ব্রাউটন মদে একজন বিশেষজ্ঞ।

—লণ্ডনে যে মদের পাইট বিক্রি হয়—সে রকম তিন পাইট মদের দাম জাহানাবাদে পড়বে ছ-সাত আশরফি। এখানকার দিশি মদ মুখে দিয়ে দেখেছি শাহজাদা। পোল্যাণ্ডের ধেনো মদের চেয়েও কড়া। খেলে মনে হয় গলা-বুক জ্বলে গেল। সত্যি কথা বলতে কি—খুব কম লোকই হিন্দুস্থানে মদ খায়। মদ হিন্দুস্থানিদের তেমন করে টানতে পারে না।

—সে তো ভাল কথাই ব্রাউটন। যা খেলে গলা-বুক জ্বলে যায়—তা খাওয়া কেন? —বলেও শাহজাদা বুঝলেন, গেব্রিয়েল ব্রাউটন তাঁর নিজের কথার ঘোরে রয়েছেন। না-খেয়ে থাকার দুঃখেই যেন ভাসছেন তিনি। খেয়ে থাকলে এই শরীর হয়?

—পেস্তা, বাদাম, আপেল, আখরোট, খুবানি, ডালিম, আঙুর, তরমুজ, বেদানা আসছে ইস্পাহান, বলখ্, বোখারা, সমরখন্দ থেকে। গরমে তরমুজের দাম পড়ে যায়। কিন্তু ভাল জাতের তরমুজ তখন বাজারে ওঠে না। অথচ হিন্দুস্থানে এসে খাবার পাতে তরমুজ অভ্যেস হয়ে গেছে। না খেয়ে থাকতে পারি না। তবে গরমের দিনে—এই এখন আমটা সস্তা যাচ্ছে—দোবেলা আম খাই শাহজাদা।

—আম তো খুব ভাল জিনিস।

—দেখুন জাহানাবাদের আমের জাত ভাল নয়। ভাল আম আসে সুবে বাংলা থেকে। সুবেদার শাহজাদা সুজাঙ্গীর নিশ্চয় ঢাকায় বসে বসে ভাল ভাল আমের স্বাদ নিয়ে থাকেন।

—যান না একবার ঢাকায় ঘুরে আসুন। শাহজাদা সুজা খুব খাতিরদারি—কদরদারি জানেন।

—যেতে হবে একবার ঢাকায়। গতবছর রমজানের শাহজাদা সুজা আগ্রায় এসেছিলেন। তখনই আমায় ঢাকা ঘুরে আসার দাওয়াত দেন। ভাল আম অবশ্য গোয়া থেকে—গোলকুণ্ডা থেকেও আসে শাহজাদা।

—গোয়ার আমে আঁশ বড্ড বেশি।

—দোকানে গিয়ে কিছু খাবার উপায় নেই। মাছি আর ধুলোয় ভর্তি। খাওয়া যায় না। এখানকার চুলোগুলো ঠিকমত নয় বলে রুটিগুলো ভালভাবে তৈরি হয় না। সেঁকাও ঠিকমত হয়ে ওঠে না।

—কিল্লার আবদারখানা থেকে রুটি আনিয়ে নিলে পারেন।

—তাই তো আমি করি শাহজাদা। তবু বলব, টাটকা মাখন, দুধ, ডিম দিয়ে বানালেও স্বাদ যেন কেমন পোড়া পোড়া লাগে। ঠিক রুটির স্বাদ নয়—যেন কতকটা আমাদের কেকের মতো।

শাহজাদা এবার এগোবার জন্যে পা বাড়ালেন। পারলেন না। ব্রাউটন থামেননি। এই বিদেশি হেকিম কয়েকবারই নাদিরা বেগমকে অসুখ থেকে চাঙ্গা

করে তুলেছেন। এঁর কথার ভেতর চলে যাওয়া যায় না।

ব্রাউটন বললেন, বাজারের রান্না মাংস বিশ্বাস করে খাওয়া যায় না। কিসের মাংস কে জানে! ঘোড়া না উট—কে বলতে পারে! ভেড়ার মাংস পাঁঠার মাংস বলে চালিয়ে দিচ্ছে। তাই হুঁশিয়ার হয়ে মাংস কিনি। কিনে বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা করি। কচি পাঁঠার মাংসই ভালবাসি। তাই মাঝে মাঝে জ্যান্ত কচি পাঁঠাই নিয়ে থাকি। যেদিন বাড়িতে রান্নার পাট রাখতে ইচ্ছে হয় না—সেদিন এই কেল্লায় গোলাম পাঠিয়ে রান্না মাংস কিনিয়ে আনি।

ব্রাউটন একজন রীতিমত খাদ্যরসিক তা বুঝতে বাকি ছিল না শাহজাদার। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছিলেন?

—ইচ্ছে ছিল বাদশার দরবারকে একবার হাজির হই।

—তা চলুন না।

ব্রাউটন তখনও তাঁর কথার ঘোরে। সেই ঘোরের সুর একটাই। কিছুই খাবার পাওয়া যায় না। কিচ্ছুটি না খেয়ে গেব্রিয়েল ব্রাউটন দিব্যি বছরের পর বছর বেঁচে আছেন। তিনি ফের শুরু করলেন, ভাল জাতের খাসি, মোরগ তো পাওয়া যায় না। মোরগ বেগমখানার জন্যেই বরাদ্দ। সাধারণ মুরগি প্রচুর আসে বাজারে। সস্তাও বেশ। ওদের ভেতর কালো চামড়ার মুরগির নাম দিয়েছি আমি—হাবসি মুরগি। বড় পায়রা আসে বাজারে। আসে ছোট ছোট পাখি। ভাল মাছ। মাছ এলেই উধাও। খোজারা সঙ্গে সঙ্গে তা কিনে নেয়। ওরা মাছ খুব ভালবাসে। কেন বাসে জানি না—

—চলুন। বাকিটা যেতে যেতে বলবেন।—বলেই ব্রাউটনকে প্রায় বগলদাবা করে শাহজাদা দারা এগোলেন। সবে মদ, মাংস, ফলের ফিরিস্তি শেষ হয়েছে। এরপর আরও কোন পদ নিয়ে পড়েন ব্রাউটন তার ঠিক কি! আর ওঁকে বলতে দিলে সারা বেলা কিল্লার গলিপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিতে হত।

যেতে যেতে ব্রাউটনেরও ভাল লাগে শাহজাদাকে। এত বড় মুঘলশাহীর পহেলা শাহজাদা—অথচ তাঁর নেই কোনও ঘমন্ড, নাক-উঁচু ভাব—সবসময়ই দারাশুকোকে ভাল লাগে গেব্রিয়েল ব্রাউটনের। কাজে অকাজে যখনই দেখা হয় শাহজাদার সঙ্গে তখনই তাঁর হাসি হাসি মুখ, বড় বড় ভাসা দুই চোখ, জিজ্ঞাসু সব কথাবার্তা ব্রাউটনকে ভেতর থেকে টানে।

ওঁরা যেতে যেতে দেখলেন—কিল্লার ভেতর থেকে একটি চওড়া রাস্তা চলে গেছে চাঁদনি চকে। পাশে জল ভর্তি খাল। এই খালের জল বেগমমহলের অন্দরে চলে গেছে। যমুনা থেকে টেনে আনা জলেই এই খালের ভরভরাটি।

এমন সময় কিল্লার ওপর থেকে গম্ভীর সুরে সানাই, কাড়ানাকাড়া, মন্দিরা, ঢোল একসঙ্গে বেজে উঠল। দারা বুঝলেন, শাহজাহান বাদশা এবার গোসলখানায় শলাপরামর্শে ছেদ টেনে কিছুক্ষণের জন্যে একা হবেন।

ডানদিকে পড়ল দেওয়ান-ই-আম। ক'দিন আগেই ব্রাউটন এখানে এসেছিলেন। তখন মসনদে বসেছিলেন বাদশা। খোজারা চামর দিয়ে তাঁকে বাতাস করছিল। তটস্থ ভঙ্গিতে ক'জন মনসবদার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। মসনদের ঠিক

নিচে রূপোর বেড়ায় ঘেরা জায়গায় ওলন্দাজ ইলচির সঙ্গে যোধপুরের রাজা জয়সিংহ দাঁড়িয়েছিলেন। চোখ নামিয়ে।

ঠিক এই সময়েই বাদশার সামনে দিয়ে ভাল ভাল ঘোড়া, হাতিদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় পোষা হরিণের দল, নীলগাই, গণ্ডার, বাংলাদেশের বড় বড় মোষ, চিতাবাঘ, শিকারী উজবেগ কুকুর, শিকারী বাজপাখি।

এখন দেওয়ান-ই-আম একদম ফাঁকা। তার বিশাল চত্বর পেরিয়ে তবে গোসলখানা। শাহজাদাকে দেখে একজন মাঝবয়সী আওরত দাঁড়িয়ে পড়ে কুর্নিশ করল। শাহজাদা এগিয়ে যেতেই গেব্রিয়েল ব্রাউটন তার সামনে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালেন।

দারা শাহজাদার মেজাজে—ভারে এগিয়ে যেতে যেতে পিছিয়ে পড়া ব্রাউটনের দিকে এক পলক তাকালেন। তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। প্রায় চরণদারের মতো সঙ্গী হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইংলিশস্তানের ইলচির এ কী বেয়াদবি? তাঁকে না বলেই তাঁর ইজাজত না নিয়েই গেব্রিয়েল ব্রাউটন পিছিয়ে পড়েন কী করে? শাহজাদার মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। তার ওপর আবার একজন মাঝবয়সী আওরতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়া?

আওরত যদি হারেমের জেনানা-দারোগা হয়ে থাকে তো ব্রাউটনের মাথার ওপর বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। পলকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিতে নিতেও শাহজাদার মনে হল—যেন কাঁচুমাচু মুখে ব্রাউটন আওরতের ডান হাতখানি ধরতে গেলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে আওরত সে-হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বেগে এগিয়ে গেল।

এসব কথা তো বাদশার কানে উঠবেই। দরিয়া পেরিয়ে আসা বিদেশিরা বাড়িঘর ছেড়ে এদেশে থাকতে থাকতে তাঁদের নাম অনেক রকমের কানাঘুষোর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। সেসব দুর্বলতা শাহী ক্ষমার চোখেই দেখে থাকে। কিন্তু হারেমের জেনানা-দারোগা যদি হয়ে থাকে ওই আওরত—তাহলে ব্রাউটনের নসিবে দুঃখ আছে। হারেম বলে কথা। তাও মুঘল হারেম।

শাহজাদা গোসলখানার দিকে এগিয়ে চললেন। এমন সময় তাঁর পেছন পেছন বড় বড় পায়ে এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে ফেললেন ব্রাউটন। দারা তাকালেন না।

ব্রাউটন নিজেই কৈফিয়তের গলায় বললেন, মানুষের হৃদয় বড় কঠিন।

দারা রসিকতা করার ঝোঁক সামলাতে পারলেন না। বললেন, বলুন আওরতের কলিজা।

—যা বলেছেন শাহজাদা।

আগেকার সব রাগ নিমেষে ভুলে গিয়ে দারা বললেন, এই দুনিয়ায় কত রকমের মানুষের বাস বলুন তো?

অবাক হয়ে তাকালেন ব্রাউটন।

দারা বললেন, ইনসান আর আওরত!

—ওঃ! বলে হেসে থেমে গেলেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। তাঁর নিজের বয়স পঞ্চাশ পার হয় হয়। সঙ্গী শাহজাদা দারার এখনও যে তিরিশই হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। ব্রাউটনের মনে হল—আমরা দু'জনই মরদ ঠিকই। কিন্তু দু'জন দুই সময়কার মরদ। মাঝখানে প্রায় বিশ বছরের ফারাক। এক বয়স আরেক বয়সকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। তবু দারাশুকো একজন শাহাজাদা—তাই তিনি সব জায়গায় কথা বলতে পারেন। আমি একজন চিকিৎসক। আমি সব জায়গায় কথা বলতে পারি না।

ব্রাউটন আচমকাই বলে বসলেন, দেখুন তো। এখন আবার ঢাকা চলে যাচ্ছে—

—কে?

ব্রাউটন মুখ ফসকে বলে ফেলেই সাবধান হয়ে গেলেন। তারপর অনেক রেখে ঢেকে চেপেচুপে বলেই বসলেন, তুমি যাবে যাও—তো মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া কেন?

শাহজাদা কঠিন হয়ে বেঁকে দাঁড়ালেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকলেও একজন শাহজাদা। আর এখন তিনি জাগন্ত অবস্থায় জানতে চেয়েছেন—কে? —অথচ তার কোনও জবাব নেই।

ব্রাউটন জানেন, এই শাহজাদা নিমেষে আগুন—নিমেষে জল।

রীতিমত ভার আর হুকুম মেশানো গলায় দারা জানতে চাইলেন, কার কথা বলছেন ব্রাউটন?

শাহজাদার চোখের দিকে তাকিয়ে মুঘল কেতায় রপ্ত ব্রাউটন তসলিম জানিয়ে বললেন, শাহজাদা, আমি খয়রুন্নেসার কথা বলছি—

—কোন খয়রুন্নেসা? দারুণ এক কাঞ্চনবালার খুশনাসিব আম্মিজান? জাহানাবাদে কান পাতলেই যার নাম শোনা যায়?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন শাহজাদা—

পুরো ব্যাপারটা দিনের আলো হয়ে উঠল শাহজাদার চোখে। তিনি ফের আগের মতোই জল হয়ে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

দেওয়ান-ই-আমের ভেতর দিয়ে গোসলখানায় যেতে হয়। গোপনে, নির্জনে শলাপরামর্শ করার সময় বাদশা শাহজাহান এই গোসলখানাই বেছে নিয়ে থাকেন। জায়গাটা দেওয়ান-ই-আমের চেয়ে অনেক ছোট। গরমের দিনে দরকার মতো হামামের আরামও ওখান থেকেই তিনি পেয়ে যান। দেওয়াল জুড়ে রঙিন সব ছবি খোদাই করা। যা দেখলে চোখ ভরে যায়।

এখানে কিছুটা উঁচু বেদীতে বসে বাদশা নির্জনে দেশের খবরাখবর শুনে থাকেন। আমির-ওমরাহরা সেখানে হাজির থাকতে বাধ্য। না-থাকলে তাদের জরিমানা হয়। দিনের শেষে এখানে কাজ শুরু হয় বলে আগাগোড়া উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা সব সময় তৈরি থাকে।

শাহজাদা ঢুকতে যাবেন—কিন্তু তাঁকে দাঁড়াতে হয়। একে একে মির্জা রাজা জয়সিংহ, উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ, গুজরাতের সুবেদার শায়েস্তা খাঁ একসঙ্গে

গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে আসছেন। দেওয়ান-ই-আমের ভেতর দিয়ে নাকারাখানা থেকে বাজানো সানাই, ঢোল, কাড়ানাকাড়া, আর মন্দিরার মিলেমিশে যাওয়া গম্ভীর সুর গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। সুবেদার শায়েস্তা খাঁ সম্পর্কে শাহজাদার মামা। তিনি সবার শেষে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সম্ভ্রম আর স্নেহ মিশিয়ে দারার মুখে তাকালেন। দারা পালটা সম্ভ্রম দেখিয়ে সেই স্নেহ-দৃষ্টির জবাব দিলেন।

গেব্রিয়েল ব্রাউটন লাল কিল্লায় অবাধগতি হলেও এখন গোসলখানায় ঢুকতে পারলেন না। এ সময় বাদশা শাহজাহান কখনও সুগন্ধী আতরে স্নান করেন। কখনও শলাপরামর্শে বসেন। কখনও বা সন্ধ্যার মুখে মুখে খানিকক্ষণ একা থাকেন। একা থাকাও তাঁর একটা নেশা। এ নেশা ইদানীংকার।

না-ডেকে-পাঠালে একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ইলচি আর বিশ্বাসী হেকিম হলেও ব্রাউটনের পক্ষে এখন বাদশার মবারকে হাজির হওয়া সম্ভব নয়। যিনি পারেন —তিনিই গোসলখানায় ঢুকলেন।

গোসলখানায় ঢুকে শাহজাদা দারার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিছুক্ষণ তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। উজ্জ্বল আলো আর সুগন্ধী ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতর চোখ সয়ে এলে তিনি দেখতে পেলেন, সাদা ধবধবে মের্জাই গায়ে বাদশা উঁচুতে বসে আছেন। মের্জাইতে রেশম আর সোনার সুতোর চিকন কাজ সবচেয়ে আগে চোখে আসে। মাথায় সরতাজেও সোনার সুতোর কাজ। তার নিচে সারি দিয়ে হিরে বসানো। একদম মাঝখানে বড় একটি পোখরাজ। তা থেকে যেন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে সারা গোসলখানায়। গলায় মুক্তোর মালা।

এবার সেই দুই বিখ্যাত চোখের মুখোমুখি হলেন শাহজাদা। এ কি হিন্দুস্থানের বাদশার চোখ? যে দুই চোখে কোনও পলক পড়ে না? না, এ সেই দুই চোখ—যা বাদশাকে মুছে দিয়ে সেখানে একজন আব্বা হুজুরকে বসিয়ে দেয়? স্রেফ আব্বা হুজুর?

শাহজাদা দারাশুকো এবার দেখতে পেলেন—বাদশা একদম একা বসে আছেন! তাঁর সামনে সব কটি কুর্শিই খালি। দারা ওই দুই চোখে তাকিয়ে তখন তখনই নিজের কথাটি পাড়তে সাহস পেলেন না। তাঁর সামনে শূন্য গোসলখানায় উঁচু বেদীতে বসে আছেন শাহজাহান নন—যেন মুঘলশাহীর প্রাণপুরুষ খোদ তৈমুরই চুপ করে বসে। বসে বসে তিনি একমনে শাহজাদা দারাকে দেখে চলেছেন।

কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে দারা কুর্নিশ করলেন। হজরত! সারা জাহানাবাদে হাজার হাজার খড়ের চালের ঘর। রোদে এখন ভয়ংকর তেজ। এখন কি হাতিদের সামনে আগুন জ্বালার সময়? তিন তিনবার আগুন লেগে কয়েক হাজার খড়ের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে জাঁহাপনা—

বাদশা শাহজাহান কোনও কথা বললেন না।

তাতেই যেন নিজের কথাগুলো বড় দুর্বল শোনাল দারার নিজের কানে। সেজন্যে যুক্তিটা জোরালো করতে দারা ফের বললেন, এ গরমে আগুন লাগলে

ওরা জলও পাবে না কাছাকাছি। সেই যমুনা ভরসা। কিন্তু জল আনতে আনতে সব ছাই হয়ে যাবে। ছাই হবার পর নেভাবার মতো আগুনও থাকবে না আলমপনা। থাকবে কী করে? ওই চালাঘর ছাড়া ওদের তো আর কিছু নেই।

এবার চোখের পলক না ফেলে শাহজাহান বাদশা চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তার ফলে শাহজাদার শিরায় শিরায় যেন কী এক যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এ কী এক অসম্ভব অবস্থা। বাদশা বসে আছেন যেন বা কোনও পাথরের স্তূপ মাত্র। নিরেট। তাঁর সামনে কথা বলে পাথরে কোনও কিছু জানানো যাচ্ছে না। শরীরের সব শিরা টনটন করে উঠল দারার।

শেষ চেষ্টার মতো মরিয়া হয়ে দারা বলতে লাগলেন—বলা হয়—জলের অভাবে আকবর বাদশাকে একদিন তাঁর সাধের রাজধানী ফতেপুর সিক্রি ছাড়তে হয়েছিল। খোদা না করুন—একই সেই জলের অভাবে—আব্বা হুজুর—আপনাকে না একদিন এই জাহানাবাদ ছেড়ে চলে যেতে হয়। যেভাবে হাজার হাজার চালাঘর আগুন লেগে জলের অভাবে ছাই হয়ে যাচ্ছে—

খুব শান্ত গলায় পাথর কথা বলে উঠল, খোদার ইচ্ছায় জাহানাবাদে জলের অভাব হবে না শাহজাদা—। একটু থামলেন বাদশা। তারপর ফের বললেন, যমুনা থেকে খাল কেটে জল আসছে। সামনের বছরের ভেতর চালাঘরের বাসিন্দারাও আগুন লাগলে জল পাবে—

—যতদিন না পায়—ততদিন কি হাতিদের নিয়ে পটকাবাজি—আগুন নিয়ে খেলাধুলো বন্ধ করা যায় না হজরত? যে কোনও সময় গরম বাতাস আগুনের ফুলকি উড়িয়ে নিয়ে চালাঘরগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ওখানে ফৌজি সেপাই, গোলাম, কারিগরদের গেরস্থালি। আগুন লাগলে ওরা হাজারে হাজারে সর্বস্বান্ত হবে আলমপনা—

বাদশা শাহজাহান গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন, তাহলে কি শাহজাদা শাহী হাতিগুলোকে লড়াইয়ের তালিম না দিয়ে বসিয়ে রাখা হবে?

—লড়াই? বলেই দারা থেমে গেলেন। তিনি নিজেও তো হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে এই কথাই জানতে এসেছিলেন। আবার লড়াই কেন? কোথায়? হাতিদের যে কেন আগুন ধরিয়ে পটকা ফাটিয়ে সইয়ে নেওয়া হয়, আগুনের সঙ্গে আওয়াজের সঙ্গে—তা হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা—দোবারা কান্দাহার অভিযানের সিপাহসালার দারাশুকোর না জানার কথা নয়। তবু তিনি গোড়াতেই লড়াইয়ের কথাটা পাড়তে সাহস করেননি। খড়ের চালাঘরে আগুন লাগার বিপদের কথা তুলে লড়াইয়ের দিকেই আস্তে আস্তে তিনি এগোচ্ছিলেন।

বাদশা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, শাহজাদা দারা। শাহী থাকলেই যেমনই থাকে দুর্ভিক্ষ, অজন্মা—তেমনই থাকে লড়াই। শাহী মানেই দুনিয়ার গায়ে খানিকটা জমিন জুড়ে একটা দেশের—অনেক মানুষের মাথার ওপর শাসন। শাহী মানেই সেই দেশটার সীমানা—দুবলা হলে—কুঁচকে আসবে। আবার তাগদদার হলে সেই সীমানা সবদিকে সরে সরে—পিছু হটে দেশটাকে বড় করে দেবে। সে জন্যে চাই তৈমুরের মতো খোয়াব দেখার তাগদ। বাবরের মতো জান-

বাজি। আকবরের মতো ফৌজ ইসতেমাল করার মগজ।

ঠিক কী বলতে চান আব্বা হুজুর তা স্পষ্ট করে ধরতে পারছিলেন না দারা। তিনি তাকিয়ে আছেন দেখে শাহজাহান বাদশা খোলসা হবার জন্যে বললেন, দারা। আমার এই দু'হাতে আছে তৈমুরের মতো ছুটন্ত তুর্কি ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরার তালিম। আমার নিঃশ্বাসে—তোমরা আমার ছেলে—তোমাদের নিঃশ্বাসেও আছে বোখারার তাজা হাওয়া। হিন্দুকুশ পাহাড়ের গায়ে অক্ষু নদীর ঢেউ ছুটে এসে বসন্তে ফেলে যায় ঢেউয়ের ফেনা। সেই ফেনা শুকিয়ে ধুলো ধুলো হয়ে মিশে যায় বাতাসে। সেই বাতাসে ভাসে একজন চাঘতাই মুঘল ঘোড়সওয়ারের পরদাদা, দাদাসাহেব, আব্বা হুজুরের ঘেমে ওঠা ঘোড়ার পসিনার খুশবু। এর পরেও কি শাহজাদা আপনাকে বলতে হবে—কিসের লড়াই? কেন লড়াই? কোথায় লড়াই!

—জানি আব্বা হুজুর। আপনি তৈমুরের খোয়াবে বন্দ হয়ে আছেন।

—খোয়াব দারা? কে বলল খোয়াব? তুমি যেমন আমার শাহজাদা—জিন্দা, তাজা, খুবসুরত—ঠিক তেমনিই হিন্দুকুশ আর অক্ষু নদীর কোলে চাঘতাই বনভূমি আমার কাছে এই হিন্দুস্থানের জমিনের মতোই আস্ত—সাচ্চা। তৈমুর এক সন্ধ্যায় তাঁর ছয় নাতির বিয়ে দেন। তিনি ভেবেছিলেন—তাঁর নাতিরাই দুনিয়াটা ভাগ করে নিয়ে শাসন করবে। আমি কি সেই নাতিদের শরীরের খুন আমার শরীরে বয়ে চলিনি? আমিও চলেছি—তুমিও চলেছ দারা। আমাদের কাছে এটাই কি সবচেয়ে বড় কাজ নয়—?

—কী আব্বা হুজুর?

—আমার কবজি তোমার কবজি এসে শক্ত করে ধরুক। আমরা দুই মুঘল, চল একসঙ্গে যাই সেই বনভূমিতে। বলখ্, বদকশান হিন্দুস্থানের সামিল হোক।

শাহজাদা দারা একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। তাঁর সামনে বসে হিন্দুস্থানের বাদশা। মানুষটি একদম অসম্ভব। সব তাগদ এক করে তিনি কয়েক শতাব্দী আগেকার তৈমুর নামে প্রায় রূপকথার এক বিষম লড়াকুর খোয়াবকে হাতে-কলমে—খুন-পসিনায়—হাতির থেঁতলে দেওয়া তাগদে—ঘোড়ার ক্ষুরে ফের জাগিয়ে তুলতে চান। তাতে যদি দশ হাজার ঘোড়া তুষার ঝড়ে হারিয়ে যায় তো যাক। তাতে যদি হাজার হাজার বছরের নির্জন পাহাড়ী খাদ ছিটকে পড়া হাতির মরণ চিৎকারে ভরে ওঠে তো উঠুক। তাতে যদি আস্ত এক পদাতী বাহিনী উজবেক ঘোড়সওয়ারদের হাতের তলোয়ারের নিচে নিজেদের মুণ্ডুগুলো হারায় তো হারাক। কোনও আফসোস নেই তাতে। তার বদলে চাই বলখ্। বদকশান। বোখারা। সমরখন্দ।

শাহজাদা দারা বলেই ফেললেন, আব্বা হুজুর! হিন্দুস্থানে মুঘলশাহী আপনার হাতে পড়ে এখন নওজওয়ানি পেয়েছে। লালকিল্লা, তাজমহল, জামা মসজিদ যেমন গড়ে উঠেছে—উঠেছে—নয়া রাজধানী জাহানাবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—তেমনই হিন্দুস্থানের ভেতর লম্বা চল্লিশ সাল পরে এই প্রথম

গোলকুণ্ডা, বিজাপুরে এখন বাদশার মবারক মাথা নুইয়েছে। তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে এখন শান্তি। আপনার ফরমানে গোকুলে, বৃন্দাবনে, মথুরায় গোঁসাইদের খাজনা মকুব—ময়ূর শিকার বারণ। দর্শন, চিকিৎসায় তালিম নিতে সারা হিন্দুস্থানের মুসলমান ছেলেরা কাশীতে শাহী খরচায় পড়তে যাচ্ছে।

—কী বলতে চাও দারা?

—হজরত! আমি বলতে চাই—আপনাকে ঘিরে যে আমির-ওমরাহদের ভিড়—তারা আপনার মোসাহেব ছাড়া কিছুই নয়। এখন হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সুসময়। আর এখনই তারা আপনাকে উসকে দিয়ে সুদূর হিন্দুকুশে লড়াই করতে পাঠাচ্ছে। তারা জানে এখন শাহী খাজানাখানা সারা দেশে ভাল ফসলের দরুন—আদায় উসুল ভাল হওয়ায় আশরফিতে-মোহরে ভরভরাট। সেই খাজানাখানা ফুটো করে দিয়ে তারা চায় সুদূর হিন্দুকুশে বেফয়দা লড়াইয়ের জন্যে আশরফির বৃষ্টি হোক। তাহলে সেই বৃষ্টির সুযোগে ফৌজি রসদের ঠিকা জোগান মিলবে ওদের। কোঁচড় ভরে মোহর জুটবে। এই তো সবে পর পর দু'সন কান্দাহার গেল—আর কেন? আর কেন আব্বা হুজুর? আর কেন এই বেফয়দা লড়াই?

ফুঁসে উঠলেন শাহজাহান। বেফয়দা?

—বেফয়দাই তো আব্বা হুজুর। তার চেয়ে জাহানাবাদে খড়ের চালাঘর আগুনে হারিয়ে যারা সর্বস্বান্ত হল—

—সর্বস্বান্ত? কারা? ওই ফৌজি সেপাই—গোলামের দল? ওদের কবে কী ছিল দারা? ওদের তো কিছুই নেই। ফৌজে ভর্তি হলে তবে ওদের পেটে দানা পড়ে—চানা মেলে—ওরা তখন ঘি, চিনির মুখ দেখতে পায়। নয়তো ওদের তো কিছুই নেই।

—এই হিন্দুস্থানে কার কী আছে হজরত!

বাদশা কী বলতে গিয়ে অবাক হয়ে নিজের ছেলের মুখে তাকালেন। কিছু বলতে পারলেন না।

দারা বললেন, এই হিন্দুস্থানে একজন আমির মারা গেলেও তার বিষয়-সম্পত্তি বাদশার হাতে চলে আসে। এখানে কারও কিছু নেই। সবই বাদশার। তাহলে একজন সামান্য গোলাম বা সেপাইয়ের কী-ই বা থাকতে পারে আব্বা হুজুর?

শাহজাহান গম্ভীর হয়ে বললেন, জমি-জিরেত, হাভেলি, ধনদৌলত, খাজনা, হাতি ঘোড়া—কোনও কিছুরই পাকাপাকি মালিক কেউ হতে পারে না হিন্দুস্থানে। জিন্দা জীবনে কেউ এসব ভোগ করলেও মৃত্যুর পর তার সবকিছুর মালিকানা বাদশায় বর্তায়। মালফুজাত-ই-তৈমুরায় বলা আছে—তাই-ই খোদার বিধান।

—তার ফলটা কী হয়েছে তা কি একবার ভেবে দেখেছেন হজরত!

শাহজাহান আজ যেন তাঁর এত চেনাজানা নিজেরই বড় আওলাদকে ভাল করে চিনে উঠতে পারছেন না। এই ছেলেকে ঘিরে তাঁর বড় আশা। একদিন

মুঘল ধ্বজ ধরে দাঁড়াবে এই শাহজাদাই। আর সে আজ এমনই সব কথা বলছে—যার বাঁকে বাঁকে শুধুই অজানা সব ছবি চমক দিয়ে দেখা দিয়েই ফের মিলিয়ে যাচ্ছে।

শাহজাদা দারা বললেন, তুরস্ক, ইরান আর আমাদের হিন্দুস্থান—এই তিন দেশে বাদশারাই সারা দেশের সব ধনদৌলত, জমি-জিরেতের মালিক। ওসবে কারও মালিকানা এই তিন দেশের বাদশারা মানেন না। ফলে এই তিন দেশ ভেতরে ভেতরে একদম থেমে আছে। সাধারণ কারিগর, চাষী, ব্যাপারী, শিল্পী, গাইয়ে, কবি—সবাই থেমে আছে। কারও কোনও এগিয়ে যাওয়া নেই। চাষী ভাবছে আমি ফলিয়ে কী করব? কী লাভ আমার? বেশি ফললে আমি তো তার মালিক হব না। ব্যাপারীও তাই ভাবছে। তাই ভাবছে তাঁতি, চিত্রকর—সবাই। এই মারাত্মক ভুলের জন্যে হিন্দুস্থানকে একদিন আফসোস করতে হবে আব্বা হুজুর। সেদিন বোঝা যাবে কী বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। যে-দেশে সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয় না—খেটে আয় করাকে স্বীকার করা হয় না—সে-দেশের সামনে কোনও আশা নেই—জুলুমি, তানাশাহী, পতন আর চরম দুর্দশার দোজখে সে-দেশ ধ্বংস হবেই।

—চুপ করো দারা। চুপ করো।

দারা কিন্তু থামতে পারলেন না। তিনি বলেই চললেন, হিন্দুস্থানের আম-আতরাফ চাষী মানুষজনের মনে জিজ্ঞাসা একটাই—কেন আমি একজন জুলুম-বাজ জায়গিরদারের জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটব? খেটে লাভ কী? যে কোনও দিন আমার জমানো আশরফি, সমস্ত সম্পত্তি যদি খেয়ালখুশির বশে কেড়ে নেওয়া হতে পারে—তাহলে আমার খাটুনির দাম কী? জীবনের যেখানে দাম নেই কোনও—খাটুনির কোনও দাম নেই—সেখানে যেভাবে হোক জীবনের ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। ফসল ফলিয়ে—আশরফি জমিয়ে লাভ কী? এজন্যে গরিব চাষীদের ছেলেমেয়ে হওয়াও বন্ধ হয়ে এসেছে। একই জিজ্ঞাসা জায়গিরদার-জমিদারদের মনেও দানা পাকিয়ে উঠেছে। দেশের অবস্থা—জমিজমা চাষবাসের অবস্থা কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কী? এজন্যে খরচা করারও কোনও মানে হয় না। কেনই বা আমরা খরচা করব? আইন-ই-আকবরিতে চাষবাসের উন্নতির জন্যে শাহী খাজানাখানা থেকে খরচা করার বিধান লেখা থাকলেও তা তো করা হয় না! যে কোনও দিন বাদশার মর্জিমত আমাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হতে পারে—আমরা আবার আম-আতরাফ ইনসান হয়ে যেতে পারি। তাই যদি হয়—তাহলে আমাদের সুকাজের সুফল যে আমাদেরই বংশধররা উত্তরাধিকারী হয়ে ভোগ করবে—তার কোনও ঠিক নেই। তাই একদিনকা বাদশা হয়ে চাষীদের চুষে নিয়ে যতটা সম্ভব রোজগার করাই ভাল। তাতে যদি চাষী না খেয়ে মরে—ভিটেমাটি ছেড়ে পালায়—তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ আমরাই বা ক'দিন আছি। আজ আছি—কাল নেই। যে ক'দিন পারি লুটে নেব। যখন সব ছেড়ে চলে যাব—তখন সারা মাঠ পতিত হয়ে পড়ে থাকবে—আস্তে আস্তে জঙ্গলে ঢেকে যাবে। সারা হিন্দুস্থান জুড়ে

তাই হচ্ছে হজরত।

বাদশা শাহজাহান কোনও কথা বলতে পারলেন না। তিনি যে পাশ বদলে বসবেন—তাও তাঁর মনে এল না। তিনি সরাসরি শাহজাদা দারার চোখে চোখও রাখতে পারছিলেন না।

—এই পতনের চিহ্ন হিন্দুস্থানের সর্বত্র। বেশির ভাগ শহরে ঘরবাড়ির অবস্থা শোচনীয়। বহু শহর ছেড়ে মানুষ পালিয়ে গেছে আব্বা হুজুর। আমি কান্দাহার অভিযানে যাবার সময় পাঞ্জাবে এমন ভূতে পাওয়া শহর দেখেছি অন্তত তিনটি। বিদেশি ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি—একই দশা ইরান, মেসোপটেমিয়া, মিশর, তুরস্কেও। ওসব দেশেও বিষয়সম্পত্তি, ধনদৌলতের একমাত্র মালিক ওদের বাদশা। নীলনদের সম্বচ্ছরের বান আটকাবার ব্যাপারে কেউ মাথাই ঘামায়নি। ফলে ভাঁটি এলাকা ফি-সন বানে ভেসে যায়। বালিতে ঢেকে যায়। সোনার মিশরে তাই ফসল কমে এসেছে। দেশের এই দশায় কখনও ছবি হয়? গান হয়? যে যার মোহর মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত আব্বা হুজুর। আপনি জালসাজিস নিয়ে কিছুদিন হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে ঘুরে নিজের চোখে সব দেখুন। তাহলেই জানতে পারবেন।

—আমি হারুন-অল-রসিদ নই দারা।

—তাঁর চেয়ে কম বা কিসে? আপনি এত বড় হিন্দুস্থানের বাদশা। তুরস্কে শুনলাম—মাত্র পাঁচ ছ'হাজার সেপাইয়ের একটা বাহিনী গড়তে এখন প্রায় তিন মাস সময় লাগে। কারণ কী? সম্পত্তির অধিকার নেই মানুষের। দেশ ছেড়ে লোক পালিয়ে গেছে। বণিকরা বলছিল—শুধু খ্রিস্টান গোলাম বেচে আর তাদের বেগার খাটিয়ে তুরস্ক আর বেশিদিন টিকতে পারবে না। সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিলে জুলুমির পথ খুলে যায় আব্বা হুজুর। এভাবে বাদশার সর্বনাশের পথ খুলে যায়। জমিজিরেত একছন মানুষের আশা-ভরসা। তাই দেখে মানুষ কাজে নামে। মানুষ তার খাটুনির ফল ভোগ করবে নিজে—সেই ভোগের অধিকার দিয়ে যাবে তার ছেলেদের—এই হল মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় বলেই মানুষের হাতে দুনিয়ার রূপ বদলে যায়—সুন্দর হয়ে ওঠে দুনিয়া। আর সেই খড়ের সামান্য চালাঘরও যদি একজন ফৌজি সেপাইকে বারবার আগুনে হারাতে হয় তো সে সর্বস্বান্ত হয়ে আপনার খোয়াবের পেছনে কতটা লড়াই দিতে পারবে আব্বা হুজুর?

বাদশা শাহজাহানের বুক একদিকে তাঁর এই ছেলের জন্যে ফুলে উঠছিল গর্বে—আবার অন্যদিকে দারারই আঁকা সারা হিন্দুস্থানের ছবি তাঁকে ভেতরে ভেতরে টেনে ধরছিল। কতদিকে শাহজাদার নজর। কান্দাহার অভিযানে পাঠিয়ে একটা বড় লাভ হয়েছে—শাহজাদা হিন্দুস্থানকে চিনতে শিখেছে। আবার আরেকদিকে দারার এ কী বে-তৈমুরি জবান। যা এতক্ষণ শোনা গেল—তা যেন কোনও শাহজাদার কণ্ঠস্বরই নয়। যেন অন্য কেউ ভাবনা চিন্তার আকাশে কালো রং ঢেলে দিচ্ছিল এতক্ষণ।

শাহজাহান কিছুতেই দারার মুখে তাকালেন না। গোসলখানার দেওয়ালে

রঙিন নকশায় চোখ রাখলেন। রেখে বললেন, সিপাহ্-সালারকে নজর রাখতে হয় দারা।

শাহজাদা এতক্ষণ যেন ঘোরে ছিলেন। জীবনে কোনওদিন এতকথা একসঙ্গে তিনি বাদশার মবারকে কবুল করেননি। বুঝতেই পারলেন না—আব্বা হুজুর কোন কথা বলছেন। তিনি বাদশার মুখে তাকালেন। সে মুখ চিন্তিত। চোখে কোনও পলক পড়ল না বাদশার।

দারা জানতে চাইলেন, একথা কেন আব্বা হুজুর?

—লড়াইয়ে যেমন বারুদ শুকনো রাখা চাই—তেমনই চাই জংবাজ সেনাপতি-দের ফুর্তিতে—মেজাজে রাখা।

এবারও দারা ঠিক ধরতে পারলেন না।

বাদশা শাহজাহান অপলক চোখেই বলতে লাগলেন, মনে রাখবে—সারা হিন্দুস্থানে শুধু চিতোর, অম্বর আর যোধপুর—এই তিন সামন্ত রাজা এক রাতের ভেতর প্রত্যেকে বিশ হাজার করে ঘোড়সওয়ার দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন।

—তা তো পারেনই।

—আর কারও এ ক্ষমতা নেই। এ'রা তিনজন মুঘল শাহীর তাগদের ফোয়ারা। আবার এ'রাই যদি একজোট হন তো আকবরাবাদ—জাহানাবাদ টলমল করে উঠবে।

দারা কোনও কথা বলতে পারলেন না।

—সেই তিনজনের ভেতর মির্জা রাজা জয়সিংহকে তুমি বলেছ—আপনাকে দিল্লির গায়কদের মতো দেখাচ্ছে?

শাহজাদার মনে পড়ল, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন। কিন্তু মুখে বাদশার সামনে তাঁর কোনও কথা ফুটল না।

—মির্জা রাজার মতো মানী মানুষের মানে ঘা দিয়ে ভাল করোনি শাহজাদা।

॥ পঁচাত্তর ॥

এখন রমজানের মাঝামাঝি। কাল গেছে হিন্দুদের মদন পূর্ণিমা। যমুনার পাড় ধরে সংক্রান্তির স্নানের পর ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে পুরোহিতদের প্রণামীর সিধে দিয়ে স্নানার্থীরা চলে গেছে। পুরোহিতরাও উধাও। কিন্তু ভাঙা ঝুপড়ি-গুলো পড়ে আছে। সেইসব ঝুপড়ির আশপাশে বাজারের মুসলমান ছোটখাটো ব্যাপারীরা কাল সারাদিন রোজা রেখে সন্ধে সন্ধে ইফতার সেরেছে। সেইসব ইফতারে কাটা ফলের খোসা—রাতের নাস্তায় সরাই থেকে আনানো মাংসের ভাঙাখুরি চারদিক ছড়িয়ে। এই ব্যাপারীরাই কাছাকাছি দেহাত থেকে আনাজ-পত্তর এনে নয়া বাজারে বসে যায়। তাই জাহানাবাদ ছেড়ে ঘরে ফিরতে পারে না। এসবেরই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আলি মর্দানের কাটানো নয়া খাল। প্রমাণ সাইজের বারোজন মানুষ মাথায় মাথায় দাঁড়ালে তার সমান চওড়া এই খাল কেটে আনা হয়েছে তিন ক্রোশ দূর থেকে। চলে গেছে নয়া রাজধানী জাহানাবাদে লালকিল্লাকে

ঘিরে। একই হিসেবে পাঁচ মানুষ সমান গভীর। তাতে বাদশা শাহজাহানের খায়েশ মাফিক সেরা সেরা বহু মাছ ছেড়ে দেওয়ায় সে এক ছবি। চাঁদনি চকের দিক থেকে বাজার হাট সেরে আজকের ইফতারের আগে হাটুরে মানুষজন ঘুরে ঘুরে সে খাল দেখছিল। সারাদিন রোজা রেখে—নামাজ আদায় করে দুর্বল শরীরে হাঁটতে হাঁটতে এইসব দেহাতি মুসলমান নয়া খালে বড় বড় মাছের ঘাই—যমুনার দিককার লাল কিল্লার উঁচু দেওয়াল দেখে তো বোবা। কিল্লা কী বিরাট। না জানি বাদশার কত তাগদ—কত ধনদৌলত। না হলে এত মাছ কেউ খালে ছেড়ে রাখে—স্রেফ দেখার সুখের জন্যে—খান না—শিকার তো করেনই না বাদশা। ওদের ভিড়টা চাঁদনিচকের উলটোদিকে লালকিল্লার দিল্লি দরওয়াজা হয়ে লাহোরি দরওয়াজার দিকে এগিয়ে গেল।

এখন সূর্য ঢলেছে। তার লালচে আলো লালকিল্লার লাল পাথরে পড়ে সারা জাহানাবাদে কী এক গম্ভীর লালি ছড়িয়ে দিল। সারাদিনের চড়া রোদে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা ছিল। রোজার সময় সরাইখানাগুলো এই এখন বিকেলবেলার আগে আগুন ধরায় না। এবার সন্ধ্যা নামলে যমুনার পাড় ধরে ইফতারিদের খোশ-গল্পে, খানাপিনায় ভরভরাট হয়ে উঠবে।

জাহানাবাদে সারা দুপুরে এই ফাঁকা রাস্তাঘাটে শুধু এক জাতের প্রাণী বসে বসে শুধুই ধুঁকেছে। খদ্দেরের আশায়। কোনও গাছতলায়। কিংবা কোনও হাভেলির ছায়ায়। এরা হল গিয়ে হিন্দু গণতকার আর মুসলমান নজুমল। সামনে ছক ফেলে গম্ভীর মুখে বসে থাকা গণতকাররা মাঝে মধ্যে পাশে রাখা এক একখানা মোটা বই নাড়ে চাড়ে। নজুমলের দল তেমনই সামনে মেলে রেখেছে ইউনানি ছক। দুপক্ষেরই পাশে রাখা গ্রহনক্ষত্রের আঁকা ছবি। রাস্তার গায়ে শতরঞ্জে বসে এই ব্রজ্ঞজ্ঞানী, অদৃষ্টশাস্ত্রীরা সময়ে সময়ে হাতে কাঁটা-কম্পাস তুলে নিয়ে মাটিতে ঘোরায়। তাই দেখে হাটুরে মানুষজন ছুটে আসে। এক ঝলকে যে যার ভবিষ্যৎ দেখে নিতে চায়।

জাহানাবাদের রাস্তা বিকেল পড়তেই ভরে উঠছে। আপাদমস্তক সাদা ওড়নায় ঢেকে মেয়েরা বাজারে এসে নজুমলের সামনে হাত বের করে বসে। এক আওরতকে নজুমল কানে কানে তার সুসময়ের সঠিক শুরুটা বলে দিল।

ঠিক এই সময় দেখা গেল আগ্রার লালচকে বসে থাকা সেই ফিরিঙ্গি গণতকার কখন এসে জাহানাবাদের লাহোরি দরওয়াজার উলটোদিকে এক কম্পাস নিয়ে বসে গেছে। শোনা যায় লোকটা পর্তুগিজ। তার খদ্দেরও এদেশি মানুষজন নয়। ফৌজের বিদেশি গোলন্দাজ, দেওয়ানখানায় তদ্বির-তদারকে আসা ফ্রানসিসি, ওলন্দাজ ব্যাপারীর লোকজন, হিরেমুক্তোর দরিয়া-চষা কারোবারিরা এই ফিরিঙ্গির সামনে এসে হাত মেলে ধরে থাকে।

আগ্রার মতো জাহানাবাদে এখনও ফুলের তেমন জোগান গড়ে ওঠেনি। তবু দু'চারজন করে ফুলওয়ালি জামা মসজিদের দিক থেকে দিল্লি দরওয়াজা চলেছে। লালকিল্লার কাজে আসা রইস মানুষজন নাকি ঘোড়া পালকি থেকে ওই দরওয়াজাতেই নেমে থাকে। এক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার সমান তালে টগাবগ

শব্দ তুলে কিল্লা থেকে বেরিয়ে লাহোরের পথ ধরল। যমুনা থেকে ভরা জলের পিপে নিয়ে উটের দল এবার কিল্লায় ফিরবে। তাদের সার দিয়ে আসা চোখে পড়ে।

এমন সময় দেখা গেল কিল্লা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ইংলিশস্তানের ইলচি গেব্রিয়েল ব্রাউটন লাহোরি দরওয়াজার সামনে থেমে পড়েছেন। ওখানেই শাহী কারিগররা বসে। কাশ্মীরীরা কার্পেটের বনাতে ছুঁচ-সুতোর কাজ করছে মন দিয়ে। রুপো গালিয়ে ছোট হাপরে বাতাস টানা চলছে। রত্নাকর ক'জন বসে একটা চামড়ার কোমরবন্ধে কিছুতেই গুটি তিনেক সস্তার মুক্তো বসাতে পারছে না। বসাবার ঘর হয় ছোট হচ্ছে। নয় বড় হয়ে যাচ্ছে ফের। বারে বারে তাই নিচে চামড়ার তলানি পটি নিতে হচ্ছে।

ব্রাউটন এগিয়ে গিয়ে আগ্রা-দিল্লির বাজারি ভাষায় জানতে চাইলেন, ছোটমোটো একজোড়া পাঁয়জোর হবে ?

ভাষাটা উর্দু। বাজারে চলে। রাজধানীর বাইরে দেহাতের মান্ডি বা খেয়াঘাটে চলে। কিন্তু কিল্লা বা রইসি মিলাদে অচল। অথচ ব্রাউটন লক্ষ করেছেন, দরবারের আমির থেকে শুরু করে হারেমের তাহা তাহা জেনানা এই বাজারি ভাষাটা দিব্যি বোঝেন। অনেক ভেবে তার একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন ব্রাউটন। তিনি ভাষার কারবারি নন। শাহী মাদ্রাসা বা মক্তবে তিনি পড়াতেও বসছেন না। শাহী হিসেবে তিনি ইংলিশস্তানের ইলচি—কিন্তু কাজেকর্মে হয়ে দাঁড়িয়েছেন আগ্রা-জাহানাবাদের ওপর মহলে জোর পসারের হেকিম। তাঁর মনে হচ্ছে, কাওয়ালী গানে, দেহাতি লচকদার গানে এই নয়া ভাষাটা ঢুকে পড়ে সবার মন কেড়ে নিচ্ছে।

রত্নকারদের ভেতর বড়জন ব্রাউটনকে ভাল করেই জানে। সে বসবার জন্যে কুর্সি এগিয়ে দিয়ে তসলিম জানাল। জানিয়ে দেখল, রমজান মাসের এই চড়া রোদে ব্রাউটন রীতিমত ঘামছেন। ভিনদেশী নীল কুর্তাকামিজে গোরাপানা সাহেব রীতিমত হাঁসফাঁসও করছেন। সোনালি চুল যাতে মুখে না এসে পড়ে সেজন্যে লালচে মসলিনের পট্টি কপালে শক্ত করে বেঁধেছেন। মাথার চুলের তুলনায় দাড়ি কম সোনালি। বলা যায় খয়েরি মতো। বয়স যদি পঞ্চাশ পেরিয়েও থাকে শরীরখানি চল্লিশের—তাগড়া, গোরু শুয়োর—কোনও গোস্তেই খাওয়া দাওয়া বাছবিচার নেই। রত্নকার এও জানে—দূরদেশ থেকে এসব মানুষ হিন্দুস্থানে এসে কসবি নিয়ে থাকে—তার জন্যে গয়না গড়ায়, নাকছাবি, পাঁয়জোরের বরাত দিয়ে থাকে।

রত্নকার গম্ভীর মুখে জানতে চাইল, পায়ের মাপ এনেছেন কি ?—বলেও মনে মনে রত্নাকর হাসতে লাগল। পাঁয়জোরে পায়ের মাপ দরকার হয় না।

ভড়কে গিয়ে ব্রাউটন বললেন, তা তো আনা হয়নি।

—আমার কাছে ভাল একজোড়া পাঁয়জোর আছে। মুক্তোর দানা বসানো। দেওয়ানখানার এক আমির বরাত দিয়েও নিতে পারছেন না। আপনি নিয়ে যান।

দেখুন হয় কিনা। হলে পর সস্তায় করে দেব।

—কত পড়বে?

—দু'পায়ে মোট আশি দানা মুক্তো মটর আছে। আপনার জন্যে আশি আশরফিতেই দিয়ে দেব।

গুণে গুণে আশিটি আশরফি রত্নকারকে দিয়ে ব্রাউটন পায়জোড় জোড়া খুব সাবধানে ওপরের জামা তুলে নীচের সুতির ঝোলায় রাখলেন। তারপর জাহানাবাদের বড় সড়কে বিকেলের নরম আলোয় ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন। এত বছর হিন্দুস্থানকে দেখেছেন তিনি। তবু দেখার শখ তাঁর মেটে না। হিন্দুস্থানে বাজার মানেই আস্ত হিন্দুস্থান। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়েই আগ্রার সেই ফিরিঙ্গি গণৎকারে তাঁর চোখ আটকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে উবু হয়ে বসে পড়লেন ব্রাউটন। প্রায় ভুলে যাওয়া ইংরেজিতেই তাকে বললেন, আজ কোনও মক্কেল জোটেনি?

বহুদিনের পুরনো একটা নাবিকের কম্পাস মোটে সম্বল। সেটা নেড়ে গণৎকার তাঁর কথায় কোনওই গুরুত্ব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, কী জানতে চাও?

ইংরেজি হলেও তাতে টানটোন শুনে ব্রাউটন বললেন, পর্তুগীজ নিশ্চয়।

গণৎকার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, আগে এক আশরফি ফেল।

ব্রাইটন তা দিতেই গণৎকার পুরনো দু'একখানি পর্তুগিজ ভাষায় প্রার্থনা বই মেলে ধরল। তার ভেতরের ছবি দেখিয়ে বলল, এগুলো হল গ্রহনক্ষত্রের পর্তুগিজ ছবি।

ব্রাউটন হেসে ফেললেন, ওগুলো আমি চিনি। এভাবে লোক ঠকাচ্ছ কেন?

গণৎকার নির্বিকার গলায় বলল, যে দেশের যা আচার। তাই মেনে চলাই তো উচিত। এবার বলো কী জানতে চাও?

ব্রাউটন উঠতে পারলেন না। কিন্তু যা জানতে চান—তাও বলতে পারছেন না। তাঁকে বিড় বিড় করতে দেখে গণৎকার হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, ওঃ! এই কথা। তা তোমার কপাল দেখেই বলে দিচ্ছি। জুটবে। খুব শিগগিরি তোমার একখানি সুন্দরী বউ জুটবে'

গেব্রিয়েল ব্রাউটন একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ফের জাহানাবাদের সন্ধ্যার ভিড়ে মিশে গেলেন। গলায় গুনগুন করে গানও এসে গেল। সন্ধ্যার জাহানাবাদ—ঠিক আগ্রার মতোই সারা এশিয়া হয়ে উঠছে—তুর্কি ঘোড়া সুপারির হাত ধরে আফগান ফৌজ রিসালাদার চলেছে। হয়তো ভাঙ মেশানো ঠান্ডা মালাই খেয়ে গান শুনতে বসবে। তাতারনী তার পোষা ময়নার জন্যে কাগনীদানার পুঁটুলি ময়নার ঠোঁটের সামনে নাচাতে নাচাতে হাঁটছে। ইলাহাবাদি কায়েত জনা ছয়—ভাই হবে ওরা—মাথা মুড়িয়ে সাদা কাপড়ে যমুনার দিক থেকে দোকান পসারের আলোয় এসে ভেসে উঠল এইমাত্র। মা বাবার কেউ একজন মারা গেছে। সব দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে—এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ব্রাউটনের মনে হল, গণৎকার আমায় রত্নকারের ঘর থেকে বেরতে দেখেনি তো? ব্যাটা এক নম্বরের ঠগ!

দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন ব্রাউটন। কিন্তু আর দাঁড়াতে পারলেন না। ঘোড়সওয়ার চারজন আগাম রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে এগোচ্ছে। পেছনে নিশ্চয় অতি মানী কেউ আসছেন। তিনি শুনেছেন, বাদশার ডাক পেয়ে বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা রাজধানী এসেছেন। দেওয়ানখানায় গুঞ্জন, বাদশা চন—ঢাকায় শাহজাদার অনেকদিন হল—এবার তাঁকে কান্দাহার—নয়তো বলখ্‌-এ যেতে হবে। ফৌজের সিপাহ-সালার হয়ে।

ব্রাউটন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিকেলের আলোর সঙ্গে দোকানপাটের আলো এসে মিশেছে। যা ভেবেছিলেন তাই। আজ যা ভাবছেন তাই মিলে যাচ্ছে। দিনটাই বড় সুন্দর! শাহজাদা সুজাঙ্গীরের শিবিকা চলেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে ব্রাউটন দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজের অজান্তে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, খয়রুন্নেসা। খয়রুন্নেসা। —কী খেয়াল হতে প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, ড্যাম ইট!

ঠিক তখনই আগুপিছু ঘোড়সওয়ারদের সমান তালে কুচের মাঝখানে এক ভীষণ উঁচু বেহদর হাতির পিঠে গাদেলায় বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজাঙ্গীর দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুঘল শাহীর সব তাগদ, লাবণ্য, তেজ, মহিমা যেন একটি মানুষের মুখে একসঙ্গে এইমাত্র ফুটে উঠল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে দেখতে ব্রাউটনের তাই মনে হল। তিনি নিজের মনের কাছেই মনে মনে বলতে লাগলেন, হিন্দুস্থান কী আশ্চর্য দেশ। এখানে সূর্যের এত আলো। এখানে যে বাদশা শাসন করেন—তাঁর এতবড় ফৌজ। সেই ফৌজ অভিযানে গেলে বাদশার এক এক শাহজাদা এক এক সময় সেই অভিযানের সিপাহ-সালার হন। ঠিক যেন রূপকথার বাদশা। এক একজন শাহজাদা এক এক রকম। এশিয়ায় এমন দেশ আর দুটি নেই। এত রং। এত তেজ।

শাহজাদা সুজা ভাইদের ভেতর সবচেয়ে আগে মনসব পান। সেও দশ এগারো বছর হয়ে গেল। রাজধানী থেকে এত দূরে বাংলার সুবেদারিতে গিয়ে শাহজাদা সেখানকার জল ছলছল নদী, গাছপালার ছায়াঘন পথঘাটে এতই মিলেমিশে গেছেন যে—এখন জাহানাবাদের এই গরম, বুক খালি যমুনা তাঁর কেমন পচা লাগে। সেখানে ঢাকা—রাজমহল করে নিজেই যেন স্বাধীন বাদশা হয়ে উঠেছেন একজন। বাংলাদেশে এত পাথর নেই। এত গরম নেই। নেই এত ঠাটঠমক—কথায় কথায় ঘোড়সওয়ার কিংবা হাতির মিছিল। কামানের গাড়ির ঘড়ঘড়ানি। পদাতীদের কুচ।

বাদশা হুমায়ুনের মকবারার কাছাকাছি সবে গড়ে তোলা নয়া রাজধানী—এই জাহানাবাদের সঙ্গে তিনি যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। এখানে আমির ওমরাহের ছড়াছড়ি। লালকিল্লা মানে লাল পাথর আর বেলে পাথরের বিশাল—বিরাট এক গেঁথে তোলা। সেইসঙ্গে আছে নানারকমের কার্নিকে কাজ, নীলা গুঁড়িয়ে রঙের পলেস্তারা, রং তামাশা। আব্বা হুজুরের খোয়াব। প্রায় দশ বছর হতে চলল লাল কিল্লা তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই। এখনও কিল্লার এক একদিকে কাজ চলেছে। দিনের বেলা যমুনার গা ধরে কারিগররা বসে বসে পাথর মাজে, কাটে, নকশা মাফিক রংও লাগায়।

শাহজাদা সুজা জাহানাবাদে এসেছেন—এটাই এখন রাজধানীর বড় খবর। সুপুরুষ, সাহসী, শাহী গরিমা মাখানো তাঁর মুখখানি আম আতরাফ মানুষজনের মনে খুব ধরেছে। যমুনার ওপারের দেহাতি ঘরগেরস্থালিতে কুমারী মেয়েরা সুজার মতো পুরুষকে স্বপ্নে দেখে—যেন সে জীবনে এমন খসম পায়। বউ বিবি যাদের পেটে বাচ্চা এসেছে—তারা অলস বিকেলে ইফতারির কল বেরুনো ভিজে ছোলা আর আদা কুচি গোছাতে গোছাতে ভাবে—ছেলে হলে তার মুখখানি যেন শাহজাদা সুজার মতো হয়। তারা ভাবে—বাদশা শাহজাহান কত পুণ্য করে এসেছিলেন। নয়তো বাপের পাশে দাঁড়ানোর এমন সুন্দর চার চারটে শাহজাদা হয় কারও?

নহবতখানা থেকে সানাইয়ের সঙ্গে ঢোল, মন্দিরা বেজে উঠল। গম্ভীর, সুন্দর সুর। সেই সুরে শাহজাদার শিবিকা যেন জড়িয়ে গেল। সুজা গান, কবিতা, সুরের রীতিমত কদরদার। তিনি আর না এগিয়ে দিল্লি দরওয়াজার সামনেই হাতি থেকে নেমে পড়লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে সুজা মাথা উঁচু করে দেখলেন—লালকিল্লার সামনের দিকের বেলে পাথরের ঝুলবারান্দা, খোলা অলিন্দ, ঝরোকা—সবই সন্ধ্যার আলোয় যেন ঝিলিক দিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখতে দেখতে শাহজাদা বুঝলেন—ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—কিল্লার মূল বনেদ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে থাকা সব জায়গাতেই ইরানি পালিশ টালি বসানো হয়েছে। সামান্য আলো পেলেই এইসব টালির পালিশ গা জ্বল জ্বল করে ওঠে। শাহজাদা দেখছিলেন আর একটু একটু হাঁটছিলেন। আসলে পাথরের এই বিশাল কিল্লা তৈরির প্রায় আগাগোড়া সময়টাই তিনি ঢাকা-রাজমহল সুবেদারিতে ডুবে রয়েছেন। তাই তাঁর তেমন করে লালকিল্লা দেখা হয়নি। কী বিরাট। যেন বা আসমান ধরে ওপরে উঠে যেতে চাইছে। এত উঁচু।

সুজা দেখছেন লালকিল্লা। আর সুজাকে দেখছে সন্ধ্যার জাহানাবাদ। ঘোড়-সওয়ার, হাতি, সুখদোলা সমেত শাহজাদার শিবিকা আগাগোড়া থমকে থেমে আছে। সেই শিবিকা থেকে সরে গিয়ে অমন সম্ভ্রম জাগানো নওজওয়ান শাহজাদার কিল্লার দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে ঘোরাফেরা মানুষজনের তো চোখে পড়বেই।

সুজা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন—এত পাথর? পাথরের পর পাথর। শুধু হিন্দুস্থানের পাথরে হয়নি। ইরান, তুর্কিস্থানের তো আছেই—আছে কাছে পিঠের খাইবার, খোরাসান, স্কার্দু, চিত্রল, গিলগিটেরও। কী পরিমাণ গো-গাড়ি, উট, হাতি লাগাতে হয়েছে এইসব পাথর টেনে আনতে। তারপর সেগুলো মাপসই করে ঘষেমেজে কত ওপরে তুলতে হয়েছে।

ঠিক এইসময় বড় একখানা পাথর উল্কাপাতের মতোই শাহজাদার গা ঘেঁষে বিষম আওয়াজ করে পড়ল। ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকালেও বাইরে তা কিছু বুঝতে দিলেন না সুজা। তিনি একজন শাহজাদা। তিনি একজন সুবেদার। কিন্তু ঘোড়সওয়ারদের সামনের সারির দুজন ঘোড়া থেকে নেমেই ছুটে এল। এসেই তারা ওপরে তাকাল।

লালকিল্লায় শাহজাহান বাদশার রঙমহল তৈরির শেষ কাজটুকু চলছে।

অনেক উঁচুতে ভারায় বসে যারা কাজ করছিল—তারা জলতরঙ্গের মতোই কাজের কাঁচা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

ঘোড়সওয়াররা ওদের গেঁথে ফেলবে বলে বর্শা তুলতেই সুজা বাঁ হাত তুলে থামালেন। সিঁড়ি ধরে তিনজন নেমে এসেছে। তার ভেতর একজন বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে। দাড়ি আগাগোড়া মেহেন্দিতে রাঙানো। গায়ে ইরানি গলতা। তিনি ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলেন। চিনতে পেরেছেন তিনি। কী সর্বনাশ হয়ে যেত যদি পাথরখানা শাহজাদার মাথায় পড়ত।

—এবারের মতো মাফ করে দিন আমাদের। খোদার শও সুকর! আপনার গায়ে লাগেনি শাহজাদা।

সুজা ওসব কথার ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, এত পাথর?

গলতার বাঁ দিককার পাড় কিল্লার চাতালে লোটাচ্ছিল। সেটা গুটিয়ে ডান হাতের ওপর তুলে নিয়ে আবদুল হামিদ বললেন, জাহানাবাদের হাওয়া বাতাসে পাথর বৈ অন্য কিছু—

মাঝখানে থামিয়ে দিলেন সুজা। তাহলে শেরশার মকবরা, তুঘলকাবাদের মিনার সব আছে কী করে? সেসব জায়গায় তো দিশি ইটের ছড়াছড়ি।

—আমি সামান্য আবদুল হামিদ।

সুজা সম্ভ্রম দেখিয়ে বললেন, ও! আপনিই আবদুল হামিদ।

—হ্যাঁ। বাদশার হুকুমে রঙমহলের শেষের কাজটুকু তুলে দেওয়াই বাকি।

—জানি। আপনার কথা জানি। ঢাকায় বসে শুনেছি আপনার কথা। আপনি নকশা দেখে হাতে কলমে কাজ তুলে দেবার ওস্তাদ।

—আমি কিছুই নই শাহজাদা। ইজ্জৎ খানের হাতে লালকিল্লার কাজ শুরু হয়েছিল। ইজ্জৎ খান চলে গেলেন। এলেন আলিবর্দি খান। তাঁর জায়গা নিলেন মরকামত খান। আমি মরকামত খানের মুরিদ বলতে পারেন।

সুজা বললেন, হিন্দুস্থানের ইটের চল তো আজকের নয়।

—সেকথা ঠিকই বলেছেন হজরত।

—আমি ইটের কথা অন্য কারণেই বলব। দূরে থেকে পাথরের চাঙ বয়ে আনা এক ঝক্কি। সে পাথর দরকার মতো মেজে ঘষে নেওয়াও তো কঠিন কাজ। তারপর অমন ভাবি জিনিস অত উঁচুতে ঠেলে তোলা কি সহজ?

ওস্তাদ আবদুল হামিদ শুনছিলেন আর শাহজাদার যুক্তি সাজানোর ভঙ্গিতে অবাক হচ্ছিলেন। পাথর আনা, ঘষামাজা, ওপরে তোলা—তিনটিই বড় বড় তিন ঝামেলা। তার চেয়ে ইট অনেক সহজ। টেনে আনার বালাই নেই। জায়গার কাছাকাছি অন্য জায়গায় ভাল করে পুড়িয়ে নেওয়া যায়। একই আকারের বহু ইট দিয়ে পছন্দসই একটা জায়গা ভাগে ভাগে গেঁথে নেওয়া যায়। শুধু সীমানার ইটগুলো কর্নিক দিয়ে দরকারি আদলে আনতে হয়। ছোট্ট জিনিস বলে ওপরে তোলাও খুব সহজ।

—আপনার তো সবদিকেই পাকা জহুরির নজর আছে—হজরত।

আবদুল হামিদের মিষ্টি কথা একদম আমলে না এনে শাহজাদা সুজা রীতিমত ওস্তাদি ঢঙে বললেন, অনেক—অনেক পাথর বাঁচানো যেত।

—কী রকম ?

—আমি বাংলা ঢঙের কথা বলছিলাম।—বলতে বলতে সুজা যেন নিজের শাহীর কথা বলছেন—এমন উদাত্ত গলায় বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, পাথর দেবেন। নিশ্চয় দেবেন। বনেদ হবে পাথরের। কিন্তু তারপর শুধু শুধু পাথরের পর পাথর তুলে ভারি—জবরজং করে কী লাভ বলুন।

আবদুল হামিদ যতই নওজওয়ান শাহজাদার মুখের কথা শুনছিলেন—ততই তাঁর কান বেশি করে খাড়া হয়ে উঠছিল। বাদশা শাহজাহানকে ঘিরে যেমন গাইয়েরা আছেন বছরের পর বছর—আছেন কবি, ফিরঙ্গি গোলন্দাজদেয় দল—তেমনই আছেন কিল্লা, সুড়ঙ্গ, মসজিদ, মকবরা বানিয়ে ওস্তাদের দল। সেই কেতায় পড়েন বলে আবদুল হামিদ আজ প্রায় পনেরো বছর স্মারণা ছেড়ে আগ্রা-দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। তিনি একই সঙ্গে নানা কারণে অবাক হয়ে উঠছেন।

হিন্দুস্থানের মসনদের কাছাকাছি আমির, ওমরাহ, মনসবদাররা মিঠে কথার বশ। বাদশা শাহজাদারা তো এই অস্ত্রে কুপোকাৎ। কিন্তু এ কেমন শাহজাদা ? আচমকা ওপর থেকে ভারি পাথর পড়লে চমকান না। তা নিয়ে অনর্থও করেন না। আবার মিঠে কথার চামর বুলিয়ে দিলেও সেদিকে মন দেন না। তারপর এখন রীতিমত পাকা ওস্তাদের মতোই কিল্লা, মকবরার পাথর আর ইট নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। কথাগুলো একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।

শাহজাদা বলতে দারার মুখোমুখি হয়েছেন আবদুল হামিদ। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা এসব ব্যাপারে মাথাই ঘামান না। তিসরি শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে দেখেছেন তিনি। সেই শাহজাদা হাসেন না। রাগেন না। শুধু তাকিয়ে থাকেন। আর আখেরি শাহজাদা মুরাদ তাকাবেন কী ? সবসময় তাঁর চোখ লাল হয়ে আছে। বুজে আসছে সে-চোখ।

দুসরি শাহজাদা সুজা যে এমন মানুষ তা জানতেন না আবদুল হামিদ।

সুজা তখন নিজের থেকেই বলে চলেছেন। সুবে বাংলায় ভাল করে পোড়ানো ইটের গাঁথুনি ওঠে আগে। পরে সেই গাঁথুনির পিঠে কল্কা তোলা পোড়া টালি খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া হয়—

—তাতে কি টেকে ?

—খুব টেকে। এখানে যেমন চড়া রোদ সুবে বাংলায় তেমনই ভারি বর্ষা। সেজন্যে কী মকবরা—কী মসজিদ—সবারই ছাদ পেছন দিকে কিছু ঢালু। তাতে জল দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু বড় বড় মসজিদ—মকবরা—সবই সেই পোড়া ইটের ওপর কল্কা তোলা ছোট ছোট টালি বসিয়ে বানানো।

—ছোটখাটো ভূমিকম্পেই টালি খসে পড়বে হজরত।

—পড়েনি কিন্তু। প্রায় তিনশো বছর হতে চলল পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের। তেমন কিছু হয়নি তো আদিনার—। ছোট সোনা মসজিদও আগে যেমন ছিল—এখন তাই আছে।

আবদুল হামিদ কোনও কথা বলতে পারলেন না।

সুজা তখন বলে চলেছেন—সরকার যশোহর—মহাল বাগেরহাটে গিয়ে ষাট গম্বুজ দেখুন। দেখুন সেখানে খান-জাহান-আলির কবর। তা দুশো বছর হয়ে গেল। বাংলা কেতায় তৈরি। কিছুই হয়নি। পাথরের বালাই নেই সেখানে—

আরও কিছু যেন বলতেন শাহজাদা। আবদুল হামিদের দুপাশে দাঁড়ানো তাঁর দুই কারিগরের মুখ দেখে সুজা বুঝলেন, সারাদিন রোজা রেখে—নামাজ আদায় করে তারপরও রঙমহলে পাথরের কাজ করে খিদেয় ওরা ধুকছে। ইফতারির জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

শাহজাদা খুব অভিজাত ভঙ্গিতে সামান্য হেসে আর একটিও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর নামিয়ে আনা শুঁড়ে পা রেখে দিব্যি নিজের হাতির পিঠের গাদেলায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাস্তার ওপারে তখন দোকানি ব্যাপারি হাটুরে মানুষের ভিড় ভেঙে পড়েছে। শিবিকা ফের চলতে লাগল। আবদুল হামিদ কোনও কথা বলতে পারছেন না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। নয়া রাজধানী জাহানাবাদ তখন সন্ধেরাতের জ্বরে কাঁপছে।

লালকিল্লার পিলখানা কিন্তু সনাতন হাতির পছন্দ হয়নি। আগ্রায় মোরি দরওয়াজার কাছাকাছি হাতিদের থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। হাঁপিয়ে উঠলে সনাতন গিয়ে যমুনার পাড়ে বসত। এখানে যমুনার দিকটাই প্রায় দশমানুষ সমান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

জাহানাবাদের ঠিক বাইরে রাইসিনা পাহাড়ের পায়ের কাছে খোলা প্রান্তরে হাতিরা দিনের বেলা এসেছিল। বিশ বাইশটা হাতির এক দঙ্গল। ভৈ আর মেঠের দল প্রায় প্রাণান্ত হয়ে অনেক কষ্টে ওদের চান করিয়েছে। যমুনা থেকে টেনে আনা খালের জলে। এখন রাতের ফিকে জ্যোৎস্নায় খোলা প্রান্তরেই হাতিদের সামনে আখের গোছা ধরে দেওয়া হয়েছে। লালকিল্লায় পিলখানা ঠিক তেমন করে এখনও তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতির ঘরও। অবশ্য আগ্রা দুর্গে সনাতন বেশিরভাগ রাতই চাতালে পড়ে থাকে। ঠিক এখন যেভাবে সে হাতির গেহুর বস্তার গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপর আসমান। পায়ের নীচে রোদে পোড়া শুকনো শুকনো কিছু ঘাস মাত্র।

সনাতনের পায়ের কাছে অন্ধকারে বসে থাকা কে একজন উঠে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়েই সে বলল, তাহলে, তুমি শেখাবে না বল।

—আরে। উঠলে নাকি? —বলে সনাতন নিজেই সিধে হয়ে বসল।

—হ্যাঁ। শুধু শুধু বসে থেকে কী করব?—বলেই সে হন হন করে হাঁটা ধরল।

এবার সনাতন হাতি তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। সে শাহী ফিল-ই-বর্কাস—দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, ও বিষণ। বিষণ—যেও না। দাঁড়াও। একটা কথা শুনে যাও।

এবার বিষণ ফিরল। দেখা গেল সে বেশ তাগড়া। সনাতন হাতির কাছে

এসে বেশ তেড়িয়া গলায় বলল, কী বলবে বলো।

—শোনো বিষণ—মাথা গরম করে না। বোসো।

—এখন বসার সময় নেই।

—কেন ? শাহজাদী রৌশনআরা তো হামামে ঢুকেছেন। তাই তো বললে তুমি একটু আগে।

—ঠিকই বলেছি। যে কোনও সময় আমায় ডাকতে পারেন।

—এই যে বললে—অনেকক্ষণ ধরে শাহজাদী চান করেন।

—হ্যাঁ করেন। আবার চান করতে করতেও ডেকে পাঠাতে পারেন আমায়—

—চান করতে করতে ?

—হ্যাঁ। আবার আমায় একদম নাও ডাকতে পারেন। কী বলবে বলো এবারে—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—বলছিলাম—হাতির খেলা তুমি কেন শিখতে চাও ? এ বড় মারাত্মক খেলা বিষণ। খেলাতে গিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারো।

—সেজন্যেই তো শিখতে চাই ফিল-ই-বর্কাস। তুমি যখন এক দঙ্গল হাতি নিয়ে ভোর ভোর রাইসিনা পাহাড়ের এদিকটায় রওনা হও রোজ—কী শানদার লাগে তোমায়।

—দূর ! আমি তো একমাথা পাকা চুলের বুড়ো।

—তবু তোমায় সুন্দর দেখায়। বিশাল বিশাল হাতি তোমার কথায় হাঁটছে—বসছে—শুঁড় তুলে সালাম দিচ্ছে—আবার বাচ্চা খোকার মতোই চার পায়ে পিছু হটছে—টানাখালের জল ফোয়ারা করে নিজেদের গায়ে দিচ্ছে ওরা—আবার খেয়াল হল তো তোমায় ফোয়ারা করে চান করিয়ে দিচ্ছে।

—কোত্থেকে দেখলে এত সব ?

—কেন ? লালকিল্লার শাহজাদী মহল থেকে তো এদিককার সব দেখা যায়।

—আমি তো কিছুই দেখতে পাই না।

—তুমি দেখবে কী করে। আমরা তো অনেক উঁচু থেকে তোমায় দেখতে পাই। নাও এবার বলো—শেখাবে ? না শেখাবে না ?

—এ বড় বিষম খেলা বিষণ। হাতি সামনের দু'পা ভেঙে কখন সেলাম দেয় বাদশাকে জানো ?

—কখন ?

—হাতির পিঠে শুয়ে পড়ে মাথার কাছে চামড়ার পটিতে টান মারি। সেই পটির নীচে লোহার সলা বসানো আছে বিষণ। টানলেই সলা গিয়ে হাতির গায়ে ফোটে। অমনি ব্যথায় সে বসে পড়ে। সামনে দুই পা ভাজ করে। তখন শুঁড়ের নীচে লোহা বসানো ছিপটির ডগা ঠেসে ধরি। তাই সে শুঁড় তুলে ধরে ব্যথায়। এর ভেতর কোনও খেলা নেই বিষণ। যা আছে—তার নাম ব্যথা। শিখবে ?

বিষণ অন্ধকারের ভেতর ফিল-ই-বর্কাসির মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। সে আন্দাজে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

সনাতন বলল, শাহীর সব আনন্দ, খেলাধুলোর নীচেই আগাগোড়া ব্যথা

ছড়ানো রয়েছে। যেদিকে যাবে—সেদিকেই দেখবে এই ব্যথা দাঁড়িয়ে আছে।

আজ এই সন্ধে রাতে সনাতনের গলা বিষণের কিছু অন্যরকম লাগল। দূরে দূরে হাতিরা এক একজন এক একরকমের ঘন অন্ধকার হয়ে দাঁড়ান। শুঁড়ের হাতার ভেতর গোছা গোছা আখ। জঙ্গলের এত বড় জানোয়ার বন্দি হয়ে এখন কত ছোট এক ছবি মাত্র।

ফিল-ই-বর্কাস তখন বলে উঠল, গোসলখানায় সন্ধেবেলা বাদশা যখন বসেন —তখন ভেতরে গ্যাছো কখনও?

—আমি যাব কী করে! আমি যে শাহজাদী রৌশনআরার দিনরাতের গোলাম মাত্র।

—আমিও খুব একটা যাইনি। তবে দু'একবার হাতিদের শাহী ইয়াদদস্তের জন্যে বাদশার সামনে দিয়ে কয়েকটা হাতিকে নিয়ে যেতে হয়েছে। তারা সামনের দুই পা ভেঙে ব্যথায় বাদশাকে শুঁড় তুলে কুর্নিশ করেছে। কী দেখলাম জানো?

বিষণ মাথা নাড়ল।

—খাওয়া হবে না—অথচ তাগড়া দুটো ভেড়াকে ছাল ছাড়িয়ে বাদশার সামনে টাঙানো। সেই ভেড়ার লাশ তরোয়ালের এক কোপে দু'ভাগ করে কেটে বাদশার সামনে কেরদানি দেখাবে বলে হুমদো হুমদো ফৌজি আহেদি সব তরোয়াল হাতে নিয়ে তড়পাচ্ছে। আচ্ছা বল ত বিষণ—স্রেফ কেরদানি দেখানোর জন্যে ভেড়া দুটোর জান দিতে হল। এই বে-ইনসানি রোজ সন্ধেবেলা বাদশার সামনে গোসলখানায় হয়ে থাকে। এটা নাকি বাদশা শলাপরামর্শে বসার আগে রোজ দেখে থাকেন। যিনি দেখেন—আর যারা দেখায়—সবারই নাকি এটা খুব আজব খেলা। ভাবো তো ব্যাপারটা—

বিষণ ভাবতে পারছিল না। অন্ধকার প্রান্তরে বসে চোখের সামনে আলো ঝলমলে লালকিল্লা—মনে হল তার—অনেক ব্যথার ওপর পাষাণ হয়ে বসে থাকা অতিকায় কোনও স্তূপ। একদিনের জন্যেও তার মনে হয়নি—সে যে কথায় কথায় শাহজাদী রৌশনআরার হাতে কোড়ার ঘা খেয়ে থাকে—তাতে কোনও ব্যথা আছে। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে কোড়ার চামড়ার লেজটা পিঠে বা বুকে বসে গেলে রক্ত বেরয়—কিন্তু তাতে যে ব্যথা হয়—ব্যথা থাকে—তা একেবারের জন্যেও বিষণের মনে আসেনি।

আজ পুরো ছবিটা সে আরেকদিক থেকে দেখার চেষ্টা করে মনে মনে। যতবারই কোড়া মারার জন্যে রেগে ওঠা শাহজাদীর হাত ওঠে—ততবারই কোড়া ভুলে গিয়ে বিষণ শুধুই দেখতে পায় রৌশনআরার সুন্দর মুখ—রেগে ওঠা চোখ —তাও সুন্দর—তার চেয়েও সুন্দর বাহুমূল—বাহুমূলের আশপাশের ঢিলে মসলিনে ঢাকা রহস্যের আভাস। উঃ! মরদ হয়ে পয়দা হওয়া কী যন্ত্রণার। সুন্দর সুন্দর করেই গেলাম। ব্যথাকে ব্যথা লাগে না। রাগকে রাগ লাগে না। তাও সুন্দর মনে হয়। বিষণ বুঝল, ফিল-ই-বর্কাস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে নিজের অপমান—নিজের ব্যথাকেই খুঁজে পাবে না। তো অন্যের—

বিষণ বুক ঠুকে বলল, হাতির লড়াইয়ে আমি হাতি চালাতে চাই। গোলামির তো অনেকদিন হল। একদিন কি ইচ্ছে হয় না ফিল-ই-বকসি—আমিও একবার শানদার—রোশন হয়ে জ্বলে উঠি? অন্তত একবার?

যে-কথাটা বিষণ খোলসা করে বলতে পারল না—সে-কথাটা বিষণের নিজের মনের ভেতরেও খুব কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। এখনও ডাকলে—হুকুমের আঁকশিতে ধরা পড়লে বিদেশি ইলচিদের বাড়ির ঘরোয়া নাচের কায়দায় শাহজাদীর বুকে বুক লাগিয়ে কোমরে হাত রেখে ঘুরেফিরে সে নাচে—তাকে নাচতে হয় শাহজাদী রোশনআরার অন্দরমহলে—শাহজাদীরই কড়কানিতে, চাবুকে—রোশনআরার গা থেকে উঠে আসা আতরের খুসবুতে ভাসতে ভাসতে। নয়তো দিনরাতের হাজিরা হিসেবে তাকে পড়ে থাকতে হয়—রোশনআরার অন্দরমহলের দুয়ারে। ঘুমিয়ে পড়লে শাহজাদী কখনও কখনও তাকে পায়ের ডগার খোঁচায় জাগিয়ে দেন। তার সারাজীবনে একবার কি এই গোলাম জ্বলে উঠতে পারে না? তাতে যদি আলি মর্দানের আতসবাজির মতো চিরকালের জন্যে একটিবার জ্বলে উঠেই আসমান থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে হয় তো হোক।

বিষণ ফের বলে উঠল, দিল্লি দরওয়াজার সামনে বালি বিছানো খোলা চাতালে আমি সুরতসুন্দরের পিঠে থাকব। আর উলটোদিক থেকে শুঁড় তুলে সুধাকর ছুটে আসবে।

সনাতন বুঝতে পারে বিষণের খোয়াবের ছবিটা কতখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো। সুরতসুন্দরের পিঠে বিষণ। আর তফাতে অনেক উঁচুতে লালকিল্লার খোলা অলিন্দে শাহজাদী রোশনআরা দাঁড়িয়ে।

সনাতন মুখে বলল, সুরতসুন্দরের পিঠ থেকে সবাই ফেরে না বিষণ।

—দেখে নিও। আমি ঠিক ফিরব। ফিরব তো বটেই—ইনামও পাব।

—ইনাম বিষণ! সে তো একশো দাম বোঝাই একটা খেরিয়া থলে মাত্র। হাতি সামলাতে গিয়ে অনেক সময় মাহুতকে হাতির পায়ের নীচে জানদিতে হয়। আর বাঁচলে জোটে একশো দাম। জাহানাবাদের বাজারে একশো দামে কী পাওয়া যায়? একটা আস্ত দাগমুণ্ডী ভেড়াও একশো দামে জোটে না বিষণ। তার জন্যে এত আজিজ জানটা দিয়ে দেবে?

—আমি কি সারা জীবন মিট মিট করেই জ্বলব ফিল-ই-বকসি?

সনাতন খানিকক্ষণ কোনও কথা বলল না। রাজধানী জাহানাবাদের আওয়াজ, রোশনাইয়ের বাইরে রাইসিনার এই প্রান্তর। সারাদিন রোজা রাখার পর সাধারণ হাটুরে ব্যাপারি মানুষজন সামান্য কিছু খাবারদাবার নিয়ে এই প্রান্তরেও ছড়িয়ে পড়ছে। রোজা ভেঙে ওরা এখানে ইফতারি সারবে। অন্ধকার আসমান তারায় তারায় ছয়লাপ। কী এক পুরনো ব্যথা নীরেট পাথর হয়ে পা থেকে বুকে উঠে আসছে সনাতনের। তার সবটা তার নিজেরও স্পষ্ট মনে পড়ে না। ব্যথার বীজের জায়গা আজ এতদিন পরে ধোঁয়া ধোঁয়া—ভোরের কুয়াশায় ঢাকা।

সনাতন বলে উঠল, তাগড়া নওজওয়ান তুমি। ঘোড়া দাবড়াতে পার?

বিষণ হো হো করে হেসে উঠল। ফিল-ই-বকসি হয়ে একথা তুমি জানো না

—যে গোলামদের ঘোড়ায় উঠতে নেই।

—নেই তো কী? আগ্রা দুর্গে থাকতে দেখতাম শাহজাদী রৌশনআরার ঘোড়ার পাশে পাশে দৌড়চ্ছ।

—ওই দৌড়নোই সার। শাহজাদী ঘোড়ায় চড়া শিখছেন তখন। আমি স্রেফ পাশে পাশে ছুটতাম। পাছে শাহজাদী পড়ে গিয়ে ব্যথা পান—

ব্যথা কথাটায় সনাতন যেন জ্বলে উঠল। বলল, ওই ফাঁকে ঘোড়ায় রপ্ত হয়ে নিতে পারনি?

—সে সুযোগ কোথায়!

—বন্দুক চালাতে পার?

—না।

—লাঠি খেলা জান?

—না। কখন শিখব বলতে পার? আমি যে শাহজাদীর দিনরাতের হাজিরা।

—তাহলে তুমি জ্বলে উঠবে কী করে বিষণ?

—তুমি রাতে রাতে রাইসিনা পাহাড়ের এই কোলে আমায় হাতি চালানো শেখাতে পারতে ফিল-ই-বর্কাস। তাহলে আমি ঠিক একদিন জ্বলে উঠতাম। শান আর সৌকতে আমি আলোর ফুলকি তুলে হাতির লড়াইয়ে হাজির হতাম।

—ওকে জ্বলে ওঠা বলে না বিষণ। হাতির লড়াই তো বাদশার জন্যে সাজানো গোছানো লড়াই। তাতে কি জ্বলে ওঠা যায়?

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দু'জনই দু'জনের মনের আন্দাজ পাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে মনে মনে।

বিষণ ধরতেই পারছে না—কোন খেলায়—কোন লড়াইয়ে ঠিক ঠিক জ্বলে ওঠা যায়। খাঁটি মরদের মহিমায়।

সনাতন বলল, ইনসাফের জন্যেই জ্বলে ওঠা যায়। বিচারের জন্যে—ন্যায়ের জন্যে জ্বলে ওঠা যায়। চিতোরের কথা শোনোনি?

—তাতে কী? আমিও তো পড়তে জানি না বিষণ। কান খাড়া রাখো। চোখ খোলা রাখো। বুকে সাহস রাখো। কত কী শুনতে পাবে। কত কী দেখতে পাবে। মনে ফুর্তি রাখো। বুকে সাহস রাখো। তুমি এখন নওজওয়ান। চিতোরের রানা আকবর বাদশার কাছে হেরে গিয়ে বনে জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখান থেকে লড়াই দিতে থাকলেন। শোনোনি এসব কথা?

—না।—বলেও বিষণ বুঝতে পারছে না—কার বিরুদ্ধে সে লড়াই দেবে? কে তার দুশমন তা সে জানে না। যেমন সে জানে না—কে তার আসল দোস্ত। সে জানে—সে একজন গোলাম।

জাহানাবাদের চেয়ে আগ্রার সঙ্গে শাহী সড়কগুলোর যোগাযোগ অনেক বেশি—আর অনেক দিনেরও বটে। তুলে নিতে নিতেও আগ্রা থেকে দেওয়ানখানা এখনও সবটা জাহানাবাদে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিদেশি ব্যাপারিরা পুরনো অভ্যেস বশে এখনও সুরাটে জাহাজে নেমেই হাঁটা পথে কিংবা সুখদোলায় সিধে সাবেক রাজধানী আগ্রায় চলে আসে।

অনেকদিন ঢাকা-রাজমহল করে বাংলা-ওড়িশার সুবেদার শাহজাদা সুজা আগ্রায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। এখানে আগ্রা দুর্গে জাহানাবাদের লালকিল্লার মতো নানান দেশের পাথরের চকমকানি নেই। কোন সে ছোটবেলায় বাদশা জাহাঙ্গীরের পেয়ারের নাতি হিসেবে তিনি শাহী জাঁকজমকের সঙ্গী হয়ে এই আগ্রা দুর্গকে একটু একটু করে চিনেছেন। এখানকার হামামশাহী, জাহাঙ্গীরি মহল, মচ্ছিভবন সবই তাঁর চেনা।

এখন পড়ন্ত বিকেল। রমজানের মাসটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খাঁটি দেহাতি মুসলমানরা সারাদিনের কাজের পর যমুনা পেরিয়ে নিজের নিজের গাঁয়ে ফিরছে। হাতে সবারই ঝোলা। সন্ধে সন্ধে রোজা ভেঙে কিছু খাবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে—দেখলেই বোঝা যায়—দেহাতি নয়া মুসলমানরাও চলেছে। তারা আর ঝোলা নেয়নি। যে যা পেরেছে—কেনাকাটা করে হাতে ঝুলিয়ে ফিরছে।

আগ্রা দুর্গের ওপরে নক্করখানা থেকে এবার শানাই, ঢোল বেজে উঠবে। তার উলটোদিকে সামান বুরুজের সামনে দাঁড়িয়ে শাহজাদা সুজা একজন গোলামকে কবুতরখানার দরজা খুলতে হুকুম দিলেন। দিয়ে নিজেই শিস দিয়ে উঠলেন। পুরনো অভ্যেসে। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা তাঁর এই নাতিকে নিয়ে কবুতর ওড়াতেন। সুজার মনে পড়ল—বাছাই কবুতরদের আকাশে উড়িয়ে দিয়ে ফের কবুতরখানায় ফিরিয়ে আনার এই খেলাকে জাহাঙ্গীর বাদশা বলতেন—ইশক্-বাজি।

ইরানি কয়েকটা লড়াকু কবুতর যমুনার দিকে উড়িয়ে দিতে দিতে শাহজাদার মনে পড়ল—প্রায় শ'খানেক বছর আগে পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা এক রবিবার এই আগ্রায় পা দেন। তাঁরই হুকুমে লোদিদের পুরনো কেল্লা ভেঙে তার ওপর এই আগ্রা দুর্গের পত্তন হয়। তিনিই এই দুর্গে কবুতরখানা গড়ে তোলেন। দেশ বিদেশের বাছাই সব কবুতর দিয়ে।

কবুতরগুলো ইশক্-বাজির নেশায় আগ্রার আকাশে পাক খাচ্ছিল—আর মাঝেমধ্যে ছোঁ মেরে নীচে নামতেই সুবেদার শাহজাদা সুজা হাতের বেদানা ভেঙে দানা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

ঠিক এই সময়—বাদশা শাহজাহান শিশমহলে একা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে। শাহজাদী মহলের লাগোয়া এই শিশমহল আসলে বাদশার স্নানঘর। শাহজাদা গরমে কাবু হয়ে পড়লে এই শিশমহলে এসে ঢুকে পড়েন। আতরের খুসবুর

সঙ্গে পাথরের ফাঁপা দেওয়াল ফুঁড়ে ঠান্ডা জলের ধারা নেমে আসছে তো আসছেই। একটু আগে খাস তাতার বাঁদিরা গোলাপ জলে মুলতানী মাটি মিশিয়ে বাদশাকে ডলাই মলাই করে ফের আতর ছিটিয়ে তবে পোশাক এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। আগ্রার গরমে ঘামের হাত থেকে বাঁচতে এটাই রাস্তা।

এখন হিন্দুস্থানের বাদশা আরশিতে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন। নিজের দিকে তাকালেন শাহজাহান। প্রায় বিশ বছর হতে চলল তিনি বাদশা। তাঁর সামনে কোনও বাধা নেই। হিন্দুস্থান শান্ত। এক বাংলায় ছোট খাটো বাগিপনাহ্ বৈ সারা দেশে কোথাও কোনও বিদ্রোহ নেই। আল্লাতালা আমার কোনও খায়েশই অপূর্ণ রাখেননি। বাংলা সামলাতে সুজার মতো শাহজাদা পেয়েছি। ফুর্তিবাজ নওজওয়ান সুবেদার দুপুর থেকে এখন ইশক্-বাজিতে মেতে আছে। নসিব আমায় সব দিয়েছে। বাহাদুর সুবেদার আওরঙ্গজেব দক্ষিণে ডাকাতির হাত থেকে রাস্তাঘাট অনেক নিরাপদ করে তুলেছে। দক্ষিণে এখন মুঘল ধ্বজের নীচে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর। গুজরাতে জানবাজ সুবেদার মুরাদ বকস। আর ফৌজদার-ই-হিসার তো শাহজাদা দারা। দারার মতো শাহজাদা পাওয়া খোদার করুণা। নয়তো অমন ছেলে ক'জন পায়? ধার্মিক, পণ্ডিত, সরল—আবার কবিও বটে। সারা এশিয়ায় কোন শাহীতে কোন বাদশা আমার মতো নসিব নিয়ে এসেছেন? আরজুমন্দ এসবের কিছুই দেখে যেতে পারেনি। সে নেই। অথচ আমরা সবাই আছি। আছি কথাটা মনে আসতেই আরশির বাদশার আন্দাজ পেতে চাইলেন শাহজাহান। চওড়া কাঁধ। চোখে পলক-না-পড়া তাকানো। মাথার ওপর উষ্ণীষে সরবন্ধের মাঝখানে একখানি বৈদূর্য জ্বল জ্বল করছে। কোমরবন্ধে ঝোলানো খাপ থেকে একটানে তরোয়াল বের করে বাদশা যেন অদৃশ্য কোনও দুশমনকে এক কোপে দু'ভাগ করে ফেললেন। তারপর আয়নায় শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললেন, হজরত। আমি এখনও দিব্যি ঘোড়া দাবড়াতে পারি। আমিই আমার নসিবকে ফিরিয়ে এনেছি। নয়তো কবেই বিলোচপুরের প্রান্তরে এ-নসিব বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত। হিন্দুস্থান জানত—জাহাঙ্গীর বাদশার বাগি শাহজাদা খুর্রম মুখ থুবড়ে পড়েছেন। আর আজ? সামনে নেই কোনও সুলতান দাওয়ার বকস্। নেই কোনও শাহজাদা শারিয়ার। আমি নিশ্চিন্ত। আগ্রার গরম এই শিশমহলে ঢুকতে পারে না। এখানে আয়েস, আরামের সঙ্গে বাদশার চনমনে শরীর জ্বলজ্বল করছে। সারা দেশের ফসলের শাহী ভাগটা উসুল হয়ে নগদে খাজানা খানায় জমা পড়েছে। আমির ওমরাহদের দেওয়া ভেট, নজরের মণিমুক্তো জমা হতে হতে উপচে পড়ার দাখিল। যেটুকু কাঁটা হয়ে আছে কান্দাহার তা তুলে ফেলার মতো ফৌজ হিন্দুস্থানে আছে। শাহজাহান আরশির শাহজাহানের মুখে তাকিয়ে বুঝলেন, সেখানে উদ্বেগের লেশ মাত্র নেই। যা আছে স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে বলা যায় তৈমুরি খোয়াব। দু'হাতে অন্তহীন তাগদ। সামনে বিশাল দুনিয়া। শুধু ছিনিয়ে নেবার অপেক্ষা। হিন্দুকুশের কোলে—অক্ষু নদীর পাড় ধরে দাদাসাহেব—পরদাদাসাহেবের নওজওয়ানি দিলের দেশ। সমরখন্দ, বোখারা, খোস্ট—এসব কি

কোনওদিন হিন্দুস্থানের সামিল হবে না ? আল্লাতালা ! সবই তেরি রেজা !

শাহজাদা সুজা কি যাবে বলখ্‌-এ ? বদকশানে ? নওজয়ান শাহজাদার হাতে মুঘল ধ্বজ আমি নিজে তুলে দেব। সে ধ্বজ হিন্দুকুশের বাতাসে উড়বে।

শিশমহলে দুই শাহজাহান—বাদশা আর আরশির শাহজাহান আর কেউ নেই। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন। তাঁদের দু'জনের মাঝখানে লড়াই, অভিযানের খোয়াব ঘন হয়ে যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার মতো হয়ে উঠছে।

রানি হাভেলির যমুনার দিকে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। শাহজাদা দারাশুকো রানাদিলের এ-মূর্তি কখনও দেখেননি। সাধারণ এক ফেরতা করে পরা শাড়িতে নিতান্ত দেহাতি গেরস্থি আওরতের চেয়ে বেশি কিছু দেখাচ্ছে না রানাদিলকে। তবে চলাফেরায় সেই না-পরোয়া ভাবভঙ্গি একদম মুছে ফেলতে পারেনি রানাদিল। সে এগিয়ে এসে শাহজাদার বুকে হাত রেখে বলল, বাদশা যখন কবুলই করেছেন—তখন আমাদের বিয়েতে আটকাচ্ছে কোথায় ?

তখন তখনই কোনও জবাব দিতে পারলেন না দারা। একটু দম নিয়ে তিনি যমুনার ওপরকার অন্ধকার আকাশে তাকালেন। এখনও সময় হয়নি রানা—

রানাদিল ঝামর দিয়ে উঠল। এখনও হয়নি ? আমার কি তবে তোমার জন্যে ফি-সন্ধ্যেবেলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে কাটাতে হবে ?

—তা কেন ? জাহানাবাদে চলো। নয়া রাজধানী। এত গরমও নয় সেখানে।

—কেন ! ওখানে কি সূর্য ঘোমটা দিয়ে ওঠে ? তোমার নাদিরার মতো বোরখায় মুখ ঢেকে ?

দারা কিছুদিন ধরে লক্ষ করছেন, কথায় কথায় রানা নাদিরার কুচ্ছো না করে থাকতে পারছে না। অথচ তাকে নিয়ে এসব কথার কিছুই জানে না নাদিরা।

রানাদিল বলে উঠল, আমি তো তোমার পহেলা বেগম হচ্ছি না ! আমায় কেউ তোমার শাহজাদা-বেগমও বলবে না। তাহলে বিয়েতে অ্যাতো কিন্তু কিন্তু কেন শাহজাদা ?

—কোনও কিন্তু নয়, রানা। এই তো সবে কান্দাহার গেল।

—কান্দাহার করে তো পাক্কা তিনটি বছর কাটিয়ে দিলে শাহজাদা। জওয়ানি বড় মধুর। হেসে নাও দু'দিন বৈ তো নয়। সেই জওয়ানিই আসমানের তারা গুণে কেটে গেল।

—সামনে আবার লড়াই। আবার অভিযান— । এসব মিটলে তবে তো তোমায়—

শাহজাদার কুঁচকে যাওয়া কপালে তাকিয়ে রানার মুখ গম্ভীর হয়ে এল। সে জানতে চাইল, এবার কোথায় ?

—মুঘল শাহী দুনিয়ার যে কোনও জায়গায় লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে। এবার মনে হয় বলখ নয়তো বদকশানে !

—কেন ? কী আছে ওখানে ?

—কিছুই নেই রানা। কিছু পাহাড়—বনজঙ্গল আর কয়েকটা পাহাড়ি নদী। শীতে তুষার ঝড়।

—তাহলে ?

—বাদশার খেয়াল। বাদশার খোয়াব। আমরা মুঘলরা একসময় ওখান থেকে এসেছিলাম—তাই আব্বাহুজুর বিশাল এক খোয়াব দেখে চলেছেন। ও সব জায়গা হিন্দুস্হানের সামিল না হওয়া অব্দি তাঁর চোখে ঘুম নেই। মনে শান্তি নেই। হিন্দুস্হান সমরখন্দ অব্দি এগিয়ে না গেলে কী যেন বাকি থেকে যায় আব্বাহুজুরের কাছে।

—অমন শাহীর মুখে আমি ঝাড়ু মারি শাহজাদা। আজ আমি শাহজাদা দারাশুকোর মাসুকা। থাকি রানি হাভেলিতে। রমজানের এই আগুনে গরমে গলা শুকিয়ে এলে খাই ঠান্ডায় ভাসিয়ে রাখা টসটসে আঙুর। সবদিন তো আমার এভাবে কাটেনি শাহজাদা। আমি জানি হিন্দুস্হান কী চিজ।

—ওসব কথা থাক রানা।

—থাকবে কেন শাহজাদা ? গেঁহু, যব, বজরার গোলায় বস্তার পাশে পড়ে থাকতাম। বাবা কে ? মা কে ? জানিনা। আমি রাস্তার মেয়ে। ছোট মতো কাঠি কাঠি দেখতে একটা মানুষের বাচ্চা। রুটি কুড়িয়ে খাই। ছুড়ে দিলে লুফে নিই। লুফে নিয়ে গিলে ফেলি। গলা দিয়ে না নামলে কয়েক আঁজলা জল খাই।

—আঃ। চুপ করো রানা। আমি আর শুনতে পারছি না।

—শুনতে হবে তোমায় শাহজাদা। তুমি না বাদশার ছেলে ? বাদশা না তোমার আব্বাহুজুর ? এই আমাদের মতো হাভাতে—না খেতে পাওয়া মানুষ-জনকে রাস্তা থেকে পাকড়াও করে ফৌজি ঘোড়সওয়াররা কামানের গাড়িতে জুতে দেয়। ষাঁড়ের সঙ্গে আমরা কাঁধ দিয়ে ঠেলে ঠেলে কামান তুলি চড়াইয়ের মাথায়। সেখান থেকে উতরাই ভাঙি সাবধানে—ফৌজি কোড়া খেতে খেতে—পাছে কামান গড়িয়ে বেমক্কা পড়ে যায়। এরই নাম তো বাদশার লড়াইয়ে যাওয়া। তোমরা শিকারে গেলে আগ্রার লালচক থেকে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সঙ্গে। নারওয়ার জঙ্গলে আমরাই মশাল হাতে—ঢেঁড়া পিটিয়ে বুনো জানোয়ার তোমাদের নিশানার ভেতর তাড়িয়ে আনি। তখন তোমরা হাতির পিঠে উঁচু গাদেলায় বসে শিকারের বাহাদুরি দেখাও। তাই নয়কি শাহজাদা।

—চুপ করো রানা। চুপ করো। আমি আর শুনতে পারছি না।

—রাস্তার মিশকিন, ভবঘুরে, হাভাতে মুসাফির, খালি পেটের নাচনেওয়ালি, ফৌজি ফালতু খাটা কী জিনিস আমি জানি। আমি জানি—আমি জানি—আমাদের না হলে শাহী খোয়াব মেটে না। শাহী লড়াই জমে না।

—ওসব কথা রাখো রানা। আমার সঙ্গে চলো। নয়া রাজধানীতে যাবে না ?

—জাহানাবাদে গেছি শাহজাদা। আমার ভাল লাগে না। পাথরের পর পাথর। আসছে তো আসছেই। উটের পিঠে। গো-গাড়িতে। বছরের পর বছর।

—আব্বা হুজুর মিনার, কিল্লা, মসজিদ, সমাধির খোয়াব দেখে আসছেন

সারা জীবন। এর যেন শেষ নেই।

—রাগ করবে না শাহজাদা?

—না। রাগ করব না। তোমার স্পষ্ট কথা আমার বড় ভাল লাগে।

—তবে শোনো। তোমাদের এই শাহজাহানি পাথুরে খোয়াব—আমার বড় ভার লাগে। এত ভারি মনে হয়—যে জাহানাবাদে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

শাহজাদা এগিয়ে গিয়ে রানাদিলের মাথাটি নিজের বুকের ওপর রাখলেন। রেখে বুঝতে পারলেন—তিনি যখন রানাদিলের কাছে থাকেন—তখন পুরোপুরি রানাদিলের হয়ে যান। আবার যখন নাদিরার কাছে থাকেন—তখন পুরোপুরি নাদিরার হয়ে যান। তাহলে আমি আসলে কার? একজন ইনসান একইজনের? না, একজন ইনসান একই সংগে অনেকের? কোনটা সত্যি? এসব ভাবতে ভাবতেই দারাশুকো বললেন, জানি রানা। তুমি অনেক দূরে দেখতে পাও। আগ্রার পথেঘাটে বড়টি হয়েছ তুমি। তাই তুমি অনেক জিনিস পরিষ্কার দ্যাখো। আমি বলি কি—তুমি জাহানাবাদে চলো। সেখানে যমুনার গায়ে আমার নয়া হাভেলিতে থাকবে।

—এখানেও গরম। সেখানেও গরম শাহজাদা।

—সেখানে আমার নতুন নিগমবোধ মঞ্জিল একদম যমুনার পাড়ে। মাটির নীচে তিনখানি ঘরের তায়খানা তৈরি হয়েছে। একদম ঠান্ডা। গরম সেখানে ঢুকতে পারে না।

—আমি আগ্রা ছেড়ে কোথাও যাব না শাহজাদা। তুমি তোমার জাহানাবাদের তায়খানায় বসে ঠান্ডায় ঠান্ডায় ভগবানের কথা ভাব গিয়ে! রানাদিল তোমার সে ভাবনায় গিয়ে ভাগ বসাবে না।

—ও কী কথার শ্রী রানা? এটা রমজানের মাস। এটা শুদ্ধির মাস।

—তোমার শুদ্ধি—কোরবানি নিয়ে থাকো গে শাহজাদা। আমায় ছেড়ে দাও। আমি আবার আগেকার রানাদিল হয়ে যাই। তুমি তোমার রোজা, নামাজ, জাকাত, হজ নিয়ে খাঁটি মুসলমান হয়ে থাকো। আমায় ছেড়ে দাও শুধু।

—এসব তো খারাপ নয়। ভাল জিনিস। উপোস থাকা—আল্লাতালার নাম করা তো ভাল। দান করাও ভাল। তীর্থে যাওয়াও ভাল।

—তুমি মুসলমান। তুমি আরও ভাল মুসলমান হয়ে থাক শাহজাদা। আমি তো মুসলমান নই। আমায় ছেড়ে দাও।

—তুমি কী রানা? হিন্দু?

—তা তো জানি না। তবে আমি মানুষ—তাই জানি।

—আমিও তাই রানাদিল।—বলতে বলতে শাহজাদা দেখলেন অন্ধকার যমুনার পাড় ধরে ইফতারের ছোট ছোট জমায়েত বসছে। এরা রাজধানীর আশপাশের ব্যাপারিদের ভেতরকার নয়া মুসলমান। আজানে, নামাজে এখনও পুরোপুরি রপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সন্ধ্যার নামাজের সুরেলা টান এইমাত্র শেষ হল বোধহয়। রানাদিলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেয়াল রাখতে পারেননি

শাহজাদা। তিনি ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না—তিনি আগে মুসলমান? না আগে মানুষ?

তবু একবার তাঁর মনে হল—আজকের সন্ধ্যাটি খুব সম্ভব বৃথা যায়নি।

এমনই সন্ধ্যায় আগ্রা দুর্গের ঢালা পথের বাঁকে বাঁকে দাখিলারা এসে অভ্রের বাতিদানের আলো ধরিয়ে দিয়ে গেছে কখন। শাহজাদী জাহানারা নিয়মিত রোজা রাখেন। পাঁচ ওক্ত নামাজ আদায় করে থাকেন। আর ক'দিন পরেই ঈদ। শাহজাদী তাঁর অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে পাথরে পিছলে পড়া আলোর ভেতর এসে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখে শাহজাদীর দিনরাতের হাজিরা কোয়েল চোখ ফেরাতে পারছিল না। ক'দিনের টানা উপোসে জাহানারার শরীর থেকে বাড়তি মেদ উবে গেছে। অভ্রের শিখাটির পাশে দীর্ঘ একটি আলোকরেখা হয়ে জাহানারা যেন এইমাত্র জ্বলে উঠলেন। তাঁর মুখে—এলোচুলে পড়েছে পাথর-পেছলানো অভ্রের আলো। জাহানারা বেগম এখন বুঝি বা কোনও আঁকা ছবি।

হাজিরা কোয়েল বহুদিন হল শাহজাদী বেগমের খাস বাঁদি। সে আর থাকতে পারল না। ফস করে বলেই বসল, মুলুকে মালিকা—

এই হাজিরাকে খুব ভালবাসেন জাহানারা। বললেন, ভণিতার কোনও দরকার নেই তো। যা বলবার বলে ফেলো।

—আপনি এখনও ভয়ঙ্কর সুন্দরী।

ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেলেন জাহানারা। মনে মনে হিসেব করে তাঁর মনে পড়ল—সবে তিনি তিরিশ পেরিয়েছেন। মুখে বললেন, সত্যি কি তাই?

—হ্যাঁ মালিকা। আপনার জওয়ানির শুরুয়াতে যেমন সুন্দরী ছিলেন—আজও তাই আছেন।

মনে মনে খুশিই হলেন শাহজাদী। বললেন, অ। নিজের কাজে যা কোয়েল।

একটু এগিয়ে এসে জাহানারা দেখলেন, কোয়েল তাঁর জন্যে একখানি মুকুর, কিছু গুগ্‌গুল আর নখের জন্যে রক্ত চন্দন রেখে গিয়েছে। বড় একখানি মাটির সরায় রেখে গিয়েছে হলুদ আভা ছড়ানো কয়েকটি সাদা চাঁপা ফুল। তার সুবাসে বাতাস ভারি হয়ে এসেছে। জাহানারা সারাদিন রোজা রেখে রীতিমত কাহিল এখন। তিনি বালু পাথরের ঝরোকার খোপ ধরে ধরে একটি বেদীতে গিয়ে বসলেন। এখানে বসলে যমুনার ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়া যায়। বসতে বসতে দেখলেন—কোয়েল বড় একটা পিরিচ বোঝাই করে আঙুলের থোকা আর বাবাসেতিও রেখে গিয়েছে। বাঁদিটি বড় পরিপাটি।

শাহজাদী নিজের মনকে বললেন, মন। বলতো বলখ্‌-এর লড়াইয়ে আমার ছত্রশাল কি আমার বাহাদুর ভাই আওরঙ্গজেবের সঙ্গী হবে? না আগ্রায় ফিরে আসবে? সারাদিন রোজা রেখে কাহিল শরীরে জাহানারা যেন দেখতে পেলেন—লড়াইয়ের পর ছত্রশাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আগে আগে ফিরে আসছেন। মুখে সেই ভুবন-ভোলানো হাসি। চোখে আসমানের ছায়া। এবার

কাছে এসে শাহজাদীকে কুর্নিশ করবেন ছত্রশাল। চওড়া কাঁধ। সেই তুলনায় সরু কোমর। ছত্রশালের ঘোড়া ছুটে এসে যেন তার সামনের পা জাহানারার বুকে বসিয়ে দিল। জাহানারা আনন্দে সুখে চোখ বুজে ফেললেন। আমি কি তাঁর হাত কখনও ছুঁতেও পারব না? ছত্রশাল! আমার আজিজ!! আমাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন। রাজমহিমায়—অভিজাত ভঙ্গিতে। বুকের ওপর হাত রেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিনি দাঁড়ালেন। তারপরই মুহূর্তে ঘোড়ার পেটে পায়ের খোঁচা দিয়ে ছত্রশাল বর্শা বাহিনীর পেছনে মিলিয়ে গেলেন।

—শাহজাদী—?

এভাবে তাঁর গায়ে হাত রেখে কেউ কথা বলে না। হিন্দুস্থানে তেমন কেউ নেই যে এভাবে গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে জাগায়।

—চোখ খুলুন শাহজাদী।

বিরক্ত হয়ে চোখ খুললেন জাহানারা। দেখলেন—তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে—গোয়ালিয়রের নটী গুলরুখ বাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে বিরক্তিতে কুঁচকে আসা রেখাগুলো নিমেষে সরল হল। শাহজাদীর চোখের আনন্দের জন্যে গুলরুখ এক নতুন নাচ ক'দিন হল দেখাচ্ছে। তাঁরই বয়সী হবে গুলরুখ।

—এ কী ঘাগরা পরেছ?

গুলরুখ একটুও দমল না। বলল, শাহজাদী। কারিগরদের বলে এই ঘাগরা বানানো। খুব হালকা আর পাতলা। মোটে একদিন এর আয়ু।

—তাই?

—হ্যাঁ শাহজাদী। পরে আছি যে বোঝাই যায় না। একদিনের বেশি এটা পরা যায় না। নষ্ট হয়ে যায়। খুব সুন্দর ছুঁচের কাজ।

—তাতো দেখছিই। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। কে বানাল?

গুলরুখ কোনও কথা বলল না। চোখ নামিয়ে নিল। গুলরুখের ওড়না দিয়ে গুর্জরি আতরের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। ওড়নার ঝালরে বাদাম ফুলের চুমকি। গলায় শাহজাদীর দেওয়া মুক্তোমালার লহর। গুলরুখ যে শাহজাদীর সখী।

—ওঃ! বুঝেছি। তোমার সেই আশিকের তৈরি।

মাথা না তুলেই গুলরুখ বলল, হ্যাঁ শাহজাদী। কাল সারারাত জেগে ছুঁচের কাজ করেছে।

—বেচারা—!

শাহজাদীর কথা শেষ না হতেই বনের বুলবুলির মতো গুলরুখ নেচে উঠল। জাহানারার মনে হল—মানুষ কি মৃত্যুর আভাসে দিব্যদৃষ্টি পায়। নাচের ফাঁকে ফাঁকে গুলরুখ হরিণীর মতো চঞ্চল হয়ে উঠছে। চাপা গলায় পুরনো একটা গান গাইছে মাঝে মাঝে। তাতে যেন শোকের ছিটে। আকাশের মেঘ এসেছিল তব চরণচুমি।

নাচের শেষে গুলরুখ চলে যাচ্ছে। দুর্গের টানা খোলা পথ ধরে শাহজাদী তার পেছন পেছন চললেন। গুলরুখকে শুক্রিয়া গুজর করা হয়নি। ধন্যবাদ জানাবেন জাহানারা। দেওয়ালের পাশে পাশে লাল নীল আলোর প্রদীপ।

প্রদীপগুলোর বুকে বুকে আগুনের শিখা।

জাহানারা দেখলেন, বাতাসে দুলে দুলে একটি আগুনের শিখা গুলরুখের ওড়নার ঝালর ছুঁয়ে দিল। মুহূর্তে লালচে গুলরুখকে আগুন ঘিরে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে গুলরুখ খোলা অলিন্দের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল।

জাহানারাও ছুটে চললেন। এবার ওঁরা এসে পড়লেন মহলের খোলা চাতালে। মাথারও পর অন্ধকার আকাশ। নীচে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা গুলরুখ। জাহানারা আর পারলেন না। চোখে জল এসে গেছে। তিনি তাঁর গায়ের ওড়নাটি ছুড়ে দিলেন গুলরুখকে। চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে আয়—

কে বেরবে! শাহজাদীর ওড়নাটি পেয়ে আগুন আরও মেতে উঠল। জাহানারা দেখলেন, গুলরুখের সঙ্গে তিনিও আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে। গুলরুখকে এভাবে জ্বলে যেতে দেখে শাহজাদী দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি।

পাশেই দেওয়ান-ই খাসের দরবার থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে। চিৎকার করে ডাকলে হয়তো কেউ আসবে। কিন্তু কে আসবে? ওই আগুনের ভেতর পিঠ, ডান হাত যেন জল হয়ে যাচ্ছে জাহানারার। তিনি যেন দরবার থেকে ভেসে আসা ছত্রশালের গলা পেলেন। ছত্রশাল দৌলতাবাদ থেকে আগ্রা এলেন কখন! আমি তো জানি না। পুড়ে যাওয়া ওড়না—ঘাগরার ভেতর থেকে আমার কোমর—বেরিয়ে পড়া পা ছত্রশালের চোখে আসবে কি? তিনি কি আমায় ছুঁয়ে দেখবেন? আগুন আরও দাউ দাউ করে উঠল।

না, তাঁর চোখের সামনে অন্য কোনও মানুষের হাত আমায় ছোঁবে? আর তিনি অসহায় হয়ে চুপ করে তা দেখবেন? লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন জাহানারা। সে লালি আগুনের শিখার চেয়েও গরম। জাহানারার কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখ বুঝে ফেললেন।

খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকা ব্যাপারিরাই প্রথম লক্ষ করল—আজ তো বেশি রাতে আগ্রা দুর্গের নক্করখানা থেকে শানাই, বাঁশি, ঢোল, রাতের মতো শেষবার গম্ভীর সুরে বেজে উঠল না। যে যেখানে শুয়ে ছিল—সেই উঠে বসল। সারা আগ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। তামাম হিন্দুস্থান ঘুমচ্ছে। তবে কি বাদশা শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কিন্তু তাহলে তো সারা দুর্গের বাইরে ঘোড়সওয়ারদের পাহারা বেড়ে যাবে। তা তো বাড়েনি। তাহলে?

ব্যাপারিরাই প্রথম পায়ে পায়ে হাতিপোল দরওয়াজার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। যদি কিছু শুনতে পাওয়া যায় সেপাইজিদের কাছ থেকে।

না। উঁচু উঁচু ঘোড়াদের পিঠের ওপর বসা মূর্তির মতো বোবা বড় সড় চেহারার রাজপুত সওয়ারদের মুখ থেকে কিছুই শোনা গেল না। দুর্গে রোজ যেমন আলো জ্বলে—আজও তাই জ্বলছে। তবে তফাৎ এই—অন্যদিন দেওয়ান-ই-খাসের সব আলো এতক্ষণে নিভে যায়—আজ সেখানকার কোনও আলোই নেভেনি।

সারা আগ্রা ইংলিস্তানের ইলচি গেব্রিয়েল ব্রাউটনকে চেনে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও পায়ে হেঁটে—কিংবা কখনও খোলা সুখদোলায় বসা এই লালমুখো

মানুষটিকে আগ্রা প্রায়ই দেখে থাকে। নীল চোখ, লাল মুখ। সোনালি লম্বা চুলের ওপর লাল ফিতে শক্ত করে কপালে বাঁধা—শীতের সময় কালো ঘন বুনোনের আঙিগয়া গায়ে—পায়ে এখানকারই বিনামা জুতো—মানুষটিকে সবাই কোনও না কোনও সময়ে ঘুরতে ফিরতে দেখেছে। দেখেছে শাহী এতিমখানায়—সাধারণ মানুষজনকে চিকিৎসাপত্তর করতে।

সবাই দেখল, সেই ব্রাউটন সাহেব গভীর রাতে একা বাদশার আটঘোড়ার শাহী গাড়িতে বসে গম্ভীর মুখে দুর্গে ঢুকছেন। তাহলে কি বাদশার গুরুতর অসুখ? শেষ রাতের দিকে ব্রাউটন সেই গাড়িতে বসেই ফিরে গেলেন। এবারও তাঁর মুখ গম্ভীর। আবার সূর্য উঠতেই সেই গাড়িতেই ব্রাউটন দুর্গে ফিরে এলেন।

দুপুরের নমাজের পর আগ্রার সবাই জানতে পারল, শাহাজাদী-বেগম জাহানারা আগুনে পুড়ে গেছেন। কেন না জামা মসজিদের ইমাম নমাজের সময় আল্লাতালার দোয়া চাইলেন। বললেন, মাসুম জাহানারার হাত—পিঠ পুড়ে গেছে।

সারা রাজধানীতে কোথাও কোনও জলসা নেই। কাওয়ালি নেই। লালচকে ফুলওয়ালিদের ভিড় কম। নক্করখানায় শানাই, ঢোল, মন্দিরা বন্ধ। হামামগুলো প্রায় ফাঁকা। শয়তানপুরায় গানবাজনা, ঘুঙুরের রোল প্রায় শোনাই যায় না। যোগীপুরায় কিন্তু নিত্যদিনের মতোই কমন্ডলুর ঠোকাঠুকি—ধুপধুনোর সেই একই আঁধার করা ধোঁয়া আর নাম গান।

সন্ধের সময়—জৎপুরার দিককার দেহাতি লোকজন বলতে লাগল, শাহজাদীর গায়ে আতর মাখানো মসলিনে অভ্রের বাতিদান থেকে আগুন লেগে যায়।

ওয়াকেনবিশরা লক্ষ করছিলেন, আজ বাদশা শাহজাহান কিছুতেই দরবারে স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়াচ্ছেন। একবার তো কাউকে কিছু না বলেই বাদশা আচমকা অন্দর মহলে চলে গেলেন।

জাহানারা আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। একটা চেনা গন্ধে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এ-গন্ধ হিন্দুস্থানে শুধু একজনেরই হাত থেকে পাওয়া যায়।

শাহজাহান সাবধানে হাত সরিয়ে নিলেন।

—আব্বাহুজুর।

শাহজাহান কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে জাহানারা জানতে চাইলেন, আমার মাথার নীচে কী যেন রাখলেন?

শাহজাহান মনে মনে বললেন, খুব হুঁশিয়ার মেয়ে তো। এত কষ্টের ভেতরেও সবদিকে খেয়াল আছে? মুখে বললেন, কিছু না মা—

—হ্যাঁ। আপনার হাত থেকে আপেলের সেই বিখ্যাত খুশবু পেলাম আব্বা হুজুর। আপনি যেন কী রাখলেন আব্বা হুজুর। বালিশের নীচে—

—ও কিছু নয়। হাজার আশরফি—

—কেন আব্বা হুজুর?

—তুমি সেরে উঠবে এই আশায়—কাল ভোরে ওই হাজার আশরফি মিশকিনদের ভেতর বিলি করে দেব মা—

জাহানারা কোনও কথা বলতে পারলেন না। বাদশা হলেও ইনি আমাদের আব্বা হুজুর। অনেক কষ্টে শাহজাদী বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সেরে উঠব। দাওয়াই তো পড়েইছে—

এমন সময় উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন। বাদশা জাহানারা থেকে চোখ সরিয়ে খানিকক্ষণ খোলা অলিন্দ দিয়ে যমুনার দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে কোনও কথা নেই। তারপর একসময় পেছন ফিরলেন।

বাদশার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাদুল্লা ঝুঁকে কুর্নিশ করলেন।

বাদশা জানতে চাইলেন, ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ হজরত।

—দু'জন তসিলদার সমেত মোট ক'জন ওরা ?

—আলমপনা। তহবিল তছরুপের দায়ে ওরা মোট সাতজন গ্রেপ্তার হয়েছিল।

—কত আশরফির তছরুপ সাদুল্লা ?

—মোট সাত লাখ আশরফি।

শুয়ে শুয়ে সবই কানে আসছিল জাহানারা বেগমের। শাহী তহবিল তছরুপের এই ব্যাপারটা কয়েকদিন আগে ধরা পড়েছে। ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে—যদি আমি সেরে উঠি—এই আশায়। শাহজাদী জানেন, এভাবে বাদশা কয়েকটা হাতিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দেবেন পাখিদের। যদি তাঁর আদরের মেয়ে জাহানারা সেরে ওঠে।

শাহজাদী চোখ বুজলেন।

সন্ধের দিকে এলেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। শাহজাদীর সারা শরীর তখনই টাঙিয়ে দেওয়া মসলিনের পর্দার আড়ালে চলে গেল। সেই পর্দার ওপারে ব্রাউটন জাহানারার হাতখানি ধরলেন। তারপর চোখ বুজে শাহজাদীর নাড়ীর গতি বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইরানি হেকিম সর্দার মুয়ানা তখন পাশেরই খোলা চত্বরে নানান লতা পাতা নিয়ে পড়েছেন। তাঁকে জোগাড় দিচ্ছে খোজা গোলাম আরিফ। সেখান থেকে একটা বুনো গন্ধ বাতাসে এ-ঘরে আসতেই শাহজাদী অস্থির হয়ে পড়লেন। অমনি কোয়েল সেরা আতরে ভেজানো ফিকে গোলাপি মসলিনের টুকরো শাহজাদীর নাকের সামনে ধরল। ধরে বলল, মুলুকে মালিকা ! এখন আপনাকে মন শক্ত করতে হবে। মলম তৈরি হয়ে গেলেই আমরা কজনা মিলে আপনার গায়ে সে মলম মাখিয়ে দেব।

জাহানারা চোখের পাশ দিয়ে নিজের ঘরখানি একবার আবছা মতো জরিপ করছিলেন। নিয়ে বললেন, তোরা না বলতিস—আমি আগের মতোই ভয়ংকর সুন্দরী আছি !

—আগের চেয়েও অনেক সুন্দরী আপনি এখন।

—আর মিছে বলিসনে। যেটুকু ছিলাম—তাও আগুন এসে নিয়ে গেল।

—আগুন আপনার হাতে আর পিঠে লেগেছে শাহজাদী। মুখ—গলা যেমন ছিল তেমনই আছে। একটু কিছুও লাগেনি সেখানে—

শুনতে শুনতে জাহানারার চোখে জল এসে গেল। তিনি কিছুতেই কান্না থামাতে পারছেন না। জল চোখ দিয়ে আপনা আপনি গড়াচ্ছে। ছত্রশাল। আপনি এলেন না। আমার এ দুর্ভাগ্যের খবর সুরাট থেকে কামরূপ অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। অথচ দৌলতাবাদে আপনার কাছে পৌঁছল না। এর চেয়ে আশ্চর্যের খবর আর কী হতে পারে।। আর আপনার এসে কাজ নেই ছত্রশাল। এসে কী দেখবেন? আপনার সেই জাহানারা আর নেই।

মুখে শাহজাদী খুবই অস্ফুটে জানতে চাইলেন, গুলরুখ কোথায়? কেমন আছে?

কোয়েল বলল, ভালই! তার তো শুধু হাঁটু অব্দি পুড়েছে।

জাহানারা মনে মনে বললেন, আহারে! বেচারা! এবার নাচতে নামলে আর পায়ের কাজ দেখাতে পারবে না। গুলরুখের পায়ের কাজই তো আসল।

ইরানি হেকিম সর্দার ময়ানাকে সামান্য কথা বোঝাতে গিয়ে গেব্রিয়েল ব্রাউটন হিমসিম খাচ্ছেন। ফিরিঙ্গি পর্তুগিজদের এদেশে আনা অনেক কিছুর ভেতর আলু জিনিসটিকে হিন্দুস্থানিরা এখন অনেকেই চেনে। শাহজাদীর চিকিৎসায় তিনি এই আলু ব্যবহার করতে চান। কিন্তু ইরানিরা আলু কখনও দেখেনি।

কোমরের ঝোলা থেকে কয়েকটা আলু বের করলেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। তারপর ভাঙা ভাঙা ফারসিতে যা বললেন—সাজালে তা এমনটি দাঁড়ায়ঃ এখন শাহজাদীর পিঠের ফোসকাগুলো ফাটবে। তাতে মলম দেবার আগে এই আলু কেটে লাগাতে চাই। যদি ফোসকার জল আলু দিয়ে শুষে নেওয়া যায় তো লড়াইয়ের আধখানাই ফতে!

সর্দার ময়ানা কিছু বুঝতে পারেননি। তিনি বললেন, ফের গোড়া থেকে বলো।

ব্রাউটন আবার শুরু করলেন।

॥ সাতাত্তর ॥

চোখের কোণে বর্ধমানের সদরঘাট হুবহু ফুটে উঠল। এখন লাহোর দুর্গের বাইরে পড়ন্ত বিকেলে রাভির জল চড়া রোদে শান্ত হয়ে বয়ে চলেছে। পাথুরে মেঝেতে শুয়ে থাকা আওরত রীতিমত লম্বা। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মানুষটি নিজের মুখ ওড়নায় ঢেকে নিয়েছেন। তবু কেন বর্ধমানে দামোদরের ওপর সদরঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। লাহোর থেকে বর্ধমান? সে তো অনেক রাস্তা। সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে।

একসময় আওরতের মনে হল—তিনি বুঝি উঠে বসেছেন! অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন—তাঁর পিঠের নীচে লাহোর দুর্গের পাথর। এখানে পাঁথরে পালিশ পড়ে না। এখানে দুর্গের নানান রকমের কাজের মানুষের থাকার জায়গা।

কারিগর, জল-নিকাশী ওস্তাদ, কামারশালের নায়েব থেকে শুরু করে ভিস্তির চামড়া সেলাইয়ের লোকও থাকে।

আওরতের বয়সে হলেও ওড়নার বাইরে বেরিয়ে থাকা মাথার চুলে রীতিমত ঢেউ। সেই ঢেউ খানিকটা কাঁচাপাকা। ঘাগরার বাইরে বেরিয়ে থাকা পায়ের গোড়ালি আদৌ ফাটাচটা নয়—যেমনটি হয়ে থাকে কাজের মানুষজনের। এমনকি ডান হাতের কনুই রীতিমত সুডোল। ওড়নার বাইরে বেরিয়ে থাকা বাহুমূল বুঝিয়ে দেয়—ইনি কোনও ঢিলেঢালা দেহাতিনী নন।

ক'দিন আগে ঈদ গেছে। গেছে হিন্দুদের বৈশাখী। কাছাকাছি ক'দিনের এই জোড়া উৎসবের পর লাহোর যেন চড়া রোদ্দুরে ধুঁকছে। এখান থেকে আগ্রা-জাহানাবাদ অনেক দূরে। কোনও নালিশ বা আবেদনের ফয়সালা হয়ে লাহোরে তা ফিরে আসতে আসতে মাস কাবার হয়ে যায়।

অল্পবয়সী একটি বাঁদি এসে আওরতের গলায়—বুকে হাত রেখে বলল, মুলুকে মালিকা। আপনার গা তো পুড়ে যাচ্ছে—

জ্বরের ঘোরে আওরত ধমকে উঠলেন, কতবার না বলেছি—ও নামে ডাকবে না। আমি কিল্লা লাহোরের গোলাপ বাগ সাজাবার মেহেরুন্নিসা—স্রেফ মেহেরুন্নিসা।

বাঁদিটি লাহোরি। কাছেই কোথাও ওর বাবা মা থাকে। তারাও সম্ভবত জন্মে ইস্তক গোলাম-বাঁদি। কেল্লারই সর্বক্ষণের হাজিরা-দাখিলা হবে। কেল্লাতেই ওদের ঘরগেরস্থি।

বাঁদিটি উঠে যাবার সময় বলল, যাই আব্বাজানকে ডাকি—

আব্বাজান কথাটি কানে যেতেই জ্বরে পুড়ে যাওয়া আওরত নিজে নিজেই বললেন, আব্বাহুজুর! কতকাল যে আব্বাহুজুর নেই। উজিরে আজম ইতিমাদ-উদ্দৌল্লা। আপনার এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই নসিবের চাকা ঘুরে গেল। নয়তো বেশ চলছিল হিন্দুস্থান—

বাঁদিটি তার বাবাকে নিয়ে হাজির হয়ে দেখল, জ্বরের ঘোরে মেহেরুন্নিসা কী সব বলে চলেছেন। কোনও কথা আলাদা করে চেনা যায় না।

মেহেরুন্নিসা কিন্তু নিজের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। তাঁর নিজের গলা নিজেরই কানের কাছে গমগম করে উঠল। আমি—আব্বা হুজুর ইতিমাদ-উদ্দৌলা—ভাইজান আসফ খাঁ আর শাহজাদা খুর্রম—একসঙ্গে হিন্দুস্থানের চাকা ধরেছি। ওঃ! সে কী সুখের দিন। ওঃ! সে কী আনন্দের দিন। আমার দরবারকে সেদিন সারা হিন্দুস্থান ঝুঁকে পড়ত। কে আগে নজর পেশ করবে—

বাঁদিটির বাবা রীতিমত সম্ভ্রমে শুয়ে থাকা আওরতের মুখের ওপর থেকে ওড়না সরিয়ে দিয়েই চমকে উঠল। সারা মুখ ফুলে উঠেছে। আর লাল। সে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে মেয়ের মুখে তাকাল। তাকিয়ে বলল, এখন হেকিম পাই কোথায়?

—পেলেও লাভ কী? আমরা ডাকলে তো আসবে না।

বাঁদিটির বাবা বললেন, কেন আসবে না। বলব—হিন্দুস্থানের এক সময়কার

বাদশা-বেগম জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ভুল বকছেন।

—ওকথা বিশ্বাসই করবেন না হেকিম সাহেব। বাদশা জাহাঙ্গীরের নূরজাহান বেগম কিল্লা লাহোরে গোলাপ বাগ দেখাশুনো করেন—একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। ধমকে বলবেন, দিনের বেলায় আরক গিলেছ? যাও! বেরও।

নূরজাহান তখন চমকে চমকে উঠছেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, দামোদরের ওপর সদরঘাট থেকে সাদা ঘোড়ার পিঠে কে এক নওজওয়ান আসছেন। ঘোড়া কাছাকাছি হতেই চিনতে পারলেন মেহেরুন্নিসা। আগ্রা দুর্গে কাঁচা বয়সের খেলুড়ে সঙ্গী। কুতুবুদ্দিন। এখন সা জওয়ান। কুতুব, সেলিম আর মেহের একসময় কত না একসঙ্গে গল্পগাছা করতেন হায়াত খাঁ বাগে। কেল্লার সামনে বুরুজের কাছাকাছি।

কুতুবের চোখে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠলেন মেহেরুন্নিসা। ঠিক এমনি এ'দিন আমি কেঁপে উঠেছিলাম। আকবর বাদশার চোখের সামনে। শাহজাদা সেলিম যমুনার চর থেকে আমায় দেখে হাত নাড়ছিলেন। আমিও হাত নাড়ছি। দেওয়ান-ই-খাসের চেহেল সেতুনের পাশে দাঁড়িয়ে। শীতের দুপুরে। শাহজাদা শীতের দুপুরে হাঁস শিকার করছিলেন চরে। হাত নেড়ে ফিরে তাকাতেই দেখি—আমার সামনে আকবর বাদশা।

তিনি যেন কী ভাবছেন। আমি ঝুঁকে কুর্নিশ করেই পিছু হটে হটে পালিয়ে এলাম। তার ক'দিনের ভেতরেই হিন্দুস্থানের বাদশার ইচ্ছাতেই বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু এখন? এখন যে আমি কুতুবের চোখের সামনে থেকেই পালাতে চাই। কোনদিকে পালাই?

বাঁদিটির বাবা দেখল, নূরজাহান বেগম প্রবল জ্বরে মুচড়ে মুচড়ে উঠছেন। ঠোঁট কাঁপছে। সে ঠোঁটে ঘোর লাগা সব কথা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কিছু বোঝা যায় না।

কুতুব ঘোড়ার পিঠে বসেই জানতে চাইল। ফৌজদারনি! তোমার ফৌজদার কোথায়?

—তমিজ হারিয়ো না কুতুব। তিনি আমার খসম। এখানকার ফৌজদার।

—বেশ তো। তা শের আফগান কোথায়? ভুলে যেও না—আমিও আসছি আগ্রা থেকে। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের ফরমান নিয়ে।

মেহেরুন্নিসার কেমন খারাপ লাগল। সদরঘাটে বড় নৌকো থেকে চুনের পাথর নামছে। ইশারায় ডাকলেই ওরা ছুটে আসে। মাঝি, মজুর—সবাই ফৌজদার শের আফগানকে সম্ভ্রম করে। ভালবাসে।

মেহেরুন্নিসা স্পষ্ট গলায় বললেন, পীর বাহরমের বাজারে গেছেন।

কুতুব রীতিমত অবহেলার গলায় বলল, সে চুলোটা কোথায়?

বিশ্রী লাগল মেহেরুন্নিসার। তিনি শান্ত গলায় বললেন, ওই তো পীর বাহরমের মাজারশরিফ। ওর পেছনেই পীর বাহরমের বাজার—

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে কুতুব বলল, সেখানে কিসের ফৌজদারি মেহের?

—ফৌজদার সাহেব পঞ্চ-বিচারে বসেছেন। —বলতে বলতে আশপাশে তাকালেন মেহেরুন্নিসা। আমার মেয়েটা—লাডলি কোথায় গেল? বড় একা লাগছে মেহেরের। এখন যদি পাশে থাকত।

কুতুব খুব কাছে এগিয়ে আসতে সরে দাঁড়ালেন মেহেরুন্নেসা।

—মেহের। চলো আমার সঙ্গে। আমরা দু'জনে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

মেহেরুন্নেসা চমকে তাকিয়ে পড়লেন।

—গোলকুণ্ডায় যাব দু'জনে। সেখানে ফৌজি লশকরির ভার পাব। হাত বাড়ালেও আগ্রা আমাদের ধরতে পারবে না।

আরও কী বলতে যাচ্ছিল কুতুব। মেহেরুন্নেসা দেখলেন, পীর বাহরমের মাজার শরিফের পেছন থেকে ফৌজদার শের আফগান—আর হিন্দুস্থানের তাজা নওজওয়ান বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর একই সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের কোমরে ঝোলানো তলোয়ার হাঁটার ছন্দে বারবার উরুতে পড়ে খাপসুদ্ধ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

বাঁদিটির বাবা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার মেয়ে এই বেসাহারা আওরতের কপালে ওড়না ছিঁড়ে ভিজিয়ে নিয়ে কপালে রাখছিল। মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার তা ভিজিয়ে নিচ্ছে বাঁদিটি। ওরই ভেতর নূরজাহান বেগম ভুল বকতে বকতে সিধে উঠে বসলেন। ওরা দু'জনে মিলে আবার তাঁকে শুইয়ে দিল।

বাঁদিটির বাবা খুব আস্তে আস্তে বলল, বাদশা-বেগম নূরজাহান ওঁর বেটি লাডলির খোঁজে নিজেই বর্দালি চেয়ে এই কিল্লা লাহোরে এসেছিলেন। বলতে বলতে গোলামটির চোখ পড়ল নূরজাহানের কোমরে। আলুথালু ওড়না। ঘাগরা ঢিলে। গায়ের জামা পিঠের দিকে উঠে যাওয়ায় কোমর জুড়ে মোহরের মালা ঘুলঘুলির আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে। এই মোহর খুবই চেনে বাঁদিটির বাবা। আকবরি মোহর কোণাটে। আর হিন্দুস্থানে বাদশা-বেগম নূরজাহানের নামে জাহাঙ্গীর বাদশা এই মোহর কাটান। গোল মতো। বিয়ে শাদির গলার হারেও এ-মোহর সারা হিন্দুস্থানে দেহাতে দেহাতে ছড়িয়ে আছে। গোলামির গোড়ার দিকে বাঁদিটির বাবা রাজধানী আগ্রায় এ-মোহর খুব দেখেছে। রসিক ব্যাপারিরা বলত—মেহের! এখন আর বড় একটা দেখা যায় না লেনদেনে। সব গিয়ে ঢুকেছে নিশ্চয় খাজানাখানার সরফদের ঘরে।

গোলামটি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কোমরের ওপর তার মাথা নেমে এল।

বাঁদিটি চমকে উঠল। আব্বাজান?

বাধা পেয়ে মুখ তুলল গোলাম। তুই এখান থেকে যা—যা বলছি—

—আব্বাজান? —বলতে বলতে মেয়েটি দেখল, তার বাবার হাঁ মুখে ওপরের দাঁত নীচের দাঁতে ঘষে গেল শব্দ করে।

গোলামটি কোনও কথা না বলে ফের তার মাথা নামিয়ে নিল হিন্দুস্থানের সাবেক বাদশা-বেগম নূরজাহানের কোমরে। তার নাকে, মুখে জ্বরের তাপ যেন ছেঁকা দিচ্ছে। মোহরের সারি সরিয়ে গোলামটির দাঁত গেঁথে তোলা সুতো খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তার খেয়াল হল, জ্বরের তাপে মোহরগুলোও গরম হয়ে উঠেছে।

আগ্রায় হিন্দুস্থানের হালের বাদশা-বেগম শাহজাদী জাহানারার পিঠের ফোসকাগুলোয় হাজিরা কোয়েল চেরাই আলু আলতো করে চেপে চেপে পোড়া জায়গার রস শুষে তুলছিল। তুলতে তুলতে হাসিতে ঢলে পড়ে কোয়েল বলল, সে যদি দেখতেন শাহজাদী—ইরানি হেকিম সর্দার মুয়ানা কিছুতেই বোঝে না—কলা গাছ কী?—কাঁচা কলা কী?—আর ব্রাউটন সাহেব তাকে বোঝাবেনই বোঝাবেন।

আগ্রা দুর্গে শাহজাদী জাহানারার ঘর এখন মাটির নীচের তয়খানার মতোই ঠাণ্ডা। বাইরে রীতিমত চড়া রোদ। শাহজাদী খুব সাবধানে ডান হাতখানি সরালেন। সে-হাত নিজের কোলে নিয়ে কোয়েল বলল, ইরানে তো কলাগাছ নেই। চিনবেন কোত্থেকে সর্দার মুয়ানা। আলুও তিনি দেখেননি।

জাহানারা কোনওমতে বলতে পারলেন, তাই?—বলে শাহজাদী শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিলেন—গোলাম আরিফ খোলা চাতালে কাঁচ কলাগাছের চেরাই থোড় নিয়ে পড়েছে। পাশেই হামান দিস্তে উপচে থেঁতো-করা কাঁচাকলার মন্ড। আর গুগগুল। এই তিন মিলিয়ে বাটা মলম কোয়েল তাঁর পোড়া জায়গায় লাগিয়ে চলেছে।

আপনা আপনিই জাহানারা বেগমের মুখে এসে গেল, এ-মলম আর কতদিন কোয়েল? আর কতদিন?

—আজই শেষদিন শাহজাদী।

—তাই?

—তাই তো বলে গেছেন ব্রাউটন সাহেব। জ্বর নেই আপনার। কথাও বলতে পারছেন দিব্যি। কাল ভোর থেকেই বাদশা আপনার সেরে ওঠার সুবাদে খুশি মানাবেন।

এবার শাহজাদী কোনও কথা বলতে পারলেন না। গলা বুজে এল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। বড় বড় ফোঁটায় জল এসে দাঁড়িয়েছে চোখে। আব্বা হুজুর। আমি তো সেরে উঠবই। আপনি সব ফেলে আমার জন্যে দোয়া করে চলেছেন—সেই কবে থেকে। কতদিন হয়ে গেল—আম্মিজান নেই। অথচ আপনি সব সময় আমাদের পাশে পাশে। আম্মিজানকে যে হারিয়েছি—সেকথা আপনি আমাদের বুঝতে দিতে চান না।

কোয়েল টেরও পেল না—কখন শাহজাদী ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন খুব ভোরে সারা আগ্রা জেগে উঠল। না জেগে আগ্রার উপায় ছিল না। সারা রাজধানী জানে—বাদশা শাহজাহান শাহজাদী জাহানারার সেরে ওঠার সুবাদে

খুশি মানাবেন। রাজধানীর জানা মানে—যেখানে যত মিশকিন ছিল—তারা সবাই এসে রাজধানীতে রাত থাকতে ভিড় করল। আর ঝেঁটিয়ে এল—যত ছিল ফকির দরবেশ—সাধু সন্ন্যাসী, তাদের সামলাতে সাকেত ছাউনি থেকে ফৌজ তলব করতে হল। রোদ উঠতে না উঠতেই আগ্রা দুর্গের আকবরি দরওয়াজার সামনে শুধুই মানুষের মাথা। আর তার মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে মির্জা রাজা জয়সিংহের রাজপুত ঘোড়সওয়ার বসে—কঠিন, কঠোর মুখে —যেন কিছুই হয়নি—এভাবে তারা ডাইনে বাঁয়ে অবলীলায় ঘোড়া চালাচ্ছে।

অনেকদিন পরে মানুষের মাথা—মুখ দেখে—তাদের গলার স্বর শুনে বড় ভাল লাগল শাহজাদী জাহানারার। কতকাল এভাবে মানুষ দেখা হয়নি তাঁর। শাহজাদা দারা তাঁকে কুরশিতে বসিয়ে বাদশার দর্শন ঝারোকার সামনে এনেছেন। ছোটে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে জাহানারার গর্ব হল। আমার ভাই এত সুন্দর?

মাথা ঘুরছে জাহানারার। অনেকদিন শুয়েছিলেন। ভোরবেলার কাঁচা রোদে তিনি কিছুতেই দিক ঠিক করতে পারছেন না। কোনদিকে তাকিয়ে নামাজ পড়তাম? কাবা কোনদিকে? রোদ এত ঝকঝকে। এত সুন্দর।

শাহজাদীর ডানপাশে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানের বাদশা। তাঁর সামনে বিশাল থালায় আশরফির স্তূপ। সেদিকে তাকিয়ে জাহানারার চোখে বারবার জল এসে যাচ্ছিল। আব্বা হুজুর? আপনি আমায় অ্যাতো ভালবাসেন?

শাহজাহান দুহাতের আঁজলা ভরে আশরফি নিয়ে নীচের মানুষের ভিড়ে তা ছড়িয়ে দিলেন। অমনি মানুষের ভিড় ঘোলানো জল হয়ে যেন পাক খেয়ে আশরফি কুড়োতে লেগে গেল। এভাবে চলতেই থাকল আশরফি ছড়ানো। দুলাখের মতো আশরফি ফুরোতে ফুরোতে সূর্য এসে আগ্রার মাথায় দাঁড়াল।

—আব্বা হুজুর। আমি উঠি?

—না। দাঁড়াও—বলে শাহজাহান ডানদিকে তাকালেন। দুজন তাতারানি বিশাল একখানি থালা কানাতে কানাতে ধরে নিয়ে আসছে। তার ওপর থরে থরে মণিমুক্তা সাজানো। একটি বৈদুর্য দুপুরের রোদে জ্বল জ্বল করে উঠল।

—হজরত? —বলে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন শাহজাদী।

—না। আজ তোমায় উঠে দাঁড়াতে হবে না। বোসো।

জাহানারা চোখ দিয়ে মণিমুক্তো দেখিয়ে বললেন, এ সব?

—হ্যাঁ। সবই তোমার।

—আমার? —বলতে বলতে কেঁপে গেলেন জাহানারা। তাঁর চোখ জলে ভরে গেল ফের।

—নিজের মেয়েকে একজন আব্বা হুজুরের তোফা!

—তোফা? —বলতে বলতে ফের উঠতে গেলেন জাহানারা। পারলেন না। তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন। দারা ছুটে এসে তাঁর বাজিকে ধরতে গেলেন। তার আগেই শাহজাহান তাঁকে ধরে ফেললেন। জাহানারা তাঁর আব্বা হুজুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন।

শাহজাহান নিজেকেই যেন বলছেন, এভাবে চাপা স্বরে বললেন—একদম একা একা সে গলা—যেন কেউ আর সামনে নেই তাঁর—কিছু আর সামনে নেই তাঁর—আমি ভাবিনি তোমায় ফিরে পাব। সবই তাঁর ইচ্ছা।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা দারার মনে হল, আসমানে নিশ্চয় কোথাও বেহেসত্ আছে। তাই তো আমরা ভেবে থাকি। কিন্তু মাটির এই দুনিয়াতেও বেহেসত্ থাকে—বেহেসত্ নেমে আসে কিছুক্ষণের জন্যে। সেই বেহেসতের সামনে তিনি নিজে এখন দাঁড়িয়ে আছেন।

যাঁর কেরামতিতে শাহজাদী জাহানারা উঠে বসেছেন—সেই গেব্রিয়েল ব্রাউটন কোথায়? বাদশা শাহজাহান তাঁর খোঁজ করতেই শাহজাদা দারা বললেন, হজরত! তিনি তো ঢাকা রওনা হয়ে গেছেন—

—ঢাকায়?

—হ্যাঁ হজরত। শাহজাদা সুজার দাওয়াত রাখতে ইলাচমশাই করেই ঢাকা পাড়ি দিয়েছেন।

বাদশার ইচ্ছে ছিল, আজই তিনি এই আশ্চর্য বিদেশী হেকিমকে উপহারে, কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে দেবেন। ইরানি হেকিম সর্দার মুয়ানাকে না চটিয়ে ঠিকঠাক মলম বানাবার ব্যবস্থা করে জাহানারাকে সারিয়ে তুলেছেন ব্রাউটন। নয়তো শাহজাদীর জীবন পালঙ্কে পড়ে পড়েই কাটত।

শাহজাদা দারা—বাদশা শাহজাহান একই সঙ্গে শাহজাদী জাহানারার মুখে তাকিয়ে। একজন আব্বা হুজুর—অন্যজন ছোটেভাই—আনন্দ, ভালবাসায় শাহজাদী জাহানারা ছলো ছলো চোখে ফের তাঁর কুরশিতে বসে পড়লেন।

সেই কবে আগ্রা ছেড়েছেন ব্রাউটন। পেছনে পড়ে আছে ফিরোজাবাদ। তারপর সরাই মুরলীদাস। এটোয়া। সেকেন্দ্রা। আরও কিছুটা এগিয়ে ব্রাউটন দেখলেন, একশো দশটির মতো গো-গাড়ি আগ্রা চলেছে। প্রতি গাড়িতে ছ'টি করে তাগড়া ষাঁড়। দুপাশে ঘোড়সওয়ারের পাহারা। ব্রাউটন শুনলেন, গাড়ি পিছু পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা যাচ্ছে। বাংলা সুবার আদায়। নিজের খরচ খরচা রেখে ঢাকা এই টাকা পাঠাচ্ছে আগ্রার দেওয়ানখানায়। বাংলা তাহলে কতটা ধনী সুবা? সেখানকার সবাই কি রইস মানুষজন। ঠিক করে উঠতে পারেন না ব্রাউটন।

যমুনায় এবার নৌকো ছেড়ে দিতে হল ব্রাউটনকে। সামনে শুধুই পাল। ডাঙায় উঠে একদল হাটুরে মানুষের সঙ্গে তিনি একটা জনার খেতের গায়ে এসে পড়লেন। এখানে পৌঁছে দেখলেন—সূর্য মাথার ওপর। চাঁদি ফেটে যাবার দাখিল। একটা ছোট ছেলে তাদের পোষা এক গণ্ডারকে জনারের শীষ খাওয়াচ্ছে।

ব্রাউটনের বুকটা ধক্ করে উঠল। আমি এ কোন্ অজানা দুনিয়ায় পাড়ি দিলাম? স্রেফ খয়রেন্নুসার মেয়ে কাঞ্চনবালা আরশিকে ঢাকায় চোখের দেখা দেখতে পাবো বলে বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজার দাওয়াত নিয়ে বসে আছি।

খয়রুন্নেসা বেঁচে থাকতে সে তার মেয়ে কাঞ্চনবালা আরশির হাত আমার হাতে দেবে না কিছুতেই। আমি পঞ্চাশের দিকে। আরশি বড়জোর পঁচিশ। অমন সুন্দর হাসি। অমন সুন্দর নাচে। আমি না তাকিয়ে পারি না। কিন্তু আমার মতো বয়স্কর হাতে খয়রুন্নেসা কি তার আরশিকে দেবে? আমি কিন্তু সত্যি বুড়ো হইনি। এখনও হাঁটি যখন—মনে হয় আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি—ছুটতে পারি—সাঁতরাতে পারি—আবার বন্দুক বাগিয়ে ভাল মতো গুলিও করতে পারি। হাত একটুও কাঁপবে না। হিন্দুস্থানে বয়স বড় তাড়াতাড়ি আসে। এদেশে মেয়েরা বড় তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যায়। আরশিকে পেলে আমি তাকে কিছুতেই বুড়ি হতে দেব না। কিন্তু খয়রুন্নেসা কি আরশিকে দেবে? আরশিই তো তার রোজগার। পোষা গণ্ডারটা ব্রাউটনের হাতের কাছে এসে হাঁ করে মুখ তুলল। যদি ব্রাউটনও তাকে জনারের শীষ খেতে দেয়।

সামনে সরাই শাহজাদা। ব্রাউটন হাটুরে দলটার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার দেখা পেলেন ব্রাউটন। নদী দেখে তাঁর মনে হল—এই নদীর এত নাম? ফ্রান্সে লুভর-এর সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া সিন নদীর চেয়ে গঙ্গা বেশি চওড়া নয় মোটেই। সেখানে সিন নদী অন্ততপক্ষে বেলগ্রেডের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া দানিয়ুবের সমান চওড়া। বর্ষা শুরুর আগে—মার্চ-এপ্রিলে এত কম জল থাকে গঙ্গায় যে সম্ভব হয় না তখন আর নৌকো চালানো।

গঙ্গার পাড়ে পৌঁছে খানিকটা আরক খেলেন ব্রাউটন। গঙ্গার জল মিশিয়ে। ফলে রাতের দিকে সরাইখানায় পেটের গণ্ডগোল দেখা দিল তাঁর। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজের ওষুধ খেলেন তিনি। তারপর মনে পড়ল—হিন্দুস্থানের বাদশা তো শুধু যমুনা আর গঙ্গার জলই খেয়ে থাকেন। রাজধানীর বাইরে থাকলে কাছাকাছি গঙ্গা হলে সে-জলই বাদশা খেয়ে থাকেন।

এইভাবে খানিক হেঁটে—খানিক গঙ্গায় নৌকোয় ভেসে ভেসে তিনদিনের দিন ব্রাউটন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন। সকালবেলা। জোড়া নালা দিয়ে ঘেরা পাথরের দুর্গে গিয়ে ফৌজদারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন ব্রাউটন। তার একজন ফরাসি ডাক্তার ছাড়াও জনা তিন চার পারসি ডাক্তারও রয়েছে। ডাক্তার রুদ মহলি বললেন, গঙ্গার জল একদম খাবেন না। খেলে কিন্তু ভুগবেন। পরদিন ভরদুপুর অব্দি হাপিত্যেশ করে বসে থাকার পর গঙ্গা পেরবার ছাড়পত্র পেলেন ব্রাউটন।

গঙ্গা পেরিয়ে দিনের মাথায় বেনারস এসে পৌঁছলেন তিনি। গায়ে গতরে বেশ বড় আর মজবুত লাগল বেনারস শহরকে। অন্য জায়গার চেয়ে এখানেই যেন দোতলা, তেতলা বাড়ি বেশি। কিন্তু রাস্তাগুলো বড় সরু সরু। তাই অসুবিধা—অস্বস্তিও বেশি। সরাই গুটি কয়েক। গঙ্গার উত্তর পারে বেনারস গড়ে উঠেছে। এইভাবে যেতে যেতে কখনও নদী পড়ে—কখনও বা পাথরের সেতু—আবার ধুলোর রাস্তায় ধুলো মাখামাখি করে ব্রাউটন এগিয়ে চলেন। দুপুরের সূর্য, রাতের চাঁদ, জঙ্গল, নয়তো ফাঁকা বালিয়াড়ি—এইসব দেখতে দেখতেই রাস্তা পেরল। নৌকোয় ভাসতে ভাসতে—পায়ে হাঁটতে হাঁটতে। একদিন

পাটনা এসে গেল। গঙ্গার দক্ষিণ কূলে।

এই বয়সে একজন ইলচি হয়ে আরশির মতো সামান্য একজন কাঞ্চনবালার জন্যে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে ব্রাউটনের মনে হচ্ছিল—আমি কি তীর্থ করতে বেরিয়েছি? যে তীর্থের নাম ভালবাসা। এই ভালবাসার শেষে দাঁড়িয়ে আছে একজন ইনসান—যার নাম আরশি। সে আমার ভাষা বোঝে না। আমিও তার ভাষা বুঝি না। তার কাছে আমি একজন রঙিন—বিচিত্র ইনসান মাত্র। মানুষের জ্বর হলে সারাতে পারি। ফোড়া হলে কেটে কুটে সারিয়ে দিই। পুড়ে গেলে বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

পাটনা থেকে নৌকোই ব্রাউটনের ঘোড়া। বর্ষার পর হলে নদী জলে ভরাট থাকত। এগোনোও যেত অনেক তাড়াতাড়ি।

বিকেলের শেষে ঘুম ভেঙে গেল শাহজাদী জাহানারার। তিনি স্বপ্নে দৌলতাবাদ চলে গিয়েছিলেন। আমি পুড়ে গেলাম—তাও তুমি এলে না? এরকম একটা মন নিয়ে প্রায়ই ছত্রশালের কথা ভাবতে ভাবতে শাহজাদী ঘুম আর জেগে থাকার ভেতর ঘোরাফেরা করেন। তখন তাঁর সঙ্গী থাকে নিজেরই চোখের জল।

এরকম এক অবস্থায় কে যেন তাঁর ঘুম ভাঙাল। কোয়েলই হবে। নয়তো কে আর তাঁর অন্দরমহলে এসে তাঁকে ঘুম থেকে তুলবে? একটু বিরক্তই হলেন জাহানারা। ছত্রশালের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জলে জেগে থাকা—কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখা—দুইই এখন ভাল লাগে শাহজাদীর। আজকের স্বপ্নে তিনি মাটিতে বসে ছত্রশালের পা থেকে লড়াইয়ে যাবার চামড়ার পটি খুলে দিচ্ছিলেন। ছত্রশালের পা নিজের বুকের কাছে নিয়ে।

—কে?

—আমি বাজি—

—কে? —বলে উঠে বসতে গেলেন জাহানারা।

দুহাতে তাঁকে আলতো করে শুইয়ে দিয়ে ভারি সুন্দর এক যুবক বলল, আমি আওরঙ্গজেব।

—আওরঙ্গজেব! তুমি আওরঙ্গজেব! এত সুন্দর দেখতে হয়েছ ছোটেভাই—

আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা থেকে আনানো একটি ছোট হীরে রুপোর থালায় শাহজাদীর সামনে তুলে ধরলেন। তুলে ধরে বললেন, যখনই খবরটা পেলাম—তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম—তুমি সেরে উঠে তোমার আংটিতে বসিয়ে এই হীরেটা পরবে। তোমার না-লায়েক ছোটে ভাইয়ের এই ছিল মিন্নৎ!

—না-লায়েক কেন আওরঙ্গজেব? তুমি তো আওরঙ্গজেব বাহাদুর!

—কোথায় বাজি? তার তো কোনও চিহ্ন দেখতে পাই না কোথাও। ওসব কথা থাক এখন।

জাহানারা বুঝতে পারেন—কোথায় যেন এই ছোটে ভাইয়ের বুকে কাঁটা বিঁধে আছে। তিনি সেখানকার ব্যথা কমিয়ে আনতেই বললেন, শাহী জানে কে বাহাদুর।

এখানে শাহী মানে বাদশা। এভাবে বলাই রেওয়াজ। বাদশাকে বাঁচিয়ে। বাদশাকে রেখে ঢেকে।

আওরঙ্গজেব কুর্নিশতে বসতে বসতে বললেন, দু' দু'বার লড়াইয়ে গেলাম। দু' দু'বারই দুশমনের মুখোমুখি হলাম না। অথচ ফিরে এসে পেলাম আরও মনসবি—আরও ঘোড়সওয়ার—আরও খাতির, আদর।

জাহানারার মনের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এল। আওরঙ্গজেব বলছেন শাহজাদা দারার কথা। শাহজাদী মনে মনে বললেন, দারা তোমার বড়ো ভাই আওরঙ্গজেব।

তখন আওরঙ্গজেব বলে চলেছেন, আকবর বাদশার খোয়াব কামিয়াব হয়েছে দক্ষিণে। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর আজ আগ্রার কাছে মাথা নুইয়েছে। দৌলতবাদে মুঘল শাহীর শেকড় ভাল মতোই নেমেছে বাজি। পরপর কয়েক বছর অজন্মা গেলেও দেওয়ানখানা থেকে কোনও আশরফি যায়নি সেখানে। তবু সেখানকার চাষীরা জমি জিরেত ছেড়ে পালায়নি বাজি। ফসলে নগদে আগ্রা দক্ষিণে তার পাওনাগণ্ডা পুরোপুরি উসুল করেছে।

—সবই তোমার কৃতিত্ব ছোটেভাই। তুমি বাহাদুর।

—আমি লড়াই করলাম। ফসল তুলে দিলাম। আদায় উসুলও ঠিকঠাক হল। সবদিকেই ফতে। অথচ আমার দিকে তাকাও বাজি। আগ্রা আমার ব্যাপারে অন্ধ। আমায় দেখতেই পায় না। আগ্রার চোখে আমি না-লায়েক।

॥ আটাত্তর ॥

গেব্রিয়েল ব্রাইটন বুঝে উঠতে পারছিলেন না—সুবে বাংলার রাজধানী কেন রাজমহল থেকে সরিয়ে ঢাকায় করা হল। আগ্রা-জাহানাবাদ থেকে এত দূরে—ঢাকায় শাহী কেতা মানামানির কোনও কড়াকড়ি নেই। সুবেদার শাহজাদা সুজা বিকেলে রোদ পড়ে এলে মানী মেহমান ব্রাউটনকে বুড়িগঙ্গায় ভেসে ভেসে বন্ধুর মতোই ঢাকা দেখিয়েছেন।

বজরা থেকে শাহজাদার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় উঠে আসার সময় ইংলিশস্থানের ইলচি গেব্রিয়েল ব্রাউটন জানতে চাইতে চাইলেন, শাহজাদা রাজমহলের থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন কেন? গঙ্গার ডানপারে রাজমহল তো বেশ সুন্দর শহর। রাজমহলে ঢোকার মুখে সারাটা ডাঙা তো ইট দিয়ে বাঁধানো।

বুড়িগঙ্গায় ভাসন্ত বজরা, দুকোশী নৌকো, গহনার নৌকো—সব কিছুতেই আজ আলো দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা শাহী হুকুম। ভিনদেশী মেহমান গেব্রিয়েল ব্রাউটনের সম্মানে।

বজরা থেকে ডাঙায় নেমে শাহজাদা সুজা বললেন, আগে বাংলার সুবেদাররা ওখানেই থাকতেন। সেই পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার আমল থেকেই। চমৎকার শিকার পাওয়া যেত ওখানে। ব্যবসা-বাণিজ্যও হত প্রচুর। কিন্তু—

ব্রাউটন হাঁটতে হাঁটতে চার ঘোড়ার গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। থেমে দাঁড়িয়ে

শাহজাদার মুখে তাকালেন।

—কিন্তু গঙ্গা নদী যে খাত বদলাল। রাজমহল শহর নদী থেকে দূরে পড়ে গেল। ওদিকে আরাকান থেকে মগদের হামলা। পর্তুগিজ হারমাদদের আচমকা হানা। তাই তখৎ সরিয়ে আনা হল ঢাকায়। জাহাংগীর বাদশার আমলে। এসব কথা থাক। আজ সারাদিন আপনার খুব পরেশান গেল। এবার আপনার আরামের দিকে আমার নজর দেওয়া উচিত।

আগ্রাই কেতায় ব্রাউটন ঝুঁকে কুর্নিশ করলেন বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজাকে। করে বললেন, হুজরত। ঢাকায় এসে ইস্তক শুধু তো আরামই করছি। আপনি যেখানে মালিক—সেখানে কারও তকলিফ হতে পারে?

শীতালক্ষ্যা আর বুড়িগঙ্গার মাঝামাঝি জায়গায় ঢাকাকে পাহারা দিতে কিল্লা। সেখানে চারদিক মুখ করে গুটি বারো কামান বসানো। শাহজাদার সঙ্গে বুড়িগঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে সবই চোখে পড়েছে ব্রাউটনের। এখানে রোদ পড়ে এলে নদীর বুকে ভেসে বেড়ালে সারা শরীর জুড়িয়ে আসে। আগ্রায় যমুনার বুকে ভেসে বেড়ানোর মতো জল তো সব জায়গায় নেই। শাহজাদা সুজা জীবনটা হালকা করে নিতে পারেন। শাহী কড়াকড়ির ভেতরেও আর পাঁচটা দিকে এই নওজওয়ান সুবেদারের নজর থাকে।

ঢাকায় ঢোকার আগে দুটি ইটের সেতু পেরিয়ে এসেছেন ব্রাউটন। তখন বুড়ি-গঙ্গার দুই তীরেই পাঁচ-ছ'টি করে মিনার দেখেছেন। তার সব ক'টিতে মানুষের শুকনো কাটা মুণ্ডু ঝোলানো। ওরা শাহী সড়কে দস্যুগিরি করে ধরা পড়েছিল। তাই তো বললে মাঝি।

ঢাকা লম্বায় বেশ বড় শহর। বুড়িগঙ্গার উত্তর-কূল ধরেই সবাই বাড়ি করেছে। ফলে শহর দু'ক্রোশ ছাড়িয়ে গেছে।

গাড়ি এসে থামল বাংলার সুবেদারের মহলের সামনে। দেওয়াল ঘেরা। তার মাঝে খাড়াই উঠে গেছে সুবেদারি মহল। বেশির ভাগই কাঠের তৈরি। শাহজাদা সুজা বিশেষ খাতির করে ব্রাউটনকে দু'হাতে ধরে তাঁর নিজের মহলে চললেন। যেতে যেতে শাহজাদা বললেন, আপনি ছিলেন বলেই হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম —শাহজাদী জাহানারা বেঁচে উঠলেন—

ব্রাউটন কিছু না বলে শাহজাদার মুখে তাকালেন। তিনি মনে মনে অবাক হয়েছেন। তাহলে মুঘল শাহীতে ভাই দিদিকে ভালবাসে? বহুবছর ধরে মুঘল শাহীর কাছাকাছি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল—শাহীর মানুষদের ভেতর আর যাই থাকুক—ভালবাসা বস্তুটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সন্ধেরাত ঘুঙুরের বোলে জমজমাট হয়ে উঠল। শাহজাদা সুজাঙ্গীর বসেছেন সুবেদারি মসনদে। তাঁর আশপাশে বসা দু'চারজন আমিরকে চিনতে পারলেন ব্রাউটন। এরা ইরান থেকে আসা সিয়া। আগ্রা-জাহানাবাদের দরবারে এরা এক কোণে পড়ে থাকত।

হালকা ঝুমুরের তালে এক দঙ্গল মেয়ে আকাশি রঙের ঘাগরা উড়িয়ে

শাহজাদার সামনে বেলেহাঁস হয়ে নাচল। এই এক জায়গায় বসে তো—ফড়িং দেখে আবার জায়গা বদলে আরেক জায়গায় গিয়ে বসে। এমন নাচ তো দেওয়ান-ই-খাসে দেখা যায় না। শাহজাদা রসিক সমঝদার। নাচের এক এক তুর্কিতে সুজা খেয়িল্লা উপ্‌ড়ে করে আশরফি ছুড়ে দিচ্ছেন। আর অমনি বেলে হাঁসের দল কুড়িয়ে নিচ্ছে।

ব্রাউটন নড়ে চড়ে বসলেন। এর ভেতর খয়রুন্নেসার মেয়ে কাঞ্চনবালা আরশি কোথায়? তার খোঁজেই তো ঢাকায় আসা ব্রাউটনের। সুবেদার শাহজাদার দাওয়াত রাখাও হল—আবার কাজের কাজও হয়ে গেল।

রাত বাড়তে আরশি একা শাহজাদার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখখানি গম্ভীর। পানের রসে ঠোঁট লাল। কালো চোখের দৃষ্টিও যেন ভারি হয়ে উঠেছে। ঢাকায় এসে আরশি যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। ক'জন মাঝবয়সী মেয়েলোকের মাঝখানে আরশির মা খয়রুন্নেসাকে এতক্ষণে দেখতে পেলেন ব্রাউটন। খুব মন দিয়ে জাঁতিতে সুপুরি কুচোচ্ছে। এটা কি সুপুরি কুচোনোর সময়—? না, দেমাক দেখানোর ভঙ্গি? আসলে—দ্যাখো আমার মেয়ে আরশি কতটা সুন্দরী।

ব্রাউটনের মন বলল, একজন মানুষ এত সুন্দর হয় কেন? সুন্দর হয়ে সব যে ওলটপালট করে দেয়। আরশি তখন বর্ষার মেঘ দেখে ময়ূরের ভঙ্গি করে সুবেদারি দরবারে আগাগোড়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পোশাকও ময়ূরের মতো। কোমরের চারদিকে খুব সুন্দর করে ময়ূরের পালক গুছিয়ে বসানো হয়েছে। সেই দশাতেই আরশি বসছে—উঠে দাঁড়াচ্ছে লাফিয়ে, জায়গা বদলাচ্ছে। আবার পায়ে হিন্দুস্থানের দরবারি নাচের কাজ। সঙ্গে বাঁশি, মন্দিরা।

নাচ একসময় ভাঙল। ব্রাউটনের তখন আচ্ছন্ন অবস্থা। শাহজাদা উঠে দাঁড়ালেন। আমিররাও দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখাদেখি। বাতাসে বুড়িগঙ্গার ঢেউ। এলোমেলো। তাতে সুবেদার মহলের বাতিদানগুলোর শিখা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে।

কেউ কেউ চোখের ধমকে ব্রাউটনকে উঠে দাঁড়াতে বলছিলেন। কিন্তু সে সব দিকে কোনও খেয়ালই নেই ইংলিশস্তানের ইলচির। তিনি সার দিয়ে দাঁড়ানো কাঞ্চনবালাদের ভেতর সিধে আরশির মুখে তাকিয়ে। আরশিও চোখের পলক না ফেলে এই ভিনদেশি লালমুখো মানুষটির দিকে তাকিয়ে। ভাবখানা—আমার জন্যে তুমি আগ্রা থেকে এতটা পথ ভেঙে ঢাকায় এসেছ? সেটা যেন কত বড় কৃতিত্ব—মুখে এমনই একটা ভাব করে তাকালেন ব্রাউটন।

শেষে সুবেদার শাহজাদা সুজার মুখে নিজের নামটি শুনতে পেয়েই গেব্রিয়েল ব্রাউটন তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন।

সুজা তখন ফরমানি গলায় বলে চলেছেন—

—এখন থেকে বন্দর পিপলিপত্তন, বন্দর বালেশ্বর, বন্দর হুগলিতে ইংলিশস্তানের জাহাজকে কোনও কিছু দিতে হবে না।—বলেই শাহজাদা সুজা গেব্রিয়েল ব্রাউটনের মুখে তাকালেন।

ব্রাউটন ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলেন। তাঁর মুখে কোনও কথা নেই। চোখ দুটো যেন ছন্নে পাওয়া।

কে একজন বলে বসল, তাহলে বন্দর রিষড়াই বা বাদ যায় কেন ?

তার জবাবে একজন সিয়া আমির পরিষ্কার গলায় বললেন, ওখানে যে গ্রিক জাহাজিদের কুঠি রয়েছে।

গেব্রিয়েল ব্রাউটন আগ্রা-জাহানাবাদের শাহী কেতায় রীতিমত রপ্ত। তিনি তসলিম জানিয়ে বললেন, খোদাবন্দ—

সুবেদার শাহজাদা সুজাংগীর রীতিমত অস্থির হয়ে পড়লেন। চেঁচিয়ে বললেন, আঃ! আপনি হাজার হোক ইংলিশস্তানের ইলচি। তা ছাড়াও এতবড় হেকিম। আসল কথাটা বলুন না—

—আজ যে সুবিধা আপনি দিলেন—সে জন্যে যুগ যুগ ধরে ব্রিটেনের মানুষ আমায় শুক্রিয়া জানাবে। তারা শুল্ক না দিয়েই কোম্পানি বাহাদুরের মারফত হিন্দুস্থানের চিনি থেকে পশম—রেশম থেকে গন্ধক—সবসময়ই কম দামে পাবে। কিন্তু আমার নিজের জন্যে যে আপনার বরাবর একটি আর্জি আছে শাহজাদা।

—বলে ফেলুন—আপনার জন্যেই আমাদের বাজি আজও সুস্থ হয়ে বেঁচে আছেন। আমার সুবা বাংলা আর ওড়িশা। তাই আমার বন্দরগুলোর সুবিধা তো আপনি পাবেনই—তাছাড়া আমাদের বাজিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে আপনার যে-তোফা চাই তারই বন্দোবস্ত হবে।

—হজরত। আমি যে-তোফা চাই তা আপনার হাতের মুঠোয়।

সারা দরবারের দমবন্ধ হয়ে এসেছে। কী তোফা চাইতে পারেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন ? খয়রুন্নেসার হাতের জাঁতি থেমে এসেছে। তাতে আধো কাটা সুপুরি।

—আঃ! বলেই দেখুন না—

—হজরত। আমি ওই আরশিকে চাই—

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনবালা আরশি খুশিতে, আনন্দে—আর তা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টায় মুখ নামিয়ে নিল। বিপদ বুঝে তার মা খয়রুন্নেসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুবেদার সুজা আলাদা করে কারও নাম জানেন না। তিনি বললেন, আরশি ? সে কি ?

—হজরত। ওই কাঞ্চনবালা—

গেব্রিয়েল ব্রাউটনের দেখানো আঙুল বরাবর মুখ নামানো মেয়েটিকে দেখে সুবেদার সুজা হো হো করে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, মঞ্জুর। মঞ্জুর !!

আর অমনি বড় বড় পা ফেলে তাজা নওজওয়ানের মতোই গেব্রিয়েল ব্রাউটন লজ্জায় ভেঙে পড়া আরশির সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই এক ঝটকায় তাকে নিজের বাঁ কাঁধে বসিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়েও গেলেন ব্রাউটন। যে সারেঙ্গি-ওয়ালা এতক্ষণ আরশির ময়ূর নাচে ছড় টানছিল—সে ব্রাউটনের বেরিয়ে যাওয়ার ভেতর কালেংড়ার ছন্দ পেল। অমনি সে কালেংড়া গত বাজিয়ে দিল। তার সঙ্গে দিগর ঢোল আড়ঠেকা দিতে লাগল। যেন আগে থেকে ঠিক করে রাখা সঙ্গত।

সারা দরবার একই সঙ্গে হো হো হাসিতে ভেঙে পড়ল।

ওদিকে জাহানাবাদ ছাড়িয়ে পুরনো দিল্লির গা ধরে যমুনা যেখানটায় আধখানা চাঁদ হয়ে তীর বরাবর সব জমা জল এক জায়গায় করে বিশাল এক দিঘির চেহারা দিয়েছে—সে জল ঘেঁষে শাহজাদা দারার নয়া হাভেলি—নিগমবোধ মঞ্জিল সকালবেলার রোদে ঝকঝক করছে। নয়া রাজধানী জাহানাবাদ যাবার পথে ঘোড়সওয়ার থেকে ফৌজী রসদ যোগানদার—সবাই ওই মঞ্জিলের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। যদি শাহজাদাকে একবার চোখের দেখা দেখা যায়। শাহজাদা নিজের হাভেলিতে নিজের মতো করে থাকেন। সেই থাকাটা কেমন? তখন কি তিনি দরবারি পোশাকে থাকেন? এমন হাজারো জানার ইচ্ছে নিয়ে প্রায়ই মানুষজন ভিড় করে নিগমবোধ মঞ্জিলের সামনে। সকাল থেকে বেশি রাত অবধি তাই মঞ্জিলকে ঘিরে সাধারণ মানুষের নানান জানার ইচ্ছে—নানান জিজ্ঞাসা।

এরকমই এক সকালে ঘোড়সওয়াররা এসে মঞ্জিল ঘিরে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল। ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষজনকে রাইসিনার দিকে হটিয়ে দেওয়া হল। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ওইসব খেদানো মানুষজন দেখতে পেল—

হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান তাঁর আটঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছেন। সঙ্গে দক্ষিণের চার সুবার সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর।

নিগমবোধ মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন শাহজাদা দারাশুকো।

—এই তোমার হাভেলি?

দারা মাথা নিচু করে বললেন, এখানে নিজ ন আমার পড়াশুনোও করতে পারি হজরত।

বড় ভাইয়ের মুখে পড়াশুনো কথাটা শুনে চমকে হেসে তাকালেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তাঁর ঠোঁট ভেঙে পড়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে তুলল। সে ভাঙা হাসি শাহজাহান কিংবা দারাশুকো কারও চোখেই পড়ল না। বরং দারা দেখলেন, পড়াশুনো কথাটির পর থেকে বাদশার চোখে সম্ভ্রমের আভাস।

শাহজাহান বললেন, হ্যাঁ। দেওয়ানখানা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। নয়তো সুবেদারির ঝক্কি এসে তোমার ঘাড়ে চাপবে। মাথা তুলতে পারবে না শাহজাদা।

—আপনি এই প্রথম এলেন।

—আসব আসব করে আসা হয়নি।—বলতে বলতে হিন্দুস্থানের বাদশা সদর ঘরে সুখদোলার ওপর হিন্দুস্থানের একখানি বিখ্যাত বই দেখতে পেলেন। এ গ্রন্থ কে না চেনে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে হিন্দুস্থানের বাদশার অভিষেকের সময় যখন খুৎবা পড়া হয়—তখন হিন্দু শিরোমণিরা এই বই থেকে পড়ে বাদশার শাহীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

ভগবদ্গীতা। তার পাশে ছড়ানো আর দু'খানি বই শাহজাহান চিনতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন—তাঁরা এসে পৌঁছবার আগে অব্দি শাহজাদা এখানে বসে পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে এই মাত্র উঠে গিয়ে দারা তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে। মনে মনে বাদশা বললেন, ভাল—ভাল শাহজাদা পড়ুক। জানুক

দেখুক। জ্ঞানী হয়ে উঠুক। জ্ঞানীর আত্মাজ্ঞান হওয়ার সুখ আলাদা। যে কোনও শাহীর শাহজাদা—সুলতান মানে তো কিছু বদরাগি, বেহিসেবি, ফূর্তিবাজ নওজয়ান। সে তুলনায় আমি তো খুশনসিব। দারার মতো আওলাদ ক'জন ইনসানের হয় ?

ভগবদ্গীতার পাশের দু'খানি বই শাহজাদা আওরংগজেব এগিয়ে এসে নেড়ে চেড়ে দেখলেন—কিন্তু ওদের নাম পড়তে পারলেন না। না পেরে তিনি বড়ে ভাইয়ের মুখে তাকালেন।

দারা বললেন, ওখানা যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। আর ওই চটি বইখানি হল নাটক—প্রবোধচন্দ্রোদয়—

এ কথায় আওরংগজেবের ঠোঁটে আবার তাচ্ছিল্য এসে দাঁড়াল।

তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দারা বললেন, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণের ফারসি তর্জমা হয়েছিল পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার আমলে। সে তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না।

স্পষ্ট বললেন না আওরংগজেব। মনে মনে বললেন, বাঁচা গেছে।

এর ভেতর বাদশা শাহজাহান জানতে চাইলেন, আলি মর্দানকে তাহলে কোথায় কাজে লাগালে ?

—আব্বাহুজুর। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—ওখানে মেঝের কাঠের পাটাতন সরালেই নীচে তায়খানায় যাবার সিঁড়ি।

— তাই ? বলে বাদশা সরে দাঁড়ালেন। সরে দাঁড়ালেন আওরংগজেবও। দারা দূরে মেঝের গায়ে উঠে থাকা একখানি কাঠের দাঁড়িতে চাপ দিতেই নীচে তায়খানায় যাবার সিঁড়ির মুখে পাটাতন উঠে গেল। সেখান থেকে নতুন আলো যেন ওপরে উঠে আসছে।

নীচে নামতে নামতে বাদশা বললেন, এ আলোর ব্যবস্থা কোত্থেকে করল আলি মর্দান।

—খুব সোজা আব্বাহুজুর। ওপরের ঘরগুলো জমিন থেকে বেশ উঁচুতে বানানো হয়েছে। ফলে নীচে তায়খানার ঘরগুলোয়—যমুনার বুক থেকে আলো আর হাওয়া এসে লাফিয়ে পড়ছে। রীতিমত ঠান্ডা—আর নির্জন।

সব ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বাদশা শাহজাদা দারার মুখে তাকালেন। তাকিয়ে জানতে চাইলেন, তুমি হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা। তোমার কাছে শাহীর দাবি অনেক।

নীচে তায়খানার ঘরগুলো এমনই—সেখানে ওপরের দিল্লি-জাহানাবাদের কোনও আওয়াজই পৌঁছয় না। আবার পাশেই যমুনার বয়ে যাওয়া জলের অবিরাম ভাঙাভাঙি। সেই সঙ্গে জলপাখিদের কিচিরমিচির ডাক। হু হু হাওয়া।

শাহজাদা বাদশার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন।

শাহজাহান বললেন, এই ঠান্ডার শান্তি—এই নির্জন তায়খানা—এসব নিয়ে তুমি কী কর ?

—নিজেকে ভাবতে পারি আব্বা হুজুর। নিজের ভাবনা ভাবতে পারি।

—যাকে শাহীর কথা ভাবতে হবে।—সে কি শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে।

শাহজাদা ঘাবড়ালেন না। এমন কাছে কখনও তিনি নিজের আব্বাহুজুরকে পাননি। স্বচ্ছন্দ গলায় বললেন, এই দুনিয়ার মালিকের কথা ভাবি। তার হাতে আমি, আপনি, শাহী—সবই।

হঠাৎ বাদশার খেয়াল হল, শাহজাদা আওরঙ্গজেব তো সঙ্গে নেই। তিনি দারার দিকে তাকালেন। আওরঙ্গজেব কোথায় ?

—দেখছি না হজরত। ও ঘরে হবে হয়তো।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখা গেল—সেখানেও আওরঙ্গজেব নেই। শাহী স্বভাবে—কেতায় শাহজাদা বা বাদশা সহজে অস্থির হন না। শাহজাদার তায়খানা আগাগোড়া ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাদশা।

শেষে শাহজাদার সঙ্গে ওপরে উঠে এলেন। এসেই অবাক। নীচে তায়খানায় নামার সিঁড়ির মুখে শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর দাঁড়িয়ে। পাহারার ভঙ্গিতে। হাতে খোলা তলোয়ার।

—কী ব্যাপার ? তুমি এখানে ?

আওরঙ্গজেব পাহারার তটস্থ ভঙ্গিতে বললেন, আপনি নীচে নেমে গেলেন। আমি তাই তলোয়ার বের করে দাঁড়িয়ে আছি।

আরও অবাক হলেন বাদশা শাহজাহান। শাহজাদা দারাও খুব অবাক। বাদশা জানতে চাইলেন, কেন ?

—হিন্দুস্থানের বাদশা মাটির নীচে তায়খানায় গেছেন। কোনও পাহারা নেই ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে—

—এটা তোমার বড়ো ভাই শাহজাদা দারার মঞ্জিল। আমি তোমাদের আব্বাহুজুর। নিজের আওলাদের তায়খানা দেখতে নীচে নেমেছি। এখানেও পাহারা !

—নীচে নেমে হিন্দুস্থানের বাদশার বিপদ হতে পারত হজরত।

—কী বিপদ !

—কেউ যদি ওপর থেকে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিত। তা হলে তো বাদশার জীবন বিপন্ন হতে পারত। এই আশঙ্কায় আমি পাহারায় ছিলাম।

শাহজাহান শুধু বললেন, ওঃ !—বলে তিনি রাগে নিগমবোধ মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে এলেন।

দুপুরের জাহানাবাদ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। বাইরে থেকে শাহীর ভেতরকার অদৃশ্য ভূমিকম্প তখন তখনই টের পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার মুখে জাহানাবাদের আসমানে থমথমে আঁধি এসে দাঁড়াল। নীচের জমি, লালকিল্লা, রাইসিনা পাহাড়ের প্রান্তর—কোথাও একটু বাতাস নেই। যে কোনও মুহূর্তে সারাদিনের গরমের পর আসমান থেকে ধুলোর ঝড় রাজধানীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ভূমিকম্পের চিড় এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অথচ এক দুপুরে সব ওলট-পালট।

ঠিক এই সময় শাহী গোসলখানায় প্রথম দীপশিখাটি জ্বলে উঠল। অন্ধকারে ফাঁকা দেওয়ান-ই-খাসের চেহেল সেতুনের পাশে দাঁড়িয়ে রৌশনআরা। তাঁর চোখ দূরে গোসলখানার একা দীপশিখাটির দিকে। রৌশন জানেন—এখন ওখানে তাতারনিরা হিন্দুস্থানের বাদশাকে আতরের ঠাণ্ডা খুসবুর ভেতর মুলতানী মাটি মাখিয়ে ডলাই মলাই করছে। নাহানের পাট শেষ হলে বাদশা সন্ধ্যার জরুরি শলাপরামর্শে বসবেন। যা করার—তা ওই শলাপরামর্শের আগেই করে ফেলতে হবে। হিন্দুস্থানের সব তাগদ একটি মাত্র ফোয়ারা। সে ফোয়ারার নাম বাদশা। বাদশা যদি একবার পাকাপাকি ফরমান জারি করে বসেন তো সে হুকুম পালটানো কঠিন।

রৌশন শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, এলাহাবাদের সুবেদারের সামনে কিছু বেফাঁস বলেছিলে?

আরও অন্ধকারে—একেবারে দেখা যায় না—দেওয়ান-ই-খাসের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তিনি বললেন, কে সুবেদার?

রৌশন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, বাকি বেগ।

—সেই খোজাটা!

—তা বললে চলবে কেন ছোটে ভাই! বাকি বেগ শাহজাদা দারাশুকোর অতি বিশ্বাসী খোজা। তাই তাকে বড়ে ভাই সুবা এলাহাবাদের নায়েব সুবেদার করে বসিয়েছেন। আব্বাহুজুরও তা মেনে নিয়েছেন।

—আমিও একজন সুবেদার। বলতে পারো সুবেদার-ই-আজম। চার-চারটে সুবা আমি দেখে থাকি। আমি তো ফাঁকি না দিয়ে নিজেই সব দেখি। দেখে আসছি। আগ্রা কোনও তংখাই পাঠায়নি। অজন্মা গেছে। গেছে অনাবৃষ্টি। লড়াই। তবু তার ভেতর দেওয়ানখানায় আদায় উসুল করে খাজনাখানায় ঠিকঠাক খাজনা পাঠিয়েছি। অথচ আমার বেলাতেই!

রৌশনআরা কোনও কথা বললেন না। চুপচাপ তিনি ছোটেভাই আওরঙ্গজেবকে কথা বলাতে চান। কথা বললে—চাপা রাগ বেরিয়ে যায়। তা হলে অঘটন কিংবা বেফাঁস কিছু ঘটার বিপদটাও কেটে যায়।

—যারা গরহাজির থেকে বকলমে সুবা চালায়—আগ্রায় বসে না-পাক অবিশ্বাসী সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওঠা বসা করে—কাফেরদের যোগজাগ, গান-বাজনায় মেতে থাকে—আগ্রায় বসে বকলমটি নাড়ে আর যত পাগল নিয়ে মেলা বসায় তো—দেখছি শাহীতে তাদেরই পোয়াবারো।

—এখন আফসোস করলে চলবে কেন ছোটে ভাই! এসব কথাই তুমি নিশ্চয় সেদিন দরবারে বলাকওয়া করেছ?

—করে থাকতে পারি। খেয়াল নেই।

—সেখানে বাকি বেগ ছিল?

—থাকতে পারে। খেয়াল নেই।

—থাকতে পারে না—ছিল। নিশ্চয় ছিল। না হলে এসব কথা কী করে বাদশার কানে ওঠে? বাকি বেগ সামান্য খোজা থেকে আজ নায়েব সুবেদার।

এলাহাবাদে সে নিজের দেখাশুনোর জন্যে ফ্রানসিসি হেকিম বুর্গকে পুষে থাকে। তার এই আরাম, আয়েশ—সবই বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোর দয়ায়। সে বড় ভাইয়ের স্বার্থ দেখবে না তো কে দেখবে।

—রৌশন। আমি ইনসাফির রাস্তা চিনি। ন্যায়বিচারের পথ বুঝি। দু'দুটো লড়াইতে দুশমনের মুখোমুখিই যে হল না—আগ্রা তাকে সওয়ার বাড়িয়ে দিল? আগ্রা তাকে হিন্দুস্থানে ফেরার পথে যত কিল্লা পড়েছে—সব জায়গায় কামান দেগে খাতিরদারি দেখানোর হুকুম দিল? তাজ্জব! সে হল সিপাহ-সালার? আর আমি পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার চল্লিশ বছরের পুরনো খোয়াব কামিয়াব করে বিজাপুর, গোলকুণ্ডাকে মুঘল ধ্বজের নীচে এনেছি—সারা দক্ষিণ শান্ত রেখেছি—আর আমারই নসিবে এই ইনাম জুটল?

—এসব কথাও নিশ্চয় এলাহাবাদের নায়েব-সুবেদার বাকি বেগের সামনে বলছে ছোটে ভাই।

—না। এসব কথা বলিনি।

—ভাল করে মনে করে দ্যাখো। অন্য কোথাও বলেছ?

—না মনে পড়ছে না।

—মনে করে দ্যাখো তো—বাজি শাহজাদী জাহানারার সামনে বলেছিলে কি?

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মনের ভেতর সব গুলিয়ে গেল। শাহী গোসলখানায় একটা একটা করে এখন অনেক শিখা জ্বলে উঠেছে। ভাইবোন—দু'জনেই জানেন—ওখানে এখন বাদশা জরুরি শলাপরামর্শে বসবেন। থাকবেন উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ। বাছাই কয়েকজন আমির। ফৌজি সিপাহ-সালার। খলিলুল্লা খাঁ। জাফর খাঁ। চাই কি বড়ে ভাই শাহজাদা দারাও থাকতে পারেন। আওরঙ্গজেবের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। ওখান থেকে একবার পাকা রায় ফরমান হয়ে বেরিয়ে পড়লে তা ওলটানো খুবই কঠিন।

—মনে করে দ্যাখো—

আওরঙ্গজেব প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, না। কিছুই মনে পড়ছে না। বলেও থাকতে পারি।

—তাহলে এটা বাজিরই খেলা। বাজিই সব ঘটাচ্ছেন। শাহজাদী জাহানারা এখন হিন্দুস্থানের শাহী বাদশা বেগম—একথা ভুললে চলবে না। তিনি সেরে ওঠায় হিন্দুস্থানের বাদশা দশ লাখ আশরফি বিলিয়েছেন। সাত সাতটা শাহী হাতিকে বাগোয়ানের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! তাঁর সেরে ওঠার সুবাদে।

—কী বলতে চাও রৌশন?

—আস্তে কথা বলো শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর! তুমি এখন একজন বেদৌলত শাহজাদা মাত্র। আজই দুপুরে তোমাকে বাদশা শাহজাহান দক্ষিণের সুবেদারি থেকে রেহাই দিয়েছেন।

আওরঙ্গজেব খুব চাপা গলায় বললেন, বলো বরখাস্ত করেছেন। আমার পাহারার ঘোড়সওয়ারদের রিসালা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বিকেলের ভেতর।

রোশনআরা আরও চাপা গলায় বললেন, ভুলে যেও না ছোটে ভাই—শাহজাহান বাদশা কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশা নন।

আওরঙ্গজেব দেখলেন—দেওয়ান-ই খাসের ফাঁকা অন্ধকার চাতালে কেউ যেন রোশনআরা নামে এক মুঘল শাহজাদীকে কুঁদে তৈরি করেছে—সেই খোদাই রোশন বুঝি বা জোরালো কোনও খায়েশ—তীব্র ইচ্ছা হয়ে ফুটে উঠছে। সে ইচ্ছার শেষ জানেন না আওরঙ্গজেব। জানতে গিয়ে ভয়ও করে।

রোশনআরা বললেন, আব্বা হুজুর যখন শাহজাদা খুররম—আমরা সব ভাই বোনই তখন বেশ ছোট। তখনই তিনি বাগী হলেন। আগ্রার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আমি, তুমি—আমরা সবাই তখন সেদিনকার বাগী শাহজাদা খুররমের সঙ্গে মাঠে ঘাটে—বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। তখন কিছুই বুঝিনি—কিন্তু আজ পেছনে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাই—

কেঁপে উঠলেন আওরঙ্গজেব—কী?

রোশনআরা দূরে আলো ঝলমল গোসলখানার দিকে তাকিয়ে। দু'চোখে কোনও পলক পড়ল না। শাহজাদা সেলিমও বাগী হয়েছিলেন। আকবর বাদশা তাঁকে ক্ষমা করেন। জাহাঙ্গীর বাদশাও শাহজাদা খুররমকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।

—ক্ষমা?

—হ্যাঁ আওরঙ্গজেব। নয়তো কোন দাদাসাহেব খুররমের মতো বাগীকে বলেন—তোমার দারাকে—তোমার আওরঙ্গজেবকে আমার কাছে গচ্ছিত রাখো? যে-দাদাসাহেবের কাছে অনেক আগে থেকেই আমাদের আরেক ভাই সুলতান সুজা বড় হচ্ছিলেন। শাহজাদা খুররম সেদিন ক্ষমা চাননি। চেয়েছিলেন সময়—দম ফেলার সময়—ফৌজ ফের গড়ে তোলার সময়। তাই তিনি সেদিন আগ্রা যাননি। যেতে গড়িমসি করেছিলেন। আগ্রায় গিয়ে ধরা দেননি। আমাদের দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার কাছে শাহজাদা খুররম ছিলেন আদরের শেখু বাবা! ভুলে যেও না শাহজাদা আওরঙ্গজেব—সময়, বয়সের জোর, তাগদ, মসনদের টান আমাদের আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানকে কঠিন, কঠোর করেছে। তিনি জাহাঙ্গীর নন। তিনি আকবর নন। নয়তো দ্যাখো না—আমরা যাতে কেউ বুঝতে না পারি—সেজন্যে কায়েতি হিন্দি শিখে তিনি দরকারে কায়েতি হিন্দিতে লিখে এদিকে ওদিক তাঁর হুকুম পাঠান।

আওরঙ্গজেব মনে মনে বললেন, তা সত্যি! তুমি যে অ্যাতো দিকে নজর রাখো রোশন—তা তো কোনও দিন ভাবিনি।

রোশনআরা বললেন, মসনদে পেঁছিতে শাহজাদা খুররমকে পার হতে হয়েছে তিন তিনজন শাহজাদাকে—খসরু, পরভেজ, শারিয়রকে। তাই তিনি মুহূর্তে হুকুম দিতে পারেন—আজ থেকে—এখন থেকেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব আর দাক্ষিণের সুবেদার নয়। মনে রেখো ছোটে ভাই—এই দাক্ষিণের সুবেদারি থেকেই শাহজাদা খুররম বাগী হয়েছিলেন। এই দাক্ষিণের সুবেদারি থেকেই শাহজাদা খুররম শাহী মসনদে বসে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান হয়েছেন। তাই

তোমাকেও তো বুঝেশুনে কথা বলতে হবে ছোটে ভাই। কোথায় বলবে—কখন বলবে—এসব তো তোমাকেই ঠিক রাখতে হবে।

—আমি ইনসাফির দিকে রৌশন। ইনসাফি বৈ আর কিছুর পরোয়া করি না আমি। ন্যায় বিচারই আমার পথ।

—সবাই মনে করে সে ন্যায়বিচারের দিকে আছে। ইনসাফি চেয়েছো। সুবেদারিও হারিয়েছো। এখন কী করবে?

—জানি না।—বলে চুপ করে গেলেন আওরঙ্গজেব।

—আমি জানি। বাদশা গোসলখানায় উজিরে আজমের সঙ্গে এক্ষুণি শলাপরামর্শে বসবেন। দক্ষিণের সুবেদারি নিয়ে ওখান থেকে একবার শাহী ফরমান বেরিয়ে পড়লে তখন আর তোমার বেদৌলতি রোখা যাবে না ছোটে ভাই। এখন অব্দি তোমার সুবেদারি হারানোর খবর চাউর হয়নি। সবাই জানেও না শাহজাদা। শুধু পাহারার এক রিসালা ঘোড়সওয়াররা জানে। তাতে কিছু যায় আসে না শাহজাদা। এখুনি ও ফরমান বেরবার আগে তা আটকাতে হবে। ও হুকুম বাতিল করতেই হবে।

—হবে বুঝলাম। কিন্তু কী করে হবে রৌশন? কী করে?

—অস্থির হয়ো না ছোটে ভাই। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এক্ষুণি তুমি শাহজাদী জাহানারার কাছে চলে যাও। তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কদমবুসি করো। শুধু তিনিই তোমার বেদৌলতি রুখতে পারেন।

—বাজি?

—হ্যাঁ বাজি। হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম শাহজাদী জাহানারা। সুরাট বন্দরের আয় যাঁর তাম্বুল খরচা। হিন্দুস্থানের বাদশার চোখের মণি। তিনি বললে যে কোনও হুকুম হিন্দুস্থানে বাতিল হয়ে যায়। বাদশা শুধু তাঁরই কথায় নিজের হুকুম পালটান—নতুন করে ভাবতে বসেন।

—কিন্তু বাজিই যে এ খেলা খেলেছেন—খানিক আগে বললে তুমি?

—বলেছি। তা খেলতে পারেন। খেললেও তোমার হয়ে বলতে বাজির বাধবে না। খেলার পরেও তিনি বলতে পারেন। আবার আব্বাহুজুরের কানে ও সব কথা বাজি নাও তুলে থাকতে পারেন।

—তাহলে আমার কথাগুলো আব্বাহুজুরের কানে কে তুলল রৌশন?

—নায়েব সুবেদার বাকি বেগ।

—এতটা সাহস হবে কি তার?

—সে নিজে তো আর বাদশার মবারকে গিয়ে তাঁর কানে কথাগুলো তুলবে না ছোটে ভাই। সে জানাবে তার মালিককে।

—বড়ে ভাইকে?

—হ্যাঁ শাহজাদা। জানাবে শাহাজাদা দারাকে। বাদশার আরেক চোখের মণি এবার বুঝে নাও নিজেই।

আওরঙ্গজেব দেওয়ান-ই-খাসের এই অন্ধকারের ভেতরেই নিজের বুকের কাছে মাথাটি নামিয়ে আনলেন। লজ্জায়। ভাবনায়। আগ্রা দুর্গ হিন্দুস্থানের কলিজা।

এই কলিজ্জার গলিতে গলিতে এর কথা ওর কানে তোলা। ফিসফিসানি। ষড়যন্ত্র। শেষে বড়ো ভাইও।

রোশনআরা প্রায় ধমকে উঠলেন। দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও—এক্ষুণি যাও বাজির ঘরে। তিনি তাঁর ঘরে শুয়েই আছেন। তাঁকে গিয়ে বলো—তুমি বেকসুর। তুমি তাঁর ছোটে ভাই। তোমার কথা ঠিক শুনবেন।

—তোমারও তো আমি ছোটে ভাই রোশন?

—কোথায় জাহানারা! আর কোথায় রোশনআরা! বাজির সবসময় ওঠা বসা বাদশার সঙ্গে—ভিনদেশি ইলচিমশাইদের সঙ্গে—উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে বাদশা মনসবদার করেন—সুবেদার করেন—সওয়ার বাড়ান। নতুন নতুন খাজনা বসান বাদশা তাঁরই সঙ্গে কথা বলে।

—তুমি নিজে বাজিকে বললে হয় না?

—না। হয় না। আমার বলার চেয়ে তোমার বলায় কাজ হবে অনেক বেশি। যাও।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব প্রায় দৌড়ে জাহানারার মহলের দিকে চলে গেলেন।

গিয়েই আবার ফিরে এলেন তিনি। বললেন, আমি বললেও কি হবে রোশন?

—হবে শাহজাদা। বলার মতো করে বলবে। যিনি সেরে উঠলে লাখো লাখো আশরফি বিলি হয়—সাজা পাওয়া আমলা রেহাই পায়—তাঁকে তো সেইভাবেই বলতে হবে শাহজাদা। মনে রেখো শাহজাদা আওরঙ্গজেব—তোমার বেদৌলতি যেমন রুখতে হবে আজ—তেমনই একদিন অমন লাখো লাখো আশরফিও তোমায় মজুত করতে হবে।

—আশরফি? কেন রোশন?

—বা! একথা তুমি জানো না? হাসালে শাহজাদা। আশরফি হাতে না থাকলে কে হিন্দুস্থানে কবে মনের মতো করে ফৌজ গড়ে তুলতে পেরেছে? এবার দৌলতওয়ালা সুবেদার হয়ে তুমি তোমার দৌলতাবাদের মসনদে ফিরে যাবে দাক্ষিণে। মনে রেখো শাহজাদা খুর্‌রম দক্ষিণের সুবেদারিতে বসেই মনের মতো করে পছন্দসই ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর চোখ ছিল আগ্রার ওপর। যাও—

এবার আর ফিরে না এসে শাহজাদা আওরঙ্গজেব সিধে জাহানারা মহলে গিয়ে ঢুকলেন।

অন্ধকার ফাঁকা দেওয়ান-ই-খাসের চেহেল সেতুনের পাশে দাঁড়ানো শাহজাদী রোশনআরাকে হঠাৎ এসে কেউ দেখতে পারে না। রোশনআরা খানিক পরে দেখলেন—গোসলখানা জুড়ে যেন আলোর বান ডাকছে। তার মানে আন্দ্রের সবকটা বাতিদান এই মাত্র জেলে দেওয়া হল। বাইরে দূর থেকে গোসলখানার ভেতরটা দেখা যায় না।

রোশন তাঁর মনের চোখে কিন্তু সবটাই দেখতে পাচ্ছিলেন। সে ছবিটা অনেকটা এরকম : হঠাৎ গোসলখানার দুয়ার খুলে গেল। বাইরের গরম হাওয়া

ঢোকায় ঠান্ডায় খোশমেজাজি বাদশা ভ্রু কুঁচকে দরজার দিকে তাকালেন। তাকিয়েই চমকে উঠলেন। একি জাহান? তুমি এই শরীরে? এখন? এখানে?

অনেক কষ্টে সবে সেরে ওঠা শাহজাদী জাহানারা ঝুঁকে কুর্নিশ করতে গেলেন। সবটা পারলেন না। বাদশার চোখের চকিত চাহুনিতে তটস্থ তাতার বাঁদিরা ছুটে গিয়ে শাহজাদীকে ধরল। দু'পাশ থেকে। তারপর তাঁকে একজন আমিরের খালি কুর্শিতে বসিয়ে দিল।

বাদশা-বেগম জাহানারা হাঁপাচ্ছিলেন। তাই দেখে বাদশা শাহজাহান হাত তুলে বললেন, থাক। এখন কোনও কথা বলতে হবে না। তুমি অ্যাতো পরেশানি নিজের ঘাড়ে নিলে কেন জাহান? আমি তো নিজেই রাতে তোমার মহলে যেতাম। তখনই যা বলার বলতে—

জাহানারা একবার বাদশার চারপাশে তাকালেন। তাঁর সে দৃষ্টিপথে পড়লেন—উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ। বাদশার দুই ভায়রা ভাই—খলিলুল্লা খাঁ আর জাফর খাঁ। জাহানারার মামা সুবেদার শায়েস্তা খাঁ। জাহানাবাদ সাজিয়ে তোলার কারিগর আলিমর্দান খাঁ। মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী আর ফৌজের সিপাহসালার। তাছাড়া কয়েকজন বাঘা বাঘা আমির। হুকুম-বরদার বাছাই ক'জন আহেদী। শাহজাদী কোনওরকমে বলতে পারলেন, হজরত। ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

বাদশার চোখে কোনও পলক পড়ে না। তিনি মুখ তুলে তাকাতেই ওঁরা সবাই নিমেষে মিলিয়ে গেলেন।

বাদশা এবার মুখ তুলে তাকাতেই শাহজাদী বললেন, বয়স মোটে ছাব্বিশ। কিন্তু পুরোদস্তুর বাহাদুর বটে। কামিয়াব—আর লায়েকও বটে। তার প্রমাণও সে দিয়েছে। তাজা, নওজওয়ান—

—থামো। থামো জাহানারা। তুমি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কথা বলছ।

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর। আমি দাক্ষিণের সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরের কথাই বলছি।

—সে এখন আর সুবেদার নয় দাক্ষিণের।

—জানি হজরত। আমি তার এই বেদৌলতি মানতে পারছি না আলমপনা। কেন সে এমন নওজওয়ান বয়সে বে-ইজ্জত হবে?

—আর তিন শাহজাদার কাউকে তো বেদৌলত হতে হয়নি। আগ্রায় এসেই সবার নামে বিষ ঢালবে—আর সে একাই নাকি ইনসাফির দিকে! আগ্রা তাকে নাকি বে-ইনসাফির দিকে ঠেলে দিয়েছে! বোঝো কথা!

—এবারটি আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করুন আব্বাহুজুর!

—তোমাকে তো আমার কিছুই না দেওয়ার নেই জাহান—

নিগমবোধ মঞ্জিলের মাটির নীচে তায়খানায় মোট তিনখানি ঘর। শাহী স্থপতি আলিমর্দানের নকশা মতো এই মঞ্জিল আর তার তায়খানা তৈরি হয়েছে। বাইরে ওপরে চড়া রোদে, ধুলোয় যখন নয়া রাজধানী জাহানাবাদ অস্থির—তখন নীচে তায়খানায় বসে যমুনার বুক ছুঁয়ে আসা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। শব্দ বলতে যমুনার জলভাঙার অবিরাম শব্দ। নলখাগড়া বনে পাখিদের কিচিরমিচির শুনেই সময় কেটে যায় শাহজাদা দারাশুকোর। পাখিরা ঠোঁটে করে খাবার খুঁটছে—কখনও ছোঁ মেরে জল থেকে কুচো মাছ তুলছে। সেসব দেখতে দেখতে দারার মনে হল—মানুষ নিজে সংসার করে খোয়াব দেখে কিছু বানিয়ে তোলার। সে-বানিয়ে তোলায় নিজের আওলাদকে বড় করে তোলার স্বপ্ন থাকে। থাকে হাভেলি বানাবার। আরও থাকে দুঃসময়ের জন্যে মোহর-আশরাফি, জমি-জিরেত করার আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু সেই আওলাদ বড় হয়ে তার নিজের মন-পসন্দ রাস্তায় চলে। নিমেষে নিজের আব্বাহুজুরের গড়ে তোলা রাস্তা বাতিল করে দেয়। তৈমুর চেয়েছিলেন —তাঁর ছয় নাতি একদিন দুনিয়া শাসন করবে। সেজন্যে তিনি লিখে যান—মালফুজাত-ই-তৈমুরী। তৈমুরের জীবনী ও বিধান। এক চাঘতাই মুঘল আরেক চাঘতাই মুঘলের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? খুনের রিস্তা থাকলে দুই শাহজাদা নিজেদের ভেতর কেমন সম্পর্ক গড়ে তুলবে? তাগদের লাগাম যার হাতে থাকবে সে তার আশ্রয়ে কেমন ভাবে রাখবে অন্য মুঘলদের? এসব কথা সবিস্তারে বলে গেছেন তৈমুর শাহ।

কিন্তু তাঁর কথা শুনে কি চলেছেন পরেকার মুঘলরা? শাহজাদা সেলিম? বাদশা জাহাঙ্গীর? শাহজাদা খুর্রম? বাদশা শাহজাহান? আমরাই কি শুনেছি? আমি? শাহজাদা সুজা? শাহজাদা আওরঙ্গজেব? শাহজাদা মুরাদ? শাহজাদী রোশনআরা? পোড়ো রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আমাদের খেলা বেড়ানোর সেই ছেলেবেলা কোথায় গেল? কোথায় গেল সেইসব ভালবাসা? অভিমান? হাসি ঠাট্টা? রুবাই আওড়ানো?

আব্বাহুজুর এখন একজন শানদার বাদশা। দুনিয়ার ভেতর হিন্দুস্থান দেশে দেশে নানান শাহের মনে হিংসা পয়দা করে থাকে। রেশম, পশম, চিনি নিয়ে হিন্দুস্থানের জাহাজ দরিয়া চষে বেড়ায়। সেই ছেলেবেলার বাগী শাহজাদা আজ এই হিন্দুস্থানের এমনই এক বাদশা যিনি কিনা সারা হিন্দুস্থানে সবরকমের বাগীপনাহ্ দুরমুস করে দিয়েছেন। তিনি এখন তৈমুরের মতোই খোয়াব দেখছেন—তাঁর চার ছেলে হিন্দুস্থানকে একদিন শাসনে রাখবে। আমরা কি তা করতে পারব?

আব্বাহুজুর একভাবে খোয়াব দেখেন। আমি খোয়াব দেখি আরেকভাবে। আকবর বাদশা এক বিবি এক ঈশ্বরের কথা ভাবতে পেরেছিলেন—কিন্তু একথা ভাবতে পারেননি—তাঁরই বিধানমত মুঘল শাহজাদীরা বিয়ে না করে সারাটা

জীবন কাটাবে কী করে? আব্বাহুজুর তাজমহলের চাঁদোয়ার পাথরের রং বাছতে বসে দিন কাবার করে দিতে পারেন—কিন্তু তাঁর চোখের মণি শাহজাদী জাহানারার মনের খবর নিতে সময়ই পান না।

আমি ভাবি বাজি একদিন ছত্রশালের গলায় মালা দেবে। তার জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠবে। কিন্তু আব্বাহুজুরের মাথায় এসব কিছুই আসে না। শাহজাদা সুজা রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে। আর শাহজাদা আওরঙ্গজেব তো ছত্রশালকে বাজির ভালবাসাটাই না-জায়েব—অন্যায় মনে করে অমন জানবাজ রাজপুতকে দাক্ষিণে ফেলে রেখেছে—তাঁর আগ্রা আসাই বন্ধ।

আসলে আমরা সবাই যে যার মতো করে খোয়াব দেখে থাকি। তাই শাহজাহান বাদশা ডুবে আছেন তাঁর নিজের খোয়াবে। সেই সব খোয়াব হল; কান্দাহার বলখ বদকশান, তাজমহল, লালকিল্লা, জামা মসজিদ, জাহানাবাদ, গোলকুণ্ডার হিরে, বদকশানের চুনি, হরনালা সুতোর মসলিন।

এই নিগমবোধ মঞ্জিল দেখাতে এনেছিলাম আব্বাহুজুরকে। বাদশা মাটির নীচে এই তায়খানা দেখতে এলেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব নীচে নামার সিঁড়ির মুখে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল। যদি কোনও ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে। যদি বাদশার জীবনের বিপদ ঘটে। এত ষড়যন্ত্র—এত বিপদের গন্ধ ও কোত্থেকে পায়? শাহজাদা দারার চোখের সামনে ছেলেবেলার ছোটে ভাই ভাসে। কালো চোখ—কালো ভ্রূ। সফেদ আওরঙ্গজেব আলাদা করে চোখে পড়ার মতো ছিল। সেই আওরঙ্গজেব? খোদাতালা—শাহী, তাগদ, মসনদ, আয়েস—সব পালটে দেয় ইনসানের?

রোশনআরা কখনও সরল চক্ষে তাকায় না। দু'চোখ সব সময় স্থির করে তাকায়। কী কিল্লা আগ্রা—কী লালকিল্লা—সব জায়গাতেই ওর হাঁটাচলা কেমন পা টিপে টিপে—গোলাম মানেই ওর কাছে কোড়া মারা।

আর মুরাদ বকস্! শাহজাদা মুরাদ সুবেদারি থেকে আগ্রায় এল তো শুধুই শিকার আর শিকার। হয় বাগোয়ানে জংগলে—নয়তো নারোয়ায়। দেহাতি মানুষ অনেকে পাকড়াও করে ঢেড়া পেটানোয় জুতে দেওয়া—কিংবা তাদের হাতে মশাল ধরিয়ে দেওয়া। কে থাকল—কে মরল—সেদিকে কোনও নজর নেই আয়েসি শাহজাদার। ঘেরাওয়ের ভেতর বুনো শুয়োর এসে পড়লেই হল। সে শুধু হাতির পিঠে গাদেলায় দাঁড়িয়ে বন্দুক দাগবে।

এরাই আমার ভাইবোন। আম্মিজান মমতাজমহল নেই। আছেন আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান—তাঁর নিজের খোয়াবের পেছনে তা দিয়ে চলেছেন। এর ভেতর আমি শাহজাদা দারাশুকো। মিঞা মীরের মুরিদ। মুল্লা শা বদকশানীর খানকায় তাঁর সঙ্গে নেচেছি। আসমান থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পাই।

বুঝতে পারি না কী করব? আমার একদিকে নাদিরা। আরেকদিকে রানা-দিল। এই দশায় আমার নিজেকে বড় অপরাধী লাগে। কোথায় বাজি চাঁদের আলোয় ছত্রশালের সঙ্গে ঘোড়া দাবড়ে চিতোরের পাহাড় রাস্তায় রাতচরা পাখির

কর্ণ—তীক্ষ্ন গলার আওয়াজ পেয়ে রাশ টেনে থামবে—নির্জন নিশীথকে অনুভব করবে—তা নয়—বাজির নসিবে জুটল স্রেফ আগুন। খোদাতালার করুণার শেষ নেই। আমরা বাজিকে ফিরে পেয়েছি।

খোদাবন্দ। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কোন্ পথে যাব? আব্বা-হুজুরের রণসাজ বড় ভারি লাগে। ভারি লাগে সুবেদারি। এর ভেতর কোথায় আনন্দ? মন তো ভরে ওঠে না। উটের কাতারের হিসেব, বন্দুকচীদের তংখা, সুড়ংগ খোঁড়ার বেলচাদের মাটি কাটার অংক—এই কি মনসবদারি? সবেদারি-মনসবদারির কোন্ জায়গাটায় উঁচু হওয়া যায়—যেখানে পেঁাছে মনে হবে আমার মাথায় এসে পাহাড়ি বাতাস লাগছে?

শাহজাদা দারার সামনে কাশ্মীর থেকে আনানো ভাল লেখার কাগজ। পাছে যমুনার বাতাসে উড়ে যায়—তাই একখানি মাকরানি পাথর দিয়ে চাপা। পাশেই দোয়াতদানী—কলম।

নিজের অস্থির মনকে এক জায়গায় করতে শাহজাদা কলম তুলে নিলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। শিকস্ত লিপিতে একটি রুবাই ফুটে উঠল। শাহজাদা রুমি, খশরু, হাফিজ, সাদি, জামির রুবাইয়ে ডুবে থাকেন এক একদিন। আজ তাঁর নিজের ভেতর থেকেই রুবাই বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাঁর মনের ভেতরকার আধো জাগা মন যেন কথা কয়ে উঠছে। তাঁর মন বলে উঠল—আমি কেমন করে বলি—হজরত আমার হুজুর? আমি তো তাঁর কাছে সামান্য কুকুর। সেই একেকে যখন জানি তখন সত্যের সংগে এক হয়ে যাই। প্রিয়তমকে শুধু আঁকড়ে থাকতে হয়। কাকে আঁকড়াব? নাদিরাকে? না, রানাদিলকে? আমার যে দু'জনকেই একইসংগে আঁকড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। যাকেই আঁকড়াই—তার দিকে তাকাতেও নেই। কারণ, যাকে ধরে থাকব—সে-ই ঈশ্বরকে দেখার পথে বাধা হতে পারে। ক্ষণেকের তরে আলাদা হয়ে বসো তার কাছ থেকে। থাকো ঈশ্বরবিহীন হয়ে ক্ষণকাল। দুনিয়াদারির হিরে জহরৎ তার কাছে যাওয়ার পথে বাধা। তার চাইতে আমায় ভুখা—নাংগা করে দাও খোদাতালা। মিশকিন করে দাও। শাহীগিরি সহজ। বরং সামান্যের সংগী হও। আশরফি বাড়লে তৃপ্তি হারাবে। পাগড়িতে যতই প্যাঁচ দেবে তা ততই ভারি হবে। জল ঢেকে রাখতে পারে না বরফের মুখ। হয়তো বা তার গায়ে রেখে যায় সামান্য চিহ্ন—

রুবাইয়ের এইসব ভাবনায় ডুবে থাকা শাহজাদার চোখ জোড়া বিশেষ কিছু দেখছিল না। তাঁর চোখের সামনে যমুনার পাড় ঘেঁষে নলখাগড়ার বন। তাতে পাখিদের কিচিরমিচির। পাখপাখালি। তায়খানার খোলা জানলা দিয়ে যমুনা ডিঙিয়ে আসা বাতাস। বর্ষার পর চার ধারের মাটি এখন রসস্থ। তাতে সকাল-বেলার রোদ পড়ে সব রস যেন শুষে নিতে চায়।

ঠিক এমন সময় সেখানে একজন বেশ বয়স্ক মানুষ এসে শাহজাদাকে কুর্নিশ করলেন। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

দারা কিন্তু হাসলেন না। কথাও বললেন না। তিনি তাঁর ভাবনায় ডুবে আছেন। সেই বয়স্ক মানুষটি যেন তা বুঝেই চলে যাবেন বলে যেই না পিছিয়ে

আসতে শুরু করেছেন—অমনি শাহজাদার ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। রীতিমত উচ্ছ্বাসে দারা বলে উঠলেন, ও কি ? এসেই চলে যাচ্ছেন বড়।

বয়স্ক মানুষটি মাথার পাগড়ি সামলে ফের কুর্নিশ করলেন। করে বললেন, আপনি ভাবনায় মেতে আছেন—তাই চলে যাচ্ছিলাম।

শাহজাদা দারাশুকোকে ব্যস্ত দেখে তাঁর মীর মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ চলে যেতে পারেন। কিন্তু হিন্দুস্থানের কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ তো এভাবে চলে যেতে পারেন না।

শাহজাদার মীর মুন্সি কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ হাসিমুখেই বসলেন। বসতে বসতে জানতে চাইলেন, লিখছিলেন—

—হ্যাঁ। অনেকদিন পরে ফের রুবাই আসছে। আমি কেমন কাঁপছি। কী একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে।

—দেখি—বলে শাহজাদার লেখা কাগজগুলো হাতে নিলেন চন্দ্রভান। নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। মনে মনে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মীর মুন্সির কপালে ভাঁজ পড়ছিল। ঠোঁটে চাপা হাসি। সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে চন্দ্রভানের চোখও বুজে যাচ্ছিল। যখন চোখ বুজে যায়—তখন দারা লক্ষ করেন—তাঁর মীর মুন্সি হাতের কাগজগুলো শক্ত করে ধরেন।

শাহজাদা সত্তরের কাছাকাছি এই চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে আব্বাহুজুর শাহজাহান বাদশার কাছ থেকে ধরে চেয়ে নিয়েছেন। দুসারিবার অভিযানে যাবার সময়। রীতিমত রসিক, পণ্ডিত, ফারসিতে উঁচু দরের কবি—আবার শাহী কাজকর্ম চালাতে ওস্তাদ। মানুষটি তাঁর জীবনের গোড়ার দিকটা মুল্লা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটির কাছে পড়াশুনো করেছেন। নাস্তালিক—শিকস্তা—দুই লিপিতেই সমানে লিখতে পারেন চন্দ্রভান। চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন আগ্রা আর লাহোরের পয়লা সারির স্থপতি আবদুল করিমের আছে। এখন বেশ কিছুকাল হল শাহজাহান বাদশার কাছাকাছির মানুষ। তাঁর দূত হয়ে কখনও কখনও অন্য রাজার সভাতেও গেছেন। যেমন বিজাপুরে। বাদশা কবি চন্দ্রভানকে এক হাজারি মনসবদারও করেন।

চোখ খুলে মীর মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ কাগজের শেষ রুবাইটি তুলে ধরে শাহজাদার কাছে জানতে চাইলেন, এখানে কী লিখেছেন ?

দারা তাঁর লেখা দেখে নিয়ে বললেন, ওঃ! ওখানেই আপনার চোখ আটকে গেল ?

—যাবে না কেন শাহজাদা ? এ রুবাই অন্য কেউ লিখলে কিছু এসে যেত না। কিন্তু এ রুবাই যে হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার লেখা।

শাহজাদা দারা একটু থতমত খেয়ে রীতিমত স্থির চোখে তাকালেন। তারপর বলতে লাগলেন, কুৎসায় ভরিয়ে তুলতে তুমি আমায় বলেছো নাস্তিক। সত্য বলে মানি সেই কথা—নিন্দা আর স্তুতি দুই-ই সমবিন্দুতে মিলেছে আমার কাছে। ইসলামের দুশো সত্তরটি সম্প্রদায়ই আমার ধর্ম—

পাথরের মতো বসে থাকা শাহজাদার মুখে তাকিয়ে চন্দ্রভান গম্ভীর হলেন কিছু।

দারা তখন বললেন, আমি কারও চেয়ে কম খাঁটি মুসলমান নই।

—আমিও শাহজাদা কারও চেয়ে কম খাঁটি হিন্দু নই।

শাহজাদা বললেন, দেখুন—আগ্রায়—জাহানাবাদে, মেরাঠে, আজমিরে কট্টররা আরও কট্টর হয়ে উঠছে। তারা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি নাকি নাস্তিক। না-পাক কাজকর্মে জড়িয়ে আছি। এরা কি জানে না—খোদ রুমি বলে গেছেন—অবিশ্বাসীর মূর্তি পুজোর পেছনেও একটা বিশ্বাস আছে—সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য একজন ঈশ্বর।

মুন্সি চন্দ্রভান সামান্য হেসে বললেন, আপনি যে কথা বলছেন—তা জ্ঞানের কথা। কিন্তু আপনি যে শাহী হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা। আপনাকে শুধুই জ্ঞানী হলে চলবে না শাহজাদা। জ্ঞানের সঙ্গে চাই কৌশল। আপনাকে কৌশলীও হতে হবে।

—এই একপেশে মূর্খের সঙ্গে কৌশলী হতে আমার ঘেন্না করে।

—তা বললে চলবে কেন!

—আজকের এই আধুনিক দুনিয়ায় ওরা বলছে, সত্য শুধু ইসলামেরই একচেটিয়া। অন্য সব ধর্মে যেখানে মূর্তি আছে—সেখানে সত্য নেই। এটা কি হতে পারে মীর মুন্সি? আপনি কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। আপনি বলুন।

—শাহজাদা। আপনাকে সাবধান হতে হবে। এমন কথাও চাউর করা হচ্ছে—আপনি নামাজ আদায় করেন না। রোজা রাখেন না।

—আমি ধ্যানে তাঁকে পাই। সুলতান-উল-আযকর শুনতে শুনতে আমি আমার দুই কানে নির্জন নিশুতি রাতে পিঁপড়ের সারির হাঁটা চলা শুনতে পাই। নামাজ আদায় করে—রোজা রেখে আমার কী হবে?

মুন্সি চন্দ্রভান আর কোনও কথা বলতে পারলেন না। তিনি শাহী দেওয়ানখানায় মীর মুন্সি হিসেবে যাতায়াত করে থাকেন। বাদশার হুজুরের লেখালিখি এক সময়—তাঁকে দেখতে হত। জন্মে ব্রাহ্মণ এই মানুষটি শাহী কাণ্ডকারখানার একেবারে মাঝখানে থেকেও একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু।

চন্দ্রভান প্রায় নিজেকে বলছেন—এমনই ভঙ্গিতে বললেন, যাঁরা নামাজি—যাঁরা রোজা রাখেন—তাঁরা তো ধর্মকেই মানেন।

—তাঁরা মানুন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ঈশ্বরে যাবার রাস্তা যদি একটু অন্য রকম হয় তো—তাতে গেল গেল করে ওঠেন কেন?

—কেন শাহজাদা?

—এখানে ঈশ্বর প্রধান কথা নয় মীর মুন্সি। এখানে ঈশ্বর আসল কথা ন[illegible] কবিবর। ঈশ্বরের ধুয়া তুলে—ধর্মের ধুয়া তুলে শাহজাদা হিসাবে [illegible]াকে ঘায়েল করার ইচ্ছাটাই আসল কথা। কট্টররা আব্বা হুজুরকে উসকে ইসলামের ধ্বজা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেছে—আপনি ইসলামকে বাঁচান। আপনিই ইসলামের ত্রাণকর্তা। আর উসকে চলেছে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে। ওরা ছোটো ভাইকে জিন্দা পীর বানাতে চায়। কেন চায় তা বুঝি আমি। পহেলা শাহজাদাকে ধরতে না পেরে হাতের কাছে পেয়েছে হিন্দুস্থানের তিসরি

শাহজাদাকে।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বললেন, শাহী ব্যাপারে আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে এসেছিলাম।

—বলুন।

—মীর্জা রাজা জয়সিংহের বোনের মেয়ে ইন্দর কুমারীর সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়েটা পাকা করে ফেলা দরকার।

—তা তো দরকারই। রাজপুতেরা সব সময়ই মুঘলদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে সুলেমান শুকোর বয়স তো মোটে ন' বছর।

—তা হোক। বিয়েটা এখন থেকে পাকা হয়ে থাকুক। এ বিয়ে খুবই জরুরি শাহজাদা।

—তা আমি জানি কবিবর। মুঘল শাহীতে বিয়ে শাদি হয়ে থাকে তাগদের যোগ বিয়োগ—হিসেব নিকেশ করেই। আচ্ছা বলুন তো লাডলি কি শারিয়ারকে ভালবাসত?

—লাডলি? কোন্ লাডলি?

—লাডলি আবার ক'জন। মরহুম নুরজাহান বেগমের পয়লা শাদি বাবদে বর্ধমানে ফৌজদারের ঘরে যে-মেয়ে জন্মায়—

—ও হো। হ্যাঁ। যার সঙ্গে আপনার চাচা শাহজাদা শারিয়ারের শাদি হয়—নুরজাহান বেগমের ইচ্ছায়। শাদির সময় নুরজাহান ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম। তিনি চেয়েছিলেন—শাহজাদা শারিয়ার হোক হিন্দুস্থানের বাদশা। আর তাঁর বেগম লাডলি।

—তা কিন্তু হয়নি! লাডলিরও বিয়ে হয়েছিল শাহীর জরুরী দরকারে। কবিবর। আমি জানতে চাই—লাডলি বেগম কি শাহজাদা শারিয়ারকে ভালবাসতে পেরেছিলেন?

—কোত্থেকে পারবেন। গোয়ালিয়র দুর্গে যে হারিয়ে গেলেন শারিয়ার। চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন।

—এই জরুরি দরবারের বিয়ে শাদিগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

—জাহাঙ্গীর বাদশার এন্তেকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা খসরুর ছেলে সুলতান দাওয়ার বকসকে আপনার দাদাসাহেব আসফ খাঁ ঘোষণা করলেন, হিন্দুস্থানের বাদশা আজ থেকে সুলতান দাওয়ার বকস্। তাঁর নামে খুৎকা পড়াও হয়ে গেল। ওদিকে শাহজাদা শারিয়ার লাহোরে এসে সেপাই জোগাড় করতে লাগলেন। মসনদের জন্যে লড়াইয়ে যাবেন। ঠিক এই সময় এলেন আপনার আব্বাহুজুর। শাহজাদা খুর্রম সব ঢেউ ভেঙে হিন্দুস্থানের সামনে বাদশা হয়ে দেখা দিলেন। আজ তো সেসব কথা ইতিহাস শাহজাদা—

দারা যমুনার বুকে তাকিয়ে। তায়খানা থেকে দেখা যায়—কোথাও জল। কোথাও বালি। কোথাও বা নলখাগড়ার জঙ্গল। তাতে বর্ষা শেষের জলে ধোয়া নবীন সব পাখি। বাইরে রোদ বাড়ছে। তায়খানায় বসে সে রোদের আভা পাওয়া যায়। সেদিকে তাকিয়ে দারা বললেন, শাহী ঘরঘেরাস্থির সবই আগামী

দিনের হিন্দুস্থানের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসে থাকে মাত্র—ফতে নয়তো হেরে যাওয়া লড়াইয়ের কথা। মসনদের কথা। কিন্তু কে বলতে পারে—চাচা শারিয়ার—বড়ে ভাই দাওয়ার বকস্ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একবারও কি ভাবেননি—এই শাহী—তার ঠাট, শান, সৌকত—সবকিছুই একদিন মাটিতে মিশে যাবে! এসব কথা তো ইতিহাসে থাকে না। ইতিহাসে থাকে শুধু শাহী, জরুরি দরকারের কথা। যে দরকারে শাদি হয়। আবার খুনও হয়।

মীর মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথম জীবনে স্থপতি আবদুল করিমের কাছে কাজ করেছেন। তিনি মগজদার ভোগী মানুষ ছিলেন। তারপর কাজ করেছেন লাহোরে উজির-ই-কুল আকিল খাঁয়ের দেওয়ানখানায়। তিনি ছিলেন যেমনিই পণ্ডিত—তেমনই ভোগী। আগ্রা-জাহানাবাদে এসে তিনি দেখলেন বাদশা শাহজাহানের দরবারে তো ভোগের যমুনা বয়ে চলেছে। তার ভেতর এসব কী কথা?

চন্দ্রভান বললেন, আপনি স্বধর্মে থাকুন শাহজাদা।

—কিসের স্বধর্ম?

—একজন শাহজাদার যে স্বধর্ম—তার কথা আমি বলছি।

—সে তো শিকার—নাচ—একের পর এক আওরত।

—সেইভাবেই তো শাহজাদা থেকে একজন ধীরে ধীরে বাদশা হয়ে ওঠেন। তাঁর নানা দিকে খেয়াল যায়। দেশ দখল। নানা ঘোড়ায়, জাতিতে আগ্রহ। আওরতে দিলচসপি। দরাঙ্গ খাঁ বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলেকে ডেকে গান শুনুন।

সত্তর ছুঁই ছুঁই চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে সমীহ করেন শাহজাদা। মানুষটি নিরাসক্ত। কবি। কাজেকর্মে উৎসাহী। দক্ষ। আবার ভুয়োদর্শীও বটে। তাঁর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে দারা বললেন, জীবনের ধর্ম হল যাতে প্রাণরস পাওয়া যায়—তাতে ডুবে থাকা।

—প্রাণরস? তার খোঁজ পেয়েছেন নাকি!

দারা বুঝলেন, রসিক কবি তাঁকে স্নেহভরে ঠাট্টাই করছেন। এই ঠাট্টাও ভাল লাগে দারার। তবু গুছিয়ে বলার জন্যে তিনি গম্ভীর হলেন। তারপর মুখ খুললেন। খুব শান্ত গলায় বললেন, কবিবর! আমি জানি না প্রাণ কাকে বলে। আমি জানি না রস কাকে বলে—

—উচিত দার্শনিকের মতই কথা বলেছেন শাহজাদা। আমি যৌবনে আকবর বাদশার কথা শুনেছি। মাঝবয়সে লাহোরে দূর থেকে জাহাঙ্গীর বাদশাকে দেখেছি। তারপর তো আপনি জানেনই—জীবনের প্রান্তে এসে শাহজাহান বাদশার মবারকে হাজির হলাম। এখন আছি শাহজাদা দারাশুকোর খিদমতে।

—ওভাবে বলবেন না কবিবর। আপনি শাহীর খিদমত করে থাকেন।

—যাই হোক। সব দেখে মনে হয়—এক একজনের প্রাণের ঝোঁক এক একরকমের। কারও ঝোঁক মানব রহস্যের বীজে পৌঁছানো। কারও বা সংগীত—আতর—সরাবে। আবার কারও বা ঝোঁক সৌধ-মহল-মসজিদে-চুনি-মুক্তায়। কিন্তু

আপনার ঝোঁকটি বিস্ময়কর। আপনি যেন আসমান থেকে তারার আলোর সুতো ধরে ঈশ্বরে উঠে যান।

—আমায় আর লজ্জা দেবেন না মীর মুন্সি।

॥ আশি ॥

এবার কাশ্মীরে খুব মজা হয়েছে। মজাটা মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে নিয়ে। চন্দ্রভান সুবা লাহোরের উজির-ই-কুল আফজল খাঁয়ের খাস কাজকর্ম দেখতেন। আফজল খাঁয়ের এন্তেকালের পর বাদশা শাহজাহান চন্দ্রভানের হাতে লেখা শিকস্তি ফারসি বয়েত পড়ে তাঁকে হিন্দু-ই-ফারসি দান বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁকে গোড়ায় নিজের ওয়াকেনবিশ—পরে কাগজপত্র, হুকুম ফরমান, রোজকার তুজুক দেখাশুনোর মুন্সি করে নিয়েছিলেন বাদশা। মানুষটির বয়স হয়েছে। সুশ্রী। রসিক। কবি—আবার কাজেও তুখোড়। চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে বাদশার খুব পছন্দ। সেই মানুষটিকে বাদশার কাছ থেকে ধার নিয়ে শাহজাদা দারাশুকো নিজের মীর মুন্সি করেছেন আজ কয়েক বছর।

শীত কেটে যেতে বাদশা শাহজাহান কাশ্মীর এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন শাহজাদা দারা। এই শাহী সফরের সঙ্গী হয়েছেন নাদিরা বেগম। বড় ভুগছেন। শরীর সারাতেই তাঁর এই আসা। আর এসেছেন শাহজাদার মীর মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে নিয়েই মজা। তিনি এখন শাহজাদার মীর মুন্সি। কিন্তু বাদশার সেকথা মনেই থাকে না। তিনি প্রায়ই নিজের মুন্সি ভাবেন চন্দ্রভানকে। আবার ভুলটা বুঝতে পেরে বাদশা নিজেই বলেন, আপনি আসুন এখন। আপনি নিজে কবি। আবার একজন কবিরই মীর মুন্সি আপনি।

এই কবি হলেন বাদশার পহেলা শাহজাদা দারাশুকো। বাদশা যখন নিজের শাহজাদাকে কবি বলেন—তখন তাঁর কথায় ছেলের জন্যে একই সঙ্গে শ্লেষ আর গর্ব যেন ঝরে পড়ে। সেখানে যেন বাদশার চেয়ে একজন আব্বা হুজুরই বড় করে ফুটে ওঠেন। তাই তো মনে হয় চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের। তিনি হিন্দুস্থানের বাদশার এই রসিকতা উপভোগ করেন। দু'এক সময় লাগসই টিপ্পনিও কাটেন।

মাঝেমধ্যে সত্তর বছরের চন্দ্রভান নিজের থেকেই অনেক কথা বলে ওঠেন। একদিন হয়তো বললেন, আমরা যখন বালক—তখন আকবর বাদশা কাশ্মীরকে হিন্দুস্থানের ভেতর আনেন।

বাদশারও মনে থাকে না—তিনি একজন বাদশা। যেন কোনও বয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন—এই ভঙ্গিতে শাহজাহান বলেন, তখন আমি পৃথিবীর আলো দেখিনি। আচ্ছা তখন হিন্দুস্থান কেমন ছিল? শাহীই বা কেমন ছিল?

—হজরত। মুঘল শাহী তখন হিন্দুস্থানে এত বড় হয়ে ওঠেনি। জীবন অনেক সহজ ছিল।

—আকবর বাদশাই বা কেমন ছিলেন?

—ওরে বাবা! ওকথা বলবেন না আলমপনা। একজন সামান্য বালকের পক্ষে কি বাদশার কাছাকাছি হওয়া সম্ভব? আর আমি তো তখন লাহোরে। আমার বড় ভাই উধোভানের চেষ্টায় পড়াশুনো করে চলেছি। রাজধানী আগ্রার কথা—হিন্দুস্থানের বাদশা আকবরের কথা আমরা ব্যাপারিদের মুখে শুনতাম। আর বইতে যা কিছু পড়তে পেতাম। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কোনও দিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম—একদিন আমি বাদশার এত কাছে এসে তাঁকে দেখতে পাব—তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারব? সবই নসিব বন্দেগান।

বারামুল্লা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাদগামের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া কিষেণ-গঙ্গার মুখোমুখি মুঘলকুঠির হাতায় বসে এক একদিন বাদশা শাহজাহান কথা বলেন। সামনেই পাহাড়ের মাথা থেকে সারা শীতের জমা বরফ গলে যাওয়া চোখে পড়ে। চিনার গাছগুলোর ডাল পাতা থেকে বরফ খসে খসে যাচ্ছে নিত্যদিন। শাহী হাতিগুলোর শীত কি গরমে কোনও হুঁশ নেই। তারা কিষেণগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে ফোয়ারা তুলে চান করেই চলেছে।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা দারার মনে কবিতার যাতায়াত। কথাগুলো মনে এসে ফুটি ফুটি করে। কিন্তু লেখা হয় না। নাদিরা বেগম কাশ্মীরে এসে ইস্তক আরও যেন কাহিল হয়ে পড়েছেন। পাহাড়, শীতের শেষে হেসে ওঠা সবুজ উপত্যকা—তার মাঝে মাঝে সদ্য সদ্য গলতে থাকা হ্রদের বুক—আসমান জুড়ে দূরদেশের পাখিদের ফিরে যাওয়া—সবই যেন বিশেষ কোনও রুবাই—বিশেষ কোনও দেওয়ানের পায়ের আওয়াজের মতো শাহজাদার মনে ফিরে ফিরে যায়। কিছুতেই তা আর লেখা হয়ে ওঠে না।

এর ভেতর বাদশা শাহজাহান কোনওদিন সমরখন্দ যাবার রাস্তার কথা বলতে থাকেন। হিন্দুকুশ পাহাড়, উসুরি নদী, বদকশান, সুরখালি নদী, তৈমুরাবাদের কথা এসে পড়ে। এসব কথা বলতে গিয়ে বাদশার গলা ভারি হয়ে ওঠে। দূরে কিষেণগঙ্গার তীরে দাঁড়ানো কোনও ফকির-দরবেশও যেন সে গলা শুনতে পাবে। এত গম গম করে। দারা তাকিয়ে থাকেন আরও দূরে। কিষেণগঙ্গার ওপারে চুপ করে দাঁড়ানো পাহাড়ে। ওখানেই এক গুম্ফায় মুল্লা শা'র খানকা।

ওই একই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বাদশা শাহজাহান যেন পাহাড়ের ওপিঠ দেখতে পান—এই ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, আরও উত্তরে বলখ্ বদকশান। সেসব ছাড়িয়ে হিন্দুকুশের পা ধুয়ে অক্ষু নদী চলে গেছে সমরখন্দের দিকে। তৈমুরের রাজধানী।

—আব্বা হুজুর। আপনি তো ওদিকে কখনও যাননি। তবু কী করে দেখতে পান?

—আমি যাইনি। যাননি আমার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা। তাঁরও আব্বা হুজুর আকবর বাদশাও কোনওদিন ওসব জায়গায় যাননি।

—তবু?

—হ্যাঁ দারা। তবু। ওসবই তো হুমায়ুন বাদশা—বাবার বাদশার দেশ।

—মুঘল বাদশার দেশ তো এখন এই হিন্দুস্থান।

—হ্যাঁ শাহজাদা ! কিন্তু আমি যে আমার খুনের ভেতর সমরখন্দ, তৈমুরাবাদ, উসুরি নদীর চোরাটান টের পাই।

আসমানে, হাওয়ায় এখন কাশ্মীরের নয়া বাহার। সামনের প্রান্তরের তুষার-ঢাকা মোটা পাতির ঘাস বিন বিন করে জেগে উঠেছে। রোদের তাপে তুষার গলিয়ে।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ শুধু কবিই নন। শব্দের উৎস খুঁজতেও তিনি বেশ দড়। চন্দ্রভান বললেন, হজরত। এই কাশ্মীরের ভাষাতেও দেখছি—না আরবি—না ফারসি—কোনও ছাপই নেই।

শাহজাদার মনে হল, এসব কথা বলে তাঁর মীর মুন্সি বাদশার মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন না তো ?

শাহজাহান জানতে চাইলেন, কেমন ?

—বন্দেগান। এই ধরুন—খুব কড়া শীত। তাকে কাশ্মীরিরা বলছে শুনলাম—চিলে কালান। মাঝারি শীত—ওদের ভাষায়—চিলে কুর্দ। আর শীত কমে এলে তাকে বলবে—চিলে বাচ্চে।

—বাচ্চে কথাটাই তো ফারসি। যা-কিনা আগ্রা-জাহানাবাদের সাধারণ মানুষ-জনের নয়া ভাষা—উর্দুতেও ঢুকে পড়েছে।

সবদিকে নজর রেখেও হিন্দুস্থানের বাদশা যে উর্দুতে বাচ্চে কথাটির ঢুকে পড়া লক্ষ করেছেন তাতে বাদশার হুঁশিয়ার নজরের ঝাড়া প্রশংসা করে চন্দ্রভান বললেন, হজরত। আপনার নিশ্চয় নজরে এসেছে—এই কথাগুলোর ওপর চাঘতাই তুর্কি'র ছায়া পড়েছে। আর বাচ্চে কথাটি আপনি ঠিকই ধরেছেন—ফারসি থেকে এসেছে।

বাদশা শাহজাহান তাঁর চেয়ে বয়সে বেশ বড় এই হিন্দু-ই-ফারসি দানের মুখে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন—আমি কী খুশ-নসিব। নয়তো এমন পণ্ডিত, রসিক, কবি আবার তুখোড় মুন্সি কি আর একজনও পাওয়া যায় ? সেই প্রসন্ন মুখেই শাহজাহান বলেন, আমার শাহজাদাদের একজনকে এই চাঘতাই তুর্কি শিখতে হবে।

চন্দ্রভান বললেন, কেন আলমপনা ? এই ভাষায় কি কোনও বড় কবি আছেন ?

—আছেন কিনা জানি না। তবে এটা জানি—বলখ বদকশানে অভিযানে যেতে হলে ওদের ভাষাটাও জানা থাকা দরকার। তাহলে দুশমনের গতিবিধি—মতলবটা বুঝতে সুবিধেই হবে।

এই দুশমন কথাটা শাহজাদা দারার না-পসন্দ। তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না—নিজের খোয়াব মেটাতে গিয়ে একটা দেশ—সেখানকার মানুষজন—ঘরবাড়ির ওপর চড়াও হয়ে তাদের দুশমন বলব কেন ? তারা তাদের নিজেদের বাঁচাতে এই অভিযানে বাধা তো দেবেই। শাহজাদার মুখের ভেতরটা এমন সুন্দর দুপুরে তেতো হয়ে গেল।

শাহজাহান তখন তাঁর খোয়াবের হিন্দুস্থানের নতুন সীমানা আঁকছিলেন। ভরন্ত গলায়। যেন বা কোনও খুবসুরত আওরতের কথা বলছেন। বাদশার

কথার ভেতর উঠে যাওয়া যায় না। দারা বসে বসেই শুনলেন—তাঁর আব্বা হুজুর বলে চলেছেন—উত্তরে হিন্দুস্থান শেষ হবে সমরখন্দে। এখনকার বেনারসের মতোই সমরখন্দের উলুগ বেগ মাদ্রাসায় বাছাই ছেলেদের পড়তে পাঠানো হবে। পশ্চিমে হিন্দুস্থানের সীমান্ত হবে কান্দাহার। এই বিশাল হিন্দুস্থান শাহজাদারা শাসন করবে। বদকশানি চুনি, নীলগাইয়ের চামড়া, পশমকে তখন সারা দুনিয়া জানবে হিন্দুস্থানের জিনিস। ওসব জিনিসের সওদা হবে সুরাট বন্দরে। বিদেশী ব্যাপারিদের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে সমরখন্দ অব্দি ধাওয়া করতে হবে না।

বাদশার এই খোয়াব দরবারি ওয়াকেবহাল থেকে উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ—সবাই জানেন। দারা চুপ করেই ছিলেন। হঠাৎ আব্বা হুজুরের গলায় নতুন কথা শুনে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন।

শাহজাহান বললেন, বাবর বাদশার চার শাহজাদা ছিল। আমারও চার শাহজাদা। তৈমুরের বিধান না মেনে বাবর বাদশার শাহজাহাদের ভেতর শাহজাদা কামরানই গোড়ায় বে-ইনসাফি করেন। তাঁর চোখ উপড়ে নেওয়া ইনসাফেরই কাজ হয়েছিল। এই বিচারই শাহজাদা কামরানের পাওনা ছিল। দেখতে হবে—আমার শাহজাদারা ইনসাফির বাইরে না যায়—

এখানে চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বাদশার মেজাজ বুঝে খুব সমঝদারের মতোই ছোট একটি কথা বললেন, বাবর বাদশার শাহজাদাদের ভেতর পেয়ার শুকিয়ে যাবার একটা কারণও ছিল হজরত।

একথায় বাদশার মতোই দারাও তাঁর মীর মুন্সির মুখে তাকিয়ে পড়লেন।

—তখন সবে নয়া নয়া শাহী। তখন হিন্দুস্থান আজমের মতো এত মজবুত নয়। সব কিছুই দুলছে। কিছুই নিশ্চিত নয়। সেদিনকার হিন্দুস্থান ছিল বেশ ছোট্ট। আজকের মতো এত বড় নয়। তার ভেতর চার শাহজাদার খোয়াব কী করে সফল হবে!

শাহজাদা দারা ফস করে বলে বসলেন, আরেকটা কথা তো আপনি বললেন না—

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ আর শাহজাহান একই সঙ্গে দারার মুখে ফিরে তাকালেন।

দারা বললেন, সেদিনকার হিন্দুস্থান যেমন ছিল ছোট আর দুবলা—সেদিনকার শাহজাদাদের লালচ ছিল তেমনই বিশাল—আকাশছোঁয়া।

বাদশা চমকে উঠলেন। লালচ কাকে বলছ দারা?

শাহজাদা দারার বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি তাঁর আব্বা হুজুরের চোখের ভেতর তাকিয়ে আরও একজন শাহজাদাকে দেখতে পাচ্ছেন। সেই শাহজাদারাও হুমায়ুনদের মতোই চারভাই ছিলেন। সেই শাহজাদার বড়ে ভাইকে আফিমের আঠা লাগিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বুরহানপুর দুর্গে আচমকা তাঁর এন্তেকাল হয়। সেই শাহজাদার আরেক ভাই না-লায়েক হয়ে পড়েন—শাহী অবহেলায়—নেশায়—হতাশায়। তাঁকেও মৃত্যু এসে নিয়ে যায়। সেই শাহজাদার ছোটে ভাই গোয়ালিয়র দুর্গে চিরকালের মতোই হারিয়ে যান। বাকি শাহজাদা এখন তাঁর মুখোমুখি তাকিয়ে—হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছেন প্রায় বিশ বছর—

এখন তাঁর চোখে কোনও পলক পড়ছে না।

দারা বললেন, লালচ ছাড়া কী বলব হজরত? তাগদের লালচ। আয়েসের লালচ। হুকুম ফরমান জারির লালচ—বলতে বলতে দারার কথাগুলো নিজের মুখের ভেতরেই জড়িয়ে গেল। গলা বুজে এল। তাঁর মুখোমুখি একজন আব্বা হুজুর পুরোপুরি বাদশা হয়ে উঠছেন। তাঁর চোখে কোনও পলক পড়ছে না। হাসি তো অবরে সবরে এ মুখে ফুটে ওঠে।

—বলো মসনদের লালচ। তাই তো?

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর।

—মুঘল শাহীতে বিধান তো একটাই। তখৎ ইয়া তাবুদ। মসনদের জন্যে মরদ হয়ে একজন শাহজাদা যা-কিছু করেন—তাকে লালচ না বলে শাহজাদা দারা—আমি বলব, একজন লায়েক মরদের মগজ আর তাগদের খেলা। যে-খেলায় জানবাজি আছে—তলিয়ে যাবার বিপদ আছে—আবার ভেসে ওঠার শান আর সৌকতও আছে। এর ভেতর লালচ কোথায় শাহজাদা? তাগদেরও তো একটা খুবসুরতি আছে। ওই যে হাতিরা নদীর পাড়ে জলের ফোয়ারা করছে শুঁড় দিয়ে—তা কি দেখতে ভাল লাগে না আমাদের? সুন্দর লাগে না?

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। শাহজাদা দারার বুকের ভেতর পাশাপাশি চার ঘোড়সওয়ার একই সঙ্গে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে। বাইরে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে শাহজাদা সামনের নরম ছায়া মাখানো প্রান্তরের দিকে তাকালেন। কী নিঃশব্দ, নিরীহ চেহারা প্রান্তরের। অথচ এখনই ওখানে অদৃশ্য এক বাজ পড়েছে। যার আওয়াজ শুধু শাহজাদা দারার বুকের ভেতরেই পেঁছেছে। তিনি খুব শান্ত গলায় বললেন, হজরত। একজনের কামিয়াব—সফল হওয়া মানেই তো বাকি ক'জনের বিফল হওয়া—হারিয়ে যাওয়া।

—বাঃ। সেজন্যেই তো খোদাতালা দুটি শব্দ বানিয়েছেন। লায়েক। না-লায়েক।

এখানে চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ শাহজাদাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন। কথাগুলো সহজ করে দিতে তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, সবাই তো আর বাবর বাদশা, শাহজাহান বাদশা হতে পারেন না—খোদাতালা সেভাবে সব ইনসানকে এই দুনিয়ায় পাঠাননি।

নিজের কথা গিলে ফেলে দারা নতুন কোনও কথা আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি সামনের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন—তৈমুরের লিখে যাওয়া বিধান সত্ত্বেও হুমায়ুন বাদশার ভাই শাহজাদা কামরান গদ্দারি করতে পিছপাও হননি। আকবর বাদশা শাহজাদা সেলিমকে বড় ভালবাসতেন। তাতে সেলিমের আগ্রা দুর্গে চড়াও হতে আটকায়নি। যেমন কিনা জাহাঙ্গীর বাদশার হাজারো ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁর শেখু বাবার বাগী হতে আটকায়নি। শেষ অব্দি তাগদের খুবসুরতি জানবাজ খেলায় সেই শেখু বাবা সফল হয়ে ভেসে উঠেছেন। আর তলিয়ে গেছেন বাকি তিন শাহজাদা—খসরু, পরভেজ, শারিয়ার। তাগদের সুন্দর খেলায় কোথাও ভালবাসার কোনও জায়গা নেই। আব্বা হুজুর ভাবছেন

—তৈমুরের খোয়াবের ঢঙে তিনিও স্বপ্ন দেখছেন—তাঁর খোয়াবের হিন্দুস্থান যখন হেলমন্দ থেকে ব্রহ্মপুত্র অব্দি ছড়িয়ে পড়বে—উসুরি নদীর পার থেকে যখন গোদাবরী নদীর পার অব্দি শুধুই মুঘল ধ্বজ উড়বে—তখন তাঁর চার শাহজাদার সবাই এক একজন আকবর বাদশা হয়ে উঠবেন।

শীত চলে গেলেও বিকেলের বাতাসে এখনও হিম। চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ আর শাহজাদা দারা দেখলেন—তাঁদের সামনেই হিন্দুস্থানের বাদশা তাঁর নিজের চিন্তা ভাবনার জগতে একদম ডুবে যাচ্ছেন। শাহজাহানের চোখ এখন কোথাও বিশেষ-ভাবে তাকিয়ে নেই। চোখের দুই মণি কেমন মায়া মাখানো।

চন্দ্রভান দেখলেন—বাদশা তাঁর রওয়ান-তখতের পাশে সারে সারে সাজানো ওয়াকেনবিশের রোজকার লেখার বাঁধাই মুরাক্কা হাতে তুলে নিচ্ছেন। তিনি শাহজাদার চোখে তাকালেন। দুজন চোখে চোখে কথা বলে নিলেন। কেননা, তারপরই দুজনে একসঙ্গে পিছু হটতে হটতে বাদশাকে কুর্নিশ করে দেওয়ালের পেছনে মিলিয়ে গেলেন। মীর মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ চাপা গলায় বললেন, বাদশার এদানি তুজুকে নেশা ধরে গেছে।

হিন্দুস্থানের বাদশা কবে কী বলেন—কী হুকুম দিলেন—কী খেলেন—কার সঙ্গে কথা বললেন, কোনও গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেলে তা তো বটেই—দরকারে যেসব চিঠি বাদশা লেখেন—তাও আগাগোড়া অক্ষরে অক্ষরে রোজকার তুজুকে ওয়াকেনবিশরা লিখে রাখেন। পরে সেসব নথির মতো বাঁধাই করে মুরাক্কা বানানো হয়। দরকারে বাদশা সেসব পড়ে দেখেন। পড়তে পড়তে সেইসব সময়ে যেন ফের বাদশার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাত্র বছর খানেক আগের মুরাক্কা। এক জায়গায় বাদশার চোখ আটকে গেল। একখানি চিঠি। বয়ান দেখে বাদশা চিনতে পারলেন। তাঁর নিজেরই লেখা। দাক্ষিণের সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরকে।

পরগণার ভাল ফসলি গ্রামগুলো সব নিজে নিয়ে অন্যদের অজন্মার গ্রাম-গুলো দেওয়া একজন মুসলমানকে মানায় না। ব্যাপারটা অন্যায়। আর তুমি তাই করেছ। আমি হুকুম দিচ্ছি—তুমি আশির পরগণার অজন্মা গ্রামগুলোর অর্ধেক নিজে নাও। নিজে যে-টাকা খাজানাখানা থেকে নিয়ে থাকো—এখন থেকে তার অর্ধেক নেবে। আমি এই কমানোর হুকুম দিলাম। এবার থেকে তোমার প্রকৃত আয় তাহলে স্বাভাবিক হবে।

চিঠিখানি পড়ে বাদশা হাসলেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। মুন্সি চন্দ্রভান কিংবা শাহজাদা দারা—কেউই নেই কাছাকাছি। আবার চোখ নামিয়ে আনলেন মুরাক্কায়।

আওরঙ্গজেবের জবাব—

আমার জীবনে কখনও আমি অন্যায়ভাবে কোনও কাজ করিনি। আল্লাকে সব সময় সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এই দুনিয়ায় সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধিকেও সবসময় সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। ওই সুফলা গ্রামগুলি বাবদে আপনি আমাকে লক্ষ তংখার ব্যাপারে আপত্তি করে হুকুম দিয়েছেন। আমি নিজে ওই সব সুফলা

গ্রামের জমিগুলো নিইনি। আমি দক্ষিণে রওয়ানা হওয়ার আগেই আপনার শাহী দেওয়াখানার কানুনগোরা ওইসব জমি শায়েস্তা খাঁয়ের এক্তিয়ার থেকে আমার নামে জমায় তুলে দিয়েছে—অবশ্যই আমার দেয় রাজস্বের অনুপাতে।

আমার একথা ভেবে অবাক লাগছে—বিশেষ করে ওয়াজিরের মতো তীক্ষ্ন স্মৃতিধর থাকতে আপনার রাজস্ব কর্মচারীরা কেন এসব কথা আপনাকে জানাননি। সাধারণ নিয়ম না মেনে—হজরত আপনি কোনওরকম তদন্ত না করে—এমনকি আমাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা না করেই শুধুমাত্র অভিযোগ পেয়েই হুকুম জারি করেছেন। এমনকি এখন সামান্য জাগতিক ব্যাপারে মুসলমান কথাটি ব্যবহার করেছেন। ওরা আপনাকে বিশ্বাস করিয়েছে—আমি আমার নির্দিষ্ট বেতনের চেয়ে বেশি পাচ্ছি—এখানে আমি নিরুপায়। আমার নগদ বেতন থেকে আপনি পঞ্চাশ হাজার তংখা কমিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছেন। এই চিঠির বদলে আমাকে আদৌ কিছু দেওয়ার দরকার কি ?

পড়তে পড়তে বাদশা চোখ বুজলেন। তাঁর মনে পড়ল—দক্ষিণে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সুবেদার করে পাঠানোর সময় পই পই করে বলে দিয়েছিলেন—চাষীদের হাল ফেরাতে হবে ওখানে। চাষ বাড়াতে হবে। শাহজাহানের মনে পড়ল—তিনি অধৈর্য হয়ে পড়ে দক্ষিণে হুকুমের পর হুকুম পাঠিয়েছিলেন। চাষ বাড়াও। মানুষ বসাও। বসতি বাড়াও।

তখন শাহজাদা আওরঙ্গজেব বার বার পাঠিয়েছেন। কী করে সম্ভব হজরত ? এক যুগ ধরে লড়াই চলেছে এ এলাকায়। মানুষ তো কমবেই। লড়াইয়ের একটা ক্ষয়ক্ষতি আছে না। তারপর দশ বছর ধরে কুশাসনের সমস্যা দু'তিন বছরে কি শোধরানো যায় ?

বাদশা নিজের মনকেই বললেন, তবু শাহীর তিসরি শাহজাদা হাল ছাড়েননি। লেগে থেকেছেন। কোনও কোনও মহালের আদায় দ্বিগুণ করেছেন। আঙুর, আখ, কলা, বাদামের চাষ চালু করে আদায়ের বহর বাড়িয়েছেন।

চিঠির বাকিটুকুতে তাকালেন বাদশা। আওরঙ্গজেব লিখেছেন—

আলমপনা ভাল করেই জানেন—আমি অপ্রয়োজনে কদাচ ব্যয় করি। আপনার কাছ থেকে যা পাই তা দিয়ে আমি ফৌজ চালাই। আমার লোকজনকে যেহেতু নগদে দিতে হয়—আমার ফৌজকে অনেকটাই ছোট করতে হবে। কেননা—আমার নগদ ভাতা কমানো হয়েছে।

বাদশা তাঁর চোখের সামনে দূরের পাহাড় দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন শাহী হাতির দঙ্গল চান করে মুঘল কুঠির দিকে ফিরছে। কিষেণগঙ্গার বুকে রোদের আলো পড়ে চকচক করে উঠল। শাহজাহানের মনে পড়ল—দক্ষিণের বরখাস্ত সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে তিনি শাহজাদী জাহানারার অনুরোধে তাঁর ইজ্জৎ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আওরঙ্গজেব এখন গুজরাতের সুবেদার।

ক্ষমতা কী অদ্ভুত জিনিস। ইনসানের কলিজার ভেতরকার যন্ত্রণা চাপা দিয়ে নিজের কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আমিও কি একদিন আমার বাগী দিনগুলোতে আগ্রাকে হৃদয়হীন কবন্ধ ভাবিনি ?

আজকের জাহানাবাদ-আগ্রার শাহীর চাতালের নীচে চাপা পড়ে আছে—এক-সময়কার কত তাগদের শান সৌকত—চমকদার গৌরবগাথা—কত না-বলতে পারা—মনে মনে ইনসাফির জন্যে গজরানো যন্ত্রণা। আমি কি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে কিছু অন্যায় করেছি? আমি যে ওর ভেতর এক এক সময় আমার বাগী দিনগুলোর ছায়া দেখতে পাই। কেন দেখি জানি না। যখন জানবাজি করে তাগদের খুবসুরতি খেলা খেলছি—যখন তলিয়ে যেতে যেতে আবার ভেসে উঠছি—তখন রোশন, আওরঙ্গজেব, মুরাদ গওহর আরা একে একে দুনিয়ার আলো দেখছে—বড় হচ্ছে—

বাদশা দেখলেন—প্রান্তর জুড়ে সন্ধ্যার আয়োজন। বসন্তের প্রথম পাখির দল কিছুতেই অন্ধকারকে মেনে নিতে রাজি নয়। তারা চিনারের ডালে ডালে তখনও উন্মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে। ঝাঁপাচ্ছে। কিচিরমিচির। ওরা জানেও না—হিন্দুস্থানের নয়া রাজধানী জাহানাবাদের চাতালের নীচে পরতে পরতে চাপা পড়ে আছে এক এক শাহীর—এক এক তাগদের স্মৃতিরেণু—রায়পিথোরা, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ, দিনপথ, সেলিমগড়।

শাহজাহান মনস্থির করলেন। বলখ-এ মুঘল ফৌজের সিপাহশালার হয়ে এবার যাবে শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর।

এই মুঘলকুঠিতে বেশ কয়েকবার এসেছেন শাহজাদা দারা। ফি-বারই তিনি বাদশার সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছেন। ইচ্ছা ছিল—নাদিরা বেগম কিছু চাঙ্গা হলে তাঁকে নিয়ে তিনি কিষেণগঙ্গা পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে সেই গুম্ফাটি দেখিয়ে আনবেন বেগমকে। মুল্লা শার খানকা।

কিন্তু তা বোধহয় যাওয়া হবে না। দারা বেগমের সুখদোলায় গিয়ে একপাশে বসলেন। তারপর নাদিরার মাথায় হাত রেখে বললেন, এখন কেমন আছ?

নাদিরা খোলা অলিন্দ দিয়ে আসমানের যেখানটায় পাহাড়ের মাথা—সেদিকে তাকিয়ে। চোখের কোণে যেন জল। দারা কোনও জবাব পেলেন না। তিনি লক্ষ করলেন, নাদিরা আগের চেয়ে যেন অনেক—অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। এমনিতে নাদিরা কৃশ। উঠে দাঁড়ালে কোনও অদৃশ্য বাতিদানের সাদা শিখা হয়ে জ্বলে। আজ সেই শিখাকেও শাহজাদার রীতিমত ক্ষীণ লাগল।

তিনি আবারও জানতে চাইলেন, কেমন আছ নাদিরা?

এবারও নাদিরা বেগম হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।

দারা দেখলেন, তাঁর কাত হওয়া মুখের দুই চোখ থেকে চুপচাপ জলের দুটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

শাহজাদার কেমন মনে হল, তাঁর এই জানতে চাওয়া যেন তাঁকেই ফিরে বলছে, কেন? তুমি জানো না—আমি কেমন আছি।

দারা আর কোনও কথা না বলে নাদিরা বেগমের পায়ের দিককার পশমিনা তাঁর কোমর অব্দি টেনে দিলেন।

শাহজাদা দারা চলেই আসছিলেন। নাদিরা বেগম তাঁকে থামালেন। শুয়ে শুয়েই বললেন, শাহজাদা। আমি কেমন আছি—একথা জেনে কী হবে আপনার।

দারা চমকে গিয়ে থামলেন। বললেন, বাঃ ! আমরা স্বামী স্ত্রী। একসঙ্গে থাকি। তুমি অসুস্থ। অনেকদিন ভুগছ। স্বামী হয়ে জানতে চাইব না—তুমি কেমন আছ ?

কাত হয়ে শুয়েছিলেন নাদিরা বেগম। এবার তিনি চিৎ হয়ে সরাসরি শাহজাদার মুখে তাকালেন। তারপর চোখের জল না মুছেই শান্ত গলায় বললেন, আপনি তো রানাদিলেরও স্বামী। নয় কি ? সে কেমন আছে জানতে চেয়েছেন কি ?

সঙ্গে সঙ্গেই কোনও কথা বলতে পারলেন না দারা। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললেন, কেউ ভুগলে তার আশপাশের মানুষ জানতে চাইবেই—সে কেমন আছে ? এটাই মানুষের ধর্ম। আমি এখনও রানার স্বামী হইনি নাদিরা। না হলেও সে যদি খুব ভোগে—কষ্ট পায়—আমি অবশ্যই জানতে চাইব—সে কেমন আছে। আর তুমি তো আমার বেগম। আমার সুখ দুঃখের সাথী। আমি তো জানতে চাইবই—তুমি কেমন আছ ? এটা কি না-জায়েজ ? অন্যায় ?

ফের পাশ ফিরে শুতে শুতে নাদিরা বেগম বললেন, জায়েজ না-জায়েজের—ন্যায়-অন্যায়ের ফারাক আমার কাছে আজকাল মুছে গেছে খোদাবন্দ।

—একথা বলছ কেন নাদিরা ?

খোলা জানলায় বসন্তের কাশ্মীরি বিকেল এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন ফোটা বনফুলে সারা দিন বন্দ হয়ে বসে থাকা ভ্রমরদের এখন ঘরে ফেরার পালা। আকাশ জুড়ে নিশ্চুপ পাহাড়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাদিরা বেগম বললেন, শাহী শাহজাদাদের মতোই আপনিও যদি হারেমে রাত কাটাতেন—তাহলে আমি সুখীই হতাম হজরত।

—সুখী হতে ? আমি হারেম-বিলাসী হলে ?

—হ্যাঁ হজরত। শাহী কেতায় তাই তো আপনাদের জন্যে হারেম।

—আমি তো কোনওদিন হারেম-বিলাসী নই নাদিরা।

—সেটাই তো আমার দুঃখ শাহজাদা।

—দুঃখ ? কী বলছ নাদিরা ?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। আপনি হারেমে যেতেন। থাকতেন দু'চার রাত। আবার ফিরেও আসতেন। সেখানে তো মন দেওয়া নেওয়ার কোনও বালাই থাকত না।

—ওঃ। —বলে একদম চুপ করে গেলেন শাহজাদা দারা। মন ? —সে রাস্তার মানুষেরই হোক—আর শাহী শাহজাদারই হোক—তাকে নিয়েই তো যত যন্ত্রণা। তিনি রানাদিলকে বলেছিলেন—এসো রানা। আমরা যেমন আছি তেমনই থেকে যাই। স্বামী-স্ত্রী তো এভাবেই একসঙ্গে থাকে। এর ওপর বিয়ে করে নতুন আর কী হবে।

—ওঃ ! তুমি তাহলে আমাকে তোমার কসবি করে রাখতে চাইছ ?

—ছি। কসবি কেন ? তুমি আমার বেগম।

—নিকা না করা বেগম তো ?

—আমরা দু'জনে যেমন আছি—নিকায় কি তার চেয়ে বেশি কিছু থাকা যায় ?

—বে-নিকা আওরত আর পাঁচজনের চোখে কসবি ছাড়া আর কিছুই নয় শাহজাদা ! নিকায় কেন আপনার অরুচি—তা বুঝতে পারছি—

—অরুচি ? কিসের অরুচি ! অরুচি তো নয়। কী বুঝলে তুমি ?

—আমায় নিকা করলে তা চাপা থাকবে না। আর তা কানে গেলে নাদিরা বেগমের বুকে বড় বাজবে ! তাই না ?

দারা বলেছিলেন, তুমি—নাদিরা—দু'জনই এত নরম—এত ভাল—কিন্তু কিছুতেই একে অন্যকে মেনে নিতে পার না।

পায়ে ঘুঙুরের ঝালরে ঝনৎকার তুলে রানাদিল বলছিল—একসঙ্গে থাকতে হলে নিকা—নয়তো কিছুই নয়। আমি তো জোড়হাত করে কতবার তোমায় বলেছি শাহজাদা—আমায় মুক্তি দাও। ছেড়ে দাও। এভাবে আলাদা হাভেলিতে বে-নিকায় থাকাথাকি আমার ঘেন্না করে। মানে লাগে। ভীষণ অপমানের মনে হয়।

—নাদিরাও তো একজন মানুষ। খুবই ভালমানুষ। অসুখে ভুগছে। তোমায় জেনে নিকা করার পর সে-খবর সে পাবেই। ভীষণ কষ্ট পাবে মনে।—বলেও দারা বুঝেছিলেন, তিনি যা খুলে বলতে পারছেন না রানাদিলকে—তা হল, আমার এতদিনকার নিকা করা বেগম নাদিরা—তার বুকে বড় বাজবে—সে কিছু দুবলা-নরম সরম—তোমার মতো আগ্রার বাজারে দাপিয়ে নেচে বেড়ানো মেয়ে নয় সে—তাকে কিছু রহেম করো।—এসব কথা দারা বলতে পারেননি রানাদিলকে। লজ্জায়।

শাহজাদার একথায় রানাদিল পা মটকে মটকে তাঁর সামনে ধেয়ে এসেছিল। এসে বলেছিল, তুমি থাকোগে তোমার ভালমানুষকে নিয়ে। তার সেবাযত্ন করো গিয়ে। দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও। আমায় বেঁধে রেখো না আর—

দারা দেখছিলেন—রানা ছেড়ে দেওয়ার মিন্নৎ জানাতে জানাতে অঝোরে কাঁদছিল।

দারা এবার ভাল করে নাদিরার দিকে তাকালেন। বেগমের গলাটি পাখির মতো সরু হয়ে এসেছে। ওই গলায় তিনি নিজের অল্প বয়সের ঠোঁট কতসময় চেপে ধরেছেন। নাদিরার গায়ের খুশবু তাঁর বড় প্রিয় ছিল। হাত দু'খানি রোগা লাগছে। শাহজাদা খুব আস্তে জানতে চাইলেন, একজন তো একই সঙ্গে অনেককে ভালবাসতে পারে নাদিরা।

—পারে। তা পারেন পীর-দরবেশের মতো মানুষ। তাঁদের ভালবাসায় মরদ আওরতের ভালবাসার ফারাক থাকে না শাহজাদা। আপনি ঘরগেরস্থি মানুষ। আপনি নিজের ছেলেকে ভালবাসবেন। নিজের মেয়েকে ভালবাসবেন। হিন্দুস্থানকে ভালবাসবেন। হিন্দুস্থানের বেসাহারা মানুষজনকে ভালবাসবেন। কিন্তু জওয়ান আওরতকে ভালবাসার সময় আপনার ভালবাসা পীর-ফকিরদের মতো ছড়িয়ে যাবে না। যে কোনও এক জায়গায় স্থির হবে।

—তাই কি ? আমি তো একই সঙ্গে তোমাকে বাসি। রানাকেও বাসি।

—এ-ভালবাসা দু'জনকে একসঙ্গে বাসা যায় না হজরত! নিজের মনকে পুছতাচ করুন। তাহলেই জবাব পেয়ে যাবেন—আপনি সত্যি কাকে ভালবাসেন। আমাকে ? না রানাদিলকে ?

—তুমি তো আমার মতো মরদ নও নাদিরা। তুমি কী করে মরদের ভাল-বাসার অলিগলি জানবে।

—আমি আপনার মতো মরদ নই ঠিকই। কিন্তু এতগুলো বছর আপনি যে আমারই মরদ। আমারই খসম। আমি আপনার ভালবাসার অলিগলি জানব না তো কে জানবে শাহজাদা ?

—আমি একই সঙ্গে তোমায় ভালবাসি নাদিরা। আবার রানাদিলকেও ভালবাসি। দু'জনের কাউকে ছেড়েই আমি থাকতে পারি না।

—ওঃ! আপনি তো খুব বাহাদুর আশিক! মুঘল ফৌজে শুনেছি দু-আসপা শি-আসপা সওয়ারি থাকে—

—হ্যাঁ নাদিরা। কোনও কোনও ঘোড়সওয়ারকে দু'টি করে ঘোড়া দেওয়া হয় —আবার কোনও কোনও সওয়ারিকে তিনটি করে ঘোড়া দেওয়া হয়। এরা অন্য সওয়ারিদের চেয়ে বেশি তংখা পেয়ে থাকে।

—জীবনে—ভালবাসার দু-আসপা শি-আসপা সওয়ারি হয় না শাহজাদা। ভালবাসায়—আসিয়ানায় এক ঘোড়া—এক সওয়ার। এক আশিকের একটিই মাসুকা থাকে।—বলতে বলতে নাদিরা বেগম তাঁর কোমর থেকে পশমিনাটা সরাতে গেলেন। অমনি পাথুরে মেঝেতে ঠং করে কী পড়ল।

শাহজাদা তা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন—একটি পুরনো আকবরি মোহর। গোল মতো। এই নাও নাদিরা—বলে মোহরটা বেগমকে দিতে দিতে বললেন, মোহর ? সুখদোলায় ?

নাদিরা তাঁর মুখে না তাকিয়ে আনমনা গলায় বললেন, হ্যাঁ। মোহর। সুখদোলায় মাথার বালিশের নীচে মোহর রেখে আমার ঘুমনোর অভ্যেস অনেক দিনের।

—তাই নাকি ? বাঃ! ভাল তো। আমি তো লক্ষ করিনি।

—হ্যাঁ শাহজাদা। ছোটবেলায় খুব ভুগতাম। বেশিরভাগ দিনই জ্বরে পড়ে থাকতাম। তাই খাওয়া হত না। আব্বা হুজুর রোজ আমায় একটি করে মোহর দিতেন। তাঁর নিজের জীবনও ছিল অনিশ্চিত—বলা যায় অনিশ্চিত শাহজাদা। মোহর দিয়ে বলতেন এটা রেখে দাও। আমি বালিশের নীচে রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভাল ঘুম। নিশ্চিন্ত ঘুম।

শাহজাদা দারা কোনও কথা বলতে পারলেন না।

॥ একাশি ॥

প্রয়াগে ত্রিবেণী সংগমে আকবর বাদশাকে ফৌজ রাখতেই হত। তাঁর হুকুমে সেখানে দুর্গ হল। বড় বড় প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়াল। ফৌজের সঙ্গে সংগে দোকানপাট আসে। আসে নায়েব। আমলা। আকবর শাহ দেখলেন—জায়গাটা শহর হয়ে উঠেছে। তখন নাম রাখলেন—ইলাহাবাদ। শাহজাহান বাদশার হাতে পড়ে সেই ইলাহাবাদের নাম ক'বছর হল এলাহাবাদ হয়েছে।

দুর্গের কাছে এক বটগাছ। হিন্দুদের বড় পবিত্র। জাহাংগীর বাদশা গাছটি কেটে লোহা দিয়ে জায়গাটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সেখানে আবার গাছটি জন্মেছে। তাই হিন্দুদের কাছে এই বট গাছের আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে। বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে তখন গংগার মাঝখানে মাসভর একটি টিলা দেখা যায়। এলাহাবাদে সে এক বিস্ময়। মাঘী পূর্ণিমায় অমৃতস্নানে দেদার ভিড়। গরমের সময় তরমুজ আর আঙুরের ছড়াছড়ি। কিন্তু সুবা এলাহাবাদের মাটিতে জওয়ান বজরা একদম হতে চায় না। সুবার নয়া সুবেদার শাহজাদা দারা ক'দিন আগে জাহানাবাদে আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশাকে এখানকার জাফরওয়ালের পশমে বোনা কার্পেট পাঠিয়েছেন।

কয়েকমাস আগে ঘোর বর্ষার ভেতরেই মামা—শায়েস্তা খাঁর হাত থেকে এলাহাবাদের সুবেদারির ভার দারা বুঝে নেন। এখানে তিনি বড় একটা থাকেন না। বাদশাকে রাজি করিয়ে তিনি নায়েব-সুবেদার হিসাবে এখানে তাঁর বিশ্বস্ত খোজা বাকি বেগকে বসিয়েছেন। এখানে এসে তো শাহজাদা অবাক। বাকি বেগ সুবেদারিতে রীতিমত পোক্ত হয়ে উঠেছে। এক ফ্রানসিসি হেকিম ঘুরতে ঘুরতে বাকি বেগের দরবারে এসেছিল। বাকি বেগ তাকে নিজের হেকিম হিসেবে দুর্গেই রেখে দিয়েছে।

সুবা হিসাবে এলাহাবাদ কম বড় নয়। মোট দশটি সরকারে পৌনে দুশোর মতো পরগনা নিয়ে এলাহাবাদ। একুশ কোটি দামের ওপর খাজনা আদায় হয়ে থাকে। চুনার, কাশী, গাজিপুর, জৌনপুর—সবই এই সুবায়।

বাকি বেগ শাহজাদাকে হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে দু দু'বার। সফল হয়নি। দারা ওসবের ধার ধারেন না। দুর্গের বাইরে নীচে বর্ষার পরেকার শান্ত গঙ্গা গেরুয়া রঙ ধরে বয়ে চলেছে। সকালবেলাতেই শাহজাদা দারা দুর্গের দরবারি বেদিতে কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে আছেন।

দুর্গের তোপখানার দারোগার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নায়েব-সুবেদার বাকি বেগ শাহজাদাকে দেখতে পেলেন। বেশ কিছুটা দূর থেকে। তার মনে হল—শাহজাদা দারা কী দেখে যেন একা একা আনন্দে হাসছেন। খোজা বাকি বেগ জীবনের ঘাটে ঘাটে অনেক ঘা-গুঁতো খেয়ে আজ সুবে এলাহাবাদের নায়েব-সুবেদার। শাহজাদাকে দেখে তার নিজেরই ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ল। গায়ে দেবার নতুন একটা আংগিয়া পেলে সেটা গায়ে দিয়ে সে নিজে এমনই একা একা মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে আসমানে তাকিয়ে হাসত। নতুন আংগিয়ার আনন্দে।

শাহজাদা নিজেই বুঝতে পারছিলেন না—ভোরবেলাতেই তাঁর এত আনন্দ হচ্ছে কেন ? সারা মন যে আনন্দে ভেসে যাবার জোগাড়। ভীষণ অধীর হয়ে পড়েছেন দারা। দু'কানে হাত রেখে সারা মন একজায়গায় করলে বাজারের গোলমালের ভেতরেও ভোমরার গুনগুনানী কানে আসে—যেন বা সারি বেঁধে হেঁটে যাওয়া পিঁপড়ের পায়ের শব্দও শুনতে পাওয়া যায়। যাকে বলে সুলতান-উল-আযকর। সেই নাম স্মরণ করলে দুই কানে খোদা শব্দটি ভেঙে পড়ে। জলপ্রপাতের মতোই।

শাহজাদা রিসালা-ই-হকনুমা লিখতে বসেছেন। খোদার কাছে যাবার রাস্তার হদিস দিতেই এই লেখা। দারা সত্যকে সরলভাবে জানতে চান। তাঁর এই জানা তিনি মানুষের ভেতর অকাতরে বিলিয়ে দিতে চান। বিলিয়ে দিতে না পারলে এই জানা জেনে কী লাভ !

সুবেদারির সঙ্গে তার নানান ঝক্কি জড়িয়ে আছে। কান্দাহার কিংবা বলখ—যাই হোক না কেন—তার সবটাই তো অভিযান—লড়াইয়ের তোড়জোড়। ঘোড়-সওয়ার, বারুদ, কামান, পদাতী, বেলদার, বন্দুকচি—হাতির শুঁড়ে দু'ধার ধারালো ভারি তলোয়ার বেঁধে দিয়ে তাকে দুশমনের ভিড়ের ভেতর ঠেলে পাঠানো। নাদিরা মানে অসুখ, অভিমান। রানাদিল মানে ঘুঙুরের ঝালরের ঝনৎকার। ক্ষণে হাসি। ক্ষণে রাগ। এই মুক্তি তো এই বাঁধন।

সেই তুলনায় আল্লা নাম সবচেয়ে সহজ, ভরাট, মধুর। যারা ইসলামে বিশ্বাসী বা যারা অবিশ্বাসী—দু'তরফের পক্ষেই এ কথা খাটে। দারার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল—বন্ধুরা ! শোনো ! এই শরীরে যে আত্মা এসেছে—তারও কারণ আছে। এর ভেতর পরমাত্মার বীজ লুকিয়ে আছে। একদিন না একদিন এই আত্মা শুধরে গিয়ে আরও খাঁটি হবে। একসময় পরমাত্মা বা সেই আমিতে ফিরে যাব।

শাহজাদার মনের ভেতর কে যেন আলো ফেলেছে। সেই আলোতে তিনি দেখতে পান—তাঁর নাড়াচাড়া করা পুরাণ—নানান ধর্মের বইপত্তর থেকে উঠে আসা আরও ঝাঁঝালো কোনও আলো তাঁর ভেতরে এইমাত্র ছড়িয়ে পড়ল।

সুখের ভেতরে থেকেও সুখে যেন মোহ না হয়। দারা বারবার নিজেকেই এ কথা বলেন। পোশাক দিয়ে কিছু বিচার করা যায় না। এই দুনিয়ায় মোহ বাড়লেই খোদাতাল্লাকে ভুলতে হয়। ঈশ্বরের পথ সহজ। তাকে ভালবাসায় পেতে হবে। আমি রোজা, নামাজ—সবার সামনে রাখি না। সেজন্যে আমার নিন্দা। সেই নিন্দাই আমার ফুলের মালা। ওই মালা গলায় দিয়ে আমি খোদার কাছে যাব একদিন। তুমি একটি নাম। তোমার একই নাম ছাড়া দ্বিতীয় নাম নেই। শোনো বন্ধু। ঈশ্বরের সাথে মিশে তোমার হৃদয়কে যদি বানাতে চাও বাগান—তবে সেই প্রিয়তমের খোঁজে বেরিয়ে পড়ো।

শাহজাদার হুঁশ হল। একজন দাখিলা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। এইমাত্র যেন কুর্নিশ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। তার হাতে মুখ আঁটা একখানি লম্বা কাগজ।

দারা কাগজখানি হাতে নিলেন ? জাহানাবাদ থেকে আব্বা হুজুরের জরুরি

তলব নয়তো ? কাগজখানি খুলেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। নাঃ! শেখ মুহিবুল্লা—বলতে বলতে তাঁর কপাল কুঁচকে যাওয়া দু'তিনটি রেখা সমান সমান হয়ে মিলিয়েও গেল। সারা মুখখানি কী এক আনন্দে ঢলোঢলো হয়ে উঠল।

জাহানাবাদ থেকে এলাহাবাদ রওনা হওয়ার আগেই এক চিঠিতে তিনি শেখ মহিবুল্লাহকে লিখেছিলেন—এলাহাবাদ সুবা আমার কাছে বাসযোগ্য মনে হচ্ছে এই ভেবে যে আমার এলাকার ভেতর মহাত্মা শেখ মহিবুল্লা বাস করছেন। দারা সেই চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্নও করেছিলেন শেখকে। তার জবাব দিয়েছেন শেখ।

শাহজাদা জানতে চেয়েছিলেন—আসিক কি এন্তেকালের পর তার মাসুকার সংগে মিলিত হয় ?

সুফি সাধক মহিবুল্লা জবাবে লিখেছেন—মৃত্যু হল বন্ধুর সংগে বন্ধুর মিলনসেতু। জ্ঞানীরা এ ব্যাপারে যে কথাই বলুন না কেন—মৃত্যুর দরওয়াজা পার হয়ে মানুষ পূর্ণ হয়।

শেখ মহিবুল্লার কথাগুলো তাঁর চিঠি থেকে সিধে উঠে এসে শাহজাদা দারাশুকোর বুকে বিঁধে গেল। আমি তাঁর পথের রাহী। এ জীবনে তাঁর সংগে মিশে যদি না-ই যেতে পারি—মৃত্যু সেতু হয়ে তাঁর কাছে আমায় পেঁাছে দেবে। আমি ভরে উঠব তখন! পূর্ণ হব। আমি নাদিরাতে আছি—রানাদিলেও আছি। আমাদের ভেতর পূর্ণ হয়ে উঠতে কে আগে এন্তেকালের বুলন্দ দরওয়াজা পার হব ? শুধু মৃত্যুই আমাদের ভেতর মিলনসেতু গড়ে দিতে পারে।

এ কথা ভাবতেই দারার দুই চোখ বিশেষ কিছুতে না তাকিয়ে কাছের মতো সামনের খোলা অলিন্দে ধরা-পড়া আসমানে আটকে গেল। এই আসমানের নীচেই বর্ষাশেষের গেরুয়া গংগা বয়ে চলেছে।

ওদিকে জাহানাবাদে শাহজাদা দারাশুকোর খুবই প্রিয় মানুষ হাকিম নুরুদ্দিন সিরাজির ডাক পড়েছে আজ অনেকদিন পরে। বাদশার দরবারে। ষাট পেরিয়ে যাওয়া সিরাজির জীবনের বালক বয়সটুকু বাদ দিলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরেই তিনি পড়াশুনোয় ডুবে আছেন। কোরান আর পয়গম্বরকে যুক্তির চশমা দিয়ে দেখে থাকেন মানুষটি। সেই যুক্তি শাহজাদা দারার ভাল লাগে। মাঝে মধ্যে বাদশা শাহজাহানও তাঁর সংগে এসব নিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন। তাছাড়াও অন্য একটি কারণে সিরাজির দিকে বাদশার একটা টান আছে। শাহজাহান হিন্দুস্থানের তিনি বলতে গেলে একজন জ্যান্ত সালতামামি। শাহজাহান বাদশার আমলে কোথায় কী হচ্ছে—কাশীর ভারতকোষের ধাঁচে হাকিম নুরুদ্দিন সিরাজি তাঁর মুয়ালাজাত লিখে চলেছেন। এতে হজরত মহম্মদের কাজকর্ম আর বাণীর যেমন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আছে—তেমনই আছে শাহজাহান আমলের বড় বড় কাজকর্মের বিশদ আলোচনা। শোনা যায়—সিরাজি অল্পবয়সে সমরখন্দের উলুগ বেগ মাদ্রাসায় পড়াশুনো করেন। কাঠ মোল্লারা অবশ্য সেকথা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, সিরাজি আসলে একটি ঠগ। অবিশ্বাসী।

হাকিম নুরুদ্দিন সিরাজি গোসলখানায় বাদশার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ

করে দাঁড়াতেই বাদশার হুকুম হল—গত এক বছরের বড় বড় ঘটনায় আপনার ব্যাখ্যা কী?

—হজরত একটা বছর তো লম্বা সময়। আমার কাছে একটি প্রহরও খুব জরুরি। কোন্ ঘটনার কথা বলব?

—আপনার বিচারে যা যা জরুরি তাই বলুন।—বলতে বলতে গোসলখানায় নির্জনতায় শাহজাহান চোখ বুজলেন। এইভাবে চোখ বুজে তিনি তাঁরই আমলে ঘটে যাওয়া বড় বড় ঘটনার ভেতর দিয়ে ঘুরে আসতে ভালবাসেন। হিন্দুস্থানে তিনিই সব তাগদের ফোয়ারা। ফোয়ারা যেন তাঁর শুরুয়াতের জলকে চিনে নিতে চায়। হাকিম নুরুদ্দিন সিরাজি নিরাসক্ত কথকের ভঙ্গিতে বলে থাকেন। যেন অন্য কোনও হিন্দুস্থান—যেন অন্য কোনও বাদশার কথা বলছেন—এইভাবে সিরাজি শুরু করলেন।

গত বছরের শীতে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে বাদশা শাহজাহান গুজরাতের সুবেদার করে পাঠান। সেখানকার সড়কে সড়কে দস্যুগিরি চরমে পৌঁছেছিল। তাদের শায়েস্তা করতে প্রায় ফৌজি অভিযান চালাতে হত। তাই গুজরাতের আরেক নাম হয়ে উঠেছিল লশকরি খেত। আগেকার সুবেদার আজম খান সেখানে গিয়ে দস্যুদের শায়েস্তা করতে নামেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব দস্যু পাহাড়িয়াদের কড়া হাতে দমন করেন। তিনি নওয়াগড়ের রাজাকে মুঘল শাহীর বরাবরে নজরানা দিতে বাধ্য করেছেন। গুজরাতের সব সড়ক এখন রাহিদের পক্ষে নিরাপদ। সেখানে এখন সদা শান্তি।

বাদশা শাহজাহান খুশি হয়ে সুবেদার শাহজাদা আওরংগজেব বাহাদুরকে ইজফা দিয়ে বার্ষিক বেতন বাড়িয়ে ষাট লাখ টাকা করেছেন।

গতবছর বর্ষার পর বাদশা শাহজাদাকে ডেকে পাঠান। বাদশা তখন লাহোরে। সেখানে গিয়ে শাহজাদা আওরংগজেব বাদশার সংগে দেখা করলেন। পরদিনই শাহী ফরমানে জানা গেল—শাহজাদা আওরংগজেব বাহাদুর বলখ্ আর বদকশানের সুবেদার—সেখানে মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালারও তিনি।

সিরাজির গলাটি যেন স্বয়ং ইতিহাস। গমগমে—নিয়তির মতো অভ্রান্ত। তিনি বলতে থাকলেন—

বলখ্-এর রাজা নজর মহম্মদ বিদ্রোহের উসকানি দিয়েই যাচ্ছিলেন। অক্ষু নদীর ওপারে তাতার হানাদাররা খাজনা বন্ধ করে দেয়। বাদশা শাহজাহান স্থির করলেন, বলখ্ আর বদাকশান জয় করতেই হবে। ওই পথ দিয়েই তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দে যেতে হয়। মুঘল শাহীর পহেলা বাদশা বাবরের দেশ ওখানেই। আর এই মুঘল খানদানের শুরুয়াৎ তৈমুর থেকেই। রাজা জগৎসিংহের রাজপুত বাহিনী রাস্তা তৈরিতে নেমে গেল। রাজপুতেরা কাবুলের দিক থেকে রাস্তা বানাতে বানাতে এগিয়ে চলল। উজবেকরা বার বার এসে হানা দিয়েও সাহসী রাজপুতদের সরাতে পারল না।

পঞ্চাশ হাজারের ফৌজ নিয়ে শাহজাদা মুরাদবকস্ বলখ্ নগরিতে ঢুকেছিলেন। নজর মহম্মদের বিশাল ধনভাণ্ডার থেকে মুরাদবকস্ নগদে বারো লাখ টাকা

আটক করতে পারেন। তাছাড়া আড়াই হাজার ঘোড়া আর তিনশো উট পেয়েছিলেন শাহজাদা মুরাদবকস্।

নিজেরই লেখা পড়তে পড়তে হাকিম নুরুদ্দিন সিরাজি লক্ষ করলেন, বাদশার বাঁ হাতের আঙুল মসনদের সোনার সুতোর কাজের ওপর চেপে বসে যাচ্ছে। সিরাজি চোখ সরিয়ে ফের তাঁর মুয়াল্লাজাতে তাকালেন।

শাহজাদা মুরাদবকস্ শীত বাড়ছে দেখে বলখ্ থেকে চলে এলেন। ফলে উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁকে বলখ্-এ প্রায় ছুটে যেতে হল। কেন না, মুঘল ঘাঁটিগুলো উজবেক হামলার ভেতরে এসে পড়েছিল। পঁচিশ হাজার ফৌজ নিয়ে আওরঙ্গজেব বাহাদুর কাবুল থেকে এগোতে লাগলেন। শাহী খাজানাখানা থেকে শাহজাদার জন্যে পঞ্চাশ লাখ তংখা বরাদ্দ হয়েছে।

বাদশা শাহজাহান চোখ খুললেন। বললেন, এরপর তো আপনার পক্ষে আর জানা সম্ভব নয়। এখন থেকে বলখ্ অনেক দূর।

সিরাজি বাদশাকে তসলিম জানিয়ে বললেন, এখানে এসে আমিও থেমে গেছি।

বাদশা ফের চোখ বুজলেন। নির্জন গোসলখানায় পাথর মূর্তির মতো চারজন পাহারা-আহেদি দাঁড়িয়ে। সিরাজি চুপচাপ তাঁর লেখা মুয়াল্লাজাতের খোলা পাতার সামনে বসে।

চোখ বুজে শাহজাহান বলখ্-এ পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলেন। সেখানকার পাহাড় পথ—পাহাড়ি ধাঁচের মসজিদের চুড়ো—সবই যেন তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

একদম চোখ খোলা রেখেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরকে এগোতে হচ্ছিল। রাজা জগৎ সিংহের রাজপুত ফৌজে পাথর কাটার বেলদার ছিল। ওরা অন্য সময় পাথর গোলাই করে কেটে তোপের চেহারা দেয়। বারুদ ফুরোলে ওই গোলাই তোপ করে দাগা হয়। পাহাড়ের পর পাহাড়। দুনিয়া তৈরি হওয়ার সময়কার চেহারা সব পাহাড়ের। এগোনো মানে ঘুরে ঘুরে পাক দিয়ে এগোনো। সিধে যাবার উপায় নেই। সে পথে একদিকে পাহাড়। আরেকদিকে গভীর খাদ। ফৌজি রসদ বইবার খচ্চরদের পিঠে গেঁহুর বস্তা, বারুদের বাঁধাছাঁদা চুপড়ি। পাছে গভীর খাদ দেখে ভয় পেয়ে খচ্চর লাফ দেয়—তাই ওদের সবার চোখে আলি মর্দানের পরামর্শে ঠুলি পরানো হয়েছে। এ লড়াইয়ে শাহী ফৌজ থেকে আলি মর্দানই শাহজাদাকে সলা দেবার লোক।

শীত ফুরিয়ে এল। কেননা, খাদের গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের গা থেকে আস্ত আস্ত তুষার চাক্ সারাদিনই ঝরে পড়ছে। এখানে আসমান বলতে শুধু পাহাড়। দুই পাহাড়ের ফাঁকে আকাশ সামান্য—ধোঁয়াটে আর মেঘলা।

তাতার আর উজবেক ঘোড়সওয়াররা এ পথের সঙ্গে পাহাড়ি বিছের মতোই বড় হয়েছে। ওরা আচমকা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তুলে হাজির হয় আর ঝাঁকে ঝাঁকে বিষতীর ছুড়ে হাওয়া হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ফৌজের পাঁচ-ছ'টা ঘোড়া—কিংবা তিন চারজন সওয়ার ঢলে পড়ে। একটা তীর তো একদিন খোদ

শাহজাদার বুকে এসে ঠং করে বাজল। লড়াইয়ের সাজের নীচে বুক জুড়ে লোহার পাত বসানো থাকায় তা কাবু করতে পারেনি আওরংগজেবকে।

যতই মুঘল ফৌজ এগোচ্ছে—ততই তারা এই কশাক ধাঁচের আচমকা হামলার সংগে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের পালটে নিচ্ছিল। ফৌজ এক একদিন এই পাহাড়ি পথে কুচ করে তিন মঞ্জেল অব্দি এগিয়ে যায়। সন্ধের মুখে শাহী লাল তাঁবুতে শাহজাদা ঢুকে পড়েন। ওর ভেতরেও তিনি কখনও তাঁর নামাজ খেলাপ করেন না।

বলখ্ নগরিতে ঢোকার মুখে উজবেকেরা টিলার আড়াল থেকে পাথর বৃষ্টি শুরু করে দিল। শাহজাদা মীর আতসকে হুকুম দিলেন—কামানের মুখ উঁচু করে তোপ দাগা হোক। এ হুকুমে কাজ হল।

রাতের দিকে নিজের তাঁবুতে বসে শাহজাদা প্রায়ই পেছন ফিরে তাকান। আমি আগুনে পুড়ে যাওয়া বাজিকে দেখতে গিয়ে অসাবধানে এমন কিই বা বলেছিলাম—যে জন্যে আব্বা হুজুর আমার ইজ্জতের কথা একবারের জন্যেও হিসেবে না এনে সরাসরি আমার পাহারা-রিসালা তুলে নিলেন? এককথায় দক্ষিণের সুবেদারি আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন?

আমি কি শাহজাদা দারার মতোই হিন্দুস্থানের বাদশার আরেকজন ছেলে নই? বড়ে ভাই আব্বা হুজুরের কানে আমার সংগে দুশমনি করে কতটা বিষ ঢেলে থাকতে পারেন—যার দরুন আমি একজন ছেলে হয়েও আমার আব্বা হুজুরের স্নেহ থেকে একদম বঞ্চিত হব?

শীতের বালাই নেই দিনের বেলায়। রাতের বাতাসে কঠিন হিম। তার ভেতর তাঁবুতে বসে ঘুম আসে না শাহজাদা আওরংগজেবের। বাদশা আমায় এই অভিযানে সিপাহসালার করে পাঠালেও শাহী ফৌজের আলি মর্দানকে সংগে জুড়ে দিয়েছেন। আমি হাত খুলে লড়তে পারছি না। খোদ বাদশা কাবুলে এসে বসে আছেন। রোজকার দাখিলা—রোজকার হুকুম, খবর—সবই কাবুল থেকে আসছে—আবার কাবুলে পেঁছেও দিচ্ছে।

শাহী লাল তাঁবুর ভেতর সুখদোলায় বসা শাহজাদা আওরংগজেব এখন একদম একা। তাঁর মুখোমুখি ফৌজি বাতিদানের শিখাটি সিধে হয়ে আলো দিচ্ছে। এ-জায়গা এত উঁচু—এখানে বাতাসে এখনও রাতের দিকে তুষারকুচি ওড়ে। একটু অসাবধান হলেই বুকে ঠান্ডা বসে যায়। এমনিতেই ঠান্ডায় মাথা ধরে যায় সন্ধের পর। কোনও কোনওদিন শীতে বমি পায় শাহজাদার। খিদে হতে চায় না। তার আঠাশ-উনত্রিশ বছরের তাজা শরীরটায় যেন মরচে পড়ে যাচ্ছে। শুধু নিজের শরীর নয়—ঘোড়াদের শরীর—খচ্চরদের শরীর—সওয়ারদের শরীর—সবদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে আওরংগজেবকে। তিনি বাদশার ফরমানে বলখ্ বদকশানের সুবেদার যেমন—তেমনই এই মুঘল ফৌজের সিপাহসালারও তিনি।

হঠাৎ ভীষণ রাগে উঠে দাঁড়ান শাহজাদা। বিড় বিড় করে বাতিদানের শিখাটির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—

বড়ে ভাই! আপনি দোবারা কান্দাহারে লড়তে গেলেন। একবারও দুশমনের মুখোমুখি হলেন না। অথচ ফিরলেন যখন হিন্দুস্থানের কিল্লায় কিল্লায় বাদশার হুকুমে আপনার জন্যে তোপ দাগা হল। যেন বা দুশমনের হাত থেকে কান্দাহার ছিনিয়ে এনেছেন।

বড়ে ভাই! এই জাল ফতে জংয়ের জন্যে আপনি ইজফা পেলেন। বাদশা আপনার মনসব বাড়িয়ে দিলেন। সওয়ার বাড়িয়ে দিলেন।

আর আমি খান্দেশ, বেরার, মালবে, দৌলতাবাদে বসে অজন্মা জমিতে ফসল ফলালাম—চাষী বসালাম—শাহী খাজানাখানা থেকে একটি দামও পেলাম না—তবু শাহী খাজনা পুরোপুরি আদায় উসুল করে দিয়েও পেয়েছি বাদশার কটু কথায় ভর্তি কয়েকখানি চিঠি মাত্র। সেসব চিঠিতে আগ্রা শুধুই আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে চেয়ে আমাকে হয়রান করেছে।

হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে আমার ইজ্জতের কোনও দাম নেই। হাসতে হাসতে আগ্রায় গেছি বাজিকে দেখতে। বিকেলের ভেতর আমার সুবেদারি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সুবেদারিতে আমার কোনও লালচ নেই বড়ে ভাই! বরখাস্ত হবার খবর কানে আসতেই আমার কোমরের তরোয়াল আমি খুলে ফেলেছিলাম। ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরিও হয়েছিলাম।

বুন্দেলায় বাগীপনাহ্ শায়েস্তা করার এই কি ইজফা! গোলকুণ্ডা, বিজাপুরে মুঘল ধবজা উড়ুক—তাই তো চেয়েছিলেন পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা। তাঁর সে খোয়াব আমারই হাতে সত্যি হয়ে উঠল। তারই ইজফা কি আমার এই বে-ইজ্জতি?

দক্ষিণে এখন আঙুর ফলে। আখ হয়। চাষীরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালায় না। শাহী আদায় পুরোপুরি উসুল হয়। তারও ইজফা কি বাদশা আপনার কথায় আমায় বরখাস্ত করে বুঝিয়ে দিলেন?

সেই সে কোন কবে আগ্রায় পাগলা হাতির মুখোমুখি বর্শা ছুঁড়ি যেদিন—সেদিন সবার প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতে বুঝতে পেরেছিলাম—আপনিও তো সেখানে ছিলেন বড়েভাই—কিন্তু আপনি এগিয়ে আসবেন না। একজন মুঘল শাহজাদার কাছে কি এমনটি আশা করা যায়?

আমার বাহাদুরির সব ইজফা আজ আমার মিলেছে বড়ে ভাই! শয়তানও আসতে চাইবে না—এমন জায়গায় আমাকে মুঘল ফৌজের সিপাহশালার করে বাদশা পাঠিয়েছেন। এখানে তুষার পেছল সরু গিরিপথ। পাশেই অথৈ খাদ। বাতাসে উজবেকদের সাঁই সাঁই তিরতীর। তবু আমি আল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি—আমি জং ফতে করেই ফিরব।

আমি এই নিশুতি রাতে পাহাড়ে তাঁবু ফেলে পড়ে আছি। এখানে বাদশা জং ফতে করেও কিছুই পাবেন না। এসব জায়গা বাবর বাদশার দেশ হলেও এখানে এখন শুধুই পাহাড়—নোংরা উজবেকের দল আর কিছু নীল গাই।

আর আপনি বড়ে ভাই!

আপনার বাহাদুরির জালসাজিস আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে। লাহোর

দুর্গে বসে শীতের রাতে আগুনের তাপ পোহাতে পোহাতে আপনি সব না-পাক অবিশ্বাসী সাধু সন্ন্যাসী নিয়ে নরক গুলজার করছেন। আর কাবুল থেকে বাদশার হুকুম মতো বনজারা চৌধুরীদের ঠিকা পাইয়ে দিচ্ছেন। তারা পোকায় কাটা গেঁহু, ময়লা রেড়ির তেল, সোহাগা, ভিজে বারুদ, নিরেস সোরা আমাকে এই পাহাড়ে পাঠাচ্ছে। আপনি লাহোরে এখন মুঘলশাহীর সবচেয়ে সেরা ঠিকাদার বনেছেন! লাহোরে সুবেদারিকে সুবেদারি! আবার ঠিকেদারিকে ঠিকেদারি! চমৎকার!

রাগে, দুঃখে নিষ্ফল আক্রোশে নওজওয়ান শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর তাঁর সুবেদারি তাঁবুর ভেতর একা একা নিশুতি রাতে কাঁপছিলেন।

পরদিন ভোর থেকেই উজবেকরা দলে দলে এসে চারদিক থেকে হামলা শুরু করে দিল। শাহজাদা বলখ্ দখল করে খানিক এগিয়ে এসে দুই পাহাড়ের মাঝখানের গিরিপথে তাঁবু ফেলেছিলেন। জায়গাটার নাম আকচা। তার নকশাটা এরকম: রাজধানী বলখ্ তো দখলেই আছে। সুবিধা দেখে এবার এগোনো যাবে। উজবেক হামলার মুখে শাহজাদা বাজাই ঘোড়সওয়ারদের দিয়ে একটা ফিকা পর্দা তৈরি করলেন। তার পেছনে রাখলেন সহজে জায়গা বদলানো যায়—এমন তিন সারি কামান। কামানের পিছনে অন্তত বারো রিসালা বন্দুক-বাজ ঘোড়সওয়ার। রোদ এখানে নরম। সূর্য মাথায় ওঠার আগেই কাজ হল। উজবেকদের আস্তানা দখল হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে সব কেমন শুনশান লাগল। উজবেকরা কোথায় গেল? আওরঙ্গজেব বাতাসে লড়াইয়ের গন্ধ পান। তিনি তাড়াহুড়ো করে রাজধানী বলখ-এর দিকে ফিরলেন। শাহজাদার সন্দেহ ঠিকই মিলে গেল।

উজবেকরা রাজধানী মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আওরঙ্গজেব ভেবেছিলেন, আকচা থেকে তৈমুরাবাদের দিকে এগোবেন। তা আর হল না। উজবেকদের সুলতান আবদুল আজিজ—তার ভাই সুভান কুলি আর উজবেক সর্দার বেগ উঘলি তিনদিক থেকে মুঘল ফৌজের ওপর হানা দিল। কিন্তু মুঘল কামানের মুখে ওরা শেষ অব্দি দাঁড়াতে পারল না। যে কোনও অবস্থাকে মনে মনে মেনে নিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেব লেগে থাকতে পারেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। সুলতান আবদুল আজিজ তাঁর দুই নাতিকে আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠালেন। তারা শাহজাদাকে কুর্নিশ করার চেষ্টা করল। হল না।

শাহজাদা বললেন, হয়েছে। হিন্দুস্থানে গিয়ে কুর্নিশ করা শিখবে তোমরা। এখন বল কী ব্যাপার?

দুই নাতি দু'খানি সাদা পশমের থান মেলে ধরল। তার মানে শান্তি।

শাহজাদা হাসতে হাসতে বললেন, কী? তোমাদের দাদাসাহেবের লড়াইয়ের সাধ মিটে গেল?

দুজনের ভেতর একজন কিছু বেশি লম্বা। দুজনেরই মাথার চুল বেণী করে পাকানো। পায়ের পশমি পটিতে কোনও পাহাড়ি পাখির পালক গোঁজা।

সোনালি পালক। সেই রংয়ের পটি কপালেও বাঁধা। গায়ের ওপরের দিককার আঙ্গিয়া নীলগাইয়ের চামড়ায় তৈরি। তাতে গাইয়ের বেঁচে থাকার সময়কার লোম একটিও পড়েনি।

সবই খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আওরঙ্গজেব বড় জনের কাছ থেকে জবাব পেলেন। সে বলতে লাগল, দাদাসাহেব বলছিলেন—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করাও যা—নিজের ধ্বংস ডেকে আনাও তাই।

শাহজাদা ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সরল, পাহাড়ি কিশোর। সব সময় চেষ্টা করে যেন নিজেদের ভেতরকার দমকা হাসির ঝর্ণা চেপে আছে। যে কোনও সময় হেসে উঠতে পারে। লড়াইয়ের মতো মরণ বাঁচন ব্যাপার বলেই যেন অনেক কষ্টে ওরা গম্ভীর হয়ে আছে। ওদের চেয়ে কিছু কম বয়সে—শাহজাদার মনে পড়ল—আব্বা হুজুর আমাকে আর বড়ো ভাইকে দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার কাছে গচ্ছিত রাখতে পাঠিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আর বাগী হবেন না—এই শর্ত মেনে নিয়েই সেদিনকার শাহজাদা খুর্‌রম তাঁর দুই ছেলে—সুলতান দারাশুকো আর সুলতান আওরঙ্গজেবকে হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন বুঝতেই পারিনি—একদিন বড়ো ভাই এমন হয়ে যাবেন। আমরা দু'ভাই হাতির পিঠে গাদেলায় বসে রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার কাছে হাজির হয়েছিলাম সেদিন।

—তোমাদের দাদাসাহেব নিজে এলেন না কেন?

—সারাদিন ঘামাসান লড়াই গেল। শরীর ভাল নেই তাঁর।

আওরঙ্গজেব দুই বালকের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওরা কি জানে—আগ্রা জাহানাবাদে ময়ূর সিংহাসনে হিন্দুস্থানের যে বাদশা বসেন—যাঁর হুকুমে বিশাল মুঘল ফৌজ পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যে কোনও দেশ দখল করতে পারে—তাঁর পূর্বপুরুষ বাবর বাদশা সমরখন্দ থেকে এই ন্যাড়া পাহাড়ি এলাকা পেরিয়েই হিন্দুস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন একদিন। যে কোনও তুজুক—যে কোনও তাওয়ারিখ আসলে তাগদের খেলা। দুশমনকে ঘাড় ধরে নত করাই ইতিহাস।

পাহাড়ে রাত আসে দৌড়ে। আসমানে ক'দিন ধরেই অসময়ে মেঘের খুব গুড়গুড়ি। এখনও বর্ষার অনেক দেরি। নিরাপদ জায়গায় তাঁবু ফেলা দরকার। মেঘের আওয়াজ হলেই ফৌজি হাতির দঙ্গল খুব চিৎকার করে। একেবারে বুকফাটা আওয়াজ। শাহজাদা আওরঙ্গজেব সে আওয়াজ একদম সহ্য করতে পারেন না। সিপাহ-শালার হিসেবে তাঁর এখন পিছিয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। লড়াই দিয়ে যেতেই হবে। নয়তো উজবেকরা—তাতাররা ভাববে—এ কি ডরপোক সিপাহ-শালার। তেমনি তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে—কোন পথে ফেরা যায়। আর যাই হোক—বলখ কোনও থাকার জায়গাই না।

সুলতান আবদুল আজিজের দুই নাতি তসলিম জানিয়ে চলে গেল। মুঘল ফৌজের তরফে সলাহ দেবার জন্যে সারা অভিযানে শাহজাদার সঙ্গী আলি মর্দান। মানুষটি লড়াইয়ের ভেতর বেড়ে উঠেছেন। সারা জীবন ধরে তিনি যা

ভাল বোঝেন—তা হল লড়াই। এমন মানুষকে আওরঙ্গজেবের বড় পছন্দ। যে মানুষ যে-জন্যে—তা যদি তিনি না হন—তো বোঝা মাত্র—বিরক্তিকর।

মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়সে দক্ষিণে চার সুবার সুবেদারি করতে গিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে অনেক দাম দিয়ে তবে অনেক জ্ঞান কিনতে হয়েছে। আলি মর্দান লড়াইয়ের আসিক। মুর্শিদকুলি খাঁ খাজনা আদায়-উসুল—জমি জিরেত বাটাবাটির জহুরি। এমন মানুষদের নিয়ে যদি একটা শাহী গড়ে তোলা যেত—তো সেখানে আম আতরাফ মানুষজন কোনও কষ্ট পেতেন না। অপচয় হত না। সময় বাঁচত। অপদার্থ মানুষ ক্ষমতার চুড়োয় ফাঁকি দিয়ে বসতে পারত না।

আবার। আবার সেই বড়ে ভাইয়ের কথা এসে যাচ্ছে। শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। আমি আপনার কথা ভাবতে চাই না। কিন্তু এমনই নসিব! যেদিকেই ভাবি—সেদিকেই ভাবনা আপনাকে টেনে আনে।

আপনি কোনওদিনই কোনও সুবেদারি করেননি। অথচ আপনি এলাহাবাদের সুবেদার। আপনিই লাহোরের সুবেদার। আপনি কোনওদিন ফৌজদারি করেননি। অথচ আপনিই সরকার কোয়েলের ফৌজদার! এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনিই সরকার হিসারের ফৌজদার। কারণ, ওখানে সম্বচ্ছরে সাড়ে বাইশ লাখ টাকার রাহি আদায় হয়। হিন্দুস্থানের সর্বশক্তিমান বাদশা চান—আপনি এই রাহি পান।

আপনারই অনুগ্রহে সামান্য খোজা বাকি বেগ আজ এলাহাবাদ সুবার নায়েব-সুবেদার। কারণ আপনি যে একজন গরহাজির সুবেদার! তাই বিশ্বস্ত খোজা আপনার হয়ে সুবা চালায়। দরকার মতো আপনার ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেবের দুশমনি করে তাঁর মুখের কথা ভেঙেচুরে আপনার পছন্দসই করে তবে আপনার কানে ঢালে।

সত্যিই যদি কোনওদিন হিন্দুস্থান আপনাকে বাদশা হিসেবে পায় তো আপনি কী করবেন?

বাবর বাদশা লড়াই করেছেন। করেছেন হুমায়ুন আকবর। আমাদের আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশাকে তো হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু মনে করা হত। কিন্তু আপনি?

আপনি তো সুলতান-উল-আযকর, হবস্-ই-দম নিয়ে ব্যস্ত। সন্ন্যাসীরা এসে আপনার অন্দরমহলে যোগাসনে বসে যায়। ফকিররা কেরামতি দেখায়। অথচ আপনি মনে করেন—আপনি একজন সিপাহ-শালার—সুবেদার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব অস্থির হয়ে পড়লেন। দারা। দারা। এ-চিন্তা থেকে মুক্তি চাই। আমি যেটুকু পেয়েছি—সবটুকুই লড়াই করে পাওয়া। বুন্দেলা, দৌলতাবাদ, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, গুজরাত—আমার এই জওয়ান বয়সের এক একটি ফলক। খোদা জানেন কোথায় গিয়ে শেষ হবে এসব। এখন আমি বলখ্-এ।

আলি মর্দান শাহী তোপখানার বারুদ যাচাই করছিলেন। মীর আতস মানুষটি

তার নিশানাবাজির জন্যে বেশি মাইনে পেয়ে থাকে। ফার্নাসিস দেশের লোক। সে এই ন্যাড়া ঠান্ডা পাহাড়ে আর থাকতে চায় না।

আলি মর্দান বললেন, বেশিদিন আমরাও থাকব না।

মীর আতস হাত পা নেড়ে বলল, পথে সুরেকালি নদী শীতে কিন্তু বরফ হয়ে যাবে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব কোনও কথা না বলে—বিদেশী গোলন্দাজের কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। তিনি টেরও পেলেন না—কখন সাদির রুবাই এসে তাঁর ঠোঁটে ভর করেছে। তিনি আপনা আপনিই বিড়বিড় করতে লাগলেন।

॥ বিরাশি ॥

শাহজাদী জাহানারা রাও ছত্রশালের মুখে মোট দু'বার গান শুনেছেন। একবার হোলির পর। আগ্রা দুর্গে। বাদশা শাহজাহান তাঁর এই সামন্ত রাজাটিকে রীতিমত পছন্দ করেন। দুর্গে হোলির পর বিশেষ ক'জনকে নিয়ে বাদশা ঘরোয়াভাবে বসেছিলেন। তখন সেখানে ছত্রশাল দু'তিনখানি হোলিতে গান গেয়েছিলেন। সেই গায়কী। গলায় আচ্ছন্ন করে দেওয়া স্বর—ভুলতে পারেন না জাহানারা। সরু কোমর—বিরাট কাঁধ—প্রায় চোখ বুজে গাইছেন মানুষটি—মাঝে মাঝে হরিণ-চোখ সামান্য খুলে যাচ্ছে—তা দেখে শাহজাদীর বুক কেঁপে উঠছে।

—আরেকবার—বর্ষায় সেবার যমুনা দু'কূল ভাসিয়ে আগ্রায় উঠে এসেছে। বর্ষা চলে গেল। কিন্তু জল নেমে যাবার নাম নেই। চরজমির ফুলচাষ একদম ভেসে গেছে। তরমুজের জমি তৈরি করা যাচ্ছে না চরে। সেই সময় একবার বাদশার ইচ্ছেতেই দেওয়ান-ই-খাসে গান গেয়েছিলেন ছত্রশাল। অত বড় যোদ্ধা—যোদ্ধার মতোই গান গেয়েছিলেন তিনি। রাগরাগিণীর সে কী সুন্দর কসরত। সবটাই বীরদর্পে। অথচ কী মোলায়েম। ভুলতে পারেন না জাহানারা।

এইসব ভাবতে ভাবতেই অন্দর মহলের খোলা অলিন্দ দিয়ে শাহজাদী দেখতে পেলেন—দিল্লির এক সেরা গায়ক চলেছেন। রীতিমত দীনহীন পোশাকে। হাতের ইশারায় কোয়েলকে ডাকলেন জাহানারা। যা তো। ওঁকে ডেকে আন—

কোয়েল অবাক হল। এই সকালবেলায়?

—বললাম তো। ডেকে আন।

খানিক বাদে শশব্যস্ত গায়ক এসে কুর্নিশ করলেন শাহজাদীকে।

জাহানারার অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না। তিনি এই গায়কের গান আগে কয়েকবার শুনেছেন। চোখের ইশারায় অন্দরমহলের পয়লা খোজাকে ডাকতে বললেন।

কোয়েলের ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই খোজা এসে হাজির হল। শাহজাদীর হুকুম হল—এই মেহমানের জন্যে সেরা দরবারি পোশাক আনাও।

গায়ক তো ঘাবড়ে গিয়ে রীতিমত ঘামছেন। তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে

জাহানারা বললেন, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে।

গায়ক খুব খুশি হয়ে উঠছিলেন। আবার একথাও ঠিক—হয়তো ভাবছিলেন—বলা নেই—কওয়া নই—হঠাৎ এত খাতির কেন? শেষে গর্দানটা যাবে না তো? শাহজাদা শাহজাদীদের খেয়ালের তো কোনও অন্ত নেই।

দরবারি পোশাকে গায়ককে সাজিয়ে জাহানারার বড় ভাল লাগল। এই পোশাকে ছত্রশালকেও তো সাজাতে পারতাম। কিন্তু তিনি তো আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরিষ্কার লিখেছেন—কোনও মুঘল শাহজাদীর মুরাক্কায় চৌহান রাজপুত সামন্তের তসবির শোভা পেতে পারে না। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ কী? মানে কী? তিনি হিন্দুস্থানের গর্ব। বিরাট যোদ্ধা। ভয়ংকর সুন্দর মানুষ। আবার গান করেনও আশ্চর্য। তাঁকে দরবারি পোশাকে সাজিয়ে আমার বুক ভরে যেত। এখন সেই পোশাকে সাজালাম দিল্লির সেরা গায়ককে। তাঁকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ছত্রশালের তুলনায় বড় দীন মানুষটি। আর ভাবতে পারছিলেন না জাহানারা। এই দুনিয়া কী দয়ামায়াশূন্য। এই দুনিয়ার নিশ্বাসও যে গরম ঠেকছে।

জাহানারা শান্ত মুখে হাসলেন। তার মানে—এবার আপনি আসতে পারেন।

গায়ক পিছু হটতে হটতে কুর্নিশ করে চলে যাচ্ছিলেন।

জাহানারা বললেন, দাঁড়ান। আপনি এখন থেকে এই পতাকা নিয়ে চলাফেরা করবেন।

গায়কের তো গলে পড়ার দশা। খোদ শাহজাদী জাহানারার কাছ থেকে পতাকা পাওয়া মানে বিশেষ সম্মান—আলাদা খাতিরদারী। হয়তো ভাল করে সংসার চলে না। চল্লিশের ভেতর বয়স। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে কৃতকৃতার্থ গলায় তিনি জানতে চাইলেন, শাহজাদী যদি ফরমায়েস করেন তো তিনি এক্ষুনি গান গেয়ে শোনাতে পারেন।

শাহজাদী ভদ্র গলায় বললেন, অন্য কোনওদিন সুন্দর কোনও সময়ে শোনা যাবে। আপনার গান তো আমার কানে লেগে আছে।

এ কথার মানে জানেন গায়ক। তিনি আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলেন। কিন্তু সেদিনই সন্ধেবেলা এক গন্ডগোল হয়ে গেল।

হিন্দুস্থানের খোদ শাহজাদী জাহানারার কাছ থেকে পতাকা পাওয়া যা তা কথা নয়। গায়কের বুকে তো প্রবল উৎসাহ। দিল্লি-জাহানাবাদে যত গাইয়ে বাজিয়ে আসেন—তাঁদের না জানানো অব্দি তিনি স্থির হতে পারছিলেন না।

সন্ধে হতেই চারজন ঘোড়সওয়ার আর আটজন পদাতী ভাড়া করে সেই গায়ক বেরিয়ে পড়লেন। সামনে পদাতী। দুপাশে দুজন করে ঘোড়সওয়ার নিয়ে নিজেও একটি ঘোড়ার পিঠে বসেছেন। হাতে শাহজাদীর দেওয়া পতাকা। সিধে দেওয়ান-ই-খাসে এসে হাজির।

আসার পথে জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের বিখ্যাত মনসবদার মহবত খানের সঙ্গে গায়কের দেখা হয়েছিল। মহবতখান দরবারের দিকে আসছিলেন। তাঁর দুই ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে গায়কের ঘোড়সওয়ারের লেগে গেল।

মহবত খান দাঁড়িয়ে পড়ে গমগমে গলায় জানতে চাইলেন, কে যায়—

একজন পদাতী বলল, দিল্লির সেরা গায়ক। শাহজাদী জাহানারা গায়ককে নিজের হাতে পতাকা দিয়েছেন—

এসব কথার সময় পতাকা হাতে গায়ককে তাঁর ঘোড়া খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে গায়ক এই গোলমাল লক্ষই করেননি। তিনি নয়া দরবারি পোশাকে শাহী পতাকা হাতে রীতিমত মশগুল হয়েছিলেন।

মহবত খাঁ রীতিমত রুষ্ট হলেন। মুখে শুধু বললেন, ওঃ।

দরবারে বসে বাদশা দেখলেন, মহবত খাঁয়ের মতো আমির কোনও পতাকা ছাড়াই আসছেন। বাদশা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, পতাকা কোথায় আপনার?

—হজরত। আমার তো কোনও পতাকার দরকার নেই।

—কেন?

—এই দরবারে গায়ক পতাকা নিয়ে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। সুতরাং আমিরের পতাকার তো কোনও দরকার নেই!

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা হুকুম দিলেন, গায়কেরও পতাকার কোনও দরকার নেই।

রাত গভীর হবার আগেই কোয়েল খবরটা নিয়ে এল। জাহানারার মনে পড়ল, কিছুকাল আগে আরেক গায়ককেও তিনি একইভাবে পতাকা দিয়েছিলেন। সেবারও সেই গায়ক একইভাবে মহবত খাঁয়ের ঘোড়সওয়ারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেবারও অবিকল একই ঘটনা ঘটেছিল। সেবারও মহবত খাঁ তাঁর বিরক্তি জানাতে পতাকা ছাড়াই দরবারে গিয়ে বাদশার চোখে পড়েছিলেন। বাদশাও সেবার হুবহু একই হুকুম দিয়েছিলেন।

গতবারের চেয়ে এবারে ফারাক শুধু এই—সেবারে মহবত খাঁয়ের ধারণা হয়েছিল—গায়ককে পতাকা দিয়েছেন শাহজাদা দারা। তাই সেবার মহবত খাঁ শাহজাদা দারার ওপর রেগে গিয়েছিলেন। এবার তিনি রাগ করলেন আমার ওপর।

জাহানারা বুঝলেন, বাদশার দরবারে তাঁদের দুশমন অনেক। সেই সংখ্যা আরও বাড়ল। আওরঙ্গজেবের দোস্ত অনেক। শাহজাদা দারা এমনি খোলা দিলের মানুষ। গরম জোসের নওজওয়ান। কিছুটা গর্বিতও বটে। তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অনেক সময় মানী মানুষের ইজ্জত রাখতে জানে না। ফলে অনেক সময় দোস্তও সরে গিয়ে দুশমন হয়ে ওঠে।

আরও বেশি রাতে কোয়েল দরবারের আরও খবর নিয়ে এল। মহবত খাঁ নাকি খোদ শাহজাদা দারাকেই বলেছেন, একজন সামান্য গায়ক। তার কী দরকার ছিল পতাকা আর পদাতীর? যখন একজন মানী মানুষ পথে হেঁটে চলেন—মানুষ পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু দিল্লির গায়কের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে?

দারা তো বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তিনি মহবত খাঁয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। সব শুনে লজ্জায় জাহানারার মাথা নুয়ে পড়ল। তিনি তাঁর অন্দরমহলে সুখদোলায় এসে আছড়ে পড়লেন। নিজেকে যেন দীন ভিখারিনীর মতো অন্দর মহলের নির্জনে লুকিয়ে ফেললেন। নিজেকে বড়

উপবাসী লাগে জাহানারার। তাঁর হৃদয়ের কোনও তৃষ্ণাই মেটেনি। ছত্রশালের ওপর ক্ষোভে—অভিমানে তিনি দুনিয়ার চোখে গায়কের কদরদারি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফল এই। ওড়না কাঁধের ওপর দিয়ে শাহজাদী উঠে বসলেন। বাইরে সারা রাজধানী এখন ঘুমোচ্ছে। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল।

পাহাড়ে শীত পাহাড়ের মতোই নির্মল। হিন্দুস্থানের বাদশার খোয়াব সফল করতে বাদশার ফরমানে বলখ্ বদকশান অভিযানে মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার হয়ে এসেছিলেন। শাহজাদা আওরংগজেব। এখন প্রবল তুষারপাতের ভেতর আরওংগজেব ফিরছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন—বাবর হুমায়ুনের দেশে যাবার এ-পথে আর যাই হোক থাকার মতো কোনও আকর্ষণ নেই। বরং এখানে অভিযান মানে জয় করেও নিষ্ফলা জয় মাত্র। পাহাড়ের পর পাহাড়। কিছু কাঁটাঝোপ। খাদ। আর উসুরি উজবেকদের বিষতীর। ঝাঁকে ঝাঁকে।

প্রচণ্ড তুষার পড়ছে। সামনে সুরকলি নদী। তার বুক জমে গিয়ে পাথর-বরফ হয়ে আছে। গিরিপথ একদম নদীর গা ঘেঁষে। সরু মতো। মাথার ওপর তাতাররা সুবিধা মতো পাথর গড়িয়ে দিচ্ছে। তাতে সকাল থেকে এই দুপুরের ভেতর সাতটি শাহী হাতি ঘায়েল হয়ে সুরকলির বরফ জলে ভেসে গেল।

তুষার-পেছল পাহাড়ি পথ বেয়ে নামতে নামতে শাহজাদার মন বলল, বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোর পরামর্শেই আব্বাহুজুর আমায় এই নিষ্ফল মরণ-অভিযানে পাঠিয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে তুষার ঝড় শুরু হয়ে গেল। তার ভেতর ক্লান্ত শ্রান্ত আলি মর্দান ফিরে এলেন। একা। তাঁর ঘোড়াও জখম। রীতিমত খোঁড়াচ্ছে।

সন্ধ্যায় ভিজে তাঁবুর সামনে মশালের আলোয় নিশ্চুপ আলি মর্দানকে দেখে শাহজাদার বুকটা ধক্ করে উঠল। এ কী? আপনি ফিরে এলেন? এখন?

আলি মর্দান কোনও কথা বলতে পারছেন না। এই মানুষটিকে বড় পছন্দ আওরংগজেবের। কাজের মানুষ। যোদ্ধা আবার কারিগরও বটে। একটা কামান আগাগোড়া খুলে ফেলে ফের জোড়া দিতে পারেন। কাজ বোঝেন। ইনিই নয়া রাজধানী জাহানাবাদের লালকিল্লা ঘিরে নালা কেটে তাতে সারা বছর যমুনার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

আলি মর্দান মুখ তুলে চাইলেন। চর্বি দিয়ে জ্বালানো মশালের আলোয় সে মুখ দেখে শাহজাদার মনে হল—একটি ধ্বংসস্তূপ।

আওরঙ্গজেব কোনও কথা জানতে চাইতে পারলেন না। আলি মর্দান কোনওমতে বললেন, নদীর গা ঘেঁষে ফৌজ নিয়ে চড়াই ধরার চেষ্টায় ছিলাম। ওখানটায় পাহাড়ি পথ আর সুরকলির বরফ ঠাণ্ডা জল একাকার হয়েছিল। ঘোড়াদের পা ডুবে যাচ্ছিল। এমন সময় ধস নামল—

—ধস?

—হ্যাঁ শাহজাদা। পাহাড়ি ধস। মাথার অনেক ওপর থেকে। আর সেই সঙ্গে সুরকলির বুকের বরফ অনেকটা জুড়ে নিমেষে যেন গলে গেল।

—ফৌজ ?

—একজনও বাঁচেনি শাহজাদা। পাথর-চাঁই হুড়মুড় করে গড়িয়ে নেমে এল। ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে জলের গভীরে ছুটে গেল। বরফের নীচেই পাহাড়ী নদীর চোরাবান। ওরা মুহূর্তে তলিয়ে যেতে লাগল।

—দশ হাজার সেপাই ছিল যে—

—ঘোড়া সমেত তারা একজনও উঠে আসতে পারেনি শাহজাদা। হাতি, উট —তাও ভেসে গেল। তখন আবছা মতো সূর্যটা ডুবছিল।

কৈফিয়ৎ কী চাইবেন আওরঙ্গজেব। তিনি চুপ করে বিধ্বস্ত মানুষটির মুখে তাকিয়ে রইলেন। একবার অন্ধকার আকাশে তাকালেন। সেখানে কোনও তারা নেই। আলো নেই। এই আসমান হিন্দুস্থানের ওপরেও ঝুলে আছে। হিন্দুস্থান এখান থেকে এখনও অনেক পথ। না জানি এবার কাবুল থেকে কত রকমের আখরোট জাহানাবাদে গিয়ে পেঁছেছে। আখরোট আওরঙ্গজেবের বড় প্রিয়।

মধ্য এশিয়ায় বলখ্‌-বদকশানে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সিপাহসালার করে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না বাদশা শাহজাহান। তিনি কাবুলে মুঘল দুর্গে বসে থেকে নিত্যদিন কাসিদা মারফত খবর আনিয়ে লড়াইয়ের হাল খবর নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকবেন। নীচে লাহোরে পাঞ্জাবের সুবেদারি তখন শাহজাদা দারার হাতে। বাদশার হুকুম মতো দারা লাহোর থেকেই লড়াইয়ের রসদ পাঠাচ্ছিলেন।

একদিন তাঁর মনে হল—উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ আর ছোটে ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাদশাকে তাতিয়ে তাতিয়ে লড়াইয়ে নামিয়েছেন। এই নিষ্ফলা লড়াইয়ে শুধুই ক্ষয়। রসদের। মানুষের। হাতি ঘোড়ার। গোলা বারুদের। এতে লাভ কী? এমন সময় শীত এসে পাহাড়ি পথে রসদ পেঁছে দেওয়া অসম্ভব করে তুলল।

দারা দেখলেন—একদিকে সব বাধা জয় করে জেদের লড়াই। আরেকদিকে শুধুই ক্ষয়। ফল বলতে শূন্য। তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে লাহোর থেকে সিন্ধুর থাট্টা রওনা হলেন। একসময় ওখানে বড় বন্দর ছিল। কিন্তু বালিতে সমুদ্রে যাবার নদীকূল বুজে আসায় তার এখন পোড়ো দশা।

শাহজাদা দারার পোড়ো বন্দর দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তিনি সারমাদ নামে এক সাধুর নাম শুনেছিলেন। তাঁর দেখা পাবেন বলেই এই যাওয়া।

এক শীতের দুপুরে শাহজাদা দারা এসে হাজির হলেন থাট্টায়। খোঁজ করতেই তাঁর ঠিকানা পাওয়া গেল। সবাই বলল, সেই নাঙ্গা ফকির? তাঁর খোঁজ পাবেন বানিয়া পাড়ায়।

থাট্টায় জাহাজ আসা বন্ধ হলেও ছোট ছোট ডিঙি এখনও আসে। হিন্দুস্থানের কাছাকাছি নৌকাপথের ছোট আরব ব্যাপারিরা তাদের মালমশল্লা নিয়ে থাট্টায় ডিঙি করে এসে থাকে। সেসব জিনিস কেনাকাটায় থাট্টার বানিয়ারা জড়িয়ে আছে। কেননা তারা ওসব কিনে ডাঙায় ডাঙায় ব্যবসা করতে করতে লাহোর অব্দি গিয়ে থাকে।

বানিয়াপাড়া এমন কিছু নয়। মরা নদীর খাঁড়ির মুখে কতকগুলো চাটাই ঘর। তার ভেতর একটি মন্দির দেখে বোঝা যায়—ব্যাপারিরা সবাই হিন্দু।

দারা যখন গিয়ে হাজির হলেন—তখন সারা গায়ে ছাইমাখা ফরসা মতো ফিরিঙ্গি চেহারার এক সাধু উঠোনে বসে একমনে কী লিখছেন। থাট্টার মুঘল ফৌজদার চটে গিয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হুকুম দেবেন দেবেন—এমন সময় দারা হাতের ইশারায় তাঁকে থামালেন।

সারমাদ চোখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে দাঁড়ানো দারার মুখ দেখে তাঁর ভাল লাগল। তিনি হেসে পড়লেন। অস্ফুটে বললেন, আমিই নাঙ্গা ফকির সারমাদ।

দারা খুব নম্র গলায় বললেন, আমি দারাশুকো।

—জানি। আপনি শাহজাদা দারাশুকো। আপনি যে একদিন আসবেন—আমি তা জানতাম।

—তাই? বলেও দারার একবারও মনে হল না—মানুষটি কোনও রকমের অলৌকিক। সাধুসন্ন্যাসী ফকির দরবেশরা মনের মতো মানুষ পেলে অমন ভাষায় সাদরে কাছে টেনে নেন। সারমাদ বেশ বলিষ্ঠ। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে থাকবে। বেশ চওড়া কাঁধ। আর ফিরিঙ্গিদের মতোই সফেদ। দুই চোখ যেন ভেতরের চাপা আনন্দে সবসময় জ্বলজ্বল করছে।

—আপনি নাঙ্গা কেন?

খুব হাসি হাসি মুখে দারার মুখে তাকিয়ে থাকলেন সারমাদ। তারপর রীতিমত শিক্ষিত গলায় বললেন—দুনিয়াদার আমাদের ঘিরে দিয়েছেন দুঃখ বেদনায়। দুর্বলদের জন্যে তিনি দিয়েছেন পোশাকের বাহার। পবিত্রদের জন্যে তিনি রেখেছেন নগ্নতার আবরণ।

শাহজাদা দারা চমকে উঠলেন। এ তো রীতিমত শিক্ষিত কথাবার্তা। অথচ এমন নগ্ন। এই ন্যাড়া বানিয়াপাড়ায় একা পড়ে আছেন। কে এই মানুষটি?

দারার ভেতরকার জিজ্ঞাসা বুজে থাকবেন সারমাদ। বললেন, উতলা হবেন না। আমিই বলছি।

দারা কোনও কথা বললেন না।

সারমাদ নিজেই বলতে থাকলেন। আপনি জিজ্ঞাসু মানুষ। আপনার জন্যে আমি খুলে দিল। তবে শুনুন। আমার বাড়ি ছিল আর্মেনিয়ায়।

শাহজাদা দারা আর্মেনিয়া বিলক্ষণ জানেন। আকবর বাদশার আমল থেকেই মুঘল হারেমের জন্যে বাছা বাছা সুন্দরী কেনা হয়ে থাকে আর্মেনিয়া, জর্জিয়া থেকে। এদের ভেতর কেউ বাদশাহের চোখে পড়ে বিশেষ খাতির পেয়ে এসেছে—এমনকি অনেক উঁচুতেও উঠেছে। তাছাড়া মুঘল ফৌজে যেমন বাছা বাছা ঘোড়া আসে মধ্য এশিয়ার নানান্ দেশ থেকে—তেমনি লড়াকু সব বন্দুকবাজও আসে নসিব ফেরাতে। আর্মেনিয়রা বেশিরভাগই অবশ্য ভর্তি হয় তোপখানায়। এখনও তোপখানার দারোগাদের অনেকের বাড়ি আর্মেনিয়ায়।

—আমি ইহুদি বাড়ির ছেলে। পরে ইসলাম ধর্ম নিয়েছি। এখন আমার নাম

মহম্মদ সৈয়দ সারমাদ। শুনেছি ফিরিঙ্গিস্তান আমাদের দেশ ছিল অনেক আগে। সেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্মেনিয়ায় ব্যবসা করতে উঠে এসেছিলেন। এখন আমি লোকমুখে শুধু সারমাদ হয়েছি। স্রেফ নাঙ্গা সারমাদ। হিন্দুস্থানে আসার আগে আমরা কাসানে থাকতাম।

—আপনারা তাহলে খ্রিস্টান ছিলেন।

—না। আমরা আগাগোড়াই ইহুদি ছিলাম। শুধু আমিই ইসলাম নিয়েছি। আমার ঠাকুর্দা ব্যবসাদার হলেও বাবা ছিলেন মাস্টারমশাই। আমি রিববানী ইহুদি বংশের ছেলে ছিলাম। তা সেসব বলে এখন আর কী হবে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। তৌরিত পড়েছি। শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়েছি। ইরানের মুল্লা সাদরা—আবুল কাশেম কান্দ্রাস্কির কাছে দর্শন পড়েছিলাম। তা সেসব ধুলে মুছে গেছে শাহজাদা।

—আমি যে শাহজাদা তা জানলেন কী করে?

—বাঃ। সারা হিন্দুস্থানের ফকির দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীরা আপনার ঈশ্বর জিজ্ঞাসার কথা বলেন। তাঁরা আপনাকে তো তাঁদের আত্মীয় মানেন।

এ কথায় দারা চুপ করে গেলেন। তাঁর মনটা শীতের নরম রোদে ভরে উঠল। সমুদ্র থেকে উড়ে আসা জলচর পাখি মাছের আশায় বুজে আসা নদীর খাঁড়িতে ছোঁ দিচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে—আবার জায়গা বদলাচ্ছে। বাতাসে একটা আঁশটে গন্ধ।

সারমাদ নিজেই বললেন, একদিন ব্যাপারিদের বড় নৌকোয় সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। এসে নামলাম এই থাট্টায়। তারপর এখানে এসে অভয়চাঁদকে দেখে সব ভুলে গেলাম।

শাহজাদা কিছু বললেন না। তিনি শুনেই এসেছেন—বানিয়াদের একটি অল্পবয়সী ছেলে এখন সাধু সারমাদের সাধনসঙ্গী। তার ভালবাসাতেই সাধু সারমাদ বিভোর। সে-ই নিশ্চয় অভয়চাঁদ।

—অভয়চাঁদকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারি না শাহজাদা।

দারা দেখলেন, সারমাদের দুই চোখে জলের ফোটা এসে দাঁড়িয়েছে।

—অভয়চাঁদের বাবা আমাকে তার এই ঘরে থাকতে দিয়েছে।

—অভয়চাঁদ কোথায়?

—এই তো নদীতে গেল। আমার সঙ্গে দিনরাতই থাকে। ও এখন দূরের জিনিস দেখতে পায়। দূরের কথা শুনতে পায়—

—তাই।

—হ্যাঁ শাহজাদা। আমি তো বিভোর থাকি। ও থাকে ওর মতো। আমি জানি না এই দুনিয়ায় আমার ঈশ্বর অভয়চাঁদ—না, অন্য কেউ। অভয় তো আমার কাছ থেকে ফারসি শিখেছে। আরবিও শিখেছে।

—পড়তে পারে?

—হ্যাঁ। পড়তে পারে। বলতেও পারে। আমারই মতো কোরান মানে। আমি হিন্দু সন্ন্যাসী আবার আমি রব্বি ইহুদি। আমি কাফের আবার আমি মুসলমান।

শাহজাদা দারা মুগ্ধ। তিনি সারমাদের গলায় যেন আমির খসরুর বিখ্যাত সেই রুবাইয়ের ধ্বনি শুনতে পেলেন—যেখানে খসরু বলছেন—আমার শরীরের শিরা উপশিরা তাঁর হয়ে গেছে। তাই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত নিইনি। হ্যাঁ আমি কাফের—মূর্তি পুজো করি। আমি সখার প্রেমে মুগ্ধ। মুসলমানীতে আমার কোনও কাজ নেই। মারা বা মুসলমানী দরকার নিস্ত।

দারা বুঝলেন, সারমাদের মতো সন্ন্যাসীকে বিচার করা সাধারণ জ্ঞানের কাজ নয়। আজ ভাগ্যিস তিনি এসেছিলেন—তাই এমন মানুষের দেখা পাওয়া গেল। এমন মানুষকে পাগল বলা সহজ। কারণ, যেসব অর্বাচীন সারমাদকে পাগল বলে—তাদের দৌড় দেহ পেরিয়ে যায়নি। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ।

—আপনি শাস্ত্র গুলে খেয়েছেন। আপনি পণ্ডিত।

দারার এ কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন সারমাদ। তারপর বললেন, আমি শাস্ত্রচর্চাকে বিদায় দিয়েছি। কারণ, ঈশ্বরের দিকে এগোতে গেলে এসবের দরকার নেই।

দারা মাটিতে বসে পড়লেন। বিনীত গলায় বললেন, প্রভু। এই দীনের ইচ্ছা হয়—রোজ আপনার কাছে আসি। কিন্তু সফল হই না। যদি আমি 'সেই আমি' হই, তাহলে আমার ইচ্ছার পথে বাধা কেন? যদি আমি—'আমি' না হই, তাহলে আমার ত্রুটি কোথায়? যদি ইমাম হোসেনের মৃত্যু ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়—তবে মাঝখানে এজিদ কেন? যদি এটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয়ে থাকে—তাহলে এই ঘটনার ব্যাখ্যা কী? পয়গম্বর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলেন—পরাজয় এল ইসলামের সেনাবাহিনীর কাছে। পোশাকি ইসলামের উলেমায় বলে, এ হল ধৈর্যের পরীক্ষা—কিন্তু এই শিক্ষার প্রয়োজন তাঁর কাছে কেন হবে যিনি অধ্যাত্মচেতনার শেষ স্তরে পৌঁছে গেছেন।

সারমাদ এতক্ষণ শাহজাদার মুখে তাকিয়ে ছিলেন। এবার ছোট্ট করে বললেন, একসময় ধর্মশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি ঠিকই—কিন্তু এখন সব ভুলে গেছি। —তারপর বললেন, কোনও ভগবান নেই। কোনও মূর্তি নেই।

—সে কী কথা?

—হ্যাঁ শাহজাদা। সেইটেই কথা। আমি এখনও 'না'-এর দিকটাতেই বিভোর হয়ে আছি। হ্যাঁ-এর দিকে এখনও যাইনি। তাই আমি অযথা মিথ্যে কেন বলব?

দারা বললেন, আমির খসরু আপনার ভাল লাগে?

—আমি অন্য কারও চিন্তাধারা বা কাজে আগ্রহী নই। কিন্তু গজল লেখার সময় আমি হাফিজকে ভাবি। রুবাই লেখার সময় আমি খৈয়ামের মুরিদ। কিন্তু আমি তাঁর মতো সরাবে চুমুক দিতে পারি না।—বলতে বলতে হঠাৎ সারমাদ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, সেই মহান দুনিয়াদারকে একবার খুঁজে পেতে চাই। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ—তাঁর লোভ। একবার দুনিয়ার জিনিসে মোহ হলে মানুষ তা বাড়িয়েই চলে। পিরামিডের মতো উঁচু করে মানুষ তার লোভের জিনিস—মোহের জিনিস জমাতে চায়। মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে না নেওয়া অব্দি

সে এই জমানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। লোভের দাস যারা—তারা তো বন্দী। জীবনের সুতো তো পলকা। মুহূর্তে ছিঁড়ে যায়। লোভ যেন সুতোটাকে পাকিয়ে না দেয়! তাহলে গিঁট লেগে যাবে জীবনটাতে। মেপে দরকার মতো ভোগ করতে হয় শাহজাদা। তার ভেতর লোভের বিষ থাকবে না! যারা ইয়ুসুফের মুখের মাধুরী দেখেনি—তারা তাকিয়ে দেখুক ইয়াকুব আর জুলেখার মুখে—প্রেমের কী ব্যথা তারা বয়ে চলেছে—তাকিয়ে দেখুক সেই ব্যথাকে।

সূর্য ডুবে এল। দারা দেখলেন সারমাদ ব্যাকুল হয়ে আবছা নদীপথের দিকে তাকিয়ে! সেই পথের শেষে আবছামত একটি মানুষ। যুবক কি কিশোর—বোঝা যায় না। এ নিশ্চয় অভয়চাঁদ। যে সারমাদের ভগবানও হতে পারে। খুদা-ই-মন অভইচান্দস্ত ইয়া দিগর।

॥ তিরাশি ॥

থাট্টা আজকের বন্দর নয়। সুরাট তখন এতটা মাথা তুলে দাঁড়ায়নি—থাট্টায় যাবার নদীকূল তখন বালিতে ভরে যায়নি—তখন ওখান থেকেই হিন্দুস্থানের রেশম, নীল দরিয়ার পর দরিয়া চষে দেশে দেশে যেত। সেই থাট্টার আজ পোড়ো দশা। ছোটখাটো ব্যাপারীরা নৌকো-ভরসা ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় থাট্টা থেকে।

সন্ধের মুখে মুখে শাহজাদা দারাশুকো বানিয়াপাড়া থেকে বেরিয়ে এলেন। তখনও অভয়চাঁদের জন্যে সাধু সারমাদ পথ চেয়ে বসে আছেন। সন্ধে রাতের কুয়াশা মাখানো আকাশে শাহজাদার বারবার মনে হচ্ছিল—মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে কত ধর্ম। সেইসব ধর্মের ছায়া মানুষের অজান্তে আকাশ জুড়ে সব সময় জায়গা বদলাচ্ছে। আর নীচে আমরা মানুষরা যে যার ধর্মের ছকে বসে থেকে কোনও বনিবনা গড়ে তুলতে পারছি না।

সারমাদের মতো অত জ্ঞানী সাধু সামান্য বানিয়া বালক অভয়চাঁদের ভেতর কী দেখলেন? সেই যে গঞ্জালির সময় এক সুফী সাধক ঘোষণা করেছিলেন—আনালহক্। আমিই ঈশ্বর—মানুষের ভেতর এই ঈশ্বরসন্ধানই কি সারমাদকে অভয়চাঁদে মগ্ন করে তুলল? দুনিয়ায় নানান ধর্ম। এক এক ধর্মে একেকভাবে ঈশ্বরকে খুঁজে দেখার চেষ্টা হয়েছে—হচ্ছে।

আমরা যদি সবাইকে জানতে চাইতাম—বুঝতে চাইতাম—তো অনেক কিছুই সরল হয়ে যেত। ভুল বোঝাবুঝির কোনও সুযোগই থাকত না। পরদাদা সাহেব আকবর বাদশা হিন্দুস্থানের তাবৎ ধর্মের ভেতর সবার সঙ্গে সবার একটা সম্ভ্রম বোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সবাই সবাইকে জানুক। সবাই সবাইকে বুঝুক। এজন্যে তিনি রামায়ণ মহাভারত ফারসিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। কিন্তু কী ফল হল? বদাউনি বলতেন, কাফেরদের ওসব না-পাক বই অনুবাদ করাও পাপ।

আমি মুন্সি বনমালী দাসকে দিয়ে শ্রীমদ ভগবদ্‌গীতা ফারসিতে অনুবাদ করাচ্ছি। ভেবেছি—তার নাম দেব অর্জুনের সঙ্গে দুর্যোধনের সংগ্রাম। প্রবোধ-

চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ শেষ হয়েছে। নাম রেখেছি—গুলজার-ই-হাল!

লাহোর অনেক রাস্তা। ফেরার পথে দারা যতই এগোন—ততই মনে হয়—কে বা কারা যেন হিন্দুস্থানের এদিককার মাঠঘাট একদম ধ্বসে দিয়ে গেছে। সাধু সারমাদের আস্তানায় যাবার আগে হাতি রেখে গিয়েছিলেন শাহজাদা। পাহারার এক রিসালা ঘোড়সওয়ারও পেছনে পড়েছিল। এখন সন্ধেরাতে ফেরার সময় শাহজাদা লক্ষ করলেন—হাতিরাও জায়গায় জায়গায় পা ফেলতে গিয়ে পা টলে যাচ্ছে।

গত ক'বছরে শাহজাদা দারা লাহোর, মুলতান, গুজরাতের সুবেদার হয়ে আসছেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। যখন যেখানে মুঘল শাহীর হুকুমতকে নরম সরম করে তুলে ধরার দরকার বোঝেন বাদশা—তখনই সেখানে তিনি শাহজাদা দারাকে সুবেদার করে পাঠান। গুজরাত থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব বলখ-এ সিপাহ-শালার হয়ে গিয়েছিলেন বলে সেখানকার সুবেদারি দারার হাতে এসে পড়ে। এদিককার মাঠঘাট—নদীনালা—চটি আস্তানার সঙ্গেও দারাশুকো রীতিমত পরিচিত। বেশ অনেকবার বাদশার সঙ্গে কাশ্মীর যাবার পথে এসব জায়গা ঘুরে গেছেন শাহজাদা।

এমন চেনা পথের এমন চেহারা দেখে শাহজাদা অবাক হচ্ছিলেন। তারপর তাঁর খেয়াল হল—শাহজাদা আওরংগজেবের ফৌজ ফিরে এল না তো? লাহোরের বেশ কয়েক মঞ্জেল আগে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন—হ্যাঁ, শাহজাদা আওরংগজেব নিশ্চয় ফিরেছেন। সংগে সংগে তাঁর মন ভারি হয়ে এল। আব্বা হুজুরের এই তৈমুরি খোয়াবের আর কত দাম দিতে হবে? কবে বলখ্—বদকশানের পথে তৈমুর শাহীর শুরুয়াৎ হয়েছিল—সেসব জায়গায় একসময় কবে বাবর বাদশা, হুমায়ুন বাদশা ঘোড়া দাবড়েছেন—তাই ওসব জায়গা হিন্দুস্থানের শাহীর সামিল করতে হবে—তুষার-পেছল সরু পাহাড়ি পথ পেরোতে গিয়ে সেজন্যে যদি হাজার হাজার সেপাই ভেসে যায় তো যাক—তবু অভিযান বহাল থাকবে।

শাহজাদা দারা জানেন—শ্রান্ত ক্লান্ত নিষ্ফল এক বাহিনী ফিরে এসেছে। এমন অভিযানের ফৌজের দশা অনেকটা গুলি খাওয়া বাঘের মতো। পথে যা পড়েছে সব যেন সাবাড় করে দিতে দিতে এগিয়ে গেছে সেপাইরা। গেঁহু ক্ষেত বলতে আর কিছু নেই। শুধু কামানের গাড়ির চাকার ডেবে যাওয়া গর্ত। ঘর গেরস্থির কুড়েঘরগুলোর চাল নেই। টেনে নিয়ে জ্বালানি করা হয়েছে। হাতির যে শীত সয় না একদম। ঘর-গোহালও নেই। যে-যেমন পেরেছে তুলে নিয়ে গেছে গরু মোষ। মানুষ তো একদম হাওয়া। তারা কেউ এখন হয়তো বলদের পাশে পাশে কামানের গাড়ি টানছে। জুতে দেওয়া নয়া বলদ। চারদিক খা খা করছে।

ফেরার পথে শাহজাদা আওরঙ্গজেব কিন্তু মনের জোর একটুও হারাননি। তিনি ফেরার পথে একা একা একটি অংকই কষেছেন। শাহজাদা মুরাদ বক্স আর আমার অভিযান মিলিয়ে শাহী খাজানাখানা থেকে মোট সাড়ে চার কোটি তংখা খরচ হয়েছে। আর আদায় বড় জোর তেইশ লাখ। আব্বা হুজুর এই অংকটা বারবার মিলিয়ে দেখবেন। আর দেখবেন শাহজাদা মুরাদ বক্সের বলখ্ থেকে

লুটে নিয়ে আসা আড়াই হাজার দামি উজবেগ ঘোড়া আর তিনশো উট। যদি অবশ্য মুরাদ সেসব বাদশার মবারকে হাজির করে থাকে। আওরঙ্গজেব ঠিক করেছেন—তিনি যেসব চুনি এনেছেন বদকশান থেকে—সবই আব্বা হুজুরকে দেবেন। তাহলে এতখানি খরচাশেতর পর আব্বা হুজুরের মনটা কিছুটা শান্ত হবে।

ফেরার পথেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব খরচ কমাতে কমাতে ফিরছেন। এই কমানো দেখাতে পারলেও আব্বা হুজুর কিছুটা শান্তি পাবেন। যে কোনও অভিযানে সবচেয়ে খরচার জায়গা হল তোপখানা। যেমন দাম বারুদের—তেমনি চড়া মাইনে ভিনদেশি নিশানাবাজ গোলন্দাজদের। সেই বুন্দেলার লড়াই থেকেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব লক্ষ করে আসছেন—গোলন্দাজদের ভেতর অনেক অপদার্থ গোলন্দাজ ঘাপটি মেরে থেকে চড়া মাইনে নিয়ে যায়।

এবার তাই তিনি বলখ্ থেকে ফেরার পথে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর তোপখানার দারোগাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইনি আবার শাহজাদার নিজের মেসো—খলিলুল্লা খাঁ। তিনি আগাগোড়াই এই নওজওয়ান শাহজাদাকে লক্ষ করে আসছেন। যতই দেখছেন—ততই আশ্চর্য হচ্ছেন খলিলুল্লা খাঁ। তিনি এই ক'মাসের বলখ্ অভিযানে নানাসবের ওঠা-পড়ার ভেতর খুব কাছ থেকে আওরঙ্গজেবকে লক্ষ করছেন—আর যতই দিন যাচ্ছে ততই তিনি শাহজাদার গুণের কদরদার হয়ে উঠছেন।

খলিলুল্লা খাঁ আগ্রা দুর্গে মরদ হিসেবে বাদশা শাহজাহানের মেসো পারিষদ, বন্ধু, ভায়রাভাই—আবার শাহী রঙ্গ-তামাশার সঙ্গীসাথীও বটে। তাঁরই আওরত সুন্দরী মেহজবিন বেগম। খলিলুল্লা খাঁ এতদিন দেখে এসেছেন—শাহজাদা মানে বদমেজাজী, ঢিলেঢালা, অপদার্থ সুরাবিলাসী—আওরত নিয়ে মতামাতি করা কিছু আদরের দুলাল। নিজের সুখ বই অন্য কিছুতে এদের নজর থাকে না।

আওরঙ্গজেব বাহাদুর যে একেবারে অন্যরকমের শাহজাদা। নিজেই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লড়াইয়ের আগে ফৌজের অবস্থা খতিয়ে দেখেন—তোপখানায় নজর রাখেন—কোনও হাতির পায়ে কাঁটা ফুটলে তা বের করার বন্দোবস্ত করেন। লড়াইয়ের পরে আহতদের দেখাশুনা তিনি করবেনই। দেখবেন—গেঁহু কেমন, বারুদ কেমন, রেড়ির তেল কতটা পরিষ্কার। অল্প বয়সেই আওরঙ্গজেব লড়াইয়ের পর লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন। সারা হিন্দুস্থান আজ সে কথা মানে। বুন্দেলা, বিজাপুর-গোলকুণ্ডা তো আছেই—দক্ষিণের সুবায় সুবায় জমি-জিরেত—তার ফসলের ফলন, চাষী বসানো—সব কিছুতেই এই তাজা শাহজাদা কারিৎকর্মা। কী লড়াই—কী নগর বসানো—সব কিছুতেই তুখোড়, দৃপ্ত আওরঙ্গজেব তাঁর মন কেড়েছেন। আগ্রা দুর্গের বাইরে যমুনার বালিয়াড়িতে ক্ষ্যাপা হাতি বর্শা ছুঁড়ে রুখে দিয়েই সবে নওজওয়ান আওরঙ্গজেব শুধু বাহাদুর খেতাবটি কেড়ে নেননি—কেড়ে নিয়েছেন সারা হিন্দুস্থানের সাবাসি।

আওরঙ্গজেবের ডাক পেয়ে খলিলুল্লা খাঁ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে খলিলুল্লা খাঁ বুঝলেন, কুর্নিশ তসলিমে শাহজাদার কোনও নজর নেই।

আওরঙ্গজেব বললেন, গোলন্দাজদের সবাইকে নিশানাবাজির পরীক্ষা দিতে হবে। সেইমত ব্যবস্থা করুন। নিশানাবাজির ইমতেহানির সময় আমি হাজির থাকব।

বলখ্ থেকে হিন্দুস্থানে ফৌজ নেমে আসার সময়—মাঝে মাঝেই ন্যাড়া প্রান্তর পড়েছে। যতই লাহোর কাছে এসে যাচ্ছিল—ততই তেমন খোলামেলা প্রান্তর ফুরিয়ে আসছিল। সুবা লাহোরে ঘরগেরস্থি বেশ ভাল।

এক ভোরবেলা দেখে খলিলুল্লা খাঁ নিশানবাজির ইমতেহানি শুরু করলেন। পরীক্ষা বলে পরীক্ষা। বহুদিন ধরে গোলন্দাজ বলে যারা মাস মাইনে নিয়ে আসছিল—তাদের বেশিরভাগই পর পর তিনটে সুযোগ পেয়েও একবারও নিশানায় চাঁদমারি করতে পারল না। লাহোর পেঁছিবার আগেই শাহী তোপখানার গোলন্দাজবহর হালকা হয়ে গেল। খলিলুল্লা খাঁ মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, এভাবে অপদার্থ গোলন্দাজদের সরিয়ে দেওয়ায় বছরে নগদে পঞ্চাশ হাজারের মতো তনখা বেঁচে যাবে।

শাহজাদা আওরংগজেব আশা করেছিলেন, ফেরার পথে কাবুলে বাদশার মুখোমুখি হওয়া যাবে। কাবুল পেঁছে শুনলেন—বাদশা লাহোরে। কিন্তু লাহোরেও বাদশার সংগে দেখা হল না। তিনি আগ্রা নেমে গেছেন। ওদিক থাট্টা থেকে লাহোরে পেঁছিনোর পথে শাহজাদা দারা ভেবেছিলেন, লাহোরে পেঁছেই আব্বা হুজুরের সংগে দেখা হবে। দেখা হবে বলখ্-বদকশান-ফেরত বাহাদুর ছোটভাই শাহজাদা ঔরংগজেবের সংগে। কিন্তু লাহোরে ঢোকার মুখেই খবর পেলেন, ছোটভাই শাহজাদা আওরংগজেব দু'দিন হল লাহোর ছেড়ে গেছেন। তিনি এখন আগ্রার পথে।

শাহজাদা দারার কাছে লাহোর হল মিঞা মীরের। এলাহাবাদ শেখ মুহিবুল্লার। আর থাট্টা সাধু সারমাদের। খোদাতালার সন্ধান যাঁরা পান তাঁদের বিশেষ কিছুই দরকার হয় না। কিষেণগংগার মুখোমুখি পাহাড়ের গুম্ফায় কাশ্মীরে মুল্লাশার খানকা থেকে থাট্টায় সাধু সারমাদের আস্তানা—সব জায়গাতেই তিনি দেখেছেন—এঁদের বিশেষ কিছুরই দরকার নেই। অথচ একজন বাদশার জন্যে সুবায় সুবায় কিল্লা তো থাকেই—তাছাড়াও বড় বড় সড়ক বা নদীর গা ঘেঁষে থাকে আরও কিছু কিল্লা। দখল, দাপট, তাগদ বজায় রাখতে। কোনও কোনও কিল্লা আবার পাহাড়ের গা কেটে বানানো। অথচ এইসব বাদশা সুলতান চিরদিন থাকেন না। থাকেন খোদাতালা। তাঁর কোনও কিল্লা নেই। ফৌজ নেই। নেই তোপখানা।

থাট্টা রওনা হবার আগে দারা জেনে গিয়েছিলেন—বাদশা কাবুল থেকে নেমে আসছেন। তিনি জানতেন, শাহজাদা আওরংগজেবও ফিরছেন। ভেবেছিলেন, দু'জনের সংগেই লাহোরে দেখা হয়ে যাবে।

সুবা সদরে পেঁছে দারা দেখলেন, আব্বা হুজুর আর ছোটভাই—দু'জন দু'তিনদিনের ফারাকে লাহোর ছেড়ে গেছেন। তাঁর জন্যে পড়ে আছে একখানি শাহী লেফাফা। খুলে দেখলেন, শাহী ইচ্ছা—তিনি যেন আগ্রা চলে আসেন।

মুঘল চিঠি-চাপাটিতে শাহী বা আগ্রা বলতে বোঝায়—খোদ বাদশা।

শীতের শেষে অনেকদিন পরে ফের আগ্রা জমে উঠল। শয়তানপুরায় কোঠাবাড়িগুলোয় সারা হিন্দুস্থান থেকে নতুন নতুন মেয়ে এসে জমা হয়েছে। একটা লড়াই মানে রসদে-বারুদে অনেক কেনাকাটা—অনেক লেনদেন। এসব মোহর কোথায় খরচ হবে! রুপোর কারিগররা পায়জোর বানিয়ে ফুরসত পাচ্ছে না। ফিরতি ফৌজের নানা পর্দার লড়াকুর জন্যে নানা ধাঁচের মেয়ে চাই। চাই সেই সঙ্গে জুতসই নাচগান। তাই তালিমে শয়তানপুরায় কান পাতা দায়। ঢোলক, দিগর, পন্নব, দিলরুবার ছড়াছড়ি। ঘুঙুরের বোলই থামছে না কয়েক দিনরাত। শুকনো ফল আর খুশবুদার ফুলে লালচক ভরে গেছে। সরাইতে সরাইতে দুনিয়াজা আর দমপোক্তের বাতাস চারানো সুগন্ধ। খলিফারা নুয়ে পড়ে সেলাই করেই চলেছে।

সাবেক রাজধানী, আগ্রায় পৌঁছে শাহজাদা দারার মনে হল—জামা মসজিদ, লালকিল্লা নিয়েও নয়া রাজধানী জাহানাবাদ আগ্রার বনেদিয়ানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না। আগ্রার মতো এত ছায়া জড়ানো গাছ, হামাম, সরাই, পাহারা, চক, মাণ্ডি, খলিফা—জাহানাবাদে কোথায়? কোথায় এত হাভেলি, গোলাম, বাঁদি?

লড়াইয়ের ময়দানে আওরঙ্গজেবের নিজেকে মনে হয়—হুমা পাখি। বিরাট দুই ডানা। তীক্ষ্ন ঠোঁট। বিশাল উড়ান। নখে রীতিমত জোর। তিনি লড়াইয়ের নিয়মকানুন বোঝেন। কিন্তু আগ্রায় এসে ইদানীং তাঁর মনে হয়—তিনি যেন অনেকের ভেতর একজন মাত্র। আলাদা করে বিশেষ কেউ নন। এখানে মনসবদার ফৌজদার সুবেদারদের ভিড় লেগেই আছে। আছে বিদেশি ব্যাপারী—বিদেশি পাদ্রি—বিদেশি ইলচিমশাইদের আনাগোনা। আমির ওমরাহদের বেশি রাত করে খানাপিনা করে ফেরা। ফৌজের কুচ করে ফেরা—কুচ করে এগিয়ে যাওয়া। তার ওপর আছে বড় বড় বদলি—ইস্তফা—বরখাস্ত। এর ভেতর শাহজাদা আগ্রায় যমুনার গা ঘেঁষে পীর-ফকিরদের আস্তানায় যাবার উপায় নেই। প্রায় জায়গাতেই বিকট গলায় কাওয়ালির ধুম। এবার অনেকদিন পরে আগ্রায় ফিরে তাঁর মনে হল—এখানে আমার কোনও দোস্ত নেই। একটানা প্রায় আটটি বছর দাক্ষিণে কাটানো—তারপর গুজরাতের সুবেদারি—সেখান থেকে বলখ্-বদকশানে প্রায় দম হারানো লড়াইয়ের পর বহুকাল বাদে আগ্রায় এসে আওরঙ্গজেবের মনে হচ্ছিল—তিনি যেন অচেনা আরেক কোনও তৈমুরাবাদের দুয়ারে এসেই দাঁড়িয়েছেন।

সন্ধ্যার কুয়াশার ভেতর আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গের আঙুরিবাগে এসে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে ফুলের গন্ধ শীতের কুয়াশা পেরিয়ে ওপরে উঠে আসছে। পাশেরই ঢাকা পথ রৌশন মহলে গিয়ে শেষ হয়েছে। শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পেছনে পড়ে আছে কয়েক মাস ধরে সুদূর হিন্দুকুশের গায়ে বলখ্-এ, বদকশানে কসাক ধাঁচের লড়াকু উজবেকদের সঙ্গে যুদ্ধ—সুরকালির বরফজলে হাজার দশেক সেপাই, হাতি-ঘোড়ার ভেসে যাওয়া। আর সামনে? হিন্দুস্থানের তাগদের

একমাত্র ফোয়ারা—আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান—যিনি ইজফা-খেতাবে ভরিয়ে দিতে পারেন শাহজাদার নসিব—কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উপহাসে একদম কালো করে দিতে পারেন তাঁর মনের আসমান। বলা যায় ভীষণ এক অজানা সম্ভাবনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আওরঙ্গজেব।

ঠিক এই সময় তাঁর ঠোঁটে এসে অনেকদিন পরে হাফিজ ভর করলেন। অন্ধকারে ফুলের গন্ধের ভেতর ; কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া আঙুরিবাগের মুখোমুখি। পাশেই রওশন মহলে যাবার ঢাকাপথ সিধে ওপরে উঠে গেছে।

নরগিসশ অর্বদা খুব
লবশ অফসোস কুনা—

পরে কথা ক'টি এসে গিয়েছিল আওরঙ্গজেবের ঠোঁটে। কিন্তু অন্ধকার আঙুরিবাগ থেকে কে বলে উঠত, এত অভিমান কিসের ?

—কে ? কে ওখানে ? —বলতে বলতে আওরঙ্গজেব তাঁর কোমরে তলোয়ারে হাত দিয়ে ফেলেছেন।

—শেষের সেদিন গভীর নিশীথে। সাতাই কি ছোটেভাই তোমার শিয়রে এসে বসেছিল ?

—ওঃ ! রৌশন ! এ হল গিয়ে হাফিজের রুবাই। বলেই আওরঙ্গজেব নিজেকে বললেন, উঃ ! আর প্যারি না। কেন যে হাফিজ এভাবে বারবার ফিরে আসেন।

—হাফিজে ডুবে আছ বল। এই যে শোনা যায়—তুমি নাকি কবিতার দুশমন !

—যে কবিতা খোদাতালার দিকে নিয়ে যায় না—মোটেই ভাবায় না—তা আদপে কবিতাই নয়।

—হাফিজ ভাবায় তাহলে ?

আওরঙ্গজেব চুপ হয়ে গেলেন অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, হ্যাঁ, হাফিজ আমাকে চিন্তার ঘূর্ণির ভেতর ফেলে দেন। যেমন ফেলে দেন সাদি। সাদিকেও আমার খুব ভাল লাগে রৌশন।

—কিন্তু আমাকে যে আরেকজন খুব ভাবিয়ে তুলেছেন।

—কে ? কে রৌশন ?

—তিনি আমাদের আব্বা হুজুর—হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব শাহজাদী রৌশনআরার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। অনেকটা ফুলের গন্ধের মতো। ফুলটি অন্ধকারে। তার খুশবু বাতাসে। রৌশনের গলার আওয়াজ স্পষ্ট। অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

শাহজাদী রৌশনআরা নিজেই বলে চললেন। ছোটবেলা থেকেই আওরঙ্গজেব জানেন, তাঁর এই রৌশন বাজি দাঁতে চেপে কথা বলেন। রৌশন বলছিলেন, একবার যাও না দেওয়ান-ই-খাসে। দেখে এসো—

—কী দেখব ?

—বড়ে ভাইয়ের ছেলে সুলতান সুলেমান শুকোকে নিয়ে কী আদিখ্যেতা চলছে !

আওরঙ্গজেব রেগে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রৌশন চাপা গলায় বললেন, দাঁড়াও। সবই ঠান্ডা মাথায় নেবে। তোমার হতাশ হয়ে মরিয়া হওয়া চলবে না, ছোটে ভাই।

আওরঙ্গজেব নিজেকে সামলে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—মরিয়া হলে সবই হারাবে। তোমাকে আসলে লেগে থাকতে হবে ছোটে ভাই।

আওরঙ্গজেব এবার শান্ত পায়ে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে এগোলেন। সেখানে সোনার সুতোর কাজ করা চমাদোয়া মাথায় ধরে রেখেছে চাল্লিশটি স্তম্ভ—চেহেল সেতুন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঢুকে দেখলেন, একমুখ হাসি নিয়ে বাদশা শাহজাহান তাঁর বড় নাতি সুলেমান শুকোর দিকে রুপোর থালা বোঝাই আশরফির স্তূপ এগিয়ে ধরেছেন। বছর বারো তেরোর কিশোর সুলেমান শুকো কুর্নিশ করে থালাটি নিচ্ছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার আব্বা হুজুর—শাহজাদা দারাশুকো।

মাত্র মাস দেড়েক আগে আমি এমন এক সন্ধ্যায় আলি মর্দানের মুখোমুখি। হিন্দুকুশের পায়ের কাছে—হিম আসমানের নিচে—তাঁবুর বাইরে। মুঘল ফৌজের দশ হাজার সেপাই সুরকলির বরফ জলে ভেসে গেছে সেদিন। আলি মর্দানের মাথার চুল কপালে এসে পড়ায় একজন লড়াকু মানুষের বিধ্বস্ত মুখ দেখেছিলাম তখন। সেই যুদ্ধফেরত আমি শাহজাদা আওরঙ্গজেব এখন আগ্রায়—একথা ভালভাবেই জানেন আব্বা হুজুর। আরও জানেন—বলখ্ অভিযানে চার কোটি তন্‌খা থেকে ঢেলে এসেছে মাত্র বাইশ কি তেইশ লাখ। সেই আমাকে নিজের মবারকে ডেকে না পাঠিয়ে হিন্দুস্থানের বাদশা কিশোর নাতিকে আশরফি বকশিশ করছেন? তাজ্জব!

আওরঙ্গজেবের ভ্রু একটুও কোঁচকাল না।

আমি আটটি বছর দক্ষিণের সুবেদারি করার সময় মোট চারবার ডাক পেয়ে আগ্রায় এসেছি! কোনওদিন আব্বা হুজুর আমায় নিয়ে কাশ্মীর কি কাবুলে যাননি। সব সময় তাঁর সঙ্গী বড়ে ভাই। আমি বলখ্ রওনা হওয়ার আগেই বড়ে ভাইয়ের ঘোড়সওয়ার বাড়িয়ে আব্বা হুজুর করেছেন তিরিশ হাজার। এতদিন শুনে এসেছি বাদশা শাহজাহান ছুতোয়-নাতায় বড়ে ভাইকে—তাঁর ছেলে সুলেমান শুকোকে আশরফিতে—চুনি-মুক্তোয় ঢেকে দেন। দিয়ে থাকেন। আজ নিজের চোখে দেখছি। কোথায়! আমার আট ন'বছরের ছেলে মহম্মদ সুলতানকে তো ডেকে একটি মোহরও ভালবেসে বকশিশ করেননি বাদশা কোনওদিন। বাদশার জন্মদিনে—আব্বা হুজুরের শাহীর সম্বচ্ছর মানাবার জয়ন্তীতে বড়ে ভাই দাওয়াত পাবেনই। আর সেসব কথা আমরা দূরে পাহাড়ে লড়াইয়ে নেমে প্রাণ হাতে নিয়ে রূপকথার মতো শুধু শুনেই যাব?

—এই যে বলখ্ লড়াইয়ের বাহাদুর শাহজাদা আওরঙ্গজেব!

বাহাদুর কথাটি খট করে গিয়ে কানে লাগল আওরঙ্গজেবের। সারা হিন্দুস্থান আজ জানে এই লড়াইয়ের মস্ত ক্ষয়ক্ষতির কথা। একথাও সবাই জানে—অভিযান

জিতেও নিষ্ফল। কেননা—সবটাই বাদশার জেদ—বাদশার খোয়াব। ওখানে জয় করার কিছু নেই। ওখানে যত বড় ফৌজ নিয়েই যাওয়া যাক না কেন—ক্ষয়ের মাশুল গুনতেই হবে। সেই বিশাল ক্ষয়ের পর আগ্রায় ফিরে খোদ বাদশার মুখ থেকে বাহাদুর কথাটা শুনে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মনে হল—ওসব কথার কথা। আসলে শ্লেষ। একজন আব্বা হুজুর হয়েও বাদশা শাহজাহান তাঁর শাহজাদার বেইজ্জতি চান—আলোয় আলো দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে—আমির-ওমরাহদের সামনে। বাদশা যদি নিজে জং-কি-ময়দানে হাজির থাকতেন—তাহলে কি এই নিষ্ফল অভিযানেও তিনি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কোনও বাহাদুরিই দেখতে পেতেন না?

আওরঙ্গজেবের মুখের হাসি একটুও নিভল না। তিনি কুর্নিশ করে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, হজরত! সব লড়াইয়ের বাহাদুর আপনিই। হিন্দুকুশের পায়ের কাছে উজবেগ তাতারদের বিষ-তীরে আমরা ঢলে পড়েছি—আবার আমরাই লড়েছি—কিন্তু কাবুলে বসে থেকে আপনিই লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের চালিয়েছেন—আমরাও সেইভাবেই লড়েছি। বাহাদুর তো আপনি। বাহাদুররা খুব মহানুভব হয়ে থাকেন। তাই আপনি লড়াইয়ের কৃতিত্বটুকু নিজে না নিয়ে আমাদের দিয়ে দিচ্ছেন—

কাটা কাটা স্পষ্ট কথায় সবটা বলে আওরঙ্গজেব থামলেন। দেখলেন, উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ চোখের পলক না ফেলে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। বাদশা তো তার কথাই বলতে পারছেন না। তাঁর কাঁধের বাঁ দিক থেকে কাশ্মীরী পশমিনা খসে পড়েছে। আর বড়ে ভাই? শাহজাদা দারাশুকো যেন বা ঘেমে উঠেছেন।

বাদশা শাহজাহান অবাক হয়ে তাঁর তিসরি শাহজাদার মুখে ভাল করে তাকালেন!

দেওয়ান-ই-খাসের ভেতরকার আলো চেহেল সেতুনের পাথরে পড়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। এখানে যাঁরা এসেছেন—সবাই যে যাঁর দামি আঙ্গিয়া—কুর্তা পরেই এসেছেন। আওরঙ্গজেব দেখেই বুঝতে পারেন—এঁদের কাউকে তুষার ঝড়ের ভেতর সরু পেছল পাহাড়ী পথ ধরে সুরকলি নদীর গা বেয়ে কোনওদিন এগোতে হয়নি। এঁরাই বাদশার হুকুমকে জোরদার করেন। এঁরাই উঠে দাঁড়িয়ে বাদশাকে সাবাসি দিয়ে থাকেন। বিশাল অজগরের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে বেড়ে ওঠা দেওয়ানখানার কাগজে শাহীর খরচা কমানোর জন্যে এঁদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। এঁরা কোনওদিন ভেবেও দেখেননি শাহী তোপখানা থেকে মাস মাইনে শুষে নেওয়া অপদার্থদের ইমতেহানের ভেতর দিয়ে যাচাই বাছাই করলেই বছরে কোন না কোন ভাবে পঞ্চাশ হাজার তনখার সাশ্রয় হয়ে যায়। তবু এঁরাই হুকুমত। এঁরাই শাহী। এঁরাই মুঘল ধ্বজের জাঁক। এঁরাই কাজ শেষ হয়ে আসা তাজমহল বা লালকিল্লার একখানা পাথর নিয়ে খুঁতখুঁতি তুলে আগাগোড়া এক বছরের কাজ বাড়িয়ে দিতে পারেন। সেই সুবাদে তলে তলে তুর্কি কারিগরদের হাত থেকে থেরিয়া বোঝাই আশরফি নিতেও এঁদের আটকায় না। আর আমি এক আহাম্মক

শাহজাদা—নাম আওরঙ্গজেব—বাদশার খোয়াব মেটাতে গিয়ে তৈমুরাবাদের পথে উজবেগদের বিষ তীরের পরোয়া না করে সর্বদিকে নজর রেখেও রাতে রাতে বন্দী উজবেগদের কাছ থেকে রোজ একটু একটু করে চাঘতাই তুর্কী বলতে শিখেছি—এই ভাবনায় যে—কোনওদিন যদি বলখ্ বদকশান হিন্দুস্থানের সামিল হয় তো তখন ওখানে চাঘতাই তুর্কী শেখা থাকলে শাহী চালাতে সুবিধা হবে। আহাম্মক আর কাকে বলে! এখানে সবাই যাঁরা বড় বড় আমির-ওমরাহ—তাঁরা বাদশার সব কথায় সময়মত হুঁ হাঁ করে সায় দিয়ে হাভেলিকে ঘিরে সুস্বাদু মালখোবা খাবেন—বাছাই সিরাজিতে গলা ভেজাবেন। আর নিষ্ফল অভিযানের পর খরচা উসুল না হওয়ায় আমি বাদশার বিষ-জিভের নিশানা হব? রাগে দুঃখে শাহজাদা আওরংগজেবের চোখ ফেটে জল আসছিল। তবু যেন কিছু হয়নি এমনই ভঙ্গিতে মুখখানি হাসি হাসি করে তাকিয়ে রইলেন শাহজাদা।

শান্ত গলায়—শাহজাহান বললেন, কে আমাকে জানিয়েছিল—ঠিকমত বারুদ আর ফৌজ পেলেই বলখ্-বদকশানে মুঘল ধ্বজ ওড়ানো যাবে?

—আলমপনা। ওখানে তো মুঘল ধ্বজ আমরা উড়িয়ে এসেছি। আমি—উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ—আমরা দু'জনই বলেছিলাম, মুঘল তোপের মুখে উজবেগরা দাঁড়াতে পারবে না।

—মুঘল ধ্বজ উড়ল অথচ উসুল মোটে তেইশ লাখ!

—হাঁ জাঁহাপনা উড়েছে। তবে উসুল মোটে তেইশ লাখ নয়।

আওরংগজেবের একথায় ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ তুলে তাকালেন শাহজাহান—শাহজাদার মুখে। ভেতরে ভেতরে বাদশা তখন ফুটছেন। তিনি জানেন—তেইশ লাখ নয় ঠিক—সাড়ে বাইশ লাখ। মুখে জানতে চাইলেন, তাহলে কত?

—তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। —একথা বলে আওরংগজেব আরও বেশি করে নিজের মুখখানি হাসি হাসি করে তুললেন। ভেতরে ভেতরে কিন্তু তিনি কাঁপছিলেন। তিনি জানেন—এই কথাবার্তার জায়গাটা যদি দেওয়ান-ই-খাস না হয়ে কোনও প্রান্তর হত—বাদশা শাহজাহান না হয়ে মানুষটি যদি শুধুই শাহজাদা খুর্রম হতেন—আর তিনি নিজে শাহজাদা আওরঙ্গজেব না হয়ে অন্য যে-কেউ হতেন—তো এতক্ষণে হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু খুর্রম তাঁকে খোলা সমশের হাতে পেড়ে ফেলতেন। আওরঙ্গজেব জানেন—তাঁর নিজের একটা সুবিধা আছে। তিনি এখন তাঁর নিজের আব্বা হুজুরের সঙ্গেই কথা বলছেন।

শাহজাদা দারা তাঁর ছোটে ভাই আওরঙ্গজেবের মুখে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। হিন্দুস্থানের বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে এ কী বে-তমিজি?

শাহজাহান রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, বেশি?

—হ্যাঁ বন্দেগান। উসুল তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি হয়েছে। সে-উসুলের মাপ দুনিয়ার কোনও মোহরেই হবার নয়।

সারা দেওয়ান-ই-খাসে সবার বুকের নিঃশ্বাস পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। বাদশা কোনওরকমে বলতে পারলেন, কী রকম?

—আপনি হিন্দুস্থানের বাদশা। হিন্দুস্থানের বাদশার খোয়াব ছিল—তাঁর

শাহীর শরিয়াতের মানুষজনের জায়গাগুলোয় মুঘল ধ্বজ উড়বে একদিন। তা তো উড়েছে বন্দেগান। ওড়েনি?

সারা দেওয়ান-ই-খাসে সবার নিঃশ্বাস পাথর হয়ে জমে গেছে। খোদ বাদশা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন তাঁর তিসরি শাহজাদার মুখে।

তখন আওরঙ্গজেব বলে চলেছেন, বাদশার খোয়াবের দাম তো মোটে চার কোটি তনখা হতে পারে না। নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি। মুঘল ফৌজ বলখ্-বদকশানে গেলে ফের মুঘল ধ্বজ ওখানে উড়বে—পাহাড়ী পাতলা বাতাসে পত্ পত্ করেই উড়বে জাঁহাপনা। কিন্তু ফৌজ ফিরে এলেই ওরা মুঘল ধ্বজ নামিয়ে নিয়ে নিজেদের পতাকা ফের উড়িয়ে দেবে। ওখানে জয় করার মতো কিছু নেই হজরত। পাথর আর পাথর। চওড়া পাতার ঘাস আর কিছু পাহাড়ী খচ্চর। তুষার ঝড়। সাঁই সাঁই বিষ-তীর। কী আছে বলতে পারেন ওখানে?

বাদশা কিছুতেই তাঁর এই তিসরি শাহজাদার মুখে মুখ তুলে তাকাতে পারছেন না। এ এক অসহ্য অবস্থা। নিজের ছেলের মুখে তাকাতে না-পারা যে কী কষ্টের। সন্ধ্যার দেওয়ান-ই-খাসে যেন এখন নিশীথের নির্জন নেমে এসেছে। শাহাজাদা আওরঙ্গজেব এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। এবার অনেকটা নুয়ে পড়ে তিনি বাদশাকে কুর্নিশ করলেন। তারপরে সেই অবস্থায় পেছনে হটে গিয়ে হায়দরাবাদী এক আমিরের পাশে বসলেন আওরঙ্গজেব।

ঠিক তখনই—যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ বললেন, হজরত। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট এমনকি গজনির আকাশে ফের বারুদের গন্ধ—

মসনদে পাশ বদলে বাদশা বললেন, জানি সাদুল্লা খাঁ। জানি।

আবার অনেকক্ষণ কোনও কথা নেই দরবারে। ওর ভেতরেই বাদশা আবার বললেন,—শাহী মানে কী সাদুল্লা খাঁ?

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ নিয়মের মানুষ। ছিলেন রোজিনাদার। সেখান থেকে ধাপে ধাপে মনসবদার হয়েছেন। হয়েছেন শাহী উজির। শেষে উজিরে আজম। তিনি কাজ বোঝেন। আবার গোলাবারুদও বোঝেন। কিন্তু বোঝেন না যেটা—সেটা হল হেঁয়ালি। তবে একটা আন্দাজ অবশ্য পান। তিনি বাদশার কথায় কিছুই বলতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন।

তখন শাহজাহান দুই চোখে সারাটা দেওয়ান-ই-খাস জরিপ করে আওরঙ্গজেবের মুখে তাকালেন। তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, দেখি শাহজাদা কী বলেন?

আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়িয়ে বাদশাকে তসলিম জানালেন। তারপর বললেন, শাহী মানে—তা তাঁর হুকুমত হয় সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূরে দূরে জারি করবে—বাড়তি তাগদের জোরে—নয়তো সীমানার ভেতর ধাপে ধাপে তাঁর হুকুমত কুঁকড়ে আসবে—তাগদের অভাবে।

শাহজাহান মনে মনে বললেন, বাঃ। কখন শিখল? কবে এসব বুঝল আওরঙ্গজেব?—তারপর বাদশা মুখ গম্ভীর করে বললেন, কান্দাহারের আসমানে আঁধি উঠেছে।

দরবারে কেউ মুখ খুললেন না। সবাই জানেন—কান্দাহারের আকাশে কিসের আঁধি।

শাহজাদা দারা ছোটভাই আওরঙ্গজেবের গলায় যেন আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশার স্বরই শুনতে পেলেন। সেই একই কথা। শাহী মানে—হয় সীমানা ছাড়িয়ে সীমানার বাইরে গিয়ে তাগদের জোরে হুকুমত জারি করা—নয়তো তাগদের অভাবে সীমানা থেকে হুকুমত গুটিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা। এই নাকি দুনিয়ার সর্বকালের সব রকমের শাহীর ইতিহাস। তিনি দেওয়ান-ই-খাসে বসে একা একা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না—তাহলে কি মানুষের কোনও ইতিহাস নেই? ভালবাসার কোনও ইতিহাস? নেই ক্ষমতার ইতিহাস? করুণার ইতিহাস? আল্লাতলার অসীম অনুগ্রহের ইতিহাস নেই? সবটাই তাহলে স্রেফ শাহী—ওরফে ক্ষমতার ইতিহাস? তা কী করে হয়? মানুষবিহীন কোনও ইতিহাসই যে হয় না। তাগদ ফুটে ওঠে মানুষকে ঘিরেই। যেমন কি না ঈশ্বর উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন মানুষকে নিয়েই। মানুষ বই ঈশ্বর হন না। আমি আছি বলেই তিনিও আছেন। তাই মানুষের ইতিহাস শুধুই তাগদ নয়। তাতে যেমন রাগ আছে—ত্যাগও আছে। তাই শাহী মানে শুধু হুকুমতের সীমানা নয়—মসনদ নয়—তোপখানাও নয়। এসব কথা বলে ওঠার জন্যে শাহজাদার বুকের ভেতর থেকে কে যেন বুকের কপাটে দুম দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ বললেন, শাহ আব্বাস মাত্র দশ বয়সে এই তো দু'বছর হল ইস্পাহানের মসনদে বসলেন! বসেই তিনি ফৌজ নিয়ে খোরাসান অব্দি এগিয়ে এসেছেন।

শাহজাদা দারা কোনও কথা বললেন না। বললেই তা আব্বা হুজুরের ওপর গিয়ে বর্তাবে। শেষবার—তা প্রায় ছ'সাত বছর হতে চলল—দারা যখন ফৌজ নিয়ে কান্দাহারের দিকে এগিয়েছিলেন, তখন ইরানের শাহ সফী নিশাপুর অব্দিও পৌঁছতে পারেননি। কাশান শহরেই তিনি অসুখে মারা যান। শাহ আব্বাস তখন নেহাত শিশু। তখন দারা পারস্যের সিস্তান, ফরাহ্‌, হিরাত শহর দখল করে কাবুল-কান্দাহার—পরিণামে হিন্দুস্থানকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেটাই ছিল উপযুক্ত সুযোগ। সেদিন শাহজাদার এই আগ বাড়িয়ে থাকার নীতি বাদশার পছন্দ হয়নি পাছে কান্দাহার পৌঁছে শাহজাদা দারা পারস্য আক্রমণ করে অকারণে লড়াই বাধিয়ে বসেন সেজন্যে শাহজাদাকে গজনী থেকেই ফিরে আসার জরুরি হুকুম পাঠানো হয়েছিল। সেদিন ওই সুযোগের অবহেলা করে বাদশা ঠিক করেননি। আজ তাহলে এত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসত না।

বাদশা শাহজাহান হঠাৎ বলে উঠলেন, ঢাকায় খবর পাঠাতে হচ্ছে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বুকের ভেতর একটি আশাতরু শেকড়সুদ্ধ মড়মড়

করে ভেঙে পড়ল। তিনি নিজেকেই মনে মনে বললেন, শাহজাদা আওরংগজেব! তুমি ইনসাফ কোনওদিনই পাবে না। তোমার আব্বা হুজুরের বাঁ চোখও তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। নিজের আব্বা হুজুরের স্নেহবঞ্চিত আওরংগজেব—তোমার সামনের সবটা রাস্তাই তোমাকে লড়াই করে উঠতে হবে।

বাদশা ঘোষণার গলায় বললেন, এবার কান্দাহার অভিযানে শাহজাদা সুজাঙ্গীরকে পাঠানো যাক।

শাহজাদা আওরংগজেবের বুকের ভেতর শিকড়বাকড় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে পড়ছিল রৌশনআরার কথা। লেগে থাকো। লেগে থাকো। আওরংগজেব দাঁড়িয়ে উঠে রীতিমত কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন, হজরত! আপনার ইচ্ছাই হিন্দুস্থান। আপনিই হিন্দুস্থানে সব ইচ্ছার ফোয়ারা।

তাই নাকি? —বলে বাদশা তাঁর তিসরি শাহজাদার মুখে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারছেন না—একথা বিদ্রূপ। না, পূর্ণ সমর্পণ? কিংবা শ্লেষের মিশেল দেওয়া আত্মসমর্পণ?

আওরংগজেব তো এত নরম সরম শাহজাদা নন্। রীতিমত সব গুলিয়ে গেল বাদশার। তিনি শান্ত গলায় বললেন, আমার হুকুম—তুমিই এবার কান্দাহারে মুঘল ফৌজের মাথায় থাকবে।

আওরংগজেব তখন কাঁপছেন। শাহজাহানের মুখে হাসি।

॥ চুরাশি ॥

নয়া রাজধানী জাহানাবাদে যমুনার গায়েই শাহজাদা দারার নয়া হাভেলি—নিগমবোধ মঞ্জিল। এই মঞ্জিলের মাটির নীচের ঠান্ডা ঘর—তয়খানায় বসে এক একদিন শাহজাদার মনে হয়—ওপরে উঠলেই তো হিন্দুস্থানের রাজধানী। তার চেয়ে এই তয়খানার নির্জনে বসলে দেখা যায় শুধু যমুনার জল। তার বুকে বাতাস ঠান্ডা হয়ে এই তয়খানায় ঢোকে। তবে এখন শীতে জাহানাবাদের আকাশে সকালবেলার সূর্য। তার রোদে আরাম। তার বাতাসে আয়েশ।

শাহজাদা দারা ওপরের ঘরগুলোয় বসে বাইরের লোকজনকে দেখা দিয়ে থাকে। এই যেমন ফৌজি রসদের যোগানদার, বারুদ থেকে আরবি ঘোড়ার ব্যাপারী, দেওয়ানখানার তেপনচি কিংবা নিজের সুবার নায়েব সুবেদারের তরফে খবর বয়ে আনা কাসিদ। কিন্তু মাটির নীচে তয়খানার নির্জনে এদের তিনি আসতে দিন না। তয়খানার দুনিয়া সম্পূর্ণ আলাদা।

ছেলে সুলতান সুলেমান শুকো তার মা নাদিরা বেগমকে নিয়ে জাহানাবাদে থাকলে লালকিল্লাই তাদের অন্দরমহল—আর আগ্রায় থাকলে আগ্রা দুর্গই তাদের সাবেক অন্দরমহল। এত বড় হিন্দুস্থানের এক নদীতে কোনও নৌকাডুবি হলে—সে খবর আরেক পাহাড়ে পেঁছিতে অনেক দিন লেগে যায়। তাই বাইরের জগতের কোথায় কী হল—তার কোনও দাগই অন্দরমহলে পড়ে না। মনে হয়—যুগ যুগ ধরে অন্দরমহলে যে আরাম-আয়েশ, কুর্নিশ-তসলিম, নাচ-গান চলে

আসছে—তা আরও অনেক যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে। কিল্লার পাথরের দেওয়াল কিছুতেই কাঁপে না—হেলে না—বদলায় না। শুধু লড়াইয়ের সময় কামানের গাড়ির শব্দ করে গড়ানো একটু-আধটু চঞ্চল করে তোলে কাউকে কাউকে। তাও অল্প সময়ের জন্যে।

এই তো শাহী। এই মুঘল শাহীর শেকড় হিন্দুস্থানের জমিনের ভেতর কতটা নীচে চলে গিয়েছে—তার কোনও আন্দাজ কারও নেই। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। শাহজাদা দারার এক একসময় মনে হয়—নিজেকে নিয়ে মাতোয়ারা এই হিন্দুস্থান এক আজব রঙ্গশালা।

তয়খানায় সকালবেলাতেই চারখানি চাররকমের মহাভারত নিয়ে পড়েছেন শাহজাদা। চারখানিই ফারসি অনুবাদ। প্রথমখানি নকি খানের অনুবাদ। বাদশা আকবরের আমলের। মুখবন্ধ আবুল ফজলের। একখানি খুব সংক্ষেপে—অনুবাদ ইমাদউদ্দিন সিরকাজির। শুধু দ্রোণ-পর্ব অনুবাদ করেছিলেন সুলতান আমেদ সিরাজি। আর রয়েছে আবদুল কাদের বদাউনির বিরাট-পর্ব।

এই চারখানি অনুবাদই এখন কালের অতলে। ফতেপুর সিক্রির পোড়ো অলিন্দ থেকে শাহজাদা কোনওরকমে পেয়েছেন। সেখানকার ভাঙা দেওয়ানখানার সিঁড়িঘরের লাগোয়া ঢাকা অলিন্দে। মহাভারতের কাহিনী বড় টানে শাহজাদাকে। কতকাল আগে এই দিল্লির কাছাকাছি আরেক শাহী ছিল। সেখানেও একদিন লেগেছিল ঘমণ্ড আর তাগদের লড়াই। কী বিচিত্র এই কাহিনী। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সারা মহাভারত ফের ফারসিতে অনুবাদ হওয়া দরকার। অনুবাদের পর এই মহাভারত খুব মন দিয়ে পড়া দরকার—সবচেয়ে আগে হিন্দুস্থানের বাদশার। তারপর পড়া দরকার শাহজাদাদের। সুবেদার-মনসবদার-ফৌজদারদের, এমনকি শাহজাদী রোশনআরা—শাহজাদী গওহরআরারও পড়ে নেওয়া ভাল এই মহাভারত। দারা যেন এই জাহানাবাদ—আগ্রায় সেদিনকার হস্তিনাপুরের ছায়া দেখতে পান।

শাহজাদা বারবার ওপর থেকে নীচে নামার কাঠের সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ কিংবা বনমালী—কেউই তো এখনও এসে পৌঁছলেন না। শেষে কি লালকিল্লায়, কোনও কাজে ওঁরা আটকে গেলেন? এত দেরি তো করেন না ওঁরা। মহাভারত নিয়ে কথা ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে একজন দাখিলা নেমে এসে কুর্নিশ করল।

দারা জানতে চাইলেন, মুন্সি চন্দ্রভান এসেছেন?

—না হজরত। দু'জন ফিরিঙ্গি পাদ্রি এসেছেন।

—তাঁদের নিয়ে এসো এখানে। —বলে মনে মনে নিজেকে বললেন, নিশ্চয় পাদ্রি হাইনরিশ রথ এসেছেন। সঙ্গে আবার কে? খ্রিস্টকে নিয়ে রথের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে দারার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যে দু'জন শাহজাদার তয়খানায় নেমে এলেন—তাঁদের কেউই হাইনরিশ রথ নন। দারার মুখে আপনা আপনি আনন্দের আভা ফুটে উঠল। আসুন ফাদার বুজেও। আসুন ফাদার জুজার্তে।

হেনরি বুজেও আর পেড্রো জুজার্তে—দুজনই বয়সে ফাদার হাইনরিশ রথের চেয়ে বেশ ছোট। রথ এসেছিলেন এদেশে আকবর বাদশার আমলের শেষদিকে। আর এঁরা এসেছেন জাহাঙ্গীরি আমলের মাঝামাঝি। তবে দু'জনই ষাট ছুঁই ছুঁই। ওঁরা দুজন যে হিন্দুস্থানে বসে নিঃশঙ্কভাবে নিজেদের ধর্ম বিনা বাধায় মেনে চলতে পারছেন—সেজন্যে শাহজাদা মনে মনে নিজেকেই ধন্যবাদ দিলেন। তা না পারলে এঁদের সামনে শাহজাদার মাথা হেঁট হয়ে যেত। শুধু ইসলামই সত্য—ইসলাম বই আর অন্য কিছু সত্য নয়—এমন কট্টর মতের মানুষের তো ছড়াছড়ি জাহানাবাদ আগ্রায়। তার ভেতর এটা কিছু কম নয়।

শাহজাদা দুই ফাদারকে তাঁর মুখোমুখি মোটা পশমের কাজ করা বনাতে বসাতে বসাতে বললেন, আমাদের শেষ লক্ষ এক—আমাদের সবার ঈশ্বরও এক।

ফাদার পেড্রো জুজার্তে মিথ্যা আতঙ্কের ভান করে নিজের ঠোঁটে আঙুল দিলেন। দিয়ে বললেন, চুপ। আস্তে বলুন।

দারা হো হো করে হেসে উঠলেন।—কেন? আস্তে বলব কেন? এ তো চিরকালের সত্য।

ফাদার হেনরি বুজেও বললেন, মানছি সত্য। আমরা জানি আপনি সত্য বলছেন। কিন্তু আমাদের মাথার ওপর জাহানাবাদের এখন সহ্য করার ক্ষমতা বড় কম।

—আপনি ফাদার নরম করে বলছেন। আমি বলব কট্টর অসহিষ্ণুরা অন্য কোনও মত শুনতে রাজি নয়। তারা শুধু নিজেদের গলার আওয়াজ শুনতে ভালবাসে। তারা ইসলাম বিপন্ন—এই ধুয়া তুলে তাগদ কবজা করতে চায়। ক্ষমতাই ওদের লক্ষ।

—যে কোনও শাহীকে ঘিরে—মসনদকে ঘিরে ধর্ম চিরকালই এ কাজ করে এসেছে শাহজাদা। এ তো নতুন কিছু নয়।

—এবার আপনারা নতুন কিছু দেখতে পাবেন ফাদার।

ফাদার বুজেও বললেন, কিরকম?

—ইসলাম, ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ধর্মের গূঢ় সত্য খতিয়ে দেখছি। আপনাদের মতো বিভিন্ন ধর্মের আরও যাঁরা আছেন—তাঁদের সবার সঙ্গে এইসব ধর্মের ভেতরকার ঐক্য নিয়ে কথা বলেছি। বহু সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছি। সাধু সারমাদের সঙ্গী অভয়চাঁদ তো এখন দিল্লি আসেন যান। তিনি মোজেসের বইটি ফারসিতে অনুবাদ করেছেন। সাধু সারমাদ সে অনুবাদ দেখে শুধরেও দিয়েছেন। সব পড়লাম। এবার মানুষের সব ধর্মের ঐক্যের কথা বলার সময় এসেছে ফাদার।

এবার হেনরি বুজেও কিংবা পেড্রো জুজার্তে—কেউই কোনও কথা বললেন না। বরং বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তয়খানার ভেতরকার পাতলা শান্ত বাতাসও যেন ভারি হয়ে এল। অনেক পরে জুজার্তে বললেন, জাহানাবাদ—আগ্রার হালচাল দেখে আপনার জন্যে আমাদের চিন্তা হয় শাহজাদা। মাটির নীচে নিজের তয়খানায় বসে এসব কথা বলছেন বলুন—কিন্তু মাটির ওপরে জাহানাবাদে এসব

কথা বলবেন না।

দারা হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, মাটির ওপরে রাজধানী জাহানাবাদের শাহীকে ঘিরে যারা রয়েছে তাদের কথা ভেবেই তো একথা বলছেন।

ফাদার বুজেও সামান্য মাথা নাড়লেন।

দারা বললেন, মাটির ওপরে রাজধানী—শাহী—তাগদ—এসব হল গিয়ে নসিব ফেরাতে বেরিয়ে পড়া কিছু লোকের দুনিয়া।

ফাদার জুজার্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

তাঁর মুখ দেখে দারার মায়া হল। তিনি বললেন, আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। শাহী আসলে কী? বলা হয় ঈশ্বরের খোদার বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া একজন মানুষ—যিনি বাদশা। যে কিনা আসলে ছলে বলে কৌশলে এই দুনিয়ার গায়ে খানিকটা জায়গায় কিছু মানুষের মাথার ওপর একটা মসনদ জোগাড় করে বসে গিয়ে ঘোষণা করে—আমিই তোমাদের দণ্ডমুণ্ড—আমি তোমাদের বাদশা। তাই নয় কি? দুনিয়ার ইতিহাসের দিকে তাকান ফাদার। সব যুগে—সব দেশে এই-ভাবেই ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়া একজন মানুষ নিজের তাগদকে—নিজের ভোগবিলাসকে—যা ইচ্ছে করে যাওয়ার অধিকারকে পাহারা দিতে—প্রশ্নাতীত করতে সবসময় খোদা আর মসজিদকে সঙ্গী করে নেয়। দরকারে মসজিদের মোল্লাদের ভেতর এই বাদশা লোকটি তাগদের খুদ-কুঁড়োও ছুঁড়িয়ে দেয়। হাতে রাখতে হবে তো। এর সঙ্গে যোগ হয় তাঁর অসীম ক্ষমতা মাখানো কিছু অলৌকিক রূপকথা। যাতে কিনা—এই মসনদ চিরস্থায়ী হয়। যাতে কিনা এই যথেচ্ছাচারের অধিকার বংশপরম্পরায় বহাল থাকে। একেই কি আমরা শাহী বলি না ফাদার? একেই তো আমরা বলি বিধি-নির্দিষ্ট।

শাহজাদা যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁফাতে লাগলেন। তয়খানায় কোনও শব্দ নেই। শাহজাদা এবার শান্ত গলায় বললেন, এই তয়খানার ওপরে মাটির ওপর রাজধানী জাহানাবাদেও ওই একই শাহী বহাল। তার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। মুঘল বলতে যে গরিমার ছায়া আজ হিন্দুস্থানের দেহাতে মানুষের মনে দাগ কাটে—তা তো আসলে সওয়া শো বছর আগে গজনি থেকে ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়া বাবর নামে এক চাঘতাইয়ের লড়াই, খোয়াব, জেদ, শিকার, কামান, আল্লায় আস্থার কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু কি? এর ভেতর কোথায় ইমান? ইনসাফ? কোরবানি? কোথায় বা আল্লা? ঈশ্বর?

দুজন ফাদারের কেউই কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁরা শাহজাদার মুখে তাকিয়ে রইলেন।

ফাদার পেড্রো জুজার্তের মনে হল—এ কী অদ্ভুত জ্ঞান এই তরুণ প্রাণ থেকে বেরিয়ে এল? যা শুনে—যা মগজের ভেতর নাড়াচাড়া করে মনে হয়—আমি নিঃস্ব—আমি সর্বস্বান্ত। কেননা—সাধারণ মানুষ থেকে গির্জার ফাদার—সবারই ছোটবেলা থেকে মনটা এভাবে গড়ে ওঠে—দেশে একজন রাজা আছেন

—রাজার ক্ষমতা আছে—গৌরব আছে। তার সবচেয়ে বড় কথা—রাজার রাজা হয়ে ওঠার পেছনে ঈশ্বরও আছেন। এই এমন রূপকথা মাখানো জগৎটা যে কত ফাঁপা তা এইমাত্র শাহজাদা দারাশুকো জলের মতো সরল করে বলে দিলেন। জীবনের এতগুলো দিন ধরে যা আমরা মনে মনে লালন করে আসি—তা যদি এভাবে এক লহমায় ফাঁকা—অসার হয়ে যায় তো বড় নিঃস্ব লাগে নিজেকে।

ঠিক এরকমই এক সকালবেলায় সুরাট বন্দরে অনেক জাহাজের ভেতর বাহারি সব পাল গুটিয়ে সাধারণ জাহাজের চেয়ে কিছু বড় একখান জাহাজ এসে ভিড়ল। জলের ওপর ভেসে থাকা জাহাজের গায়ে জায়গায় জায়গায় বসানো গজাল লোহার মাথা দেখে বোঝা যায়—এ জাহাজকে বড় বড় দরিয়া চষে তবে হিন্দুস্থানে আসতে হয়েছে। লম্বা পাড়ির পর এসব জাহাজ সুরাটে মেরামতি হয়—রং হয়। তার আগে ব্যাপারীদের আনা মালপত্র ছোট ছোট নৌকোয় করে ডাঙায় নিয়ে যাওয়া হয়। খাঁড়ি ধরে। ডাঙার ভেতর অনেকদূর অব্দি বয়ে যাওয়া নদী ধরে। কেননা, জাহাজ একদম খোদ সুরাট বন্দরে ভেড়ানোর উপায় নেই কোনও। খাঁড়িমুখো—নদীমুখো যত্রতত্র চড়া পড়েছে।

বেলা বাড়তে দেখা গেল—জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমে আসার জন্যে পাটাতনে দাঁড়ানো প্রায় সবাই অধীর হয়ে পড়েছে। কিন্তু বন্দর শাহর হাতে অত নৌকো নেই। দূরে থেকে রোদের আলোয় যা দেখা গেল—জাহাজে বেশ কিছু ভিনদেশি যাত্রী তো আছেই—আছে কিছু হাবসি গোলাম—তারা লম্বায় সবার মাথার ওপর—আর অন্তত তিনটি জিরাফ! তার মানে এ জাহাজ নিশ্চয় মোজাম্বিক ছুঁয়ে এসেছে—নয়তো জিরাফ আসতে পারে না। এ জিরাফ নিশ্চয় কোনও বড় আমলার জন্যে বড় কোনও ব্যাপারীর ভেট। আর যে জাহাজ একবার মোজাম্বিকে ভেড়ে—সে জাহাজ অতি অবশ্যই মলাক্কা, হরমুজ, মসকাত, সিংহল হয়ে আসবেই। এই পাঁচ জায়গাই তো এখন দরিয়ায় রীতিমত লাভ তোলার জায়গা।

দুপুরের শেষে বন্দর মুখে ভিড় কমলে জাহাজটির গায়ে আরবি হরফে লেখা তার নাম পড়া গেল। ময়েসাট্রিথট। সুরাট বন্দর মুন্সি নামটা পড়ে ঠিক করতে পারলেন না—ফিরিঙ্গিদের ঠিক কোন দেশ থেকে এ-জাহাজ এল। বিকেলের মুখে ময়েসাট্রিথট থেকে এমন একজন যাত্রী বড় নৌকো করে ডাঙায় এসে পা রাখল —যাকে দেখে বন্দরের মাল খালাসি মুটে থেকে বন্দর মুন্সি—সবাই একসঙ্গে তাকিয়ে পড়ল।

—আরে! এ যে ট্যাভারনিয়ার সাহেব—

মুন্সির এ কথায় ট্যাভারনিয়ার হেসে একটু ঝুঁকে ফের সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, অনেকদিন পরে। তাই না?

মুন্সি বলল, অনেকদিন কোথায়! দু'বছরও হয়নি—আপনি দেশে ফিরে গেলেন।

কথা আরও এগোত। কিন্তু একটা হইচই পড়ে গেল। বজরা মতো বড় নৌকো থেকে লম্বা লম্বা পায়ে পরপর তিনটি জিরাফ এসে ডাঙায় নামল। অত

বড় চেহারার জানোয়ার। তার ওপর জিরাফরা ডাঙায় এসে পা দিতেই তাদের বয়ে আনা বজরাটা ভীষণ দুলছে—একটা জিরাফ লম্বা গলা বাড়িয়ে বন্দর-মুন্সির মাথার পাগড়িটা গাছের পাতার মতো মুখে নিয়ে দিব্যি চিবোতে লাগল।

বন্দর-মুন্সি তার কুরশি থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এ তিন জানোয়ার কোথায় যাবে?

ট্যাভারনিয়ার সুরাট বন্দরে নতুন নন। এই নিয়ে ক'বার হল তাঁর এ-বন্দরে আসা। এখন হিন্দুস্থানে নেমে তিনি বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে শূন্যে দু'হাত তুলে ক্রাইস্টকে আর ধন্যবাদ দেন না। হিন্দুস্থান তাঁর কাছে এখনও এক বিরাট বিস্ময়। কিন্তু এখন তিনি এখানকার আদব কায়দা, ফৌজদার, মোহর যাচাইয়ের স্রফ, কোতোয়াল, সরাই, কসবি—সবই জানেন। এখন যিশুর জন্মের পর ষোলোশো আটচল্লিশ বছর চলছে। তার নিজের এই তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি বেশ ক'বার হিন্দুস্থান ঘুরে গেছেন। বন্দর-মুন্সির কথায় লাল রিবন দিয়ে বাঁধা নিজের লম্বা লম্বা সোনালি চুল খুলে ফেলে ট্যাভারনিয়ার রিবনটি নিজের হাতে নিলেন। তারপর বুক খোলা কোটের পকেট থেকে একটি ওলন্দাজ ঘড়ি বের করে সেটি ওই রিবনে গাঁথলেন। গেঁথে রিবনের মালাটি বন্দর-মুন্সির গলায় পরিয়ে দিয়ে ট্যাভারনিয়ার—এক গাল হাসলেন।

বন্দর মুন্সিটি মীর্জাপুরি কায়েত। চেহারায় ছোটখাট। গালে পান। কপালে তিলক। তার মনে হচ্ছিল—তার সামনে শীতের বিকেলে এখন তিনটি নয়—মোট চারটি জিরাফ দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, ট্যাভারনিয়ারও অনেকখানি লম্বা। তার তিন জিরাফের ভেতর তিনিও যেন একজন জিরাফ হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথাটা অনেক উঁচুতে।

রিবনে ঝোলানো ঘড়িটি বুকের ওপর পড়তেই সেটি চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল মুন্সি। নিকেল করা। দাঁড়ি দুটিতে সোনার জল। মুখে হাসি এসে গেল মুন্সির। সে-মুখে তাকিয়ে ট্যাভারনিয়ার তাঁর এক জিরাফের মুখ থেকে চিবনো পাগড়ি উদ্ধার করে মালিককে ফেরত দিলেন। দু'হাত কোটের ওপর দিয়ে কোমরে ছুঁয়ে দেখলেন—হ্যাঁ। জামার নীচে হিরে-মুক্তো রাখা চামড়ার গেঁজটি ঠিকই আছে।

ব্যস্ত বন্দর। নৌকো ভিড়ছে। মাল নামছে। মাল বোঝাই হয়ে আবার নৌকো ছাড়ছে। ঢেউয়ের গুঁড়োর ওপর ভাসন্ত জোলো-পাখি। বন্দর শাহর লোকজন মাল ওজনের কাঁটায় মাপছে। দুনিয়ার নানান দরিয়ার বন্দর থেকে কাটা হুন্ডি ভাঙিয়ে আশরফি দেওয়ার জন্যে কাছেই গাদিতে গাদিতে হিন্দুস্থানের সব মহাজন বসে। সেখানে নানান দেশের ব্যাপারী সারি দিয়ে দাঁড়ানো। কেউ হুন্ডি ভাঙিয়ে ফের নয়া হুন্ডি করিয়ে নিচ্ছে। কেননা, রাস্তায় নানান বিপদ। নগদ নিয়ে কেউই ঘোরাফেরা করতে চায় না।

বন্দর মুন্সি আর জানতে চাইল না—ওই তিন জিরাফ এখন কোথায় যাবে? নিশ্চয় কোনও বড় আমলার জন্যে ভেট হিসেবে যাবে। সুরাট বন্দরে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সবাই দেখতে পেল—ট্যাভারনিয়ার বন্দরের কাছাকাছি সরাই-

থানার দিকে চলেছেন। তাঁর পেছনে তাঁর তিন জিরাফ। যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালেন ট্যাভারনিয়ার। ফিরেই দেখলেন—বন্দর-মুন্সির মুখ। সে মুখে আশা, হাসি, মিনতি। ট্যাভারনিয়ার চেঁচিয়ে বললেন, কেমন ব্যবসা হয় দেখি। ফেরার পথে তো আবার আসছি—।

ট্যাভারনিয়ারের কথার সামান্য ভাঙা ভাঙা শেখা ফারসি। তাতে বাজার চলতি নয়া উর্দুও আছে। বাকি সবটাই আকার ইঙ্গিতে। তাই নিয়েই হিরের কারবারি এই ফ্রানসিসি মানুষটি হিন্দুস্থানের এক মাথা থেকে আরেক মাথা করে বেড়াচ্ছেন।

বন্দর-মুন্সি দেখতে পেল—আরও আরও ভিনদেশি ব্যাপারির মতোই এই ঢ্যাঙামত মানুষটি সুরাটের বাজারের রাস্তা দিয়েই এগোতে এগোতে দিব্যি হিন্দুস্থানের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

খানিক এগিয়ে ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, তাঁর জিরাফ তিনটি তাঁকে দিব্যি পেছনে ফেলে অনেকটা অনেকটা করে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনেই সন্ধ্যা। এভাবে এগোলে খানিকক্ষণের ভেতরেই সন্ধ্যার আঁধারে জিরাফ তিনটি হারিয়ে যাবে। এখুনি কোনও সরাইয়ে জায়গা হওয়া দরকার। সঙ্গে আবার কোমরের গেঁজেতে নাশপাতির মতো দেখতে সাতটি মুক্তোর একটি মালাও আছে।

ট্যাভারনিয়ারের সামনে এখন দুটি রাস্তা। দুটি রাস্তাই আঁধার করে এসেছে। আঁধার আরও গাঢ় হয়ে উঠছে—রাস্তার ধারের ঝুপসি ঝুপসি গাছের ঝাঁকড়া ডালপালার ছায়ায়।

একটি রাস্তা দিয়ে সুরাট থেকে আহমেদবাদ হয়ে ছেচল্লিশ দিনের হাঁটাপথে আগ্রা গিয়ে পৌঁছনো যায়। আর অন্যটি খাণ্ডোয়া হয়ে গোয়ালিয়রের ওপর দিয়ে আগ্রা গেছে। এ রাস্তাও প্রায় পঞ্চাশ দিনের হাঁটাপথ।

ট্যাভারনিয়ার জানেন—এবার তিনি এর কোনও পথেই যাবেন না। তিনি দৌড়ে দৌড়ে জিরাফদের ধরলেন। জিরাফরা লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়ে কাঁটা ঝোপ থেকে বেছে কচিপাতা খাচ্ছিল। হঠাৎ এক দৃশ্য দেখে ট্যাভারনিয়ার দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গোড়ায় হাতি। তার পেছনে উটের সারি। জোড়ায়—জোড়ায়। কখনও তিরিশ থেকে চল্লিশ জোড়া পর্যন্ত। সবার পিঠে জিনের ওপর একটি করে ছোট সরু কামান। কালভেরিন জাতের। গুচ্ছবন্ধের কাছে মশাল হাতে একজন করে গোলন্দাজ। পরনে তার অনেকটা পাতলুনের মতো পা থেকে মাথা অব্দি দীর্ঘ চামড়ার পোশাক। এরপর রসদ বোঝাই অগুনতি গো-গাড়ি। সেগুলিকে ঘিরে হেঁটে এগিয়ে চলেছে পদাতীর দল। তাদের পেছনে বোঝা পিঠে খচ্চরের সারি। তাদের শেষে এই বাহিনীর সেনাপতি।

কোথায় আবার লড়াই লাগল? ট্যাভারনিয়ার সাবধান হয়ে গেলেন। এই মিছিলের খুব কাছে গেলে ফৌজ তাকে ধরে নিয়ে মাল বওয়ায় জুতে দিতে পারে। চাই কি জিরাফ সমেত। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একজন ভিস্তিওয়ালা বলল, কান্দাহারে লড়াই লাগবে। সে লড়াইয়ে সিপাহ-সালার শাহজাদা আওরঙ্গজেব।

ট্যাভারনিয়ার বুঝলেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে এই ফৌজ চলেছে গুজরাত থেকে। তিনি জিরাফ তিনটি এনেছেন গুজরাতের সুবেদার শাহজাদা দারাশুকোকে উপহার দেবেন বলে। এ-দেশে হিরে-মুক্তোর কারবার করতে গেলে গোড়াতেই দোরে দোরে উপহার ছড়াতে হয়। ছড়াবার পর ব্যবসার জাল গুটোতে হয়। সেই গোটানোর বেলায় এসব উপহারের খরচ-খরচা তুলে নিতে হয়। যাক, সুখবর পাওয়া গেল একটা। লড়াই মানেই কাঁচা মোহর উড়বে বাতাসে। তখন হিরে-মুক্তো দেখিয়ে বাতাস থেকে মোহর কুড়িয়ে নিতে হবে।

পরদিন ভোর ভোর সরাই থেকে খাণ্ডোয়ার রাস্তাই ধরলেন ট্যাভারনিয়ার। খানিক এগিয়ে তিনি অন্য রাস্তা নেবেন। তাই-ই ইচ্ছে। সুরাট থেকে আহমেদাবাদ হয়ে যেমন আগ্রা যাওয়া যায়—তেমনি আগ্রা যাওয়া যায় খাণ্ডোয়া দিয়ে নাসিরগড় হয়ে গোয়ালিয়রের ওপর দিয়ে। সূর্য যখন মাথায় মাথ র—তখন দেখা গেল, লাল রিবন বাঁধা ট্যাভারনিয়ারের মাথাটি তিন জিরাফের মাঝখানে মাঝে মাঝে উঁকি দিচেহ। জিরাফ সমেত তিনি খাণ্ডোয়ার পথ ছেড়ে দক্ষিণে নেমে যাচ্ছেন। ইলোরার দিকে। হাজার হোক হিরে-মুক্তো বেচে খাওয়া মানুষ। হয়তো গোলকুণ্ডার দিকেই যাবেন ট্যাভারনিয়ার।

বাদশা শাহজাহানের বয়স এখন ষাটের দিকে ঝুঁকেছে। একসময়কার ক্ষিপ্র চিতা ইদানীং যেন কিছু শিথিল। মমতাজমহল নেই প্রায় বিশ সন। সেই থেকেই মানুষটার ভেতরটা যেন আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এসেছে। তারপর বলখ্-বদকশানে ফৌজ পাঠিয়ে তিনি মুঘল শাহীর শুরুয়াত সেই তৈমুরাবাদ, সমরখন্দ, নগর বলখ্—সবই হিন্দুস্থানের সামিল করতে গিয়ে সবে ভীষণ ধাক্কা খেয়েছেন। —দশ হাজার সেপাই ভেসে গেছে। গেছে অঢেল হাতি-ঘোড়া-উট-কামান। চার কোটি তন্‌খা হিন্দুকুশ পাহাড়ে উবে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে মার খেয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ফৌজ মুঘল বাহিনী। তার গৌরব-গরিমা সুরকলি নদীর বরফ জলে তলিয়ে গেছে। এরপর কী হবে আর ময়ূর সিংহাসনে বসে? এই মুঘল মসনদের মান-সম্মান যেন আর নেই।

ক'দিন হল শাহজাহান বাদশা নয়া রাজধানী জাহানাবাদে লালকিল্লার জাঁকের ভেতর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন! জাহানাবাদে সব কিছুই নতুন। এমনকি সেখানকার দেওয়ান-ই-খাসের রুপোর চাঁদোয়ায় সোনার সুতোর ঝিলিক-ও যেন তাঁর গায়ে ফুটছিল। কেননা—অমন আনকোরা রাজধানীতে বসে তিনি বলখ্-অভিযানের ভার সহ্য করতে পারছিলেন না।

তাই সাবেক রাজধানী আগ্রায় এসে তিনি আগ্রা দুর্গের শাহজাহানী মহলে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি খোলা অলিন্দে দাঁড়িয়ে যমুনার ওপারে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নীচে যমুনার চরে সবে মাটি ওল্টানো সারা। এবার সেরা জাতের তরমুজের বীজ মাদা করে বসানো হবে। সে কাজে লেগে থাকা চাষীদের এত উঁচু থেকে কতটুকুই বা দেখাচ্ছে! জাহানাবাদে লালকিল্লার যমুনার দিককার প্রাকার প্রায় দশ মানুষ সমান উঁচু।

আর অন্য দিককার প্রাকার দশ এগারো মানুষ সমান উঁচু হবে। এখানে আগ্রাতেও তাই। বাদশার একবার মনে হল—সাধারণ মানুষের তুলনায় শাহীর তাগদ কত বেশি। অথচ সাধারণ মানুষ আর বাদশার বুকের কষ্ট—বা আনন্দ সবই সমান : সেখানে কোনও ফারাক নেই। আওলাদের জন্যে টান-ভালবাসা—মরহুম বেগমের জন্যে দুঃখ—সেখানে বাদশা থেকে সেপাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন খোদাতালা।

আগ্রায় এখন শীতের দুপুর। যমুনার চরে—জলা জায়গায় কাশবনে হিমালয় টপকে আসা পাখিদের জল নিয়ে খেলা—কিচিরমিচির। এত বড় দুর্গে কে কোথায় আছে বোঝার উপায় নেই। দুর্গ পাহারার রুক্ষমূর্তি রাজপুত সেপাইরা যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে। সারা হিন্দুস্হানের তাগদের ফোয়ারা বাদশা শাহজাহান যে একাকী তাজমহলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—তা শুধু জানে সারা হিন্দুস্হানে মাত্র কয়েকজন রাজপুত সেপাই। তারা বাদশার গোপন পাহারা।

ঠিক এইসময় একজন কাসিদ এসে দাঁড়াল। কুর্নিশ করে চুপ করে গেল। বাদশা তার দিকে তাকাতেই সে চোখের পলক না ফেলে বলতে লাগল, এগিয়ে থাকা ফৌজি চৌকি থেকে খবর এসেছে ; ইস্পাহানের শাহ আব্বাস হিরাতে ফৌজ নামিয়েছেন। খোরাসানে এগিয়ে গিয়ে তিনি কান্দাহার যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

গম্ভীর হয়ে শুনলেন শাহজাহান। তারপর দু'হাতে সামান্য তালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাসিদ সেখান থেকে মিলিয়ে গেল। যেতেই শাহজাহান বাঁ হাতে নিজের কানের কাছে চুল চেপে ধরলেন। ওঃ! হিরাত। হিরাত! বলখ্ অভিযানে দশ হাজার সেপাই চার কোটি তন্‌খা খরচা না করে আমি তো তার চেয়ে অনেক কমে হিরাত দখল করে বসে থাকতে পারতাম।

বলতে বলতে খোলা অলিন্দে তিনি একা একাই পায়চারি করতে লাগলেন। বাইরের আসমান, চরের পাখি, যমুনার কাশবন জানেও না—হিন্দুস্হানের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। কান্দাহার যাবার রাস্তাই যদি বেদখল হয়ে যায় তো শাহজাদা আওরঙ্গজেব কী করবে? আগাম রওনা হয়ে যাওয়া সিপাহ-সালার আওরঙ্গজেবও নিশ্চয় এ খবর পেয়েছে।

আটকের কাছে সিন্ধুর দুই তীর সিন্ধু আর ঝিলমের মাঝখানের জায়গা—এসব নিয়েই কান্দাহার। মাত্র কয়েক বছর হল বাদশা নিজে সুবা কান্দাহার পত্তন করেছেন। দুর্গ কান্দাহারের চারদিকে ফৌজি তাগদ মজবুত করে তবে তিনি এই কান্দাহার সুবার শুরুয়াত করেছেন। হিন্দুস্থানে হামলা করতে হলে হাতে চাই কান্দাহার। আবার কাবুল, ইস্পাহান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, হিন্দুস্থানের ভেতরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের মালপত্র এই কান্দাহারের বাজারে এসেই তবে হাতবদল হয়। ওখানেই ব্যাপারীদের দেওয়া-নেওয়া। সেই কান্দাহার হাতছাড়া হয়ে যাবে? শাহজাহান দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, কিছুতেই না।

কান্দাহার, কাবুল, বলখ্, বদকশান পাশাপাশি। আহুর-মজদায় বিশ্বাসী ইরানিরা কান্দাহার দিয়েই একদিন হিন্দুস্থানে ঢুকত। ওখান থেকেই হিন্দুকুশে

যাবার পথ। হেলমন্দ আর তার শাখা নদীতে কান্দাহার সুজলা-সুফলা। ভাল ধান হয়। ইতিহাস আর বাজারি বুদ্ধিতে তুখোড় শাহজাহান সব দেখতে পাচ্ছেন। ওঃ। কান্দাহার। তোমার আর হিন্দুস্থানের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে থল-চোটিয়াল পাহাড়। তোমার দক্ষিণে থাকে বালুচেরা। পশ্চিমে সিস্তানের মরুভূমি। উত্তরে কাবুল, গজনীর পাহাড়। উত্তর-পশ্চিমে হিরাত শহর। সেই হিরাতে শাহ আব্বাস ফৌজ নামিয়েছেন। খোরাসানে এসে কান্দাহার যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

॥ পঁচাশি ॥

মারা বা-উমুয়াম-ই-ইন্ হার দো কোয়াম করে নিস্ত্।

এই ক'টি কথা নিজের সামনের কাগজে নাস্তালিক ফারসিতে লিখলেন শাহজাদা দারাশুকো। লিখে একবার মনে হল—বড় কঠোর হয়ে গেল? তাই না! কিন্তু না লিখেই বা কী করব? দারার মন বলল, ভেবেছিলাম—আমি আল্লাতালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে যা জেনেছি—সবই আমি হিন্দু, মুসলমান—হিন্দুস্থানের তাবত ইনসানকে দু'হাতে বিলাব।

কিন্তু নেবার লোক নেই। নেবে কি? নেবার বদলে তারা উঠে পড়ে লেগেছে—এই কথাটিই প্রমাণ করতে—শাহজাদা দারাশুকো কতখানি বিধর্মী। উঃ! বিধর্মী? আমি? নিজেকেই নিজে বলতে বলতে দারা তাঁর গায়ের পশমিনাখানি সারা গায়ে পেঁচিয়ে নিলেন। এবার হিন্দুস্থানের সারা উত্তর জুড়ে যেন বেরহম শীত পড়েছে। এ শীতের কোনও দয়ামায়া নেই। আগ্রা-জাহানাবাদের রাস্তায় রাস্তায় বেসাহারা লোকজন মারা যাচ্ছে। রোজ ভোরে দুই রাজধানীর সড়ক থেকে শীতে একদম শেষ মানুষের মুর্দা তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

শাহজাদা ফের লিখলেন: মারা বা-উমুয়াম্-ই-ইন্ হার দো কোয়াম্ করে নিস্ত্। হিন্দু বা মুসলমান—কোনও দিককারই সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে আমার কোনও দরকার নেই। আমজনতা মানেই নিন্দা-মন্দের ঝড়। আমি বাছাই মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। এই বাছাই মানুষরাই সমাজে সাম্য আনবে।

দারার কানে এসেছে—জামা মসজিদে শুক্রুরবারী বড় নমাজের পর দুই কট্টর মোল্লা—শেখ আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিক আর আবদুল হক মুহাদ্দিম দেহলভি সব কিছু উদার কাজকর্মকে ইসলামের দুশমন বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ফতোয়ায় কারও নাম নেই। কিন্তু লক্ষ যে শাহজাদা দারাশুকো তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বলা হচ্ছে—ইসলামকে সুফীয়ানার আড়ালে অবিশ্বাসীদের কাফেরির সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ইসলাম বিপন্ন। কেননা, ইসলামের সত্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

শাহজাদা জানেন, সুফীয়ানায় ইসলাম বিপন্ন নয়। বিপন্ন ওই কাঠ-মোল্লারা। কেননা, উদার সুফীয়ানায়—দিলদরিয়া কাদিরী উপাসনার ভেতরকার জোরে মানুষ ঈশ্বরের পথের পথিক হয়ে পড়েছে। তাদের আর মোল্লা, উলেমা,

আলেমের দরকার হচ্ছে না। ওরা তাই সাধারণ মানুষের ওপর ভেলকির জাল—মোহ ছড়াতে না পেরে বেকার হয়ে পড়ছে। কেননা, মানুষ বুঝতে পারছে—সত্য কারও একচেটিয়া হতে পারে না। সব ধর্মেরই সত্য আছে। ঈশ্বরে যাওয়ার জন্যে চাই সত্যে আগ্রহ, শুদ্ধ চিত্ত আর মানুষকে সেবা করার ইচ্ছা। এই সরল সিধে পথ নিলে সব ধর্ম থেকেই দালাল, ফড়ের উৎপাত বন্ধ হয়।

আমি মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান। তবে আমি সুফী পথের পথিক। সব ধর্মেই মুক্তি আছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—ইসলাম বই অন্য কোনও ধর্মে মুক্তি নেই। শুধু কোরান কেন? বেদও ঈশ্বর থেকেই এসেছে। তাই বেদে কোরানের অনেক কিছুই আছে। একথা বলি —একথা বিশ্বাস করি বলেই কি আমি কাফের হয়ে যাব? কাফেরের মূর্তি উপাসনার পেছনেও বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসই ঈশ্বর।

কোরানের অনেক ব্যাখ্যা বেদে পাওয়া যায়। একথা বললেই কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হল? ঈশ্বর থেকে এসেছে এমন অনেক বই ইসলাম বিশ্বাস অনুসারে বাতিল হয়েছে। কিন্তু যিনি ধর্মের গূঢ় জগতে ঢুকতে চান তিনি ওই সব বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন। কাজেই আমি যদি বেদের ভেতর কোরানের কিছু রহস্যের সমাধান পেয়ে থাকি তো দোষের কী? এই সিরহিন্দি মুজাদ্দিক আর মুহাদ্দিম দেহলভির পায়ে পড়তে হবে আমাকে?

কিছুতেই নয়।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন গ্রন্থ পড়ে বুঝতে পারছি—দয়ালু ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুয়াতে বেদ নামে ঐশ্বরিক গ্রন্থ মানুষের জন্যে পাঠান। তাতে মানুষের ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ, আদেশ, নিষেধ আছে। হিন্দুদের সব ধারারই বিশ্বাস—ঈশ্বর বা আল্লাহ এক। তিনিই সবার ওপরে। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। জগৎ ধ্বংস হবে। মানুষ তার সুকাজের পুরস্কার পাবে। কুকাজের শাস্তি পাবে। কোরানে ইহুদি আর খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়া অন্য সব বাতিল হওয়া ধর্মের কোনও নাম করা হয়নি। কিন্তু দুনিয়ায় বহু ধর্ম আছে। কারণ, কোরানেই আছে—এমন কোনও দেশ জাতি নেই যাদের মধ্যে পয়গম্বর বা অবতার আসেননি। এসব পয়গম্বরের বিবরণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এই বিশ্বাসে কথা বলতে দোষ কোথায়?

এসব ভাবতে ভাবতে শাহজাদার বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছিল। আগ্রা দুর্গের দারা-মহল এখনও আগের মতোই সাজানো। কেননা, শাহজাদা নিজেই জানেন না—কখন কোথায় থাকবেন। দেওয়ান-ই-খাসের দিক থেকে এই সন্ধ্যাতেই বড় করে আলো আসে। খোলা অলিন্দে দাঁড়ালে সে আলোর আভা টের পাওয়া যায়। শাহজাদা খোলা অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লা নামের চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। একথা বিশ্বাসী—অবিশ্বাসী দুয়ের কাছেই সত্য। একশো চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে শুধু একটি কথা বলতে: আল্লা বলো। তাঁর নাম করো। আমি খুব নিঃশব্দে আল্লার নাম জপ করি। তখন আমার জিভ নড়ে না।

মিঞা মীর আমায় শিখিয়েছিলেন।

শাহজাদা দারার অনেক আগে মনে হত—সবই তুমি—আমি কিছু নই। এখন সেই আমি তুমি একদম ঘুচে গেছে। এখন মনে হয়—আমি সেই আমি। হামহ্ ওয়াজাহ্ সমা হামহ্ অয়ন—তুমিই সব মুখ—সব কান—সব চোখ। এই চোখ দিয়ে জগৎ দেখতে পাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখা যায়। উজ্জ্বল বালিকণায় সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্রের নোনা জলকণায় সমুদ্র দেখছি। ইসলামের বাইরের খোলস খসে পড়েছে। এখন নাস্তিকতা আমার কাছে উদ্ভাসিত।

শাহজাদা দারাশুকো একা একা আগ্রা দুর্গের অন্ধকার খোলা অলিন্দে বলে উঠলেন: অগর কাফির (আ) জ্ ইসলাম-ই-মাজাজি গস্ত বেজার—কে রা কুফির-ই-হকিকি সুদ পাদদার। যদি কোনও অবিশ্বাসীকে ইসলামের বহিরঙ্গ থেকে বের করা হয়—যিনি অবিশ্বাসের আসল চেহারা জানতে পেরেছেন—তাহলে কেমন হয়?—ভাবতে ভাবতে শাহজাদা ফের বিড়বিড় করে উঠলেন—

দারুণ হার-বাত্-এ জান-ইস্ত পিন্হান্
বা-জের-ই-কুফার ইমান-ইস পিন্হান্।

সাধনায় প্রতিটি মূর্তি সজীব হতে পারে। অবিশ্বাসের নীচেই লুকিয়ে আছে বিশ্বাসের ফল্গু। নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা রুবাইটি পাছে ভুলে যান—তাই দারা ছুটে তাঁর অন্দরমহলে চলে এলেন। লিখে রাখবেন। মেঝেতে কাগজের সামনে বসবেন বলে নিচু হওয়ার সময় আপন মনেই বললেন, লা ইলাহা ইল আল্লা—আল্লাই একমাত্র পূজ্য—আল্লাই একমাত্র আছেন।

রুবাইটি ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো তাড়াতাড়ি লিখে রাখতে রাখতে একই সঙ্গে দারা নিজেকে মনে মনে বলে উঠলেন, কাবা আর সোমনাথ আমার একই লাগে। আমি না-হিন্দু—না-মুসলমান। তাহলে আমি কী?

এর কোনও উত্তর না পেয়ে শাহজাদা ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল বনাতের ওপর। সেখানে বিরাট একখানি বই পড়ে আছে। হাতে তুলে নিলেন শাহজাদা। বইয়ের ওপরে লেখা—টিব-ই-দারা শিকোহ্। পাতা উলটেই বুঝলেন দারা। ওষুধবিষুধ নিয়ে লেখা বই। বিশেষ করে হিন্দুস্থানের ভেষজ নিয়ে মাথা ঘামানো হয়েছে। রোগের বিতাং দিয়ে কারণ আর তার চিকিৎসার কথা রয়েছে। বইটি লিখে নুরুদ্দিন মহম্মদ বিন্ আবদুল্লা আমায় উৎসর্গ করেছেন। পাতা ওলটাতেই এক জায়গায় চোখ আটকে গেল দারার। আগ্রা ছাড়িয়ে বিয়ানার দিকে যেতে দেহাতী মাঠে ঘাটে এই লতাগাছ তিনি দেখেছেন। নাম জানতেন না। লজ্জাবতী লতা। আঁকা ছবিটি ভাল করে দেখলেন শাহজাদা। পাতার কী উপকার। পাতা বেটে রস করে খেলে কী উপকার। সবই লেখা আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে এল শাহজাদার। রোগ তো মানুষের বাছবিচার করে না। এ-বই হিন্দু-মুসলমান—দুইয়েরই উপকারে আসবে। এ বই তো দুই তরফকে কাছাকাছি আনতে পারে। এমন বই অনেক লিখিয়ে যদি সাধারণের

ভেতর বিলি করা যায় তা কেমন হয় ? বইয়ের পেছন দিকে থাকবে তৌহীদ—একমেবাদ্বিতীয়ম-এর কথা। লতা-পাতার কথা জানতে গিয়ে মানুষ জানবে—ঈশ্বর এক—এক বৈ কিছু নয়।

নিজের এই নতুন ভাবনায় নিজেই শাহজাদা আনন্দে ভরে উঠলেন। তিনি খর পায়ে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চললেন। কিন্তু দেওয়ান-ই-খাসে ঢুকবার মুখে এসে দারা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বাদশা শাহজাহানকে ঘিরে আমির-ওমরাহরা বসে। বাদশার কপালে তিনটি ভাঁজ পড়েছে। আমির, ওমরাহ, সুবেদার মনসবদারদের স্তুতি-প্রশংসা কিছুই যেন বাদশাকে ছুঁতে পারছে না। সব কিছুর মাঝখানে শাহজাহান যেন একদম একা বসে আছেন।

. সামান্য কয়েক পলক আগে শাহজাদা দারা ছিলেন এক জগতে। আর এখন দেওয়ান-ই-খাসের কাছাকাছি এসে তিনি যেন একদম অন্য জগতে চলে এসেছেন। দেওয়ান-ই-খাসের ঠিক উল্টোদিকে তাকালে গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়ক আবছা মতো দেখা যায়। রাজধানীর দোকানপাট—সরাইখানার আলো শেষ হলে এতদূরে থেকে সড়ক আবছা লাগারই কথা। ওই ধোঁয়াটে পথের ডানদিকে একটা বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে ফৌজি ছাউনি সাকেতের দিকে। সেদিক থেকেই দারা দেখলেন --মশাল জেবলে ঘোড়সওয়াররা আসছে।

দেখে তিনি মাথা নামালেন। মনে মনে বললেন, বুঝেছি। তিনি যা বুঝেছেন - তা হল: জাহানাবাদ-আগ্রার আশপাশের সব সুবা শাহী জরুরি এত্তেলা পেয়েছে। তাই এক এক সুবার সুবেদার ফৌজ নিয়ে রাজধানীর কাছাকাছি ছাউনিতে এসে জমা হচ্ছেন। সেরকমই কোনও ফৌজের ঘোড়সওয়াররা রাতের লড়াইয়ের মহড়া দিচ্ছে।

তার মানে কান্দাহার! শাহজাদা দারা এসেছিলেন, খর পায়ে। ফিরে গেলেন। খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে। ভাবতে ভাবতে। তিনি নিজেই দু'দু'বার কান্দাহারে লড়তে গেছেন ফৌজ নিয়ে। কিন্তু লড়াই হয়নি। তিনি আন্দাজ করতে পারেন লড়াই মানে কী। ফৌজ মানে কী।

ইস্পাহানের শাহ আব্বাস খোরাসানে এসে কান্দাহার যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। হিরাতে এখন ইস্পাহানি ফৌজ। আব্বা হুজুর যে-মুঘল ফৌজ কান্দাহারে ইস্পাহানিদের সঙ্গে টক্কর দিতে পাঠিয়েছেন—পরেও যা পাঠাতে চলেছেন—তার অনেক মাথাওয়ালা মানুষ তো আদপে ইস্পাহানি। তারা কি শাহ আব্বাসের ফৌজের সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে লড়বে ? হিন্দুস্থানে মুঘল ফৌজ যখন লড়তে আসে তখন বাবর বাদশা তাদের বলেছিলেন, তোমরা কাফেরদের সঙ্গে লড়ছ। কাফেররা দুশমন। তাই তারা প্রাণপণ লড়েছিল। কিন্তু কান্দাহারে তো কাফের নেই। সবাই মুসলমান। মুসলমান কী করে মুসলমানের দুশমন হয় ? তার ওপর মুঘল ফৌজে শিশোদিয়া রাজপুতেরা যতটা মরণপণ করে জাতিশত্রু রাঠোর রাজপুতদের বিরুদ্ধে লড়বে—ততটা গা ঘামিয়ে কি ইস্পাহানিদের সঙ্গে লড়বে ?

দেওয়ান-ই-খাসে মসনদে আমির-ওমরাহদের ভেতর বাদশা এখন বসে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়—তিনি এমনভাবে বসে আছেন—যেন আশপাশে কেউ নেই। তিনি যেন ফাঁকা দেওয়ান-ই-খাসে বসে আছেন। সারা আগ্রা ঘিরে হিন্দুস্থানের দেহাতী এলাকায় এখন সুবেদাররা তাঁবু ফেলছেন। জরুরি এত্তেলা পেয়ে তাঁরা ঘোড়সওয়ার, পদাতী, গোলন্দাজদের নিয়ে সাবেক রাজধানীর কাছাকাছি চলে এসেছেন। সব সুবেদারই জানেন—কান্দাহার বাদশা শাহজাহানের চোখের মণি। যে করেই হোক—তিনি কান্দাহার হাতছাড়া হতে দেবেন না।

ফৌজি লোকজন রাজধানীর চারদিক ঘিরে হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আগ্রার বাজারে এখন ক'দিন ধরে খুব টান। ঘি, চিনি, গেঁহু, রেড়ির তেল, তিল তেল, রকমারি গোস্ত, মশল্লা সবতাতেই টান পড়েছে। প্রায় আধখানা হিন্দুস্থানের ফৌজ যে দুয়ারে তাঁবু ফেলেছে।

শাহজাহান বাদশা নিজেকেই মনে মনে বললেন, আমার ময়ূর সিংহাসন যতই চমকদার হোক না কেন—বলখ্-বদকশানে জিতেও মুঘল ফৌজ যেন হেরে ফিরে এসেছে। দশ হাজার সেপাই, হাতি-ঘোড়া ভেসে গেছে। এ-জয় যেন হার। মুঘল ফৌজের এই বে-ইজ্জতিতে সারা ফৌজ যেন যোশ হারিয়ে বসে আছে।

খুব তাড়াতাড়ি ফৌজের ইজ্জত ফিরিয়ে আনা দরকার। দরকার ফৌজের যোশ, তেজ ফিরিয়ে আনা। আর তা আনতে হলে পহেলা সুযোগেই কান্দাহার দুর্গের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া ইস্পাহানি হাতখানা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই ফৌজ ফিরে পাবে তার ইজ্জত—হিন্দুস্থানের বাদশাকেও তখন চমকদার ময়ূর সিংহাসনে মানাবে। নয়তো ও মসনদ যেন ফাঁকা লাগে।

হঠাৎ শাহজাহান সিধে হয়ে বসলেন। দেখতে পেলেন তাঁর সামনে বেশ কয়েকটি চেনা মুখ। এঁরা কেউ হায়দারাবাদি কেউ বা ইস্পাহানি। আবার কেউ আফগান। কেউ কেউ চাঘতাই তুর্ক। সবাই আমির। বাদশার দরবারের শোভা। ওঁদের ভেতর বিহার আর মালবের সুবেদার দু'জন তটস্থ হয়ে বসে।

বাদশা সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সারা দরবার যেন জরিপ করে নিলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, আমি নিজে কাবুলে যাব। কাবুল দুর্গে বসে কান্দাহারে লড়াই চালাব।

সবাই প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বাদশার ইচ্ছায় সায় দিলেন। তাঁরা বেশ উঁচু গলায় বলাবলি করতে লাগলেন, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। ইস্পাহানের শাহ আব্বাসের পাখা গজিয়েছে। এবার তার দিন ঘনিয়ে এল। হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু এবার কাবুল দুর্গে বসে নিজে লড়াইয়ের লাগাম ধরবেন।

বাদশা শাহজাহান একটিও কথা না বলে তাঁর দরবারি আমিরদের দেখছিলেন—তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন। খানিক বাদে ওঁদের কথাবার্তা থামল। বাদশা যেখানে যান—তাঁর তখত সেখানে যায়। তখন নাম হয় তাঁর তখত-রওয়ান।

বাদশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারি আমিরদেরও সেখানে যেতে হয়। সে কথাটা মনে করিয়ে দিতেই যেন বাদশা বললেন, তাহলে আপনাদের সঙ্গে কাবুলে দেখা হচ্ছে—

বাদশার কথায় এবার আমির-ওমরাহদের সায় যে অস্পষ্ট হয়ে এল। আফগান আমির নজবুল্লা খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হজরত! এখন কাবুলে কঠিন শীত। কিন্তু শাহী দরবারে আমরা সে শীতকে গ্রাহ্যই করি না।

শাহজাহানের মনে পড়ল, আগ্রা-জাহানাবাদের শীত কাবুলের শীতের পাশে কিছুই নয়। তবু তিনি চুপ করে রইলেন।

আফগান আমিরের কথার সঙ্গে আরেক আমির উঠে দাঁড়িয়ে যোগ করলেন, আলমপনা! আমার মন বলছে—হিন্দুস্থানের জঙ্গি হাতির মতো কোনও জানোয়ার নেই শাহ আব্বাসের।

—তা নেই।

—আমার মন বলছে, শীতেও হাতি বেপরোয়া। এই কথা ভেবেই ইরানিরা এমন শীতে লড়াইই করবে না।

তখন নজবুল্লা খাঁ বললেন, মাস দুই পরে তো আর শীত থাকবে না। তখন বসন্তের শুরুয়াতে যদি আপনি কাবুল যান তো কোনও ক্ষতি নেই।

শাহজাহানও শীতের কথাটি যে ভাবেননি—তা নয়। তিনি বললেন, আপনারা সবাই কি তাই বলছেন?

সারা দেওয়ান-ই-খাসের রুপোলি চাঁদোয়া যেন ফেটে যায় যায়। সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ বন্দেগান। বসন্তে কাবুল তো ফুলের বাহার। লড়াইও তখন সুবিধার হবে।

বাদশা খানিকক্ষণ আমিরদের মুখে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর আর পাঁচটি হুকুম যে ভঙ্গিতে দেন—সেই একই গলায় বললেন, কান্দাহারে পাঁচ হাজার সেপাই আর পাঁচ লাখ তনখা পাঠানো হোক।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকেনবীশরা ঝুঁকে পড়ে বাদশার মুখের কথা লিখতে লাগলেন।

প্রায় একশো বছর হতে চলল—ইরানিরা কান্দাহার দখল করে। তারপর বারবার হাত বদল। এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে কিল্লা-কান্দাহারের ইস্পাহানি প্রধান মুজঃফর হুসেন মীর্জা গদ্দারি করে আকবর বাদশার হাতে কিল্লা তুলে দেয়। আকবর বাদশা তাকে দরবারে আমীর করে নেন। জাহাঙ্গীর বাদশা হবার পর ইরানের শাহ তাঁকে কিল্লা-কান্দাহার ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন। জাহাঙ্গীর সে অনুরোধের কোনও জবাবই দেননি। শাহজাদা খুর্রম বাগী হওয়ার ঠিক পরের বছর ইরানি ফৌজ নেমে এল। তারা দেড় মাস ধরে কিল্লা-কান্দাহার চারদিক থেকে ঘিরে বসে থাকল। গজনল কামান বসিয়ে। নিজের ছেলের বাগীপনাহ্ সামলাবেন? না, কান্দাহার হাতে রাখবেন? বাদশা জাহাঙ্গীরকে কান্দাহার হারাতে হল। কিন্তু তার বছর পনেরো বাদেই—শাহজাহান তখন বাদশা—এখন থেকে ঠিক বারো বছর আগে—কিল্লার ইরানি ফৌজের মাথা আলি

মর্দান কোনও লড়াই ছাড়াই গদ্দারি করে বাদশা শাহজাহানের হাতে কান্দাহার তুলে দিল। এই সুযোগ পুরোদস্তুর কাজে লাগালেন শাহজাহান। কিল্লা-কান্দাহারের আশপাশের দুই কিল্লা মজবুত করে তুললেন ফৌজ পাঠিয়ে। শুধু তাই নয়— কিল্লা-কান্দাহারে জোরদার ফৌজ বসিয়ে তিনি হিন্দুস্থানে সামিল করলেন এক নয়া সুবা—যার নাম দিলেন কান্দাহার। আলী মর্দান বাদশার দরবারে আমির হয়ে খেতাবও পেল।

ঝুঁকে পড়ে ওয়াকেনবীশদের লিখে যাওয়া দেখে বাদশা শাহজাহান ভাবলেন, আমি তো কাবুল গেলাম না। পাঁচ হাজারের নয়া ফৌজ আর নগদে পাঁচ লাখ তনখা পেয়ে কিল্লা-কান্দাহারের কিল্লাদার দৌলত খাঁ সব দিক সামলাতে পারবে। বাদশা এও বুঝলেন, বাদশাহীতে যেমন আয়েশ, আরাম আছে—আছে দুশ্চিন্তা, ঝুঁকি। সময়মতো নির্ভুল রাস্তা নিতে না পারলে ভীষণ বিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে এ কথাও বোঝালেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেব আর উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ তো এগিয়ে গিয়েছেই। কিল্লাদার দৌলত খাঁকে ওরা তো গিয়েই মদত দেবে। আচ্ছা, আমি যে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছি—এ তো খোদাতালারই ইচ্ছায়। সত্যিই কি খোদাতালা এমন ইচ্ছা করে থাকেন ? না, নিজেরাই কিছু একটা করে সেই কাজে খোদাতালার নামে মোহর মারি ! যাতে কিনা সবার চোখে সে-কাজ পাকাপাকি হয়ে যায়।

হিন্দুস্থানে কোনও শাহী থাকুক বা না-থাকুক—হিন্দুস্থান তো থেমে থাকতে পারে না। বর্ষায় নদীগুলো ভর্তি হয়। সময় মতো গেঁহুর শিষ দানা বাঁধে। গোরু-মোষ, হাতি-ঘোড়া গাভিন হয়। দিনের পর রাত আসে। এক একজন মানুষ নিজের জায়গায় নিজের কাজ করে চলে। গাছে গাছে শুকনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন কচি পাতা আসে। অনেকে খবরই রাখে না—শাহী কোথায়। বাদশা কেমন দেখতে ? তাঁর ফতোয়া, হুকুম, ফরমান—সবই শোনা কথা মাত্র। হ্যাঁ। বাদশা একজন আছেন বটে। তিনি থাকেন রাজধানীতে। খেলাত দেন। লড়াই করেন। তারপর বয়স হলে একদিন মরে যান।

এরকম হিন্দুস্থানের ভেতর জাঁ-বাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার—শীতের এক সন্ধ্যায় ইলোরা থেকে গোলকুণ্ডা যাবার সড়কে ভাগনগর নামে এক শহরে এসে হাজির হলেন। শহরে ঢোকার আগে তিনি দেখেছেন, হলুদ পাকা ধানের মাঠ। চরতে বেরনো গাই গোরুর দল। গোরুগুলো বেশ স্বাস্থ্যবতী। দেহাতী গেরস্থ বাড়ির উঠোনে ভেড়া, মুরগি। এসব পেরিয়ে শহরে ঢুকতেই লক্ষ করলেন ট্যাভারনিয়ার —এটা আসলে আরও বড় জায়গা গোলকুণ্ডারই শহরতলি। ভাগনগরের গায়েই এত জলকর যে ভাগনগরে ঢুকেই ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, সরাইখানায় সরাইখানায় দারুণ সুগন্ধী মাছ ভাজা হচ্ছে। খিদে পেয়েছিল। ট্যাভারনিয়ারও বসে গেলেন সরাইখানায়। শুধু শিরদাঁড়ায় একটা কাঁটা—খেতেও ভারি চমৎকার। মাছটির নাম চিলওয়া। সঙ্গে নিলেন কমলার রস। দেখতে দেখতে পথের ক্লান্তি কেটে গেল। এবার তিনি ভাগনগর শহরটি ঘুরে দেখতে বেরোলেন। কাছেই

গোলকুণ্ডা দুর্গ। শহর থেকে দুর্গের মাথা দেখা যায়। ট্যাভারনিয়ার সরাইখানায় বসেই শুনেছেন, একবার শাহজাদা ঔরংগজেব দাক্ষিণে সুবেদার থাকার সময় ভাগনগর লুট করেন। তাই এখানকার সুলতান গোলকুণ্ডা দুর্গেই থাকেন এখন। ভাগনগরের গা ঘেঁষে—ট্যাভারনিয়ার লক্ষ করলেন, ফ্রান্সের ফনধেনব্লুর মতোই অসংখ্য টিলা। তার একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। নদী পেরনোর জন্যে চমৎকার পাথরের সেতু। প্যারিসের পণ্ট নেউফের সেতুর চেয়ে কোনও অংশে কম সুন্দর নয়। ভাগনগর আকারে প্রায় অরলিন্সের মতোই। যেমনি মজবুত—তেমনি খোলামেলা। রাস্তাগুলো চওড়া—আর সুন্দর। তবে ধুলোয় বোঝাই। রাতে কোথায় ঘুমোনো যায়—তা খুঁজতে খুঁজতে ট্যাভারনিয়ার দেখলেন—সুন্দর তিন চারটি মসজিদ রয়েছে। ঠিক করলেন, ওরই একটির চাতালে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। এখন তো শহরটা ঘুরে-ফিরে দেখি।

যতই ঘোরেন ট্যাভারনিয়ার—ততই অবাক হন। সারা শহর জুড়ে হাজার হাজার বারাঙ্গনার ঘর। খদ্দের ধরতে যে যার কুড়ে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে। মোমের আলো জ্বালিয়ে। খাতায় নাম লিখিয়ে তবে এখানে নামা যায়। খোঁজ নিলেন ট্যাভারনিয়ার দারোগার কাছে। দারোগা বললেন, না। সুলতান ওদের কাছ থেকে কোনওরকম কর নেন না। তবে ওদের মক্কেলদের জন্যে সারারাত তাড়ির দোকান খোলা থাকে। তাড়ির ওপর কর বেড়েছে। সামনে না কান্দাহারের লড়াই! শেষবারও হিন্দুস্থানে এসে এই কান্দাহারের কথা শুনেছিলেন ট্যাভারনিয়ার। এবারও হিন্দুস্থানে পা দিয়ে ইস্তক বারবার কান্দাহার কথাটি তাঁর কানে এসেছে।

দারোগাই বললেন, কান্দাহার হল গিয়ে শাহজাহান বাদশার একটা রোগ। কিছুদিন অন্তর অন্তরই হয়। হলেই শাহী খাজানাখানা থেকে ফৌজ আর গোলা-বারুদের পেছনে জলের মতো মোহর খরচ হয়। সে মোহর আসে হিন্দুস্থানের দিকে দিকে চড়া কর বসিয়ে। এই তো দেখুন না—ভাগনগরের ওই মেয়েগুলো শরীর দিয়ে সেই মোহর যোগাচ্ছে।

ট্যাভারনিয়ারের মুখ দেখে দারোগা বুঝলেন, তাঁর কথা এই বিদেশি ব্যাপারীর মাথায় ঢোকেনি। তখন তিনি নিজের কাঁচাপাকা দাড়ি ডান হাতে চুমরে নিয়ে বললেন, ধকলটা তো ওদের ওপর দিয়েই যায়। ওরাই তো খদ্দের ধরে। খদ্দেররাই চড়া দামে তাড়ি খায়। দামের অর্ধেকটাই তো শাহী খাজানাখানায় কর হিসেবে চলে যাচ্ছে।

খানিকটা তাড়ি মুখে দিয়ে দেখলেন ট্যাভারনিয়ার। তিনি দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো মানুষ। বুঝলেন, এই তাড়ি খানিকটা ফ্রান্সের নতুন মদের মতোই মিষ্টি। চামড়ার থলিতে পুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে শহরে আনা হচ্ছে।

তিনি জানতে চাইলেন, রোজ এমন কত ঘোড়া শহরে আসে?

দারোগা বললেন, তা পাঁচ ছ'শো। নিশুতি রাতে ভাগনগরে তাড়ির বান ডাকে। তাই তো ঢালাওভাবে মেয়েদের খাতায় নাম লেখাতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওদের জন্যেই তাড়ির এত চাহিদা—

ট্যাভারনিয়ার দারোগার চৌকিতে বসেই সব দেখতে পাচ্ছিলেন। দক্ষিণী শীত আরামের। সন্ধে রাত। তায় সমুদ্র কাছাকাছি। রাস্তার ওপারেই একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে কয়েকটি কুড়ে ঘর। যে যার ঘরের সামনে মোম জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখতে ছিপছিপে। খুব অনায়াসে তারা হাসছে। হাত-পা নেড়ে কথাও বলছে। ট্যাভারনিয়ার উঠলেন। কাল ভোরে মসুলিপত্তম রওনা হবেন।

যে-কান্দাহার নিয়ে উতলা হয়ে বাদশা সুবায় সুবায় জরুরি এত্তেলা পাঠান —সুবেদাররা ফৌজ নিয়ে ছুটে আসেন রাজধানী, পলতে-কামান পিঠে নিয়ে উটের কাতার মাঠ ভাঙে, তাড়ির ওপর চড়া কর বসে, ভাগনগরের মেয়েরা সারা রাত ধরে খদ্দের নেয়—সেই কান্দাহারে এই শীতের রাতে কিল্লাদার দৌলত খাঁয়ের অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

চড়া শীতের মুখে মুখে ইস্পাহানের শাহ আব্বাস ফৌজ নিয়ে এসে কিল্লা-কান্দাহার অবরোধ করেছেন। কিল্লার বাইরে তুষার পড়ছে। ভেতরের উঠোনেও তুষার পড়ছে। কিল্লার ভেতরকার ঘোড়াগুলো শীতে থরথর করে কাঁপছে। অথচ তাদের খাবার খড় নেই। ভেতরে যে চোদ্দোশো সেপাই রয়েছে তাদেরও খাবার বাড়ন্ত। দৌলত খাঁ ঠিক করতে পারছেন না, গোস্তের জন্যে কোন ঘোড়াটা আগে জবাই করা হবে? কিল্লা-জামরুদ থেকে শেখানো পায়রা পায়ে বেঁধে আশার খবর এনেছে--নয়া ফৌজ--পাঁচ লাখ তনখা আগ্রার হুকুমে এসে পোঁছেছে। কিন্তু তুষারে পাহাড়ি পথে ধস নামায় পাঠানো যাচ্ছে না। রাস্তা সাফ হলেই সব পোঁছে দেওয়া হবে।

দৌলত খাঁয়ের মনে হচ্ছে—আশা কুহকিনী। পঞ্চাশ দিন হয়ে গেল—শাহ আব্বাস কিল্লা ঘিরে রেখেছেন। বেরুনোর রাস্তা চারদিক থেকে ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার খাবার জলেও টান। কোথায় তনখা! কোথায় নয়া ফৌজ!

দু'পাশে দুই মশালধারীর মাঝখানে খোলা তলোয়ার হাতে দৌলত খাঁ দাঁড়িয়ে। একজন খাঁয়ের যেমন দাড়ি গোঁফ থাকে তার কিছুই নেই মানুষটির। নির্লোম মানুষটির মুখ মশালের আগুনে ঝকঝক করছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় সেই তাতার দু'জন। ওদের এখুনি হাজির করো।

পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা দুই তাতারকে হাজির করা হল।

—ওঃ! তোমরা? দু'দিনও হয়নি তোমাদের ইজফা দিয়ে সর্দার করেছি। এই আমি কিল্লাদার দৌলত খাঁ তোমাদের তনখা বাড়াবার জন্যে আগ্রার দেওয়ানখানায় সুপারিশ করেছি! আর সেই তোমরাই বাগী হলে?

দৌলত খাঁয়ের মনে আরও অনেক কথা আসছিল। তাঁর সুপারিশ এতদিনে নিশ্চয় আগ্রার সাবেক দেওয়ানখানা থেকে জাহানাবাদের হাল আমলের দেওয়ান-খানায় পোঁছেছে। ইজফা পাওয়া বাহাদুর সর্দাররা কী করে লুকিয়ে দুশমনের সঙ্গে যোগাযোগ করে? বাগী হয়?

তাতার দু'জন কোনও কথা বলল না। তাদের কুতকুতে চোখে কোনও ভাবলেশ নেই। যারা ওদের দুজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছিল—তারা জানে, ফৌজে গদ্দারি ধরা পড়লে কাঁধের ওপর মুণ্ডু হারাতে হয়। কিল্লাদারের হাতে

খোলা তলোয়ার মশালের আলোয় ঝলসাতে দেখে তারা ভেবেই নিল—কিল্লাদার দৌলত খাঁ অন্য কাউকে কাজটা করার হুকুম না দিয়ে নিজের হাতেই কাজটা সারবেন। গদ্দারির শাস্তি মওত।

ঠিক এমন সময় দৌলত খাঁয়ের মুখের কথায় চারদিকে হাজির সব ফৌজি লোকজন চমকে উঠল। কিল্লাদার বললেন, ওদের হাত খুলে দাও—আজাদ করে দাও ওদের—

এক লহমায় তুষার সরে গিয়ে কাল সকালে যদি রোদ উঠত—তাতেও কেউ এতটা অবাক হত না। কিল্লাদার বললেন, এ কিল্লা তোমাদের ইজ্জত। একে যদি দুশমনের হাত থেকে বাঁচাতে না পারো—তো মনে করবে যার যার আওরতকে দুশমন গায়েব করে নিল।

প্রায় বাবা-বাছা বলে গদ্দার দুই তাতার সর্দারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করলেন কিল্লাদার। মাঝরাত থেকেই তার ফল ফলতে শুরু করল। নিশুতি কান্দাহারে তখন কনকনে শীত। সান্ত্রী চৌকিতে—এমনকি চেহেল জিনা পাহাড়ের মাটিতেও কামানের পেছনে খুব অল্পই ফৌজ ছিল। বলা যায়—বাছাই ফৌজিদের কয়েকটা টুকরো মাত্র। তাদের ভেতর থেকে একজন গোলন্দাজ এসে মাঝরাতে কিল্লাদার দৌলত খাঁয়ের ঘুম ভাঙাল। অসময়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন দৌলত খাঁ। বেশ বিরক্ত। বললেন, এ কী বেতমিজি ?

—উপায় ছিল না। —বলে গোলন্দাজ বলল, কিল্লা আপনার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে হুজুর।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন দৌলত খাঁ। অ্যাঁ। কী বলছ ?

—যা বলছি সত্যি বলছি হুজুর।

—সাফ সাফ বলো।

—বাগী তাতার সর্দারদের আপনি শাস্তি না দিয়ে বোঝাতে গিয়েছিলেন —তার ফল ফলেছে।

—উঠে দাঁড়াবার সময় তলোয়ারখানা হাতে নিয়েছিলেন দৌলত খাঁ। সেখানা গোলন্দাজের মাথার ওপর তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর ভণিতা করলে মুণ্ডুটি হারাতে হবে—

—গোলন্দাজ একটুও ভয় পেল না। সে শান্ত গলায় বলল, হুজুর আজ যখন রাত তাজা ছিল—তখনও যদি তাতার সর্দারদের নিজের হাতে বাগীপনাহ্ গদ্দারির শাস্তি দিতেন তো এমনটি হত না। বেশির ভাগ সেপাই এখন গদ্দার, বাগী তাতারদের দিকে ঝুঁকেছে। আর বাইরে ? ওই শুনুন—

কিছু শোনার জন্যে কান পাততে হল না কিল্লাদারকে। ভীষণ আওয়াজ করে অন্দর-কিল্লায় একটা গোলা এসে পড়ল বিকট শব্দ করে। দৌলত খাঁয়ের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, তুর্কি আর আর্মানিদের সঙ্গে লড়াই করে করে ইস্পাহানি ফৌজ এখন ভাল তোপখানা গড়ে তুলেছে। নিশ্চয় খুব লম্বা কামানের নল দিয়ে এই তোপ দাগা হচ্ছে। কিল্লা-কান্দাহারে এর ফিরতি জবাব দেবার মতো কামান হিন্দুস্থানের ফৌজের হাতে নেই।

পরদিন খুব ভোর ভোর দেখা গেল, ইরানিদের গোলা এসে কান্দাহার বাজারের ওপর পড়ছে। অবিরাম। এই বাজারেই চারদিককার সব দেশের জিনিস-পত্তর আসে। এখান থেকেই হিন্দুস্থানের নীল, সোহাগা, রেশম ইউরোপের বাজারে যায়। সেই বাজারের লোকজন কামানের গোলায় এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে। কারও মাথা উড়ে গেল। কারও বা দু'খানা পা। ইরানি গোলার আওয়াজ নিশানা চাঁদমারির পরেও ফুরিয়ে যায় না। আশপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তা খানিকক্ষণ ধরে সারা দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ যখন কান্দাহার যাবার হুকুম পেলেন তখন তিনি লাহোরে। শাহজাদা আওরঙ্গজেব তখন মুলতানে। ও'রা দু'জন ডেরায় এসে মিললেন। দু'জনই এগোতে এগোতে ফৌজ জোগাড় করেছেন। ডেরায় তাঁরা এখন পঞ্চাশ হাজার।

শীত যেতে এখনও দেড় মাসের মতো। এদিকটায় শীত প্রায় ছ'মাস জুড়ে। সামনেই থল-চোটিয়াল পাহাড়। তার ওপারেই কান্দাহার। শাহজাদা এক দুপুরে ফৌজের খাজাঞ্চীকে হুকুম দিলেন, সব সেপাই একশো তনখা করে আগাম পাবে—আর আহেদীরা আগাম পাবে তিন মাসের মাইনে।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ তরতাজা শাহজাদার এই হুকুম মানতে পারছিলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, এই হুকুমের পেছনে শাহী কোনও কাগজ আছে কি?

আওরঙ্গজেব তাঁকে বোঝালেন, লড়াইয়ের ময়দানে কিছু হুকুম নিজের বুদ্ধিমত দিতে হয়। নইলে তো আগ্রা কি জাহানাবাদে বসে হুকুম দিয়েই কান্দাহারে লড়াই চালানো যেত। আসলে কি জানেন উজিরে আজম—লড়াইয়ের সময় ইনসানের মনে ফুর্তি থাকা দরকার। আর সে ফুর্তি এনে দিতে পারে একমাত্র তনখা। তনখা খরচ করে কিছু কেনা যায়। দুশ্চিন্তা তাড়ানো যায়। তনখা জমিয়ে বসে বসে আরাম, আয়েশ করা যায়।

সন্ধের দিকে আওরঙ্গজেব নিজেকে বললেন, তনখা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু এই তনখা দিয়ে কি একজন একপেশে আব্বা হুজুরের একই দিকে ঢলে পড়া বন্ধ করা যায়? তাঁকে কি নিজের দিকে ঘুরিয়ে আনা যায়? আব্বা হুজুরের না দেওয়া স্নেহ, ভালবাসা কি ফিরে পাওয়া যায়? তা বোধহয় এমন মামুলি মোহর-আশরাফি দিয়ে হবার নয়। সেজন্যেই চাই আলাদা কোনও মোহর—আলাদা কোনও আশরাফি—যা কিনা ইনসাফি মোতাবেক একজন আব্বা-হুজুরকে তাঁর বঞ্চিত শাহজাদার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। আমি কান্দাহারের পথে সেই মোহর-আশরাফি খরিদ করতে বেরিয়েছি। লড়াইয়ে তাগদ দিয়ে জয় কিনতে পারলেই সেই আনমোল মোহর আমার হাতে চলে আসবে। আমাকে এখন শুধু লেগে থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। রৌশনআরার মগজটি বেশ সাফ। সে আমাকে ঠিক মতলবই দিয়েছে।

শীত প্রায় শেষ। সামনেই বসন্ত। ক'দিন বাদেই চিনারের ডাল থেকে তুষারের চাপ খসে খসে পড়বে। বাঙ্গাস, কোহাট, জামরুদ, জালালাবাদ হয়ে

রমজানের গোড়ায় শাহ্জাদা আওরংগজেব কাবুলে এসে তাঁবু গাড়লেন। আরও আগেই এসে তিনি পেঁছিতে পারতেন। কিন্তু রাস্তায় তুষার পড়ছিলই। তার ওপর ঘোড়ার খাবারে সবসময়েই টান।

॥ ছিয়াশি ॥

এটা খুবেই চেনা জাহাজ ট্যাভারনিয়ারের। ময়েসট্রিথট। বসরা, বন্দর-আব্বাস, স্মিরনা থেকে এই জাহাজেই তিনি বার কয়েক হিন্দুস্থানে পাড়ি দিয়েছেন। মোজাম্বিক, মলাক্কা, হরমুজ, মসকাত, সিংহল ছুঁয়ে জাহাজ হিন্দুস্থানের গা ধরে সুরাটে এসে থামে। তার পরেও কোনও কোনও জাহাজ ওপরের দিকে উঠে এক কালের বড় বন্দর থাট্টা—এখন প্রায় পোড়ো—তার খাঁড়িমুখ অব্দি যায়।

এত চেনা জাহাজ এমন অদ্ভুত ব্যবহার কেন করছে বুঝতে পারছেন না ট্যাভারনিয়ার। তাঁর সঙ্গে রয়েছে মাঝারি নাশপাতির মতো দেখতে ক'টি মুক্তো। তাছাড়া তিন তিনখানি বড় হিরে। এগুলো নিয়ে তিনি সুরাটে নেমেই ইলোরা হয়ে গোলকুণ্ডা গোয়ার পথ ধরবেন। কিন্তু যেভাবে জাহাজ চলছে—শেষে না জাহাজডুবি হয়। তাহলে ধনে-প্রাণে মরতে হবে।

দুপুরবেলার সমুদ্র। তিনদিন হল ময়েসট্রিথট বন্দর-আব্বাস থেকে সুরাট রওনা হয়েছে। জাহাজে হিন্দুস্থানের শাহী ফৌজের জন্যে বাছাই পঞ্চাশটির মতো আরবি ঘোড়া আছে। তিনজন কারমেলাইট খ্রিস্টান যাজক রয়েছেন। তাঁরা যাবেন আগ্রা। কার্পেট উঠেছে বসরা থেকে। তাছাড়া চীনে মাটির ওপর রঙিন সূক্ষ্ম কাজের কিছু জলপাত্র যাচ্ছে গোলকুণ্ডার সুলতানের জন্যে। মামুলি মালপত্রের হিসেব মাথায় ঢোকে না ট্যাভারনিয়ারের। সেসব জিনিস রয়েছে অঢেল।

সাত সাতখানা পাল একসংগে তুলে দিয়ে ময়েসট্রিথট অনুকূল পশ্চিমি বাতাসের সংগী হয়েছিল কাল থেকেই। এই বাতাসের সংগে পাল খাটিয়ে দিলে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ দিনের পথ সুরাট পনেরো ষোলোদিনে পেরনো যায়। এভাবে আগেও ট্যাভারনিয়ার দু'দু'বার হিন্দুস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু জাহাজ এবার এমন পাগলামো করছে কেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তীরভূমি থেকে ভেতর-সাগরে পঁচিশ ক্রোশের মাথায় মাথায় প্রায়ই বসতি বিহীন অনেক দ্বীপ ছড়িয়ে থাকে বড় দরিয়ায়। অবাক কাণ্ড! ময়েসট্রিথট ঘুরে ঘুরে সেইসব দ্বীপের গা ঘেঁষে চলেছে। ওভাবে চললে তো ডুবো তীরে ঘা খেয়ে জাহাজ ঘায়েল হবে।

হঠাৎ ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, জাহাজের খোলে, জল ঢোকা আটকানোর পথগুলো খুলে দিয়ে লশকররা জাহাজে জল ঢোকাচ্ছে। কী ব্যাপার? এমন আত্মঘাতী কাণ্ড। শেষে ডুবে মরতে হবে না তো! ট্যাভারনিয়ার এক লশকরের কাছে ছুটে গেলেন। কী করছ? কী হচ্ছে এসব?

লশকর তার দিকে না তাকিয়েই বলল, বন্দুক থাকলে গুলি ভরে নাও এইবেলা—

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাভারনিয়ার সমুদ্রের দূরে বুকের দিকে তাকালেন। সেখানে আস্তে আস্তে অনেক মাস্তুল একসঙ্গে ভেসে উঠছে।

রোদ পড়ে আসার আগেই যেমন ঢেউ—যে ঢেউ এসে জলে টুবু টুবু ময়েসাট্রিখটের পাটাতন ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—মনে হয়—এই বুঝি ডুবে গেলাম, আবার ময়েসাট্রিখট ভেসে ওঠে—তেমনই একসঙ্গে প্রায় পঁচিশখানি মালাবারি খুদে জাহাজের এগিয়ে আসার জল তোলপাড় করা শব্দ।

ট্যাভারনিয়ার বুঝলেন, ময়েসাট্রিখট মালাবারি জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছে। ট্যাভারনিয়ার বন্দুক বাগিয়ে ধরেও মাথা উঁচু করতে পারছিলেন না। সেই কারমেলাইট খ্রিস্টান যাজকদের একজন এসে তাঁর কানে কানে বললেন, ওরা গোঁড়া মুসলমান। খ্রিস্টানদের ওপর খড়্গহস্ত। এক খ্রিস্টান যাজকের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে তার ওপর এমনই অত্যাচার করে যে—যাজকের একখানা হাত আর একখানা পা খাটো হয়ে প্রায় আধখানা হয়ে গিয়েছিল। পর্তুগিজরা ওদের ধরতে পারলে ফাঁসি দেয়—নয়তো সাগরে ছুড়ে ফেলে দেয়। এই জলদস্যুরা দশ পনেরোটি জাহাজ একসঙ্গে করে দল বেঁধে সাগরে ঘুরে বেড়ায়। ওদের এভাবে এগিয়ে আসা দেখে মনে হল ট্যাভারনিয়ারের—অনেকদিন এমন শিকার জোটেনি ওদের।

ময়েসাট্রিখটে মোট তিনটি কামান। তারা একই সঙ্গে গর্জে উঠল। এক একটা গোলা ফাটে আর ময়েসাট্রিখট নিজেই যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। মালাবারি জলদস্যুদের কামানের গোলার কোনও পরোয়াই নেই। ওদের জাহাজের একটার মাস্তুল এক দম গোড়া থেকে গোলার ঘায়ে ভেঙে পড়ল। দু'জন চাপাও পড়ল। তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

এবার ওরা কাছাকাছি একদম। ট্যাভারনিয়ার তিনবার ঘোড়া টিপলেন। পটাপট তিনজন মালাবারি জলদস্যু পড়ে গেল। হিন্দুস্থানের মালাবার তীরভূমিতেই নাকি সবচেয়ে আগে ইসলাম এসেছিল। তাই তো তিনি শুনে এসেছেন বাগদাদে। সেখানকার মানুষ এত নিষ্ঠুর। ওরা কপালে চোখে লাল রং মেখেছে। মাথায় চুড়ো করা চুলে একটু করে তেকোণা লাল কাপড়ও বাঁধা। থই থই জলে দাঁড়িয়ে গুলির নিশানা করা কঠিন। দরিয়ার নোনা জলে পা চুলকোচ্ছে ট্যাভারনিয়ারের।

এবার বেশ কাছাকাছি এসে মালাবারিরা আগুনের ছোট ছোট মশাল ছুঁড়তে লাগল ময়েসাট্রিখটের পাটাতনে। ভাগ্য ভাল। আগেই পাটাতনে জল থই থই করে রাখা ছিল। একটি মশালও সুবিধা করতে পারল না।

এবার মালাবারিরা টপাটপ ময়েসাট্রিখটের পাটাতনে লাফিয়ে পড়তে লাগল। বিপদ বুঝে ট্যাভারনিয়ার ষণ্ডা মতো ওদের এক নায়েককে নিশানা করলেন। ঘোড়া টিপতে যাবেন—ঠিক এমন সময় সেই নায়েক ছুটে এসে তাঁর নলে লাথি কষাল। বন্দুকটায় গুলি ছোড়ার শব্দ হল—কিন্তু নিশানা হারিয়ে তা গিয়ে দরিয়ায় পড়ল। মাথায় এসে কী যেন ভারি মতো লাগল তাঁর। ঢলে পড়লেন

ট্যাভারনিয়ার। তারপর কিছু মনে নেই।

ট্যাভারনিয়ার চোখ খুলে দেখেন—সূর্য ডুবুডুবু। চারদিকে মশালের আলো। সারা গায়ে ব্যথা। তার ওপর সন্ধের বাতাসের সঙ্গে দরিয়ার ঢেউয়ের গুঁড়ো এসে পড়েছে সমস্ত গায়ে। তাতে সারা শরীরটাই ভিজে। এদিক ওদিক তাকালেন। প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন লশকরের সঙ্গে তিনিও একটি মালাবারি জাহাজের মাস্তুলের গোড়ায় পড়ে আছেন। একটু মাথা তুলে দেখলেন, তাঁর দিকে মালাবারিদের সেই নায়েক প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে।

ট্যাভারনিয়ারের চোখ খোলা দেখে নায়েক সাদা দাঁত বের করে বাতাসে থেঁতলে যাওয়া মশালের শিখার আলোয় হা হা করে হেসে উঠল। হেসেই সে কোমর থেকে চাবুক বের করে মারবার জন্যে তুলল।

—আমায় মেরো না। মেরো না। আমি ভবঘুরে মুসাফির।

—মুসাফির। মিথ্যে বাহানা করছিস কেন? বল তুই কিসের ব্যাপারী? কিছুই পাইনি তোর কাছ থেকে এখনও।

ট্যাভারনিয়ার ভিজে শরীরে বুঝলেন, তাঁর ট্রাউজারের নীচে কোমরে প্যাঁচানো হিরে-মুক্তো ঠাসা চামড়ার গেঁজের খোঁজ ওরা এখনও পায়নি। তবে তাঁকে ল্যাংটো করে মেরে ফেলার আগে শয়তানরা হিরে-মুক্তোগুলো ঠিকই বের করে নেবে।

—আমি সত্যিই মুসাফির। ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়েছি।

—চালাকির জায়গা পাসনি। গাঁটের কড়ি খরচা করে জাহাজভাড়া গুনে ঈশ্বর খুঁজতে বেরিয়েছিস? তোর ঈশ্বর কে? কোথায় যাবি, হিন্দুস্থানে?

হিরে-মুক্তোগুলোর অনেক দাম। সেগুলো বাঁচানো দরকার। ট্যাভারনিয়ার বললেন, আমার ঈশ্বর পয়গম্বর। মুহম্মদ। লা ইলাহা ইল্লালা হু—

নায়েক যেন থেমে গেল একটু। কিন্তু তার সন্দেহ যায়নি। এমন লালমুখো ভিনদেশির মুখে পয়গম্বরের নাম? সে ফের জানতে চাইল, কোথায় যাবি?

—হিন্দুস্থানে।

—সে তো বুঝলাম। কোন দেশে বাড়ি?

—আমি ফ্রানসিস। প্যারিসে থাকি।

—হিন্দুস্থানে কার কাছে যাবি?

ফস করে ট্যাভারনিয়ারের মুখে এসে গেল একটি নাম। তিনি শুনেছেন বাদশা শাহজাহানের পহেলা শাহজাদা সবরকম ধর্ম নিয়েই মাথা ঘামান। উদার মানুষ। ট্যাভারনিয়ার বলে বসলেন, শাহজাদা দারাশুকো।

—দারাশুকো। সেই মুলহেদ? সেই কাফের শাহজাদা? —কথা শেষ হল না। নায়েক দাঁড়িয়ে উঠে তার কোমরের চাবুক মারার জন্যে প্রচণ্ড জোরে বাঁ হাত তুলল।

ট্যাভারনিয়ার দু'হাত তুলে ঠেকাতে গিয়ে পড়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এ কোথায় আমি পড়ে আছি?

গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তন যাবার পথে সোনার খনি পড়ে। সেখানে হিরের কাজ কীভাবে হয় তা দেখতেই ট্যাভারনিয়ার এ রাস্তা ধরেছেন। পথে, এক মুসাফিরখানায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ওখানে মুসাফিরখানা আসলে দুটি। একটি সম্ভ্রান্ত মুসাফিরদের জন্যে। থাকার জায়গা খুব সুন্দর। গরম লাগলে বাইরের বাগানে তাঁবু খাটিয়ে থাকা যায়। সেখানে ওঠেননি ট্যাভারনিয়ার। কেননা, ওখানে উঠলে সবার চোখে পড়তে হবে। তাই তিনি এই মুসাফিরখানার লাগোয়া ছোট ছোট কুঠুরির একটিতে উঠেছেন। এসব ঘর গাড়ির মুসাফিরদের জন্যে। রোজ বিকেলে এখানে রুটি, ভাত, রান্না করা তরি-তরকারি বিলনো হয়। যারা বিগ্রহ পুজো করে তারা রান্না করা খাদ্য খায় না বলে তাদের রুটির জন্যে ময়দা আর সামান্য ঘি দেওয়া হয়। কেকের মতো রুটিগুলো সেঁকে নিয়ে তার দু'পিঠে ঘি মাখিয়ে তেমনই একজন মুসাফির খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছেন।

কি স্বপ্নই সব দেখলাম দিনের বেলায়। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। ট্যাভারনিয়ার উঠে বসলেন।

রজব, রমজান, সেবল, জিলকাদ—বছরের এই চার চারটি মাস আফগানিস্থানে এক এক রকম। রজবের শেষ থেকে রমজানের মাঝামাঝি অব্দি বরফ গলতে থাকে। নদীগুলো ঠাণ্ডা জলে ভরে যায়। নানা রঙের ফুলে বসন্ত রঙিন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও নির্দয় হতে থাকে। সেবলের শেষে এসে বর্ষার জন্যে জানোয়ারদেরও প্রাণ কাঁদে। বর্ষা পড়লে তবে ঘাস গজাবে। সেই ঘাস খুঁটে খেতে পারলে ঘোড়াদের দিল শান্ত হয়। জিলকাদের শেষাশেষি আকাশের কোণে মেঘ দেখা দেয়। তারপর একদিন দিগন্ত জোড়া পাহাড় কাঁপিয়ে দিয়ে বাজ পড়ে। সঙ্গে বর্ষা নামে। এতদিন ধরে শুকিয়ে থাকা চিনার গাছগুলো সেই বর্ষায় নেয়ে উঠে তাজা হয়।

কিন্তু এখন যে পাথরের গা থেকেও রোদের ভাপ বেরুচ্ছে। কান্দাহার দুর্গের মুঘল কিল্লাদার দৌলত খাঁ দুর্গের ভাগ্য ঘোলাটে করে দিয়ে বসে আছেন শীতের মাঝামাঝি। কিন্তু মুঘল শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর নসিবের পরোয়া করেন না।

তাঁর বয়স এখন একত্রিশ। খাওয়া দাওয়া ভাব-ভালবাসা—কোনওটাতেই তাঁর কোনও বাড়াবাড়ি নেই। পাতলা ছিপছিপে চেহারা।

মনের ভেতর একটি শিখাই তাঁর সবসময় জ্বলছে। একজন একপেশে আব্বা হুজুরের না দেওয়া স্নেহ-ভালবাসার শুকনো পথ মাড়িয়ে কী করে নসিবকে জ্বলজ্বলে করে তুলতে হবে। সে জন্যে দরকার হলে মুখ ফেরানো নসিবের ঘাড় ধরে তাকে দিয়ে হ্যাঁ বলাতে হবে। বাদশার খোয়াব ছিল বলখ্। বদকশান। তৈমুরাবাদ। সেসব জায়গায় আমি মুঘল ধ্বজ উড়িয়ে এসেছি। কিন্তু জায়গাটাই এমন—যেখানে জয় হয়ে যায় হার। বলখ্-এর চেয়েও কান্দাহার বাদশার বড় খোয়াব। সেখানে বাদশা চেয়েছিলেন—বড়ে ভাইয়ের কপালে জুটুক জয়। কিন্তু এমনই নসিব—সেখানে দুশমন দু'দুবার হাজিরই হয়নি।

এবার কিল্লা-কান্দাহার হাতছাড়া। তাই সত্যি সত্যিই দুশমনের মোকাবিলায় আমার ডাক পড়েছে। আব্বা হুজুর তাহলে বিপদের সময় আমায় কদর করে থাকেন। আমাকে সেই বিপদের ভেতর থেকেই নসিব গড়ে নিতে হবে। আমি শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর। আমি কিল্লা-কান্দাহারের মুখ ফেরানো নসিব উলটে দেব।

জিলকাদ মাসের মাঝামাঝি আওরঙ্গজেব কিল্লা-কান্দাহার ঘিরে বসলেন। চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে তবে কিল্লা-কান্দাহারের পাটাতন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ একদিক থেকে—আরেক দিক থেকে কাংড়ার ভাউ সিং—দু'জনে ছোট কামান দাগতে দাগতে তোপের ধোঁয়ার ভেতর বন্দুকবাজ পদাতীদের কিল্লার সিঁড়ি ভাঙতে হুকুম দিলেন। এইসব পদাতী দৌলতাবাদ, ওয়ারদলে দুশমনের দুর্গের পেছল পাহাড়ি গা দড়ির মই বেয়ে উঠেছে একসময়।

খবরটা নীচে আওরঙ্গজেবের তাঁবুতে পেঁছিল। কিন্তু তাও তিনি হাসতে পারলেন না। এভাবে কিল্লা কান্দাহার ঘিরে ফেললেও তিনিও জানেন—কিল্লার ভেতরকার ইস্পাহানি ফৌজকে কিছুতেই কাবু করা যাবে না। সে জন্যে চাই বড় করে তোপ দাগার বড় কামান। মুঘল ফৌজে একটিও দূরপাল্লার বড় কামান নেই। অথচ দুর্গের নিরাপদ বুরুজে বসে ইরানিরা দিব্যি তোপ দেগে চলেছে। ওদের হাতে এই কামানের কোনও অভাব নেই।

কিল্লা-কান্দাহার ঘিরে পরিখা ভাল করে কাটিয়েছিলেন বাদশা শাহজাহান। এই পরিখা পেরিয়ে তবে কান্দাহার কিল্লার ওপর চড়াও হওয়া যায়। হেলমন্দের জল টেনে এনে সেই পরিখা ভরা থাকে। এসব পেরিয়ে যাওয়ার একটিই গলি। তা পাথরে ঢাকা। সে পাথর-গলিও আজই দুপুর দুপুর ইরানিরা কিল্লার বুরুজ থেকে কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের হাতের আঙুল নিশপিশ করছিল। যে বুরুজের আড়ালে বসে ইরানিরা তোপ দাগছে—সে আড়াল কয়েক পলকেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। যদি হাতে থাকে বড় নলের কামান। যদি একটিও তেমন কামান থাকত হাতে। শুধু বুরুজ উড়িয়েই থামত না মুঘলরা। ইরানি কামানগুলোকেও স্তব্ধ করে দিত। আওরঙ্গজেব জানেন কিল্লা কবজা করা থেকে কবজায় রাখা অব্দি সব রকমের লড়াইয়ে ইরানিরা তুখোড় হয়ে উঠেছে—গত ক'বছর ধরে তুর্কিদের সঙ্গে সমানে লড়ে লড়ে।

পরদিন খুব ভোরে শাহজাদা কিল্লা-কান্দাহারে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হলেন। এভাবে পড়ে পড়ে ইরানি বড় কামানের গোলা খাওয়ার কোনও মানে হয় না। হিন্দুস্থানের ফৌজ সন্ধ্যার আগে আগে এক মঞ্জিল হটে এসে তাঁবু ফেলল। তাঁবুর পেছনেই যে নদী চলেছে আওরঙ্গজেব শুনলেন—তার নাম অর্গন্ধব। নামটা তো আফগান নয়। আবার উজবেগ কিংবা আর্মেনীয়ও নয়। তুর্কি কিংবা চাঘতাই নামও এমন হয় না। নদীর এ-নাম তবে কবেকার? কোথাকার? রাতের আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেবের মনে হয় —এই জমিন একই থাকে। তার ওপর দিয়ে মানুষের সভ্যতার পর সভ্যতা

বয়ে যায়। অনেক সভ্যতার চাপ সয়েও দু'একটা নাম চিরকাল টিকে থাকে। অর্গন্ধব সেরকমই একটি নাম।

সেদিনই বেশি রাতের দিকে কিল্লা-কান্দাহারের ফৌজকে খানিকটা বিশ্রাম দেবার জন্যে বদলি ইরানি সেনারা কিল্লার পেছন দিকটায় এসে দাঁড়াল। হিন্দুস্থানি ফৌজের ঘোড়সওয়ার দলের নামী লড়াকু শাহ মীর তক্কে ছিলেন। তিনি বাছাই সওয়ারদের নিয়ে গিয়ে হামলা করলেন। তখন বেশ রাত। সারাদিন ফোসকা পড়া গরমের পর বড় বড় ইরানি গোলন্দাজ কিল্লা থেকে বেরিয়ে এসে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে সবে ধরা-চুড়ো ছেড়েছে—ঠিক সময় খোলা তলোয়ার হাতে হিন্দুস্থানি সওয়াররা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক একমুখো লড়াই। একদল লোক নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এদিক ওদিক ছুটছে। বাঁচার জন্যে কেউ কেউ পাথর তুলে ছুঁড়ছে। কিন্তু হিন্দুস্থানি সওয়াররা এ সুযোগ হারাতে চায় না। রাতের আবছা আলোয় রীতিমত এক মারণযজ্ঞ চলল। দেখতে দেখতে ইরানিরা সবাই ধরাশায়ী।

এর দিন কয়েক পরেই হিন্দুস্থানি ফৌজ পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে অর্গন্ধবের তীরে দাঁড়িয়ে গেল। কামান নেই। ঘোড়া তো আছে। আছে জঙ্গি হাতির দঙ্গল। হামাগুড়ি মেরে মাটি আঁচড়ানো পদাতীর দল। ওদের মাথা হয়ে লড়াইয়ে নামলেন রুস্তম খান। ইরানিরাও কুষক-ই-নাখুদ পাহাড় থেকে দু'ক্রোশ জুড়ে তিরিশ হাজারের ফৌজ নামিয়ে দিল। সে তুলনায় হিন্দুস্থানের ফৌজ সেপাই অনেক কম। ইরানিরা হিন্দুস্থানিদের ডানদিকে হামলা চালাল। ডান-দিককার হিন্দুস্থানি ফৌজ কিছুটা পিছু হটে এল। কিন্তু তারা কেউই জায়গা ছেড়ে পালাল না।

দু'দিকের ফৌজই গরমে কাবু। পাথর তেতে আগুন। গাছের কোনও ছায়া নেই। দুপুরের পরেই আকাশ থম মেরে গেল। কোনও বাতাস নেই। শুধু মাঝে মাঝে এক একটা ঘূর্ণি নেমে এসে চারদিককার ধুলো শুষে নিয়ে ওপরে উঠে যায়। বিকেল পড়তেই বোঝা গেল—আঁধি আসছে। শোঁ শোঁ গরম বাতাস।

ইরানিরা আর তিষ্ঠোতে পারছিল না। কামান, ঘোড়া, বন্দুক—প্রায় সবকিছু ফেলে তারা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে চলে গেল। ওপর থেকে আঁধি নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ফৌজ সে সবের দখল নিতে লাগল। ধুলো ঝড়ে চারদিক অন্ধকার। খবর চলে গেল বাদশার কাছে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব খবরটা পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলেন, আব্বা হুজুর ইরানিদের এই রণে ভঙ্গ দেওয়ার খবর পেয়ে কতটা খুশি। বার বার আমিরদের সামনে দরবারে বলছেন—হিন্দুস্থানের ফৌজ কামানই দখল করেছে একাশিটা। ঘোড়া সাতশোর ওপর। বাহাদুর ফৌজ। বাহাদুর শাহজাদা।

নিজে আওরংগজেব কিন্তু একটুও খুশি হতে পারছেন না। তিনি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, বলখ্। আবারও বলখ্। অর্গন্ধবের তীরে এই পাথুরে প্রান্তর জয় করে কী লাভ? এ জয় শেষমেশ হার হয়ে যায়। কিছুই পাওয়ার নেই এখানে।

তখনও তাঁর চোখের সামনে দূরে ফৌজি লোকজন ইরানিদের ফেলে যাওয়া

বন্দুকগুলো কুড়োচ্ছে। আওরঙ্গজেব জানেন, কিল্লা-কান্দাহার এখনও ইরানিদের কবজায়। তিনি মনে মনে নিজেকেই বললেন, শোনো কান্দাহার। আমরা—আমি আবার আসব কান্দাহার।

গরিব মুসাফিরখানার বারান্দায় ঘুম ভেঙে উঠে বসেও মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল ট্যাভারনিয়ারের। কী এক তীব্র গন্ধে সারা মগজ যেন অকেজো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, তিনি পথে কস্তুরী হরিণের চামড়া সমেত কস্তুরীও কিনেছিলেন। তখনই কস্তুরী ব্যাপারী বলেছিল, কাছাকাছি রাখবেন না। মাথা ধরে যাবে। সে পই পই করে একথাও বলেছিল, কখনও নাকের কাছে নিয়ে টানবেন না।

—কী হয় টানলে ?

—এত তীব্র গন্ধ—যে নাকের কাছে নিয়ে কস্তুরী গন্ধ নিলে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকবে।

সত্যিই গন্ধটা খুব তীব্র। এ-হরিণ জন্মায় শুধু ভুটানের পাহাড়ি জঙ্গলে। বর্ষার সময় এরা সমতলের জঙ্গলে নেমে আসে। তখনই ওরা ধরা পড়ে। শিকারীরা গন্ধ পেয়ে যায়। কস্তুরীটি মুরগির ডিমের মতো দেখতে। নাভি থেকে কিছুটা দূরে থাকে। রক্তবর্ণ। অসৎ ব্যাপারীরা অনেক সময় হরিণের পেটের ভেতরকার যকৃৎ ভরে দিয়ে আসল কস্তুরী সরিয়ে নেয় থলিয়া থেকে। সেজন্যে ভুটানের নাম খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে সে দেশের রাজা কস্তুরী ব্যাপারীদের ওপর নানারকম বাধা-নিষেধ জারি করেছেন।

ট্যাভারনিয়ার এই পঁয়তাল্লিশ বছরের শরীরটি বেশ তরতাজা রেখেছেন। একজন রত্ন ব্যাপারীকে যতটা দরিয়ার দুনিয়া আর ডাঙার দুনিয়া ঘুরতে হয়—তার চেয়েও অনেক বেশি এলাকা তিনি চষে বেড়িয়েছেন। এশিয়া ইউরোপ জুড়ে বিশাল পৃথিবীর বাছাই, রাজা-রাজড়ারা তাঁর খদ্দের। পর্তুগালের রাজা জন, ফ্রান্সের বাদশা লুই, ইংল্যাণ্ডের শাহ চার্লস, তুসকানির গ্র্যাণ্ড ডিউক, ভেনিসে স্পেনের রাষ্ট্রদূত যেমন তাঁর খদ্দের—তেমনই খদ্দের তুর্কির সুলতান, পারস্যের শাহ, হিন্দুস্থানের বাদশা। এছাড়াও মক্কেল বলতে আছেন—বড় বড় আমির, মনসবদার, সুবেদার। এ বড় লোভের জগৎ। এ বড় লাভের জগৎ।

তুসকানির গ্র্যাণ্ড ডিউকের বরাত—একটি আসল কস্তুরী আর তার চামড়া। আসল কি না যাচাই করে দেখতে মুরগির ডিমের মতো দেখতে রক্তবর্ণ থলেটি সাবধানে পরখ করে দেখেছেন ট্যাভারনিয়ার। যারা জালি কারবার করে তারা কস্তুরীর থলেটি খুলে কস্তুরী বের করে নেয়। সেখানে অনেক সময় তার বদলে ধাতুকণাও ভরে দেয়। সুগন্ধীর জন্যে বনের একটি প্রাণীকে প্রাণ দিতে হয়। ঝোলা থেকে একখানি বনাত বের করে ট্যাভারনিয়ার কস্তুরী সমেত চামড়াটি মুড়ে রাখলেন।

এরকম অনেক বরাত নিয়েই তাঁকে দেশে দেশে ঘুরতে হয়। বিষ শুষে নেওয়ার বেজোয়ার পাথরের বরাত আছে দুটি। একটি মসকতের সুলতানের—

অন্যটি ভেনিসে স্পেনের রাষ্ট্রদূতের। হিন্দুস্থানের একরকমের কুঁড়ি সমেত কচিপাতা ছাগল, গোরু বা বানর খেলে তাদের পেটে গিয়ে তা বেজোয়ার নামে এক পাথর হয়ে যায়। এ পাথর গোয়া যাবার পথে সরকার সলসেত্তির এক মহাল থেকে জোগাড় করতে হবে।

সন্ধে হয়ে আসছিল। এখন লম্বা পথ পাড়ি দেওয়া যাবে না। হাঁটাপথে চাঁদের আলোয় খানিক এগিয়ে গিয়ে রাতের জন্যে কোনও সরাইতে উঠতে হবে। ঝোলা পিঠে ফেলে ট্যাভারনিয়ার এগোতে থাকলেন। তাঁর উলটোদিক থেকে গোরু-মোষের পাল সন্ধ্যায় ঘরে ফিরছে। মিলিয়ে যাবার আগে সূর্যের আলো কত নরম। সবাই ঘরে ফেরার পথে। সবাই এবার সারাদিন খাটা-খাটুনির পর অবসর নেবে। শুধু আমিই রাস্তায়। আমি লোভের গোলাম। লাভের গোলাম। সুগন্ধীর জন্যে পালে পালে কস্তুরী হরিণ মারা পড়ছে। দুনিয়ার সেরা সুগন্ধী তিমির নাড়িতে থাকে। সেজন্যে কত তিমিকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। সুগন্ধী নাড়িই তিমির জীবনের দুশমন।

তবে মণিমুক্তা, হিরে, পুষ্পরাগের চাহিদা পুবদেশে—বিশেষ করে হিন্দুস্থানেই বেশি। দরও সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায় হিন্দুস্থানে। এদেশের বাদশা-সুলতানরাই এ সবের সবচেয়ে বেশি কদর করে। হীরার জন্যে ভিজে নদী খাতে প্রায় ন্যাংটো পঞ্চাশ ষাট হাজার মেয়ে-পুরুষ সকাল থেকে সন্ধে রাত অব্দি চার হাত পায়ে কাজ করে। দিনান্তে এক একদলের দু'তিন ক্যারেট হিরে জুটল তো অনেক। যুগ যুগ ধরে মানুষ নদী খাত চষে ফেলছে হিরের খোঁজে। সেই হিরেকে ঘিরে গুমখুন, ষড়যন্ত্র, ঠকানো—কত কী! নীলকান্ত মণি, রক্তমুখী নীলা, দুধকান্তমণি, পুষ্পরাগের জন্যে একই ভাবে পাহাড় চষে ফিরছে কত মানুষ। কী না—একটি পাওয়া গেলে তা গিয়ে উঠবে ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত কোনও মানুষের হাতে। তিনি হয়তো তা উপহার দেবেন তাঁর প্রিয়তমাকে। প্রিয়তমা হয়তো সেটি কোনও বিশেষ দিনে গলায় পরবেন।

কী ইউরোপে—কী এশিয়ায় মানুষ পছন্দ করে শুভ্রতম হীরা, শুভ্রতম মুক্তা শুভ্রতম রুটি আর শুভ্রতম রমণী। এই কথাগুলো নিজের মনে মনে উচ্চারণ করে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন ট্যাভারনিয়ার।

আগে যে যে সুবার সুবেদারি ছিল—তার ওপরেও গুজরাতের সুবেদারি পড়েছে শাহজাদা দারাশুকোর ঘাড়ে। সুবে গুজরাত একদিকে বুরহানপুর থেকে দ্বারকা অব্দি তিনশো দুই ক্রোশ। অন্যদিকে রাজপুতানার জালোর থেকে কাম্বো সাগরের বন্দর দানও অব্দি দুশো ষাট ক্রোশ। আকবর বাদশার আমলেই আদায় হত কোটি তনখার ওপর। গুজরাতে নিতান্ত বিশৃংখল অবস্থা সামাল দিতে শাহজাদা তাঁর দলে নায়েব সুবেদার বাকি বেগকে সুবে এলাহাবাদ থেকে গুজরাতে বদলি করেছিলেন। নিজে তিনি গুজরাতে সামান্য দিন থাকার সময় থাট্টায় গিয়ে সাধু ফারহাদের সঙ্গে দেখা করেন। তা গুজরাত সামলে এনেছে নায়েব-সুবেদার বাকি বেগ। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে শাহজাদা দারা বাকি বেগের জন্যে

সুপারিশ করেন বাদশার কাছে।

সেই বাকি বেগকে আজ বাদশা শাহজাহান খেতাব দেবেন। সেজন্যে জাহানাবাদের দেওয়ান-ই-খাসে দরবার বসেছে। বাকি বেগ দূর থেকে কুর্নিশ করে বাদশার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। বাদশার বাঁ দিকে রূপোর থালায় ছোট একটি ছোরা খাপ সমেত কোমরবন্ধনীর ওপর সাজানো। বাহাদুর খাঁ খেতাব দেবার সময়ে শাহী কোমরবন্ধনী আর ছোরা এগিয়ে দিয়ে থাকেন বাদশা। বাদশা কোমরবন্ধনীটি হাতে তুলে নিয়েছেন সবে—ঠিক এইসময় শাহজাদা আওরঙ্গজেব দরবারে ঢুকলেন।

ছোট ভাইকে সবচেয়ে আগে দেখতে পেলেন শাহজাদা দারাশুকো। কিন্তু তখন তিনি উঠতে পারেন না। কেননা, বাদশা একজনকে খেতাব দিতে ব্যস্ত। বাদশা শাহজাহানও তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিনা বুঝতে পারলেন না শাহজাদা আওরঙ্গজেব। মুহূর্তে সারা মন বিষিয়ে উঠল শাহজাদার। এত অবহেলা! আমি কান্দাহার থেকে এতদিন পরে ফিরছি—একথা নিশ্চয় বাদশা জানেন। জানেন বড়ে ভাই। কিন্তু কেউই চোখ তুলে তাকালেন না। কেননা, তখন দরবারে নাটক হচ্ছে।

যে ঝলকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব দরবারে ঢুকেছিলেন—ঠিক সেই ঝলকেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। দরবারের আমির-ওমরাহরা প্রায় জানলেনই না—কান্দাহার ফেরত শাহজাদা এইমাত্র দরবারে পা দিয়েই ফিরে চলে গেছেন।

রোশনমহলে বেগে ঢুকে পড়লেন আওরঙ্গজেব। কিন্তু সেখানেও তাঁকে দেখে কেউ ছুটে এল না। শাহজাদা ঢুকেই দেখলেন, শাহজাদি রোশনআরা উঁচু দীবানে বসে। দু'জন দেহাতি বাঁদি বসে বসে তাঁর পায়ের নখ গোল করে কাটছে। আরেকজন বাঁদি এক পাটি জুতোর ওপর খসে পড়া একটা চুনি মন দিয়ে ফের বসাচ্ছে।

রোশন একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ছোটে ভাইয়ের মুখ দেখে ফের চোখ নামিয়ে নিলেন।

আওরঙ্গজেবের বুকে গিয়ে যেন একটা তোপ বিঁধে গেল। তুমিও রোশন? কান্দাহার কী তোমরা জানো না রোশন। কান্দাহার বা বলখে—জয় মানেই জয় নয়। হার মানেও হার নয়। কান্দাহার—গোলকুন্ডা বা বিজাপুর নয়। জাহানাবাদে লালকিল্লা কিংবা আগ্রায় দুর্গের অন্দরমহলে বসে লড়াইয়ের মেজাজ বা মাত্রা বোঝা কঠিন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব ফিরে যাবেন বলে ঘুরেছেন। তখনই শুনতে পেলেন—

—শোনো ছোটে ভাই—

আওরঙ্গজেব ফিরে তাকালেন।

—তুমি একমাত্র দেওয়ান-ই-খাসের দরবার থেকে এলে নিশ্চয়।

—কী করে জানলে রোশন?

—যে-বেগে অন্দরমহলে ঢুকলে তা থেকেই বুঝলাম। নিশ্চয় নাটকটাও দেখে এসেছ খানিক!

—কী রকম ?

—বুঝলে না ! একজন শাহজাদা সুবার পর সুবার সুবেদারি পেয়ে চলেছেন। তাঁর সওয়ার বেড়েই চলেছে। এখন তিরিশ হাজার !

আওরঙ্গজেব বুঝলেন, বড়ে ভাই শাহজাদা দারার কথা বলছে রৌশন।

—ওখানে থামবে না। চাই কি বড়ে ভাইকে বাদশা তিরিশ হাজার থেকে সওয়ার বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার করে দিতে পারেন কালই সকালে। সুবায় না গেলে সুবেদার বরখাস্ত হন। এমনই বাদশার মর্জি—গরহাজির সুবেদারের পছন্দসই নায়েব-সুবেদারকেও খেতাব দেওয়া হচ্ছে হিন্দুস্থানে ! একথা কি কেউ ভাবতে পারতেন—আকবর বাদশা কিংবা জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে ?

আওরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, সেই খোজাটাকে আব্বা হুজুর এতক্ষণে বাহাদুর খাঁ খেতাব দিয়ে বসে আছেন। বাহাদুরি আছে বাকি বেগের !

—বাহাদুরি বাকি বেগের নয় ছোটে ভাই। বাহাদুরি বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোর।

আওরঙ্গজেব ফিরে যাচ্ছিলেন। রৌশনআরা ফের তাঁকে থামালেন। বললেন, দাঁড়াও।—বলে নিজের গলার বড় চুনির মালাটি পা উঁচু করে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের গলায় পরিয়ে দিলেন।

—কী ব্যাপার ?

—ছোটে ভাই ! বড় কামান নেই। দুশমন তোপ দেগেই চলেছে। তুমি পিছিয়ে আসোনি। অর্গন্ধবের তীরে দুশমন কামান, ঘোড়া রেখে পালাল। আঁধি উঠল তুমি তোমার জায়গা ছাড়োনি। সব বাহাদুরির খবর জাহানাবাদ জানে। জানে আগ্রা। আমি তাদের সবার হয়ে তোমার এই সামান্য কদরদারি করলাম।

আওরঙ্গজেব কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর বার বার মনে পড়ছিল—পরপর দু'বার কান্দাহারে দুশমনের মোকাবিলা না করেই বড়ে ভাই ফিরলেন। শাহী ফরমান বেরিয়ে পড়ল—শাহজাদা দারার ফেরার পরে যত দুর্গ আছে—তিনি এলেই যেন সেসব দুর্গ থেকে তোপ দাগা হয়। যেন জয় হাসিল করে ফিরেছেন বড়ে ভাই।

—আর আমি ! ঘোড়ার খাবার নেই। বড় কামান নেই। গোলা নেই। আঁধি উঠছে। দুশমনের গোলায় ঢাকা গলিপথ উড়ে যাচ্ছে। আর আমি কান্দাহারের মাটি কামড়ে পড়ে আছি। আমি লড়াইয়ের নিয়মে লড়াই করে চলেছি।

—সব ঠান্ডা মাথায় মেনে নাও ছোটে ভাই। তোমার দুশমন নসিব। সেই দুশমনকে ঘায়েল করে নসিবকে কেড়ে নাও। নসিবকে নিজের হাতে বানিয়ে নাও। মনে করো বাবর বাদশার কথা। হুমায়ুন বাদশার কথা। আকবর বাদশার কথা। তাঁরা কিছুই সাজানো-গোছানো অবস্থায় পাননি। সবই তাঁদের বানিয়ে নিতে হয়েছে। তুমিও বানাও ছোটে ভাই। ঝাঁপিয়ে পড়ো।

আওরঙ্গজেব কোনও কথা না বলে তাঁর এই তেজী, জেদী বাজির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর চেয়ে বছর খানেকের বড় দিদিটি আগের চেয়ে যেন অনেক সুন্দরী হয়ে উঠেছেন।

দেওয়ান-ই খাসের দরবারে বাদশা শাহজাহান ধবধবে সাদা রেশমি মির্জাই গায়ে বসে আছেন। জোরালো অভ্রের শিখায় তার সোনার সুতোগুলো আলাদা করে দেখা যায়। গরমের এই সন্ধ্যায় বোঝার উপায় নেই এই বাদশাই আজ জাহানাবাদের অসহ্য গরমে খোলা আসমানের নীচে জামা মসজিদের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন দুপুর দুপুর। মসজিদের জন্যে একটি টিলার মাথা উড়িয়ে দিয়ে বিশাল চাতালের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে উঠে নামাজ আদায় করার জন্যে বিশ্বাসীদের অন্তত তিরিশটি ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হবে। তারপরই ভেতরে ঢোকার বিশাল দরজা। দরজার দুধারে শ্বেত মর্মরের দেওয়াল। মাঝে মাঝে লাল বেলে পাথর। দরজায় দরজায় তামার চওড়া পাত। তৈরি হয়ে গেলে এর চেয়ে বড় মসজিদ হিন্দুস্থানে তো আর থাকবেই না—পারস্য, তুর্কিস্তান, আরব দুনিয়ারও আর কোথাও এর জুড়ি পাওয়া যাবে না। বাদশার চরম নিন্দুকও বলতে পারবে না—হিন্দুস্থানের বাদশা আরামে-আয়েশে ডুবে থাকা কুঁড়ের বাদশা। হ্যাঁ তিনি আরাম-আয়েশ অবশ্যই করেন—কিন্তু বসে থাকার মানুষ নন তিনি। শাহী দেওয়ানখানার সবাই জানে—হিন্দুস্থান তলে তলে নিঃশব্দে কান্দাহারে ফের লড়াই দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে জামা মসজিদ। শাহী খাজানাখানা যাতে আদায়-উসুলে ভরে ওঠে সেজন্যে কানুনগো থেকে তসিলদারদের বলা হয়েছে—কোমরের কষি শক্ত করে বাঁধুন।

দরবারে যেমন রয়েছেন কাজি মুহম্মদ আসলম, কাজি-উল-কুজ্জত মুল্লা কাবি—তেমনই রয়েছেন বিখ্যাত দুই কবি—জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ আর কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী। রয়েছেন—খোদ শাহজাদা দারাশুকো। তাছাড়া কয়েকজন সুফী সাধক আর্জি নিয়ে এসেছেন। এসেছেন সুরাট গির্জার চ্যাপলেন হাইনরিশ রথের দূত। আর রয়েছেন কয়েকজন মোল্লা—যাঁরা সবসময় শশব্যস্ত—এই বুঝি ইসলামের শরিয়ত থেকে সরে যাওয়া হল।

কথা হচ্ছিল মিরাজ-ই-জিসমানী নিয়ে। ইদানীং কোনও কোনও সুফী বলছেন, পয়গম্বর সশরীরে বেহেসতে যাননি—বেহেসত তাঁর কাছে নেমে এসেছিল। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইসলাম নিয়ে সবসময় শশব্যস্ত কিছু মোল্লা। শাহজাদা দারা জানেন—এঁরা ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে খুঁটিনাটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। আফসোস। ইসলামের নিজেকে রক্ষা করতে কাউকে দরকার নেই। তিনি জানেন—সুফী বা কবিরা সবাই ভাবের পাগল। হৃদয় দিয়ে যা বোঝেন তাই বলেন—তাই লেখেন।

মোল্লাদের ভেতর সবচেয়ে কট্টর কাজি-উল-কুজ্জত কাবি। জীবন যায় যাক—তবু শরিয়তের উনিশ-বিশ হওয়া চলবে না। মানুষটি সব সময় যেন ইসলামকে পাহারা দিয়ে চলেছেন। দাবি করে থাকেন—তিনি তুরানি। কিন্তু মন্দ লোকে বলে—ওঁর বাবা ছিলেন খাস হিন্দুস্হানি—খাঁটি দৌলতবাদি।

ওঁর কথাবার্তায় দারার কষ্ট হচ্ছিল। তিনি আর থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, সুফীদের ও কথায়—পয়গম্বরকে আরও বড় করা হয়েছে। তিনি এতই বড় যে—বেহেসত তাঁর কাছে নেমে এসেছিল।

কাজী মহম্মদ আসলম সত্যবাদী বলে বিখ্যাত। তিনি যখন দেখলেন, খোদ শাহজাদা দারা পয়গম্বরের ঠাঁই আরও উঁচু করে ধরছেন—তখন তিনি বললেন, ঠিকই তো।

কুঞ্জত মুল্লা কাবি দমে যাবার পাত্র নন। তিনি এ প্রশ্ন তুললেন, মহম্মদ সশরীরে তো যেতে পারতেন। এখানে পয়গম্বরকে খাটো করা হয়েছে।

দারা বললেন, না খাটো করা হয়নি। বরং তাঁকে আরও শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়েছে—বেহেসত তাঁর কাছে নেমে এসেছে। যাঁরা খোদাকে গভীরভাবে ভালবাসেন—তাঁরা ওভাবেই মিরাজ-ই-জিসমানীকে দেখে থাকেন।

দারা লক্ষ করে দেখেছেন—কিছুদিন হল, মোল্লারা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁদের চোখে ইসলামের যেন যায় যায় দশা। সবসময় তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কোথায় ইসলামের কতটুকু হানি হল।

তাঁর কথা কয়েকজন মোল্লার মগজেই ঢুকল না। একজন তো বলেই বসলেন, খোদা নিয়ে এই মাটির দুনিয়ার না-পাক ভালবাসা? খোদা আর ভালবাসা কি একসঙ্গে চলতে পারে?

দারার মনে হচ্ছিল, এইসব পাথুরে মোল্লার মগজ ফাঁক করে তার ভেতর ভালবাসা জিনিসটি ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ তো এসব তর্ক শুনে রীতিমত কাঁটা হয়ে উঠেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

শাহজাদার কথা বাদশা কতটা বুঝেছেন—বোঝা গেল না। তিনি স্নেহ ভরে হেসে নিজের বড় ছেলের মুখে তাকালেন। তাতেই কাজ হল। অমনি মোল্লারা নিজেদের সামলে নিলেন। কিন্তু দারা বুঝলেন, এই থেমে যাওয়া সম্পূর্ণ সাময়িক।

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী জানেন, জাহাঙ্গীর বাদশা সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতেন। সন্ন্যাসী চিৎ-রূপের সঙ্গে তিনি দু'বার দেখাও করেন। আকবর বাদশার মতো তিনিও পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতেন। তবে হিন্দুধর্ম বোঝার জন্যে নয়—বরং তার মুণ্ডুপাত করার জন্যে। আকবর শাহীর এই ধারা শাহজাহানে এসে যেন শুকিয়ে গেল। এখনকার বাদশা শুধুই মুসলমান পীর-ফকিরদের সঙ্গ করে থাকেন। মাঝে মাঝে সুফীদের দরবারে ডেকে এনে তাঁদের কেরামতি দেখে থাকেন শাহজাহান বাদশা।

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী তখন এই সব ভাবছেন—ঠিক তখনই সুফীদের ভেতর বসে থাকা নামজাদা সুফী শেখ নাজিরের হঠাৎ বৈষ্ণবী দশা হয়ে গেল। এ অবস্থা অনেকেই দেখেননি। শুনে থাকবেন।

শেখ নাজির যেমন বসেছিলেন—সেই অবস্থায় একদম পাথর হয়ে গেলেন। চোখ মুদে এসেছে। ঠোঁটে হাসি। শাহজাদা খুব কাছে গিয়ে শেখ নাজির নাকের কাছে নিজের হাতের আঙুল ধরলেন। খানিকক্ষণ রেখে বললেন, দম নিচ্ছেন না।

দম ফেলছেনও না। প্রোপ্রি হবস্-ই-দম দশা—

বাদশা শাহজাহান লড়াই বোঝেন। পাথর চেনেন। হিরে-মুক্তো নিজের শাজাহানি মহলে গুনে-গেঁথে রাখতে পারেন। কিন্তু কোনটা মিরাজ-ই-জিসমানী—কোনটা হবস্-ই-দম—এসব আলাদা করে জানেন না—বোঝেনও না। তিনি বুঝলেন, শেখ নাজিরের এ এক সুফী কেরামতি। নিঃশ্বাস না ফেলে পাথর হয়ে থাকা কম কিসে? কান্দাহার লড়াইয়ের সময় এসব লোক মজুত থাকলে সুড়ঙ্গ দিয়ে দিব্যি কিল্লার ভেতর গলিয়ে দেওয়া যায়।

সারা দরবারের সবাই শেখ নাজিরের মুখে তাকিয়ে। বৈষ্ণবী দশার ভেতর তিনি জল খেতে চাইলেন। এক চুমুক খেয়ে তিনি প্লাসটা নামিয়ে ধরলেন।

একজন প্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে দিয়েই বলল, মধু! টাটকা খালিস মধু!

সবাই তো অবাক। শাহজাদা দারা—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কাজি মহম্মদ আসলম বাদশার সামনে বললেন, ওঁরা নিজের চোখে দেখেছেন—পীর সাহেব একবার একটি বদনা—আরেকবার একখানি রুমালকে দিব্যি কবুতর করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কুদ্জত মুল্লা কাবি কিছু বলতে পারছিলেন না। ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিলেন। মনে মনে তিনি নিজেকেই বললেন, শাহী দরবার একদম লখনউয়ের গুলিখোরের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার ওপরে খোদা। সারা দুনিয়া তাঁর বান্দা। সেই খোদাকে নিয়ে না-পাক ভালবাসাবাসি, বে-শরিয়তি কাণ্ডকারখানার পাণ্ডা ওই সুফী শয়তানরা। তাদের মদত দিয়ে চলেছেন শাহজাদা দারা। সেই সুফী শেখ নাজিরের জল খেয়ে ওরা বলেছে মধু! আর শাহজাদার কাছে কদর পাওয়ার লোভে তাতে সায় দিল সব দরবারি। ভণ্ডামি আর কাকে বলে।

সব দেখেশুনে বাদশা শাহজাহান ভাবছিলেন, শেখ নাজিরের কেরামতিতে সারা যমুনার জল যদি মধু হয়ে যেত তাহলে কী ভালই না হত। বর্ষার আগে শাহী হাতির দঙ্গল ও জল আর খেতে পারে না। কেমন নোনা মতো হয়ে যায়। লোকটার কেরামতি যদি এ কাজে লাগানো যেত। কিন্তু এসব কথা তো হিন্দুস্থানের বাদশা বলতে পারেন না। কেননা, এখন সারা দরবারে মনে করা হচ্ছে—শেখ নাজির না জানি ধর্মের কত কিছু। নয়তো সামান্য জলকে মধু করে ফেলেন।

বাদশার মেজাজ শরিফ। জাহানাবাদ-দিল্লির বাইরেই তিনি কয়েকদিন আগে সফর করে এসেছেন। মাঠে মাঠে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এবার নীলের জমি বাড়বে—বিশেষ করে আগ্রা-ফৈজাবাদ এলাকায়। গঙ্গার গা ধরে নাবি জায়গার সব জমিতে এবার সরেস জাতের লম্বা ধান বুনতে দেহাতিদের রাজি করানো গেছে। লম্বা ধান ফলে কম। কিন্তু দর পাওয়া যায় ভাল। এ-ব্যাপারটা এ-মরসুমের জন্যে কানুনগোরা চাষীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে।

বাদশা শাহজাহান না পারছেন শাহজাদার কথায় পুরোপুরি সায় দিতে। না পারছেন কুদ্জত মুল্লা কাবির দিকে তাকিয়ে সায়ের হাসি হাসতে। একজন তাঁর

বড় ছেলে। আর মোল্লারা তো তাঁকে ইমাম মেহেদি খেতাব দিয়েছে। ইমাম মেহেদি মানে ইসলামের ত্রাতা। সেই ইসলামের ধ্বজাধারী কুব্জত মল্লা কাবির না-পসন্দ শেখ নাজিরের কেরামতিতে কী করেই বা বাদশা অবাক হন? শাহজাহান স্রেফ শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বহুদিন পর একা একাই অন্দরমহলে বসে। জাহানাবাদের লালকিল্লার অন্দরমহলগুলোর ভেতর এই মহলই যেন সবচেয়ে অগোছালো—দিকশূন্য। বেগম দিলরসবানু কোলের মেয়ে জেবউন্নিসাকে পাথরের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা হয়ে আসা জলধারার কাছাকাছি ছোটমতো একখানি সুখদোলায় শুইয়ে দিয়ে আপন মনে খোলা অলিন্দ দিয়ে যমুনার দিকে তাকিয়ে। এবার প্রায় বিকেল। এখন সারা রাজধানীর অসহ্য গরম জুড়িয়ে আসবে। ছেলে সুলতান মহম্মদ সুলতানের এগারো বছর বয়স হতে চলল। সে কিল্লার ভেতরকার মক্তবে আদৌ যায় কি না তা তিনি জানেন না। দূরে দুর্গের ভেতরকার ঢাকা গলিপথে নেহাত শিশুর মতোই একটি বন্দি ময়ূরকে জ্বালাতন করে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে শাহজাদা আওরংগজেব আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কড়া গলায় ধমকে উঠলেন—এদিকে এসো—

নিজের আব্বা হুজুরকে বিশেষ পায়নি মহম্মদ সুলতান। সে দেখেছে—মাঝে মাঝে এই সুন্দর দেখতে মানুষটি ক'দিনের জন্যে আসেন—আবার উধাও হয়ে যান। আম্মিজানের কাছে যেদিন প্রথম শুনলেন, এই তোমার আব্বা হুজুর—শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর—তারপর অনেকদিন এই মানুষটিকে মহম্মদ সুলতান দেখেইনি। কান্দাহার না কোথায় বহুদিন কাটিয়ে তার আব্বা-হুজুর অল্পদিন হল এসেছেন। এই আব্বা হুজুরের জন্যে বালক মহম্মদ সুলতানের গর্ব হয়। ছোট থাকতেই শুনে আসছে সে—দৌলতাবাদ, কিরকি, ঝুঝর সিং, বলখ্, কান্দাহার। এসব জায়গার সঙ্গে—এসব নামের সংগে নাকি তার আব্বাজানের বাহাদুরি জড়িয়ে আছে। এই বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই নাকি শাহজাদা বাহাদুর তার কাছে আসতে পারেননি। আম্মিজান তাকে বলেছেন, নয়তো তোমার আব্বা হুজুর তোমায় খুব ভালবাসেন। তুমি তার দিল আউর জান।

ধমক খেয়ে মহম্মদ সুলতান এক ছুটে দিলরসবানুর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। দিলরস কিছুই না বলে চুপ করে ছেলের পিঠে হাত রাখলেন।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা বিড়বিড় করে বললেন, বেগম! আমি তোমায় লড়াই ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। শুধুই লড়াই। কুচ। কামান। ঘোড়ার খাবার ফুরিয়ে আসছে। তুষার পড়ছেই। আমার দুশ্চিন্তার সবটাই তোমায় লেখা চিঠিতে ভরে দিয়েছি। আর কিছুই দিইনি তোমায়। কিন্তু ভেবে দ্যাখো দিলরস—সঠিক শিক্ষাদীক্ষার অভাবেই শাহজাদারা মসনদে বসলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজা হতে হলে রাজার মতন শিক্ষা পাওয়া দরকার। যিনি একটা

দেশের মাথায় বসবেন তাঁকে মানুষ হিসেবে মহান হতেই হবে। তাঁকে সবার চেয়ে সেরা হতে হবে। তা নাহলে মসনদে বসার কোনও অধিকার নেই তাঁর। এশিয়ার শাহীগুলোর এত দুর্গতির কারণ—এখানকার শাহজাদাদের অশিক্ষা। কুশিক্ষা। শিশুবয়স থেকে ওরা খোজাদের হেফাজতে থাকে। রাশিয়া, জর্জিয়া, আফ্রিকা, মঙ্গোলিয়ার এইসব গোলাম-বাঁদির কুসংসর্গে থেকে এশিয়ায় শাহজাদারা বেড়ে ওঠে। ফলে ওরা কিছুই শেখে না। উদ্ধত, অত্যাচারী, দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। মসনদে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তখন শিশুর মতন যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। যা দেখে তাতেই ভয় পায়। গম্ভীর ভাব করে বসে থাকে। যেন কত বোঝে। মদে, মেয়েমানুষে ভেসে যায়। শিকার হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় কাজ।

আমি রৌশনের কথায় লড়াইকে সুযোগ বুঝে নিয়ে আব্বা হুজুরের মন পাব বলে বলখ্ আর কান্দাহার করেই বেড়ালাম। তার আমারই অন্দরমহল আজ এরকম। শাহজাদার ইচ্ছা হল—একবার উঠে গিয়ে মহম্মদ সুলতানকে আদর করেন। কিন্তু তা পারলেন না। সর্বদিক থেকে হেরে যাওয়ার অবসাদ যেন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে।

এমন সময়—একজন দাখিলা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

আওরঙ্গজেব মুখ তুলে তাকালেন।

—আপনার মক্তবের মৌলবী সাহেব দেখা করতে এসেছেন—

—মৌলবী সাহেব? —মনে করতে পারলেন না শাহজাদা। অন্দরমহলের লাগোয়া যমুনার মুখোমুখি দর্শন-দরবারে এসে ঢুকলেন আওরংগজেব। ছেলেবেলায় তাঁকে আরবি পড়িয়েছেন মোল্লা শাহ। তিনি দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে শাহজাদার ভ্রু কুঁচকে গেল। আপনি এলেন কী করে এখানে?

মোল্লা শাহ কেঁপে উঠলেন। কোনওক্রমে বলতে পারলেন, রৌশনআরা বেগমের কৃপা না হলে আমার এতদূর পেঁছিনো হত না।

শাহজাদা জানেন, কবে কোথায় যোগাযোগ হয়েছিল—সেই সুবাদে অনেকেই এসে থাকে নানান স্বার্থ নিয়ে। তিনি যেন তেতেই ছিলেন। গলগল করে বলতে থাকলেন, আপনার কাছ থেকে আমি কী শিখেছি? শিখিয়েছিলেন—ফিরিঙ্গিস্থান সামান্য একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপের সবচেয়ে তাগদি রাজা পর্তুগালের শাহ। তারপর ওলন্দাজদের শাহ। শেষে ইংলিশস্তানের শাহ। হিন্দুস্থানের তাগদ, ধন-সম্পদের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। হুমায়ুন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের মতো কোনও শাহ ফিরিঙ্গিস্থানে নেই। আপনি ইতিহাসে একজন বিশাল বিশারদ। আপনি কি আমাকে দুনিয়ার দেশগুলো নিয়ে কিছু শিখিয়েছেন? আপনি কি আমাকে জানিয়েছিলেন, কেন দেশে দেশে যুগে যুগে বিদ্রোহ হয়—বিপ্লব হয়? আপনি আমাকে কিছুই শিক্ষা দেননি।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন মোল্লা শাহ। তিনি এসব কথার মুখোমুখি একদম বোবা হয়ে গেলেন।

—আপনি আমায় এই মুঘল শাহীর শুরুয়াতের কথাও বলেননি। পড়শি

দেশের ভাষাও কিছুটা জানা দরকার। তা আপনি আমায় শেখাননি। আরবি লিখতে আর পড়তে আপনি শিখিয়েছেন। আরবির মতো একটা জরুগব ভাষা শিখিয়ে আপনি আমার কৈশোর আর যৌবন বরবাদ করে দিয়েছেন। আরবি ব্যাকরণ শিখেছি—আর কিছু শিখিনি আপনার কাছে। নিজের মাতৃভাষায় যে কোনও বিষয় কি আরও সহজে—আরও অনেক ভালভাবে শেখানো যায় না ?

মোল্লা শাহ সব কথা হারিয়ে ফেলছেন। বলবেন বলে অনেক কথা মনে মনে সাজিয়ে এনেছিলেন।

আওরঙ্গজেব বললেন, আপনি আব্বা হুজুরকে বলেছিলেন—আপনি আমায় দর্শন শেখাচ্ছেন। আসলে তখন আপনি আমাকে আরবি সূত্র শেখাচ্ছিলেন। মগজে জোর করে ঢোকাচ্ছিলেন ওসব। কী মূল্য আছে তার বাস্তব জীবনে ?

—আপনি অনুগ্রহ করে বাড়ি ফিরে যান। আপনি কে ? কেমন আছেন ? তা কারও জানার দরকার নেই।

সারা দুনিয়া এই দর্শন-দরবারে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়ে মোল্লা শাহ কোনওক্রমে শাহজাদাকে কুর্নিশ করলেন। আওরঙ্গজেব তাকালেনও না। তাই খেয়ালই হল না—মোল্লা শাহ চলে যেতেই কে সেখানে ঢুকল।

কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই শাহজাদী রৌশনআরা বললেন, কাজটা ভাল করলে না ছোটে ভাই।

বসে থেকেই রুক্ষ চোখে বড় বোনের মুখে তাকালেন আওরঙ্গজেব। তাঁর মন বলল, শাহজাদী হয়ে কোনও কিছুই শেখেনি এই আওরত। আগ্রা আর জাহানাবাদের অন্দরমহলে থেকে শাহী মাসোহারার মোহরগুলো খরচ করতেই শিখেছে শুধু। বিলাসে, আয়েশে, কঠিন অত্যাচারে। আর কথা বলে—শুধুই ফিসফিস করে। যেন দুনিয়ার বাতাসে শুধুই ষড়যন্ত্র ভেসে আছে।

রৌশনআরা ফের বললেন, কাজটা ভাল করলে না কিন্তু।

—কীরকম ?

—আজ হিন্দুস্থানে ইনসাফির কোনও দাম নেই। ইসলাম ঘোর বিপদে। এখন খাঁটি মুসলমানদের তলোয়ার ধরতে হবে ছোটে ভাই।

একটুও উত্তেজিত হলেন না আওরঙ্গজেব। বললেন, সেজন্যে মসজিদ আছে। আছেন মোল্লারা।

—বড়ে ভাই আল্লাকে 'সচ্চিদানন্দ' বলতে শুরু করেছেন।

আওরঙ্গজেব নড়েচড়ে বসলেন।

—মির্জা রাজা জয়সিংহকে লেখা চিঠির ওপর ফারসিতে লিখেছেন 'সচ্চিদানন্দ'।

—তাই নাকি ?

—সুফী ভাবে বিভোর আমাদের বড়ে ভাই এখন মাশুকা। আল্লার মুখে বেহস্তের আলো পড়েছে—তাই তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

—তুমি এসব জানলে কী করে রৌশন বাজি ?

—খবর রাখতে হয়!—বলে এক ঘোলাটে হাসি হাসলেন রৌশনআরা।

আওরঙ্গজেব বুঝলেন, জয়সিংহকে লেখা শাহজাদা দারার চিঠি নিশ্চয় বাজির হাতে পড়েছিল।

—শাহজাদা দারা লিখেছেন—আল্লাতালার মুখের দু'পাশে দুই গুচ্ছ চুল ঝুলে পড়ছে। তার একটি ইসলাম, অন্যটি হিন্দুর ধর্ম।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব রেগে উঠে দাঁড়ালেন। মুসলমানের আল্লাকে নিয়ে এ কী না-পাক বে-শরিয়তি কান্ডকারখানা? কাফেরির আর শেষ নেই।

—তবে কী বলছি ছোটে ভাই। এই যখন সময়—তখন হাতে রাখা যাবে এমন একটি মোল্লাকেও কি হারানো উচিত? এমন সময়ে একজন মোল্লা শাহকেও আমাদের চাই ছোটে ভাই।

আওরঙ্গজেব তাঁর চেয়ে সামান্য বড় রোশনআরার মুখে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তখন রোশনআরা বলে যাচ্ছিলেন, বড়ে ভাই তাঁর হাতের আংটিতে আরবিতে 'আল্লাহ' খোদাই করাতে পারতেন।

একথায় আওরংগজেবের সব কিছু গুলিয়ে গেল। তিনি কিছু না বুঝে অবাক হয়ে তাকিয়েই রইলেন। রোশন কী বলতে চায়! রোশন বললেন, তার বদলে দেবনাগরীতে খোদাই করিয়েছেন—

—কী?

—পরভু! বোঝো তাহলে ছোটে ভাই। শাহীর তো দিন ঘনিয়ে এল বলে। আব্বা হুজুর বড়ে ভাইতে অন্ধ। তাঁর কিছুই চোখে পড়ে না বাদশার। তাতে উসকে দিয়ে চলেছেন শাহজাদী-বেগম জাহানারা। গোকুলের গোঁসাইদের তো পোয়া বারো ছোটে ভাই। হিন্দুস্থানের এ কী হল বলতে পার? পাক ইসলামের বান্দারা পথে পথে ঘুরে হয়রান পরেশান হচ্ছে। আর গোঁসাইদের চার চারখানা নিশান দিয়ে বসে আছেন বড়ে ভাই। যেখানে খোদ বাদশাই দিয়েছেন মাত্র দু'খানি নিশান। তাঁদের খাজনা নেই। কর দিতে হবে না। মাশুল মাপ। অবাধে গোরু চরাবে ওরা। ওদের এলাকায় ময়ূর মারা চলবে না। চলবে না কোনও শিকার। এ কী জবরদস্তি?

শাহজাদা আওরংগজেব ভেবেছিলেন উত্তেজিত হবেন না। বাজি শাহজাদী রোশনআরার কোনও কথায় আর নিজেকে জড়াবেন না। রোশনের কথায় জড়ালে মনের ভেতর অবিরাম তোলপাড় হতে থাকে। ঘুম চলে যায়। যদিও বা ঘুম হয় —জেগেই শুধু মনে পড়ে একজন আব্বা হুজুরের কথা—যিনি কিনা একচক্ষু হরিণের মতো ছুটে চলেছেন একই দিকে। যার শেষে আছেন বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকো।

লালকিল্লার আওরংগজেবি মহলের বাইরের নয়া রাজধানী জাহানাবাদের আকাশে এখন আরেকটি গ্রীষ্মের রাত ছড়িয়ে পড়ছে। এই রাতের সংগে মিশে আছে—আওরংগজেব জানেন—শাহীর অল্প কিছু সফল কামিয়াব ইনসানের তৃপ্তি। আর মিশে আছে সারা হিন্দুস্থানের কোটি কোটি ব্যর্থ মানুষের হা-হুতাশ। রাজধানীর বাতাসে ওই তৃপ্তি আর হাহাকার পাশাপাশি ভাসে। তৃপ্তির যেমন একটা তাপ আছে। হতাশারও একটা তাপ আছে। গরমের রাতে সারাদিনের জ্বালা-

যন্ত্রণার সংগে এই তাপ মিশে গিয়ে দোগুণী হয়ে যায়।

রৌশনআরা বললেন, এখন একটি মানুষও আমাদের কাছে ফেলনা নয় ছোটে ভাই। শাহীর দুশমনরা একই সংগে ইসলাম আর চাঘতাই জুটির গোড় কেটে দিতে চায় সেজন্যে না-পাক বে-শরিয়তি কাণ্ডকারখানা আরও ঘটতেই থাকবে। আজ থেকে ওদের যারা দুশমন—তারাই আমাদের দোস্ত। এখন থেকে দোস্তের পর দোস্ত খুঁজে বের করতে হবে। নসিব যখন সরল সিধে নয়—তখন দম হারানো চলবে না। কঠিন লড়াইয়ের শেষে আব্বা হুজুরকে যদি জয় এনে দেওয়া যায়—যদি ফের কান্দাহারকে হিন্দুস্থানের সামিল করতে পারো—তো সেই জয়ই হবে বড়ে ভাই শাহজাদা দারাশুকোর বে-কামিয়াবির সাবুদ—প্রমাণ। সবাই বুঝবে —শাহজাদা দারাশুকো কতটা অপদার্থ। তখন নিশ্চয় বাদশা ঘুরে দাঁড়াবেন।

আওরঙ্গজেব কোনও কথাই বললেন না। দর্শন-দরবারে দাঁড়িয়ে তিনি জাহানাবাদের কালো আসমান দেখতে পাচ্ছিলেন। সে আকাশে কিছুই দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু কয়েকটি ফুটি ফুটি তারা।

একই আকাশের নীচে দিল্লির যমুনা ঘাটের আলোয় নিগম বোধ মঞ্জিলের পাতালে নিজেরই তয়খানায় শাহজাদা দারা মাটির নীচের ঘরের খোলা জানলার রুজু রুজু যমুনার অন্ধকার বুকে ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে পড়া জোনাকির আলো খুঁজছিলেন। কোথাও কি কিছু পাব না? আমার কি পাওয়ার কিছু নেই? শুধুই নিন্দামন্দ দিয়ে আমার নসিব? শুধু অপবাদ? অবিশ্বাস? সবই তো ইসলামকে নিয়ে। আমি তো ইসলামের বাইরে যাইনি। আল্লার নামের চেয়ে মধুর আর কোনও নাম নেই।

ইসলামের শুরু আরবে। যে দেশে ইসলাম গিয়েছে—সে-দেশের মানুষের প্রতিভা আর প্রয়োজন মতো ইসলাম খানিক খানিক বদলে গেছে। তুর্কিরা ইসলামকে নিয়েছে একভাবে। পারস্য নিয়েছে আরেকভাবে। সেখানে শিয়ারা দিয়েছেন ইসলামকে নতুন মানে। হিন্দুস্থানের মানুষের প্রতিভা আর প্রয়োজন ইসলামকে দেবে আরেক নতুন রূপ। সেই রূপ এখানকার সব মানুষের আকাংক্ষাকে নিয়ে গড়ে উঠবে। কেননা যাকে বলা হয়ে থাকে অবিশ্বাসী—তারও যে ঈশ্বর আছেন। যাকে বলা হয়ে থাকে পুতুল পুজো—সেই পুতুলের বীজেও তো রয়েছে বিশ্বাস—ঈশ্বর। আকবর বাদশা একথাটি বুঝতে পেরেছিলেন।

শাহজাদা দেখলেন, তিনি লিখতে বসে উঠে এসেছেন। বনাতের ওপর লেখার কাগজ ছড়ানো। যমুনার বাতাস তয়খানার ভেতর অভ্র শিখাটি নিয়ে নাচানাচি জুড়ে দিল। তিনি খোলা জানলা থেকে সরে এসে এলোমেলো কাগজগুলো গোছালেন। তারপর একখানি মুরাক্কার আড়াল বানিয়ে শিখাটি সিধে করে তুললেন—যাতে কি না লেখা যায়—পড়া যায়। নিজেরই খানিক আগে লেখা তিনি মন দিয়ে পড়তে লাগলেন—

আমি নিঃশংক দারাশুকো ১০৬২ হিজরিতে আমার আটত্রিশ বছর বয়সে স্বীকার করছি—এতদিন আমি বিভিন্ন ধর্মের পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাধকদের

লেখা অনেক বই পড়েছি। তাতে আমার মনে হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। ঠিক এই সময়ের আগে থেকে আমার ভেতরে এক অচেনা উল্লাস বাসা বেঁধেছিল। সবসময় কে যেন আমায় জাগিয়ে রাখত। সেই আবেশে আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছি।

আল্লাতালাই একটি নাম—শেষ নাম।

পয়গম্বর তাঁরই হয়ে দুনিয়ায় এসেছেন।

পয়গম্বরের অনুগামীদের জানাই প্রণতি। চাই তাঁদের আশীর্বাদ।

ঈশ্বরকে নিয়ে আমার কথাগুলোর জন্যে কিছু নীচ, হীনমনা মানুষ, সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্যে কিছু শুকনো, নীরস, যুক্তিহীন উন্মাদ আমাকে অবিশ্বাসী, অধার্মিক বলে অপবাদ দিচ্ছে। তাই দেখে আমি সুফী সন্তদের মুখের কথা সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। এমন সন্তদের কথা সংগ্রহ করছি—যাঁদের মহত্ত্ব নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। যাঁরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেয়েছেন—তাঁদের কথা বলা উচিত। এসব পড়ে দজ্জাল, হীনমনারা হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবে।

শাহজাদার ইচ্ছে—সুফী-সন্তরা অনেক সময়ে সাটে ঈশ্বরের রহস্য নিয়ে কথা বলেছেন—সেসব কথা সরল করে তুলে ধরবেন। নানাম ধর্মের প্রায় একশো সাতজন সন্ন্যাসীর বাণী তিনি এক জায়গায় করতে চান। এই মহৎ মানুষদের বাণীর ধারে নিশ্চয় নিন্দুকের জিহ্বা দু'খণ্ড হবে।

শাহজাদা ফের নিজেরই লেখা পড়তে শুরু করলেন।

যারা খ্রিস্টের চেয়ে দজ্জাল বা শয়তানের দলকে বেশি মানে—যাঁরা মুসার চেয়ে ফারাওকে পছন্দ করে—পয়গম্বরের চেয়ে আবু জেলকে মানে তাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। যিনি এসব বিষয়ে রস পান তিনি ভাগ্যবান।

এবার শাহজাদা নিজের মনের ভেতর যেন কবিতার পদধ্বনি শুনতে পেলেন। একদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যাবার উল্লাস—অন্যদিকে অপবাদের—নিন্দার কাঁটা যেন মনের মর্মমূলে বিঁধে আছে।

মুল্লা যেখানে নেই সে তো স্বর্গ
....
মুক্ত হোক এ ধরা মুল্লাদের গর্জন থেকে
তাদের ফতোয়াতে আর কেউ দেবে না কান।
... .
যিনি পান করেছেন অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পেয়ালা

আর লেখা হল না শাহজাদার। এই তরখানায় যাঁরা জানান না দিয়েই আসতে পারেন তাঁরাই এসে হাজির। দারা দেখলেন, কবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর ভারি পা কাঠের সিঁড়ির ধাপে। তাঁর গায়ের লাল রেশমি উড়ুনির প্রান্তদেশ সিঁড়ির ধুলোয় মাখামাখি। এই মানুষটির পেছনে যে ভারি গলা শোনা যাচ্ছে—তার মালিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ।

শাহজাদা দারার হৃদয় যেন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন। আসুন।

তয়খানায় নেমে কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী বনাতে বসতে বসতে বললেন, শাহজাদা ! আমরা বলি, আপনি সময়ের আগে এই দুনিয়ায় এসে পড়েছেন।

—আগে যদি এসেই থাকি—আগেই চলে যাব।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ মন দিয়ে শাহজাদার উজ্জ্বল মুখখানি দেখছিলেন। তরুণ প্রতিভার সব চিহ্ন এ-মুখে। বিনয় আর অহংকার, সাহস আর ভালবাসা পাশাপাশি যেন ও-মুখে দ্যুতি ছড়ায়। তিনি বললেন, যত দিন যাচ্ছে—হিন্দুস্থানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মুক্তির হাওয়া যেন শুকিয়ে উঠছে—হাঁফিয়ে উঠছে।

শাহজাদার মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, দেখলেন তো সেদিন !

সরস্বতী আর জগন্নাথ একই সঙ্গে দারার মুখে তাকালেন।

—সেই যে সিরাজ-ই-জিফমানি। পয়গম্বর সশরীরে গেলেন কি না—সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল। অথচ বেহেসত যে নেমে এল তাঁর কাছে—তাঁকে শ্রদ্ধা আর প্রণতির চোখে বলা সুফীদের একথার ধার দিয়েও যেতে চায় না কাঠ-মোল্লারা।

আকবর বাদশার আমলের সেই মুক্ত হাওয়া কোথায় গেল ?

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর একথায় শাহজাদা দারা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা চোখ বুজতেই বদাউনীর দল—ফেউয়ের দল এককাট্টা হয়েছে। ওরা দল পাকিয়েই চলেছে। ঈশ্বর নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। ওদের লক্ষ—ঈশ্বরকে ঘিরে যে তাগদের ফোয়ারা—সেটি কবজা করতে হবে।

ঠিক এইসময় পাগলা বাতাসে অভ্রের শিখাটি দপ করে নিভে গেল।

সংগে সংগে দারা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

॥ অষ্টআশি ॥

তয়খানায় রাতের অন্ধকারে যমুনার ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকছে। তার ভেতর দিলখোলা শাহজাদার হাসি থামতে মুখ খুললেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। অন্ধকারে তিনজনের কেউই কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। জগন্নাথ বললেন, শাহজাদা ! আপনাকে নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে।

—নিশ্চয় প্রশংসা নয় পণ্ডিতরাজ !

জগন্নাথ চুপ করে রইলেন। দারা বললেন, শাহজাদা বলেই তো আমাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে।

জগন্নাথ চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, আরও তো শাহজাদা রয়েছেন। তাঁদের নিয়ে তো হয় না। লোকেরও বলিহারি। শাহজাদা দারাকে নিয়ে এত আগ্রহ কেন ?

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী জানতে চাইলেন, কী নিয়ে চর্চা ?

দারাই জবাব জুগিয়ে দিলেন, নিশ্চয় আমি কতটা বে-শরিয়তি কাজকর্ম করছি—কতখানি ধর্মদ্রোহী—না পাক! এসব নিয়েই চর্চা নিশ্চয়?

—ঠিকই ধরেছেন শাহজাদা।

সরস্বতী জানতে চাইলেন, কোথায় শুনলেন?

এবার পণ্ডিতরাজ কিছুটা গুটিয়ে গেলেন। কিছুকাল হল তিনি একটি যবনীকে গ্রহণ করেছেন। সুন্দরী বলে সেই যবনীর খ্যাতি আছে। নাম তার লবঙ্গী। তা সেই লবঙ্গী জাহানাবাদের চকবাজারে চুড়ি পরতে গিয়েছিল। সেখানেই মেয়েমহলে শাহজাদা দারাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে দেখে কান পেতে সবই শুনে এসেছে। এসে সবটাই পণ্ডিতরাজকে বলেছে।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কিছুটা কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, আমি শুনিনি। শুনেছেন আমার অর্ধাঙ্গিনী। চকবাজারে চুড়ি পরতে গিয়ে মেয়েমহলে শুনে এসেছেন—শাহজাদা দারার হাতের আঙটিতে দেবনাগরিতে লেখা আছে—'পরভু।'

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী বললেন, সে তো সবাই জানেন। ঠিক এই সময় একজন দাখিলা এসে অভ্র-শিখা জেবলে দিল।

শাহজাদা দারা বললেন, পরভুর বদলে যদি ফারসিতে লেখা থাকত 'আল-রব'—তাতেই বা কী উনিশ-বিশ হত? আমার কাছে আল-রব মানে শুধু মুসলমানের আল্লা নয়—সব মানুষের আল্লা। আমার কাছে 'পরভু' মানে শুধু হিন্দুর ভগবান নয়—সব মানুষের ভগবান।—একথা বলতে বলতে শাহজাদা তাঁর হাতের সামনে খোলা কাগজ আর বইপত্রের ভেতর থেকে একগোছা কাগজ তুলে ধরলেন। ধরে বললেন, এই আমি 'হাসানত-উল-আরেফিন' লেখা প্রায় শেষ করে এনেছি। নানা ধর্মের প্রায় একশো সাতজন সন্ন্যাসীর বাণী—প্রবচন এখানে দিয়েছি। শুরুতে আল্লা, পয়গম্বর আর তাঁর অনুগামীদের তসলিম জানিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ চেয়েছি। এমন সব সন্তের কথা এখানে আছে—যাঁদের মহত্ত্ব নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এ-লেখা বিষ-জিভকে স্তব্ধ করে দেবে। আমার কাছে সোমনাথ আর কাবা—দুইই সমান।

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী শাহজাদার মুখ দেখে বুঝলেন, কট্টর গোঁড়াদের নিন্দামন্দে দারা বেশ কিছুটা অস্থির হয়ে পড়েছেন। এই দিলদার নওজওয়ানের সোজা সত্য কথা মোল্লাদের না-পসন্দ। মোল্লারা মনে করেন—ধর্মের বাখান শুধু তাঁরাই শোনাবেন। এসব নিয়ে বক্তৃতা শুধু তাঁরাই একচেটিয়াভাবে দেবেন। অন্য কেউ নয়। তিনি যদি শাহজাদাও হন—তবুও তিনি এসব নিয়ে কথা বলার কে? তাই তাঁরা নিন্দা আর কুৎসায় আকাশ অন্ধকার করে তুলেছেন। শাহজাদার উদার চিন্তাকে মোল্লারা তাঁদের নিষিদ্ধ এলাকায় হুট করে ঢুকে পড়া বলে মনে করছেন—আর সে জন্যে তাঁরা রীতিমত আতঙ্কে ভুগছেন। দারাশুকো একজন শাহজাদা বলেই তাঁরা বেশি করে আতঙ্কগ্রস্ত। এই গোঁড়ারা তাই জেগে বসে আছেন—তক্কে তক্কে থাকছেন—কখন ওসব উদার চিন্তাকে উপড়ে ফেলা যায়।

দারা বললেন, আমি জানি—আমার চারপাশে সন্দেহ আর অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠছে। আল্লাকে নিয়ে—ভগবানকে নিয়ে আমার কথাবার্তার কদর্থ করা

হচ্ছে। ওদের হামলা থেকে নিজেকে বাঁচাতেই এই হাসানত-উল-আরেফিন লিখছি। আমি যে-চোখে মানুষ আর ঈশ্বরকে দেখি—সেই ধাঁচের কথা মহাজনেরা বলে গেছেন। তাঁদের সেসব কথা নিয়েই এই আরেফিন। আসলে উলেমারা অজ্ঞ নিজেদের সম্বন্ধে—তাদের অজ্ঞ হতে শেখানো হয়।

শাহজাদা আর কথা বলতে পারলেন না। রাগে দুঃখে তাঁর গলা বুজে এল। এতদিন আমি তৌহিদ তত্ত্ব জানতে—ঈশ্বর যে এক—তা বুঝতে ইসলামের ভেতর ঘোরাফেরা করেছি। আমার মন যে সেই মহান সুফী সাধক মনসুর বিন হাল্লাজের দিকেই ঘুরে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন—আনাল হক। মানুষেই ঈশ্বর। মানুষই ঈশ্বর। একথা বলে তাঁকে নিজের মুণ্ডুটি হারাতে হয়েছিল। আমিও তো বলছি, আল্লা শুধু মুসলমানের নয়—তিনি সব মানুষের। এ জন্যেই গোঁড়ারা মনে করছে—আমি ইসলাম ধর্মবিরোধী।

একসময় মনে করতাম—হাম্-উস্ত। সব কিছুই তিনি।

সব কিছুই তাঁর কাছ থেকে এসেছে—হাম-অজ-উসত—একথাকে বেশি গুরুত্ব দিইনি। সুফীরা অনেক গূঢ় কথা ভেঙে বলেননি। তাঁরা চুপ করে থাকেন এসব ব্যাপারে। গত বারো তেরো বছরে আমি মহামানবদের সঙ্গ পেয়েছি। মিঞা মীর, মুল্লা শা বদকশানি, শাহ দিলরুবা, সারমাদ—সবার সঙ্গে সঙ্গত করেছি। করে যা বুঝেছি তা এই হাসানত-উল-আরেফিন-এ নিঃশঙ্ক মনে লিখে যাচ্ছি ভাবিকালের জন্যে। আগে আমি সাবধানী ছিলাম। কী কথায় কী হয়ে যায়—তাই রেখে ঢেকে আমার ভাবনাকে তুলে ধরেছি। আজ আমি নিন্দুকদের কুৎসাকে আর ভয় করি না। আজ আমার আর কোনও দ্বিধা নেই। এইসব ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা বলে উঠলেন, কবীন্দ্রাচার্য—পণ্ডিতরাজ—আপনারা দুজনই রসিক, ধার্মিক—মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করেন। আমি আজ মানুষের ধর্মের কথাই এইই আরেফিনে লিখে চলেছি। জানি এসব কথা প্রকাশ হয়ে পড়লেই নিন্দুকদের ঝাঁকে—কুৎসাবাজদের ঝাঁকে ঢিল পড়বে। তারা হৈ হৈ রৈ রৈ করে বেরিয়ে পড়বে। তাই বলে কি আমার ভাবনাকে চেপে রাখব ?

কবীন্দ্রাচার্য লম্বা চওড়া মানুষ। মাথার চুল সামান্য পিছিয়ে গিয়েছে। শাহজাদা দারা তাঁর ছেলের বয়সী হবেন। তিনি স্নেহভরে বললেন, দেখুন শাহজাদা, ইসলামের আঙিনায় মুক্ত হাওয়া বইলে মোল্লাদের আসনপাট উড়ে যাবে। তারা কিন্তু আপনাকে রেয়াত করবে না। ভবিষ্যতে এ জন্যে আপনাকে খেসারত দিতে হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই দারা কিছু বলতে পারলেন না। মনে মনে বললেন, ইসলামের আঙিনা। সে আঙিনা মানে তো কিছু ক্ষমতায় একচেটিয়া অধিকার। এই মোল্লারাই আগ বাড়িয়ে এসে আব্বা হুজুরকে ইসলামের ইমাম মেহেদি করেছে। বাদশা আজ ইসলামের পাহারাদার। পাছে ইসলামের কোনও ক্ষতি হয়। হিন্দুস্থানের বাদশা আজ সারা দেশে সবার আগে—সেরা সাচ্চা মুসলমান। তাই চন্দ্রভান মুন্সির রুবাইয়ের ভেতরকার বীজ তিনি মগজে নিতে পারেন না। বুঝতেই পারেন না। অথচ আমাদের আব্বা হুজুর দরবারি কানাড়ায় রস পান—

দরকারে গোলাপবাগের জন্যে শাহী জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন—তাজমহলের চাঁদোয়ায় নীলের আভা আনতে নীলা গ'্ড়িয়ে রঙের খোঁজ করেন। সেই তিনি আজ ওই মোল্লাদের ইসলামের ত্রাতা!

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বললেন, আপনার ছোটে ভাই—

—কে?

—শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর তো দক্ষিণে একের পর এক ভাঙা মসজিদ পোড়ো মসজিদ এমন করেই সংস্কার করছেন—যাতে কিনা সেসব জায়গায় ফের প্রাণ ফিরে আসে। নামাজিরা যাতে ফিরে আসেন আবার—

—এ তো খুব ভাল কাজ।

দারার একথায় জগন্নাথ বললেন, দৌলতাবাদ, হায়দরাবাদের মোল্লারা আওরঙ্গজের বাহাদুরকে জিন্দাপীর বলে সাবাসি জয়ধ্বনি দিয়েছে।

জগন্নাথ দক্ষিণের মানুষ। দক্ষিণ থেকেই তিনি শাহী দরবারে এসে মান-সম্মান পেয়েছেন। তাঁর কথা তো ভুল হবার নয়। দারা যেন জ্বলে উঠলেন। বললেন, মোল্লারা? তা তো ওরা বলবেই। ওদেরই তো জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব!

তয়খানা এবার থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। অভ্রশিখাটি জ্বলছে নিজেরই মতো। শাহজাদা দারা যেন অন্যায়ভাবে পরাস্ত কোনও যোদ্ধার আফসোসভরা মুখশ্রী নিয়ে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে। সে-মুখ দেখে কবীন্দ্রাচার্য বলে উঠলেন, পণ্ডিতরাজ! অনেকদিন আপনার গান শোনা হয় না।

একথা বলায় পন্ডিতরাজ কবীন্দ্রাচার্যের মুখে তাকালেন। তাকিয়ে বুঝলেন, কবীন্দ্রাচার্য চাইছেন—গান শুনে শাহজাদার মনটা অন্যদিকে ঘুরে যাক। দুজনই দারাকে রীতিমত স্নেহ করেন। দু'জনই চাইছিলেন, শাহজাদার মনের অস্থিরতা কাটুক।

জগন্নাথ শ্রীরঞ্জনী রাগে আলাপন শুরু করলেন। রীতিমত সাধা গলা। লবঙ্গী যবনী হয়েও এই কাফেরের গলায় মালা দিয়েছে—কারণ কাফের ভরাট গলায় আশ্চর্য গাইতে পারেন। তয়খানার ভেতরে শাহজাদার মগজে তালগোল পাকানো সব যন্ত্রণা যেন মসৃণ হয়ে এল। পণ্ডিতরাজ চোখ বুজে গাইছিলেন।

শাহজাদার কথায় চোখ খুলে গেল। গানও থেমে গেল। দারা বললেন, আমরা যে মহাভারত অনুবাদে নেমেছি—সে তো সবটাই লড়াই আর শোকের কাহিনী। রিস্তেদারে রিস্তেদারে—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের কাহিনী।

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেন। শাহজাদার চোখ দেখে তাঁর মনে হল—শাহজাদা যেন অনেকদূরে দেখতে পাচ্ছেন। দারার মুখে কোনও কথা নেই। তিনি তয়খানার খোলা অলিন্দ দিয়ে যমুনার অন্ধকার বুকে তাকিয়ে আছেন।

ঠিক এই সময় কবীন্দ্রাচার্য বললেন, শাহজাদা! একটি ব্যাপার এখুনি বন্ধ হওয়া দরকার।

শাহজাদা দারা তাঁর মুখে তাকালেন।

কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী বললেন, কালই আবার শাহীর চোখের নীচে শাহীর মদতে আগ্রায় একটি বর্বর নাটক ফের অভিনয় হবে। মুঘল শাহীর মতো দুনিয়া জোড়া খ্যাতি যে শাহীর তাকে এই বর্বরকাণ্ড আর মানায় না।

—খুলে বলবেন তো।

—আবার কোনও গরিব কৌতূহলবশে মুঘল হারেমের কোনও বাগে ধরা পড়েছে। কালই শাহী হুকুমে তার পা দু'খানা কেটে ফেলা হবে। তারপর তাকে নেকড়ের খাঁচায় খাবার হিসেবে ফেলে দেওয়া হবে।

দারা কোনওক্রমে বলতে পারলেন, উঃ!

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বললেন, আকবর বাদশার আমল থেকে কালকেরটা ধরলে এমন ঘটনা ঘটবে মোট সাতষট্টিবার।

শাহজাদা বললেন, আমি তো ভেবেই পাই না—পরদাদা সাহেব আকবর বাদশার আমলে এমন নৃশংস ব্যাপারের শুরুয়াত হয়েছিল কী করে? তিনি তো বাদশা হিসেবে ছিলেন একদম অন্য ধরনের মানুষ।

জগন্নাথ বা সরস্বতী কেউই কোনও কথা বলতে পারলেন না। জগন্নাথ দক্ষিণে থাকতে শুনেছিলেন, গোয়ায় পর্তুগিজ শাসনে দিশি কোনও কালো মানুষ যদি কোনও সাদা মানুষকে আঘাত করে তো সেই কালো মানুষের হাত বা পা কেটে ফেলা হয়। পর্তুগিজদের কন্নাড়ি প্রজারা এর পরেও যে কী করে পর্তুগিজদের কাছে কাজ করে—ব্যবসা দেখে—মামলা-মকদ্দমার দেখাশুনো করে—তা ভেবে পান না পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ।

শাহজাদা দারা অস্ফুটে বললেন, দেখি কী করা যায়।

পরদিন দুপুরে শাহজাদা দারাশুকোকে দেখা গেল—আগ্রার সাবেক হারেমে। তিনি এখানে বিশেষ আসেননি। যেন বা একটা প্রকাণ্ড মাঠ—উঁচু দেওয়ালে ঘেরা—তার ভেতর একদল বেগমের জন্যে এক একটি মহল। দারা লক্ষ করলেন দু'তিনটি মহলের মাঝে একটি করে সুন্দর সাজানো বাগ—তার সঙ্গে একটি করে পরিচ্ছন্ন পুকুর। দারা ভেবে অবাক হলেন—সবরকম বেগম সমেত আকবর বাদশার পাঁচ হাজারের মতো বেগম ছিল। একটি মহলের দারোগা—সেও আওরত, শাহজাদাকে দেখে ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করল। তারপর খুব মিঠে গলায় বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

শাহজাদা কিছুই চেনেন না। দারোগা তাঁকে একটি মহলে নিয়ে এল। সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিয়েই দারোগা ফের কুর্নিশ করে বলল, আলিজা! যদি দরকার হয়—এই রেশমি ডোরি টানবেন। ঘণ্টি শুনতে পেলেই আমি আপনার খিদমতে ছুটে আসব।

পলকে দারোগাটি মিলিয়ে যেতেই শাহজাদা দেখলেন—বিশাল সাজানো অলিন্দে তিনি শুধু একা। আর নানা দেশের নানান সাজের মেয়েরা তাঁকে দেখে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে। সবাই খুব সুন্দরী। কারও বয়স হলেও বেশ সুঠাম। হাসি থেকে দাঁড়ানো—রীতিমত মাপা। ছোটবেলায় মক্তবে দারাকে মালফুজাত-ই-তৈমুরা পড়তে হয়েছিল। তাতে এক জায়গায় কিশোর দারা

পড়েছিলেন—শাহী কাজে বাদশা যতটা সময় দেবেন—ঠিক ততটাই সময় দেবেন হারেমে। কেননা, শাহীর কাজে কাটানো সময়ের পাশাপাশি সমান জরুরি এই হারেমে কাটানো সময়। কারণ, হারেমেই একটি শাহীর যা কিছু ভাল—তাই জমা থাকে—তার সমৃদ্ধি ঘটে। তৈমুরের বিধানে এভাবে হারেমের কথা ছিল।

যতটা বিরক্তি আর নফরতি নিয়ে শাহজাদা দারা হারেমে এসেছিলেন—তার অনেকটা কেটে যেতে দারা নিজেই অবাক হলেন। তাঁর চোখের সামনে যোধাবাঈ মহল—খালি পড়ে আছে। দারা জানেন, আকবর বাদশার সঙ্গে যখন যোধাবাঈয়ের দেখা হয়—তখন রাজা বিহারীমলের এই মেয়েটির বয়স ছিল মাত্র সতেরো। তিনি আমার দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার আম্মিজান। তাঁর স্বামীর —আকবর বাদশার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে—ঈদের দিন তিনি নিজের খরচে কামরূপ থেকে কান্দাহার পর্যন্ত সারা হিন্দুস্থানের গরিব মানুষজনকে খাইয়েছিলেন।

দারার মন যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল—যখন তাঁর মনে পড়ল, বাদশার আনন্দের জন্যে বন্ধু রাজারা বাদশাকে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে পাঠিয়ে থাকে। শুধু হিন্দুস্থানের ওপারেই নয়—স্পেন, পর্তুগাল, তুর্কিস্থান থেকে বিদেশী বণিকরা সুন্দর দেখতে মেয়েদের বাদশার মবারকে নজরানা হিসেবে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। শাহজাদা জানেন, তাদের ধর্ম আর জাতি বিচার করে আলাদা মহলে থাকার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আগে আব্বা হুজুর শাহজাহান বাদশা এদের সঙ্গে তিনমাসে অন্তত একবার নিয়ম করে খেতে বসতেন। এ রেওয়াজ নাকি সেই পরদাদা সাহেবের আমলের। বিদেশিনীদের সঙ্গে একবার খেতে বসেই আকবর বাদশা স্পেনের লাল মদের প্রেমে পড়ে যান।

পাহারার অনেকগুলো চৌকি পেরিয়ে তবে শাহজাদাকে এখানে আসতে হয়েছে। তিনি এমন ভাব দেখিয়েছেন—যেন হারেম কেমন চলছে তাই দেখতে তাঁর এই আসা। দেওয়ানখানার নথি থেকেই জানা যায় দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার বাইশ বছরের শাহীতে সাতচল্লিশজন হারেমে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাদের ভেতর একুশ জনই শাহীর পহেলা কেতার ওমরাহ। সবারই পা কেটে নিয়ে বাকি শরীর খাবার হিসেবে নেকড়েদের দেওয়া হয়েছে। এক ওমরাহ মুলুকে-মালিকা নূরজাহান বেগমের মহলে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁকে নেকড়ের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়নি। টুকরো টুকরো করে তাঁকে কাটা হয়েছিল।

দারা হাঁটছিলেন আর ভাবছিলেন—এ এক অদ্ভুত জগৎ। বেগম, শাহজাদী, কসবি, নাচের মেয়ে, বাঁদি, বাছাই সুন্দরী—সবাই এক জায়গায় আলাদা আলাদা মহলে থাকে। দিল্লির সুলতানদের বড় হারেম ছিল। সেই নমুনা আকবর বাদশার চোখের সামনে ছিল। হারেমের আয়তন বুঝিয়ে দেয়—বাদশার গুরুত্ব —বাদশার শাহী কত বড়। এই ব্যাপারটা—দারার মনে হল—আকবর বাদশার মাথায় ছিল। তাই আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি পড়ে বোঝা যায়—আকবর বাদশা হারেমকে শাহীর আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ভেতর একটি প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করতেন। নয়তো এমন এলাহি ব্যবস্থা হয় কী করে? এখানে বাদশা যেমন

সবার ওপরে—তেমনই তিনি এখানে একজন অতিথিও বটে।

এই হারেম থেকেই নূরজাহান খেলাধুলো, গানবাজনা, রুবাই লেখায় উৎসাহ জুগিয়েছেন একসময়। এখান থেকেই তিনি এতিমখানায় অনাথদের তোফা পাঠাতেন। এখানে এসেই তিনি ফৌজদারি থেকে বাদশা-বেগম হয়ে উঠেছিলেন। আমার আম্মিজান এখানকারই। তিনি একসময় কবিতাও লিখেছেন। এখানে কোনও দুঃখ থাকার কথা নয়। এখানে চিরবসন্ত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইরানি, তুরানি, পর্তুগিজ—ইউরোপের নানা দেশের সুন্দরীরা এখানে থাকে। হিন্দু রাজপুত মেয়েদের বিয়ে করে আনা শুরু করেছিলেন আকবর বাদশা। এখানে নাচ, গান কোনও ধর্মের বাঁধনে বাঁধা নেই। এখানে বেগমরা তাদের নিজের মতো করে মন্দির, মসজিদ, বাগ বানিয়েছে। পোশাক, আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, ভাষার সূক্ষ্ম দিকগুলোর জন্ম তো এখানেই।

শাহজাদা দারা আজই সকালে আগ্রা দুর্গে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছেন, হারেমে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়া মানুষটিকে নেকড়ের মুখ থেকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না। সারা আগ্রা এই বর্বর কাণ্ডটি চাক্ষুষ দেখার জন্যে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। এসব দেখার জন্যে দেহাত থেকে মানুষ এসে যমুনার গায়ে সংসার পেতে রান্নাবান্না চাপিয়েছে। তিনি এসে পৌঁছবার আগেই সেই বদনসিবের পা দুখানি ভোরবেলা কাটা হয়ে গেছে।

শাহজাদার মনে হল, তিনি ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর জোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হারেমে আসার আগে তাঁকে খোজাদের পাহারা পেরিয়ে রাজপুত হপ্তচৌকির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই পাহারার কাজ পাওয়া শাহীর হিসেবে খুবই সম্মানের। একজন রাজপুত মনসবদার এখন পাহারার সবটা দেখছেন। তাঁরই লোকজন সেই বদনসিবকে দেওয়াল টপকাবার সময় ধরেছে।

হঠাৎ শাহজাদা দেখলেন, তাঁর সামনে বছর সতেরো আঠারোর একজন বিদেশি নাচিয়ে মেয়ে—কিংবা বাঁদি, দারা ঠিক বুঝতে পারছেন না—হাসিমুখে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। খুব সুন্দরী মেয়েটি। মাথার চুল সোনালি। চোখ দুটি নীল। মুখখানি নিষ্পাপ। তার গায়ে মসলিনের পোশাক। তবে বিদেশি ঢঙের। হাত পা যা বেরিয়ে আছে তাতে পেকে যাওয়া গমের রঙে সফেদির মিশেল।

শাহজাদা জানতে চাইলেন, তোমার দেশ কোথায়?

মেয়েটি ঝুঁকে তসলিম জানিয়ে ভাঙা ভাঙা ফারসিতে বলল, জর্জিয়া।

দারা জানেন জর্জিয়া কোথায়। তবু বললেন, সে কোথায়?

মেয়েটি মাথার সোনালি চুলের ঢালে ঝাঁকুনি দিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে আগ্রার উত্তরদিকে দেখল।

শাহজাদার অবাক লাগল, কত দূর দেশ থেকে চিরকালের মতো চলে আসতে হয়েছে মেয়েটিকে। কোনওদিনই আর তার রিস্তেদারদের—মা, বাবা, ভাইবোন, পড়শিদের সঙ্গে দেখা হবে না। হিন্দুস্থান তো ওর কাছে অজানা জায়গা। ফারসি, উর্দু—কোনওটাই এখনও রপ্ত হয়নি। সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। তবু

ওর নিষ্পাপ হাসিতে সেই উদ্বেগের কোনও ছায়া পড়েনি।

দারা বললেন, তুমি কি জানো—তোমাদের দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে আজ এক বদনসিবকে নেকড়ের মুখে প্রাণ দিতে হবে।

দারা থেমে থেমেই সরল ফারসিতে কথাগুলো বললেন—যাতে মেয়েটি বুঝতে পারে।

আবার সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে মেয়েটি বলল, জানি।

—কী করে জানলে ?

—ওই নওজওয়ান মুর বণিক তো আমাকে দেখতে এসেই ধরা পড়েছে।

—তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল ?

—নাঃ ! তবে আমাকে যখন খাইবার দিয়ে আনা হয়—তখন ওই ঘোড়া ব্যাপারী আমাকে দেখেছিল কাফেলার ভেতর। আমাকে কিনতেও চেয়েছিল। আমার তখনকার মালিক রাজি হননি।

—কেন ?

—জর্জিয়ার সবচেয়ে বড় কার্পেট ব্যাপারী আমায় সংগ্রহ করেছিলেন——হিন্দুস্থানের বাদশাকে নজরানা দেবেন বলে। আমাকে কেনার মুরদই নেই ওই নওজওয়ানের।

—কেন ? কত দামে কার্পেট ব্যাপারী তোমায় কিনেছিলেন ?

জর্জিয়ার মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর একদম চুপ করে গিয়ে বলল, আপনি তো শাহজাদা ?

দারা আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—তাহলে বুঝুন। হিন্দুস্থানের বাদশার জন্যে নজরানা কি কেনা যায়। আমি যে আনমোল।

এই 'আনমোল' কথাটি বলার সময় মেয়েটির চিবুকের বাঁ পাশে একটু টোল পড়ে মুছে গেল। মেয়েটি জানে, সে অমূল্য। শাহজাদার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। তিনি বললেন, তোমায় দেখতে এসে ধরা পড়ে সেই বদনসিব মুর নওজওয়ানের দু'খানি পা হারাতে হয়েছে আজ ভোর রাতে।

—জানি। তাই-ই তো নিয়ম।

—জানতে পেরে তোমার কেমন লাগছে ?

—খুব ভাল।

শাহজাদা চমকে উঠলেন। কেন ?

—বাঃ ! আমার জন্যে একজন তার দামি দু'খানা পা হারাল। তাকে যখন নেকড়েরা খাবে—তখন তা দেখতে সারা আগ্রা ভেঙে পড়বে। এ কি কম কথা শাহজাদা। ক'জনের নসিবে এমন ঘটে ?

শাহজাদার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, তাই ?

সমান শান্তভাবে মেয়েটি বলল, আমি যে আনমোল !

সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদার মাথা ঘুরে গেল। তিনি জানতেও পারলেন না—তিনি পড়ে গেছেন। মেয়েটি ছুটে এসে ধরে না ফেললে শাহজাদা সিধে মেঝেতে গিয়ে

পড়তেন। মহলের অন্য বাঁদিরা ছুটে এল। ছুটে এল খোজারা।

শাহজাদার জ্ঞান ফিরে এল সন্ধের মুখে মুখে। গরমের সন্ধেরাত। সারা ঘরে গুগগুলের সুবাসের সঙ্গে জল ছড়ানো বেলির গন্ধ মিশে গিয়ে সে এক আশ্চর্য খুশবু বাতাসে। চোখে চেয়ে দারা বুঝলেন তিনি জর্জিয়ার সেই সোনালি চুল ঝাঁকানো—সুন্দরী, নিষ্পাপ মুখশ্রীর নিষ্ঠুর মেয়েটির অতিথি। চোখ চাইলে আগ্রার আকাশে চাঁদ। এতক্ষণে সেই নওজওয়ান মুর নিচেয় সাবাড় হয়ে গেছে। রাজধানী আগ্রারও নিশ্চয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। আমি এ কোন দুনিয়ায় ঈশ্বর ঈশ্বর করছি! ঈশ্বরকে বুঝতে—ভাবতে—হৃদয়ের ভেতর নিতে মানুষের হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। বদনসিব মুর নওজওয়ানের মনে এই জর্জিয়ানিকে দেখার জন্যে সবটাই কি ছিল চোখের নেশা? না, জওয়ান বয়স ভেবে ভেবে কল্পনার আগুনে জ্বলে গিয়ে ভালবাসায় পড়া? এখন তা জানারও উপায় নেই কোনও। নেকড়েরা তাকে নিশ্চয় আদর করে খেয়েছে। ভালবাসা তো ঈশ্বরের কাছাকাছি জিনিস। মেয়েটি তার কিছুই বুঝল না। ভালবাসার স্বাদ কেমন তাও জানল না।

শাহজাদা চোখ তুলে দেখলেন, হাঁটু অব্দি আঁটোসাঁটো ঘাগরা পরে মেয়েটি এখন পাকা হাতে একা একা কিঙ্গিনা বাজাচ্ছে। মুখে চাপা হাসি। মাথার সোনালি চুলগুলো দু'কাঁধে। ডান হাতের আঙুলে নীলা বসানো আঙটিতে ঘরের আলো ঠিকরে পড়ছে। একখানি চীনা মাটির উঁচু-কানাত বোঝাই দিয়ে কাবুলের পিচ ফলের স্তূপ।

দারাকে চোখ চাইতে দেখে জর্জিয়ানি এগিয়ে এল। আসা মানে এক দমক খুশবু। সেই সঙ্গে নীল চোখ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওঠাপড়া। দারা নিজেকে বললেন, এই মেয়ে তার নিজের দাম নিয়ে ভাবে! নিজেকে অমূল্য ভাবে! এই সুন্দর গড়নের ভেতর অসম্ভব নিষ্ঠুর একখানা পাথর বসানো রয়েছে।

মেয়েটি বলল, আলিজা! আপনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। —বলতে বলতে ঘুম পাড়ানো খুব তীব্র একটা গন্ধ শাহজাদার নাকের সামনে ধরল। জ্ঞান হারাতে হারাতে দারার একই সঙ্গে দুটি জিনিস মনে এল। এক: গন্ধটা মেয়েটির হাতের কোনও সবুজ পাতা থেকে এল। দুই: ঈশ্বরসন্ধানী হতে মানুষের যদি হাজার হাজার বছর লেগে থাকে—তাহলে মুর ঘোড়া ব্যাপারীকে ওভাবে নেকড়ের খাবার বানানো ছাড়তে মানুষের কত হাজার বছর লাগবে? ফের বেহুঁশ হতে হতে এসব ভাবনার—আবিষ্কারের—জিজ্ঞাসার খোঁচাগুলো শাহজাদার ভেতর আস্তে আস্তে নরম হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে পেলেন শাহজাদা মাঝরাতে। তখন তিনি মনে করতে পারলেন না কোথায় আছেন। অভ্যেস বশে অস্ফুটে ডাকলেন, নাদিরা—

তাঁকে ঘিরে দু'হাতের বাঁধন কিছু আলগা হল। আমি শ্বেতলানা—হজরত।

দারা উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। দেখলেন তাঁর সারা শরীর জড়িয়ে মেয়েটি শুয়ে। সে শরীরের একটা আলাদা আহ্বান। ততটা নিষ্ঠুরও

লাগছে না ওকে। ঘরের মৃদু আলোয় নিজের গায়ে তিনি যমুনার সাদা বালির মতোই আলাদা হয়ে জেগে থাকা একখানি পা দেখতে পেলেন। তাতে সারা দুনিয়ার ইচ্ছা স্তব্ধ হয়ে আছে।

শ্বেতলানা নাদিরা নয়। নাদিরা ভীরু—অভিজাত। শ্বেতলানা রানাদিল নয়। পোড় খাওয়া রানাদিল বেপরোয়া। শ্বেতলানাও পোড় খেয়েছে—কিন্তু ভীরু নয়। নাদিরাও পোড় খেয়েছেন। তবে তাঁর শান্ত হাবেভাবে তিনি অভিজাত। শ্বেতলানা পোড় খেয়েও—স্নিগ্ধ। দারা দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ভোররাতে শ্বেতলানা একা একা কাঁদছিল। শাহাজাদা তখনও ঘুমিয়ে। শ্বেতলানার খেয়াল ছিল না—সে একই পালঙ্কে একজন মুঘল শাহজাদার সঙ্গে শুয়ে আছে। শাহজাদা আজ রাতে তার অতিথি। মেহমানের সুখ-শান্তির দেখভাল তারই হাতে। কেঁপে কেঁপে কাঁদছিল শ্বেতলানা। তাতে দারার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বিরক্ত হয়ে দেখলেন, শ্বেতলানা কাঁদছে। জানতে চাইলেন, কী হয়েছে?

শ্বেতলানা সাবধান হয়ে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, কিছু নয় হজরত।

—উঁহু। তুমি কাঁদছিলে। কী হয়েছে?

—কিচ্ছু না। এমনই।

—তোমায় বলতেই হবে—

শ্বেতলানা বলল, আমি কোনওদিন কোনও মুঘলকে এত কাছ থেকে দেখিনি।

অবাক হলেন দারা। বুঝলেন, শ্বেতলানা বেশিদিন এখানে আসেনি। এসে থাকলে রেওয়াজ মাফিক এতদিনে শাহী দস্তরখানায় খানাপিনার সময় বাদশার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যেত। তিনি জানতে চাইলেন, কতদিন হল এসেছ—?

—তা দু'সন তো হবেই।

—দুই সন?—আরও বেশি অবাক হলেন দারা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একথাও মনে পড়ল, বাদশা বেশ কয়েক বছর এদিকেই ঘেঁষেন না। তার ওপর তিনি ব্যস্ত হয়ে আছেন বলখ, বদকশান, কান্দাহার, লালকিল্লা, জামা মসজিদ, তাজমহল নিয়ে। মুখে বললেন, আমার আগে কোনও মুঘলকে তুমি কাছ থেকে দেখোনি?

—না হজরত। মায়ের মুখে গল্পে শুনেছি মুঘলদের। আমি তিবলিসির মেয়ে। শিয় দরিয়ার জল আমাদের গাঁয়ের গা দিয়ে বয়ে গেছে। শীতে সে জল বরফ-পাথর হয়ে যায়। তার ওপর দিয়ে তখন জঙ্গলের বুনো ভালুক নেমে আসে। শুয়ে শুয়ে ভয় পেতাম। তখন মা আমাকে মুঘল শাহজাদার গল্প বলত—

—কী বলত?

—তাঁদের জানবাজি—তাঁদের দিলদরিয়া স্বভাব—খুব সুন্দর চেহারা, দয়ামায়া আর হিরে জহরতের কহানি। হিন্দুস্থানের নদী—পাহাড়ের কথা—দুর্গ আর বাদশার অন্দরমহলের শান-সওকতের কথা—

শ্বেতলানার গলায় দয়া, জানবাজি, দিলদরিয়া—কথা তিনটি বাঁকানো বঁড়শির

মুখ হয়ে শাহজাদার বুকে বিঁধে গেল। সেখান থেকে যেন রক্ত পড়তে লাগল। লজ্জায় অনুতাপে। দারার মনে হল—ভিনদেশি সব মেয়ে কড়া পাহারায় হারেমের খোঁয়াড়ে রেখে কী আশ্চর্য দিলদারি, দয়া, জানবাজিই না দেখাচ্ছি আমরা—মুঘলরা!

—মায়ের মুখের কহানির সঙ্গে কিছুই মেলেনি তো! তাই কাঁদছ?

—না আলমপনা। একজন মুঘল এত ভাল?—এত সুন্দর—?—আমি জানতাম না। সেই রূপকথার এক মুঘলের সঙ্গে আমি এই প্রথম থাকলাম—সেই আনন্দে আমি কাঁদছিলাম।

শাহজাদা মনে মনে অবাক হয়ে বললেন, আনন্দে?

শ্বেতলানা চাপা গলায় বলল, আহা! আমার মা এসবের কিছু জানল না। তার মেয়ের খুশনসিবি দেখতেই পেল না। আফসোস।

শ্বেতলানা যতই ভাল ভাল কথা বলে—দারা দেখলেন—ততই বিবেকের কামড়ে তাঁর হাত পা গুটিয়ে আসছে। তিনি মেয়েটিকে আর ছুঁতেও পারছেন না। মালফুজাত-ই-তৈমুরায় তৈমুরের বিধানগুলোকে একসময় শাহজাদার মনে হত—বিধানের বয়ানেই তৈমুরের কত না দূরদৃষ্টি মিশে আছে। এখন সেই বিধানগুলোকেই দারার মনে হয়—মানুষের ইনসানিয়াতির ওপর পাথর চাপিয়ে দেবার জন্যেই এসব বিধান। কী করে ক্ষমতার লম্বা হাত যুগের পর যুগ বাড়িয়েই রাখা যায়—তাগদের যাঁতাকলকে শাহী নাম দিয়ে তার নির্যাতনের—লাঞ্ছনার যন্ত্রটিকে ভদ্রস্থ করা যায়—সেজন্যে বাদশা নামে একটি কিম্ভূত জিনিসের দুপাশে ফৌজ আর মসজিদ রেখে তাতে রূপকথার ময়াম মাখানো হয়েছে গত সোয়াশো বছর ধরে। তারই নাম মুঘলশাহী। রূপকথার কাজল পরা চোখে শ্বেতলানা এসব কিছুই দেখতে পায় না! পেয়ার—ইনসানিয়াতি—কোনওটাই সে টের পায় না। তাই ভালবাসতে গিয়ে মুর নওজওয়ান সাবাড় হলে সে আনমোল হয়ে যায়। নিষ্পাপ মুখে আনমোল কথাটি বলার সময় তার চিবুকের বাঁ দিকে একটি টোল পড়ে মাত্র। সে জানেও না—সে নিষ্ঠুর।

ভোর হয়ে আসছিল। রাজধানীর সরাইখানাগুলো এখন মাখন-মিছরি সাজিয়ে রাখবে মুসাফিরদের জন্যে। শাহীর যাঁতাকলে আরেকটি নতুন দিনের আলো এসে পড়বে! শাহজাদা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি এবার যাব।

—যাবেন? আবার কখন আসবেন হজরত?

—জানি না।

শ্বেতলানা কুঁকড়ে গেল। খুব মৃদু গলায় বলল, আমার কোনও ভুল হয়ে থাকলে শুধরে নেব আলমপনা। আমি যে অনেক কিছু জানি না।

—না না। কোনও ভুল হয়নি তোমার।

—হজরতের আনন্দের জন্যে আমি কিঙ্গিনা বাজিয়ে নাচতে পারি—গাইতেও পারি। কিন্তু সে সুযোগ তো পেলাম না। আপনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আফসোস থেকে গেল।

শাহজাদা যাবেন বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। শ্বেতলানা জানতে চাইল, আপনি

আনন্দ পেয়েছেন আলমপনা ?

চমকে উঠলেন দারা। তিনি চিঠি লিখতে গিয়ে চিঠির ওপর লিখে থাকেন —সচ্চিদানন্দ। এখন সে কথাটা তাঁর কাছে বিরাট একটা ঠাট্টা হয়ে দেখা দিল। সৎ। চিৎ। আনন্দ। সে চিত্ত কোথায় আমার ? মনে মনে এসব কথা নেড়ে দারা বললেন, তুমি আজ ভোরে আমার চিত্তে একটা উদয় জাগিয়ে দিলে শ্বেতলানা।

মেয়েটি একথার কিছুই বুঝল না। সে তাকিয়ে থাকল শুধু। হারেম থেকে বেরিয়ে দারা দেখলেন, যমুনার তীর ঘেঁষে ভাঙা হাঁড়ি-কুঁড়ি, ভেঙে দেওয়া কুঁজির গুটি, ব্যবহার করা পদ্মপাতা। কাল যারা নেকড়ের মুখে মুর নওজওয়ানের মরে যাওয়ার মজা দেখতে এসেছিল—তারা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করেছে।

ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্বেতলানা। ভাল করে রোদ উঠতেই হারেমের দারোগা এসে তার ঘুম ভাঙাল। এই আওরত-দারোগার রুঠো ভাবকে বড় ভয় পায় শ্বেতলানা।

দারোগা কিন্তু খুব মোলায়েম করে হেসে বলল, ওঠো। তোমার জন্যে খলিফা এসে বসে আছে।

—খলিফা ?

—হ্যাঁ। তোমার পোশাকের মাপ নেবে। এসব পোশাক তো আর চলবে না।

—কেন ?

—বাঃ। কে এসেছিলেন ? মনে নেই ! হয়তো ইনিই হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা।

শ্বেতলানা উঠে বসল। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

কাজের তাড়ায় দারোগা বসতে পারল না। যাবার সময় ফের মোলায়েম করে বলল, ওঠো—ও। আজ থেকে আরও বড় মহলে থাকবে তুমি। এ মহল আর মানায় না তোমায়—

—কেন ?

খুব হেসে যাবার সময় দারোগা বলল, ওমা। তাও জান না ? বিকেলে জহুরি আসবে কিন্তু।

॥ উননব্বই ॥

আগ্রা আর জাহানাবাদের ফৌজি রসদ জোগানদাররাই রেষারেষি করে চার শাহজাদার ভেতর যেটুকু বা ভাব-ভালবাসা ছিল তা লোভের গরম হাওয়ায় নিমেষে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিল। শাহজাহান বাদশা শাহী কাণ্ডকারখানায় শান্তি বজায় রাখতে শাহজাদাদের সুবায় সুবায় সুবেদারি দিয়ে তাগদ আর আয়েশের বিলি ব্যবস্থা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এক এক শাহজাদা এক এক সুবায় সর্বেসর্বা থেকে আরামে, আনন্দে, ক্ষমতায় ডুবে থাকবে। তাহলে হিন্দুস্থানের মসনদে তিনি নিজে স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।

কিন্তু ফৌজি রসদ জোগানদাররাই গোলমালটা পাকাল।

শাহজাদাদের ভেতর সবার আগে সুজা মনসব পেলেও আস্তে আস্তে দেখা গেল শাহজাদা দারার জাত তিরিশ হাজারে এসে ঠেকেছে। সেই সঙ্গে ঘোড়সওয়ারও দারার বেড়ে বেড়ে যা দাঁড়াল তা দুই শাহজাদা সুজা আর আওরংগজেবের সওয়ার যোগ দিয়ে একুনে সেখানে পেঁছিয় না। গোলা-বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র, সেপাইদের গেঁহু-চানা, জানোয়ারদের দানাপানি, মশাল জ্বালানোর চর্বি, কামানের গাড়ির চাকার তেল—সবই ফৌজি রসদ জোগানদাররা জুগিয়ে যায়। সওয়ার সবার চেয়ে বেশি বলে ওসব জিনিস দারার ফৌজকেই জোগাতে হয় সবচেয়ে বেশি।

সুজা, আওরংগজেব, মুরাদও তাঁদের ফৌজ অনুযায়ী ওসবের জোগান পেয়ে থাকেন। আগ্রা বা জাহানাবাদের যেসব শেঠ ওসব জুগিয়ে থাকে তারা শাহজাদাদের খুব মেজাজে রাখতে নিয়মিত তোলা, ভেট, নজরানা পাঠিয়ে থাকে। তাহলে খারাপ গেঁহু বা জানোয়ারদের জন্যে ওঁচা বজরা জোগানে পার করিয়ে দিতে যেমন অসুবিধে হয় না—তেমনই অসুবিধে হয় না দেওয়ানখানা থেকে এসব জিনিসের ফাঁপানো দাম বের করে নিতে।

সেই সব শেঠই তোফা দিতে গিয়ে তিন শাহজাদা—সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদকে বলতে লাগল—তোফা যায় তো শাহজাদা দারার মবারকে। যেমনই বড় ফৌজ তেমনই তার শান। শাহজাদা দারার ঘোড়সওয়ার কত বেশি। জাতও তো তিরিশ হাজার।

সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ—হিন্দুস্থানের তিন প্রান্তে যে যাঁর সুবার সদরে বসে শেঠদের তোফা—তা সে নগদ আশরফিই হোক কিংবা ভেট হিসেবে দুটি আর্মানি নওজওয়ান বাঁদি নয়তো নজরানা হিসেবে এক জোড়া তরতাজা আরবি ঘোড়াই পেয়ে থাকুন—সবাই ভাবতে বসেন না জানি বড়ে ভাই শাহজাদা দারা এসবের চেয়েও আরও কত ভাল তোফা পাচ্ছেন! কেননা তাঁরই তো সওয়ার সবচেয়ে বেশি। তাঁরই ফৌজের তো সবচেয়ে বেশি রসদ লাগে।

ঠিক এই সময় শাহজাদা দারাকে গুজরাতের বদলে মুলতান আর কাবুলের সুবেদারি দিলেন বাদশা। আকবর শাহীর আমলে কাশ্মীর, কান্দাহার কাবুল সুবার ভেতরে ছিল। শাহজাহান বাদশা হয়েই কাশ্মীরকে আলাদা সুবা করে দিয়েছেন। কান্দাহার হারানোর পর তিনি কাবুল, গজনী, পেশাওয়ার, সওয়াত আর বন্নু জিলা নিয়ে সুবে কাবুল বহাল রেখেছেন।

বলা যায়—এটা শাহজাদা দারার পক্ষে ইজফাই বটে। ফলে আর কেউ না হোক শাহজাদা আওরংগজেবের বুকের ভেতর কে যেন আস্ত একটা গোলা বসিয়ে দিল—যে গোলা এখনও ফাটেনি। একদিন বুক চৌচির করে ফাটবে।

দুই সুবার সুবেদার করেই বাদশা শাহজাহান শাহজাদা দারাকে ডেকে পাঠালেন। জরুরি তলব। দারা জানেন, আব্বা হুজুর তাঁকে চোখে হারান। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের এই সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর বয়সে পেঁছে বুঝতে পারেন—হিন্দুস্থানের বাদশা তাঁর পহেলা শাহজাদাকে তাঁর নিজের মতো করেই

ভালবাসতে চান। তার মানে তিনি দারাকে যেমনটি দেখতে চান—দারা তেমনটি হলেই তবে বাদশার ভালবাসার ছাঁচে মেলে—ভালবাসতেও সুবিধা হয়।

বাদশা চান—দারা হোন জবরদস্ত সুবেদার। ফকির দরবেশ, কবি-পাগলদের সঙ্গ করছে করুন—কিন্তু শাহী দরবারে জং-কি-ময়দানে দারাকে হতে হবে দস্তুরমত লড়াকু—দরকারে দুশমনকে উৎখাত করতে তিনি যেন পিছপাও না হন। আল্লাতালার করুণার জন্যে তিনি ধ্যান করতে পারেন—কিন্তু শাহী কাজে গাফিলতি করে তিনি যেন নসিব খারাপ না করেন। তার মানে মুঘল বলতে যা বোঝায় তা তাঁকে থাকতেই হবে। তার ফাঁকে ফাঁকে দরবেশ-পাগল নিয়ে যতটা মাতোয়ারা হওয়া যায়—তা হোন—তাতে বাদশার কোনও আপত্তি নেই।

শাহজাদা দারা মনে করেন—আমি একজন পূর্ণ মানুষ। কামিল ইনসান। নিশুতি রাতে তাঁর মনে হয় তারার ভারে এই বুঝি আসমান ভেঙে পড়ল। তাঁর ভেতরে সবসময় কী এক আনন্দের সঙ্গে অজানা ব্যথা মাখানো থাকে। আমি আব্বা হুজুরকে ভালবাসি। কিন্তু তাঁর ভালবাসার ছাঁচে পড়ে তাঁর মনোমত হতে ভালবাসি না।

শাহী তলব পাওয়ার সময় শাহজাদা দারা তাঁর মনের মানুষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জায়গাটি লাহোরের শহরতলি। সময়—বসন্ত শেষে বর্ষার শুরু। সকালবেলা। দারা অনেক পথ ভেঙে শাহ মুহম্মদ দিলরুবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অতি সজ্জন মানুষ। নিজেকে সবসময় এক কোণে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর ইচ্ছে নয় যে লোকে তাঁকে জানুক। দারা দেখলেন শাহ দিলরুবা একখানি সাদা কাপড়ে তাঁর নিজের মুখ ঢেকে রেখেছেন।

পেশাওয়ার যাবার রাস্তায় লাহোরের এক প্রান্তে এক সামান্য কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শাহজাদা দারাশুকো। তাঁর বড় ইচ্ছে, তিনি শাহ দিলরুবার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু দিলরুবা তাঁর মুখ দেখাবেন না—কথাও বলবেন না।

তখন দারা বললেন, দয়া আর ভক্তি দিয়ে আপনার মন তৈরি। আমি হিন্দুস্থানের বাদশার জরুরি তলব পেয়ে জাহানাবাদ চলেছি। ভেবেছিলাম, পথে আপনার দেখা পাব। কথা বলব।

শাহ দিলরুবা একটি পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। তিনি দারাকে বললেন, আমি চাই না লোকে আমার মুখ দেখুক।

দারা বললেন, আমি আগ্রা বা লাহোর যেখানেই থাকি না কেন আমার হৃদয় আপনার সঙ্গে বাঁধা থাকে। আপনি আমার দরবারে এলে আমি কৃতার্থ হব। আমার খুব ইচ্ছে আপনার কাছে আসি। যদি সম্ভব হত তাহলে মাথা দিয়ে হেঁটে আপনার এই পবিত্র কুটিরে হাজির হতাম।

শাহ দিলরুবা কোনও জবাব দিলেন না। দারা বললেন, আপনার মুখ দেখলে মানুষ ধন্য হবে। পবিত্র হবে।

বরফ যেন গলল। দিলরুবা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। যাদের মনে করব সত্যিকারের ভক্তপ্রাণ—তাদের কাছেই নিজের মুখ খোলা রাখব—অন্যদের কাছে নয়।

শাহজাদা দারা এই সময় একটি লেখা নিয়ে মেতে আছেন। তা হল ভক্তিতে আচ্ছন্ন দশাগুলি কেমন—কী কী অবস্থা হয় তখন—ধাপগুলো যেমন—তাই-ই লিখছিলেন তিনি। এই তরিয়ত-উল-হকিকত খানিকটা গদ্যে লিখেছেন তিনি। এখন দেখছেন—প্রায়ই কবিতা এসে যাচ্ছে। আবেগ যেন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। লেখার ভেতর ঘন ঘন রুবাই, বয়েত এসে যাচ্ছে। শুরু করেছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লার শক্তির কথা দিয়ে। আজই খুব ভোরে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান এই মহানের যশ বা দীপ্তির কেন্দ্রবিন্দুতে কোনওদিনই পৌঁছতে পারে না। যা কিছু দেখছি সবই ঈশ্বর। মন্দির, মসজিদ, গির্জায়—সব জায়গায় একই ঈশ্বর।

শাহ দিলরুবাকে কদমবোসি করে ভরাট মনে শাহজাদা দারা তাঁর হাতিতে উঠলেন। আগু-পিছু ঘোড়সওয়ারদের পাহারার ভেতর হাতি আগ্রার দিকে পা ফেলল। যাবে জাহানাবাদ। হাতির পিঠে গাদেলায় বসে মনের ভেতর ফুটে ওঠা এক রুবাইয়ের পদধ্বনি শুনতে পেলেন শাহজাদা।

পীর, পণ্ডিত, মুর্খ, পাপী প্রতি দেহে তুমি একই খোদা।
আছ মিশে সুরারও সাথে, শুধু অমৃতে নয়।
তুমি কাবাতে আছ, তেমনই সোমনাথে
সেই তুমি রয়েছ মদ্যপের আস্তাকুঁড়ে
মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছ তুমি
মূর্তি তো তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।
তোমাকে যে ভালবাসে কখনও তাকে পাঠাও জহন্নামের কাছে।
আবার কখনও বা খুলে ফেল মুখের আবরণ
কোনও মুসার কাছে সিনাই পাহাড়ে।

আমি হিসারের ফৌজদার। সরকার কোয়েলের—রাহদার। সুবা এলাহাবাদ, সুবা গুজরাতের সুবেদারি করেছি। করেছি পাঞ্জাবের সুবেদারি। এখন দুই সুবা—মুলতান আর কাবুলের সুবেদার আমি। আমার জাত বেড়ে হয়েছে তিরিশ হাজার। কিন্তু এই সবই এই মাটির ওপর খেলাধুলো মাত্র। কিছুই থাকার নয়। থাকে শুধু রহমানি। বিসমিল্লাহ রহমানে রহিম। এই যে শাহী সড়ক—তার গায়ে দুনিয়া পয়দা হওয়ার সময়কার পাথরের চাঙ পড়ে আছে। কত তাগদ, জৌলুস—এল। গেল। পাথর রয়ে গেছে। এটাই খোদার কারিগরির কেরামতি। এখন বর্ষার শুরু। এখন মেঘফাটা রোদে শাহী হাতির রুপোর গলঘণ্ট ঝিকমিক করে উঠছে। হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার লম্বা কাফেলা রঙিন পতাকা, সাজাগোজা ঘোড়সওয়ারের দল আর হাতির গদ্দি গড়ান চালে হাঁটার দরুন ফাঁকা প্রান্তরে আলাদা বিশাল এক মিছিলের চেহারা পেয়েছে। তাই দেখতে দেহাতি মানুষজন রাস্তার দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে।

শাহজাদা বুঝলেন, সবটাই যেন সাধারণ মানুষ থেকে শাহীকে আলাদা করে রাখার আয়োজন। এই দেহাতি মানুষদের আমি শাসন করি। ওরা আমায় ভয় পায়—ভক্তি করে। সরাসরি কথা বলতে গেলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে। কেননা

অভ্যাস নেই। ঈশ্বরের সঙ্গেও আমরা সরাসরি কথা বলতে চাই। কিন্তু অভ্যাস নেই। ভয় পাই। ভক্তি করি।

এই লেখায় আমি খোদার বন্দনা করেছি। তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই আমি। আমি তাঁকে ভয় করি না—তাঁকে ভালবাসি। ভক্তি করি। বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞরা নিশ্চয় বুঝবেন—সত্যের দূত সেই মহান দিশারী আমার কল্পনার আরশিতে ছায়া ফেলে আমায় জাগিয়ে তুলেছেন। এই অবস্থায় আমার দর্শন ফুটে উঠবেই। তাই এই লেখার নাম দিয়েছি তরিয়ত-উল-হকিকত।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে শাহজাদা দিগন্তে তাকালেন। দূরে দূরে দেহাতি গাঁয়ের আভাস। কী এক বিশ্বাসে তাঁর দুই চোখ সেই দিগন্তে আটকে গেল। দুই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তিনি শান্ত গলায় বললেন, আমি তাঁর সংগে মিশে যাবো—যাবোই। তারপর তাঁর মন ভেতরে ভেতরে বলতে লাগল, এ দুনিয়ায় কোনওদিনই তৃষ্ণা মিটবে না। আমি অলীকে যেন না ডুবি। হৃদয়ের উৎসেই অসীম দরিয়ার পয়দায়িস। সেখানেই তাঁর জন্ম। সে পথে যেন আগাছা না জন্মায়। আগাছা হল এই জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমি কেন নাদিরায় থাকব? কেনই বা রানাদিল? ঈশ্বরের অসীমে আমার যাত্রা। সে পথে হারেমের কোনও শ্বেতলানার জায়গা নেই। কল্পনা, ধারণা, অনুমানের ওপরে আত্ম-সমর্পণ। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার সাধককে পূর্ণ আত্মসমর্পণে নিয়ে যায়। এ অবস্থা অনেকটা অবসাদশূন্য সুরার মতো। স্বর্গীয় উল্লাসে ভরপুর সরাইখানার মতো। যেন বা আলোর মালা পরানো শহর। অজানা পুরুষের নির্জন ঘরে জ্বলন্ত দীপশিখা।

আমি অনেক বই পড়েছি। সেসব বই আমার বুদ্ধিকে জাগিয়েছে। কিন্তু তার সাহায্যে আমি এমন কোনও পথ পাইনি যা আমাকে দেহ থেকে স্বরূপে নিয়ে যেতে পারে—কিংবা ব্যক্ত থেকে গুপ্তে টেনে নিতে পারে। আমি কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না আত্মা দেহের এই খোলসের ভেতরেই ঘুরপাক খায়। দীর্ঘদিন আমি এই সত্যের গভীরে ঢুকতে পারিনি। আমার উদ্দেশ্যও উপলব্ধি করতে পারিনি। শেষ অব্দি আমি মনের পথে চললাম। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম কী উজ্জ্বল প্রভায় এ পথ আলোকিত। সব স্পষ্ট। সব শব্দ সহজে বুঝতে পারি।

শাহজাদার কাফেলা চলেছে মাঠ ভেঙে। মাথার ওপর ছায়া ধরে একখানি মেঘ। সারা দুনিয়া যেন শব্দশূন্য। তখন দারা নিজেকে বললেন—আমার মন একাগ্র করতেই সব ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল। হৃদয় পরম আনন্দে ভরে উঠল। সবার কাছ থেকে সরে গিয়ে সেই আনন্দ আমি নির্জনে উপভোগ করি। শেষ অব্দি আমার আমি আমি ভাবটাই মুছে যেতে লাগল। আমি ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পাচ্ছি এখন। তা যেন সমুদ্রের ভেতর সমুদ্র। জ্যোতির ভেতর জ্যোতি।

যুক্তি চায় লাভের পথ। প্রলাপ চায় লোকসান। যুক্তি চায় গৌরব। প্রলাপের আকাঙ্ক্ষা দুঃখ। যুক্তি সবসময় আমাকে নাদিরা—সুলেমান শুকোর কথা মনে করায়। প্রলাপ আমার অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়—চায় ধ্বংস। যুক্তির অস্তিত্ব

বাসনা ঈশ্বরের আবাসভূমি। প্রলাপ শুধু মূর্তি পূজার মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে। যুক্তির হাতে থাকে জপমালা—আর প্রলাপ? সে প্রণয়িনীর অলকদামের গুচ্ছতেই ভুলে থাকে।

সারা প্রান্তর জুড়ে মুঘল কাফেলা নিঃশব্দে মাঠ ভাঙছে। যেন কী এক প্রতিজ্ঞা রাখতেই তার এই যাত্রা। দূরে দূরে রোদের চৌকো। কিন্তু কাফেলার মাথায় মেঘের ছায়া। ঘোড়াদের দাবনার ঘামে ধুলো জমে গিয়ে পুরু সর। শাহজাদার ভেতর থেকে রুবাইয়ের চরণ আছড়ে পড়ল।

দরুঁ-হর বুতেজান ইস্ত পিনহান।
প্রতিটি মূর্তিতেই প্রাণ লুকিয়ে আছে—
শাহজাদার ঠোঁটকে যেন শব্দই খুঁজতে হচ্ছে না
বে-জের-ই-কুপাফার ইমান ইস্ত পিনহান॥
কাফেরির আড়ালে তো ইমান লুকিয়ে আছে।

শাহজাদা যেন রুবাইটি কোনও রকমে উগরে দিলেন। দিয়েই যেন তিনি নিঃশেষ। এবার বাতাসে—আলোয় বেলা পড়ে আসার চিহ্ন। কাফেলা থেমেছে। হাতি ছাড়াও অন্য জানোয়াররা এখন জল খাবে। খেয়েই ফের মাঠ ভাঙবে। বাতাসে দু'একটি কুচো পাখি। ওরাই জানিয়ে দিল—সূর্য ঢলেছে।

আরও একজন শাহজাদা হিন্দুস্থানের প্রান্তরের পর প্রান্তর মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। তিনি শাহসুজা। ঢাকার আরাম-আয়েশ ছেড়ে তিনি যে মাঠ ভাঙছেন—তার কারণ একটিই। তা হল—তিনি শুনছেন—কান্দাহার ফিরে পাওয়ার জন্যে যে মুঘল ফৌজ যাবে—তার মাথায় তাঁকেই বসানো হবে। তাই-ই নাকি আব্বা হুজুরের ইচ্ছা।

হিন্দুস্থানের মসনদ সুজার মনের ভেতর একটা ধোঁয়াটে জায়গা ছাড়া কিছুই নয়। জাহানাবাদ থেকে ঢাকা বহু দূর। সেখানে শাহজাদা সুজা সুবেদার নন—আসলে বাদশার মতোই থাকেন—চলেন—বলেন। এই সুপুরুষ, দক্ষ, বিলাসী মানুষটি বাদশা বেঁচে থাকতে কোনওরকম অশান্তি চান না। তিনি চান—সুবে বাংলার সঙ্গে তাঁর শাসনে বিহার আর ওড়িশাও জুড়ে দেওয়া হোক। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। যাবেন লাহোর। সেখানেই হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় ফৌজি ছাউনি। কিন্তু রাজমহল ছাড়ার পর পথের কোথাও এক ফোঁটাও বৃষ্টি পাননি।

বেশ কয়েকদিন বাদে শাহজাদা দারাকে কিন্তু ঘোর বৃষ্টির ভেতর জাহানাবাদে ঢুকতে হল। বৃষ্টিতে কাফেলার হাতিগুলো খুব খুশি। দারা যখন লালকিল্লার বুলন্দ দরওয়াজার সামনে তাঁর পেয়ারের হাতি ফতে-জংয়ের পিঠের গাদেলা থেকে নামলেন—বৃষ্টির ভেতরেই ফতে-জং শাহজাদাকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় আনন্দে শুঁড় তুলে চিৎকার করে বর্ষাকে অভিনন্দন জানাল।

শাহজাদা দারা লালকিল্লায় ঢুকতে যাবেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কিল্লার পশ্চিম দিককার সড়কে। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। তার ভেতর সড়ক জুড়ে ফৌজ

চলেছে। ভিজতে ভিজতে। যতদূর দেখা যায়—শুধু সেপাইদের মাথা। শাহজাদা বুঝলেন, তিনি এসে পৌঁছবার আগেই আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান কিছু স্থির করে ফেলেছেন। দারার মন বলল, আমি নিজেই দু দু'টি সুবার সুবেদার। বেশ বড় বড় ওই দুই সুবা। এই দুই সুবার ফৌজ লড়াইয়ে শাহী-অভিযানের সামিল হয়ে থাকে। আব্বা হুজুর তো আমায় কিছু জানাননি। হয়তো এ জন্যেই ডাকা।

তৈরি হয়ে বাদশার মবারকে যেতে যেতে শাহজাদার সন্ধে হয়ে গেল। তখন বাদশা দেওয়ান-ই-খাসে। সেখানে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই দারা বুঝলেন, তিনি যেন কোনও ফৌজি ছাউনিতে এসেছেন প্রায়।

লড়াকু মনসবদাররাই যেন দরবার ভরিয়ে ফেলেছেন। শাহজাদা বুঝলেন, তাহলে কান্দাহার শুরু হয়ে গেছে। মুঘল মগজে কান্দাহার একটি স্থায়ী দুশ্চিন্তা, কিন্তু তাঁকে দেখে বাদশা একদম অন্য কথা পাড়লেন।

শাহজাহান হেসে তাকালেন দারার মুখে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে একটি জরুরি ব্যাপারে কথা বলব বলেই তোমাকে ডাকা।

—হুকুম করুন আলমপনা।

—তুমি যখন পয়দা হলে—সেই শুভদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে ছিল নওরোজ উৎসব। তারও কয়েকদিন আগে আমি মেবারকে মুঘল শাহীর সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাবে রাজি করাই। আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা সেবার খুশিতে দুগুণী ঈদ মানান। রাজসিংহ মেবারের রানা হয়েই বেয়াদবি শুরু করেছেন।

দারা শুধু বলতে পারলেন, মেবার ?

শাহজাহান গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ। সেই মেবার। হিন্দুস্থান এখন কান্দাহার নিয়ে ব্যস্ত। এখনই জাহানাবাদ কিছু করবে না। যে বছর তোমার পয়দায়িস—সেই বছরই মেবারকে মুঘলশাহীর বন্ধু করে তুলেছিলাম।

দারা জানেন, এখানে জাহানাবাদ মানে খোদ বাদশা। তিনি চুপ করে থাকলেন।

শাহজাহান বলতে লাগলেন, জাহাঙ্গীর বাদশা আর মহারানা অমর সিংহের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল—সে সন্ধির শর্ত না মেনে কিল্লা চিতোর মেরামত করা হচ্ছে। বিশেষ করে রাজসিংহ এই কাজে দারুণ উৎসাহী। রাজসিংহ তাঁর ফৌজকে ভুগৎ সিংহের অধীনে মুঘল সীমান্তের দিকে পাঠিয়েছেন। কিল্লা চিতোরের সব ক'টি দরওয়াজা মেরামত তো করাই হয়েছে—তাছাড়া কয়েকটি নতুন দরওয়াজা বানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়—দেওয়াল এতই জবরদস্ত করে তোলা হয়েছে—যেখান দিয়ে ঢুকে পড়া দুঃসাধ্য।

দারা শুনেছিলেন আর ভাবছিলেন, সেই একই কাহিনী। কী চিতোর—কী কান্দাহার—সেই একই ব্যাপার। কিল্লা—তার দরওয়াজা—দেওয়াল—কামান—জলের নালা—সেই এক কাহিনী। হামলা। গোলা। বিষ-তীর। আগুনে-মশাল। শাহজাদার মনে হচ্ছিল—আমি কি এসবে আছি ? না, এসব থেকে সরে গেছি ?

বাদশা বললেন, হিন্দুস্থানের ফৌজ এখন কান্দাহারের পথে। এবারও তুমি

লাহোরে থাকবে। সেখান থেকেই কান্দাহারের ময়দানে রসদ যাবে। গোলা যাবে। গেঁহু যাবে। যাবে চানা—ঘি, তেল। তুমি একবার গোলন্দাজ বাহিনীর মীর-আতশদের সঙ্গে কথা বলে নেবে। কোথায়, কখন, কেমন গোলার দরকার হবে—তার সবটাই তুমি দেখবে। এসব ভার তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—জাঁহাপনা। জং-কি-ময়দানের ভার কাদের ওপর?

—তুমি নিশ্চয় জানো—এবার সব ভার দেওয়া হয়েছে উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ আর শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরের ওপর।

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেন দারাশুকো। জাহানাবাদের দিকে আসার সময় তিনি পথের মাঝে শুনেছেন—শাহজাদা সুজা ফৌজ নিয়ে লাহোরের দিকে গেছেন। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল—এবার তাহলে কান্দাহার লড়াইয়ে মুঘল ফৌজের মাথায় শাহজাদা সুজা। কিন্তু আওরঙ্গজেবই যদি কান্দাহার যান তো সুজাকে কেন লাহোর যেতে বলা হল? এর জবাব তিনি চাইতে পারেন না। তাই শাহজাদা চুপ করে বাদশার মুখে তাকালেন।

শাহজাহান ওই দুটি স্তব্ধ গভীর চোখে তাকিয়ে নিজেই বলে উঠলেন, শাহজাদা সুজাকে ফিরতে বলা হয়েছে।

দারার মনে একই সঙ্গে অনেক কথা এল। কিন্তু তিনি তা সাজিয়ে উঠতে পারছিলেন না। লড়াইয়ে লেগে থাকায় ছোটে ভাই আওরঙ্গজেবের উৎসাহ তিনি জানেন। আবার একথাও তিনি জানেন—তাঁর খবই সুশ্রী, দার্শিক, দক্ষ, আরেক ছোটে ভাই সুজাশগীর সুদূর ঢাকা থেকে লাহোর অব্দি এগিয়ে গিয়ে যখন জানবে—সে কান্দাহার-হামলার ফৌজি প্রধান নয়—তখন তার আশাভঙ্গ কতটা হবে। আব্বা হুজুর দুনিয়াটাকে তাঁর নিজের চাহতের ছাঁচে ফেলে ঢেলে সাজিয়ে নিতে চান। সে জন্যে যদি অঝোর বর্ষার ভেতর পেছল পাহাড়ি পথে ভারি, কামানের গাড়ি নিজেদের কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলতে গিয়ে কয়েক দঙ্গল সেপাই কিংবা বেগার খাটতে ধরে আনা হিন্দু দেহাতি মানুষ পা পিছলে অতল খাদে চিরকালের মতো হারিয়েও যায়—তাহলেও বাদশা তাঁর খোয়াবের গায়ে এক কণা ধুলো পড়তে দেবেন না। খুব মমতায় সেই ধুলোর কণাটি বাদশা নিজেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। এরই নাম শাহী। দুনিয়ার যে কোনও যুগের যে কোনও শাহী মানেই তাগদের লম্বা হাত—যে হাত মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যন্ত্রণার যন্ত্রে জুড়ে দেয়।

সেদিনই আরবি ঘোড়া ব্যাপারীর জাল সাজিসে সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাদা দারা খুব ভোর ভোর আগ্রায় এসে হাজির হলেন। যমুনার গায়ে রানী হাভেলিতে যখন তিনি ঢুকলেন—তখন ভোরের ঠান্ডা বাতাসে পাখিরা বেরিয়ে পড়েছে। রানাদিল ঘুমাচ্ছিল। শাহজাদা এসে পড়তেই দিন রাতের দাখিলা—বাঁদিরা পলকে উধাও হয়ে গেল।

রানার দুই বোজা চোখে দুটি আলতো চুমু দিয়েই শাহজাদা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ধড়মড় করে উঠে বসেই রানা ভীষণ খুশিতে বলে উঠল, তুমি? কখন এলে?

—এইমাত্র।

—কোত্থেকে ?

—সারা রাত ঘোড়া দাবড়ে জাহানাবাদ থেকে এসেছি। হঠাৎ তোমায় দেখার খুব ইচ্ছে হল।

ঝনাত করে রানাদিল মেঝের বনেতে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বলল, তার চেয়ে সত্যি কথাটা বললেই পারতে।

দারা ভেতরে ভেতরে ঘা খেলেন। এই নাচিয়ে রানা ভাবে কী আমাকে ? শাহজাদা দারা মিথ্যে বলে ? দারা কোনও জবাব দিলেন না। তিনি বেশ আহত মুখে চুপ করে থাকলেন।

—সারারাত হারেমে থেকে শেষে—।

—হারেমে ?

—হ্যাঁ হারেমে। খোজারা কেনাকাটা করতে এসে বাজারে বলেছে। পাঁচ কান হয়ে সারা আগ্রা এখন সব জানে।

—সব ? কী জানে ?

—ওই যে একটা ঢলানি মেয়ে এসে জুটেছে না! আর্মানি, না জর্জিয়ান বাঁদি। ভাঙা ভাঙা ফারসি বলে তোমাকে খুব মজিয়েছে!

—আমি সিধে জাহানাবাদ থেকে আসছি রানা।

সেকথা কানেই নিল না রানাদিল। সে তার মতো করে বলে যেতেই লাগল। —তুমি যাওয়ায় সে বাঁদি এখন জাতে উঠেছে!

শাহজাদার মনে পড়ল তিবলিসির সেই মেয়েটির কথা—যাকে দেখতে গিয়ে এক ঘোড়া-ব্যাপারী নওজওয়ান মুরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পা হারিয়ে—শেষে নেকড়ের খাবার হয়ে। নওজওয়ান এভাবে সাবাড় হওয়ায় শ্বেতলানা খুবখুশি। কেননা—সে যে আনমোল। শ্বেতলানা নিজেই জানে—সে অমূল্য।

রানাদিল বলল, হারেমে এখন তার আলাদা মহল। তিনি এখন উঁদিপুরি মহল নাম ধরেছেন।

ফের দারা বললেন, সারা রাত ঘোড়া দাবড়ে আসতে হয়েছে আমাকে।

একথাও কানে নিল না রানাদিল। সে বলল, ওগো। তোমার উঁদিপুরির কাছে তুমি যতবার ইচ্ছে যাও। থাকো গিয়ে। আমার কোনও আপত্তি নেই।

শাহজাদা রানার মুখে একথায় খুবই অবাক হলেন।

রানাদিল বলল, কিন্তু উঁদিপুরিকে তুমি যেন ভালবেসে ফেলো না।

হা-হা করে হেসে উঠলেন দারা। দু'হাতে রানাকে জড়িয়ে বুকের ভেতর নিলেন। নিয়ে বললেন, এই জন্যেই তুমি রানা। এ জন্যেই তুমি সবার থেকে আলাদা। আমার রানা।

রানাদিল শাহজাদার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে বলল, যদি ভালবেসে ফেল —তাহলে কিন্তু আমি বুকের ভেতর ছুরি লুকিয়ে নিয়ে হারেমে ঢুকব।

—ধরা পড়ে যাবে রানা।

—নাচনেওয়ালি হয়ে পাহারাদারদের ভোলাবে। তারপর ভেতরে ঢুকে

উদিপুরির বুকে ছুরি বসিয়ে দেব।

—কাজির বিচারে মুণ্ডুটা হারাবে।

—হারালে হারাব। কাজির কাছে বলব, একজনকে ভালবেসে আমি একাজ করেছি।

—অত মাথা ঘামাতে হবে না রানা। আমি এক নওজওয়ানকে বাঁচানো যায় কিনা—তাই দেখতে হারেমে গিয়েছিলাম।

—বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরলে।

—আমি মরেছি রানা শুধু তোমার কাছে।

—আরও একজনের কাছে মরেছ শাহজাদা। তিনি শাহজাদা বেগম নাদিরা। তাকে তুমি ভালবাসনি?

—নিশ্চয় বেসেছি। নাদিরাকে আমি শাদি করেছি। তাই ভালবাসাই তো স্বাভাবিক। ভালবাসা খোদার রহেম। নফরত করা খুব সহজ। ঘৃণা খুব সহজেই আসে এই কুটিল পৃথিবীতে। কিন্তু ভালবাসা? সহজে আসে না রানা। আসতে চায় না। কিন্তু তুমি যদি শুদ্ধচিত্তের মানুষ হও তো ভালবাসা সহজেই আসবে। আমি একই সঙ্গে তোমাকেও খুব ভালবাসি। আমি কাউকে ঘৃণা করতে পারি না রানা।

—একসঙ্গে দু'জনকে ভালবাসা যায় না শাহজাদা।

—তা জানি না রানা। তবে আমার তো সহজেই ভালবাসা আসে। কিছুকাল হল নাদিরাকে ঠিক সেইভাবে ভাবি না দেখে—হয়তো তোমার কথাই ঠিক—সেইভাবে বাসতে পারি না বলে আমি নিজেই যে ভীষণ কষ্ট পাই।

একথা রানাদিলের বুকে শেল হয়ে বিঁধল। সে মাথা নিচু করে বলল, কারও জন্যে যদি কষ্ট হয়—তার চেয়ে বড় ভালবাসা আর কিছু নেই শাহজাদা।—বলতে বলতে রানাদিল মহলের লাগোয়া খোলা চাতালে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ সামনের একটি কেসিয়া গাছের দিকে। এ গাছ একসময় পর্তুগিজরা হিন্দুস্থানে আনে। হলুদ ফুলরেণু, গাছতলা ছাড়িয়ে চাতাল অব্দি ছড়ানো। কয়েকটা নিঃশঙ্ক বুলবুলি রানাদিলের পরোয়া না করে তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল।

শাহজাদা দারা রানাদিলকে আর কিছু বললেন না। কেসিয়া গাছটা থেকে হলুদের ধুলোর মতোই সব সময় রেণু ঝরে পড়ছে। তার ভেতর শাহজাদার দিকে পেছন ফিরে রানাদিল দাঁড়িয়ে। তার পরনে চুনে-হলুদ রঙের আঙিয়া। কাঁধের দু'দিকে গাঢ় লাল চুনরির ঝালর ঝুলে পড়েছে।

বর্ষা শেষ হয় হয়। দিনের বেলার পরিষ্কার আকাশ থেকে ঝকঝকে রোদ সিধে নেমে এসে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট এলাকার লম্বা শীতকে থান থান করে কাটছে। কোথাও কোথাও চিনার গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা শক্ত বরফ সে-রোদে শিথিল হয়ে শব্দ করে খসে পড়ে। থলচোটিয়ালের পাহাড়ি গলিপথে ঠিক এই সময়ে নানা রঙের ফুল ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেসব দেখার সময় নেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুরের। সামনেই কিল্লা-কান্দাহার। কিন্তু তার আগে ফৌজ

নিয়ে হেলমন্দ নদী ডিঙোতে হবে। আগে থেকে ঠিক করা বুদ্ধিমত সাদুল্লা খাঁ মুঘল ফৌজের একটা বেশ বড় দঙ্গল নিয়ে কিল্লার পশ্চিম দিকে পৌঁছে গেছেন। যে করেই হোক এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুব থেকে আওরঙ্গজেবকে কিল্লার গায়ে নালায় পৌঁছতে হবে।

শাহজাদা চান—পুরো ফৌজ ওপারে পাঠাবার আগে জঙ্গি হাতিগুলোকে ওপারে পাঠাতে হবে। হাতিরাই পারে কিল্লার ফটক ভেঙে কিল্লা-চাতালে ঢুকতে। তাই আওরঙ্গজেবের হুকুমে কামান দাগা শুরু হল।

শাহজাদা অবাক হচ্ছিলেন একটি জিনিস দেখে। তিনি জানেন—এ পথে বার-বার ফৌজ যাতায়াত করায় পাহাড়ি গাঁগুলো একদম ফাঁকা। কিন্তু এত সব রঙিন ফুল কী করে আপনা আপনি বছরের পর বছর ফুটতেই থাকে। তাদের দেখার জন্যে দেহাতি মানুষজনের একজনও তো কাছে-পিঠে নেই। তারা সবাই যে যার মতো দূরে পাহাড়ে পালিয়েছে। খাঁ খাঁ শূন্যের ভেতর কিল্লা-কান্দাহার দাঁড়িয়ে।

মুঘল গোলার জবাবে কিল্লা থেকে কোনও গোলা এসে কিন্তু পড়ল না। শাহজাদার কেমন সন্দেহ হল। তবে কি ওরা আমাদের গোলার পাল্লার ভেতর থেকেই কামান দাগবে? কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আওরঙ্গজেব বাহাদুর একে একে একুশটি হাতি জাবদা ভেলায় করে ওপারের ডাঙায় তুললেন। আজ ভোর রাতে শাহজাদা হেলমন্দের তীরে এসে থমকে থামেন। আলো ফুটতেই কামানের নল গরম হয়ে উঠল। গোলা ফাটার আওয়াজ থেকেই শাহজাদার শিক্ষিত কান একটা জিনিস ধরে ফেলল। গোলার ভেতর বারুদের আঁটুনি ভাল হয়নি। এমন গোলা নিশ্চয় বড়ো ভাই শাহজাদা দারা লাহোরে বসে মোটা তোফায় গলে গিয়ে ফৌজি রসদ জোগানদারদের কাছ থেকে নিয়েছেন। ওখানে তোফার ছড়াছড়ি। আর এখানে দুশমন মোকাবিলায় শুধু আওয়াজই সার! তোপ দাগা বেকার হয়ে যাবে যে। এ গোলা কিল্লা-কান্দাহারের দেওয়ালে পড়ে শুধুই ফাটবে। দেওয়ালের কিছুই হবে না। আওরঙ্গজেব নিজের মনে মনে বললেন, নসিব! তারপরেই যেন দুগুণী তেজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হাতি পার করাতে করাতে মাথার ওপর সূর্য উঠে এল। রোদের তাতে জানোয়ারগুলো অস্থির। শাহজাদা খোলা তলোয়ার হাতে হাতিদের ভৈ আর মেঠদের জায়গা নিতে বাধ্য করলেন। ততক্ষণে গোটা বারো কামান ভেলার চড়ে এপারে এসে গেছে। যদিও ভেলা পারাপারের সময় হাতিতে যেমন—কামানেও তেমনই বিশ পঁচিশ জন সেপাই ভেসে গেল।

যে কোনও সময় এই অপ্রস্তুত হাতির দঙ্গল আর ছড়ানো কামানগুলোর ওপর কিল্লার সামান বুরুজ থেকে দুশমনেরা স্বচ্ছন্দে গোলা ফেলে সব সাবাড় করে দিতে পারে। সেই অবস্থাতেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব খোলা প্রান্তরে পশ্চিমমুখো হয়ে নামাজ পড়তে বসলেন। খুব মন দিয়ে চোখ বুজে নামাজ পড়তে লাগলেন।

হেলমন্দের ওপার থেকে তখন বন্দুকচী, পদাতী, ঘোড়সওয়াররা এপারে আসছিল। খুব সাবধানে। যদি ঘোড়া ভেসে যায় স্রোতে। যদি বাকি কামানগুলো

ভেসে যায়! যদি সেপাই কেউ ভেসে যায়! তারা পার হতে হতে দেখল, শাহজাদার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি মন দিয়ে নামাজ আদায় করছেন।

এ দৃশ্য সারা ফৌজের জেদ, সাহস—দুইই বাড়িয়ে দিল। আওরঙ্গজেব এখন বুঝতে পারছেন—গোলাবাড়িতে তুখোড় দুশমনকে মুঘলরা বেকার গোলা ফেলে কিছুই করতে পারবে না। পারে যদি—তা সম্ভব হবে শুধু সাহস দিয়ে। জেদের জোরে।

ওই অবস্থাতেই অচঞ্চল শাহজাদা তাঁর ফৌজের ভেসে যাওয়া সেপাইদের জন্যে খোলা প্রান্তরে দুশমনি বিষ-তীর বা গুলির নিশানার পরোয়া না করেই নামাজের শেষে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। সূর্য ঢলেছে। চড়া রোদে সবাই অতিষ্ঠ। ছায়া নেই কোথাও। তার ভেতর একজন শাহজাদা ভেসে যাওয়া সেপাইদের জন্যে খোদার দোয়া চাইছেন—যে সেপাইরা লড়াইয়ে হারিয়ে যায়—ভেসে যায়—হাত-পা হারিয়ে ময়দানে পড়ে থাকে—তাদের জন্যে দোয়া চাইতে গিয়ে একজন শাহজাদা তাঁর দামি জীবন বিপন্ন করছেন। বিষ-তীর বা গুলির সহজ নিশানা হয়ে? এ ছবি সেপাইরা কখনও দেখেনি। এরকম শাহজাদাও তারা কখনও দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে এ লড়াই সবার লড়াই হয়ে দাঁড়াল। সেপাইরা হেলমন্দ ডিঙিয়ে এসেই যে যার জায়গা নিতে লাগল। কামানগুলো জায়গা মতো বসে নল তাক করল কিল্লার দিকে। বেলদার মজুররা ফৌজি সেপাইদের জন্যে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে লেগে গেল।

বিকেল পড়তে না পড়তেই দুশমনের গোলাবাজি শুরু হয়ে গেল। থলচোটিয়ালের পাহাড়ি গলিপথে আপনি ফুটে থাকা রঙিন ফুলগুলোকে দেখে শাহজাদার মনে হয়েছিল হেলমন্দের গায়ে এ কী সুন্দর প্রান্তর! সেই সব জায়গা ইরানিদের লম্বা কামান গোলা ফেলে ফেলে রক্তাক্ত নরক করে তুলল।

পয়লা ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় লাগল আওরঙ্গজেবের। বেশ কয়েকটা ঘোড়া সওয়ার সমেত ধরাশায়ী। চার পা শূন্যে তুলে ঘোড়ার মৃত্যু যন্ত্রণার চিৎকার। শাহজাদা ঘোড়সওয়ারদের কিল্লার পশ্চিম দিককার টিলাগুলোর আড়ালে সরিয়ে দিয়ে এক এক হাতির পেছনে একটি করে কামান বসালেন। সহজ নিশানায় দুশমন ওপর থেকে গোলা ফেলছে। তারই ভেতর খোলা তলোয়ার হাতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব সব দেখেশুনে বেড়াতে লাগলেন।

সন্ধে হয় হয়। রাতের অন্ধকারের অপেক্ষাতেই রয়েছেন আওরঙ্গজেব। একটা অন্ধকার রাত পেলে তিনি বেলদারদের দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটার কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। তা পারলে কাল ভোর থেকেই বন্দুকচীরা মাটির আড়ালে সুড়ঙ্গে বসে তাক করতে পারবে। পদাতীদের রাখা হয়েছে দড়ির মই বেয়ে কিল্লার দেওয়াল বাইবার জন্যে। সে সময় আসেনি এখনও। যখন জঙ্গি হাতির দঙ্গল কিল্লার দরওয়াজা ভাঙবে—তখন একদল পদাতী তাদের পেছন পেছন কাঠের গুঁড়ি তুলে দল বেঁধে কেল্লার দরওয়াজায় গুঁতোবে—আরেক দল দেওয়াল বেয়ে কেল্লার ওপরে উঠবে।

অন্ধকারে দেখাশুনো কঠিন হয়ে উঠল। কিল্লার ওপর থেকে দুশমনের

তোপ দাগাও তেমনই আন্দাজি হয়ে পড়ল। শাহজাদা বুঝলেন, ইরানিরা ভাল দেখতে পাচ্ছে না। তাই অবিশ্রান্ত গোলা দাগছে—তবে এলোপাথাড়ি।

কিল্লার আরেক পাশ থেকে সাদুল্লা খাঁয়ের ফৌজ রীতিমত নিশুতি রাতে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে জানাতে পারল—গোলাই করে কাটা পাথরের গোলা পাঠাচ্ছি। ঢিলে আটুনির লাহোরির গোলা ফেলা বেকার। পাথুরে গোলায় কাজ হবে। পর পর একই জায়গায় ফেলতে পারলে কিল্লার জবরদস্ত দেওয়াল ধসানো যাবে।

অন্ধকারেও শাহজাদা আওরঙ্গজেব সামান্য হাসলেন।

॥ নব্বই ॥

হীরা, নীলকান্ত আর দুধকান্ত কিছু মণি, পুষ্পরাগ পাথর কিংবা নানান জাতের মুক্তো বেচতে হলে শুধু মণি-মুক্তোয় তুখোড় হলে চলে না। যে-দেশে কারবার—সেই দেশের বাদশা থেকে কোতোয়াল—মানী মানুষজনকে যেমন বুঝতে হবে—তেমনি বুঝতে হবে সে দেশের ব্যবসাপত্তর—সেই সঙ্গে সেই দেশটাকেও। প্যারিসের রত্ন-কারবারি ট্যাভারনিয়ারের এবার নিয়ে হিন্দুস্থানে চৌথা সফর। মহাফুর্তিতেই তিনি হিন্দুস্থানের জমিনে পা দিয়েছেন। দরিয়ায় থাকতেই তিনি জাহাজে বসে শুনেছেন—অল্পদিন হল কিল্লা-কান্দাহার উদ্ধার করতে না পেরে শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর কাবুলে নেমে এসেছেন।

পুরো দস্তুর লড়াই চান না ট্যাভারনিয়ার। তিনি চান—কিছু হামলা—দু'-একটা ছোটখাটো জয়—ফৌজি ঠিকাদাররা লড়াইয়ের রসদ জুগিয়ে ফুলে উঠুক। এদেরই মোহরে মণি-মুক্তোর ভেট কেনা হয় বাদশা, বাদশা-বেগম জাহানারার জন্যে। আমির, ওমরাহ, মনসবদার, সুবেদাররা এইসব ভেট দেন মসনদে। তাঁদের হয়েই কেনাকাটা করে ওইসব ফৌজি ঠিকাদার।

মসুলিপত্তম হিন্দুস্থানের ডান কুলে। একদম সিধে বাঁ কুলে গোয়া। ওই পথের আধাআধি গিয়ে ট্যাভারনিয়ার নীচে রামলকোটা হয়ে গণ্ডিকোটে এসে হাজির হলেন। একটা উদ্দেশ্য ছিল ট্যাভারনিয়ারের। তিনি মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন, ১৬৫১ সালের ১৮ জুন প্যারিস থেকে রওনা হয়েছেন। আজ ১৬৫২ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তিনি জানেন, অতি সম্প্রতি গোলকুণ্ডার রাজার হয়ে মীরজুমলা এই গণ্ডিকোট দখল করেছেন। এখন রাজার সঙ্গে দেখা করে ট্যাভারনিয়ার কতক মুক্তো বেচতে চান। তাঁর সহায় হবেন নিশ্চয় রাজার উজিরে-আজম এবং সিপাহসালার মীরজুমলা।

পারস্যে থাকতে ট্যাভারনিয়ার মীরজুমলার কথা শুনেছেন। হিন্দুস্থানে এক রত্ন ব্যবসায়ীর বান্দা হয়ে এসেছিল। তারপর ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে মীরজুমলা সব কিছুর মালিক হয়ে বসল। হিরেই পেয়েছিল বিশ মণ। এখন সে পুরোদস্তুর একটা গোলন্দাজবাহিনীর মালিক—মালিক কর্ণাটকের অনেকখানি জায়গার। এই রইস আদমি যখন এদেশে আসেন—তখন তাঁর নাম ছিল মীর মহম্মদ সৈয়দ।

মীরজুমলার কথাবার্তা, হিসাবপত্র—সবই খুব দক্ষ মানুষের মতোই। ট্যাভারনিয়ার বুঝলেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই। মীরজুমলা যে কোনও রত্নই ভাল করে বোঝেন। বোঝেন হুণ্ডি। কাটাই।

মীরজুমলার কাছে আশ্বাস পেয়ে গোলকুণ্ডার দিকে রওনা হলেন ট্যাভারনিয়ার। পথে পড়ল রুস্মলকোটা, মেদক, নন্দের, সুরাট—শেষে ওপরের দিকে আমেদাবাদে এসে হাজির হলেন তিনি। তখন ডিসেম্বর শেষ হয় হয়। এক শীতের সকালে গুজরাতের সুবেদার শাহজাদাদের মামা শায়েস্তা খাঁ ট্যাভারনিয়ারকে ডাকলেন।

ওখানে ট্যাভারনিয়ারের প্রায় লাখ টাকার রত্ন বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু দাম দেবার সময় শায়েস্তা খাঁ জানতে চাইলেন কোন মুদ্রায় দাম নেবেন? টাকা? না, মোহরে?

ট্যাভারনিয়ার কিন্তু বলে ওঠার আগেই শায়েস্তা খাঁ বললেন, যদি তাঁর ওপর আস্থা থেকে থাকে—তাহলে রাজি হয়ে যান মোহর নিতেই। শায়েস্তা খাঁ বললেন, নিজের সুবিধার দিকে তাকিয়ে এই পরামর্শ দিচ্ছি না।

ট্যাভারনিয়ার বললেন, আপনার পরামর্শই মেনে নেব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার পাওনা মোহরে মিটিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। কিন্তু দাবি করলেন, প্রতি মোহরের দাম ধরা হোক সাড়ে চোদ্দো টাকা। কিন্তু ট্যাভারনিয়ার জানতেন—বাজারে এক মোহরের দাম ১৪ টাকা।

তাই মেনে নিলেন ট্যাভারনিয়ার। ভাবলেন, শায়েস্তা খাঁ খুশি থাকলে এই হারে পাওনা মিটিয়ে শায়েস্তা খাঁ তাঁর যে লোকসান করতে চলেছেন—অন্য ভাবে তা পুষিযে নিতে পারবেন।

দুদিন বাদে ফের শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ট্যাভারনিয়ার। বললেন, আপনি মোহরের যে দাম ধরেছেন সে দামে মোহর বিক্রি হয় না। এ জন্যে—ট্যাভারনিয়ার বললেন, তাঁকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার ক্ষতি সইতে হচ্ছে।

শুনে তো দপ করে জ্বলে উঠলেন শায়েস্তা খাঁ। বললেন, যে ওলন্দাজ পোদ্দার একথা বলেছে—তাকে দশবার জুতোপেটা করব। মোহর বলতে কী বোঝায়—তাই শিখিয়ে দেব এইসব লোককে।

শায়েস্তা খাঁ যে সব মোহর ট্যাভারনিয়ারকে দিয়েছেন—সেগুলো সবই পুরনো। এশিয়ার রাজরাজড়াদের মন-মেজাজ ভাল করেই জানেন ট্যাভারনিয়ার। এঁদের ওপর রাগ করা বৃথা। কোনও প্রতিবাদ না করে তিনি শায়েস্তা খাঁকে বলে যেতে দিলেন। যখন দেখা গেল—শায়েস্তা খাঁ-র কিছুটা শান্ত-মুখে হাসি ফুটেছে—তখন খুবই বিনীতভাবে ট্যাভারনিয়ার বললেন, হয় আপনার মোহর ফেরত নিন—নয়তো আমার ক্ষতি পুষিয়ে দিন।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শায়েস্তা খাঁ জানতে চাইলেন, যে মুক্তোটা কিনিনি—তা এখনও আছে কি?

—হ্যাঁ, আছে। —বলে সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে বের করে ট্যাভারনিয়ার

শায়েস্তা খাঁয়ের হাতে তুলে দিলেন মুক্তোটি। জিনিসটি বড়—তবে চেহারা সুন্দর নয়।

সেটি হাতে নিয়ে শায়েস্তা খাঁ বললেন, এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। এক কথায় বলুন কী দাম পেলে বেচবেন এটি।

ট্যাভারনিয়ার এটা ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান না। তিন হাজার টাকা পেলেই দিয়ে দেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁয়ের কাছে দর হাঁকলেন সাত হাজার টাকা।

শুনে শায়েস্তা খাঁ বললেন, মুক্তোটার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দেব। আর তা যদি নেন তো আপনার মোহর নেবার দরুন যে-ক্ষতি হল তা সব পুষিয়ে যাবে। কাল আসুন। দিয়ে দেব আপনাকে এ পাঁচ হাজার। আপনি খুশি মনে বিদায় হোন তাই চাই। তাই এছাড়া আপনাকে একটি খেলাত আর একটি ঘোড়া দেওয়া হবে।

ট্যাভারনিয়ার ঝুঁকে কুর্নিশ করে বললেন, জোয়ান ঘোড়াই দেবেন আমাকে। কেননা অনেক দূরে দেশে যাব।

পরদিনই শায়েস্তা খাঁ ট্যাভারনিয়ারের জন্যে লম্বা ঢিলে বাইরের জামা, আরেকটা ঢিলে জামা—দুটি কোমরবন্ধ আর একটি পাগড়ি পাঠিয়ে দিলেন। জামা দুটি সোনার বুটিদার কিংখাব দিয়ে তৈরি। কোমরবন্ধ দুটিতে সোনা আর রুপোর ডোরা। পাগড়িটা সুতির। কিন্তু আগুনে-লাল রঙের কাপড়ে তৈরি। তাতে সোনার সুতো দিয়ে গাঁথা ডোরা।

দেখে তো মনটা ভরে গেল ট্যাভারনিয়ারের। সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের রুচি আছে। কিন্তু যে-ঘোড়াটি পাঠিয়েছেন—তাতে কোনও জিন নেই। উঠব কী করে পিঠে? জিনের বদলে ঘোড়াটির পিঠ রুপোর ঝালর লাগানো একখানি সবুজ মখমল দিয়ে ঢাকা। বলগা পরানো মাথার সাজটি বেশ সরু—তাতে চুমকির কায়দায় রুপোর টাকা বসানো।

ঘোড়াটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ট্যাভারনিয়ার। আমেদাবাদের শীতের সকাল। এখানে-ওখানে ঝুলন্ত কুয়াশা। ঘোড়াটাকে দেখে ট্যাভারনিয়ারের মনেই হল না—ও কখনও পিঠে কোনও সওয়ার নিয়েছে।

ঘোড়াটা নিয়ে ট্যাভারনিয়ার ওলন্দাজদের কুঠিতে এলেন। আনতেই এক ওলন্দাজ ছোকরা তার পিঠে চেপে বসল। অমনি ছোকরাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে ঘোড়াটা লাফঝাঁপ দিতে শুরু করে দিল। ওলন্দাজ কুঠির সামনে খোলা মাঠে একটি কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। বেমক্কা ঘোড়াটা সেই কুঁড়ে ডিঙোবার জন্যে বিরাট এক লাফ দিল। মরতে মরতে পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ছোকরা বেঁচে গেল।

এ ঘোড়া জুতসই হবে না বলে তা শায়েস্তা খাঁকে ফেরত দিলেন ট্যাভারনিয়ার। সব খুলে বললেন। শেষে বললেন, আমি যে দেশে ফিরি তা বোধহয় চান না আপনি।

কেননা, শায়েস্তা খাঁ আরও অনেক জিনিস আনতে বলেছিলেন ট্যাভার-

নিয়ারকে। তিনি চাইছিলেন, এ জন্যে ট্যাভারনিয়ার তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যান।

একথা শুনে শায়েস্তা খাঁ হাসলেন শুধু। তারপর তাঁর আব্বা হুজুর আসফ খাঁয়ের ব্যবহারের ঘোড়াটি আনতে হুকুম দিলেন। বড় ইরানি ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়াটার বয়স যে আঠাশ বছর হয়ে গেছে।

জিন-বলগা পরিয়ে ঘোড়াটি আনামাত্র ট্যাভারনিয়ার তার পিঠে চড়ে বসলেন। হাজার হোক হিন্দুস্থানের উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের ঘোড়া। বেশ সুন্দর ঘোড়া।

এবার শায়েস্তা খাঁ বললেন, আপনি খুশি তো? এ ঘোড়া কখনও পিঠ থেকে ফেলে দেয় না।

শুক্রিয়া আদায় করে ট্যাভারনিয়ার বিদায় নিলেন শায়েস্তা খাঁয়ের কাছ থেকে। পরের দিন রওনা হওয়ার আগে ট্যাভারনিয়ারকে বড় এক ঝুড়ি আপেল পাঠালেন শায়েস্তা খাঁ। ট্যাভারনিয়ার জানতে পারলেন, শাহজাহান বাদশা শায়েস্তা খাঁকে ছ'ঝুড়ি আপেল পাঠিয়েছেন—এ ঝুড়ি তারই একটি। কাশ্মীর থেকে আনানো। একটা বড় ইরানি তরমুজও রয়েছে সঙ্গে। ট্যাভারনিয়ার ওলন্দাজ ছোকরাকে বলে বসলেন, তরমুজ? তরমুজ কোথায় পাওয়া গেল!

ছোকরা বলল, কান্দাহার লড়াইয়ের জন্যে সব তরমুজ ফৌজে চলে যাচ্ছিল। আবার একটা দুটো করে তরমুজ দেখা দিচ্ছে। জল জোগাড় করে গলা ভেজানোর চেয়ে ফৌজের পক্ষে তরমুজ অনেক সুবিধার। তার ওপর তরমুজের রসে ভিজিয়ে মোটা রুটি খেতেও ভাল—আর মুঘল তা খেতেই অভ্যস্ত।

রওনা হওয়ার আগে আপেল তরমুজ—সবই ট্যাভারনিয়ার ওলন্দাজ ফৌজি কর্তার বউকে উপহার দিয়ে দিলেন। তারপর সেই ঘোড়ায় চড়ে গোলকুন্ডা রওনা হলেন। সেখানে পেঁছেই ট্যাভারনিয়ার ঘোড়াটা বেচে দিলেন। পেয়ে গেলেন পাঁচশো টাকা। যা পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময় কিল্লা-কান্দাহার যেন থমথম করছে। ন্যাড়া মাঠের ভেতর থল চোটিয়ালের পাথর দিয়ে তৈরি জবরদস্ত কেল্লা একা দাঁড়িয়ে। কে বলবে—কয়েক মাস আগে এখানে মরণপণ লড়াই হয়ে গেছে। কিল্লার চেহেল জিনায় গোলা খাওয়া মুঘল সেপাই মরতে মরতে যে রং ঢেলে গেছে বর্ষার পর তা আর আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবই বর্ষা ধুয়ে নিয়ে গেছে। পাশেই হেলমন্দ বয়ে চলেছে যেন—কিছুই হয়নি এখানে কোনওদিন।

তখন রোদে চারদিকের পাথর ভয়ঙ্কর তেতে ছিল। শাহজাদা আওরঙ্গজেব যতবারই জঙ্গি হাতির দঙ্গল দিয়ে কিল্লার ফটক গুঁতিয়ে খোলার চেষ্টা করেন—ততবারই লম্বা কামানের নল থেকে ভারি গোলা ছুটে এসে হাতিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শেষে মুঘল ফৌজের দিকে ছুটে এসে হাতিরা বেশ কিছু সেপাই মেরে ফেলে। এরপর শাহজাদা হাতিদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

আকাশে মেঘ আসে। কিন্তু বৃষ্টি আসে না। মেঘ ভেসে চলে যায়। খোদ বাদশা শাহজাহান কাবুলে বসে আছেন। শাহজাদা নিজের বুদ্ধিমত যে লড়াই

চালাবেন তারও উপায় নেই কোনও। কাসিদের হাত দিয়ে চিঠির পর চিঠি আসছে। কামান হুঁশিয়ার হয়ে ব্যবহার করো। সেপাইদের গোলার মুখে এগিয়ে দিও না। হাতিগুলোকে বাঁচিয়ে তো তবে লড়াই দিতে হবে। ঘোড়সওয়াররা যে এগিয়ে যাবে—তার আগে গোলা ফেলে দুশমনের বেয়াদবি মাটিতে মিশিয়ে দাও।

লড়াইয়ের ভেতর একদিন দুপুরে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মনে হল—এ লড়াইয়ের সিপাহসালার তো আব্বা হুজুর। কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই মুঘল কামান ইরানিদের কামানের পাল্লার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না।

একদিন রাতে আওরঙ্গজেব সাদুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রাতের অন্ধকারে দড়ির মই বেয়ে খোলা তলোয়ার হাতে আওরঙ্গজেব বাছা বাছা লড়াকু সেপাই সঙ্গে নিয়ে কিল্লার দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠবেন। তারপর—যেখান থেকে ইরানিরা গোলা দাগছে—কিল্লার সেই সামান বুরুজে পৌঁছে তিনি গোলন্দাজদের কচু কাটা করবেন। তাহলে দুশমন কাবু হবে।

তাঁবুর ভেতর শাহজাদার উলটোদিকে বসা সাদুল্লা খাঁ বললেন, শাহজাদা—ব্যাপারটায় বাদশার পরামর্শ নেওয়া উচিত।

—কেন? সব ব্যাপারেই বাদশার পরামর্শ নিতে হবে? তাহলে লড়াইয়ের ময়দানে আমরা আছি কী করতে!

—হ্যাঁ হবে। বাদশা আমায় সাফ হুকুম দিয়ে রেখেছেন—এ লড়াইয়ে আপনি এমন কিছু করতে পারবেন না—যাতে আপনার জীবন খতরায় পড়ে। এটা শুধু বাদশা নয় শাহজাদা—একজন আব্বা হুজুরের হুকুম।

ভাঙা মনে আওরঙ্গজেব তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, তাহলে কাবুলে তাঁকে জানান।

পরদিন রাতে কাবুল জানাল, না। কিল্লার দেওয়াল বেয়ে ওঠার কোনও দরকার নেই।

সে-হুকুম কাসিদের হাত থেকে নিয়ে পড়তে পড়তে শাহজাদা অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। শেষে থেমে পড়লেন। তাহলে আমরা কিল্লাটা আরও জোরদার করে ঘিরে রাখি। যতদিন না কিল্লার ভেতর দুশমনের খাবার জল, রসদে টান পড়ে। খাবার, গোলায় টান পড়লে দুশমন কিল্লা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ শান্ত গলায় বললেন, কাবুলকে জানাই আগে—

—উঃ! কাবুল! কাবুল! আবার কাবুল?

—বাদশা নিজে যখন সেখানে রয়েছেন—তাঁকে তো জানাতেই হবে শাহজাদা।

দু'দিনের ভেতর খবর এসে গেল। না। কিল্লা-কান্দাহার ঘিরে রেখে আর সেপাই বা রসদ সাবাড় করার কোনও মানেই হয় না।

আওরঙ্গজেব আশা করেছিলেন, কিল্লা ঘিরে রাখার ব্যাপারে বাদশার সায় পাওয়া যাবে। সেই আশাতেই শাহজাদা সারাদিন এই ভয়ংকর গরমের ভেতর

ঘুরে ঘুরে সেপাই—কামান—সওয়ারদের জায়গা মতো বসিয়েছেন। তিনি ভাবতেই পারেননি—আব্বা হুজুর এবারও না করে দেবেন।

এই জবাব পেয়ে আওরংগজেবের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। এবারের কান্দাহার হামলায় দু'কোটি টাকা ঢালতে হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের ফৌজ কিল্লাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই অবস্থায় ঘেরাও তুলে নিলে কোন মুখে তিনি জাহানাবাদ ফিরে যাবেন ? আসল অবস্থা না জেনে সবাই তাঁকেই যে দুষবে। অথচ আমি তেমন করে লড়াই বা করলাম কোথায় ! লড়াই তো কাবুলে বসে খোদ বাদশা দূর থেকে চিঠি দিয়ে চালালেন। আমি তো এ-লড়াইয়ের সিপাহসালার নই।

কাবুল দুর্গে বসে বাদশা শাহজাহান চিঠি লিখছিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে। বাদশা রীতিমত অস্থির। কান্দাহারে তিন তিনবার হামলা চালাতে গিয়ে দশ কোটি টাকা হেলমন্দ দিয়ে গলে গেছে। তাছাড়া হাতছাড়া হয়ে যাওয়া আলি মর্দান খাঁয়ের কিল্লায় অন্তত দশ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, খাবার-দাবার ছিল। তাও দুশমনের হাতে পড়েছে। ময়ূর সিংহাসনের হিরে-জহরত, কোহিনুর দেখে বিদেশী ইলচিদের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে—কিন্তু সারা দুনিয়ার চোখে যে মুঘল ফৌজির শান আর সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে গেল ? এই হেরে যাওয়ায় তো মান থাকল না। ওদিকে খবর এসেছে গজনির দিক থেকে উজবেকরা মুঘল ফৌজের ওপর চড়াও হচ্ছে।

শাহজাহান শুরুতেই লিখলেন, এখুনি সরে এসো।

বাদশার ধারণা, শাহজাদা আওরঙ্গজেব এ লড়াইয়ের জন্যে বিরাট করে তৈরি হননি।

শাহজাদা তাঁকে লিখেছেন—হজরত। কিল্লা ঘিরে রাখার মতো কামান বা রসদ আমাদের সেভাবে নেই। কামান তো খুবই কম। তাই এই হামলায় মুঘল ফৌজের সামনে জয় সুদূর।

বাদশা এসব কথা ভাবতে ভাবতেই লিখলেন, আমি কিন্তু কিছুতেই কিল্লা-কান্দাহার হাতছাড়া করছি না।

শাহজাদা আওরংগজেবের লেখা চিঠিখানি আরেকবার দেখলেন বাদশা। শাহজাদা লিখেছেন, আমায় আফগানিস্তান বা পাঞ্জাবে থেকে যেতে দেওয়া হোক। তাহলে কিল্লা-কান্দাহারে পরের হামলায় অন্য কোনও সিপাহসালারের অধীনে সাধারণ মনসবদার হিসেবে লড়াই করার সুযোগ পাব। এজন্যে আমি দক্ষিণে সুবেদারির জন্য যে মাসোহারা পাই তা তিন তিনবার ছেড়ে দিতে চাই।

বাদশা তাঁর চিঠিতে এবার সাফ সাফ লিখলেন, তুমি দৌলতাবাদে ফিরে গিয়ে দক্ষিণে সুবেদারির ভার নাও ফের।

লাল হয়ে আসা এক আফগান সন্ধ্যায় বাদশার চিঠি এসে আওরংগজেবের হাতে পড়ল। তিনি বার বার চিঠিখানি পড়লেন। তারপর নিরুপায় হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ লড়াইয়ে আমার একটি ভুলই হয়েছে—তা হল—সারা হামলায় আমি ছিলাম সাদুল্লা খাঁয়ের পরেই। হামলার প্রথম মাসে আমি মাত্র একখানি

চিঠিই বাদশাকে পাঠাতে পেরেছি। সেখানে সাদুল্লা খাঁ আর বাদশার ভেতর ঘন ঘন চিঠি চালাচালি হয়েছে। আমি তো এখন আগ্রা-জাহানাবাদে ফিরলে হাসির খোরাক হয়ে উঠব।

এবার বাদশা লিখলেন, তুমি কিল্লা-কান্দাহার দখল করতে না পারায় রীতিমত অবাক হচ্ছি। ফৌজ বা রসদ—কোনওটাই তো কম দেওয়া হয়নি তোমাকে। মনে রেখো—ও কিল্লা ফিরে পাবার জন্যে আমি সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে যাব। তুমি কান্দাহার-কিল্লা উদ্ধার করতে পারবে বলে যদি আমি বিশ্বাসই করতাম—তাহলে তোমায় ফৌজ নিয়ে চলে আসতে বলতাম না। সব মানুষই কিছু কাজ করতে পারে।—অভিজ্ঞদের নির্দেশের দরকার হয় না।

ক'দিন বাদেই শাহজাদার জবাব এসে গেল কাবুলে। তিনি লিখেছেন—যার একটুও জ্ঞানগম্যি আছে—সে তার নিজের ভাল বোঝে আলমপনা।

সে-চিঠি পড়তে পড়তে হিন্দুস্থানের বাদশা কাবুল দুর্গের যে-অলিন্দ দিয়ে জাহানাবাদ যাওয়ার সড়ক দেখা যায়—সেখানে এসে দাঁড়ালেন। এই পথ দিয়েই শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে ফিরতে হবে। বর্ষা শেষের আকাশ। দুপুরের স্বচ্ছ রোদ। হিরাতের ব্যাপারীরা মালপত্র কেনাবেচা করতে সাধারণত কান্দাহার গিয়ে থাকে। সেখানে ফৌজি গোলাবারির দরুন ওরা এখন কাবুল বাজারেই আসে। কাজ সেরে তারা দল বেঁধে ফিরছে। শাহজাহান নিজের কাছেই মনে মনে জানতে চাইলেন, আমি কি আওরঙ্গজেবকে বুঝতে পারি? ওর মনে কী আছে কে জানে!

শাহজাদা সুজাঙ্গীর সুবেদারিকে বাদশাহী করে তুলেছে ঢাকায়—নিজের মতো করে। আমার এই ছেলে রূপে, দেমাকে, বিলাসে একদম শাহী কেতার নওজওয়ান। হপ্তাভর আয়েশ করে এক রোজে সুবেদারির সব কাজ সারে। তাই তো কানে এসেছে বাদশার। শাহজাদা মুরাদ বকস বেপরোয়া। বুনো মোষের মতো সামনাসামনিই লড়াই-ফয়সালা ভালবাসে। শাহজাদা দারাশুকো ভাবের পাগল। ফকির দরবেশ সাধু কবিদের নিয়ে আছে। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কর্ণাটক গান শুনেছে। চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের কাছে ফারসি রুবাই শুনেছে। সাত কাজে মাতোয়ারা মানুষ দারা।

কিন্তু আওরঙ্গজেব?

ওর মুখে আমি ওর আব্বা হুজুর হয়েও কোনওদিন হাসি দেখিনি। যে-ভাষায় আমাকে চিঠি লেখে—তা অতি হুঁশিয়ার ভাষা। তার চেয়ে কম কথায় কোনও কথা লেখা যায় না। মাথা খাটালে মনে হবে—ওর সেসব কথায় সাত আটরকম মানে হয়। কোন মানেটা ধরব—বুঝি না। ওর কথায় বিনয় নেই কোনও। আবার নেই কোনও বে-তমিজি। ওর মুখের কথায় বা চিঠির বয়ানে হৃদয়ের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। অথচ কাজের কথা হিসেবে পুরোপুরি সই সই। আওরঙ্গজেব আয়েশি বা বিলাসী নয়। বরং খুবই পরিশ্রমী। সাহসী। জেদি। আমার এই শাহজাদা কী চায়—আমি হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েও তা বুঝতে পারি না।

গোয়ায় পেঁৗছে ট্যাভারনিয়ারের চোখ খুলে গেল। এত বড় হিন্দুস্থানের পায়ের দিকে বড় বড় দরিয়া। ডানদিকে মালাক্কা পেরিয়ে দক্ষিণ নীলা দরিয়ায় পড়া যায়। আবার বাঁ দিয়ে হিন্দুস্থানি দরিয়ার চার দরজা—সিংহল, মাসকাত, হরমুজ, মোজাম্বিক। এই পাঁচ জায়গাতেই পর্তুগিজরা সবার আগে কিল্লা বানিয়ে কুঠি করেছিল। সব চলত এই গোয়া থেকেই। হিন্দুস্থানে ব্যবসা করতে হলে এ পাঁচ দুয়ার পেরিয়ে যেতে হবে। হিন্দুস্থান থেকে ইরান, আরব, আফ্রিকা চীন, জাপান, জাভা, মালয়, বালিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলেও দরিয়ায় এই পাঁচ দুয়ার পেরতে হয়। কিন্তু সব কিল্লা একসঙ্গে বজায় রাখতে গিয়ে ওরা ওলন্দাজদের হাতে মার খেয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে একহাতে কারবার—অন্য হাতে লড়াই একসঙ্গে চালানো যায় না।

আমেদাবাদে শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গে কারবার করে ট্যাভারনিয়ার নীচে গোয়ায় এসে পেঁৗছেছেন পাঁচ ছ'দিন হল। জায়গাটা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। মাণ্ডবী নদীর মোহানায় বাড়িঘর বেশ সাজানো। কিন্তু পর্তুগিজদের সেই রমরমা আর নেই। হিন্দুস্থানের মুখে ওই পাঁচ দুয়ারের দ্বারী পর্তুগিজরা একসময় গোয়ায় বসে হাতির দাঁত, সোনা, তিমির নাড়ির সুগন্ধীর কারবার করেই ফেঁপে-ফুলে উঠেছিল।

ট্যাভারনিয়ার উঠেছেন এক কন্নড়ী বাসিন্দার বাড়িতে একখানি ঘর নিয়ে। তিনি লক্ষ করেছেন, এখানে কন্নড়ীরা পর্তুগিজদের সব কাজের শাগরেদ। আদালতে পর্তুগিজদের হয়ে মামলা লড়া থেকে পর্তুগিজ ছেলেমেয়ে পড়ানো—মায় বন্দরে বন্দরে মাল খালাস থেকে ওঠানো সবই ওদের জিম্মায়।

গত কয়েকবারের হিন্দুস্থানে সফরের সময় তিনি গাঁয়ের দিকেও দেখেছেন, মাল কেনাবেচার ব্যাপারে পর্তুগিজরা ছোটখাটো কুঠি খুলে বসে আছে। হরমুজ যতদিন পর্তুগিজদের হাতে ছিল ততদিন ইংরেজ বা ওলন্দাজ ব্যাপারীরা ও পথ দিয়ে হিন্দুস্থানে আসতে পারেনি। ওরা তখন কান্দাহার দিয়ে ভাঙা পথে হিন্দুস্থানে এসেছে। তখন গেছে পর্তুগিজদের বাবুয়ানির দিন! সেরকম রইসি পর্তুগিজকে ট্যাভারনিয়ার পথে ঘাটেও দেখেছেন। ছত্রিশ বেহারার সুখদোলা চড়ে তারা যাতায়াত করত। একদিকে চীন জাপান আরেক দিকে ইরান, আরব, আফ্রিকা—মহা-দরিয়ায় দুদিকে ছড়ানো বিশাল ব্যবসা-পাতির কলকাঠি নিজেদের হাতে থাকায় ওরা সবাই ধনী, সবাই ফিডালগো—বনেদি ভদ্রলোক বনে যায়। নামের সঙ্গে ডোম পদবি তো জুড়বেই। যে কন্নড়ীর বাড়ি উঠেছেন ট্যাভারনিয়ার—তার সঙ্গে সন্ধেবেলা বসে কথা হচ্ছিল। একথায় সেকথায় কন্নড়ী জানাল—সোনা-মোহরের গরমে রাতারাতি ফিডালগো বনে গিয়ে ডোম কথাটি নামের সঙ্গে জুড়লে কী হবে, স্বভাবের বুনো দিক যায়নি কিন্তু ওদের। কোনও পর্তুগিজ যদি একবার তার বউকে সন্দেহ করে তো হয় বিষ খাইয়ে নইলে ছুরি মেরে তাকে খুন করবেই।

ঠিক এমন সময়—কন্নড়ীর বাড়ির সামনে হতশ্রী একটি পালকি এসে থামল। সমুদ্রে যতক্ষণ বাতাস থাকে—ততক্ষণ এখানেও হাওয়া লুটোপাটি খায়। সেই

বাতাসে পালকি বেহারাদের কাঁধের আড়াল-কাপড় যেন আগুনে শিখা হয়ে ওপর দিকে মুখ করে উড়ে উঠল। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর পালকির পাশ থেকে একটি কন্নড়ী বালক এসে নমস্কার করল।

কন্নড়ী সশ্রদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ট্যাভারনিয়ারকে বলল, নিশ্চয় কোনও বনেদি পর্তুগিজ মহিলা এসেছেন। ওই ছেলেটি তাঁর চাকর।

ট্যাভারনিয়ার অবাক হলেন, আমার কাছে?

—হ্যাঁ। আপনার কাছে। আপনি একজন হিরেমুক্তো কারবারি। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন।

—আমি তো এখানে কাউকেই চিনি না। আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন কেন?

এবার কন্নড়ী চোখ টিপল ট্যাভারনিয়ারকে, বোঝেন না কেন মশায়। একসময় খুব সম্পন্ন ঘরের মানুষ ছিলেন।—বলতে বলতে কন্নড়ীর কাছে এগিয়ে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, হয়তো কিছু সাহায্য চাইতে এসেছেন—

—ওঃ! —বলে নিজেকে সামলে নিলেন ট্যাভারনিয়ার। ভাবলেন, দুটো সোনালি ডুকাট বালক চাকরটির হাতে দিয়ে দেবেন। তারপর কী খেয়াল হল—অনেকদিন ইউরোপের কোনও মহিলার মুখ দেখেননি তিনি। ট্যাভারনিয়ারের বয়স এখন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। শরীরে কোনও রোগ-বালাই নেই। এমনিতেই তিনি বেশ তাগড়া। তার ওপর তাঁর স্বভাবও খুব স্বাস্থ্যকর। হাঁটাচলার ওপরেই থাকেন ট্যাভারনিয়ার। বললেন, উনি ভেতরে আসুন না। এক পাত্র মুখে দিলে চাঙ্গা হয়ে যাবেন—

ফরাসি মদিরার দুটি বোতল মজুদ ছিল। মহিলাকে বসালেন ট্যাভারনিয়ার। তারপর বললেন, দক্ষিণ ফ্রান্সের এ মদিরা হয়তো আপনার ভাল লাগতে পারে।

এতক্ষণ মহিলার মুখের ওপর পাতলা মসলিনের আড়াল ছিল। ট্যাভারনিয়ার গ্লাস এগিয়ে দিতেই পর্তুগিজ মহিলা মুখের আড়াল সরিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে হাসলেন। গ্লাসটি হাতে নিলেন।

ট্যাভারনিয়ারের মনে হল—বয়স বড় জোর পঁয়ত্রিশ। গঠন-গাঠন খুবই সুন্দর। মাথার চুল লালচে। চোখের মণি কালো। গায়ে এক সময়কার একটি দামি স্কার্ট। তার জায়গায় জায়গায় রিফু। আশ্চর্য! মোহর, আশরফি, ডুকাট, রিয়াল বড় চঞ্চল। ওরা শুধু মানুষের হাত বদলায়। যার কাছে থাকে সে ধনী। যাকে ছেড়ে যায় সে গরিব।

মহিলা যেন এমন মদিরা অনেকদিন খাননি। বেশ আগ্রহভাবেই তাড়াতাড়ি পানপাত্র শেষ করে ফেলেছিলেন। হঠাৎ ট্যাভারনিয়ার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা জরুরি কাজে আমাকে বন্দরে যেতে হবে। আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে এখানে বসতে পারেন। আরও একটি বোতল রইল আপনার জন্যে। —বলে চারটি সোনালি ডুকাট টেবিলের ওপর রেখেই তিনি রাস্তায় নেমে এলেন। সেখানে জ্যোৎস্নায় ধনী বা গরিব বলে কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না কাউকে। এগিয়ে যেতে যেতে ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, মহিলা মাথা নিচু করে ডুকাট চারটি হাতে তুলে নিলেন।

কয়েক মাস হল লাহোরে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন শাহজাদা সুজা। সেই ঢাকা থেকে তাঁকে আসতে হয়েছে। আশা ছিল কিল্লা-কান্দাহারের লড়াইয়ে তিনিই হবেন মুঘল ফৌজের সিপাহসালার। তা তাঁকে করা হয়নি। অপমানের যন্ত্রণায় তিনি বেশিরভাগ দিনই কাটাচ্ছেন—রাভির জলে মাছ ধরে। নয়তো লাহোরের নামী গানেওয়ালিদের আনা হচ্ছে শাহজাদার তাঁবুতে।

এমন সময় একদিন ভোর ভোর ফৌজি কাসিদ এসে বাদশার হুকুম তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল। হুকুমি হাতচিঠি পড়ে তো শাহজাদা সুজা তাজ্জব! এরকম হুকুম কি কোনও আব্বা হুজুর তাঁর ছেলেকে দিতে পারেন? আশ্চর্য।

বাদশা লিখেছেন: ফেরার পথে দুই শাহজাদা—সুজা আর আওরংগজেব যেন এক মঞ্জিল আগে-পিছে লাহোর থেকে দিল্লি অব্দি রাস্তা পার হয়।

তার মানে এই শাহী হুকুমনামা আমাকে আর ছোটে ভাই শাহজাদা আওরংগজেবকে একই সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। কী অবিশ্বাস। তিনি চান—আমাদের দুভাইয়ের ভেতর যেন কোনওরকম দেখাশুনোই না হয়।

আশ্চর্য। একজন আব্বা হুজুর এভাবে তাঁর দুই ছেলেকে হুকুম পাঠাতে পারেন? তিনি হিন্দুস্থানের বাদশা হলেও তো আমাদেরই আব্বা হুজুর।

যত বিশ্বাস—যত স্নেহ-ভালবাসা সবই কি শুধু বড় ছেলের জন্যে তুলে রাখতে চান আব্বা হুজুর? সকালবেলাতেই মনটা ভারী হয়ে এল শাহজাদা সুজার। তাগদের সঙ্গে যেখানে ধন-দৌলতের মেলবন্ধন হয়—সেখানে কি ইনসানের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো আগাগোড়া মুছে যায়? মা-ছেলে, ছেলে-বাবা, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ভাব-ভালবাসা কিছুই নয়!

শাহজাদা সুজা বাদশার হুকুমনামাখানি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন।

॥ একানব্বই ॥

হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান কখন কোথায় থাকবেন—কেউ বলতে পারে না। মনসবদারি সুবেদারি পাবার পর থেকে গত প্রায় বিশ বছর ধরেই শাহজাদা দারাশুকো লক্ষ করছেন—আব্বা হুজুর কোথাও থিতু হয়ে থাকেন না। হিন্দুস্থানের মুলুকে-মালিক বাদশা শাহজাহান এই যদি সকালে সাকেত ছাউনিতে আরবি টাট্টুর খেলা দেখছেন—তো বিকেলে তিনি নারোয়ার জঙ্গলে হাতির পিঠে বসে—পোষা নেকড়েদের তখন বুনো শুয়োর তাড়িয়ে আনতে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাশ্মীর তো সেই কাবুল। আর বলা নেই কওয়া নেই—বছরের ভেতর অন্তত দশবার তো লাহোর যাওয়া চাই-ই চাই। কিল্লা-লাহোরের গা দিয়ে রাভি বয়ে চলেছে। সামান বুরুজে দাঁড়িয়ে বাদশা শাহজাহান নীচে রাভির জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আব্বা হুজুর সেই লাহোরেই ডেকে পাঠিয়েছেন শাহজাদা দারাশুকোকে। শাহজাদা উপস্থিত কাবুল আর মুলতান দুই সুবার সুবাদার। কাবুলে নিজের ছেলে সুলেমান শুকোকে—আর মুলতানে বিশ্বাসী মহম্মদ আলি খাঁকে নায়েব

সুবেদার করে রেখে শাহজাদা দারা চলেছেন লাহোর।

অল্পদিন আগে এ-পথ দিয়েই কান্দাহার ফেরত মুঘল ফৌজ জাহানাবাদ ফিরে গেছে। এ-পথেই শাহজাদা দারার আরেক ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব এমনিভাবেই হাতির পিঠে গাদেলায় বসে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে আগ্রা জাহানাবাদের পথ পাড়ি দিয়েছেন।

কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে নীচের দিকে যতই নেমে আসা যায়—শীত ততই কমে আসে। কাবুলে শীত মানে তুষারে চাদ্দিক ঢেকে যাওয়া। সেই তুলনায় লাহোরের দিকে যতই এগোনো যায়—ততই শুধু পশমিনা আর মোটা পশমের খিরকার ভেতর নিজের শরীরটা ঢেকে নেওয়া।

শীতের দুপুরে শাহী সড়কের দুধারে নিস্তব্ধ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা দারার মনে হল—পৃথিবী কত শান্ত! আর আমরা মানুষেরা কতই অশান্ত। জঙ্গলের জানোয়ারকে বশ করে তার পিঠে চড়ে দূরান্তের পথ পাড়ি দিচ্ছি। এর ভেতর আছে জায়গা দখলের লড়াই। তাঁবে রাখার নেশা। মৃত্যুকে মহান করতে বিশাল মকরবা—স্মৃতিসৌধ।

শাহজাদার পাশের হাতির পিঠেই মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। বেশ বয়স হয়েছে। চোস্ত ফারসিতে গতকালও তিনটি রুবাই লিখেছেন। এখন শীতের মোলায়েম রোদ থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে মাথার সামনের দিকে পাগড়ির পাগ কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

চার দিককার চেহারা-ছবি দারার খুবই ভাল লাগছিল। ঘোড়সওয়াররা লাল ধুলো উড়িয়ে আগে-পিছে চলেছে। হালকা কিন্তু তেজি বাতাসে মুঘল ধ্বজ পতপত করে উড়ছে। তার ক্ষীণ ছায়া রাস্তার ডানদিকের পাথুরে মাটিতে সরে সরে চলেছে।

শাহজাদা বললেন, এখন হিন্দুস্থানের দেহাতে বেরলে তবু দু'চারজন মুসলমানের মুখ দেখা যায়। আগে শুধুই রাজধানী আগ্রা, দিল্লি, এলাহাবাদ, লাহোর আর ফৌজি ছাউনিতে—শাহী দেওয়ানখানায় মুসলমানদের দেখা যেত। ওখানেই ওদের ভিড় হত।

মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ যুবক হয়ে উঠেছিলেন আকবর বাদশার আমলের শেষদিকে। তিনি বললেন, শাহজাদা। আমি লাহোরে বড় হয়েছি। ছেলেবেলা কেটেছে শিয়ালকোটে। রাজধানী আগ্রায় যাবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু আগ্রা ফেরত মানুষজনের কাছে শুনেছি—তখনকার শাহী দরবারেও মুসলমান ছিলেন গোনাগুনতি। আকবর বাদশার বড় বড় কাজে ছিলেন তো রাজপুত আর ফতেহাবাদী গুণী কায়েতের দল।

—মুঘলদের আগে সুলতানি জমানায় যা-কিছু মুসলমান এসেছে।

চন্দ্রভান বললেন, অনেক হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

—খুব বেশি নয় কবি চন্দ্রভান। এত বড় হিন্দুস্থানে তেমন মুসলমান কোনও হিসেবেই আসে না। এখন হিন্দুস্থানের দেহাতে বেরলেই যে দু'চারজন মুসলমানের মুখ দেখা যায়—এরা কারা?

—শাহজাদা। এ-ব্যাপারে আমার একটা অনুমান আছে। যদি বলেন তো বলি।

—নিশ্চয় বলবেন।

—বাবর কিংবা হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে যেসব মুঘল আসেন—তাঁদের বেশির-ভাগই তখন নিজের নিজের দেশে ফিরে যান। যাঁরা রয়ে গেছেন—তাঁরা এমন করেই হিন্দুস্থানের আলো-বাতাস-জলে গা ঢেলেছেন—তাঁদের আর নতুন করে মুঘল বলে চেনার উপায় নেই।

—কবি। আপনি ঠিক কী বলতে চান ?

—ধৈর্য ধরুন শাহজাদা। আমার মনের ভেতরেও অনুমানটা এখনও পুরোপুরি দানা বেঁধে ওঠেনি। আমি এভাবে ভেবেছি—হিন্দুস্থানের আদি বাসিন্দা হিন্দুরা যখন দেখল, আগ্রায় যিনি বাদশা তিনি তাঁদের ধর্মে হাত দিচ্ছেন না—বরং ধর্ম পালনে—তীর্থযাত্রায়, মন্দির মেরামতে সাহায্য করছেন—তখন তাঁরা আগ্রার বাদশাকে ভাবলেন তাঁদের জান-মালের ত্রাতা। তাঁরা তখন বাদশার ধর্ম ইসলামের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—সে-ধর্মে সাম্য—সমদৃষ্টি রয়েছে—আধ্যাত্ম পথের সিঁড়ি ওপরে ওঠার আভাস দেয়—তখন অনেকেই ইসলামকে বরণ করেন।

—এ সিদ্ধান্তে আসছেন কেন ?

—শাহজাদা। আপনিই বলছিলেন—হিন্দুস্থানের দেহাতে বেরলে এখন দু'চারজন মুসলমানের মুখ দেখা যায়। কেন যায় ?

—সে আমি জানি না কবি।

—দেখতে পান—কারণ, হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে ধাঁ ধাঁ করে বেড়েছে। নইলে পথে-ঘাটে আজকের মতো এমন হামেশা মুসলমানের মুখ দেখা যেত না আগে। মুঘল ফৌজেও আগের তুলনায় এত বেশি করে মুসলমান পাওয়া যেত না।

—বাড়ছে কী করে কবি ? সবারই কি ছেলেমেয়ে বেশি করে পয়দা হচ্ছে ?

—না। তা নয়।

—তাহলে ? শাহী হুকুমে সবাই মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ? না, সুযোগ-সুবিধা বেশি করে পাওয়ার লোভে অনেক হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে ?

—ভয়ে নয় শাহজাদা—লোভেও নয় শাহজাদা। আমার অনুমান—ইসলামের গুণে বহু হিন্দু এগিয়ে এসে এই পঞ্চাশ বছরে ইসলামকে গ্রহণ করেছে। মুসলমান হয়েছে। তাই আচমকা আমাদের চোখে পড়ছে শাহজাদা। এটা হল গিয়ে আকবর বাদশার দীর্ঘদিনের সুশাসনের সুকীর্তির ফল।

শাহজাদা দারা গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগ্রা জাহানাবাদের কাঠ-মোল্লারা খোলা হওয়ার মুখে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চায়। তিনি বললেন, জানেন কবি! সত্যকে যখন নিজের বুকে অনুভব করি—তখন বুঝতে পারি গভীর জায়গায় হিন্দু আর ইসলামে কোনওই ফারাক নেই। আমি জানি—আমার এই কথা জামা মসজিদের উলেমাদের আঘাত করবে। তারা রেগে যাবে। তাই একথা

শুধু আপনার আমার ভেতরেই থাক।

কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বললেন, থামলেন কেন শাহজাদা! বলুন।

—ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়, জ্যোতি, গ্রহ-নক্ষত্রের বেলায় হিন্দু আর মুসলমান ধারণার ভেতর পার্থক্য প্রায় নেই। কোরানে আছে—নীল নদের দুটি শাখা—বাহর-উল আবয়াদ আর বাহর-উল-আসওয়াদ। একটি শ্বেত নদী। অন্যটি নীল নদী। এরা খার্তুমে এসে মিলেছে। এই মোহানার নাম মাজমায়াল-বাহরায়েন। আমার মনে হয় কবি—হিন্দু আর মুসলমানের মোহানা হল গিয়ে এই হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানই আমার চোখে হিন্দু মুসলমানের মাজমায়াল-বাহারায়েন।

কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ একদিকে যেমন ফার্সিতে শিক্ষিত মানুষ—অন্যদিকে মুঘলশাহীর একজন তুখোড় আমলা। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান—তিন বাদশার আমলেরই বড় বড় ঘটনার তিনি সাক্ষী। উপরন্তু চন্দ্রভান নিজে একজন পুরোদস্তুর কবি। তিনি অবাক হয়ে এই উদার শাহজাদার প্রতিভাময় মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোনও কথা বলতে পারলেন না।

দারা বললেন, বেদে কোরানের বিশদ ব্যাখ্যা আছে কবি। কোরানে যে গুপ্ত গ্রন্থের কথা আছে—তা হল বেদ। আমার এই স্বাধীন চিন্তা সনাতনী ধর্মান্ধ মুসলমানরা সহ্য করবে না। তারা আমায় অভিযুক্ত করবে। কিন্তু আমি যদি জানি একজন কাফের পাপের পঙ্কে ডুবে আছে অথচ তার গলায় তৌহীদ—একেশ্বরবাদের সঙ্গীত—আমি তার কাছে যাব—তার গান শুনব—তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। হিন্দু-মুসলমানের ভেতর কোনও মৌল পার্থক্য নেই। ইসলাম আর হিন্দুধর্ম—দুই-ই আল্লার কাছে যাবার জন্যে বড় বড় পা বাড়িয়ে চলেছে। তিনি এক। তাঁর ওপরে কেউ নেই।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বললেন, উপস্থিত শাহজাদা আপনি লাহোর চলেছেন। সেখানে গিয়ে আপনাকে ফৌজি বন্দোবস্ত দেখতে হবে। তৈরি হতে হবে আগামী বসন্তে কিল্লা-কান্দাহার ইরানিদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে। হামলা। লড়াই। আপনার নসিবে এই দুটি জিনিস অপেক্ষা করছে।

—উঃ! ফের লড়াই! ফের হামলা। দেখুন না—এ পথ দিয়ে আওরঙ্গজেবের ফৌজ ফিরেছে। রাস্তার দুধারের গাঁগুলো দেখুন। খাঁ খাঁ করছে। সেই যে তারা ফৌজ দেখে পালিয়েছে—আজও তারা ফেরেনি। তাহলে এই লড়াই হামলায় লাভটা কোথায়?

—শাহজাদা! হিন্দুস্থান চলে শাহী ইচ্ছায়। এখানে আমার কোনও মতামত থাকতে পারে না।

—যে যা-ই করুক কবি—ইনসাফির তো একটা দিক আছে—ন্যায় বিচারের তো একটা দিক নির্দেশ আছে। তাতে কি এই হামলা—লড়াই যুক্তির পথে টেকে?

—আমি কী বলব শাহজাদা! আমি সামান্য কবি। হিন্দুস্থানে তিন তিন বাদশার আমলে আমি হুকুমবরদার মাত্র। আমি কাজ করে গেছি। কাজ করেই যাব। প্রশ্ন তোলা আমার কাজ নয়।

কঠিন শীত অন্ধকার হয়ে আসা বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। হাতি, ঘোড়া, উটদের গায়ে মোটা কম্বলের বিছানি বিছিয়ে দেওয়া চলছে। সামনে রাত। শাহজাদা দারা তাঁর পায়ের দিকে দু'খানি পশমিনা পরপর চাপিয়ে দিলেন।

শাহজাদা সুজা তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরছিলেন। সেই কোন ঢাকা থেকে শুধু শুধু এতটা রাস্তা কুচ করে যাওয়া। নিজের ভেতর জ্বলে ওঠা আশার আগুনে নিজে নিজেই জল ঢেলেছেন শাহজাদা সুজা। তিনি ভেবেছিলেন—বড়ো ভাই শাহজাদা দারাশুকো দু'দুবার কান্দাহার গিয়েছেন। ছোটে ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেবও একবার কিল্লা-কান্দাহার উদ্ধারে গিয়ে ফিরে এসেছে। এবারে আব্বা হুজুর নিশ্চয় ফৌজের মাথায় আমাকেই সিপাহসালার করে পাঠাবেন। কিন্তু সিন্ধু পেরবার আগেই আব্বা হুজুর ফেরার হুকুম দিলেন। তারপরেই সেই শাহী ফরমান। ফেরার পথে যেন তাঁর ফৌজ আর শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ফৌজের ভেতর দু'তিন মঞ্জিল রাস্তার ফারাক থাকে।

কাল সারারাত শাহজাদা সুজার ফৌজ, হাতির দঙ্গল, কামানের গাড়ি, উটের কাতার, বন্দুকচীর দল সরকার কোয়েল পার হয়েছে। ইচ্ছে—দিনে দিনে জাহানাবাদে পেঁছে যাওয়া। এক মুহূর্তও চোখ বোজেননি সুজা। তিনি আয়েশি মানুষ। কিন্তু তাঁর মুখখানি এতই সুশ্রী—রাত জাগার কোনও চিহ্নই নেই এখন সেখানে। শীতের ভোরের রোদ এসে পড়ছে তাঁর মুখে। তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছেন—হিন্দুস্থানের নয়া রাজধানী জাহানাবাদ খুবই কাছে। কেননা, ঘরের কাজকর্ম—দোকানপাটের কাজকর্ম সারতে নেহাত গরিব-গুর্বো মানুষ সব খর পায়ে রাজধানী চলেছে। এখন নিশ্চয় রাজধানীর সরাই-খানাগুলো খুলে গেছে। আমি যদি সাধারণ মানুষ হতাম—তাহলে ইচ্ছে করলেই এক পাত্র সুরুয়া গরম করে খেয়ে নিতাম। তাতে চাঙ্গা হওয়া যেত।

জায়গাটা দেখে সুজা বুঝলেন, তিনি তুঘলকাবাদের কাছাকাছি এসে গেছেন। তার পেছনেই পড়ে আছে সরকার হিসার। কাল রাতে তিনি ছিলেন সরকার কোয়েলে। সেখানে বড়ো ভাই শাহজাদা দারাশুকো রাহদার। সম্বচ্ছরে বাইশ লাখ তনখার রাহদারি পেয়ে থাকেন তিনি। আবার সরকার হিসারেরও তিনি ফৌজদার। রাজধানীর গায়ে সবচেয়ে স্বচ্ছল সরকার। আর আমি! ঢাকায় মজে আছি কত বছর হয়ে গেল! আমাদের নসিবে কোয়েল সরকারের রাহদারি নেই—নেই হিসারের মতো সরকারের ফৌজদারি।

তার ওপর আবার এই—

এই কথাটি বিড়বিড় করে বলেই নিজের মনের ভেতর যন্ত্রণায় শাহজাদা সুজা অস্ফুটে উঃ! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। আশপাশে কেউ আছে কিনা দেখলেন। নাঃ। নেই। এত বড় আশাভঙ্গের পর এতখানি অবিশ্বাসের অপমান! শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ফৌজ থেকে নিজের ফৌজ সবসময় দু'তিন মঞ্জিল রাস্তার ফাঁক রেখে কুচ করবে।

কত বড় অবিশ্বাস? শীতের ভোরবেলায় পাহাড়ি টিলাগুলোর ফাঁক দিয়ে সামান্য গেরস্থ ঘরের ঘরকন্নার আরও সামান্য সব জিনিস চোখে পড়ে সুজার। এখানে সেখানে সর্ষে শাকের চাষ। দু'এক ঘর ঝুপড়ির সামনে দুধেল মোষ বাঁধা। সুজা জানেন, সম্পন্ন ঘরেলু মানুষ তাদের খেয়ে ওঠাবসা মানুষজনের ঘরে গোরু-মোষ পোষানী দেয়। নিশ্চয় মোষগুলো গাভিন এখন। কোনও খুঁটি-নাটিই তাঁর চোখ এড়ায় না।

একটি কারণে তাঁর মন অস্থির হয়ে আছে। আব্বা হুজুরের এতখানি অবিশ্বাস কেন? কার জন্যে? হিন্দুস্থানের বাদশা কি এতই দুর্বল? দুই শাহজাদার ফৌজকে তাঁর এত ভয়? হিন্দুস্থানের বাদশার হাতের ইশারায় সারা হিন্দুস্থানের যেখানে যত ফৌজ আছে—সব এসে তাঁর সামনে দাঁড়াবে। সেখানে ঘোড়সওয়ারই হবে ন'লাখের মতো। সেই বাদশা তাঁর দুই ছেলের ফৌজকে ডরান! আশ্চর্য! তাহলে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান কার জন্যে এতখানি হুঁশিয়ার? পাছে দুই শাহজাদা এক হয়ে ঘোঁট পাকায় সেজন্যেই তো ওই ফরমান। নিতান্ত অপমানকর ফরমান। কার জন্যে? শাহজাদা দারার জন্যে আর কত তিনি গুছিয়ে রাখতে চান? এত আঁটঘাটই বা বাঁধা কেন? বাদশা শাহজাহান। আমিও তো একজন শাহজাদা। আমিও তো আব্বা হুজুর—আপনারই ছেলে।

সকালবেলার রোদ ফাঁকা প্রান্তরে এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার শাহজাদা সুজা যেন তাঁর অপমানের বহরটা দেখতে পেলেন। ওই দূরে উটের কাতার অব্দি সেই অপমান—সেই অবিশ্বাস ছড়ানো।

কাল রাত থাকতেই তাঁর মন বলছে—তাঁর ফৌজের কাছাকাছি যেন আরও একটি ফৌজ চলেছে। অন্ধকারে একই সেই হাতির চলাফেরার শব্দ। উটের কাতারের কুঁই কুঁই আওয়াজ। তাঁবু-বরদারদের মোটা খুঁটি তুলে ফেলার হেঁইয়ো হেঁইয়ো আওয়াজ যেন তাঁর কানে এসেছে।

কাজেই দেহাতি কোনও ঘর থেকে কে যেন ভৈরবীর তান তুলল। অবাক হলেন সুজা। ভোরবেলা এমন লয়কারি দিয়ে কোন দেশের সাধারণ মানুষ গান ধরে? আর। হিন্দুস্থান। আমার হিন্দুস্থান। ভাবতে ভাবতে শাহজাদা সুজা এগোতে থাকেন।

রীতিমত জলদে ঘোড়ার ক্ষুরে আওয়াজ তুলে কে যেন ছুটে আসছে। শাহজাদার শিক্ষিত কান কী এক দৈবী আনন্দে নেচে উঠল। ভৈরবীর তানকারির সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের লয় সমে সমে মিশে যাচ্ছে। ভোরবেলার বাতাসে আজ কী এক অজানা আনন্দ। শাহজাদার মনের অবসাদ, অপমান, অবিশ্বাসের কালো যন্ত্রণা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দূর থেকে একটি দুধ-সাদা তুর্কি ঘোড়া তীর হয়ে ছুটে আসছে। তার পায়ে ভোরবেলার ছাই ছাই পাথুরে ধুলো। হাঁটুতে রঙিন ঝালর। মালার ওপর সোনালি ঢাকায় রোদ পড়ে ঝিলিক দিল। বেশ ক'হাত দূরে এসে ঘোড়াটি থমকে থামল—শূন্যে সামনের দু'পা তুলে। আর অমনি সেই ঘোড়ার সওয়ার লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে।

চমকে শাহজাদা সুজা তাঁর নিজের কোমরবন্ধনীতে হাত রাখলেন। তলোয়ার বের করবেন। ঠিক এইসময় সওয়ার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পুরোদস্তুর কুর্নিশ করতে করতে বললেন, বাঙলার সুবেদার বাহাদুর। বে-দৌলত-বদ-নসিব শাহজাদার সালাম নিন—

ছুটে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন শাহজাদা সুজা। ছোটে ভাই। শাহজাদা আওরঙ্গজেব এত সুন্দর! শুনেছি—সে খুবই সুন্দর। কিন্তু এত সুন্দর।

আওরঙ্গজেব সুজার বুকে বুক লাগালেন। দু'ভাইয়ের বুকের ওপর বিষ-তীর বিফল করার জন্যে লোহার পাত বসানো। মাথাতেও তাই। একই জিনিস দুই হাতের শুরু থেকে কনুই অব্দি। তাই দু'তরফের লোহার ঘষাঘষি একটা আওয়াজ তুলল।

তারপর দু'জন দু'জনকে ছেড়ে মুখোমুখি দাঁড়ান।

সুজা বললেন, কতদিন হয়ে গেল। দেখা হয় না আমাদের।

আওরঙ্গজেব বললেন, আমার বদকিসমতি ছাড়া কী। এমন সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত চেহারার বড়ে ভাইকে না দেখে কী করে এতগুলো বছর নর্মদার ওপারে পড়ে আছি।

—হ্যাঁ শুনেছি। ফের তোমায় দক্ষিণের সুবেদারিতে বদলি করেছেন আব্বা হুজুর।

আওরঙ্গজেব তসলিম জানিয়ে বললেন, হজরত! আগ্রা-জাহানাবাদ চায় না আমরা কেউ রাজধানীর কাছাকাছি থাকি—

চমকে চোখ তুলে তাকালেন সুজা। কালো ভ্রূ। হলুদ আভা ছড়ানো সফেদ গায়ের রং। চোখের মণি দুটি কালো। এক মাথা ঘন কালো চুল। আওরঙ্গজেবের শরীরে কোথাও একটু মেদ নেই। সুজা বললেন, কিরকম?

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বুকের ওপর বর্মের নীচে মোলায়েম রেশমের আঙ্গিয়া। তার ভাঁজে একখানি চিরকুট গোঁজা আছে। গতকালই যমুনা পেরবার সময় আওরঙ্গজেব এই চিরকুট পান। কাসিদ এসে দিয়ে যায়। ছোট্ট চিরকুট। তাতে মাত্র একটি ছত্রই লেখা। ছোটে ভাই। তোমার মতো একই চিঠি পেয়েছেন শাহজাদা সুজা। তোমারই রৌশন।

এই চিরকুটখানিই যেন ভোর থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে চালিয়ে নিয়ে ফিরছে।

—কত বছর হয়ে গেল আপনি সেই ঢাকায় পড়ে আছেন। রাজধানী থেকে কতদূরে।

—ঢাকা তো খারাপ জায়গা নয় আওরঙ্গজেব।

—খারাপ নয়। কিন্তু রাজধানী থেকে অত দূরে—স্বীকার করতেই হবে—হুকুম, তাগদ, ফরমান, খেলাত, খেতাব, ইজ্জতের ফোয়ারা তো রাজধানী। সেখান থেকে ঢাকা কিংবা দৌলতাবাদ—দুইই তো নির্বাসন বড়ে ভাই! আপনি কতদিন গঙ্গার ওপারে—আমিও বহুদিন নর্মদার ওপারে। ভেবেছিলাম নসিব বুঝি ফিরল। নাঃ। আবার সেই দৌলতাবাদে ফিরে যাবার হুকুম হয়েছে। শাহজাদা

মুরাদেরই বা কী ভেবে দেখুন।

ভৈরবীতে দেহাতি গলার রেওয়াজের সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের জলদ আওয়াজ মিশে যাওয়ায় শাহজাদা সুজার মন যতখানি সাড়া দিয়ে উঠেছিল—আওরংগজেবের এসব কথায় সেই আনন্দের দশা যেন ছিঁড়ে গেল। তিনি চুপ করে ছোটে ভাইয়ের মুখে তাকালেন।

আওরংগজেব বললেন, শাহজাদা মুরাদ বকস্ আজ ক'বছর হল মালব আর গুর্জরের ভেতর যাতায়াত করছেন। কখনও মালবে সুবেদারি, কখনও গুজরাতে। হিন্দুস্থানের বাদশা যেখানে পাঠাবেন সেখানেই তো যেতে হবে আমাদের। —কথায় সুজা হঠাৎ হুঁশিয়ার হয়ে পড়লেন। তিনি আন্দাজ করতে পারছিলেন না—শাহজাদা আওরংগজেব ঠিক কী বলতে চান।

সুজা বলে বসলেন, বড়ে ভাই শাহজাদা দারাও তো গুজরাতে সুবেদার ছিলেন।

—হ্যাঁ তিনি ছিলেন। তিনি একই সংগে দুই সুবায় সুবেদারিও তো করেন!

সঙ্গে সংগে শাহজাদা সুজার মনে পড়ে গেল—তাঁর বহুদিনকার ইচ্ছা—বাঙলার সংগে বিহারের সুবেদারিও তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু আগ্রা তা কানে নেয়নি। অথচ শাহজাদা দারা একই সংগে কাবুল আর মুলতান—দুই সুবারই সুবেদার এখন। সামনের বসন্তে তিনিই কিল্লা-কান্দাহারের জন্যে মুঘল ফৌজ নিয়ে কুচ করে এগোবেন।

—সে তো ছোটে ভাই তোমাকেও করতে হয়। তুমি শাহজাদা আওরংগজেব বাহাদুর আসলে সুবেদার-ই-আজম! দক্ষিণে চার সুবার ওপরে তুমি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে শাহজাদা আওরংগজেব এগিয়ে এসে বড়ে ভাইয়ের কদমবোসি করলেন সামান্য ঝুঁকে। তারপর নিজেই তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন।

সংগে সংগে সুজা এগিয়ে এসে আওরংগজেবকে তাঁর মুখোমুখি দোলায় বসালেন। হিন্দুস্থানের দুটি ইচ্ছা। এখন দুই দোলায় মুখোমুখি। এক ইচ্ছার বয়স চৌত্রিশ। অন্যের ছত্রিশ। দু'জনই ফৌজি পোশাকে। দু'জনেরই পেছনে পড়ে আছে রাত জাগা অপমান, আশাভংগ।

দোলায় বসেই আওরংগজেব বললেন, আমি, আপনি, আওরংগজেব মুরাদ বক্স—আমরা সবাই সুবেদারি করি সুবায় বসে। একসংগে চার সুবার সুবেদারি আমায় সুবায় সুবায় ঘুরে ঘুরেই করতে হয়। কিন্তু শাহজাদা দারার দিকে তাকান। তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে কাবুল, মুলতান, লাহোর, গুজরাত, এলাহাবাদ—যেখানেই সুবেদার করে পাঠানো হোক না কেন—তিনি থাকবেন বাদশার চোখের সামনে রাজধানীতে—নয়তো বাদশার সফরসংগী হয়ে। আর সুবাগুলো? সেসব দেখবে বড়ে ভাইয়ের বিশ্বাসী মানুষজন। যেমন এলাহাবাদে বাকি বেগকে নায়েব-সুবেদার করে রাখা হয়েছিল। এখন কাবুলে নায়েব সুবেদার সুলেমান সুকো—মুলতানে মহম্মদ আলি খাঁ।

—সুবেদার হওয়ার পর সুবা ছেড়ে কি থাকা যায়? সে কেমন লাগে?

সুবার শান, রওশন ছেড়ে বড়ে ভাই কী করে বাদশার ছায়াসঙ্গী হয়ে কাটান—এ আমি বুঝি না ছোটে ভাই।

—শান, সওকত, রওশনের তো অভাব নেই কোনও। রাজধানীর কাছাকাছি দু'জায়গায় তিনি ইচ্ছা করলেই পা রাখতে পারেন। সরকার কোয়েলের তিনি রাহদার। সরকার হিসারের তিনি ফৌজদার। রাহদারির আদায়ের সঙ্গে ফৌজদারির রওশন মিশে গিয়ে কম কিছু তো হয় না। তাছাড়া—

—শাহজাদা সুজা মনে মনে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করতে করতে বললেন, কী?

—হিন্দুস্থানের বাদশার সামনে তার চোখের মণিটি হয়ে থাকার মানে কী?

সুজা কিছু বলতে পারলেন না।

আওরঙ্গজেব বললেন, তাগদ, খেতাব, খেলাত, ইজফার হুকুমনামা বড়ে ভাইয়ের ইচ্ছেতেই শাহী হুকুমনামা হয়ে বেরিয়ে আসে। হিন্দুস্থানে এখন সুবা, ভেট, নজরানা—সবই বড়ে ভাই শাহজাদা দারার ইচ্ছা।

॥ বিরানব্বই ॥

মনটা তেতো হয়ে উঠল শাহজাদা সুজার। সুদূর ঢাকায় বসে আমি চিঠি লিখছি জাহানাবাদে। সুবে বিহার আমার আওতায় দেওয়া হোক। সে-চিঠি হয়তো বাদশা শাহজাহানের চোখেই পড়ছে না। আব্বা হুজুর কোনওদিনই হয়তো সে চিঠির বয়ান কী ছিল জানবেন না। কেননা, বাদশার চোখে পড়ার আগেই যদি বড়ে ভাই শাহজাদা দারা তা সরিয়ে দেন। বড়ে ভাইয়ের ওপর বাদশার এতখানি বিশ্বাস? আর আমাদের ওপর ঠিক ততখানিই অবিশ্বাস?

সন্ধেবেলা আওরঙ্গজেবের দাওয়াত পেয়ে সুজা তাঁর তাঁবুতে এসেছেন। বাছাই পিচফল। সেই সঙ্গে বিদেশি মদিরা—বড়ে ভাইয়ের সামনে সাজিয়ে দিয়েছেন আওরঙ্গজেব।

বাইরের শীতের তাঁবুতে ঢোকার উপায় নেই। ভেতরে আরামে-আয়েশে সুজা সুখদোলায় সামান্য দুলছেন। তাঁবুর ভেতরকার বাতাসে আস্ত বেলে হাঁসের পোড়ানো গন্ধ।

আওরঙ্গজেব একসময় বললেন, আব্বা হুজুর ঘাঁতঘোঁত বেঁধেই এগোচ্ছেন। মসনদে তিনি বড়ে ভাইকেই দেখতে চান। আমার কি! আমি তো দরবেশ হয়ে বেরিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু—

শাহজাদা সুজা শুনছিলেন বটে। কিন্তু কিছুই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দীর্ঘ এগারো বছর তিনি ঢাকায়। সুবে বাংলার সদর ঢাকাকে তিনি যেন আলাদা কোন শাহীর রাজধানী করে তুলেছেন। সেখানে তিনিই তাগদের ফোয়ারা। তিনিই ইচ্ছা। তিনিই শেষ কথা। সেখানে আগ্রা-জাহানাবাদের ধুলো, তাপ, হুকুম কোনওটাই তেমন করে পৌঁছায় না। পৌঁছলেও শাহজাদা সুজা যেন সর্বেসর্বা বাদশার কায়দায় সেসব নিজের সুবিধামত

মোচড় দিয়ে তবে নেন। তাই আব্বা হুজুর কিংবা বড়ে ভাই দারাকে নিয়ে তাঁর মনে কোনওরকম বিদ্বেষ জন্মায়নি—বা ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা কোনও আগুনও নেই।

আওরঙ্গজেব যেন একটা হেরে যাওয়া লড়াইকে জয়ের পথে টেনে আনতে চাইছেন। বড়ে ভাই সুজাকে যা বলছিলেন—তা যে বড় ভাইয়ের মনের অতলে পৌঁছচ্ছে না—সুজার মুখ দেখেই তা বুঝতে পারছিলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর মন বলছিল—আমার কোনও সুযোগই ছাড়া চলবে না। আবার এও মনে হচ্ছিল—তবে কি আমি হেরে যাচ্ছি? তাঁর সামনে দু'বছরের বড় শাহজাদা সুজা সুখদোলায় দুলছেন। সম্ভ্রান্ত, সুশ্রী মুখশ্রী। এ মুখের মালিক সর্বদা শুধু হুকুম দিয়েই থাকেন। এমন মানুষকে যুক্তি দিয়ে বেশি বোঝানোর দরকার পড়ে না। অথচ আমি তো বড়ে ভাইকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না। নসিব! সবই নসিব! ভাবতে ভাবতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। আমি বলখ্-এ সুরকলি নদীতে ভেসে যেতে যেতে ফিরে এসেছি। অবিরাম তুষার পড়ছে। পাহাড়ি পেছল গিরিপথ দিয়ে মুঘল ফৌজকে নিয়ে ফিরেছি। হিন্দুস্থানের বাদশার জন্যে বুন্দেলাকে স্তব্ধ করেছি। বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় আকবর বাদশার খোয়াবকে সফল করে সেখানে মুঘল ধ্বজ উড়িয়েছি। দাক্ষিণে যেখানে খরা, অজন্মাই ছিল নিত্য ব্যাপার—সেখানে শাহী খাজানাখানার কোনওরকম দাদন ছাড়াই কলা, আখ, নাখদ ডালের চাষ সম্ভব করেছি। ঘোড়ার খাবার যদি ফুরিয়ে না যেত—আব্বা হুজুর যদি লড়াইয়ে আমায় খোলা হাত দিতেন—যদি গোটা বারো বড় কামান থাকত—তাহলে আজ তো আমার হাত দিয়েই কিল্লা-কান্দাহারে মুঘল ধ্বজ উড়ত। ফৌজকে দুগুণী জোশ দিয়ে লড়াইয়ের সামিল করতে পেরেছিলাম কান্দাহারে। জান আর দিল দিয়ে লড়েছি। তবু ফিরে এলাম চোরের মতো। কোনও তোপ দাগা হল না। আব্বা হুজুর এগিয়ে এসে আমায় লাহোরে সওগাত জানালেন না।

আওরঙ্গজেব মরিয়া হয়ে বললেন, শাহজাদা দারা মসনদে বসলে আপত্তির কিছু ছিল না—যদি তিনি হিন্দুস্থানের মসনদের কাবিল হতেন—

শাহজাদা সুজা ঝুঁকে পড়লেন, কাবিল?

—হ্যাঁ। হিন্দুস্থানের মসনদের তো একটা ইজ্জত আছে। দুনিয়ার দেশে দেশে হিন্দুস্থান একটা নাম। মনে রাখতে হবে—এই বিশাল দেশের মসনদে বসতে হলে তার কাবিল হওয়া দরকার।—বলতে বলতে আওরঙ্গজেবের মনে হল, বড়ে ভাই তাঁর কথায় কোনও থই পাচ্ছেন না। এবার আওরঙ্গজেব পরিষ্কারই বললেন, শাহজাদা দারা এমন সব কথা বলছেন—যা কিনা ইসলামের শরিয়তিকেই অস্বীকার করার মতো। তাছাড়া তাঁর ওঠাবসা এখন সব সন্ন্যাসী—না-পাক কাফেরদের সঙ্গে।

আওরঙ্গজেব জানেন, শাহজাদা সুজা ইসলামের ধারও ধারেন না। মদিরা নিত্যসঙ্গী। সেই সঙ্গে অন্যসব গুণেরও কোনও ঘাট নেই। উপরন্তু আগ্রা থেকে শিয়াদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তিনি ঢাকায় বসিয়েছেন। শাহজাহান নিজে তো বটেই—আওরঙ্গজেবও ঘোর সুন্নী। শান্ত গলায় আওরঙ্গজেব বললেন,

শাহজাদা দারা নামাজও আদায় করেন না। ভেবেছিলাম—দরবেশ হয়ে মক্কা শরিফ করে আসব। কিন্তু হিন্দুস্থানের মসনদ ঘিরে শাহজাদা দারার কাফেরি চলবে—এ হতে পারে না। আপনাকে এগিয়ে এসে মসনদের ভার নিতে হবে একদিন। এটা মনে রাখবেন।

একথায় শাহজাদা সুজার মাথার ভেতর মেঘনার মোহানার ঘূর্ণির মতোই হিন্দুস্থানের মসনদ—তাকে ঘিরে তপ্ত শান আর সওকত এক পলকে ঝলসে উঠেই একদম তলিয়ে গেল।

আওরঙ্গজেব বলতেই থাকলেন। থামলেন না। তিনি এইমাত্র শাহজাদা সুজার চোখে ঝিলিক দেখতে পেয়েছেন। এতক্ষণ ওই সম্ভ্রান্ত, অভিজাত মুখখানিতে তাঁর কথাগুলো কোনও দাগ ফেলতে পারছিল না। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন, কত রক্তপাত—কত লড়াইয়ে কোরবানির পর কোরবানি দিয়েছে ইসলামের সৈনিকরা—এই হিন্দুস্থানে ভাবুন তো! তবে না হিন্দুস্থানে ইসলামে বিশ্বাসীরা কয়েকশো বছরের চেষ্টায় শাহীর পত্তন করতে পেরেছে। সেই ইসলামের শরিয়তকেই যে মানে না—সে কি বাবরের হিন্দুস্থান—হুমায়ুনের হিন্দুস্থানের মসনদের কাবিল? ইসলামের বিশ্বাসকে আঘাত হানছেন যে দারা—তাঁর হাতে কি হিন্দুস্থানের মসনদ নিরাপদ?

শাহজাদা সুজার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কোনও উলেমার কথা শুনছেন। সেই ঝোঁক। সেই একই কথা। ইসলাম বিপন্ন। আওরঙ্গজেবের সুরেলা গলার ভারী জিজ্ঞাসার সামনে তিনি যেন সব গুলিয়ে ফেললেন। তাই বাংলার মতো সেরা সুবায় সুবেদারের সই সই ভারিক্কি গলায় তিনি পালটা জানতে চাইলেন, আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান এখনও পুরোদস্তুর বাদশা। তাই জানতে চাইছি—এখনই মসনদের কথা ওঠে কী করে?

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বড় একটা হাসেন না। কিন্তু একথায় তিনি চাপা হেসে বললেন, আব্বা হুজুর যদি পুরোদস্তুর বাদশাই হতেন তো বড়ে ভাই এসব কথা আসতই না। আজ বাদশা চলেন শাহজাদা দারার কথায়। দারা আব্বা হুজুরের চোখের মণি। —এই অব্দি বলে আওরঙ্গজেব ভাবলেন, বাজি—শাহজাদি জাহানারার এ ব্যাপারে জড়িয়ে থাকার, দারাকে বাদশার সামনে তুলে ধরায় বাজির সব সময়কার চেষ্টার কথাটা তুলবেন কিনা। নিজেকেই মনে মনে বললেন, না, ঠিক হবে না। দূরে ঢাকায় থাকার দরুন শাহজাদি জাহানারা, শাহজাদা দারা এখনও তাঁর চোখে পিয়ারি। এখন ওভাবে বাজির কথা বললে শাহজাদা সুজা বিরক্তও হতে পারেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বলতে লাগলেন, কিল্লা-কান্দাহারে লড়াই-ই হল না—তবু ফেরার পথে সব সুবার কিল্লায় কিল্লায় তোপ দেগে সওগাত দেওয়া হল শাহজাদা দারাকে—তাও দুদুবার। খোদ বাদশা লাহোরে এগিয়ে এসে বীর-পুরুষকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—তাই?

—তবে কী বড়ে ভাই! খোদ বাদশাই তো এসবের হুকুম দিয়েছেন। তাঁকে

না দেখলে যে বাদশার হারাই হারাই ভাব হয়ে যায়। আব্বা হুজুর শাহজাদা দারাকে চোখের বাইরে রাখতে পারেন না। রসদ প্রায় শেষ। ঘোড়ার খাবারে টান। দরকারি কামান নেই। সেই একই কেল্লায় প্রাণপণে লড়াই দিয়ে চোরের মতো ফিরলাম। পেলাম কিছু বিষ—চিঠি। আগেও বলেছি—আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে—দিল্লি থেকে দূরে কাবুল, লাহোর, মুলতান, কাশ্মীর, গুজরাত, এলাহাবাদ—যে সুবার সুবেদারিই শাহজাদা দারাকে দেওয়া হোক না কেন—তিনি সেসব সুবার সুবেদারি করবেন অতি বিশ্বাসী নায়েব সুবেদার দিয়ে। বকলমে। আপনি তো বাংলার সুবেদার—আমি, শাহজাদা মুরাদ—আমরাও তো সুবেদার। আমরা কি কেউ নায়েব সুবেদার দিয়ে সুবেদারি চালাতে পেরেছি? পারিনি। আমরা কি সুবা থেকে দূরে জাহানাবাদ কিংবা আগ্রায় গিয়ে বাদশার পাশে পাশে থাকতে পেরেছি? পারিনি। কিন্তু আমরাও তো এক একজন শাহজাদা। দেখুন লক্ষ করে—বাদশার স্নেহের সুযোগ নিয়ে বাদশাকে নিজের মতো করে চালাবার জন্যে শাহজাদা দারা ভাল ভাল সুবার সুবেদারির ওপর রাজধানীর কাছাকাছি দুটি সরেস—মোহর ঝনঝনানো কাজ নিজের জন্যে বাগিয়ে নিয়েছেন—যাতে কিনা সবসময় বাদশার চোখের সামনে থাকা যায়!

আওরঙ্গজের না থেমেই বলে যাচ্ছিলেন—আর লক্ষ করছিলেন, কিভাবে শাহজাদা সুজার মুখের রং পালটে পালটে যাচ্ছে। তিনি সেই সমান আবেগ দিয়েই বলে উঠলেন, একটি কাজ হল, রাজধানীতে ঢুকতে সব সড়কের ওপর খবরদারি করা যায়—কোয়েল সরকারের দামি রাহদারি। সম্বচ্ছরে আদায় সাড়ে বাইশ লাখ টাকা। ঐ কাজ তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে আমরাও পেতে পারতাম। তাই নয় কি?

—নিশ্চয়। এতটা তো ভেবে দেখিনি।

—কিন্তু আমাদের কাউকেই সরকার কোয়েলের রাহদারি দেওয়া হবে না বড়ে ভাই।

—মোটা আদায়—তাই?

—শুধু সে জন্যেই নয় বড়ে ভাই।—এখানে সামান্য থেমে হাসলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। বড় করুণ—মুখ-চোখ বসে যাওয়া পরাস্তের হাসি। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—আরও একটা কারণ আছে—

তাঁর একথায় শাহজাদা সুজা নিজের ভারিক্কি সম্ভ্রম হারিয়ে ফেললেন। সুখদোলা থেকে নেমে শাহী তাঁবুর ভেতরকার বনাত ঢাকা মেঝেতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। কারণটা জানার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সিধে জানতে চেয়ে তিনি আম-আতরাফ হাটুরে মানুষের মতো খেলো হতে পারেন না। তাই ভীষণ শান্ত চোখে ছোট ভাইয়ের মুখে তাকালেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, আপনাকে আর আমাকে যে-কারণে ফেরার পথে রাস্তায় দু'তিন মঞ্জিল ফারাকে কুচ করে ফিরতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল—সেই একই কারণে সরকার কোয়েলের রাহাদারি আমাদের দেওয়া হবে না।

—অবিশ্বাস। অবিশ্বাস। আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান আমাদের বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন একমাত্র শাহজাদা দারাকে। তাই রাজধানীতে ঢুকতে সব সড়কের চাবিকাঠি—সরকার কোয়েলের রাহদারি তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছেন হিন্দুস্থানের বাদশা।

—ঠিক ধরেছেন বড়ে ভাই। —বলতে বলতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব দেখলেন, শাহজাদা সুজার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালে তিনটি ভাঁজ। বাঁ হাত কোমরবন্ধে ঝোলানো তলোয়ারের খাপে।

এবার আওরংগজেব বললেন, রাজধানীর গায়েই অন্য কাজটি হল, হিসারের ফৌজদারি। আপনি নিশ্চয় জানেন—হিন্দুস্থানের বাদশা যিনি হয়ে থাকেন—তাঁকেই ফৌজদার-ই-হিসার করা হয়ে থাকে। যেমন হয়েছিলেন জাহাঙ্গীর, শাহজাহান। ঠিক তেমনই শাহজাদা দারাকে করা হয়েছে ফৌজদার-ই-হিসার। তাই আমি মোটেই আশ্চর্য হই না। আশ্চর্য হই না—যখন দেখি—আপনার আমার ঘোড়সওয়ার একত্রে করলে যা দাঁড়ায় তার চেয়ে শাহজাদা দারার ঘোড়সওয়ার বেশি। বেশি তো হবেই বড়ে ভাই। আব্বা হুজুরের অন্ধ স্নেহের সুযোগ নিয়ে শাহজাদা দারা এক পা এক পা করে হিন্দুস্থানের মসনদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাই তো এবার তাঁকে কিল্লা-কান্দাহারের লড়াইয়ে মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার করে পাঠানো হচ্ছে।

দু'ভাইয়ের কেউই খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। শেষে সুজা আওরংগজেবের পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, এখানে যেন বাতাস নেই। চল বাইরের খুলি হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াই।

শীতের রাত। দুই শাহজাদাকে একই সংগে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে রাত-পাহারার সান্ত্রীরা তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। দূরে কোনও কোনও তাঁবুর সামনে মশাল। আকাশে হিমে অবশ চাঁদ। রাজধানী জাহানাবাদের বাইরে বেশ অনেক দূরে প্রান্তরের ভেতর দুই শাহজাদার ফৌজ তাঁবু ফেলেছে। এখানে দাঁড়িয়ে আসমানে তাকালে দূরের রাজধানীর আলোর রোশনাই চোখে পড়ে।

সুজা ফের আওরংগজেবের পিঠে হাত রাখলেন। একজন প্রায় সাঁইত্রিশ। অন্য জন পঁয়ত্রিশে পা দিয়েছেন। দু'জনই পরিণত মুঘল যুবক। হিন্দুস্থানের ইতিহাস—ইতিহাসের ভেতরকার জীবনের রক্ত, রস, লাবণ্য, ঘমণ্ড, হারজিত—নিয়মিত মতোই এইসব মানুষের বিরাগ, বিদ্বেষ, ভালবাসা দিয়েই স্থির হয়। সুজা বললেন, ছোটে ভাই! কতকাল পরে আমাদের ফের দেখা হল। কী সুন্দর দেখতে ছিলে তুমি!

—বহু বছর পরে বড়ে ভাই। আমি তো এখনও আপনাকে ফিরে ফিরে দেখছি। সেই কবে আমরা প্রথম মনসব পেয়েছিলাম—তারপর এইভাবে দেখা হল—বাদশার নিষেধ ভেঙে। আপনি ঢাকা চলে গিয়েছিলেন। আমি দৌলতাবাদে। তারপর বাদশাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমরা যেন যে যার অজান্তে ফের এই মোলাকাত করলাম। শুধু একজনের অবিশ্বাস আমাদের কাছাকাছি এনে দিল।

—হিন্দুস্থানের বাদশার অবিশ্বাসই আমাদের একজোট করল আওরংগজেব।

যাক, কাল সকালে আমার ওখানে তুমি নাস্তা করবে। মনে থাকবে?

—মনে থাকবে কী বলছেন। এ আপনার হুকুম। আমি তো আপনার হুকুমবরদার মাত্র।

—না না। সে কী! তুমি শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর। বহু লড়াইয়ের জানবাজ লড়াকু। আমার জান-পিয়ারি ছোটে ভাই। —বলেই শাহজাদা সুজা লাফিয়ে গিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠলেন। দেখতে না দেখতে অন্ধকারে মিলিয়েও গেলেন। আওরঙ্গজেবের নাক বলল, কাছেই অন্ধকারের ভেতর কোনও দেহাতির ভরভরাটি গেঁহু ক্ষেতে চুহা ঢুকেছে। তারই একটা বোটকা গন্ধ বেশি রাতের বাতাসে।

পরদিন সকালে সুজার মুখোমুখি নাস্তায় বসলেন আওরঙ্গজেব। শীতের সকালে সবই তাজা, নতুন লাগছে দুই ভাইয়ের। ধরাচুড়ো ছাড়াই ফৌজি ঘোড়াগুলো স্বাধীনভাবে ছোটাছুটি করে সব চলন্ত রূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেননা, ছুটন্ত ঘোড়ার কেশর ফোলানো চেহারা যে দেখবে তারই ভেতরকার রূপের তৃষ্ণা জেগে উঠবেই। সেদিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব ফাঁকা চোখে বললেন, আমার কোনও সুবা হোক—বা আমার কোনও শাসন করবার মতো রাজ্য হোক, জায়গা হোক, আমি সেখানে সুলতান হয়ে বসি এমন কোনও স্পৃহা আমার নেই। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তবে বেয়াড়া মোরাদকে বাগ মানাতে হবে। সে-কাজ সম্পূর্ণ করে নর্মদা পেরুব।

—ছেলে কত বড় হল?

—মুহম্মদ সুলতান? এই চোদ্দোতে পা দিয়েছে।

—তাহলে আজ সন্ধেবেলা সানাই বসুক ছোটে ভাই—

—কী ব্যাপার?

—আমার ওপর ছেলের ভার দিয়ে তুমি তো নিশ্চিন্ত?

—একশো বার। আপনি তার আতালিক। তার সমস্ত ভার আপনার ওপর বড়ে ভাই। এর চেয়ে সুখের কথা আর কী আছে। যার অভিভাবক শাহজাদা সুজা—সে তো নিশ্চিন্ত। তার আব্বা হুজুর হিসেবে আমিও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। এবার আমি শান্তিতে দরবেশ হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারব। জানব আমার নাবালক ছেলে মুহম্মদ সুলতান আতালিক হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা শাহজাদা সুজা।

—এখনও ওকথা এভাবে বলার সময় আসেনি আওরঙ্গজেব। এখনও হিন্দুস্থানের বাদশা হয়ে আছেন শাহজাহান।

—আব্বা হুজুরের পরেই তো আপনি হিন্দুস্থানের বাদশা হবেন। আল্লার মর্জি তাই।—বলে শাহজাদা আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে কুর্নিশ করে বললেন, হজরত—

—বোসো। বোসো আওরঙ্গজেব।

বসতে বসতে আওরঙ্গজেব বললেন, হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশাকে আগাম তসলিম জানিয়ে রাখলাম।

সুজা বললেন, সন্ধেবেলা আজ সানাই বসবে। আমার ফৌজে নাটোরের একজন সানাই বাজিয়ে আছে। এখন অবশ্য আবদারখানার মশালচি। তাকেই ডাকা যাবে। তোমার কাছে আমার একটি আর্জি আছে আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গজেব সুজার দু'খানি হাত ধরলেন। ওভাবে বলবেন না বড়ে ভাই। আপনি হুকুম করুন।

—তোমার ছেলেটিকে আমাকে দাও। আমার গুলরুক বেশ ভাল মেয়ে। চার হাত এক হয়ে যাক।

—এ তো খুবই আনন্দের কথা। এরপর তো আর কোনও কথা থাকতেই পারে না বড়ে ভাই।

—তাহলে সাগাই পাক্কা ?

—পাক্কা বড়ে ভাই। —বলতে বলতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব নিজের উষ্ণীষ থেকে একটি বড় চুনি খুলে শাহজাদা সুজার হাতে দিলেন। এটি গুলরুককে দেবেন।

—চুনিটি হাতে নিয়ে সুজা সম্ভ্রমে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। তারপর গায়ের আঙ্গিয়ার জেবে ফেলে দিলেন। দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন তিনি।

তার ভেতরেই আওরঙ্গজেব বলে উঠলেন, আমার সঙ্গে তো আপনার কথা হয়েই গেল। সবটাই আমি শাহজাদা মুরাদকে জানাব। তারও তো সব জানা দরকার। আমরা তিন ভাই আব্বা হুজুরের অবিশ্বাস দিয়ে একসঙ্গে গাঁথা।

—আমাদের খবরাখবর ?

—কোনও ভাবনা নেই বড়ে ভাই। তেলিঙ্গানার ভেতর দিয়ে আমি আপনি আর শাহজাদা মোরাদ নিজেদের গুপ্ত ডাক চালু রাখব। সে ডাকের সংকেত লিপিও ঠিক করে ফেলেছি।

শাহজাদা সুজা কোনও কথা বললেন না। তিনি তাঁর এই তুখোড় ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, খবর চালাচালি যদি ফাঁস হয়ে পড়ে।

—হবে না। কাসিদরা আমার কাছে সব খবর এনে দেবে। আমার হাত দিয়েই কিংবা আমার সুবার ভেতর দিয়ে তেলিঙ্গানা ঘাঁটি হয়ে যার খবর তার কাছে চলে যাবে।

এবার আর কোনও কথা বলতে পারলেন না সুজা।

প্রায় একশো বছর ধরে কান্দাহার মুঘল শাহীর পায়ে যেন কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। শ'খানেক বছর আগে নাবালক আকবরের হাত থেকে ইস্পাহানের শাহ কান্দাহার কেড়ে নিয়েছিলেন। আকবর বাদশার এন্তেকালের বছর দশ এগারো আগে কান্দাহার—আবার হিন্দুস্থানের সামিল হয়। জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের শেষ দিকে কান্দাহার ফের হিন্দুস্থানের হাতছাড়া হল। কান্দাহার নিজে যেন একই সংগে হিন্দুস্থান আর ইস্পাহানের নসিব নিয়ে খেলে চলেছে। বাদশা শাহজাহানের আমলের দশ বছরের মাথায় ফের কান্দাহার হিন্দুস্থানের হাতে চলে এল। বার বার তিনবার। আবার কিল্লা-কান্দাহার হাতছাড়া। শাহজাদা দারা দু'দুবার কান্দাহার গিয়েছেন। শাহজাদা আওরংগজেবও গিয়েছেন দু'বার। বাদশা

শাহজাহানের জেদ। কান্দাহার আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না। এবার শীতের শেষে শাহজাদা দারা আবার কান্দাহার যাচ্ছেন। সে জন্যেই তাঁকে কাবুল আর কান্দাহার—দুই সুবার সুবেদার করা হয়েছে। কাবুলে সুলেমান শুকোকে—মুলতানে মহম্মদ আলি খাঁকে নায়েব সুবেদার করে শাহজাদা দারা সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থা করতে লাহোর গিয়েছিলেন। সেখানে বাদশা শাহজাহান তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে জাহানাবাদ ফিরেছেন। ঠিক এই সময় নয়া রাজধানী জাহানাবাদের কাজকর্মও সব শেষ।

কিন্তু রাজধানীতে বাদশার জন্যে খারাপ খবর ছিল। ফিরেই শাহজাহান শুনলেন, শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ছেলে মহম্মদ সুলতানের সঙ্গে শাহজাদা সুজার মেয়ে গুলরুক বানুর সাগাই পাকা হয়ে গিয়েছে।

শুনেই তিনি নিজের মনে মনে বললেন, সাদা সাপ। সাদা সাপ! আওরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধির ফাঁদে পা দিয়েছে সুজা। আওরঙ্গজেবের বুদ্ধি ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ এসে খবর দিলেন, হজরত! আপনার নিষেধ ভেঙে দুই শাহজাদা নিজেদের ভেতর দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন।

—কোথায়?

—জাহানাবাদের বাইরে গোয়ালিয়র সড়কের গায়ে দেহাতি প্রান্তরে। ক'দিন ধরে দুই ভাই দেখাশুনো তো করেছেনই—উপরন্তু দু'জন দু'জনকে পালটা ভোজ খাইয়েছেন।

—ভোজ?

—হ্যাঁ। সেরকম কোনও ভোজের সময়েই ও'রা সাগাই পাকা করেছেন। দেওয়ানখানায় কাসিদরা তো সেইরকম খবর এনেছে।

বাদশা শাহজাহান খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। সাদুল্লা খাঁ জানেন, কান্দাহার এখন বাদশা শাহজাহানের মাথায় ঘা। চার চারবার কান্দাহার অভিযানে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে। তবু কান্দাহার উদ্ধার হয়নি। তাই এবার শাহজাদা দারাকে মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার করে কান্দাহার পাঠানো। কান্দাহার এখন বাদশার ধ্যানজ্ঞান। কান্দাহার উদ্ধার না হলে বিদেশি ইলচিদের চোখে বাদশার মুঘল মসনদ যতই সম্ভ্রম আনুক না কেন—বিশাল মুঘল ফৌজের ইজ্জত নিয়ে তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দেবেই।

বাদশা চোখ খুলে ওয়াকেনবিশদের দিকে তাকালেন। লালকিল্লার এই দেওয়ান-ই-খাস এখন নির্জন কোনও সমাধি সৌধের মতোই নিস্তব্ধ। বাদশা গড়গড় করে বলে যেতে থাকলেন—

পরমপ্রিয় শাহজাদা সুজা,

তোমার আব্বা হুজুর হয়ে আমি কতখানি বিশ্বাস করি তার প্রমাণ—

অন্যসব সুবার সুবেদার বদল হলেও বাংলা সুবার কোনও অদলবদল হয় না। আজ এগারো বছরের ওপর তুমি ঢাকায় সুবেদার হয়ে আছে। কিন্তু এ তুমি কী কাজ করে বসে আছ?

মুঘল শাহীর একজন শাহজাদা হয়ে তুমি নিশ্চয় মালফুজাত-ই-তৈমুরা অস্বীকার করতে পার না। আকবর বাদশা অনেক ভেবেচিন্তেই মুঘল শাহজাদীদের জন্যে বিধান দিয়েছিলেন—তারা চিরকুমারী থাকবে। তুমি সে বিধান না মেনে তোমার মেয়ে গুলরুক বানুর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের ছেলে মুহম্মদ সুলতানের সাগাই পাকা করেছ।

পত্রপাঠ এই সাগাই বাতিল বলে গণ্য করবে। যদি আমার কথা শুনে চল তো তোমার পিতৃভক্তি আর সুচারু সুবেদারির জন্যে আমি আওরঙ্গজেবকে মালবে বদলি করে তোমাকেই দক্ষিণের পাঁচ সুবার সুবেদার করে পাঠাব।

ইনসাল্লা! তেরি রেজা!

ফের চোখ বুজলেন বাদশা। সেই অবস্থাতেই বললেন, এ-চিঠি এখুনি ঢাকা রওনা করিয়ে দাও।

॥ তিরানব্বই ॥

হেলমন্দের গায়ে কিল্লা-কান্দাহার। হেলমন্দে এসে মিশেছে অর্গন্ধব নদী। এই দুই নদীর যোগাযোগের জায়গাটাকে সাক্ষী রেখে কিল্লা-কান্দাহার দাঁড়িয়ে। থল-চোটিয়ালের পাথরের চাঙ্ বয়ে এনে একবার মুঘলরা—আরেকবার ইরানিরা এই কিল্লার খাড়াই পাথুরে দেওয়াল গড়ে তুলেছে ধাপে ধাপে—যখন যার দখলে থেকেছে এ কিল্লা—ঠিক সেই ভাবে বদলাবদলি করে। এক তরফের গড়ে তোলা কিল্লার দেওয়াল, সামান বুরুজ, হপ্তচৌকি আরেক তরফ এসে গোলা দেগে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। উড়িয়ে দিয়ে হাতে আসার পর আবার সে নিজে অনেক মেহনতে ওসব ফের গড়ে তুলেছে। মনে হবে—এই গড়ে তোলা শুধু আরেক তরফের গোলার নিশানা করতেই।

এই দুর্গ দখল করে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছেন না শাহজাদা দারাশুকো। কতক্ষণে সুখবরটা জাহানাবাদে আব্বা হুজুরের কাছে পাঠানো যায় সেজন্যে তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন। এত সাধের কিল্লা-কান্দাহারে তাহলে মুঘল-ধ্বজ উড়ল। তাও সেই মুঘল ফৌজের হাতে কান্দাহারের পতন হল যে-ফৌজের সিপাহ-সালার আমি—শাহজাদা দারাশুকো।

পেয়ারের হাতি ফতে-জং-এর পিঠে গাদেলায় বসে ফৌজকে শাহজাদা কাবুল ফেরার হুকুম দিলেন। একটা খটকা লাগল শাহজাদার। রওনা হতে না হতেই তিনি কী করে কাবুল এসে পৌঁছলেন? কাবুল তো কান্দাহার থেকে বেশ ক'দিনের রাস্তা। তাহলে কি আমি রওনা হয়েই গাদেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? হবেও বা। এত বড় লড়াইয়ের তো একটা উদ্বেগ আছে। আছে পসিনা, খুন, গোলা, কিল্লার দেওয়াল বেয়ে ওঠা।

কাবুলের রাস্তায় বিজয়ীর সংবর্ধনা যেন অপেক্ষা করেই ছিল। কালাত-ই-খিলজাই, গজনি হয়েই দারা কাবুলে ঢুকলেন। তাঁকে সওগাত দিতে তাঁরই

নায়েব-সুবেদার সুলেমান শুকো কাবুল নগরীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। দারা ফতে-জংকে বসতে হুকুম দিলেন। ফতে-জং বসলে তবে তিনি নীচে নেমে তাঁরই ছেলের দেওয়া সওগাত নেবেন।

কিন্তু ফতে-জং যে হুকুম শুনছে না। কিছুতেই বসছে না। অথচ সুলেমান শুকো—তার পাশে দাঁড়ানো ওমরাহরা অস্থির হয়ে পড়েছেন। শাহজাদার আর ধৈর্য ধরল না। তিনি নিজেই নামতে গেলেন। ফতে-জঙের শুঁড়ের ওপর পায়ের ভর দিয়ে। আর অমনই তিনি গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলেন। এত বড় লড়াইয়ে জয়ী সিপাহ-সালার যদি হাতি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যায়—সে তো ভয়ংকর বে-ইজ্জতি।

পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন শাহজাদা দারাশুকো। কিন্তু পারলেন না। মাথার উষ্ণীষটি গড়িয়ে দূরে পড়ে আছে। অস্বস্তিতে শাহজাদার ঘুম ভেঙে গেল।

—ওকি! তুমি অমন করছ কেন?

দারা কোনওরকমে বলতে পারলেন, আঃ! নাদিরা—

—আমি নাদিরা নই শাহজাদা। আমি রানাদিল! আপনার বেগম। আমরা এখন লাহোর দুর্গে।

—লাহোর? —বলে উঠে বসলেন দারা।

—হ্যাঁ। লাহোর। এখন নিশুতি রাত। আপনি সারাদিন কান্দাহার লড়াইয়ের গোলবারুদ ব্যবস্থা করতে হয়রান হয়ে শেষে সন্ধে সন্ধে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

—লাহোর? কাবুল নয়?

—না। কাবুল নয়। কিসের খোয়াব দেখছিলেন? এই শীতের রাতেও ঘেমে গেছেন দেখছি।

দারা কিছুই না বলে দুর্গের ঢাকা গলিপথে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে হিম-জ্যোৎস্নায় কী কী আছে তা জানেন দারা। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রাজপুত রাত-পাহারা। তাহলে আমি কিল্লা-কান্দাহার জয় করিনি? শুধুই খোয়াব দেখছিলাম! কেন দেখলাম? নিশ্চয় তাহলে কান্দাহার দখল করতে পারব। তা নাহলে খোদার ইচ্ছায় কেন এই খোয়াব দেখলাম!

দারা ফিরে এলেন রানাদিলের কাছে। এসে বললেন, ঘুমিয়ে পড়ো রানা।

রানাদিল পালঙ্কে বসেছিলেন। তিনি অন্ধকারের ভেতর শাহজাদার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। তবু বললেন, শাহজাদা! আমি ছোট্ট মেয়ে নই যে বললেই ঘুমিয়ে পড়ব! শুলেও যে ঘুম আসবে—তার কোনও ঠিক নেই। আমাদের বিয়ের পর আপনার সংগে লাহোর এলাম—এসে দেখছি—আপনার দিনরাত কান্দাহার একাই দখল করে আছে।

—রানা। আমি এই শীতের শেষে কান্দাহার উদ্ধার করতে যাব। সেই অভিযানে মুঘল ফৌজের আমিই সিপাহ-সালার।

—জানি শাহজাদা। কিন্তু আমাদের বিয়ের পর এই প্রথম আমি একজন শাহজাদার বেগম হয়ে হিন্দুস্থানে ঘুরতে বেরিয়েছি। সেই সময়ের পহেলা

ঠিকানা—কিল্লা-লাহোর। এখানে এসে দেখছি—সারাদিনের শাহী কাজকম্মের ভেতর আমার কোনও জায়গা নেই শাহজাদা—আমি কোথাও নেই দারা।

—তুমি আছ রানা! তুমি আছ আমার এই দিলে।

—না। আমি কোথাও নেই শাহজাদা। খোয়াব টুটে আপনার ঘুম ভেঙে গেলে যে নাম সবচেয়ে আগে আপনার মুখে আসে—তা হল—নাদিরা।

গোলমালটা কোথায় মুহূর্তে ধরে ফেললেন দারা। বললেন, নাদিরার সঙ্গে আমার বিয়ে বিশ সন হতে চলল। বহুদিনকার অভ্যেস। তার নাম তো মুখে আসবেই রানা। কিন্তু আমার মন জুড়ে যে তুমি ভরে আছ।

—থাক ওসব কথা। ওসব শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।

এমন ভাষায় কথা শোনার অভ্যেস নেই দারার। কিন্তু রানাদিল বলে কথা। এক এক সময় শাহজাদার মনে হয় তিনি যেন বুনো কোনও জানোয়ারকে পোষ মানাতে চাইছেন। এখনও তিনি রানাদিলকে জানেন না। জানেন না রানাদিলের কিছুই। ওর ভেতরকার আনন্দ বেরবার উচ্ছ্বাস—হাসি—তাঁকে কান্দাহারে জয়ী হবার জন্যে তাতানো—সব কিছু মিলে রানাকে দারার মনে হয় বড় প্রিয়, বড় সুন্দর—এমন কখনও দেখিনি—এমন কেউ এর আগে আমার এ জীবনে আসেনি। আমাকে খোদার এ কী মেহেরবানি! রানা আমার কাছে বেহসতের এক খুশবুদার তোফা।

শাহজাদা দারা রানাদিলকে আর কিছুই বলবেন না ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখে এসে গেল যুক্তির কথা। তিনি বললেন, জানো রানা—নিন্দামন্দের কথা সাত কাহন হয়। কিন্তু ভাল লাগা, ভালবাসা, পুজোর কথা বেশি নেই। সেসব কথা নতুনও নয়। সবাই শুনেছে। সবাই বলেছে। তবু মানুষ সেই সব কথাই বার বার বলে। বলার সময় মনে হয়—ওসব কথা বুঝি নতুন।

রানাদিল কোনও জবাব দিল না। দারা বুঝলেন, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তিনি ঘরের লাগোয়া ঢাকা পথ ধরে কিল্লার খোলা চাতালে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল, কান্দাহার ফতে হয়ে গিয়েছে। সেখানে পৌঁছিতে যা-কিছু দেরি। কিন্তু কী করে কিল্লা-কান্দাহার এত সহজে তাঁর হাতে আসবে—সে-ব্যাপারে গায়েবি ঐশী দুনিয়া থেকে কোনও ইশারা মেলে কি না—তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। হিমে মোড়া আবছা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে।

পরদিন ভোরে কিল্লা লাহোরে শাহজাদা দারার খাস দরবারে দুই দরবেশ গম্ভীর ভাবে ঢুকলেন। তাঁদের গায়ের লোটানো খিরকা শতচ্ছিদ্র। ওঁরা দুজন দরবারে ঢুকেই মেঝের বনাতে কাউকে কিছু না বলে বসে পড়লেন। পড়েই যে যাঁর মতো ধ্যানে ডুবে গেলেন।

এরকম ব্যাপার শাহজাদার দরবারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটেই থাকে। সাত হাজারি মনসবদার এলেও হয়তো শাহজাদার খাস দরবারে ঢুকতে অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ঠিকঠাক ভেক থাকলে সাধু-ফকিরদের জন্যে কোনও হুকুমের দরকার হয় না। কোনও ফকির এসেছেন শুনলে শাহজাদা দারার আনন্দে অজ্ঞান হওয়ার দশা। তিনিও ছুটে এসে সালাম-খুশ-আমদ করেন।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে গভীর ধ্যানমগ্ন দুই দরবেশের দেহে বুঝি প্রাণ নেই। কিন্তু শাহজাদা কখন নিঃশব্দে তাঁর দরবারে ঢুকলেন—দরবেশ দু'জন তা ঠিকই টের পেয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ও'দের একজন হঠাৎ আনমনা ভাবে মাথা তুলে বললেন, আমি এখন ইরানে। সেখানকার হাল নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। ইরানের শাহের দুনিয়াদারি খতম!

অন্য দরবেশ মাথা না তুলেই বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি কিন্তু শাহকে কবর না দিয়ে আসছি নে।

এসব কথা শুনে শাহজাদা দারা তো রীতিমত উত্তেজিত। তিনি বললেন, আমিও স্বপ্নে দেখেছি—সাত দিনের বেশি আমাকে কান্দাহারে থাকতে হবে না। শাহ আব্বাসের মারা যাওয়া বিচিত্র নয়।

দরবেশ-ফকিরে শাহজাদার এতই বিশ্বাস যে তিনি খানিকক্ষণের জন্যে মাটির পৃথিবী ছেড়ে খোয়াবের দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।

কিন্তু হিন্দুস্থানে বাদশা শাহজাহানকে মাটির পৃথিবীতেই ঘোরাফেরা করতে হয়। তিনি এখন ষাট ছাড়িয়েছেন। মুঘল শাহীর কোনও কাজ তিনি ফেলে রাখতে চান না। বাবর হুমায়ুনের দেশ—তৈমুরাবাদ, বলখ্ বদকশান জয় করেও জয় করা যায়নি। সেখানকার জমি, পাহাড়, বরফ-নদীই বৈরী। মাঝখান থেকে হাজার দশেক সেপাই ভেসে গেছে। গেছে হাতি, ঘোড়া, উট—দামি দামি গজ-নল কামান। সবার ওপরে চার কোটি টাকা গেছে জলে। এরও ওপর কান্দাহার অভিযানের খরচ চেপেছে শাহী খাজানাখানার ওপর। কী ভেবে শাহজাহানের মুখে ক্ষীণ এক হাসি ফুটে উঠল। তিনি মনে মনে নিজেকেই বললেন, হিন্দুস্থানের মসনদে যে বসবে—তার অভিযান, অভিষেক—সব কিছুতেই তো এলাহি ব্যাপার হওয়ার কথা।

জায়গাটা জাহানাবাদের লালকিল্লা। শাহজাহানি মহল। সময়—শীতের বিকেল। একটু আগে জামা মসজিদ থেকে আসরের নামাজের আজান শোনা যাচ্ছিল। শাহজাহান বাদশা নিজের মনে মনেই বললেন, দারা দু'বার। তারপর আওরঙ্গজেব দু'বার। ফের আবার দারা। এটাই কিল্লা-কান্দাহার নিয়ে আখরি লড়াই। এসপার। নয় উসপার। শাহজাদা দারাকে কিল্লা-কান্দাহার ছিনিয়ে নিতেই হবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের ইজ্জত। মুঘল শাহীর ইজ্জত। মুঘল ফৌজের ইজ্জত। এরপর শাহজাহান বাদশা অস্ফুটে বললেন, কিল্লা-কান্দাহারের সঙ্গে শাহজাদা দারাশুকো—তোমার শাহী নসিবও জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের শাহী মসনদেরও নসিব। মসনদ তুমি কার? তাগদ যার আমি তার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই বাদশা অস্থির হয়ে পড়লেন। জাহানাবাদের বাইরে আসমানের নীচে খোলা প্রান্তরে দুই শাহজাদার দেখা হয়েছে। খানাপিনা। শলাপরামর্শ। একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে খরগোশ শিকারে যাওয়া। শেষে নিজেদের ছেলেমেয়ের ভেতর সাগাই পাকা করা হয়েছে। কিসের এত কথা? কিসের এত খানাপিনা? রাতভর হাসি ঠাট্টা—গালগপ্প? ব্যাপারটা ভেবে ইস্তক ভাল

লাগছে না বাদশার। আমার শাহজাদারা কেউ-ই না-লায়েক পরভেজ নয়—নয় অন্ধ খসরু। একথা মনে পড়তেই বাদশার রক্তচাপ যেন বেড়ে গেল। ওরা পরভেজ নয়—নয় খসরু। তাই তো আমার চিন্তা এত বেশি। সবাই লায়েক—লড়াকু। বরং বলা যায় পহেলা শাহজাদা দারা কিছু নরম—নাজুক ইনসান। আমি ওদের আব্বা হুজুর। আমি ছিলাম শাহজাদা খুর্রম। হয়েছি বাদশা শাহজাহান। আমার শাহজাদাদের ওপর সেদিনকার শাহজাদা খুর্রমের ছায়া তো পড়বেই। ওঃ! খুর্রম। আমার অতীত শাহজাদা খুর্রম।

শাহজাদী জাহনারা। আজ তোমাকে জবাবদিহি করতেই হবে। তুমি আমার ছায়াসঙ্গী। তুমি আমার চোখের মণি। তোমাদের আম্মিজান আরজুমন্দ বানুর এন্তেকাল হয়েছে বিশ বছরের ওপর। তারপর থেকেই তুমি দিনে দিনে আমার দোস্তের চেয়েও বড় দোস্ত হয়ে উঠেছ। আমার উজিরে আজমের চেয়েও বড় উজিরে আজম হয়ে উঠেছ। তুমিই মুঘল শাহীতে আমার হয়ে বিদেশী ইলচিদের দাওয়াত দিয়ে থাক। কারও মনসবদার হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে তোমার মুখে একটি ভ্রুকুটির ওপর। মুঘল শাহীর তরফে নওরোজের উৎসবে ইজফা, খেলাত, খেতাবের বিলি-ব্যবস্থা তুমিই করে থাক। সুরাট বন্দরের তামাম আদায়ই তোমার তাম্বুল খরচা। আজ থেকে আট বছর আগে তোমার কথাতেই আমি শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে গুজরাতে সুবেদার করে পাঠাই। নয়তো তাকে আমি দক্ষিণের সুবেদারি থেকে বরখাস্ত করেছিলাম। তুমি আগুনে পুড়ে গেলে। তোমায় দেখতে এসে তোমার ভাই শাহজাদা আওরংগজেব সর্বক্ষণ শাহজাদা দারাশুকোর মুণ্ডুপাত করতে থাকে। এ তো ভয়ংকর কথা। তাকে বরখাস্ত করে তার পাহারা ঘোড়সওয়ার রিসালাও তুলে নেওয়া হয়েছিল বিকেলের ভেতর।

শেষে তোমার কথাতেই তাকে ফের সুবেদার করে গুজরাতে পাঠানো হল। তোমার জানা দরকার শাহজাদী জাহানারা—কান্দাহার লড়াইয়ে তোমার ছোট ভাই শাহজাদা আওরংগজেব ঠিকমত তৈরি হয়েই যায়নি। ফৌজ, কামান, হাতির হিসেবে যাব না আমি। কিন্তু ইজ্জত? মুঘল শাহীর ইজ্জত? মুঘল ফৌজের ইজ্জত? বিদেশী ইলচিদের চোখে হিন্দুস্থানে মসনদের মণিমুক্তো যতই সম্ভ্রম আদায় করুক না কেন—কিল্লা-কান্দাহারে মুঘল ধ্বজের বে-ইজ্জতি কাটিয়ে ওঠার তো কোনও উপায় দেখি না জাহানারা। বিশেষ করে বিদেশী ইলচিদের চোখে।

জাহানারা! তোমায় জবাবদিহি করতেই হবে। যাকে আমি বরখাস্ত করেছিলাম—শুনেছিলাম তখন, বরখাস্ত হয়েই নাকি সে দরবেশ হয়ে মক্কা শরিফ রওনা হয়ে যাবে বলে ঠিক করেছিল! কান্দাহারে ভরাডুবির পর তাকে আমি ফের দক্ষিণের সুবেদারি দিয়ে বদলি করেছিলাম। দক্ষিণে রওনা হয়ে যাবার আগে ক'দিন ধরে সে তোমারই আরেক ছোটে ভাই শাহজাদা সুজার সঙ্গে খানা-পিনা, শিকার, শলাপরামর্শে কাটিয়েছে। আমি কোনও দিনই চাইনি দুই শাহজাদার ফৌজ কাছাকাছি হোক। শুধু যে আমার হুকুম তুচ্ছ করা হয়েছে—তাই নয়—আকবরের বিধান ভেঙে ওরা মুঘল-রাজকুমারী গুলরুখের সাগাই

পাকা করেছে সুলতান মুহম্মদের সঙ্গে।

শীতের শেষে কিল্লা-কান্দাহারের লড়াইয়ে শুধু কিল্লার দেওয়াল বেয়ে উঠতেই মুঘল ফৌজের চাই ষোলো হাজার বাঁশ। সেই বাঁশের বরাত দেওয়া হয় ঢাকাকে। বাঁশের দেশ তো সুবে বাংলা। সেই বরাতের সঙ্গে ঢাকার শাহজাদা সুজাকে লিখেছিলাম, গুলরুখের সঙ্গে সুলতান মহম্মদের এই সাগাই যদি ভেঙে দাও তো আমি শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে দক্ষিণ থেকে সরিয়ে সেখানকার সুবেদারি তোমায় দেব।

জানো শাহজাদী! বরাত মতো ষোলো হাজার বাছাই বাঁশ গঙ্গা দিয়ে ভাসিয়ে এলাহাবাদ অব্দি পেঁছে দিয়েছে শাহজাদা সুজা। ওখান থেকে এই বাঁশ এবার গো-গাড়িতে করে আনা হবে। কিন্তু আমার চিঠির জবাবে শাহজাদা সুজা যা লিখেছে তার মানে একটাই দাঁড়ায়। তা হল আমার কথাকে সে গ্রাহ্যের ভেতরেই আনেনি। উঃ! প্রত্যাখ্যান। হিন্দুস্থানের বাদশাকে প্রত্যাখ্যান! কারণ, সে জানে, আমি একজন বাদশা হলেও—সবকিছুর আগে আমি যে তাদের আব্বা হুজুর। নয়তো হিন্দুস্থানের বাদশাকে অগ্রাহ্য করার এত সাহস সে পায় কোত্থেকে? জাহানাবাদের বাইরেই খোলা প্রান্তরে দুই শাহজাদার এমন কী কথা হল—এমন কী বোঝাপড়া হল—যার জোরে এক শাহজাদা দক্ষিণের বড় বড় পাঁচ সুবার সুবেদারি হিন্দুস্থানের বাদশাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? কী সেই জোট? কিসের সে জোট? যার জোরে এমন পাঁচ পাঁচ সুবার সুবেদারি শাহজাদা সুজা আর কেউ নয়—হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহানকে ফিরিয়ে দিতেও কোনওরকম দ্বিধা করে না? মুঘল শাহীর কুমারী গুলরুখ বানুর সঙ্গে মুঘল শাহীর সুলতান মুহম্মদের এই সাগাই শরিয়তি মতে না-জায়েজ—অসিদ্ধ। এমন না-জায়েজ সাগাইকে হিন্দুস্থানের বাদশার কোনওরকম রাজামন্দি—সায় নেই। তবুও দুই শাহজাদা মিলে এই সাগাই বহাল রাখল। কিসের জোরে? কোন্ বোঝাপড়ায়?

শুনে রাখো জাহানারা। এই বোঝাপড়ার কূট শর্তগুলো আমি জানবই জানব। যেমন কিনা—জেনে রাখো জাহানারা—হিন্দুস্থানের বাদশা কিল্লা-কান্দাহার ছিনিয়ে আনবেই।

মালবের ভেতর দিয়ে আওরঙ্গজেবের ফৌজ দক্ষিণে চলেছে। মাথার ওপর নৌতনওয়ার রাপ্তি নদী পুবী খাতে বয়ে দোরাহার কাছাকাছি এসে ঘর্ঘরার সঙ্গে মিলেছে। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঠিক করেছিলেন, রাপ্তি-ঘর্ঘরা যেখানে চড়ায় ঠেকে অগভীর—সেখান থেকে ফৌজ নদী পেরিয়ে একদম সঙ্গে সঙ্গে আজমগড় পেঁছে রাতের মতো তাঁবু ফেলবে। শীতের শান্ত নদীর সামনে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। দূরে দু' একখানি নৌকো পাল তুলে অলস গতিতে সাদা বালির চরের দিকে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব ভাবছিলেন, আমার নসিবে কী আছে জানি না। শুধু জানি কোরানে আমার প্রবল আসক্তি। কোরান, তাগদ আর মগজই আমার ভরসা। আমি সেই হতভাগ্য শাহজাদা—যার দিকে

হিন্দুস্থানের বাদশা মুখ ফিরিয়ে আছেন।

ঠিক এমন সময় দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের নিয়মিত ফারাকে আওয়াজ তুলে শব্দটির ছুটে আসা টের পেলেন আওরঙ্গজেব। কে যেন আসছে। কে যেন আসছে। ক্ষুরের আওয়াজ এখন স্পষ্ট।

খানিক বাদে এই শীতের দুপুরেও ঘেমে নেয়ে ওঠা এক ঘোড়ার পিঠ থেকে সওয়ার লাফিয়ে নামল। নেমে সে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হজরত। শাহজাদা মুরাদ বক্স সন্ধের ভেতর এসে পড়বেন। শাহজাদা তাঁর বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

কী আর করেন আওরঙ্গজেব। হাতের কাছে কিছুই নেই। সবার চোখের আড়ালে শাহজাদা তাঁর বাঁ পায়ের জুতোয় বসানো চুনিটি খুলে নিলেন। নিয়ে ঘোড়সওয়ারের হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে জানাবে—আমি শাহজাদা মুরাদের জন্যে অধীর হয়ে বসে আছি।

সেদিনের মতো আর নদী পেরনো হল না আওরঙ্গজেবের।

সন্ধেবেলা শাহজাদা মুরাদকে নিজের তাঁবুর সামনে সওগাত জানালেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। মুরাদ ঘোড়া থেকে নামতেই আওরঙ্গজেব এগিয়ে গেলেন। মুরাদের দু'হাত ধরে আওরঙ্গজেব বললেন, ছোটে ভাই—তুমি ছাড়া কোনও শাহজাদাই হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়ার যোগ্য নয়।

শাহজাদা মুরাদের বয়স এখন আঠাশ। তিনি আওরঙ্গজেবের মতো ফর্সা নন। তবে অনেক বেশি মজবুত শরীর তাঁর। সেই সঙ্গে তিনি অসমসাহসী। সামনাসামনি লড়াইয়ে তাঁর বিশ্বাস বেশি। বড়ো ভাইয়ের কথায় মুরাদের বুক যেন জ্বলে উঠল।

আওরঙ্গজেব বললেন, বড়ো ভাই শাহজাদা দারা আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের চোখের মণি। তাঁর মনসব—তাঁর ঘোড়সওয়ার—তাঁর সুবেদারির দিকে তাকাও। তাহলেই বুঝবে। এমনকি হিসারের ফৌজদারি—সরকার কোয়েলের রাহদারি বড়ো ভাইকেই দেওয়া হয়েছে। যাতে কিনা আব্বা হুজুরের পরেই বড়ো ভাই হিন্দুস্থানের মসনদে বসতে পারেন। কিন্তু—

আওরঙ্গজেব থেমে পড়াতে মুরাদ তাঁর চোখে তাকালেন। আওরঙ্গজেব মুরাদের মুখে তাকিয়ে দেখছিলেন, চোখ দু'টি লাল। বিশাল দুই কাঁধ। বিরাট লড়াকুর মতোই দু' খানি হাত মুরাদের।

—কিন্তু শাহজাদা দারা বিধর্মী। পৌত্তলিক। সে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। আর শাহজাদা সুজা? তিনি তো ধর্ম থেকে সরেই গেছেন। ঢাকায় বসে শিয়াদের নিয়ে মাতামাতি করছেন। সুজা ইসলাম-বিরোধী। আমি কোরান বৈ কিছু বুঝি না। কোরানে আমি ডুবে আছি। এই বোধ থেকেই তোমাকে সমস্ত হিন্দুস্থানের বাদশা করতে আমি উৎসাহ পাচ্ছি। কারণ, একথা সবার জানা সত্য—আমি বহুদিন আগেই সংসার ত্যাগ করেছি—মক্কায় গিয়ে আমার শেষ জীবন কাটিয়ে দেব—এই আমার ব্রত।

এসব বলতে বলতে আওরঙ্গজেব মুরাদকে নিয়ে নিজের তাবুতে ঢুকলেন।

ছোট ভাইকে অভ্রের বাতিদানের কাছাকাছি বসালেন। তারপর বললেন, শাহজাদা মুরাদ! আমি তোমার কাছে একটা আর্জি জানাচ্ছি—

—আর্জি নয় বড়ে ভাই। হুকুম করুন।

—তুমি কোরান ছুঁয়ে কসম খাও—আল্লার দয়ায় আমি তোমাকে বাদশার মসনদে বসানোর পর তুমি আমার পরিবারের সবাইকে সদয় ব্যবহার করবে। যদি তুমি আমাকে কোরান ছুঁয়ে এখন কথা রাখার কসম খাও—তাহলে আমিও কসম খেয়ে বলছি—আমার সমস্ত তাগদ, মগজ তোমার জন্যেই ব্যবহার করব—তোমাকে হিন্দুস্থানের মসনদে বসাবার জন্যে সবরকম চেষ্টা করে যাব। আমরা মায়ের পেটের ভাই। আমরা একই আব্বা হুজুরের ছেলে। দুজনই এক ধর্মে বিশ্বাসী। দুজনই কোরানের রক্ষক।

শাহজাদা মুরাদ তাঁর বড়ে ভাইয়ের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না। বাইরে খানিক দূরে রাপ্তির সঙ্গে ঘর্ঘরা এসে মিশেছে। অন্ধকারে, শীতে তা দেখা যায় না। হিন্দুস্থানের দুটি তাজা শক্তি এইমাত্র একজোট হল। অভ্রের উজ্জ্বল শিখার সামনে।

শীত পড়ার ঠিক আগে এই যে বর্ষা গেল—তার শুরুয়াতের মাঝামাঝি শাহজাদা আওরঙ্গজেব ভাঙা মনে মুঘল ফৌজ নিয়ে কান্দাহার থেকে কাবুলে ফিরে আসেন। তখনই শাহজাদা দারা হিন্দুস্থানের বাদশাকে বলেছিলেন, হজরত! মুঘল বাদশার হারানো ইজ্জত ফিরিয়ে আনতে আমি কান্দাহার যাব।

তখনই ঠিক হয়—শীতের শেষে মুঘল ফৌজ কিল্লা-কান্দাহারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাতে সিপাহ-সালার থাকবেন শাহজাদা দারা।

দারা এখন নিজেও জানেন, কিল্লা-কান্দাহার ছিনিয়ে আনার জন্যে এটাই হল আখেরি লড়াই। এবারই হয় এসপার—নয় উসপার। তাই নিজেই তিনি লড়াইয়ের সব খুঁটিনাটি দেখছেন। বাছাই করছেন। যাচাই করছেন। হুকুম দিচ্ছেন। বাতিলও করছেন। ষোলো হাজার বাঁশও এসে পৌঁছেছে সুদূর সুবে বাংলা থেকে। কয়েক হাজার মই তৈরি হচ্ছে। কিল্লা-কান্দাহারের দেওয়াল বেয়ে উঠে ইরানিদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্যে। প্রতিটি বাঁশ ইলাহি দশ গজের ওপর লম্বা।

শাহজাদা দারার এখনই তিরিশ হাজার জাত। বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার। মসনদে বসার আগে জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে ঠিক এই একই জাত আর সওয়ার দিয়েছিলেন। এবার শাহজাহান বাদশা কিল্লা-কান্দাহারের এই লড়াইয়ে দারার অধীনে শাহী সব ফৌজ সামিল করলেন।

গত পাঁচ ছ' বছরের ভেতর শাহজাদা দারা সারা হিন্দুস্থানে বিখ্যাত হয়েছেন পণ্ডিত হিসাবেই—ফৌজের সিপাহ-সালার হিসাবে নয়। তাই সবাই অবাক—এমন একজন পণ্ডিতকে লড়াইয়ে পাঠানো হচ্ছে কেন? জাহানাবাদ-আগ্রার শায়েররা তো এমন একজন কবি—পণ্ডিত মানুষের যুদ্ধযাত্রা নিয়ে গানই বেঁধে বসল।

কিল্লা-লাহোরের কামারশালায় বড় বড় তিনটি কামান তৈরি হচ্ছিল। কিল্লা-কান্দাহারের পাথুরে দেওয়াল ধসাতে চাই জোরালো কামান, ভারী তোপ, তুখোড় গোলন্দাজ। গত ক'বারই কান্দাহার লড়াইয়ে দেখা গেছে হিন্দুস্থানের তোপখানা ইরানি তোপখানাকে পাল্টা জবাব দিতে পারে না। ওদের গোলার পাল্লা হিন্দুস্থানের গোলার পাল্লার চেয়ে অনেক বেশি। ওদের নিশানাও প্রায় অব্যর্থ।

এবার তাই বেশি তনখা দিয়ে শাহী তোপখানায় ইস্তাম্বুলের তুর্কি আর ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ ভর্তি করা হয়েছে। ঠিক জায়গায় কামান বসানো—গোলা-বারুদ নলে ভরে সলতেয় আগুন দেওয়া—তোপ ফেটে মরে যাওয়ার মতো বিপদের ঝুঁকি—সবরকমের মোটা কাজ হিন্দুস্থানি খালাসিরাই করবে। বিদেশী গোলন্দাজরা শুধু নিশানা ঠিক করবে। কামান দাগার হুকুম দেবে।

কামারশালায় ভারি কামানের পাশাপাশি সাতটি হাল্কা তোপা-ই-হাওয়াই তৈরি করা শেষ। বড় তিনটি কামানের ভেতর সবচেয়ে বড়টির নাম দেওয়া হয়েছে—কিলা-কুশা। এ কামান থেকে বাহান্ন সেরি গোলা দাগা যাবে। তারপরেই ফতে মোবারক। এ কামান থেকে পঁয়তাল্লিশ সেরি গোলা দাগা যাবে। তিনটির ভেতর সবচেয়ে ছোট কিশোয়ার-কুশা! এ কামানের গোলার ওজন বত্রিশ সের।

কিল্লা-কান্দাহার যে ছিনিয়ে নিতে পারবেনই—সে-ব্যাপারে শাহজাদা দারা একেবারে নিশ্চিত। কান্দাহার জয়ের স্বপ্নে তিনি বিভোর। তাই নিজের তোপের বাহাদুরি তিনি কামানগুলোর গায়ে আগেই খোদাই করাচ্ছিলেন। ফতে মোবারক তোপের ওপর ফারসিতে খোদাই করা হল—

তোপ-ই-দারা শুকো শাহ্ ই-জাহান্
মি-কুনদ্ 'কান্দাহার'-বা বৈয়রান্

খোদাইয়ের কাজ দেখতে দেখতে মুন্সি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বললেন, দুনিয়ার বাদশা দারাশুকোর এই কামান কান্দাহার ধ্বংস করুক।

দারা চন্দ্রভানের মুখে তাকালেন। চন্দ্রভান এই অভিযানে শাহজাদা দারার ফৌজি রসদের দেখাশুনোর ভার পেয়েছেন। দারা বললেন, কিলা-কুশা তোপেও খোদাই করাচ্ছি।

—দেখি—বলে চন্দ্রভান খোদাইয়ের ফারসি রুবাইটি চাইলেন।

দারা মুখে মুখেই বলে উঠলেন—

তোপ-ই-দারা শুকো কিলা-কুশা
সর্-ই-গর্জাস্প মি-বুরদ বে হাওয়া।

॥ চুরানব্বই ॥

নর্মদা পেরবার পর প্রথম যে বড় জায়গা শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ফৌজের পথে পড়ল তা হল খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর। আওরঙ্গজেব শহরে ঢুকলেন না। কান্দাহার তিনি জয় করতে পারেননি—কারণ, ইরানিদের মতো বড় কামান

ছিল না—ছিল না লড়াইয়ে খোলা হাত—কেন না, কাবুলে নয়তো লাহোরে বসে থেকে খোদ বাদশা চিঠি দিয়ে সব হুকুম দিচ্ছিলেন। কিন্তু এসব কথা তো আম-জনতা শুনবে না—জানবেও না। তারা হয়তো তাঁর ফৌজকে ফিরতে দেখে দাঁত বের করে হাসবে। তাই শাহজাদা তাঁর ফেরার পথে শহর জায়গা এড়িয়ে চলেছেন।

নর্মদার ওপারে এখন চড়া শীত হলেও এপারে শীত কিন্তু আরামের। হিন্দুস্থানের যতই দক্ষিণে এখন নামা যাবে—শীত ততই সহ্যের ভেতর এসে যাবে। আওরঙ্গজেব একদিন সকালবেলা ফৌজের সব জানোয়ারের গা থেকে ঢাকা দেবার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলার হুকুম দিলেন।

সারাটা পথই বলা যায় বেহড়। নদীখাত আর গাছপালায় ঢাকা অসাধ্য সব পাহাড়। সাতপুরা পাহাড় থেকে চান্দোর পাহাড় নেমে এসেছে প্রায় গোদাবরীর গায়ে। সেখানেই ঔরঙ্গাবাদ। দূর থেকে ঔরঙ্গাবাদের দিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব বুঝলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর জেগে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে কী এক মায়ায় এই নবীন মুঘলের বুক ভরে উঠল। এই ঔরঙ্গাবাদে আমি মানুষ বসিয়েছি। আজকের ঔরঙ্গাবাদ যা-কিছু তার সবই আমার কথা। ছিল মালিক অম্বরের কিরকি। সে কিরকিকে আজকের ঔরঙ্গাবাদের ভেতর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মনে বহুদিন পরে শীতের এই সকালে কী এক প্রশান্তি এল। তাহলে আমিও কিছু পারি। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ঔরঙ্গাবাদ নামে এই নয়া নগর থেকে যাবে। কিন্তু তাতে কি কান্দাহারের হার মুছে যাবে? তাতে কি বড়ো ভাই শাহজাদা দারাশুকোর দিকে আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের ভালবাসার সমান সমান যে অবিশ্বাস—অবহেলা আমার দিকে রয়েছে—তার কিছুটা কি হালকা হবে? এমন সুন্দর সকাল—আমার গায়ে কত তাগদ তা আমি জানি না—আমার পায়ের নীচে হিন্দুস্থানের পাঁচ পাঁচটি সুবা—আমার কথাই হিন্দুস্থানের দক্ষিণে প্রায় শেষ কথা—তবু আমি শান্তি পাই না কেন? কেন আমি অস্থির? সব সময় মনে হয়—কত কাজ পড়ে আছে। কিছুই করা হয়নি। অথচ শাহজাদা দারা একটি লড়াইও না-লড়ে দিব্যি সাধু-সন্ন্যাসী—ফকির-দরবেশের ফক্কিবাজিতে ডুবে আছেন। ডুবে আছেন শাহজাদা সুজা স্রেফ আয়েশে-বিলাসে। আর শাহজাদা মুরাদ বক্স? সে জানে শুধু শিকার। জঙ্গলের জানোয়ার আর সুবার হাসিন জেনানা।

ঔরঙ্গাবাদের কাছাকাছি এসে একটি গ্রাম পড়ল। নাম তার সাত্তারা। একেবারে গহিন জঙ্গল নয় জায়গাটা। আবার খুব [illegible] বসতি আছে তাও নয়। এখানকার লোকজন ঠিক চাষবাসের চাষী মানুষ নয়। ব্যাপারটা চোখে পড়ল, দক্ষিণের সুবেদার-ই-আজম শাহজাদা আওরঙ্গজেবের দেওয়ান—ডান হাত মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের। চাষী হলে বলদ থাকত। গেরস্থ হলে গাইগোরু থাকত। এলাকাটা বেহড়ের মতোই প্রায়। কাঁটাঝোপ, কাঁটালতা, বড় বড় খাদের ভেতর গোদাবরীরই কোনও শাখা বয়ে চলেছে। মুর্শিদকুলি খাঁ আবদারখানায় নিজেই

এত্তেলা দিলেন, আজ দুপুরের নাস্তায় শাহজাদাকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মালঘোবা যেন পরিবেশন করা হয়। গোস্তের নানান্ পদের ভেতর এটি শাহজাদার খুব পছন্দের তা জানেন মুর্শিদকুলি খাঁ। দশ সের গোস্তের সঙ্গে দশ সের দই, এক সের ঘি, এক পো আদার রস, ছোট এলাচি, গোলমরিচ ইত্যাদি দুই দাম করে—সেই সঙ্গে বাদাম। ঢিমে আঁচে রান্নাটা হওয়া চাই। গোস্ত তার নিজের খুশবু হারাবে না—অথচ দই, ঘি, বাদাম, আদার রসে জারিয়ে যাবে। মালঘোবার পাশাপাশি শাহজাদার সামনে সাজিয়ে দিতে হবে বাঘরা। সেটাও গোস্তেরই কারিকুরি, তবে গোস্তের সঙ্গে থাকবে ফুল-ময়দা, ঘি, নাখদ ডাল, মিছরি, লেবুর রস, পেঁয়াজ, ওলন্দাজদের সবজি শালগম, ছোট এলাচি, কাবাব-চিনি আর কাঁচ মটর। শাহজাদার সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ আওরঙ্গজেবকে ভাল করেই জানেন।

এবার মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর ঘোড়াকে শাহজাদার ঘোড়ার কাছাকাছি এনে বললেন, হজরত। এত সুন্দর সকাল। এই সাত্তারা গাঁয়ের পরেই খোলা প্রান্তর। চলুন ঘোড়া দাবড়ে আসবেন।

আওরঙ্গজেব ঠিক করতে পারছিলেন না—এত সুন্দর সকাল নিয়ে কী করবেন। তিনি বললেন, যাবেন?

—হ্যাঁ বন্দেগান। যাওয়া দরকার। ফৌজের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো হয়ে যাবে। ওদের—আর আমাদেরও গা ঘামানো দরকার। এই শরীর তন্দুরস্ত না থাকলে মগজ তো কাজ করবে না ঠিক মতো।

—তাহলে চলুন। —বলেই আওরঙ্গজেব তাঁর ঘোড়ার পেটে দুই পায়ে ঠোক্কর দিলেন। ঘোড়াটি আরবি। শুধু যেন এই ঠোক্করের অপেক্ষায় ছিল। মুহূর্তে শাহজাদাকে নিয়ে সে সাত্তারা গাঁয়ের জঙ্গলে ঢাকা ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ তৈরিই ছিলেন। তাঁর চোখের ইশারায় দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার শাহজাদার পিছু নিল। তাদের আগে আগে মুর্শিদকুলি খাঁ। এই ইরানি দাক্ষিণের জমি-জিরেত ঘাঁটাঘাঁটি করে নাম কিনলেও সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার কখনও ভোলেন না। মন ভেঙেপড়া বিষাদকে তাড়াতে চাই খিদে। আর সে খিদের উৎস মেহনত। ঘোড়া দাবড়ানোর চেয়ে ভাল মেহনত আর কী হতে পারে।

সাত্তারা গাঁ যেন বড় বড় গাছের পায়ের কাছে গড়ে উঠেছে। এ গাঁয়ে বড় জোর ক্বচিৎ কখনও কোনও সেপাই এসে থাকে। তাও অবরে সবরে। দাক্ষিণের সুবেদার-ই-আজম খোদ শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর যে এমন গাঁয়ে ঢুকে পড়তে পারেন—তা গাঁয়ের মানুষদের কল্পনার বাইরে। দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার মানে দেড়শোর মতো বাছাই ঘোড়া। তাদের পিঠে বাছাই বাছাই সব সওয়ার! সওয়ারদের পোশাক আর হাঁটু রাঙানো ঘোড়া দেখে গাঁয়ের মানুষরা ভাবল—ভোরবেলা উঠে তারা বুঝি রূপকথার কোনও স্বপ্ন দেখছে।

পিঠের ঝালরে ঢেউ তুলে আওরঙ্গজেব সাত্তারা গাঁয়ের শেষে প্রান্তরে পড়লেন। গাঁয়ের লোকজন কোনও শাহী মুঘলকে কোনওদিন এত কাছের থেকে

দেখেনি। ভোরের টাটকা রোদে শাহজাদা ঘেমে উঠেছেন। মাথার উষ্ণীষের নীচে মুখখানি রীতিমত ফর্সা। গভীর ঘন কালো চোখ। ভোরবেলা এই দৃশ্য দেখে গাঁয়ের মানুষজন কোনও ভয় পেল না। বরং গাঁও-বুড়া এগিয়ে এসে আনাড়ির মতো দূর থেকে শাহজাদাকে কুর্নিশ করল। করে জানাল—চান্দোর পাহাড়ের জঙ্গলে নীলগাই আছে। গুহায় আছে শের।

ঘোড়া দাবড়ে ভালই লাগছিল শাহজাদার। আঙ্গিয়ার নীচে নাভির কাছে তেজ আর খিদে—দুইই টের পাচ্ছিলেন তিনি। সুবেদার-ই-আজমের উপযুক্ত গম্ভীরভাব সব সময় শাহজাদার মুখে থাকে। তার বাইরে না বেরিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, ওদের কি এখন জংগলে টেনে নামানো যাবে?

দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যেন মুখিয়েই ছিলেন। তিনি গাঁয়ের মরদদের দিকে উৎসাহের চোখে তাকিয়ে বললেন, খুব যাবে। কি? তোমরা পারবে না—

সামান্য তসিলদারও এ গাঁয়ে আসে না। এটা চাষবাসের গাঁ নয়। সবাই ঠিকে কাজের খোঁজে ঔরঙ্গবাদ ছোটে। নয়তো হপ্তাভর হেঁটে বুরহানপুরে গিয়ে শাহী কামারশালে হাতৌড়ি পেটাইয়ের কাজ খোঁজে। তারা তো এখন শাহজাদা বা তাঁর এমন হাসি হাসি মুখ লোক-লশকর কোনওদিন দেখেনি। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কথায় ওরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুব পারব। আমরা নীলগাইয়ের আস্তানায় মশাল নিয়ে ঢ্যাঁড়রা পেটালেই ওরা ছোটাছুটি লাগিয়ে দেবে। তবে শের বহুত মগজদার জানবার। ওরা কি বেরবে—

দিনের বেলায় আর মশাল জ্বালতে হল না। সাত্তারা আর তার আশপাশ সুবা খান্দেশের ভেতরেই পড়ে। এদিককার জাখেরী গুড়—খান্দেশরী গুড় মানুষজনের প্রিয় খাবার। ফৌজের সঙ্গে পোষা নেকড়ে থাকে। থাকে নীরেস খান্দেশী গুড়। ঝোলা মতো। শিকার দেখাশুনোর লোকজন পোষা তিনটি নেকড়ের গায়ে আচ্ছা করে ঝোলাগুড় মাখাল। মাখিয়ে তাদের ঢ্যাঁড়রাওয়ালাদের আগে আগে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের পেছন পেছন সাত্তারার ছেলেবুড়ো সবাই বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে দা, বল্লম, ট্যাটা। আর সারা গাঁয়ের আওরতরা জঙ্গলের ফলপাকুড় জোগাড় করে ভেট সাজাতে লাগল। সুবেদার-ই-আজমের মবারকে নজরানা দেওয়া হবে।

আওরঙ্গজেবের ওসব দেখার সময় বা ইচ্ছা কোনওটাই ছিল না। মুঘল যুগে যাযাবর চাঘতাই খোয়াব সব সময়েই যেন ঘুমিয়ে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁ শুনেছেন, বাবর বাদশা শরীরের তন্দুরস্তি বজায় রাখতে রোজ ভোর ভোর ঘোড়া দাবড়াতেন—মঞ্জেলের পর মঞ্জেল। হুমায়ুন বাদশার শাহীর অর্ধেকের বেশি কেটেছে ঘোড়ারই পিঠে। আকবর বাদশা ঘোড়ার ব্যাপারে সমঝদার ছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশা তো একসময় ঘোড়ার পিঠে বসেই শের শিকার করেছেন। বাদশা শাহজাহান টানা পাঁচটি বছর ঘোড়ার পিঠেই হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আরেক-দিকে ছুটেছেন—তাঁর বাগী জীবনে। দক্ষিণের সুবেদারির দেওয়ান হয়ে ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে ছুটে বেড়ানো শাহজাদাকে মন দিয়ে দেখছিলেন। ইসলামের শরিয়তে জোর বিশ্বাস—সুবেদার-ই-আজমের পক্ষে মানানসই ওজনদার চলনবলন,

কোনও বেচাল নেই—লড়াই থেকে শান্তি—দুই সময়ই সমান বোঝেন—ফৌজের সুবিধা-অসুবিধায় কড়া দৃষ্টি—উপরন্তু চাষীকে জমির সঙ্গে জুতে দিয়ে জমি-জিরেত সুফলা করে তোলার ওস্তাদ এই তাজা শাহজাদাকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করেন।

গুড়ের গন্ধ ছড়ানো নেকড়ে খেলিয়ে দেওয়ায় নীলগাইয়ের দল বেশিক্ষণ জঙ্গলে থাকতে পারল না। ঢ্যাড়রার কোনও থামা নেই। ওরা ভীম বেগে সরাসরি শাহজাদার সফরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘোড়সওয়ারদের রিসালাদার দু'জনই আহেদি। তারা তৈরিই ছিল। কান্দাহার লড়াইয়ের জন্যে ফিরঙ্গি কামার দিয়ে বানানো তাদের দুই বন্দুক আগুন বর্ষাতে লাগল। নীলগাইয়েরা দলে মোট পাঁচটি। তাদের সামনেরটি পড়ে যাওয়ায় ওরা থমকে পড়ল। ঠিক তখনই শাহজাদার বন্দুক গর্জে উঠল। এই বন্দুকটি হালকা। আকারে ছোট। দৌলতাবাদে থাকতে গুজরাতের জাহাজ-ব্যাপারী গোক্ষুর এসে নজরানা দিয়েছিলেন শাহজাদাকে। আর্মেনিয়ার বন্দুক-ব্যাপারীদের কাছ থেকে গোক্ষুরের কেনা।

পর পর দু'টি নীলগাই পড়ে গেল। গাঁয়ের মানুষদের প্রবল উৎসাহ। পরনে লেংটি মাত্র। ওরা বাকি দুটি নীলগাইয়ের তোয়াক্কা না করেই পড়ে যাওয়া জানোয়ারদের ওপর দা, ট্যাটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুর্শিদকুলি খাঁয়ের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না। শাহজাদাকে তিনি শিকারে মাতোয়ারা করে দিতে চান। কিন্তু গাঁয়ের মরদরা নীলগাইয়ের গোস্তের জন্যে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে। দেওয়ান নিজেই এবার গুলি চালালেন। মানুষ বাঁচিয়েই। কিন্তু দু'টি মরদ পড়ে গেল। মরণ-যন্ত্রণায় গোঙানো নীলগাইদের পাশে পড়ে গিয়ে ওরা দু'জনও মরবার আগে গোঙাতে লাগল। তাতে বাকি মানুষজনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা শুধু সরে দাঁড়াল। মুখে সম্ভ্রম। ভাবখানা—আহা রে! আমরা বহুদিন গোস্ত খাইনি বলে এমন করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি জখম জানোয়ারের ওপর—যাতে কিনা শাহজাদার শিকারে বাদ সাধা হয়েছে।

ঠিক এইসময়—মুর্শিদকুলি খাঁ চেঁচিয়ে উঠলেন, শের কোথায়? শের?—বলতে বলতে তিনি দেখলেন, প্রাণ বাঁচাতে বাকি দুই নীলগাই গোদাবরীর শাখার জলের বেহড়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

অমনি ওরা ঢ্যাড়রা পেটাতে পেটাতে ফের চান্দোর পা ধরে ওপরে উঠতে লাগল। গুহা থেকে শের তাড়িয়ে বের করতে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় আসমানের ধূপ ঠাহর হয় না। জিন্দা ইনসানের জীবন নিয়ে খেলা করার এ কী অসীম ক্ষমতা। আওরঙ্গজেব হাসতে হাসতে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের দিকে তাকিয়ে সামান্য পরিহাসের গলায় জানতে চাইলেন, বলতে পারেন দেওয়ানসাহেব—জানোয়ারের কথা বাদ দিন—আল্লাতালার এই দুনিয়ায় জিন্দা ইনসানের জীবন, নসিব নিয়ে খেলার এ ক্ষমতা আমাদের কে দিল?

মুর্শিদকুলি খাঁ শাহজাদার সঙ্গে কথাবার্তার সময় কখনই হালকা হন না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, হজরত! যাঁর দুনিয়া—সেই আল্লাতালাই মুঘলশাহীকে

—বাদশাকে—শাহজাদাদের এই ক্ষমতা দিয়েছেন। এটাই আল্লাতালার ইচ্ছা।

ফের ঘোড়ার পিঠে উঠে আওরঙ্গজেব মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, হে মহান আল্লা! সত্যিই কি আপনি আমাকে মানুষের জীবন—নসিব নিয়ে এই খেলার ক্ষমতা দিয়েছেন? আমি জানি না আপনি দিয়েছেন কিনা। আমি আজও জানি না আমাদের এই মুঘল শাহীর পত্তন—প্রসার সবই আপনার ইচ্ছায় কিনা। এত শক্তি—এত তেজ—অঢেল জঙ্গল, নদী, পাহাড়, মানুষজন—সবই বেছে বেছে আমাদের দিলেন কেন? যদি দিলেনই তবে সেই দানের পাশায় কেন হার লুকিয়ে থাকে? কেনই বা জয় ভেসে ওঠে?

দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ শাহজাদাকে একা থাকতে দিতে চান না। চান না—কাজের লোকের কদরদার এই শাহজাদা কান্দাহারের বিষাদে ভেঙে পড়ুন। দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার, লেলানো নেকড়ে তিনটি আর গাঁয়ের মরদরা যখন গুহা থেকে শের তাড়িয়ে বের করতে ব্যস্ত—ঠিক তখনই—শীতের আরামসই রোদের ভেতর আওরঙ্গজেব খোলা প্রান্তরে এসে পড়লেন। তার পাশে পাশে ঘোড়ার পিঠে মুর্শিদকুলি খাঁ।

দু'জনের মুখে কোনও কথা নেই। শাহজাদার মনে হল—এই যে শিকারে মেতে উঠেছিলাম—আমার ভেতরকার ভেতরে নিশ্চয় শিকারের ইচ্ছা ছিল। না, নেহাতই গা ঘামানোই আমার মতলব ছিল? গা ঘামলে খিদে পায়! খিদে পেলে সব খাবারই সুস্বাদু লাগে। আমি যে এসব করছি—এর পেছনে ইবলিশের উসকানি নেই তো?

খানিকটা এগিয়ে বিরাট এক হ্রদ পড়ল। গত বর্ষার জল স্থির হয়ে আছে। একজন মাছ ধরছিল। গাঁয়ের মানুষ হবে। সে হঠাৎ দেখল—তার ফাতনার সামনে ঘোড়াসমেত দুই সওয়ারের ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে গেল।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে আটকালেন। এ জলকর কাদের? শাহী জলকর নয়তো?

লোকটি ভড়কে গিয়ে কোনওমতে বলতে পারল, তা জানি না। তবে সবাই বলে কোতলুগ সাগর।

শাহজাদা অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। কোতলুগ সাগরের আধখানা জুড়ে একটি পাহাড়ের ছায়া। সেই ছায়ার ওপরের দিকে মন্দির মতো কিসের আভাস। সেদিকে তাকিয়ে আনমনা আওরংগজেব জানতে চাইলেন, ও কিসের ছায়া?

লোকটি বলল, খণ্ডে রাইয়ের মন্দির। আমি ওখানে সন্ধ্যায় মৃদঙ্গ বাজাই—

মুর্শিদকুলি খাঁ শাহজাদার মন বোঝেন। তিনি লোকটিকে ধাতস্থ হতে দিয়ে শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, মন্দির ওঠার পথ কোনদিকে?

লোকটি পাহাড়ের গায়ে গাছপালার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ সামান্য ধমকে বললেন, উঁহু। ঘোড়া উঠতে পারবে?

লোকটি এবার আশ্বস্ত হল। বিশদে যা বলল, তার মানে দাঁড়ায়—ঘোড়া, হাতি, গো-গাড়ি ওঠার রাস্তা তো আছেই। ওখানে অনেকেই যায়। পুরুত-

মশাইয়ের সম্বচ্ছরের জিনিসপত্র গো-গাড়িতেই তো ওপরে ওঠে। বৈশাখীর সময় দেবদাসীরা নাচে। অন্নভোগ খেতে দলে দলে মানুষ তখন খণ্ডে রাইয়ের মন্দিরে যায়—

দেবদাসী?—কথাটি বলেই শাহজাদা চুপ করে গেলেন। দেওয়ান সাহেব দেখলেন, আওরঙ্গজেবের মুখখানি লাল থেকে আরও লাল হয়ে উঠছে। তিনি ঘোড়ার মুখ এর ভেতরেই পাহাড়ের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

অগত্যা—

দু'জনে যখন খণ্ডে রাইয়ের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন—তখন চারদিক সুনসান। বাইরে থেকে ভেতরের বিগ্রহ দেখা যায় না। চাতালের নীচেই ফুলের বাহার। হঠাৎ শাহজাদা দেখলেন, খোলা চাতালের এক কোণে খালি গায়ে বিশাল-দেহী এক পুরোহিত চোখ বুজে বসে। তাঁকে ঘিরে তিনজন আওরত নেচে চলেছে। তাদের পায়ে ঘুঙুর নেই। তাই আগে খেয়াল হয়নি শাহজাদার। এরাই তাহলে দেবদাসী। এদের কথা শাহজাদা শুনেছেন। কিন্তু কখনও চাক্ষুষ দেখেননি এদের। কাফেরদের এইসব ক্রিয়াকাণ্ড শাহজাদার চোখে ইনসানকে ইনসানের নীচে নামিয়ে দেয়। পুরো ব্যাপারটাই লজ্জার সীমানার নীচে।

লিবাস বলতে জওয়ান আওরত তিনজনের গায়ে কাঁচুলি, জরি লাগানো কোমরবন্ধ—পেছনে কোমর থেকে সোনালী শেকল নিতম্বের ভাঁজে নাচের তালে তালে ঘন ঘন আছড়ে পড়ছে।

শাহজাদার মুখখানি যেন ফেটে পড়ছে। তাই দেখে মুর্শিদকুলি খাঁ কোমর থেকে তলোয়ার বের করলেন। আওরঙ্গজেব জানেন না, এই তলোয়ার কার জন্যে মৃত্যু হয়ে নামবে। পুরোহিত? না, দেবদাসী তিনজন? আওরঙ্গজেব ডান হাত দিয়ে দেওয়ানকে থামালেন। এখন নয়—

শান্ত নির্জন জায়গায় শাহজাদার গাঢ় গলা যেন গমগম করে উঠল। এ পুরুষকণ্ঠ বুঁদ হয়ে থাকা পুরোহিতের কানে যাবেই। বেশ রাগেই চোখ খুললেন তিনি। এমন সময় অন্য পুরুষ কে এল? কার এত সাহস?

কিন্তু শাহজাদাকে দেখেই রেগে ওঠা পুরোহিত পলকে নেতিয়ে গেলেন। দেবদাসীরা ছুটে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। পুরোহিত মানুষটির বয়স হয়েছে। তার ওপর খাওয়া-দাওয়ার ভেতর এমন একটি ডাল তিনি এত বেশি খেয়ে থাকেন যে জন্যে তাঁর কোমর থেকে পা অব্দি বাঁ দিকে ভীষণ ব্যথা। পুরনো শহর দৌলতবাদে গিয়ে ভিষগরত্নকে দেখাবেন—ভাবেন—কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। তিনি শাহজাদাকে দৌলতাবাদে দূর থেকে দেখেছেন—নওরোজ উৎসবের দিন সন্ধ্যায়। ভয়ে, আতঙ্কে আচমকা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পুরোহিত চাতালের ওপরেই গড়িয়ে পড়লেন।

জওয়ান আওরতদের প্রায় নাঙ্গা হয়ে এই পুরোহিত সেবাকে কোন চোখে দেখে থাকেন আওরঙ্গজেব—তা দেওয়ান হিসেবে ভাল করেই জানেন মুর্শিদকুলি খাঁ। এবারও তিনি ঘোড়া থেকে ডানদিকে ঝুঁকে খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেলেন। ঠিক যেভাবে তলোয়ারের ডগায় তরমুজ গাঁথা হয়ে থাকে ফৌজি কসরতে

—সেইভাবেই গড়িয়ে পড়া পুরোহিতকে গেঁথে ফেলবেন তিনি।

এবারও আওরঙ্গজেব তাঁকে থামালেন। তারপর সুবেদারি মেজাজে হুকুম দিলেন, ঘোড়সওয়াররা এখুনি এখানে আসুক।

হুকুম তামিল করতে মুর্শিদকুলি খাঁ ঘোড়া দাবড়ে নীচে নামতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ফের থামালেন শাহজাদা। এখান থেকেই খবর দিন।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়ার পিঠে পাতা লাল রেশমি কাপড়খানিকে সংকেত করে মুর্শিদকুলি খাঁ পাহাড়ের ওপর থেকে নিজের মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন।

খানিকবাদে শাহজাদা দেখতে পেলেন—বহু দূরে নীচে পিঁপড়ের মতো সারি দিয়ে দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের দিকেই ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের ভেতর ওপরে উঠে আসবে।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা শান্ত গলায় বললেন, বিকেলের আগেই হাতি আনতে হবে।

—হজরত! হাতি?

—হ্যাঁ। হাতি। অন্তত গুটি ছয়েক হাতি দরকার। কাল ভোর হওয়ার আগে এ-মন্দির মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এখানে কাফেররা হররোজ ইনসানিয়াতের বে-ইজ্জতি করে চলেছে। তার আগে দেবদাসীদের ডাকুন।

—ওরা ভয়ে মন্দিরের ভেতর সেঁধিয়েছে।

—লুকিয়ে পার পাবে না। ওদের সবাইকে ডাকুন। আমার সুবায় এসব চলতে পারে না। আমি ওদের সবাইকে ইজ্জতের সঙ্গে বিয়ে দেব।

চাতালে পড়ে থাকা পুরোহিত চোখ বুজে সব শুনছিলেন। তিনি চোখ খুললেন না।

॥ পঁচানব্বই ॥

লাহোর, আগ্রা/জাহানাবাদে হঠাৎ আতর বিক্রি বেড়ে গেছে। রইসি মানুষজন রেশম তুলোয় আতর মাখিয়ে কানে তো দিচ্ছেনই। উপরন্তু নাক চাপা দিতে তাঁদের সঙ্গে সবসময় আতর মাখানো দু'চারখানি রুমাল থাকছেই। আগ্রার কাছাকাছি ফৌজি ছাউনি থেকে ঘোড়সওয়াররা চলেছে জাহানাবাদ। সেখান থেকে লাহোর হয়ে মুলতানের ভেতর দিয়ে ফৌজ রওয়ানা হবে থল-চোটিয়ালের দিকে। ওখানে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে হিন্দুস্থানের ফৌজ পাড়ি দেবে কান্দাহার। সে ফৌজের সিপাহসালার শাহজাদা দারাশুকো।

সাকেত ছাউনি থেকে শুধু ঘোড়সওয়ারই আগ্রা হয়ে জাহানাবাদ যাচ্ছে না। যাচ্ছে উটের কাতারের পর কাতার। ওরা টানবে কামানের গাড়ি। আর পিঠে নেবে হাতাহাতি লড়াইয়ের সময়কার বল্লমধারী সেপাই। এই যুদ্ধ-যাত্রার মহামিছিল যেন আস্ত হিন্দুস্থানের হুবহু ছবি। এই মিছিলে আছে বন্দুকচী, তীরন্দাজ, ঘোড়ার পিঠে বাছাই আহেদি, তৈনাতী পদাতী, খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে বেলদার,

পাথর কাটাই মিস্ত্রি আর ভিস্তির দল।

এত ইনসান আর এত জানোয়ার যাচ্ছে। তাদের খাবার-দাবার চাই। চাই দাড়ি কামাবার নাপিত, রান্নাবান্নার রসুইকার, কাচাকাচির ধোপা। তবে বেশিরভাগ সেপাই-ই আপ-খোরাকি। ঘোড়ার জিন, লাগাম—নিজের বল্লমটি আর গায়ের জামা, পায়ের পট্টি সেপাইকে নিজেরই ব্যবস্থা করতে হয়। তবে বন্দুক, গোলাগুলি শাহী দেওয়ানখানা থেকেই ওদের দেওয়া হয়।

ফৌজের সুবিধার জন্যে আগ্রা, জাহানাবাদ, লাহোরের বাইরেই উর্দু-বাজার বসেছে। সেখানে যে কোনও সেপাই ন্যায্য দামে সমস্ত খাবার ঘাস দানা দরকার মতো কিনতে পারে। পিঠে লোটা-কম্বল বদনা—কিংবা জিনে ওসব বেঁধে নিয়ে সেপাইদের পথ-চলা সারা দিনরাত দেখা যায়। বনজারা চৌধুরীরা এইসব উর্দু বাজারে সবসময় খাবার-দাবার জোগাচ্ছে। এজন্যে তারা ফৌজের পাশাপাশি বলদ আর খচ্চরের পিঠে যব, গম, ডাল, চালের বস্তা চাপিয়ে দিনরাত মাঠ ভাঙছে। তাই বস্তা পিঠে তাদের হাজার হাজার বলদ আর খচ্চরকেও মাঠ ভাঙতে দেখা যাচ্ছে। পাছে দেহাতে খাবার-দাবার লুট হয় তাই বনজারা চৌধুরীরাও রীতিমত সশস্ত্র। তার ওপর ওরা সঙ্গে রাখছে ভীষণ দেখতে সব কুকুর। পাছে এসব চৌধুরী লড়াইয়ের সময় রসদ জোগানে বেইমানি করে তাই ওদের বউ-বাচ্চাদের লাহোরে শাহজাদা দারাশুকোর হুকুমে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে।

এই মহা-মিছিলে সবচেয়ে বড় দেখার জিনিস শাহী পিলখানার জঙ্গি হাতির দঙ্গল। তারাও চলেছে লড়াইয়ে। এত মানুষ—এত কিসমের জানোয়ার—তাদের ঘাম, পেচ্ছাব, ময়লার গন্ধ—খাবার-দাবারের উর্দু বাজার—সে-বাজারের চেঁচামেচি—নোংরা—সব মিলিয়ে একটা দুর্গন্ধ সবসময় বাতাসে ভাসছে। বলা যায় সাবেক রাজধানী আগ্রা থেকে হালের রাজধানী জাহানাবাদ হয়ে লাহোর অব্দি তো এই ময়লার গন্ধ বাতাসে। তা আতরের বিক্রিবাটা এজন্যে যে বাড়বে তা তো জানা কথাই।

আগ্রা গরমে বেশি গরম—বর্ষায় জল নিকাশ হয় না—ঘিঞ্জি। রাস্তাগুলো হালের রাজধানী জাহানাবাদের রাস্তার পাশে ততটা দেখনসই নয়—সবই ঠিক। কিন্তু বনেদিয়ানায় আজও সাবেক আগ্রা সবার আগে। গান শুনতে চাও তো চলে এসো আগ্রার শয়তানপুরায়। আর ফুর্তি চাই তো সারা দুনিয়ার ফুর্তি আজও সেখানে মজুদ। বণিক-ব্যাপারীরা আগ্রায় কোন দেশের সুন্দরী এনে রাখেনি? তাই কান্দাহার যাবার পথে বিশাল মুঘল বাহিনীর বড় বড় চাঁই তো বটেই—বনজারা চৌধুরী, যারা ফৌজি রসদ জোগানের বড় বড় বরাত পেয়েছে—তাদের ঘরের মরদরাও একবার দু'বার করে শয়তানপুরায় ঘুরে যাওয়ায় ওখানকার ব্যবসা জোর যাচ্ছে।

এর ভেতর কোনওরকম আতর বা সুগন্ধীর সাহায্য না নিয়েই শাহী হারেমের উঁচু ঢাকা বারান্দায় একটি সুন্দর মুখকে প্রায়ই দেখা যায়। আগ্রার শাহী হারেমের সামনে দিয়েই সড়ক চলে গেছে। সেই সড়ক দিয়ে অবিরাম বয়ে চলেছে সেপাই শাস্ত্রীর ঢেউ। দিনরাত। উটের কাতার। ঘোড়সওয়ারের দল। বন্দুকচী, পদাতী,

তীরন্দাজরা কুচ করে চলেছে জাহানাবাদের দিকে। সেখান থেকে তাদের লম্বা পাড়ির পথ। সেই কান্দাহার গিয়ে শেষ হবে।

এই সন্দর মালিক মুখের একজন কমবয়সী আওরত। জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসির কার্পেট বণিকদের ভেট হয়ে তার হিন্দুস্থান আসা। নাম—শ্বেতলানা। কিন্তু শাহজাদা দারা তার কাছে একটি রাত থাকায় শ্বেতলানা এখন হারেমের দারোগার হাতে ঝাড়পোঁছ হয়ে উদিপুরী নামেই পরিচিত। সেই উদিপুরী এখন কিছুকাল হল তার মহলের এই উঁচু ঢাকা বারান্দায় প্রায় সারাদিনই হারেমের সামনের সড়কের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয়। এই উদিপুরী মহলের জেনানা-দারোগা এখন এই বিকেলের দিকে উদিপুরীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কাঁধে আলগোছে ছোট একখানি আসল পশমিনা চাপিয়ে দিল। দিয়ে বলল, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।

উদিপুরী সন্ত্রস্ত খরগোশের মতোই জেনানা-দারোগার দিকে ফিরে তাকাল। গোড়ায় এখানে এসে এই জেনানা-দারোগা নসরত বেগমের ব্যবহার খুব কঠিন লেগেছিল। যেদিন শাহজাদা দারা এসে রাতটা থেকে গেলেন—তারপর থেকে নসরত যেন কেমন নরম হয়ে উঠেছে তার ওপর। সেই থেকে দুটি বাঁদি এসে নসরতের হুকুমে রোজ তার চুল বাঁধে। মুলতানি মাটি মাখিয়ে গোলাপজলে খুব যত্নে তাকে চান করায়। তার পোশাক-আশাক—মায় নামটি পর্যন্ত বদলে দিয়েছে এই নসরত বেগম। কাঁধের ওপর নসরত পশমিনা রাখতেই উদিপুরী তার দিকে ঘুরে তাকাল।

নসরত বেগম খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, শীতের সূর্য ডোবার আগে খুব কড়া আলো পাঠায়। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কাঁধ—গলার রং জ্বলে যাবে যে—তাই পশমিনাটা চাপিয়ে দিলাম।

উদিপুরী বলল, রং জ্বলে যায় যাক!

—ওমা? তা বললে চলবে কেন তোমায়? তুমি এখন উদিপুরী-মহল। তুমি এখন শাহী টুকরা। মুঘল শাহীর জিনিস।

কথাটা ধরতে না পেরে তাকিয়ে থাকল উদিপুরী। বড় বড় চোখ। তাতে লম্বা পিছি। নাকটি নির্ভুলভাবে ঠোঁটের কাছাকাছি এসে সামান্য খাঁদা—যা কিনা মুঘল হারেমের ঘাগু জেনানা-দারোগা হিসেবে নসরত বেগম ভাল করেই জানে——মুঘল শাহীর শাহজাদাদের চুম্বকের মতো টানে। আওরতের রূপে নরুণ পরিমাণ খুঁত থাকলেই তবে মরদ হামলে পড়ে। সে খুব মধুর হবার চেষ্টায় প্রায় আদু আদু করে বলল, জানি উদিপুরী। সবই বুঝি। তুমি শীতের দেশের মেয়ে। তিবলিসি থেকে এই এত দূরে আগ্রায় এসে তোমার মন সবসময় দেশের জন্যে—রিস্তেদারদের জন্যে পড়ে থাকে। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সড়কের মানুষ জন, সেপাই-শাস্ত্রী, হাতি-ঘোড়া দেখে মনটা ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা কর।

একথায় উদিপুরীর মুখখানি করুণ হয়ে উঠল। চোখ ছলো ছলো। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

নসরত বেগম একগাল হেসে বলল, কিন্তু তুমি তো নসিবওয়ালি আওরত। অল্পদিনের ভেতরেই খোদ শাহজাদা দারাশুকোর নজরে এসেছ। এমন নসিব ক'জনের হয়?

তবুও উদিপুরীর মুখে কোনও হাসি ফুটল না দেখে নসরত বেগম বেশ দেমাকি গলায় বলল, শাহজাদা দারাই হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। চাই কি তুমি একদিন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম হয়ে উঠবে। তখন কিন্তু আমায় মনে রেখো। —বলতে বলতে নসরত খুব কাছে এগিয়ে এসে উদিপুরীর কাঁধ গলা পশমিনা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল। দিয়ে বলল, এখনও তুমি ইচ্ছেমত নিজের রূপ-লাবণ্য আর নষ্ট করতে পার না। তোমায় দিনকে দিন আরও সুন্দরী হয়ে উঠতে হবে। সেজন্যে শাহী দেওয়ানখানা থেকে তনখা দিয়ে আমায় রাখা হয়েছে। সন্ধেবেলা একটা হায়দরাবাদী বাঁদি এসে কিঙ্গিনা বাজায় তো?

উদিপুরী মাথা নেড়ে বলল, বাজায়।

—কিঙ্গিনার সঙ্গে রোজ সন্ধেয় নিয়ম করে নাচবে। আচ্ছা, কাল থেকে আমি তালিমের সময় হাজির থাকব।

—না না। তার কোনও দরকার নেই।

কী যেন মনে পড়ে গেল নসরতের। আর হ্যাঁ। তুমি বলে খুব কাবুলি পিচ খাও?

লাজুক ভঙ্গিতে হাসল উদিপুরী।

—না। ও ফল তোমার খাওয়া চলবে না। বহুত শক্কর থাকে পিচে। দেখতে দেখতে মুটিয়ে যাবে।

—তিবলিসিতে পিচ হয় না। গোটা কয়েকের বেশি খাব না।

—না। একটাও না। এখন তুমি মুটিয়ে গেলে আমি কী জবাবদিহি করব। এখন তোমার কম বয়স। সুন্দরী থাকতে গেলে লালচ সামলাতে হবেই। সামনে বয়স তো পড়ে আছে তোমার। আমার উমরে পেঁছে যত ইচ্ছে খেও। কেউ বলতে আসবে না।—একথা বলতে বলতেই হারেমের জেনানা-দারোগা নসরত বানু দিঘির পাড়ের বাগিচায় মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তিবলিসির শ্বেতলানা—আগ্রার উদিপুরী তার ফেলে রাখা ওড়নার প্রান্ত খুব সাবধানে ঢাকা আলিসার ওপর থেকে তুলে দেখল। না। মুছে যায়নি। জেনানা-দারোগা নসরত বেগম আচমকা তার কাঁধে পশমিনা চাপিয়ে দিতেই ভয়ে—আতংকে তার হাত থেকে খড়িটা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উদিপুরী পায়ের চটির নীচে সেটিকে চেপে রাখে। এবার সে তা সামান্য ঝুঁকে তুলে নিল। তার চোখের সামনে হাঁটু রাঙানো আরবি ঘোড়ার দল সওয়ার পিঠে নিয়ে সমান তালে সড়ক পেরিয়ে যাচ্ছে। দূরে সামনে হাতিদের পেছনটা দেখা যায়। নসরত বেগমের সঙ্গে ওরা হারেমের সামনে দিয়ে গেছে। এ এক অন্তহীন মিছিল। কোন রিসালার ঘোড়া কেমন—তুর্কি না আরবি—লিখে রাখছিল উদিপুরী—আলিসার পাথরে। পারলে সংকেতে কতজন বন্দুকচী লাহোরের পথে জাহানাবাদের দিকে এগিয়ে গেল—তার একটা মোটামুটি আন্দাজি সংখ্যা

এই কিছুদিন ধরে লিখে রাখছে উঁদিপুরী। পরে সময়মত সে তা আভাসে ইঙ্গিতে সুখদোলার চাদরে লিখে রাখে।

এবার লোটা কম্বল বদনা পিঠে পদাতীর দল চলেছে। পায়ে চটি। হাতে বল্লম। তাদের দেখতে দেখতে শ্বেতলানার চোখ জলে ভরে গিয়ে তার সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে মুছে গেল। এক ঝটকায় হাতের খড়িটি সে সামনের সেঁউতি ঝোপে ছুড়ে ফেলে দিল। তার চোখের সামনে আগ্রার গোধূলিতে ভেসে উঠল তিবলিসির কাছাকাছি জর্জিয়ার দেহাতি গাঁ—যার সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে ক্রিমিয়ার দিকে—সিমফারপোল অব্দি। এবার ওদিক থেকে যাযাবররা ভেড়া নিয়ে চরাতে আসবে এদিকে।

এখন সকালবেলা। এই রাস্তার গায়ে ফুটে আছে টিউলিপ। উঁদিপুরী পরিষ্কার দেখতে পেল—বরফ সরে যেতে বসন্তর শুরুতে শ্বেতলানা সদ্য শুকিয়ে ওঠা কাঁচা রাস্তা ধরে টিউলিপ তুলছে—একগুচ্ছ খোঁপায় দিল—বাকিগুলো তার হাতে। দূরে কাঠের বেড়া দেওয়া পাথর গাঁথা বাড়ির ভেতর থেকে মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে—কোথায় গেলি মা? সামোভারটা নামিয়ে দিয়ে যা। আমি যে হাত পুড়িয়ে ফেলব শেষে—

শ্বেতলানা একা একাই অস্ফুটে বলে ফেলল, আহারে! চুলোর কাছাকাছি মা বসে আছে। অন্ধ—কিছুই দেখতে পায় না। —বলেই শ্বেতলানা বাড়ির দিকে ছুটে চলল। দূরে অর্থোডক্স চার্চের চুড়ো দেখা যায়। এত ভোরে রাস্তায় এখনও কেউ বেরয়নি। একটা ঝাঁকড়া মতো গাছের পাশ দিয়ে ছুটে আসছে শ্বেতলানা।

উঁদিপুরী দেখতে পেল, গাছটার মোটা গুঁড়ির পেছন থেকে একজন ষণ্ডামত লোক আচমকা বেরিয়ে এসেই শ্বেতলানার মুখ চেপে ধরেছে। তাকে পাঁজাকোলে তুলে নিল লোকটা। এবার উঁদিপুরী দেখতে পেল, কাছেই ঝোপের গায়ে একটি কালো রঙের ঢাকা গাড়ি দাঁড় করানো। তার তাগড়া ঘোড়াটি ছুটে চলার জন্যে পা দাপাচ্ছে।

উঁদিপুরী চোখ মুছল। মশাল জেবলে মুঘল ফৌজ কুচ করে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষজন দাঁড়িয়ে। এরাই বোধহয় আহেদি। এদের কথা হারেমের গালগল্পে অনেকবার শুনেছে উঁদিপুরী। বাছাই সব লড়াকু। এদের আলাদা ভাবে তৈরি করা হয়। সাকেত ছাউনিতে ফৌজি টাট্টুর কসরত দেখানোর সময় এরাই আগুনে চক্করের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়। গায়ে আগুনে লাগে না। এদের তনখা সবচেয়ে বেশি। খাওয়া-দাওয়াও আলাদা—সরেস। শাহী নিয়মে মেহনতের ওপর এদের থাকতে হয়। অনেকটা আমারই মতো। এই একটু পরে কিঙ্গিনা বাজাবে একটি বাঁদি। সেই কিঙ্গিনার তালে আমি নাচের তালিম নেব। সেই সময় হারেমের জেনানা-দারোগা নসরত বেগম হয়তো হাতে তালি বাজিয়ে তাল রাখবে। সে আমায় আর একটিও পিচ খেতে দেবে না। পাছে আমি মুটিয়ে যাই। আমায় দিনকে দিন আরও সুন্দরী হয়ে উঠতে হবে। আমি যে শাহী টুকরা হয়ে গেছি; আমি মুঘল শাহীর জিনিস।

ফের শ্বেতলানার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। এবার ওড়নায় ভাল করে চোখ

মুছে নিল উঁদিপুরী। তখন বারোটি জঙ্গী হাতির একটি দল গম্ভীর গলঘণ্ট বাজিয়ে এগোচ্ছিল। তাদের ভৈ আর মেঠ দঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে। হাতিগুলোকে ফের ভাল করে গুনল। তারপর মহলের ভেতরে ছুটে গেল উঁদিপুরী সুখ-দোলার চাদরে আভাসে সংখ্যাটা লিখে রাখতে হবে। নয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে।

কিল্লা লাহোরের কামারশাল আজকের নয়। আকবর বাদশার আমল থেকেই এখানে বড় বড় নল অব্দি ঢালাই হয়। ঢালাই করে করে হাত পাকানো কারিগররা এখন ভারি তোপ দাগার এমন নল ঢালাই করছে—যার ভেতর থেকে বড় গোলা দাগলেও নল ফাটবে না। শাহজাদা দারার দেখাশুনোয় মোট সাতটি কামান তৈরি হয়েছে। সতেরোটি দুরপাল্লার তোপ-ই-হাওয়াই, ত্রিশটি ছোট তোপ তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এগুলোর খোরাক তিরিশ হাজার গোলা। সেজন্যে সিসা, বারুদ—দুইই মজুদ।

ঠিক হয়েছে শুধু বড় বড় কামানেই লোহার গোলা গাদিয়ে দাগা হবে। মোক্ষম মোক্ষম নিশানায়। আর দেওয়াল ধসানোর জন্যে শক্ত পাথর কেটে বেলদাররা যে গোলা বানাচ্ছে তা দাগা হবে মাঝারি কামান থেকে।

বড় কামানগুলো ভাগে ভাগে খুলে কিল্লার বাইরেই রাভি নদীতে ভাসানো বড় বড় নৌকোয় তোলা হবে। নৌকো গিয়ে ভিড়বে সিন্ধুর তীরে। সেখানে কামানগুলো ফের জুড়ে নেবার পর উটে টেনে নিয়ে যাবে মুলতানে। সেখান থেকে থল-চোটিয়ালের গিরিপথ পেরিয়েই কামান আবার তোলা হবে হেলমন্দে ভাসানো বড় নৌকোয়। নৌকো গিয়ে ভিড়বে কিল্লা-কান্দাহারের কাছাকাছি—অর্গন্ধব নদীর ওপর কালাত-ই-ফিলজাইয়ে। এর খানিক আগেই অর্গন্ধব হেলমন্দে এসে মিশেছে।

কামারশালা, গোলা, কামান খোলাখুলি, নৌকো—এসব নিয়েই শাহজাদা দারা সারাদিন ধরে ব্যস্ত। যে-মানুষের মনে হয় নিশুতি রাতে তারার ভারে আসমান যেন ব্যথায় ভেঙে পড়বে—তাঁর পক্ষে এতখানি মন আর সময় দিয়ে কামান খোলাখুলির ব্যবস্থা করার মানে একটাই। তা হল এমন বোদা কাজে সারাদিন লেগে থাকায় শাহজাদার মনের ভেতরটাই যেন ব্যথা করে উঠছে।

রাভির তীরে দাঁড়িয়ে শাহজাদা সব দেখছিলেন। নৌকোয় নৌকোয় তোপ-খানার মীর-আতশের লোকজন মোতায়েন। দূরের আকাশে আবছা মতো পাহাড়ের আভাস। সেখানে একটু বাদেই সূর্য ডুববে। এখন তাই চারদিক লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ শাহজাদার মনে পড়ল—একদিন এই রাভির গা ধরেই—যখন আমার বয়স বেশ কম ছিল—গিয়াথপুর আলমগঞ্জের ভেতর দিয়ে কফিপুরায় গিয়েছিলাম—মিঞা মীরের আস্তানায়। ফিরে এসেছিলাম ভরন্ত মনে। আর আজ। সেই আমারই হাত দিয়ে খোদাতালা নৌকোয় ভারি কামান তোলার কাজ দেখাশুনো করিয়ে নিচ্ছেন।

আরও কী মনে আসছিল শাহজাদার। ঠিক এই সময় এক দারোগা এগিয়ে এসে বলল, হুজুর। লাহোর থেকে খামোকা কান্দাহারে পাথরের গোলা বোঝাই

করে নিয়ে গিয়ে ফায়দা কী ? ওখানে বিস্তর শক্ত পাথর পাওয়া যায়। বেলদাররা সেখানে বসেই গোলা তৈরি করলে মেহনত কম হবে।

কথাটা মনে ধরল শাহজাদার। তিনি বললেন, বলছো ?

—হ্যাঁ হুজুর।

দারা দু'বারও ভাবলেন না। কিল্লা-কান্দাহারের কাছাকাছি পেঁছে পাথর বাছাই—সেগুলো এক জায়গায় করা—তারপর তা মাপসই করে গোলায় কাটাই করার সময় আর জায়গার যে অভাব হতে পারে—তা একবারও মাথায় এল না শাহজাদার। তিনি হুকুম দিয়ে বসলেন—এখন পাথরের গোলা কাটাই বন্ধ রাখা হোক। যা করার তা কান্দাহারে পেঁছে তাঁবু ফেলার পর করা যাবে।

গোলা কাটাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। শাহজাদার মাথায় হাজার একটা কাজ। সারা হিন্দুস্থানের শাহী ফৌজ লাহোরে এসে জমা হচ্ছে। তাদের জন্যে সারা লাহোর জুড়ে উর্দু-বাজার বসেছে। এত লোকের জন্যে খাবার জলের ব্যবস্থা করাই এক বড় ঝকমারি। ঘোড়সওয়ারই সত্তর হাজার। হাতি একশো সওয়ারির মতো। আটান্ন জনের মতো রাজপুত মনসবদার আর প্রায় তার দ্বিগুণের মতো মুসলমান মনসবদারদের সওয়ার নিয়ে এই বিরাট ফৌজ। এর ওপর খোদ শাহী-ফৌজ থেকে এসেছে আরও কয়েক হাজার বন্দুকচী, পদাতী, তীরন্দাজ ছাড়াও ষাটটি জঙ্গি হাতি।

শীত আসায় গরমের কষ্ট নেই। কিন্তু রোজ সন্ধের পর শাহজাদা যেন চোখে অন্ধকার দেখেন। এত বড় ফৌজের জন্যে বন-জঙ্গল পরিষ্কার, পরিখা খোঁড়া, জলের ব্যবস্থা করতে আরও কয়েক হাজার লোক, ভিস্তি আনাতে হয়েছে আশপাশের সব সুবা থেকে।

সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর রাত যতই বাড়ে শীতের পরিষ্কার আকাশে তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শাহজাদা দারার মন বলতে থাকে, এত সেপাই, তোপ, হাতি—কিছুরই দরকার হবে না শেষ অব্দি। ফকির-দরবেশরা যেরকম বলছেন—কান্দাহার পেঁছেই শুনব ইরানের শাহ আব্বাস মারা গিয়েছে—কিল্লা-কান্দাহার খালি করে দিয়ে তার ফৌজ পালিয়েছে।

লড়াইয়ের জন্যে পুরোদস্তুর তৈরি হচ্ছে—ঠিক আছে। কিন্তু আসলে নসিবই সব। জানবাজির ঝুঁকি নিচ্ছি—নেওয়া হয়ে থাকে বলেই নেওয়া।

ঘুম আসে বেশি রাত করে। একদিন ঘুমের পর শাহজাদা দারা ভোরবেলা উঠে দেখলেন—তাঁর সামনে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। মাথায় জটা।

শাহজাদা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। এতক্ষণ রাত-পাহারার সেপাইরা সন্ন্যাসীকে আটকে রেখেছিল—শাহজাদার কাছে আসতে দেয়নি। সে জন্যে দারা সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি ইন্দ্রগীর গোঁসাই। মন্ত্রের জোরে চল্লিশ জন 'দেও' আমার হুকুম তামিল করে।

শুনে তো শাহজাদার মন নেচে উঠল। ভোরবেলায় কিল্লা-লাহোরের বাইরে তাঁবুতে তাঁবুতে মনসবদাররা বেশিরভাগই তখনও ঘুমিয়ে। শুধু রাভির বুকে

ঢেউ ভাঙার শব্দ। দারার মনে হল—খোদাতালাই এই সন্ন্যাসীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন।

গোঁসাইজি বললেন, কান্দাহারে তোপের কোনও দরকারই হবে না।

শাহজাদাও মনে মনে তাই চাইছিলেন।

ইন্দ্রগীর বললেন, শাহজাদা! আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন—আমার এই 'দেও'গুলো রাতারাতি কিল্লা-কান্দাহারের দেওয়াল ভেঙে ফেলবে। শাহী ফৌজের জন্যে একেবারে সিধে রাস্তা করে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা গোঁসাইজিকে দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তো দিলেনই—তাছাড়া নিজেই বললেন, শীত এমন জাঁকিয়ে পড়েছে—রোজ শাহী রসদখানা থেকে আপনার জন্যে এক সুরাই শরাব আসবে।

সবটাই ঘটে গেল খুব ভোর ভোর। গোঁসাইজির কথাগুলো শাহজাদার মনে খুব বসে গেল। কুয়াশা কাটিয়ে সূর্য তখনও ভাল করে উঠতে পারেনি। লাহোর আধো ঘুমে।

ঠিক এমনই ভোরে শাহজাদা আওরঙ্গজেব দেখলেন, খণ্ডে রাইয়ের ভাঙা মন্দিরের ছায়া পড়েছে নীচের কতলুক সাগরের জলে। দক্ষিণের সুবাগুলোয় কখনই আগ্রা জাহানাবাদ-লাহোর-মুলতানের মতো অত শীত পড়ে না। ঘোড়া দাবড়াবার পর ঘেমে ওঠা শরীরে খান্দেশ, বেরার, বিদরের শীত সহ্য করা যায়। কিন্তু জলে মন্দিরের ছায়া দেখে মনটা বিষাদে ভরে গেল শাহজাদার। একদম গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়নি।

আওরঙ্গজেব হুকুম দিলেন, ফৌজ থেকে একটা কামান আনতে হবে—

মুরশিদকুলি হুকুম শুনেও চুপ করে শাহজাদার মুখে তাকিয়ে রইলেন। সে-মুখ দেখে শাহজাদা অবাক। এমন তো কখনও ঘটে না। তিনি আগ বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, কামান আনতে কোনও অসুবিধে আছে?

—না হজরত। আমি ভাবছি অন্য কথা—

—কী?

—মন্দিরের দেবদাসীরা সবাই ভয়ে নীচের বাগিচায় গিয়ে লুকিয়েছে।

—লুকিয়ে যাবে কোথায়? আমি ওদের সবাইকে বিয়ে দিয়ে দেব। তাহলে ফিরে আর এই বে-ইজ্জতির জীবন ওদের কাটাতে হবে না।

—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।

শাহজাদা কিছু বিরক্ত হলেন। তবু শান্ত গলায় বললেন, খুলেই বলুন না।

—হজরত! ওদের সঙ্গে বিয়ে দেবার মতো এত মরদ এখানে কোথায় পাচ্ছেন?

—কোথাও না পেলে আমার ফৌজের সেপাইদের সঙ্গে ওদের বিয়ে দিয়ে দেব। শরিয়তে এক একজন তো চারজনকে বিয়ে করতে পারে।

রোদ উঠলেই কামানের গোলায় নীচের সারা জঙ্গল কেঁপে উঠল। কতলুক সাগরে গোলার শব্দ গিয়ে আছড়ে পড়তেই জলও তিরতির করে কেঁপে উঠল। পরপর তিন গোলায় খণ্ডে রাইয়ের মন্দির একদম গুঁড়িয়ে গেল।

গোলার বিকট শব্দ—নীচে কতলুক সাগরের পাড়ে ফৌজি জমায়েত থেকে ঘন ঘন সাবাসির ধ্বনি—প্রাণভয়ে মন্দিরের পুরোহিতের চিৎকার করে কেঁদে ওঠার ভেতরেও শাহজাদা আওরঙ্গজেব যেন একদম একা হয়ে গেছেন। এত কিছুর কোনও কিছুই যেন তাঁকে ছুঁতে পারছে না। শাহজাদাকে দেখে মুরশিদকুলি খাঁয়ের তাই মনে হল।

আওরঙ্গজেব তখন মনে মনে বলছিলেন, বড়ে ভাই! আব্বা হুজুর যতখানি আপনার পাশে—ঠিক ততখানিই তিনি আমার থেকে দূরে। বড়ে ভাই! আপনি আবার যতখানিই কাফেরির পাশে—ঠিক ততখানিই আমি কাফেরি থেকে দূরে!

আবারও একটি গোলা এসে মন্দিরের জায়গায় পড়ল।

॥

অন্য সময় লাহোরে এখন সবাই শীতে কুঁকড়ে থাকে। থল-চোটিয়াল পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে সবাইকে কাবু করে ফেলে। এবার যেন শীতই নেই লাহোরে। এখন লাহোর তো আছেই—সেই লাহোরের বুকের ওপর বসে আছে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লি-জাহানাবাদ। লোক-লশকর, রসদ যোগান-দার চৌধুরী বনজারাদের বিরাট বাহিনী, শাহী ফৌজ, কামান, হাতি, ঘোড়া, উট। যেন চলন্ত জাহানাবাদ লাহোরের বুক থেকে একটু একটু করে সরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতানের পথ ধরছে। যাবে থল-চোটিয়ালের গিরিপথ ধরে কান্দাহার। সারা হিন্দুস্থানের তাগদ একটি বাহিনীতে ভরে বাদশা শাহজাহান কান্দাহার যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। তাঁর সিপাহ-সালার শাহজাদা দারাশুকো। কামানের গাড়িগুলো ঘড় ঘড় করে চলেছে রাভি নদীর দিকে। বড় বড় নৌকোয় চড়িয়ে তাদের রওনা করিয়া দেওয়া হচ্ছে সিন্ধুর ঘাট। ওখান থেকে ওদের আবার ডাঙায় তুলে নেবে ফৌজ। কান্দাহার যেতে এবার এ-পথ বেছে নেবার কারণ—চলতি ফৌজ এ-পথেই সহজে রসদ জোগাড় করতে পারবে।

উর্দু-বাজারে সেপাইরা কেনাকাটা করছে। এ-বাজার বসেছে লাহোরের গায়েই। খদ্দের বলতে ফৈজাবাদী হিন্দুস্থানি যেমন আছে—তেমনই আছে আফগান, উজবেক, তুর্কি, হায়দারাবাদি, ইরানি আবার দক্ষিণের তেলেঙ্গিও। তাদের দর-কষাকষি, হাসি ঠাট্টা, ঝগড়াঝাঁটি মানে দুনিয়ার কয়েক ভাষার তুমুল মাখামাখি। তাই আজকাল লাহোরের বুকে দাঁড়িয়ে সবসময় মনে হয়—দূরে কোথায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলছে। চোখে দেখা যাচ্ছে না। অথচ কাছেই কোথাও। মুঘল ফৌজ মানে সারা এশিয়ার সেপাই নিয়ে গড়ে তোলা এক অতিকায় অজগর। হৈ-হট্টগোলের কারণ, উর্দু-বাজারে গিয়ে আফগান বন্দুকচিরা হয়তো তুর্কি ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে কাজিয়া বাধিয়ে বসল—কিংবা উজবেক তীরন্দাজদের সঙ্গে লেগে গেল ইরানি বেলদারদের। ঝগড়াঝাঁটির কারণ হয়তো তুচ্ছ। কিন্তু লড়াইয়ে যাবার আগে তনখা আগাম পেয়ে সবারই মাথা গরম। তাই মুহূর্তে গোলাগুলি বেরিয়ে যায়। লাশ পড়ে। জখম হয়। কান্দাহার যাবার আগেই অনেকে লুটিয়ে পড়ে।

জানোয়ারদের পায়খানা, চিৎকার—ফৌজি সেপাইদের হৈ-হট্টগোল—জমা জঞ্জাল থেকে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধের ভেতর সন্ধে হলেই যাদুকররা আগুন জেলে কেরামতি দেখাচ্ছে। তারাও যে ফৌজের সঙ্গে কান্দাহার চলেছে। কাউকে বাদ দেননি দারা। লাহোরের নৌলাখা এলাকায় তাঁর শাহী লাল তাঁবু। সেই তাঁবুর রক্ষ রাজপুত পাহারার তোয়াক্কা না করে যাদুকররা সিধে শাহজাদার মুবারকে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

দারা এমনই এক সন্ধ্যায় তাঁর দরসালা মঞ্জেল দরবারি ঢাউস তাঁবুর হাতায় কয়েকজনকে নিয়ে বসে। চড়া শীত হলেও মালুম হয় না। কারণ লাহোরের আশপাশে প্রচুর রেড়ি গাছ। রেড়ির শুকনো ডাল জড়ো করে আগুন দেওয়ায় শীতে কাবু না হয়ে সবাই বেশ আরাম পাচ্ছে।

শাহজাদার মুখোমুখি বসে সিসিলি থেকে আসা ভবঘুরে গোলন্দাজ মানুচ্চি। তিনি বহু বছর এই হিন্দুস্থানে। এসেছিলেন যখন যুবক ছিলেন। এখন তাঁর মাথায় পাক ধরেছে। তাঁর ডানদিকে বসে ফরাসি গোলন্দাজ দ্যুপের। তিনি বীজাপুরের ফৌজে গোলন্দাজ বাহিনীর মীর-আতশ ছিলেন। বেশি তনখার লোভ দেখিয়ে দারা তাঁকে ভাঙিয়ে এনেছেন। মানুচ্চির বাঁ দিকে বসে আছেন ব্যাভেরিয়ার ফৌজের দলছুট গোলন্দাজ—আসলে তিনি ওলন্দাজও বটে—হের হলস্টেন। কিল্লা-কান্দাহারে কীভাবে হামলা চালানো হবে—তা ওঁদের কাছে এইমাত্র জানতে চেয়েছেন দারা।

মানুচ্চি, দ্যুপের হলস্টেন—তিনজনই ঝানু গোলন্দাজ। ওঁরা যাঁর যাঁর দেশের লড়াই-হামলা নিয়ে লেখা সব কেতাব খুলে বসেছেন শাহজাদার সামনে। গা-গরম করতে জ্বালানো আগুনের শিখায় শাহজাদার মনে হচ্ছিল—বিদেশী বইয়ে আঁকা দুর্গগুলো বুঝি আসল—একদম জ্যান্ত। মানুষ যতরকম কিল্লার কথা ভাবতে পারে—মানুষের বুদ্ধিতে যতরকম কিল্লা হতে পারে—তার সবই নকশা করে ওসব বইতে আঁকা। তাছাড়াও—মানুচ্চি ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানিতে বুঝিয়ে বললেন—কোন ধাঁচের কিল্লায় কোন কিসমের হামলা চালাতে হবে। তাঁর কথায় সায় দিলেন দ্যুপের আর হলস্টেন। দুজনই মানুচ্চির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তিন ফিরিঙ্গি মিলে তাঁদের অন্নদাতা শাহজাদাকে বিশদে লড়াইয়ের কূটকৌশল বোঝাতে লাগলেন।

শাহজাদা বললেন, তাহলে কিল্লা কান্দাহারের নকল বানিয়ে সেই কিল্লার হামলার মহড়া দেওয়া যাক। হাতে-কলমে গোলাবারি যাচাই হয়ে যাবে।

—হজরত। খুবই ভাল প্রস্তাব। কিন্তু কোথায় সে মহড়া দেবেন?

মানুচ্চির এ কথায় দারা বললেন, কেন? লাহোরের বাইরে—যেখানটায় সেপাইদের উর্দু-বাজার বসেছে—তারই গায়ে। সেখানে কিল্লা-কান্দাহারের ধাঁচে নকল গড় বানাবার হুকুম দিচ্ছি।

গোলন্দাজ দ্যুপের আর হের হলস্টেন একই সঙ্গে যে-যার ভাষায় বললেন, উত্তম প্রস্তাব।

শাহজাদা কী বলতে যাবেন। এমন সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে জ্বালানো

আলোর শিখায় প্রায় উদোম ল্যাংটো একটি লোক—মাথা ভর্তি জট—এই শীতে একটুও না কেঁপে তাঁর সামনে এসে প্রায় ফুটে উঠল।

তিন ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ তো চমকে উঠলেন। তাঁরা এমন মানুষকে আচমকা দেখে ঘাবড়ে গেছেন। শাহজাদার কিন্তু কিছুই হয়নি।

লোকটা কুর্নিশ করে বলল, বন্দেগান! আমি আপনার সঙ্গে কান্দাহার যাব। —বলতে বলতে লোকটা মুখের ভেতর আস্ত একটা ডিম ভরে দিল। দিয়ে মুখ বুজল। এতক্ষণ তার হাতের সাদা ডিমটি কারও চোখেই পড়েনি। কেননা এমন শীতেও যে স্রেফ লেংটি পরে ঘুরে বেড়ায়—তার মুখেই সবার আগে তাকায় সবাই।

মানুচ্চির এসব দেখার অভ্যেস আছে। দ্যু'পেরও কয়েক বছর হল হিন্দুস্থানে এসেছেন। কিন্তু হের হলস্টেন হিন্দুস্থানে খুব বেশিদিন আসেননি। তাঁর তো কপালে চোখ আটকে যাওয়ার দশা। উপরন্তু তিনি আরও একটি কারণে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। এত বড় মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার শাহজাদা দারা—তাঁর-কাছে হুট করে এমন একজন প্রায় ল্যাংটো মানুষ এসে পড়ে কী করে? পাহারা নেই? থাকলেও যদি এসে পড়তে পারে তো এ বাহিনীর কেউই পালটা হানার মুখে নিরাপদ নন।

ঠিক এইসময় লোকটা তার পিঠের কাছ থেকে কোঁ কোঁ করে ডেকে ওঠা একটা মোরগ সবার চোখের সামনে ডান হাতে শূন্যে তুলে ধরে আগুনের শিখার সামনে চোখ বড় করে তাকাল। তারপর নিঃশব্দে দু'পাটি দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। আগুনের দিকে তাকিয়ে।

ওয়াকিবহাল মানুষের মতোই হিন্দুস্থানে রীতিমত সড়গড় মানুচ্চি অস্ফুটে বললেন, যাদুকর!

শাহজাদা দারা বললেন, আমার সঙ্গে কান্দাহার গিয়ে কী করবে? সেখানে ঘামাসান লড়াই হবে। কেউ মরবে। কেউ বাঁচবে। তুমি কান্দাহার গিয়ে খামোকা প্রাণটা হারাবে কেন?

যাদুকর বলে উঠল, কান্দাহারে ইরানিরা যেসব গেঁহু যব—খাবারদাবার মজুদ করেছে—কান্দাহার গিয়ে এমনই তুকতাক করব—ওসবে পোকা থকথক করবে—কিলবিল করবে। কমবখত ইরানিরা শেষে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

—বেশ। তবে চলো। লাহোর ছাড়ার আগে কিন্তু বন্দুক চালানো শিখে নেবে।

হিন্দুস্থানের খোদ পহেলা শাহজাদার কাছ থেকে এমন মোলায়েম ব্যবহার পেয়ে যাদুকর তাল সামলাতে পারল না। সে আরও কেরামতি দেখাবার জন্যে শুকনো বেড়ির ডাল দিয়ে ধরানো আগুনটা হেঁটে পার হতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানুচ্চির নিজের পাহারা—কামানের সলতেদার এক পাঠান যাদুরককে বেড়ালের মতো ঘাড়ের কাছে মুঠো করে ধরে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধরল। তারপর আগুন পেরিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দিল। সবটাই ঘটে গেল নিমেষে।

গোলন্দাজ মানুচ্চি বা দ্যু'পের-এর হিন্দুস্থানে এমন ঘটনা দেখার অভ্যেস

আছে। যে যাদুকর ফৌজের সিপাহ-সালারের খাতির পেল—তাকে অমন করে শূন্যে তুলে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেওয়া যায়—এটা ভাবতেও পারেন না হলস্টেন। তিনি ব্যাভেরিয়ার রাজার ফৌজের সামিল হয়ে রাইনের এক পারে দাঁড়িয়ে অন্য পারে দুশমনের তাঁবু নিশানা করে গোলা দেগেছেন। ফৌজি কানুনের কড়াকড়ি তিনি জানেন। ব্যাভেরিয়ার ফৌজ এই শাহী ফৌজের পাশে কিছুই নয়। এত বড় ফৌজের সিপাহ-সালারের পেয়ারের মানুষকে অমন করা যায়? হলস্টেন তো থ। হিন্দুস্থানে সবই সম্ভব।

কান্দাহার রওনা হবার আয়োজন যতই সম্পূর্ণ হয়ে আসছে—শাহজাদা দারার ভেতরকার স্বপ্ন, উত্তেজনা তাঁকে ততই যেন লড়াইয়ের কাছাকাছি নিয়ে চলেছে। অথচ শাহজাদা তো এখনও লাহোরেই আছেন। এই উত্তেজনার দরুন তিনি কিল্লা-লাহোর ছেড়ে ওখানকার খোলা মাঠে এসে তাঁবুতে উঠেছেন। নয়তো কিল্লার ভেতর তো তাঁর জন্যে সব ব্যবস্থাই রয়েছে। তাঁবু তাঁকে লড়াইয়ের কাছাকাছি নিয়ে যাব।

বিদেশী গোলন্দাজরা দেশী মীর-আতশের চেয়েও বেশি তনখার মাস মাইনের শাহজাদা দারার তাবিনের সামিল হয়েছেন। শাহজাদা উঠে দাঁড়াবার পর তাঁরাও দাঁড়ালেন। পাছে দারা কোনও নয়া হুকুম দেন—তাই ওঁরা তা শুনবার জন্যে —শুনে তামিল করার জন্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন দেখলেন— শাহজাদা কোনও কথাই না বলে একমনে রেড়ির ডালে জ্বালানো আগুনের দিকে তাকিয়েই আছেন—তখন ওঁরা তিনজন শাহজাদার দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে হটতে একসময় অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

দিনে লাহোর তবু কতকটা লাহোরে থাকে। রাতের লাহোর পুরোপুরি ফৌজি কবজায়। ঘোড়সওয়ার, পদাতী, বন্দুকচি—যে যেখানে পেরেছে তাঁবু গেড়েছে। রাত্তির দুই তীর এখন নানান ভাষার গান আর নানান দেশী রান্নার গন্ধে মাতোয়ারা। রান্না অবশ্য খুবই সরল। কেউ ভড্ডু চড়িয়ে খিচুড়ি পাকাচ্ছে। কেউ বা রুটি সেঁকছে। সেই সঙ্গে নানান দেশের নানান ধরনের তারের বাজনা।

এর ভেতর শুধু দুটি চোখ খুব মন দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর ভেতর শাহজাদা দারার দিকে তাকিয়ে। এই চোখের মালিকের নাম—মহম্মদ বদি। পুরো রসিদ খাঁ। ওরফে বদিউজ্জমান-মহাবত-খানি।

বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলের দিলখোলা জাঁহাবাজ সিপাহি—মহবত খাঁ যিনি পরে শাহী খেতাবের একেবারে উঁচুতে খান-খানান অব্দি উঠেও শেষ পর্যন্ত নুর-জাহানি দাপটে হয়রান হয়ে সেদিনকার বাগি শাহজাদা খুররমের পালটা শিবিরের সামিল হতে বাধ্য হন—তাঁর ছেলে, মির্জা লোহারসপ এবারের কান্দাহার হামলায় শাহজাদা দারার সঙ্গী। এই লোহারসপের খাজাঞ্চি মহম্মদ বদি। সে-ই লোহারসপের তাঁবুর খোলা চিলমন থেকে শাহজাদা দারার দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে।

এক সময় মহম্মদ বদি গুটিকয় রুবাই লিখে শায়ের হবার চেষ্টা করে।

তারপর সে আগ্রায় যমুনার তীরে বাবা লাট্টু শাহ চিসতির দরগাহ শরিফে সন্ধেবেলা কাওয়ালি গাইত। সে-কাজে টিকতে না পেরে আগ্রা-জাহানাবাদের দেওয়ানখানায় ক'দিন ঘোরাঘুরি করেছিল। মুরুব্বিও ধরেছিল। যদি শাহী ওয়াকেনবীশ হওয়া যায়। বাদশা-শাহজাদাদের রোজকার কাজকর্ম দেখে লিখে রাখাই ওয়াকেনবীশের কাজ। শাহী-হুকুম, শাহী-ঘটনা লিখে নিতে হয়—তারপর খোদ বাদশা কিংবা শাহজাদাকে দেখিয়ে নিয়ে তা পাকাপাকি ভাবীকালের জন্যে তুলে রাখা হয়।

সেসব কিছুই হওয়া হয়নি মহম্মদ বদির। সে এখন নিজেকে নিজেই ওয়াকেনবীশ ভাবে। ভেবে আনন্দ পায়। মশগুল থাকে। মির্জা লোহারসপের কাছে সাধারণ কাজ নিয়ে সে মুঘল ফৌজের সঙ্গে কান্দাহার চলেছে। খাজাঞ্চির কাজ করে যেটুকু সময় পায়—সেই সময়টায় সে যা দেখে তাই লিখে রাখে। আর ভাবে—যখন আমরা কেউ থাকব না—তখন আমার এই লেখা থেকে ভাবীকালের মানুষ জানতে পারবে—একালটা কেমন ছিল।

এই জমানায় মহম্মদ বদি নিজেকে মনে করে—বড়ই অবহেলায়—উপেক্ষায়—অনাদরে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। আমার গুণের কোনও কদরই হল না। গান জানতাম—গানের কেউ কদর করল না। শায়ের হতে পারতাম। কেউ শায়ের হতে একটুও সাহায্য করল না। হতে চেয়েছিলাম শাহী ওয়াকেনবীশ। কত অপদার্থ দিব্যি ওয়াকেনবীশ হয়ে সারা জীবন মোহর-আশরফি লুটল—ভাবীকালের তুজুকের কলমচি হয়ে বিখ্যাত হয়ে থাকল। আমায় ওয়াকেনবীশ করা হল না। নিজেকে মহম্মদ বদি এক একসময় অনাদরে পড়ে থাকা বদাউনি বলে মনে করে। আকবর বাদশার আমলে বদাউনি তেমন পাত্তা না পেয়ে আবুল ফজল, ফৈজী, তোডরমল—ও'দের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন—একদল লুচ্চা।

সেই মহম্মদ বদি তার তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখল—শাহজাদা দারা তাঁর শাহী তাঁবুর হাতায় দাঁড়িয়ে গা-গরম করার আগুনের দিকে তাকিয়ে। একে একে তিন ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ বিদায় নিলেন। সারা অন্ধকারে শাহজাদা দারার মুখখানি জ্বলজ্বল করছে। মহম্মদ বদি মনে মনে বলল, মহম্মদ দারাশুকো—আপনি হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। আপনার জীবনের কোনও মুহূর্তই ফেলনা নয়। আমি সব লিখে রাখছি। ভাবীকাল এ-লেখার কদর করবে—এ লেখার বিচার করবে।

মহম্মদ বদি তাঁবুর ভেতর ঢুকে প্রদীপের সামনে কাগজ কলম নিয়ে ঝুঁকে বসল। তারপর লিখল—

সঠিক, নিরপেক্ষ ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা কদাচিৎ শাহী তুজুকে পাওয়া যায়। বাদশা-শাহজাদা-সুবেদারের বিরুদ্ধে অতি সত্যি কথা প্রকাশ্যে লেখা যায় না। আমি দরবারের বিশেষ অনুগ্রহভাজন অন্তরঙ্গ আমির-ওমরাহ কিংবা দরবারি মোসাহেব নই। শাহী আমলা, ইলচি কিংবা ওয়াকেনবীশ হিসেবে আমি চাকরি করি না। সুতরাং মিথ্যে কথা লেখার আমার প্রয়োজন হয় না।

মিথ্যা খবর সরবরাহ করা আমার জীবিকা নয়। প্রকৃত ঘটনা গোপন, যা ঘটেনি তাই ঘটেছে বলে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া—কিংবা কান্দাহারের খবর শোনার জন্যে হিন্দুস্থানে যারা কান খাড়া করে আছে—তাদের জন্যে মজার খবর লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। যেখানে কোনও মতলব নেই কিংবা কারও অনুগ্রহ পাওয়ার ওপর নজর নেই—সেখানে ইনসানের সত্য থেকে সরে আসার কিংবা স্পষ্টবাদী না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। সাধারণের কাছে অপরিচিত সামান্য ইনসান হলেও আমি বলতে পারি—খোদার কসম—এই সফরে আমি যা দেখেছি—অন্য কেউ তা দেখেনি—কেউ যদি দেখে থাকে সে দুনিয়াদারির মতলবে তা গোপন করেছে—কিছু যদি বলে থাকে সে উলটোই বলেছে। যারা গোশা-নশীন—লোকচক্ষুর আড়ালে যারা এই কোণে পড়ে আছে—এই জমানার হাল তারাই বরং ভাল জানে।

মহম্মদ বদি প্রদীপটা একটু উসকে দিল। একটানা ঘাড় নিচু করে লেখা যায় না। বাঁধানো খাতাখানির মাথায় তার এই লেখার নাম লিখেছে মহম্মদ বদি। লতাইফ-উল-আখবার।

তারপর মহম্মদ বদি লিখল—

মুঘল শাহীতে যাঁরা একদিন বাদশা হয়েছেন—তাঁরা জীবনের শুরুয়াতেই সংগঠন, সাহস, বুদ্ধির এমন পরিচয় দিয়েছেন যা অবশ্যই তাঁদের অন্যের চেয়ে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু গত ক'দিনই লক্ষ করে আসছি—শাহজাদা দারা কিল্লা-কান্দাহার উদ্ধার করতে যুদ্ধযাত্রায় নেমে সংগঠনের জায়গায় বিশৃঙ্খল দশার পরিচয় দিচ্ছেন। লড়াইয়ের আয়োজনে তিনি শুরু থেকেই কামানের দেশী গোলন্দাজদের চেয়ে বিদেশী ফিরিঙ্গি গোলন্দাজদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। মনে রাখা দরকার—প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দেশী খালাসিরাই কামানের সলতেয় আগুন দেয়—আর ফিরিঙ্গি গোলন্দাজরা দূর থেকে তোপ দাগার হুকুম দিয়েই খালাস। একজন সিপাহ-সালার হিসেবে শাহজাদা দারা কি সঠিক বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন? আমি বলব—না। তাঁর দিক থেকে এই অবহেলা পেয়ে দেশি গোলন্দাজরা কিছুতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই যুদ্ধের সামিল হবে না। তাতে ক্ষতি কার? আমি বলব হিন্দুস্থানের।

দপ করে প্রদীপ নিভে গেল।

দিন কয়েকের ভেতর লাহোরের বাইরে কিল্লা কান্দাহারের নকল হুবহু তৈরি হয়ে গেল। কিল্লার ভেতর সেপাই বা কামান কিছুই থাকল না। বাইরে কামানের দুটি মোর্চা খাড়া করা হল। সারাদিন শীতের রোদে এসব খুব ভাল লাগতে লাগল শাহজাদার।

এক মোর্চা থেকে হিন্দুস্থানি—অন্যটি থেকে ফিরিঙ্গি গোলন্দাজরা তোপ দেগে কিল্লার দেওয়াল ভাঙবে। ঢোকার রাস্তা হওয়ামাত্র এক পল্টন সেপাই হাতা-হাতি করতে করতে চড়াও হয়ে কিল্লা দখল করবে।

সেদিন ঠান্ডা হাওয়ার ভেতর খোলা প্রান্তরে রোদ যেন সকাল থেকেই খেলা করছে। নকল লড়াই দেখতে শাহজাদা ময়দানে এলেন। কিল্লা ঘিরে খেলা

হল। তারপর সেই নকল কিল্লায় তোপ দাগা শুরু হয়ে গেল।

সূর্য মাথায় ওঠার আগেই হাতাহাতি হামলা—কিল্লা ফতে—সবই শেষ। ময়দানে দাঁড়িয়েই শাহজাদা দারা হিন্দুস্থানিদের তোপের মোর্চার চেয়ে ফিরিঙ্গি-দের তোপের মোর্চা ভাল বললেন। খুব সাবাসি দিলেন তাদের।

যতবার শাহজাদা সাবাসি দিলেন মানুচ্চি ততবারই ঝুঁকে তসলিম জানালেন। ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে সবই দেখল মহম্মদ বদি। সে মনে মনে বলল, কাজটা কি ভাল হল শাহজাদা? কথাটা সত্যি হলেও খোলাখুলি বলে সিপাহ-সালার হিসেবে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করলেন না।

আর খানিক বাদেই দুপুরের খাবার সময়। খেতে বসার আগে এমন দৌড়ো-দৌড়ি ফৌজি মানুষজনের ভালই লাগে। মহম্মদ বদি দেখল—কোথায় কান্দাহার। এই নকল কান্দাহার কিল্লা ফতে করার জন্যেও মনসবদারদের ন্যাকামির শেষ নেই। তাঁরা এক একজন শাহজাদার সামনে এসে কুর্নিশ করছেন—আর শাহজাদাকে মবারকবাদ দিচ্ছেন! যেন বা আসল লড়াইটাই ফতে হয়ে গেছে!

শীতের দুপুরের চমৎকার রোদের ভেতর শাহজাদা দারাকে ঘিরে জবরদস্ত সব মনসবদার দাঁড়িয়ে। মনসবদাররা নিজেদের এলাকায় এক একজন বাদশা। তাই এই নকল লড়াইয়ের ময়দানে তাঁরা যখন শাহজাদাকে খোশামোদ করতে ব্যস্ত—তখন তাঁদের নিজেদের নানান ধরনের রিসালাদার নায়েক তাঁদের আশ-পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। তাঁদের ভেতর নাক লম্বা শাহী ওয়াকেনবীশ উটের মতোই গলা তুলে যতটা পারে শাহজাদার কাছাকাছি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বেচারার দশা দেখে খুব আমোদ হল মহম্মদ বদির। সে মনে মনে বলল, শাহী ওয়াকেনবীশ হওয়ার মজা বোঝো!

ওরই ভেতর একজন মহা খোশামুদে মনসবদার রীতিমত গলা তুলে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন, আজকের দিনটি—ফতে আওয়াল-ই দারাশুকো।

মহম্মদ বদি তা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এই নকল কান্দাহার জয় নিয়েও মাতামাতি? এজন্যেও ইতিহাসে জায়গা পাওয়ার ইচ্ছে? ছেলেমানুষী আর কাকে বলে? এই ভাবেই বাবরের হিন্দুস্থান—আকবরের হিন্দুস্থান রসাতলে যাবে। ও'রা বহু কোরবানির পর হিন্দুস্থানে মুঘলশাহী হাসিল করেছেন। আজ হিমালয় থেকে নর্মদার ওপারেও ইসলামের আজান শোনা যায়—মুঘল ধ্বজ ওড়ে। এমনটি চললে তা কি আর বেশিদিন চলবে। একজন সিপাহ-সালার হয়ে—হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা হয়ে এ কী লড়কপনাহ চলছে?

মহম্মদ বদি সাত তাড়াতাড়ি তাঁবুর দিকে রওনা দিল। যদি ভুলে যাই। সবটা বিশদে লিখে রাখতে হবে। নয়তো ভাবীকালের কাছে কী উত্তর দেব?

সেদিন রাতেই লতাইফ-উল-আখবারে লেখা হল—

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে লিখছি—শাহজাদা দারাশুকোর যেখানে বুদ্ধিমানের মতো সিপাহ-সালার হিসেবে নিজের ফৌজের সেপাই-সর্দার দু'জনের মনেই উৎসাহ দিতে হবে—তেমনই লড়াইয়ের খুঁটিনাটি নিজের চোখে রেখে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।—কিন্তু তিনি যা করছেন তাতে হিন্দুস্থানের ফৌজের

সাহসী, লড়াকু কাজের মানুষরা হতাশ হয়ে পড়ছেন আর আনাড়ি নাধরাম সর্দারদের দাপটে খাঁটি জানবাজ নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি খুঁটিনাটিতে নজর না দিয়ে উলঙ্গ প্রায় যাদুকর শতচ্ছিদ্র খিরকা গায়ে ফকিরদের ওপর বেশি বিশ্বাস রাখছেন। পরিণাম ভাল হবে না। ইরানি কামান চুপ করে থাকবে না।

শাহজাদার নিজের তাবিনের লোকজনের উৎসাহ আছে ঠিকই। কিন্তু তারা কথার বাদশা। যে কোনওদিন কোনও লড়াইয়ে মশামাছিও মরেনি—তার ভাব সে যেন একজন রুস্তম।

ঠিকই একই সময়ে শাহজাদা দারা খুব মন দিয়ে চিঠি লিখছিলেন। চিঠিখানি যাবে হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে। শীত কমে এলে হিন্দুস্থানের ফৌজ মুলতানের দিকে এগোবে। তাই তাঁর ইচ্ছা। কান্দাহার পেঁছিতেও তো প্রায় সত্তর পঁচাত্তর দিন লেগে যাবে। তখন ওদিকে বসন্ত। রজব মাসের শুরুতেই এই বিশাল ফৌজ নড়েচড়ে এগোতে থাকবে।

লেখা থামিয়ে দারা তাঁর তাঁবুর বাইরে এলেন। দূরে দূরে মশাল জ্বলছে। তার ভেতর তাঁবুর পর তাঁবুর আভাস। লাহোর এখন আস্ত একটা ফৌজি ছাউনি হয়ে উঠেছে। হিম আকাশে রাভির দিকে চাঁদ উঠেছে। ওইদিকে ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নার ভেতর এক রাতে আমি গিয়াথপুর আর আলমগঞ্জের ভেতর দিয়ে কফিপুরায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ওখানেই তাঁর আস্তানায় মিঞা মীর তাঁর গায়ের জামাটি খুলে আমার বুকে তাঁর বুক লাগিয়ে সে কী এক অদ্ভুত জিনিসের স্পর্শ দিয়েছিলেন। আনন্দে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমি আর পারছিলাম না। এত আনন্দ কোথায় রাখি?

ওখানেই আমি তাঁর মুখের লবঙ্গ মেঝেতে পড়ে গেলে গোপনে কুড়িয়ে নিই একদিন। তারপর মুখে দিই। কী যে দামি লেগেছিল সে লবঙ্গ।

আর সেই আমি আজ সেই একই লাহোরে। ওসব আজ থেকে প্রায় বিশ সন আগের কথা। মনে হয় অন্য পৃথিবীর কথা। অন্য জীবনের কথা। আসমানে তাকিয়ে শাহজাদা এই দুই দুনিয়াকে একই সুতোয় গেঁথে ফেলার রাস্তাটি খুঁজতে চেষ্টা করলেন খানিকক্ষণ। পারলেন না। আসমানের চেহারা নির্দোষ, নিষ্পাপ। এরই ভেতর নসিব লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোনও হদিস মেলে না।

শাহজাদা তাঁবুর ভেতরে ফিরে এলেন। চিঠিখানি শেষ করতে হবে। খুবই জরুরি।

॥ সাতানব্বই ॥

বছর খানেকের ওপর হিন্দুস্থানের বণিকদের, বিশেষ করে মুঘল ধ্বজ যেসব সুবায় ওড়ে—সেখানকার ব্যাপারীদের কোনও জাহাজ ইরানি বন্দরে ভিড়ছে না। কারণ আর কিছুই নয়—কান্দাহার। ডাঙায় ডাঙায় কিল্লা-ই-কান্দাহার নিয়ে হিন্দুস্থানে ইরানে লড়াই দরিয়াতেও রেষারেষি ছড়িয়ে দিয়েছে।

একটা লড়াইয়ে হাজারো জিনিস লাগে। তার সবটাই দেশের ভেতর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবারির ব্যাপারে মুঘল ফৌজকে সাগরপারের কিছু কিছু জিনিসের জন্যে বসে থাকতে হয়। সেসব নিয়ে ফেরার সময় হিন্দুস্থানের জাহাজকে ইরানের বন্দর এড়িয়ে চলার জন্যে আগ্রা-জাহানাবাদের দেওয়ানখানা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

খানিক দরিয়া—খানিক ডাঙায় কাবার করে বন্দর-আব্বাসে এসে আটকে গেছেন ট্যাভারনিয়ার। ইউরোপের ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংলিশস্তানি জাহাজ তো হামেশাই সুরাট, গোয়া যাচ্ছে। তাদের একখানায় চেপে বসলেই হয়। কিন্তু তা যাবেন না ট্যাভারনিয়ার। হরমুজ কিংবা বন্দর আব্বাস—ইরানের এই দু'জায়গা থেকে তিনি যতবারই হিন্দুস্থানে গেছেন—তার বেশির ভাগই গিয়েছেন হিন্দুস্থানের ব্যাপারীদের জাহাজে। বিশেষ করে আমেদাবাদের জাহাজের বড় কারবারি গফুরের দুনিয়া চষা সব জাহাজে। তাতে গেলে সুবিধা এই—দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে হিন্দুস্থানে পেঁছবার আগেই জাহাজে সফরি হিন্দুস্থানিদের কাছ থেকে এত বড় দেশটার হালের তাবত খবর পেয়ে যান তিনি। ডাঙায় নেমে হাল-হকিকত জানবার জন্যে তাঁকে আর খোঁজখবর নিতে হয় না। বিশেষ করে মণিমুক্তো বেচতে গেলে সে-দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা, রাজা-বাদশাদের কার কী হাল—মহামারী বা বানে দেশটা উচ্ছন্নে গেল কিনা তা জানতে হয়। জানতে হয় আমির-ওমরাহদের খবর। মনসবদার, রসদ জোগানদারদের খবর। খেয়াল রাখতে হয়—সদ্য সদ্য ক্ষমতা ঠিক কার হাতে। এসব তো আর চাপা থাকে না। ডাঙা ছাড়িয়ে দরিয়ায় ভেসে পড়া তাগদদার মানুষজনের এসব খবর নখদর্পণে। বিশেষ করে নসিব ফেরাতে হিন্দুস্থানে প্যাড়ি দিয়ে থাকে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংলিশস্তানি, ফ্রানসিসি, গোলন্দাজদের দল। তারা কেউ না কেউ কোনও না কোনও জাহাজে থাকবেই। তারাই সবচেয়ে তাজা খবর দিতে পারে হিন্দুস্থানের।

ক'মাস ইরানে থেকে ট্যাভারনিয়ার দেখলেন, মণিমুক্তো কেনার দিকে ইরানের শাহী এখন মন দিতে পারছে না। মনের সবটাই ঘুরে গেছে কান্দাহারের দিকে। হিন্দুস্থানে পেঁছেও কি তাই দেখব? তার চেয়ে আলেপ্পো হয়ে প্যারিসে ফিরে যাই। এরকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বন্দর-আব্বাসে কৃষ্ণা নামে একখানি জাহাজে উঠে বসলেন ট্যাভারনিয়ার। জাহাজখানি গোলকুণ্ডার রাজার। সিংহলের গা ঘেঁষে মসুলিপত্তমে গিয়ে নোঙর ফেলবে।

ভালই হল ট্যাভারনিয়ারের। সেবারে গোলকুণ্ডার উজিরে আজম মীরজুমলার সঙ্গে দেখা করেও শেষ অব্দি তিনি গোলকুণ্ডার রাজার ওখানে যেতে পারেননি। চলে গিয়েছিলেন আমেদাবাদে গুজরাতের সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের দরবারে।

জাহাজে উঠে ক'জন ওলন্দাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ট্যাভারনিয়ারের। এরা ইউরোপের খাঁড়িতে খাঁড়িতে কৃষ্ণাকে পথ দেখিয়ে থাকে। যাচ্ছে গোলকুণ্ডায়। ওখানে ওদের দেশী কুঠিয়ালের আড়তে যাবে। কৃষ্ণা সিসিলি হয় ভেনিস অব্দি গিয়েছিল এবার। গোলকুণ্ডার রঙিন কাপড় আর মসলিন নিয়ে। ওসবের

ইউরোপে খুব চাহিদা। কৃষ্ণাকে শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই নয়—তাকে দরিয়ায় পাহারা দেবার জন্যেও দু'জন ওলন্দাজ কামানচী রয়েছে।

বন্দর-আব্বাস ছাড়ার পর কৃষ্ণা গিয়ে পড়ল আরব সাগরে। শীতের সাগর। রীতিমত শান্ত কিন্তু এই দরিয়ার একটা দুর্নাম আছে। কোথাও কিছু নেই—শীতেও নাকি কখনও কখনও আরব সাগর ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের কাছাকাছি ট্যাভারনিয়ার নিজের মনকেই বললেন, এবার গোলকুণ্ডার রাজাকে নাশপাতির মতো বড় মুক্তো দুটো যদি কেনাতে পারি—।

মণিমুক্তোর কারবারিরা দেশে দেশে ঘুরে অনেক মানুষ দেখে দেখে অনেক দূর দেখতে পান। শীতের বিকেলে পড়ন্ত রোদে দূরে দূরে শান্ত জলের ওপর অনেক জাহাজ। কোথাও বা দলবেঁধে। কোথাও একাকী। ট্যাভারনিয়ারের মনে হচ্ছিল, গোলকুণ্ডার রাজা নাশপাতির মতো মুক্তো দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন।

ট্যাভারনিয়ারের চোখেই পড়ল না—পশ্চিমের আকাশের লালি অসময়ের মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। খানিকবাদেই দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে খ্যাপা বাতাস এসে কৃষ্ণার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ-বাতাসে কৃষ্ণা যেন পাগলা ঘোড়া হয়ে ছুটতে লাগল। সারাটা সাগর খেপে উঠেছে। যে-পথে যাবার সেই পথেই ছুটছে কৃষ্ণা। কিন্তু ছোট একটির বেশি পাল খাটানো গেল না।

পরের দিন বাতাস হয়ে উঠল আরও দুরন্ত। সূর্যের দেখা নেই। সারা আকাশ সাগর ছোঁবার জন্যে যেন ঝুলে পড়েছে। পরদিন বাতাস আরও দুরন্ত হল। দরিয়া একদম খ্যাপা ষাঁড়। আকাশে একটু আলো নেই। কেমন ছায়া ছায়া।

কাপ্তেন একসময় ওই ঝড়ের ভেতরেই কম্পাসে তাকিয়ে বললেন, গোয়া পেরিয়ে যাচ্ছি।

এমন ঝড়ে কখনও পড়েননি ট্যাভারনিয়ার। জাহাজের কুঠুরির ভেতর গিয়ে বসলেন। সেখানেও তিষ্ঠোনো দায়। এক একসময় জাহাজ কাত হয় তো ট্যাভারনিয়ার কাঠের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে টাল সামলান। একসময় মনে হল—জাহাজ যদি ডোবে তো মুক্তোগুলো নিয়ে তলিয়ে যাব। একটা কাঠকয়লার টুকরো এসে পায়ের কাছে ছিটকে পড়তেই কুড়িয়ে নিলেন তিনি। অন্যমনস্ক হয়ে জলে ভেজা কাঠের দেওয়ালে কয়লার টুকরোটা দিয়ে ঘষে ঘষে লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু কিছুই ফুটে উঠল না ভিজে কাঠে। তখন ট্যাভারনিয়ারের মনে বারবার কয়েকটি কথাই ফুটে উঠতে চাইছিল—আজ ১২ ডিসেম্বর, সন ১৬৫২।

পরদিন তুমুল বৃষ্টি। আকাশে কড় কড় করে বাজ ডাকছে। শামিয়ানা ছাড়া কোনও পাল তোলা সম্ভব হল না আর। তাও রাখতে হল আধমেলা অবস্থায়। কাপ্তান ওরই ভেতর বললেন, মালদ্বীপ পেরিয়ে যাচ্ছি।

ট্যাভারনিয়ার বাইরে তাকিয়ে কোনও দ্বীপই দেখতে পেলেন না। একসময় লশকররা বলল, খোলে জল ঢুকছে।

শ'খানেক ব্যাপারী ছাড়াও পঞ্চান্নটি ঘোড়া রয়েছে জাহাজে। গোলকুণ্ডার রাজাকে ইরানের শাহের উপহার। একসময় তার ভেতর পাঁচটি ঘোড়া দরিয়ায় ফেলে দিতে হল। তাতেও নিস্তার নেই। জল ঢুকছেই। বাইরে বাতাসের সাঁই সাঁই। পুরো একটা দিন জল ঢুকেই চলল।

দরিয়ায় ভাসার আগে জাহাজের খোল আগাগোড়া জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নইলে কাঠ শুকিয়ে গিয়ে জল ঢুকে পড়ার অবস্থা হয়ে থাকে জাহাজে। তাই-ই হয়েছে কৃষ্ণায়।

ভাগ্য ভাল। এক সওদাগর দুই বোঝা গোরুর চামড়া নিয়ে চলেছিলেন। গরমে ওগুলো পেতে শুতে ঠান্ডা মতো। ঘোড়ার জিন বানায় এমন চার পাঁচজনও ছিল জাহাজে। তারাই সেলাই করে জল তুলে ছেঁচে ফেলার ঝোলা বানিয়ে ফেলল। এইসব বিশাল ভিস্তিতে জল তুলে সবাই মিলে প্রাণ ভয়ে ছেঁচতে লাগল। একবেলার ভেতর বিপদ কাটিয়ে ওটা গেল। আর সেদিনই বিকেলের দিকে ডাঙার দেখাও পাওয়া গেল।

কাপ্তেন বললেন, আমরা সিংহল পেরিয়ে এসেছি।

আকাশ পরিষ্কার হতে লাগল। ট্যাভারনিয়ার মসুলিপত্তনমকে দূর থেকে চিনতে পারলেন—বন্দরের সাদা রঙ ওলন্দাজ পাটাতন দেখে। তিনি মনে মনে বললেন, আজ কি ডিসেম্বরের সতেরো তারিখ? না, আঠেরো তারিখ?

ডাঙায় নেমে ওলন্দাজ কুঠির মঁসিয়ে হারকিউলিসের সঙ্গে আলাপ হল। সুইডেনের মানুষ। বিবাহিত। জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেশি রাতে আরও ক'জন ওলন্দাজ এল। তাদের কেউ কেউ বিবাহিত। সঙ্গে বউ। জোর খাওয়া দাওয়া। সেই সঙ্গে গান। ট্যাভারনিয়ার গাইলেন। নিজের বেহালাটি বাজালেন। নাচলেনও অনেক দিন পরে। তাঁর পাশে পাশে কয়েকটি হিন্দুস্থানি মেয়ে নাচল। ট্যাভারনিয়ারের মনে হল—এদেশে নর্তকীর কোনও অভাব নেই।

সেই আসরেই ক'জন ওলন্দাজ বলল, মুক্তো বেচতে হলে তা আগে দেখাতে হবে রাজার উজির মীরজুমলাকে। তিনি না দেখে দিলে রাজা কিছুই কিনবেন না। মীরজুমলা ঘোড়া দেখে দিলে তবে রাজা সে ঘোড়া নেবেন।

অগত্যা পরদিন ভোরেই ট্যাভারনিয়ার রওনা হলেন। রাতেই তিনি শুনেছেন—মীরজুমলা এখন দুর্গ-শহর গণ্ডিকোটে আছেন। পথে একখানি পালকি, তিনটি ঘোড়া, ছ'টি ষাঁড় কিনলেন ট্যাভারনিয়ার। মালপত্তর বইতে। নিজেদের চলাচলের জন্যে।

কৃষ্ণা নদীর মোহনায় মসুলিপত্তনম। সেখান থেকে উত্তরে উঠতে উঠতে তিনদিনের মাথায় পেন্নার নদীর গায়ে বেজোয়াড়া পার হলেন ট্যাভারনিয়ার। তারপর দু'দিন দিনে দিনে রাস্তা কাবার করে গণ্ডিকোটের দুয়ারে এসে পৌঁছলেন এক সন্ধ্যায়। সে-সন্ধ্যায় গণ্ডিকোটের ভেতরে ঢোকা হল না। পর্তুগিজ ব্যাপারী সারা হিন্দুস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একটি দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে খুব খাতির পেলেন ট্যাভারনিয়ার। ওদের লোকজনই

ট্যাভারনিয়ারের ঘোড়া, ষাঁড়দের ঘাস কেটে খাওয়াল। ব্যাপারীরা ট্যাভারনিয়ারকে নিয়ে খেতে বসল। রীতিমত ভাল খাবার। শুয়োরের নোনা উরু। ষাঁড়ের জিভ। মাংসের কাবাব। মাছভাজা। তরমুজ—আর কিছু দেশী ফল।

মীরজুমলার দেখা পেতে পেতে দুপুর হয়ে গেল ট্যাভারনিয়ারের। কুরুর-বন্দলু পাহাড়ের গায়ে তাঁবুতে বসে মীরজুমলা কয়েকটি চিঠির জবাব দিচ্ছিলেন মুখে মুখে। লিখে নিচ্ছিল কয়েকজন কলমচি। একগোছা চিঠি মীরজুমলার পায়ের আঙুলের ফাঁকে। আরেকগোছা হাতে। চিঠির জবাব দিতে দিতে বিচারের কাজও সারছিলেন মীরজুমলা।

খুব তাড়াতাড়ি বিচার চলছিল। সবটা শুনে একজন খুনীর শাস্তি দিলেন—ওর হাত পা কেটে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হোক। এক চোরের শাস্তি হল—পেট চিরে ওকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হোক। বাকি দু'জনের শাস্তি হল—মাথা কেটে নেওয়া হোক। অপরাধটা কী তা ঠিক বুঝতে পারলেন না ট্যাভারনিয়ার।

এরপর ডাকা হল চার পুরোহিতকে। পুরোহিতরা ভয়ে জড়সড়। তাদের দিকে তাকিয়ে মীরজুমলা বললেন, আপনারা বিগ্রহকে যাদু করেছেন।

তাতে এক পুরোহিত বলল, বিগ্রহ হলেন ভগবান। তাঁকে কী করে যাদু করব?

—তা জানি না। কামানের জন্যে ঢালাই করতে গিয়ে বিগ্রহের তামা গলানো যাচ্ছে না।

সেই পুরোহিত বলল, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ট্যাভারনিয়ার সবটাই বুঝলেন। হিন্দুস্থানে তামার বড় অভাব। অথচ কামানে, তোপে তামা চাই-ই চাই। তাই বোধহয় বিগ্রহ লুটে আনা হয়েছিল। কিন্তু তামা গলানো যাচ্ছে না।

ওদিকে শাহজাদী-বেগম জাহানারার কানেও কথাটা উঠেছে। বাদশার সভাকবি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, শাহীর বাইরে গোলকুণ্ডায় হিন্দু মন্দির থেকে মীরজুমলা তামার লোভে বিগ্রহকে বিগ্রহ লুট করছেন—সে কথাটা জানিয়েছেন শাহজাদী জাহানারাকে। শাহজাদা দারাকেই ব্যাপারটা তিনি জানাতেন। কিন্তু শাহজাদা তো কান্দাহার নিয়ে ব্যস্ত। তিনি লাহোর ছেড়ে মুলতান পাড়ি দিয়েছেন।

বিগ্রহ লুট ছাড়াও আরেকটি ব্যাপার জাহানারা আব্বা হুজুরকে জানাবেন বলে আজ বাদশার মবারকে এসে দাঁড়িয়েছেন। তা হল: মুঘল শাহীর অতি ঘনিষ্ঠ রাজপুত সামন্তরাজা ছত্রশাল সেই যে কবে শাহজাদা আওরংগজেবের তাঁবিনে নর্মদার ওপারে পড়ে আছেন—তাঁর কথা কি জাহানাবাদের দেওয়ানখানা ভুলে গেল? ছত্রশাল কি চিরকালই নর্মদার ওপারে পড়ে থাকবেন? তিনি কি রাজধানী ঘুরে যাওয়ার ছুটিও পাবেন না? ছত্রশালকেও তো শাহজাদা দারার সঙ্গে কান্দাহার লড়াইয়ে পাঠানো যেত। বাদশা নিজেও তো ফৌজি ব্যাপারে

ছত্রশালের কোনও পরামর্শ পাচ্ছেন না বহুদিন।

মনে মনে যুক্তিগুলো এভাবেই সাজিয়েছিলেন জাহানারা। সন্ধ্যার মুখে নয়া রাজধানী জাহানাবাদ আলো, বণিকদের বালহস্তির গলঘণ্টের গম্ভীর আওয়াজে, ঘোড়সওয়ারদের ছুটে চলায় রীতিমত দেমাকি দেখায়। গোসলখানার ভেতরে বাদশা শাহজাহান কিন্তু রীতিমত চিন্তিত মুখে বসে আছেন। সামনে উজির সাদুল্লা খাঁ। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন ওমরাহ। দু'জন আহেদি হুকুম তামিলের জন্যে তটস্থ হয়ে দাঁড়ানো।

জাহানারা দেখলেন, আব্বা হুজুর দিনক্ষণ ঠিক করতে ব্যস্ত। ঠিক কোন দিনে কোন সময়ে শাহজাদা দারা এগোবেন—তাই খুঁজে পেতে দেখা হচ্ছে। নিজের কথা আর বলা হল না শাহজাদীর। জাহানারার মনে পড়ল, দাদাসাহেব জাহাংগীর বাদশা লিখে গেছেন—জীবনে একবার মাত্র দিনক্ষণ বিচার না করেই পা ফেলেছিলাম। সেবার কোনও অমঙ্গল না ঘটলেও আর কখনও অমন দুঃসাহসিক কাজ করিনি।

শাহজাদী জানেন, আব্বা হুজুর এ ব্যাপারে আরও সাবধানী। সাদুল্লা খাঁ শাহজাদা দারার চিঠি পড়ে শোনালেন বাদশাকে। কবে তিনি এগোতে চান—আর কবে কিল্লা-কান্দাহারের হামলা হবে—সে দুটি তারিখ দারা লিখে পাঠিয়েছেন। তাতে সায় দিয়ে বাদশা তাঁর ফরমান পাঠালেন।

জাহানারা লক্ষ করলেন, আব্বা হুজুর আগাগোড়াই অন্যমনস্ক। শুনছেন। হুকুম দিচ্ছেন। কিন্তু সবই অন্যমনস্কভাবে। বাদশা খুবই চিন্তিত তা বোঝাই যায়। এ উপলক্ষে দারাকে পাঁচ লাখ টাকার হাতি, ঘোড়া, জহরত, হাতিয়ার বাদশা খেলাত পাঠালেন। জাহানারা বাদশার মনটা বুঝলেন। সব কিছু পাঠিয়েও আব্বা হুজুর ভাবছেন—তবু যদি দারা কিছুর অভাবে পড়ে। মনসবদারদের খেলাত—রাহা খরচ দিতে হবে। তাছাড়াও সেপাইদের আগাম মাইনে—বকশিশ তো আছেই। এসব বাবদে আরও বিশ লাখ টাকা পাঠাবার হুকুম হল। এরপরেও নগদ এক লাখ আশরফি আর এক কোটি টাকা সঙ্গে নেবার জন্যে শাহজাদাকে মঞ্জুর করা হল।

মুঘলশাহীতে সারাদিন পরে জরুরি শলাপরামর্শের জায়গা হল গোসলখানা। তাই এখানে এখন বাছাই সব ওমরাহ ঘিরে আছেন বাদশাকে। তাঁদের মাঝখানে বসে আছেন উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ। এঁদের সবার দিকে তাকিয়ে—আবার একদম না তাকিয়েও বাদশা শাহজাহান যেন সবার মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে আছেন।

শাহজাদী জাহানারা বাদশার হুকুমে দারাকে খেলাত দেবার পর্ব পর পর শুনছিলেন আর অবাক হচ্ছিলেন। একেবারে দু'হাত খুলে দিয়ে চলেছেন বাদশা। শাহজাদীর মনে হল—আওরঙ্গজেবও তো দু'বার কান্দাহার-কিল্লায় হামলা চালাল। তখন তো এমন খোলা হাতে কোনও খেলাত বিলি হয়নি। আব্বা হুজুর কারও দিকে না তাকিয়ে একা একাই শূন্যে কাকে দেখে যেন হাসলেন। তাই তো মনে হল জাহানারার।

একজন মানুষ আরেকজনের মনে ইচ্ছেমত ঢুকতে পারে না। সবার অজ্ঞাতে চোখের কোণ দিয়ে একবার নিজের মেয়ে শাহজাদী জাহানারার মুখে অবাক হয়ে যাওয়ার ভাব দেখে বাদশা নিজেকেই মনে মনে বললেন, শাহজাদী জাহানারা, এখন যদি তুমি আমার মনের ভেতরে ঢুকতে পারতে—তাহলে দেখতে—একজন আব্বা হুজুর তাঁর ইনসাফির—ন্যায় বিচারের মাপকাঠি কীভাবে ঠিক করে থাকেন। সব বিচারের কাঁটা, দাঁড়িপাল্লা খালি চোখে দেখা যায় না। সব বিচার একই ভাবে একই পথে চলে না। আমি চাই—আমার ভাবের পাগল শাহজাদা কান্দাহার ফতে করে ফিরুক। ফতে করে ফেরার পথে সুবায় সুবায় কিল্লায় কিল্লায় কামান দেগে তাকে সওগাত দেওয়া হোক। আর তা দেখুক বাদ বাকি শাহজাদারা। বিশেষ করে সাদা সাপ বুঝুক—একজন আব্বা হুজুর অনেক বুঝে-সুঝেই তাঁর ইনসাফির রাস্তা ঠিক করে থাকেন।

বাদশা শাহজাহানের মুখের অনিশ্চিত হাসি—চোখের ভঙ্গি দেখে ওমরাহরা বুঝবেন, বাদশা এবার শাহজাদীর সঙ্গে একা হতে চান। সাদুল্লা খাঁ আগে উঠলেন। বাকিরা পেছন পেছন। সবশেষে আহেদি দু'জন কুর্নিশ করতে করতে গোসলখানা থেকে মিলিয়ে গেল।

জাহানারা এবার তাঁর আব্বা হুজুরের মুখে তাকালেন। বাদশা তাঁর দুখানি হাতের পাতা মেলে বসে আছেন। চোখ জাহানারার মুখে। শাহজাহানের কররেখা শাহজাদী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তিনি জানেন—ওই হাতে আছে আপেলের গন্ধ। সে-ঘ্রাণ নিখাদ তাগদের।

—শোনো শাহজাদী! তোমার কথাতেই আমি বেদৌলত—বরখাস্ত শাহজাদাকে সুবেদারি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

জাহানারা পলকে বুঝলেন, আব্বা হুজুর, ছোটে ভাই আওরংগজেবের কথা বলছেন।

—সেবারে সে ছিল শুধুই লিকায়েত—অভিযোগ আর নালিশের আস্ত একটা বিষ-পুঁটুলি। আর এবার?

জাহানারা শাহজাহানের চোখ থেকে নিজের চোখ নামিয়ে নিলেন।

—এবার সেই বিষ-পুঁটুলি থেকে বিষাক্ত লতা বেরিয়ে পড়েছে! আর কোনও ঢাকাঢাকি নেই—নেই কোনও আড়াল। আওরঙ্গজেব আমার হুকুম তুচ্ছ করে সুজার সঙ্গে—জাহানাবাদের বাইরে খোলা ময়দানে দেখা-সাক্ষাৎ—খানাপিনা করেছে! দুই শাহজাদা একসঙ্গে শিকারেও গেছে! দুই শাহজাদার ফৌজ একই ময়দানে তাঁবু ফেলেছে। জানি—সবই আমার তিসরি শাহজাদার মগজ থেকে বেরিয়ে আসা মতলব থেকেই হয়ে থাকবে।

জাহানারা সবই জানেন। তখন আব্বা হুজুর রাজধানীর বাইরে। হুকুম ছিল, দুই শাহজাদার ফৌজ সব সময়েই কয়েক মঞ্জেলের ফারাক রেখে কুচ করবে। সে হুকুম গ্রাহ্যেই আনেননি হিন্দুস্থানের তিসরি শাহজাদা।

শাহজাহানের কপালে পর পর তিনটি ভাঁজ। তিনি নিজেকেই যেন অস্ফুটে বললেন, আওরঙ্গজেবের মনে কী আছে জানি না। তৈমুরের বিধানকে তুড়ি

দিয়ে—আকবর বাদশার ইচ্ছাকে তুচ্ছ করে সে তার ছেলে স্লতান মহম্মদের সঙ্গে স্জার মেয়ে গ্লর্খ বান্র সাগাই পাকা করেছে। একবার আমার রাজামন্দির জন্যে—আমার সময় আছে কিনা তোয়াক্কা না করেই ওদের বিয়ে পাকা করেছে, জাহানারা।

জাহানারার ইচ্ছে হল—একবার বলেন, দোষটা কোথায় আব্বা হ্জ্র? আপনি কি চান—ছোটে ভাই স্জার মেয়ে গ্লর্খ বিয়ে না বসে আমারই মতো ম্খল ক্মারী হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিক ?

কিন্তু তা বলতে পারলেন না জাহানারা। আব্বা হ্জ্র এখন যেন ছিন্নভিন্ন। সামনে কান্দাহার। পাশে বেপরোয়া অবাধ্য—অজানা শাহজাদা। স্জাকে আওরঙ্গজেবের জায়গায় দক্ষিণে স্বেদার-ই-আজম করে পাঠানোর করা খোদ শাহজাদা স্জা আমলেই আনেননি—তাও জানেন জাহানারা। তাঁর মন বলল, এভাবে শাহী কতদিন টিকবে ?

দক্ষিণের শীত ঘোড়া দাবড়ালেই যেন পালিয়ে যায়। দ্ই রিসালার মতো—মানে শ'দেড়েক ঘোড়সওয়ার নিয়ে আজ ক'দিন হল শাহজাদা আওরঙ্গজেব এলোপাথাড়ি ঘ্রে বেড়াচ্ছেন। কোথাও স্স্থির হয়ে বসা তাঁর ঘটে নেই। পেছনে পড়ে থাকল খন্ডে রাইয়ের উড়িয়ে দেওয়া মন্দিরের সামনেকার বিশাল জলকর—যার নাম কুতল্গ সাগর। শাহজাদার এক এক সময় মনে হয়—সারা হিন্দ্স্থান যেন বা একটি বিশাল বন। তার ভেতর কিছ্ বসতি—দ্'একটা কিল্লা শ্ধ্ জেগে আছে। আসমান ছ্ঁয়ে আছে সাতপ্রা পাহাড়। তার পা ধ্য়ে বয়ে চলেছে—তাপ্তি, নর্মদা। কিল্লা-ব্রহানপ্রের ছায়া পড়ে তাপ্তির জলে। নর্মদা পেরলেই কিল্লা আসিরগড়।

এসব এলাকায় এলে আওরঙ্গজেব যেন স্দ্রে স্মৃতির রাস্তায় চলে যান। পাথ্রে পথ। কাঁটাঝোপ। আকাশছোঁয়া গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একদিকে দেখা যায় কিল্লা-ব্রহানপ্রের ঘোরানো উঁচু দরওয়াজা। আর নর্মদার ওপারে তাকালে ভেসে উঠবে কিল্লা-আসিরগড়ের সামানব্র্জ। একদিন বাগী শাহজাদা খ্রর্ম তাঁর বালক তিন ছেলে—স্লতান দারা, স্লতান আওরঙ্গজেব, স্লতান ম্রাদকে নিয়ে জাহাঙ্গীর বাদশার ফৌজের তাড়া খেয়ে এইসব পথেই পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বাদশা হওয়ার আগে অব্দি আব্বা হ্জ্রের বাগীপনাহর শেষ ঘাঁটি ছিল ওই কিল্লা-আসিরগড়। এই পথ দিয়েই আমি আর বড়ে ভাই হাতির পিঠে গাদেলায় ঢ্লতে ঢ্লতে ঘ্মিয়ে পড়েছি একদিন—তখন পাশে থাকতেন আম্মিজান। ওই ব্রহানপ্র-কিল্লায় রৌশনের জন্ম। ওই কিল্লা-ব্রহানপ্রেই আম্মিজান চোখ ব্জেছেন। তাও হয়ে গেল বিশ সনের ওপর।

দক্ষিণের স্বেদার-ই-আজম ঘোড়ার পিঠে আনমনে জঙ্গল ফ্ঁড়ে এগোতে থাকেন। তাঁর পেছন পেছন—আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘোড়সওয়ারের দল। ওই ব্রহানপ্রের কিল্লায় হাতায় আব্বা হ্জ্রের বাদশা-পসন্দ আমের গাছ। সে আম পাঠিয়ে আব্বা হ্জ্রের কাছে কী হেনস্থা! আগ্রার দরবারে বসে আব্বা

হুজুর যা বলেছিলেন—তার সবটাই আমাকে ঘিরে অবিশ্বাস। চিঠিতেও তিনি আমার জন্যে শুধু বিষাক্ত সন্দেহই ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেন দেবেন না? আমি তো আর বাদশা-পসন্দ শাহজাদা নই! বাদশা-পসন্দ শাহজাদা হলেন গিয়ে আমাদের বড়ে ভাই শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। এবারের কিল্লা-কান্দাহার হামলার মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার।

ঠিক এমন সময়—ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তোলা একটা শব্দ স্পষ্ট হতে থাকল। মাঝে মাঝে সে শব্দ বুজে যাচ্ছে। মানে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুর রাস্তার ধুলোয় ডুবে যাচ্ছে। শাহজাদা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের টগাবগ। তবে এ আওয়াজ ভোঁতা। রাস্তা ছেড়ে ঘোড়া এবার ঘাসে ঢাকা—লতা-পাতায় ঢাকা বুনো পথ ধরল।

একটু পরে একজন তেলেঙ্গি ঘোড়সওয়ারের মাথা দেখা গেল। এরা লম্বা চুলের ওপর সবুজ রঙের রেশমি রুমাল বাঁধে। শাহজাদার একেবারে সামনে এসে সওয়ার লাফিয়ে নামল। নেমেই আঙ্গিয়ার ভেতর থেকে একখানি বন্ধ লেফাফা বের করে শাহজাদার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কুর্নিশ করতে গিয়ে পড়ে গেল। লেফাফাখানি ঘাসের ওপর।

দু'জন ঘোড়সওয়ার নেমে তাকে তুলে ধরল। আরেকজন লেফাফাখানি শাহজাদার হাতে তুলে দিল।

আওরঙ্গজেব বুঝলেন, অনেক রাস্তা একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। তাই এই অবসন্ন দশা। ওকে ফৌজের আবদারখানায় পাঠিয়ে দিতে বলে তিনি লেফাফা-খানি খুললেন। রৌশনের চিঠি। আগ্রার ওপর দিয়ে কীরকম ফৌজ শাহজাদা দারার জন্যে লাহোর গেছে তার খুঁটিনাটি হিসেব। সাবাস রৌশন! পড়তে পড়তে শাহজাদার চোখ এক জায়গায় আটকে গেল।

ছোটে ভাই। এই হিসেব সরেজমিনে দাঁড়িয়ে যে টুকে রেখেছে—সে আমি নই। মুঘল হারেমের ঢাকা বারান্দায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকে যে টুকে রেখেছে—সে উদিপুরী—ভিনদেশি বাঁদি—তোমায় দূরে থেকে দেখে থাকবে—তোমার···।

খুঁটিনাটি হিসেবের ভেতর ঢুকে পড়লেন আওরঙ্গজেব। ১৬৮ জন সেনাপতির ভেতর ১১০ জনই মুসলমান। ঘোড়সওয়ার সত্তর হাজার। বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার ৫ হাজার। তিন হাজার তীরন্দাজ। বন্দুকধারী পদাতী দশ হাজার। হাতি ১৭০/১৮০টি। সন্ধ্যার আলোয় দেখা। কিছু ভুল হতে পারে। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার বেলদার ছ'হাজার।

তারপর শাহজাদা দারাকে দেওয়া বাদশার খেলাতের নগদ টাকার হিসেব। পড়তে পড়তে একটা যন্ত্রণা উঠে এল আওরঙ্গজেবের শরীরে। আমি শেষমেষ কিল্লা-কান্দাহারের দেওয়াল বেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। ওপরে উঠে হাতাহাতি লড়াইয়ে ইরানিদের কামানগুলো স্তব্ধ করে দিতাম। বাদশা সায় দেননি। ফিরে আসতে বলেছেন। পরাস্তের মুকুট মাথায় দিয়ে।

আর বড়ে ভাইয়ের বেলায়? কিছুরই অভাব হল না! কিছুরই অভাব রাখা হয়নি!

ফরাসি গোলন্দাজ দ্যু'পের-এর বয়স বেশি নয়। তিরিশ পঁয়ত্রিশ। শাহজাদা দারার ফৌজে এসে তিনি রীতিমত মৌজেই আছেন। যেখানে সেনা ছাউনি সেখানে অনেক কিছুই এসে জোটে। যাদুকর, ঘোড়ার বদ্যি থেকে শুরু করে নাচিয়ে মেয়ে। এই শেষের জিনিসটিতে মোটা মাইনের এই ফ্রানসিসি গোলন্দাজের খুব আগ্রহ। ছাউনি ঘিরে যেন সারা এশিয়ার মেয়েদের মেলা বসে গেছে। ফৌজের সংগী হয়ে হিন্দুস্থান থেকে ওরা এক দংগল তো এসেছেই—কিল্লা-কান্দাহার পেঁছিতে দশ ক্রোশের মাথায় মরদ-ই-কিলায় চলন্ত দিল্লির মতো বিশাল মুঘল ফৌজ তাঁবু ফেলার পরই কোত্থেকে যেন আফগান, তুর্কি, উজবেগ, আর্মানি —এমনকি কিছু ইরানি মেয়েও এসে জুটেছে। তাদের নানান ভাষার গান, নানান কিসমের তারের বাজনা, রঙে রঙে ছয়লাপ নানান পোশাক। ছাউনির সামনে খোলাখুলি চলে আসার কারও উপায় নেই। ফৌজি দারোগার হাতে পড়ে গেলে নাকালের একশেষ হতে হবে। ওরা তাই বাগ-ই-কামরানের দিককার খোলা মাঠে যে-যার সুবিধা মতো ঝুপড়ি বেঁধেছে ! সারাটা দিন যায় এইসব মেয়ের রান্নাবান্না সাজগোজে। সবে বসন্ত এসেছে। হেলমন্দের জল এখন যেন বা কাচ-স্বচ্ছ। সেখানেই চান—সেখানেই ওদের ঘরকন্না। রাতের বেলায় আলো-আঁধারিতে জায়গাটা হয়ে যায় বেহস্ত। গানে, নাচে, হৈ-হুল্লোড়ে। তখন কে আহেদি—কে সামান্য পদাতী—তার কোনও বাছবিচার থাকে না। ট্যাঁকে আশরফি থাকলে তো ফুর্তি। নয়তো নয়। গোলন্দাজ দ্যু'পের-এর ও জিনিসটির কোনও অভাব নেই।

ওলন্দাজ গোলন্দাজ হের হলস্টেল স্বভাবে দ্যু'পের-এর ঠিক উলটো। মাঝবয়সী মানুষটি দেখতে রীতিমত তরতাজা। বলা যায়—যোগী হয়ে তিনি যৌবনকে ধরে রেখেছেন। কোনও মদিরাতেই তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। যেটুকু সময় পান হলস্টেল তা কাটিয়ে দেন কামান আর গোলাবারি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে।

হিন্দুস্থানে এসে গোলন্দাজ মানুচ্চির মাথার চুলে পাক ধরেছে। তিনি মরদ-ই-কিলায় নিজের তাঁবুর হাতায় বসে সন্ধে সন্ধে আফগান-মদিরা চাখছিলেন। বাতাসে শীত চলে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস। এখনও দু'চারটে চিনার গাছের মোটা ডালে জমাট তুষার যা আছে—তা গলে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শব্দ করে পড়ে। সে শব্দ শুনতেও চমৎকার।

গোলন্দাজ বাহিনীর এই ছাউনির কাছাকাছি লোকজন কম। কেননা, ফৌজের এ-দিকটাই সবসময় কড়া পাহারায় থাকে—পাছে দুশমনের চর ঢুকে পড়ে কোনও ক্ষতি না করতে পারে। একটা জিনিস ভেবে মানুচ্চি বিশেষ চিন্তিত। কামান এসেছে ঠিকই। সেগুলো জোড়া দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু গোলা ? শাহজাদা দারা লাহোরে থাকতে পাথর কাটাই করে গোলা বানানো বন্ধ করে দেন কার পরামর্শে ? তখন ঠিক হয় কিল্লা-কান্দাহারের কাছাকাছি গিয়ে পাথর কাটাই করে গোলা বানানো যাবে। শুধু শুধু লাহোর থেকে এত

পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে—কান্দাহারের পাথর কাটাই করে গোলা বানানো শক্ত। কারণ, এখানকার পাথর বড়ই নরম। কামান দাগলে হয়তো দেখা যাবে—গোলাগুলো মাঝপথেই চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে।

এই ব্যাপারটা নিয়েই মানুচ্চি সকাল থেকে ভাবছেন। কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন? নওজওয়ান দুয়'পের যেন এখানে এসে আপেল বাগিচার ভেতর পড়ে একসঙ্গে এত আপেল দেখে দিশেহারা। কোনটা নেবে? কোনটা খাবে? কোনটা রেখে দেবে? ঠিক করতে পারছে না। এখানে আপেল বলতে ধরে নিতে হবে নানান দেশের জড়ো হওয়া নাচের গানের মেয়ের দল। দুয়'পের কামান দাগতে কিন্তু ওস্তাদ। কিন্তু ওই এক দোষ। দুবার তাঁর তাঁবু ঘুরে এসেছেন মানুচ্চি। দুয়'পের নেই। বিকেল শেষ না হতেই তিনি আপেল বাগিচায় ঢুকে পড়েছেন। আর গোলন্দাজ হলস্টেল। তিনি তো কেতাবি গোলন্দাজ। কামান নিয়ে মাথা ঘামান সারাদিন। কিন্তু কামান দাগার বেলায় বিলকুল আনপঢ়—আনাড়ি। তার ওপর ওঁর কাছে গেলেই জীবন নিয়ে কিছু কিছু নীতিকথা শুনতেই হবে।

শীত শেষের পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেই আকাশে হিন্দুস্থানের দিক থেকে যাযাবর পাখিরা ঝাঁক বেঁধে দেশে ফিরছে। হঠাৎ মানুচ্চির মনে হল—আমিও কি কোনওদিন দেশে ফিরব না? নসিব ফেরাতে একদিন তাঁর হিন্দুস্থানে আসা। নসিব ফিরে গেল। চুলে পাক ধরল। কিন্তু দেশে আর ফেরা হল না। সব বারই মনে হল—এই লড়াইটা শেষ হোক। মোহর ঝমঝমিয়ে দেশে ফিরব। কিন্তু ফেরা আর হয় না। মানুচ্চি তাঁর দাখিলাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন—দাখিলা জানে। কিছুকাল হল, হুজুর এই সময়টায় কীসব লিখে রাখেন। ওই এক বাই হয়েছে হুজুরের। একা থাকলে সন্ধেবেলা তিনি কিছু না কিছু লিখবেনই।

ময়ুরাক্ষা আর পালকের কলম এগিয়ে দিল দাখিলা। বাঁধানো খাতাখানি হাতে নিয়ে মানুচ্চি অভ্রদানি এনে দিতে ইঙ্গিত করলেন। কোনও দরকার ছিল না। মদিরা তুলে নিয়ে যাবার সময় দাখিলা আলো বসিয়ে দিয়ে গেল। মানুচ্চি শুরুতেই তারিখ দিলেন—

৪ মে, ১৬৫৩। মদর-ই-কিলা।

আজও দুয়'পের সন্ধ্যার আগেই আপেল বাগিচায় গিয়ে সেঁধিয়েছেন। নওজওয়ান মাত্রেরই সবার কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য—আওরত। এই জিনিসটি মরদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি ধরা দেবে না। কম বয়সে আমারই খুনে যখন আগুন ছুটত—তখন আমি হিন্দুস্থানের ছাউনিতে কী না করেছি! দুনিয়ার তাবত আওরত এই রহস্য দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে। কখনও সে মিষ্টি কথার আড়ত। আবার কখনও সে কঠিন, কুশ্রী কথার তোপ।

লিখতে লিখতে মানুচ্চি নিজের চোখের সামনে নিজের যৌবনকে যেন দেখতে চাইলেন। নিজের অজান্তেই তাঁর ঠোঁটে হাসি এসে গেল।

প্রায় ঠিক একই সময়ে—পাঁচ ক্রোশ উজিয়ে আরেকজন তার মুরাক্কার পাতায় পরিষ্কার নাস্তালিক ফারসিতে লিখল—

১৯ রমজান, ১০৬২ আল হিজরি। বাগ-ই-কামরান।

হামলা কান্দাহারে আমি মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার শাহজাদা মুহম্মদ দারাশুকোর তাবিনের সামান্য একটি ধূলিকণা মাত্র বলা যায় না-চিজ। কোনও জিনিস হিসাবেও গণ্য হবার যোগ্য নই। কিন্তু আমি যা দেখে যাচ্ছি—তা স্পষ্ট কথায় লিখে যাচ্ছি। আনেওয়ালা দিনে আমার এই সত্য ভাষণের বিচার হবে।

শাহজাদা দারার তাবিন থেকে কান্দাহারের হাল-হকিকত দিয়ে রোজ যে তারিখওয়ালা বয়ান জাহানাবাদে বাদশার দরবারকে পাঠানো হচ্ছে—তা মিথ্যায়—বাড়িয়ে বলায় ভর্তি। একদল আহাম্মক, দাম্ভিক, আনাড়ি শাহজাদাকে পথে বসাবে। শাহজাদার দরবারে এরা নিজেদের এক একজনকে রুস্তম বলে তুলে ধরছে। যেন কত বড় লড়াকু। তাই দেখে আসল লড়াকু জানবাজ মনসবদাররা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন। কিছুতেই মুখ খুলছেন না।

আমি মহম্মদ বদিউজ্জমান সত্যি কথা লিখে যাব।

হঠাৎ কী একটা শব্দে বদিউজ্জমান লেখা থামাতে বাধ্য হল। সে জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের জানবাজ খান-খানান মহাবত খাঁয়ের ছেলের মনসবে কাজ করে। তাঁবুর পাশ দিয়ে ঘুঙুরের শব্দ চলে গেল। তার পেছন পেছন পুরুষালি গলার আওয়াজ।

তাঁবুর চিলমন সরিয়ে বদিউজ্জমান বেরিয়ে এল। বাগ-ই-কামরান অনেকটা জায়গা জুড়ে বানানো। নানান গাছ। হুমায়ুন বাদশার ভাই কামরান বেইমানি করে কান্দাহারে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তিনিই এই বাগিচার শুরুয়াত করেন। তাঁর নামেই বাগিচার নাম। কিল্লা-কান্দাহারের তিন দিককার পরিখার গা অব্দি এই গাছগাছালি। কিল্লার বাকি দিকটা উঁচু পাহাড়।

বদিউজ্জমান অবাক হয়ে দেখল, সিকামের গাছের মাথায় চাঁদ। আর শাহজাদা দারা একটি ছায়ার পেছন পেছন ছুটে চলেছেন। ঘুঙুরের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে তার আগে আগে। অন্ধকারে আবছা জ্যোৎস্নায়।

যেমন দেখতে পেল—তেমন দেখেই চিলমন নামিয়ে বদিউজ্জমান যত তাড়াতাড়ি পারে তাঁবুর ভেতর চলে এল। একজন শাহজাদা—হোন না তিনি একটি ফৌজের সিপাহ-সালার—সব কিছুর শেষে তিনি তো শাহজাদাই—তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ফেলাও তো গুণাহ। ওই সময় বদিউজ্জমানকে কেউ দেখে থাকলে তার নালিশ-শিকায়েতের ওপর বদিউজ্জমানের পুরোদস্তুর বিচার হয়ে যেতে পারে। এসব বিচারে ইনসাফি আশা করা বৃথা।

শাহজাদা দারা আরেকটু হলেই পড়ে যেতেন। অন্ধকারে শীত শেষের পাকা পাতায় মাটি পেছল। তার ভেতর আবার বড় বড় গাছের শেকড় ঢাকা পড়ে আছে। তাতে বেধেই তিনি উলটে পড়তেন। সামলে নিয়ে তিনি এক লাফে ছায়ামূর্তির বোরখা খামচে ধরলেন।

অমনিই দারা টের পেলেন তাঁর বাঁ গালে পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দারার

গাল যেন জ্বলে উঠল। সারা হিন্দুস্থানে কেউ শাহজাদার এ-দশা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। দারা অমন জোরালো চড় খেয়েও হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আমি চলন দেখেই চিনেছি। এ তুমি না হয়ে যাও না।

—ছাড়ুন। ছেড়ে দিন শাহজাদা।

—তোমাকে এখন ছাড়ি কী করে রানা! কিন্তু এখানে তুমি এলে কী করে? লাহোর থেকে তুমি যে জাহানাবাদ রওনা হলে—

—মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি। কেন? আমি কি আপনার পোষা চিড়িয়া। যখন যে খাঁচায় রাখবেন—তখন সে খাঁচার দাঁড়ে বসে হরা মিরচা, ছোলা চিবব? ছেড়ে দিন—

হাত ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল রানাদিল। পারল না। শাহজাদা বললেন, না। তোমায় আমি ছাড়ব না। ছেড়ে দিতে পারি না।

—কেন?

—কেন! তুমি আমার শাদি-শুদা বেগম।

—ভারি আমার শাদিরে—!

দারার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। রানার মুখের ভাষা তিনি জানেন। কিন্তু কথার ওই ঝলকের সঙ্গে তিনি কখনই নিজের জীবন দিয়ে পরিচিত নন। তিনি ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণায় বোবা হয়ে পড়েছিলেন। এমনিতেই কান্দাহার, হামলার খুঁটিনাটি সামলাতে গিয়ে শাহজাদা থই পাচ্ছেন না। একটা লড়াইয়ে হাজার দিকে চোখ রাখতে হয়। এটা পাওয়া যায় তো ওটা পাওয়া যায় না। আরেকটা হয়তো এসেই পৌঁছায়নি। হামলা শুরু করার দিন যতই এগিয়ে আসছে—দারা ততই দেখতে পাচ্ছেন—অনেক কিছুই এখনও বাকি। এর ভেতর আজই খবর এসেছে।—লাহোরে রাভির বুকে নদীপথে রওনা করিয়ে দেওয়া কামানগুলোর ভেতর তিনটি আসেনি। কোথায় যেতে পারে কামান তিনটি? রাভির জলে ডুবে যায়নি তো?

আবার আজই শাহজাদা খবর পেয়েছেন—ফৌজি ছাউনি ঘিরে নানান দেশের মেয়েদের যে ঝুপড়ির বসতি বাগ-ই-কামরানের পা ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে--সেখানে তোপখানার চাঁই চাঁই মানুষজনের খুবই গতায়াত। শুনেই দারা সুস্থির থাকতে পারেননি। ব্যাপারটা তাঁকে চিন্তায় ফেলেছে। এই ঝুপড়ি নগরে ইরানি মেয়েরাও আছে। তাদের কাছে গিয়ে তোপখানার মানুষজন যদি বেঁহুশ দশায় মুঘল গোলাবারির সুলুক-সন্ধান ফাঁস করে বসে—তবে তো কিল্লা-কান্দাহারের ভেতর থানা গেড়ে বসে থাকা ইরানি ফৌজেরই পোয়া বারো।

সন্ধ্যার আঁধারে তাই তিনি হেলমন্দের তীর ঘেঁষে মেয়েদের মেলায় গিয়েছিলেন। সাধারণ এক পদাতীর জালসাজিসে। সেখানেই তিনি পেছন থেকে নাচের চলন দেখে—কথার ঝামটা শুনে—নখরা বুঝে রানাদিলকে চিনতে পারেন।

রানাদিলও কি আমাকে চিনতে পেরেছে? নয়তো আমায় দেখে ঝুপড়ির হে-

হুল্লোড় ছেড়ে বাগ-ই-কামরানের ঝুপসি আঁধারের দিকে আচমকা ছুটবে কেন? নিশ্চয় গা ঢাকা দিতে।

এখন এ-জায়গার অন্ধকার থেকে ফৌজি মানুষজন কিছুতেই তাদের সিপাহসালার কিংবা তাঁর বেগম—কাউকেই খুঁজে পাবে না।

শাহজাদা তাঁর ভেতরকার যন্ত্রণা চাপা দিতে রানার মুখখানি খুঁজলেন। অন্ধকারে দেখতে পেলেন না। শক্ত করে ধরে রাখা হাতখানি রানাদিল ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। দারা শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, কেন? আমার তোমার শাদিটা শাদি নয়?

—অমন শাদি শাহজাদারা অনেক করে থাকেন। ঘরে নাদিরা। রাস্তায় রানাদিল। আর হারেমে উদিপুরী। এর নাম শাদি?

—উদিপুরী আমার কেউ নয় রানা। একজন শাহজাদাকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। তার সংগে নাদিরার নামটা জড়ালে কেন? বেচারার ছেলেবেলা দুঃখের নওজওয়ানির দিনে নাদিরা মেহর্জাবিন মাসির দিনরাতের হাজিরা ছিল। বুঝতেই পারছ তার জীবনটা কেমন কেটেছে। কত সুখে।

—উঃ! নাদিরা। নাদিরা। নাদিরা তো শাহজাদা-বেগম। তার জন্যে লালকিল্লায় আলাদা মহল। তার জন্যে আগ্রা দুর্গে শাহী দেখাশুনো বরাদ্দ। আর আমি?

—তুমি আমার সব রানা। তুমি যেখান থেকে হেঁটে যাও—মনে হয় সেখানে গোলাপ ফুটে ওঠে। তোমার কথা ভেবে আমার সারা মন ভরে থাকে।

—চুপ করো। ওই পচা কথাগুলো আমার কানে বিষ ঢালে। যখন দেখি আগ্রার রাস্তায় নাদিরা বেগমের সুখদোলার আগু-পিছু রিসালার ঘোড়সওয়ারদের পাহারা যায়—তখন আমার কথা ভাবি শাহজাদা। আমি আপনার লুকিয়ে রাখা সোনার খাঁচার দাঁড়ে ময়নাটি হয়ে বসে আছি। আপনি মুক্তো দানাটি আমায় খুঁটে খুঁটে খাওয়াচ্ছেন। সে মুক্তোদানা গিলতে গিয়ে আমার গলায় আটকে যায়। শুধু নাদিরা বেগমের ইজ্জত আছে। সম্ভ্রম আছে। আমার কি কিছুই নেই?

—তোমার আছে এই বান্দা দারাশুকো। তোমাকে আমার ঈশ্বর মনে হয় এক একসময়। ওকথা বললে তুমি আমায় থামিয়ে দাও বলে আর বলি না। মনে মনে বলি। খোদ আল্লাতালা আমাকে তোমার মতো রত্নটি দিয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। নয়তো তোমাকে আমার পাওয়ার কথা নয়। আমি খুব খুশনসিব বলেই তোমাকে পেয়েছি রানা।

—চুপ করুন শাহজাদা। আমার জীবনই কি খুব সুখে কেটেছে!

দারা কোনও কথা না বলে রানাদিলকে নিজের বুকের ওপর নিতে গেলেন। রানাদিল এক ঝটকায় সরে গেল। গিয়ে বলল, আমিও তো একজন শাহজাদা-বেগম। কোথায় আমার সেই সম্ভ্রম? কোথায় আমার সেই ইজ্জত? সব কিছুই একা নাদিরার?

শাহজাদা দারা কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। তিনি আস্তে আস্তে

বললেন, আমি কি নাদিরাকে বে-ইজ্জত করতে পারি রানা ? সে আমার ছেলেদের মা। একজনকে ভালবাসি বলে আরেকজনকে কি টেনে নামিয়ে আনব ? তুমিই তো রানা বলে থাকো—ভালবাসার ভেতর মমতা লুকিয়ে থাকে। মমতা কি কাউকে যন্ত্রণা দেবার জিনিস ?

রানাদিল থতমত খেয়ে গেল একথায়। দূরে হেলমন্দের গা ঘেঁষা ঝুপড়ি বসতির ভেতর থেকে উঠে আসা নানান ভাষার গ্যান-বাজনা আর হৈ-হুল্লোড় একসঙ্গে মিশে গিয়ে অদ্ভুত এক আনন্দ মাখানো যন্ত্রণার ঐক্যতান কান্দাহারের সন্ধে রাতের বাতাসে ভেঙে পড়ছে। তাতে সুখ আছে। কষ্ট আছে। আহ্লাদ আছে। অপমানও আছে। সামনে কোন এক অজানা নিয়তির দিকে সবই অমোঘভাবে এগিয়ে চলেছে। এর ভেতর রইসি ফৌজি আহেদি, রিসালাদারের হো-হো করে হেসে ওঠার আওয়াজে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। রানাদিল বুঝতে পারে—কাল কী হবে—কেউ তা জানে না। সে নিজের মনের ভেতরটাও স্পষ্ট দেখতে পায় না। অগোছালো ভাবে বলে ওঠে—শাহজাদা! আপনি এমনভাবেই কথা সাজান যা আমি কাটতে পারি না। ওতরাতে পারি না। যেন আপনিই ঠিক।

দারা নিজের মনকে মনে মনে বলে ওঠেন, বাঃ! এই তো আসল রানাদিল বেরিয়ে আসছে। এই তো সেই রানা—যে সরল বালিকা—অথচ আন্দাজে দুনিয়াদার।

রানাদিল বলল, আপনি এমনভাবেই কথা বলেন—যেন সেই কথার পর আর কথা হয় না। আপনি আপনার দিকটাই দেখেন শুধু। আর সবসময়ই আপনি যে কোনও ঘটনাকে মুচড়ে নিজের ঘটনা করে নেন।

—তার মানে ?

—নিজেকে যে কোনও অবস্থার চাঁদমারি নিশানায় নিয়ে আসেন।

দারা অবাক হলেন। কে বলবে এই রানা আগ্রার মাণ্ডি এলাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছে। কথাগুলো যেন কোনও বুজুর্গের। যে কিনা এই দুনিয়ার মানে বোঝে। মুখে তিনি বললেন, এটা কি আমার দোষ ?

—না। এটা আপনার স্বভাব।

—যদি বলি এটাই স্বাভাবিক। একজন শাহজাদা যে-অবস্থাতেই পড়ুন না কেন—সব দশাই তাঁকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে শেষ অব্দি। তিনি যে শাহজাদা।

দু'জনের কেউই খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতেই পারলেন না। জায়গাটা পাথুরে হলেও হেলমন্দের রস তলায় তলায় ছড়িয়ে পড়ায় চারদিকে গাছগাছালি। পৃথিবী এখানে পথের জন্যে পাথর দিয়েছে—গাছের জন্যে মাটি! এখানে সব চেয়ে যা বেশি জন্মায়—তা রেড়ি। ডলাই দিয়ে তেল বের করে নিয়ে রেড়ির ছিবড়ে ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। শাহী হুকুমে। তাতে হাতি-ঘোড়া—কামানের গাড়ির চলতে সুবিধা। আফগানরা রেড়িকে বলে কাক্কড়। তাই রাস্তার নাম হয়ে গেছে কাক্কড়ওয়্যালি সড়ক। সেই সড়কের গায়েই বাগ-ই-কামরান। সেই সড়কের গায়েই মেয়েদের হঠাৎ গজানো সব ঝুপড়ির বসতি। সারাটা জায়গা জুড়ে আসমান থেকে এখন জ্যোৎস্না নেমে এসেছে! এখন শাহজাদা দারা রানা-

দিলকে দেখতে পাচ্ছেন। রানাদিল শাহজাদাকে।

বাতাসে ফৌজ মানুষজন আর জানোয়ারদের গন্ধ। অন্ধকারে রাজপুত ঘোড়সওয়ারদের হা-হা হাসি। তার ভেতরেই ঘোড়ার পা ঠোকার একঘেয়ে শব্দ মিশে যাচ্ছে। তার ভেতরেই রানাদিল বলল, আসমানের নীচে সবাই ইনসান। ভাব-ভালবাসা—আশিয়ানার সময় সবাইকে খোলস খুলে আগে ইনসান হতে হয়। সেখানে কেউ শাহজাদা শাহজাদী নয়।

—বাঃ। চমকার বলেছ রানা। তুমি যে কোনওদিন মক্তবে পড়নি কে সেকথা বলবে।—বলতে বলতে শাহজাদা পূর্ণ জ্যোৎস্নায় একজন পূর্ণ রমণীর দিকে তাকালেন। ঝুপড়ি নগরীতে বোধহয় হিন্দুস্থানি দেহাতিনীদের সাজ-পোশাকই উজবেগ, আর্মানি, তুর্কি, মরদদের বেশি করে টানে। একটা উঁচু পাথরে বসে পড়ে রানা তার দেহাতি ঘাগরার বাইরে ডান পা-খানি অনেকটা বের করে হাঁটু মুড়েছে। সেই পা পায়ের পাতা বড় সুন্দর লাগল শাহজাদার। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশের ভঙ্গিতে সেই পায়ের পাতার কাছে ঝুঁকে নিজের মাথা নামিয়ে আনলেন।ইচ্ছে—দুই ঠোঁট একবার ওখানে ছোঁয়াবেন।

তা বুঝতে পেরেই যেন রানাদিল পা সরিয়ে দিল।

বিফল দারা আফসোসের গলায় বললেন, তোমার মতোই তোমার পা দু'খানি বড় সুন্দর। মাটিতে হেঁটে অমন পা ময়লা করে ফেল না। মনে হয়—এই পা দু'খানি এই পৃথিবীর নয় রানা—

রানাদিল ছাউনির আশপাশে ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের তীক্ষ্ন গলা চিরে যাওয়া শব্দ করে কী একটা কথা বলল, এমন গলাতেই মেয়েরা গাল পাড়ে। তার-পর খেপে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল, আমি কি শেয়াল কুকুর? আমার সারা শরীরটাই ছিঁড়ে খাবার জিনিস হয়ে দাঁড়াল শেষে!

ধক করে শাহজাদা দারার বুকের ভেতর একখানি আস্ত পাথর যেন ঢুকে গেল। মাংস সরিয়ে। হাড় সরিয়ে। দারা যন্ত্রণায় প্রায় ক'কিয়ে উঠলেন। তোমাকে আমার ভীষণ সুন্দর লাগে রানা—আর কথা বলতে পারলেন না তিনি। গলা বুজে এসেছে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। সেখানে শুধুই জল।

—আমি কি শুধুই একটা শরীর?

—তা কেন রানা। তুমি কত সুন্দর কথা বলতে। কত সুন্দর নাচতে।

—হয়েছে। রাখুন আপনার সুন্দর সুন্দর কথা। আমি শুধুই শরীর? আমার অন্য কোনও গুণ নেই?

—একশোবার আছে। তুমি সাহসী। তেজী। নিজের জীবন দিয়ে তুমি এই হৃদয়হীন পৃথিবীকে দেখেছ।

—মনে রাখবেন শাহজাদা—এই সুন্দর শরীর দিয়েই আমি বড় হব। যত বড় হওয়া যায় ততটাই হব।

দারা বলতে চাইছিলেন—কোথায়? কোনদিকে বড় হতে চাও তুমি? বড় হওয়া মানে কী? তুমি কি মনসবদার না বাদশার দরবারে নর্তকীকবি হবে?

কিংবা উজিরে আজম ? বড় হতে গিয়ে আমার দিকে তাগদের দস্তানা ছুঁড়ে দেওয়া কেন ? আমি তো তোমায় ভালবাসি। দেখা হওয়ার পর থেকে তোমার কথা ছাড়া আর কিছুই তো আমি ভাবিনি।—কিন্তু এর একটা কথাও তিনি বলতে পারলেন না। আওরত দেখতে কত নরম। আসলে কত কঠিন। আশ্চর্য। কী হিংস্রভাবে রানা আমায় অপমান করে। অপমান করে ওর একটা তৃপ্তি হয়। তখন মুখের লাবণ্য আরও বেশি বেশি করে যেন ফেটে পড়ে। রানাকে তখন আরও সুন্দর লাগে দারার। মনে হয় কোনওদিন ওই মূর্তির কাছে যাওয়া যাবে না। ছোঁয়া যাবে না। অনেকের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওকে দূর থেকে দেখতে হবে। আবারও চোখ ভরে জল এসে গেল দারার। আবছা জ্যোৎস্নায় রানাকে তাঁর আরও সুন্দর লাগল।

—আমাকে বড় হতেই হবে। যে করে হোক বড় হব। যে কোনওদিকে। দরকার হলে আগ্রার শয়তানপুরায় বড় ঘর নেব। দোতলা কোঠি। জায়গিরদার মনসবদাররা আসবেন।

দারা মনে মনে ভাবলেন, হিন্দুস্থানে বড় হওয়া মানে তো জাহানাবাদে বাদশার মসনদে বসা। আমি যে আমার বুকের ভেতর তার চেয়েও বড় মসনদে তোমায় বসিয়েছি রানা। বুড়োপা কিন্তু আসবেই। সে তোমার শরীর নেবে।

—দরকার হলে শাহজাদা—আমি মরদের সামনে ঘাগরা খুলে বেরিয়ে আসব। দেখতে চাই কোন মরদ নিজেকে তখন সামলাতে পারে। আমি তো কোনওদিন সতীপনার ঘমণ্ড দেখাইনি শাহজাদা!

একথায় শাহজাদার মাথায় আস্ত একখানা পাথর ঢুকে গেল। তিনি যন্ত্রণায় আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

—আমি আগে নাচতাম। শরীরটা আমার কাঠবেড়ালির মতো ছিল।

—এখনও তুমি সমান সুন্দরী আছ।

—ধ্যাত! রাখুন তো ওই পচা কথাগুলো। আপনি তো আমায় কিল্লা লাহোর বলেছিলেন—রানা যা প্রাণ চায় তাই খাবে। আমি মুটিয়ে যাচ্ছিলাম। সেকথা বলতে—আপনি বললেন, আমি চাই রানা তুমি মুটিয়ে যাও। আপনি চান না আমি কাঠবেড়ালির মতোই নেচে বেড়াই।

একসঙ্গে অনেকখানি জবাব শাহজাদার মনে এসে গেল। কিন্তু একটাও তিনি বলতে পারলেন না। এই রানাদিলকেই তিনি একসময় বলতেন, রানী-হাভেলিতে সারাদিন একা থাকো। নাচলে পারো। নাচ তোমার ধর্ম রানা। তার জবাবে রানা বলেছিল—নেচে কী হবে ? যে দেখবে সে-ই তো আসার ফুরসত পায় না। দারা বলেছিলেন, খোবানি খেও না রানা। পিচফল কম খাবে। রানাদিল বলেছিল, আমি ভালবাসা পেয়েছি। এরপর যদি মুটিয়েও যাই—তাতেই বা কী! আশিয়ানা—ভালবাসা তো থেকেই যাচ্ছে শাহজাদা। শুধু শুধু শরীর নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামো।

ইদানীং কিছুকাল কান্দাহার নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে শাহজাদা দারাশুকোকে—তাই রানাদিলকে না দেখে দেখে শাহজাদার চোখে সবসময় একটা

দেখার খিদে লেগে থাকে। মনে হারাই হারাই আতঙ্ক জেগে থাকে। ভয় হয়—এই বুঝি রানাদিল অস্থির হয়ে—হতাশ হয়ে সরে যায়। তাকে দেখে অনেকেই এগিয়ে আসতে পারে। তাদের কারও সঙ্গে যদি রানার আশিয়ানা হয়ে যায়—তাহলে ? তার চেয়ে রানার মুটিয়ে যাওয়া ভাল। অনেক ভাল নাচ ভুলে যাওয়া। দারা এর আগে কখনও নাচতেন না—আশিয়ানারও একটা আতঙ্ক আছে। যে আতঙ্কে ইনসান ভাবে তার মাশুকা বেশ কিছু কম সুন্দর হয়ে যায়—যাতে কিনা আর অলি না আসে। ভালবাসা কি মানুষকে স্বার্থপর করে ?

এসব ভাবনার কোনও কথাই শাহজাদা দারা বলতে পারলেন না। তাঁর মন বলছিল—আমি এত বড় মুঘল ফৌজের সিপাহ-সালার। কত ঘোড়সওয়ার, জঙ্গি হাতি, বন্দুকচি, কামান আমার তাবিনে। আর এই খালি হাতের রানাদিলের সামনে আমি কতখানি নিরুপায়—দুর্বল—ভিখারি মাত্র।

কোনও জবাব না পেয়ে রানাদিল যেন আরও খেপে গেল। এ কী শাহজাদা ? ফের চোখে জল ? এসব আমার একদম সহ্য হয় না। এ কী মেয়েলিপনা ! বিচ্ছিরি। ভুলে যাবেন না শাহজাদা—আপনি আমার অনেক আগে বুড়ো হয়ে যাবেন। তখনও আমি এই কাঠবিড়ালিটাই থাকব কিন্তু। তখন কী হবে ?

—সময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাগদ কোনও বাদশারও নেই রানা। তবে—

—তবে ?

—কে কবে বুড়ো হয়—কেউ কি তা বলতে পারে ! —একথা বলতে বলতে শাহজাদার ভেতরে কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকল। তাঁর মনে পড়ল, এই রানাদিলই একদিন বলেছিল—আপনার মুখে তখন ভগবানের কথা শুনি—আপনি যখন নিজের মনের কথা বলতে থাকেন—তখন মনে হয় এর পর আমি আর কারও সঙ্গে মিশে সুখ পাব না। মিশতেও পারব না কোনওদিন। এই রানাদিলই একদিন বলেছিল—শাহজাদা ! আপনার গায়ের মরদানি পসিনাই আমার আতর।

আর আজ ! আজ দিনটা কীভাবে শুরু হয়েছিল মনে করার চেষ্টা করেন শাহজাদা। আজই সন্ধে সন্ধে ঝুপড়ির গা ঘেঁষে যাবার সময়—শাহজাদার হঠাৎ মনে হল—তাঁর তাবিনের সবচেয়ে সাহসী লড়াকু রুস্তম খাঁ জুজি যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই তাঁর সামনে পড়ে গিয়ে পলকে উধাও হয়ে গেলেন। আর তখনই ঝুপড়ির হাতায় রানাদিলের নাচের চলন—নখরা দেখে শাহজাদা তাকে চিনতে পারেন। পেরেই তাঁর বুক জুড়ে এ কী এক খাঁ-খাঁ দশা। ভীষণ ফাঁকা। মুখটা তেতো হয়ে গেছে। বুকের ভেতরের ভূমিকম্প বাইরে থেকে দেখা যায় না। অদৃশ্য। যার বুকে তা হয়—শুধু সে-ই সবটা বোঝে, টের পায়—একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা জেগে থাকা সারাটা মন দখল করে ফেলে।

হঠাৎ শাহজাদা দারা বলে বসেন, রুস্তম খাঁ জুজি খুব জানবাজ লড়াকু।

—শুনেছি। খুব বাহাদুর ইনসান।

দারা দেখলেন, রানার চোখ-মুখ নরম হয়ে এসেছে। তিনি নিজে একজন শাহজাদা। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। নিজেকে রুস্তমের পাশাপাশি রেখে কথা

বলতে তিনি পারছিলেন না।

—————ব কন্ঠ রানা। আমায় পারি না। আমার ভীষণ কণ্ঠ রানা।

—অন্ধকার রাতে আপনার শিবিরের সামনে ঘুরে বেরিয়েছি শাহজাদা। আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি,—আপনাকে একটু দেখার জন্যে। কেঁদেছি। কিন্তু আপনার সময় হয়নি। আপ ন শাহী তাঁবুতে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। এখন আপনার জন্যে আমার আর কোনও অপেক্ষা নেই শাহজাদা কটা দিনের কথা মনে করুন—যেদিন প্রথম আমাকে পুরোপুরি আপনার জন্যে তুলে ধরলাম—সেদিন সব হয়ে গেল—তারপর আপ ন আমায় একা একটা ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন। মনে দেখুন—একজন নাচিয়ে মেয়ের জীবনে সেদিনটি কতখানি। সেদিনের আগেরদিনও সে কুমারী ছিল। তাকে সেদিন আপনি একা রওনা করিয়ে দিলেন সঙ্গেও গেলেন না! শাহজাদা। আপনি একজন খাঁটি দুর্জন! তাই না?

—আমি সেদিন এতই ডুবে ছিলাম তোমাতে—কিছুই মাথায় আসেনি আমার।

—শাহজাদা। আপনি না একজন শাদিশুদা মানুষ। আপনি তো সব জানেন বরং সেদিন আমারই মাথায় কিছু আসেনি।

দারা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

॥ নিরানব্বই ॥

কেন মানুষ এমন করে? মানুষের ভেতরকার মানুষ এই শরীরের খোলের ভেতর ঢুকে পড়ার পর সে কি পালটে যায়? এই দেহটাই কি মানুষকে বদলে দেয়? অথচ মানুষের ভেতরকার বীজ ওখানেই লুকিয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকে। একদিন তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ তখন তার নিজের সত্তায় ফিরে আসে। রানাদিল কি পূর্ণে পৌঁছতে পারছে না? তা না হলে অমন অস্থির হয়ে ওঠে কেন? ওভাবেই বা কথা বলে কেন? আমি তো তাকে ভালবাসি। রুস্তম খাঁ জুজিই বা অমন অসময়ে ওখানে কী করছিল? আমি শাহজাদা হয়ে তার পাশে দাঁড়াই কী করে? আমি দারাশুকো।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা তাঁর শাহী তাঁবুর ভেতর বসে লিখতে লাগলেন। আজই ভোররাত থেকে কিল্লা-কান্দাহারের ওপর হামলা শুরু হবে। এখন এই সন্ধেরাতে অস্ত্রের বাতাদানের সামনে নিজেকে ভীষণ একা লাগল শাহজাদার। যুদ্ধে কোনও আনন্দ আমি পাই না। রানা আমায় আরও নিরানন্দ করে দিয়ে কাল রাতে হেলমন্দের গায়ে ঝুপড়ি-বসতিতে মিলিয়ে গেছে। তুমি আমার রানা। তুমি এভাবে চলতে পারো না আর। তুমি ফিরে এসো। আমি তোমার। শাহী হুকুমে আজ আমি কান্দাহারে। তোমার দুয়ারে আমি দাঁড়াতে পারি রানা। যে কোনও ভালবাসা—প্রার্থীমাত্রেই তো দুয়ারে থাকে। কিন্তু রুস্তম খাঁ জুজির সঙ্গে সেই দুয়ারে আমি পাশাপাশি দাঁড়াতে পারব না রানা। তুমিই কি যন্ত্রণা? সারা মন জুড়ে? তুমি কি ভালবাসা রানা?

রুস্তম খাঁ জুজি বাগ-ই-কাম্রানের দিকে না এসে কিল্লা-কান্দাহারের দিকে আরেক দিক দিয়ে এগিয়ে গেছেন। চারদিক থেকে গোলন্দাজির আওয়াজ আসছে কিল্লার ভেতর গেড়ে থাকা ইরানি গোলন্দাজেরা থেমে নেই। তারা আলোর মশাল জেবলে দিয়েই মুঘল ফৌজের জায়গা দেখে তোপ দাগছে।

রমজান মাসের শেষ হয় হয়। আজ হিজরি ১০৬২। ক'দিন হল পাচমুন্দ্রার পাহাড়ি পেরিয়ে মুঘল ফৌজ কিল্লা-কান্দাহারের চারদিকে থানা গেড়েছে। রুস্তম খাঁ জুজি জানবাজ [illegible]। আমার ভাবিনের ঐশ্বর্য। আমি তার গুণের কদরদার। কিন্তু তার পাশে গিয়ে কী করে আমি রানাদিলের দুয়ারে দাঁড়াই? নিজেকে খুবই ভুখে, নাঙ্গা, বে-কৌড়ি ভিখারি লাগতে লাগল শাহজাদার। তিনি লিখলেন—

সবব-ই-জলজল-ইত-হকিকত ই-ইসলামি দর ইন হেকল-ই-জিসমানি অন অস্ত কে উ ওয়াদিয়াত কে-[illegible] ইন পিতহান অস্ত বকামল রসিদা বাজ বা-আসল-ই-খেবস পেওয়াদাদ।--কোন মানুষ এই শরীরের খোলের ভেতর প্রবেশ করেছে। যে বীজ এখানে লুকিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে, তা একদিন পূর্ণ হবে। আবার সে সত্তায় ফিরে আসবে।

রানা তুমি ফিরে এসো। রানা তুমি পূর্ণ হও। সুন্দর হও। সুখী হও। তুমি আগ্রায় ভাসতে ভাসতে বড় হয়েছ। হিংস্র, নিষ্ঠুর দুনিয়ার স্মৃতি তোমায় অস্থির করে তোলে। আমি বুঝি। কিন্তু আমি তো সে দিনগুলোকে সুখে ভরে রঙিন করে ফিরিয়ে আনতে পারি না।

পরদিন সকালে শাহজাদার গোলন্দাজ বাহিনীর মীর-আতশ আবদুল্লা বেগ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। তিনি ফৌজের বকশিও বটে। তিনি বললেন, হজরত! আমরা যে হামলা চালাব—তার একটা শুভদিন দেখে দিতে হবে।

ভোররাত থেকে হামলা কেন শুরু হয়নি বুঝতে পারলেন দারা। শুভদিন না দেখে হামলা শুরু করতে চান না কোনও মনসবদারই। বেলা বাড়তে পাথর গরম হয়ে উঠল। সওয়ারদের ঘোড়ার দাবনা ভিজে উঠেছে। হাতিদের লড়াইয়ের জন্যে সুস্থির রাখতে ভিস্তিরা হেলমন্দ থেকে জল বয়ে আনছে। দফায় দফায় চান করাতে। কামান টানা গাড়ির ঘর্ঘর।

অবরোধ শুরু হয়ে গেল। শাহী ফৌজের মোর্চাবন্দি এক এক সারি কিল্লার এক এক দরওয়াজার সামনে থানা কায়েম করতে লাগল। একেবারে সামনে বেলদারেরা ছয় সুড়ঙ্গ খুঁড়তে লেগে গেছে। তাঁবু পড়তে লাগল। কিল্লার উত্তর-পূব দিক থেকেই মুঘল ফৌজ কিল্লা ঘিরে গেড়ে বসতে লাগল।

বাবাওয়ালি দরওয়াজার পাঁচহাজারি মনসবদার মহাবত খাঁ। ওয়েসকরনে কিলিচ খাঁ। তিনিও পাঁচ হাজারি। ওয়েসকরন আর খাজা খিজির দরওয়াজার মাঝখানটা বেছে নিলেন শাহজাদার তোপখানার মীর-আতশ মীরজাফর। খাজা খিজির দরওয়াজার মুখোমুখি বসলেন মীর-বকশি আবদুল্লা। খাজা খিজির আর মাশুরির দরওয়াজার মাঝামাঝি শাহী তোপখানার মীর-আতিশ কাসিম খাঁ। ইনি চার হাজারি। মাশুরি দরওয়াজায় পাঁচ হাজারি মীর্জা রাজা জয়সিংহ। চেহেল জিনা বুরুজে ইসলাম খাঁ। ইনি তিন হাজারি। কিল্লা-কান্দাহারের হাতায়

লাল দুর্গ ঘিরে ফেললেন বাকি খাঁ, চম্পত রায় বুন্দেলা আর সৈয়দ মীর্জার মতো মনসবদাররা।

মহম্মদ বদিউজ্জমান বসে নেই। দেখতে পাচ্ছে তাই লিখে চলেছে। পাছে হাত থেমে গিয়ে লেখা মুছে যায় তাই এক কানাত কাপড়ও তার হাতের কাছে। লিখতে লিখতে তাঁবুর হাতায় একবার তাকাল। জায়গাটা নিরিবিলিই বলা যায়। কেননা রসদ জোগানোর সারি সারি গো-গাড়িরও পেছনে তার তাঁবু। এখান থেকে সামনে তাকালেই পাহাড়। তার চোখ বিশেষ কিছু দেখছিল না। কারণ বদিউজ্জমান যেন আনেওয়ালা দিনগুলো দেখতে পাচ্ছে। ফের সে লিখতে লাগল—

কিল্লা-কান্দাহারের তিনদিকের চওড়া নালা জলে ভর্তি। কিল্লার পেছন দিকটা পাহাড়। সেদিক থেকে শাহী ফৌজ কিছুই করতে পারবে না। কোথাও কোথাও জলের নালা যদি পেরনোও যায়—তা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দেওয়াল। তবে কয়েক জায়গায় মাটি আর পাথর মিশিয়ে বানানো দশ গজি সব দেওয়াল তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ওসব দেওয়ালের কাছাকাছি যেতে হলে নালাগুলো ছেঁচে জল বের করে দিতে হবে আগে। নয়তো ওখানে পেঁছনো অসম্ভব। কালই দুপুরে শাহজাদা দারার ফতেহা জারি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় শাহজাদার মীর-সামান মোল্লা ফাজিল তাঁর লোকজন নিয়ে জল ছেঁচতে নেমে গিয়েছেন। হাজারের ওপর বেলদার এ-কাজ তুলে দেবে। তাদের ওপর হামলা আটকাতে পাহারা দেবে সৈয়দ মাসুদের সেপাইরা।

কিল্লা-কান্দাহারে ঘেরাওয়ের পয়লা দিনেই বদিউজ্জমানের তুজুকের মতো শান্ত রইল না সব। হঠাৎ একদল ইরানি সৈন্য খিজির দরওয়াজা খুলে বেরিয়ে এল। এসেই তারা হিন্দুস্থানের ফৌজকে লড়াইয়ের ডাক দিল। খাজা খাঁ তাদের জলের নালা অব্দি তেড়ে গেল। কিন্তু কিল্লার বুরুজ থেকে গুলি এসে তার ঘোড়াটিকে ধরাশায়ী করে দিল। নিজেও জখম হল খাজা খাঁ। ফেরার পথে ইরানিরা তাকে খতম করে দিচ্ছিল প্রায়। কিন্তু ওদের সর্দার চেঁচিয়ে বলল, ছিঃ! ওকে ছেড়ে দাও।

খবরটা শাহজাদার কাছে পেঁছতেই তিনি খাজা খাঁকে একটি ঘোড়া আর খাসা খেলাত বকশিশ করলেন। খাজা খাঁয়ের মনসবে দু'শো সওয়ারও বাড়িয়ে দিলেন।

কিল্লা-কান্দাহার ঘিরে ঘেরাও অবরোধ চলতেই লাগল। দিনগুলো যায় যেমন তেমন। কিন্তু রাত হলেই অন্যরকম। বেলদার-কোদালিয়াদের কাটা আড়াল সুড়ঙ্গে রাত নেমে এলেই ইরানিরা চুপি চুপি সেখানে নেমে আসতে লাগল। যাবার সময় সেপাই-কোদালিয়াদের মাথা কেটে নিয়ে যেতে লাগল ওরা। একদিন সন্ধ্যায় বেলদার দারোগা ফতে মহম্মদ চারজন লোক নিয়ে শাহী মীর-আতিশ কাসিম খাঁয়ের আড়ালে সুড়ঙ্গের মাথায় কাজ করতে গেল। পরদিন সকালে সেখানে তাদের লাশ পাওয়া গেল। কারও মুণ্ডু নেই।

পরদিন সেবল মাসের ৮ তারিখ। অল-হিজরি ১০৬২। দিনে তো বটেই—রাতের বাতাসও গরম। বেশি রাতে চাঁদ উঠে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল।

মহাবত খাঁ আর কিলিচ খাঁয়ের থানার মাঝামাঝি জায়গাটা ইরানিরা অন্ধকারে চুপিসাড়ে পেরিয়ে গেল। তিন সেপাইকে খুন করে যাবার সময় ইরানিরা চারটি ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দিয়ে বেমালুম পালিয়ে গেল।

চুরি ডাকাতিতে পাকা ওস্তাদ বুন্দেলা রাজপুতেরাও ইরানিদের আচমকা হামলা থেকে রেহাই পেল না। একদিন দুপুরে পাহাড় সিং বুন্দেলার সেপাইরা একটু ঢিলেঢালা ছিল। ইরানিরা হঠাৎ চড়াও হয়ে তাদের ষাটজনকে খতম করে দিল। ওদের তাড়া করে গেল বুন্দেলারা। কিল্লার বুরুজ থেকে কামান দেগে ইরানিরা ওদের আরও বিশজনকে ঘায়েল করল।

যতই দিন যায়—গরমে সবাই অস্থির। হাতিগুলোর ভেতর উরুতে ফোসকা পড়তে শুরু করেছে। কামানের খটাক-কলে রেড়ির তেল ঢাললে তা পলকে যেন রোদের তাতে উবে যায়।

জিলকাদের দোসরা তারিখ আর পাঁচদিনের মতোই ভোর হল। লাল হয়ে সূর্য দেখা দিল ভোর ভোর। লাখা পাহাড়ের ছোটো কিল্লা থেকে ত্রিশজন ইরানি বন্দুকচী দিনের বেলাতেই চুপচাপ পাহাড় সিং বুন্দেলা আর বাকি খাঁয়ের মোর্চার মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে এগিয়ে এল। কিছু উট আর গোরু সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। ইরানিরা এসে চারটি উট আর পাঁচটি গোরু জবাই করে গোস্ত নিয়ে পালাতে শুরু করেছিল। শাহী সেপাইরা ওদের দেখতে পেয়ে তাড়া করল। গরমে পাথর তেতে আগুন। কিল্লা থেকে আরেকদল ইরানি বেরিয়ে এল। নিজেদের লোকজনকে বাঁচাতে। দু'তরফই গুলি চালাল। দুই ইরানির লাশ পড়ে থাকল। বাকিরা হালালের গোস্ত ছাড়ল না কিন্তু। দিব্যি কিল্লায় ফিরে গেল তারা।

জিলকাদের পাঁচ তারিখ আকাশে আলো ফোটার আগেই ইজ্জত খাঁয়ের সেপাইরা ফজরের নামাজ পড়তে বসেছে। এই সময়টায় পাহাড়ের ওপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস হেলমন্দের গা ছুঁয়ে আসে। তাই চোখে মুখে ঠেকতেই আলাদা একটা আরাম লাগে। সামনে তো চড়া রোদের একটা সারাদিন পড়ে আছে। হঠাৎ তিনশোর মতো ইরানি সেপাই এসে নামাজিদের ওপর চড়াও হল। ভোর-রাতে অনেকেই খতম। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। নজর বাহাদুরের ছেলে কুতব খাঁ প্রাণপণ না লড়লে ইজ্জত খাঁ বাঁচতেন না। ইরানিরা যখন পিছু হটছে তখন মহাবত খাঁ এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই আচমকা হামলায় ইজ্জত খাঁয়ের নব্বই জন, কুতব খাঁয়ের একত্রিশ জন আর মহাবত খাঁয়ের চোদ্দোজন সেপাই খতম। ঘায়েল একত্রিশ জন।

তখনও বেলা আছে। ইজ্জত খাঁ বুঝলেন—সত্যি কথা জানলে শাহজাদার দরবারে তাঁর ইজ্জত থাকবে না। তাড়াতাড়িতে এক ফন্দি এল তাঁর মাথায়। হুকুম দিলেন—আমাদের সেপাইদের লাশ হেলমন্দে ভাসিয়ে দাও।

গোর দেওয়ার কথা। জিন্দা সেপাইরা ইজ্জত খাঁয়ের কথা শুনে তো তাজ্জব। এ কীরকম মুসলমান? কিন্তু মনের কথা মনে চেপে রেখেই তারা হুকুম তামিল করল। ইজ্জত খাঁ নিজে মহাবত খাঁয়ের কাছে গেলেন। গিয়ে একথা সে কথার পর মহাবতকে বললেন, আপনার এলাকা থেকে দুটো ইরানি লাশ নেব?

মহাবত খাঁ অবাক হলেন। তবু চোখের পলক না ফেলে বললেন, এ আর

এমন কি কিমতি চিজ। যে ক'টা আছে নিয়ে যান না।

—না। দুটো হলেই আমার আপাতত চলবে।

ইরানি লাশ দুটো এনে ইজ্জত খাঁয়ের আগুলি-সুড়ঙ্গের কাছে ফেলা হল।

এত বড় একটা ব্যাপার ঘটল। শাহজাদা নিজে এসে একবারও ঘুরে দেখে গেলেন না। এলেন উর্দুবেগী। এসে ইজ্জত খাঁয়ের মুখে সব শুনলেন। তাঁর বাহাদুরির নিশানা ইরানি লাশ দুটোও দেখলেন। তারপর খসখস করে কী লিখেই উর্দুবেগী শাহজাদার দরবারে চলে গেলেন।

বেশি রাতে শাহজাদা দারা নিজের তাঁবুতে বসে লিখাছলেন তাঁর সামনে উর্দুবেগীর সেই লেখা। সেটা পড়ে শাহজাদা লিখলেন, ইজ্জত খাঁ খুব বাহাদুর লড়াকু। সময়মত দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

শাহজাদার লেখা এই কায়দা আরজদস্ত নিশুতি রাতে ঘোড়াব পিঠে সওয়ারের সঙ্গে লাহোর রওনা হয়ে গেল। অনেক ঘোড়া বদলে তবে এই আরজদস্ত হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহানের হাতে জাহাঁনাবাদে পেঁছিবে। সেখানে দেওয়ানি খাসে বাদশার মবারকে এই আরজদস্ত তাঁকে পড়ে শোনানো হবে।

শাহজাদা দারা যে ঝুটা আরজদস্ত বাদশার সঙ্গে পাঠিয়েছেন—তা আর চাপা থাকল না। কয়েকদিন পরে কান্দাহারের শিবিরে শিবিরে এসব কথা চাউর হয়ে গেল।

মহম্মদ বদিউজ্জমান বসে থাকার পাত্র নয়। সে নিজের মতো করে সবটা লিখে রাখল। একেবারে গোড়ায় লিখল—

এই হামলার শুরুযাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল—শাহজাদা চান—কিল্লা-কান্দাহার ফতে করার তোড়জোড়ে তাবত সুনাম যেন তাঁর নিজের তাবিনের মনসবদাররা বিশেষ করে জাফর আর ইজ্জত খাঁয়ের ভাগে পড়ে। দিন যায়। রাত আসে। চারদিক থেকে কান্দাহার রোজ কে-রোজ থমথমে হয়ে উঠছে।

কান্দাহারের ভেতর কিল্লার চারদিকে পাহাড়। সেখানে পেঁছিবার জন্যে যে গুহা-পথ দিয়ে এগোতে হবে—তার মুখেই খাড়া পাহাড় রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। এই খাড়াই পাহাড়ের গা কেটে বানানো চল্লিশটা ধাপ ওপরে উঠলে একটা চাপা রাস্তা ভেতর-দুর্গে চলে গেছে। এই চল্লিশ-সিঁড়ি বাবদে পাহাড়টার নামই হয়ে গেছে চহেল-জিনা। ওপরে ওঠার শেষ ধাপে এক গুহা। গুহার ভেতর ধনুকভঙ্গী গম্বুজওয়ালা একটা ঘর। দুশমন যদি চেহেল-জিনার পাহাড়ে তোপ টেনে ওঠাতে পারে—তাহলে কান্দাহারের আশা ছেড়ে দিতে হয়। এই ঘরের দু'দিকে দুই টিলা। একটা টিলা যেন শহর কান্দাহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আরেক টিলার ঝোঁক ভেতর-কিল্লার দিকে। বাদশা শাহজাহান এই কিল্লা হারাবার আগে চেহেলজিনাকে জবরদস্ত করে পাহারার জন্যে ওই দুই টিলায় পাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন। চার বছর আগে কিল্লা কান্দাহার দখল করে ইরানের শাহ আবাস ওখান থেকেই শহরের ওপর তোপ দাগেন।

এই চেহেল-জিনা দখল করা সোজা নয়। ওখানে ঘাঁটি গেড়ে সামান্য ক'জন দুশমন খুব সহজেই বহু সেপাইয়ের ওপরে ওঠা আটকে দিতে পারে। শুধু হাতাহাতি লড়াই করেই চেহেল-জিনা কেড়ে নেওয়া।

রোজ রোদের তাত বাড়ছে। আফগান আসমানে যেন কোনও মায়া-দয়া নেই। জমিনেও তাই। এদিক সেদিক সামান্য বা গাছপালা। বেশিরভাগই পাথর। সে পাথর সারাদিনের রোদ খেয়ে তেতেই আছে। ঠাণ্ডা হতে রাত নিশুতি। শাহজাদা দারা ওপরের দিক তাকান—আর ভাবেন—আর ক'দিন বাদে ফৌজি হাতি, ঘোড়া, উটের দল পা রাখবে কোথায়? এত গরম তো হাতির সইবে না। এখন যে একটা দিনও দামি। দারা হুকুম দিলেন, হাওয়াই তোপ দাগো।

পর পর দু'রাত ধরে কয়েক হাজার হাওয়াই তোপ চেহেল-জিনার দাগা হল। শাহজাদার ধারণা ছিল—এবার ইরানিরা ওখান থেকে পালাবে। কিন্তু একজন ইরানিও পালাল না। এবার শাহজাদার তাবিনের মনসবদার জাফর এসে বললেন, হুজুরত। চুপিসাড়ে একদল পাহাড়ি সেপাই ওপরে পাঠাই?

—শুধু শুধু পাঠাব কেন? দুশমনের দল দেখুন গিয়ে মরে পড়ে আছে। অ্যাতো হাওয়াই তোপ দাগা হল—

যারা তোপ দেগেছিল সবাই মাথা পিছু বিশ তনখা করে বকশিশ পেল। তাদের মনসবদারের একশো সওয়ার বাড়িয়ে দিলেন শাহজাদা। কিন্তু ক'দিনের ভেতরেই দারা বুঝলেন, হাজার হাজার তোপ বেহুদা খরচ হয়েছে। মাঝখান থেকে লাভ হয়েছে এই—দারুণ গোলাবাজির আওয়াজে ভয় পেয়ে হেলমন্দের গা ধরে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়ি বসতির মেয়েরা পালিয়ে গেছে। দারা ভেবেই পান না—রানাদিল কোন দিকে গেল? জালালাবাদ হয়ে কাবুলের দিকে যায়নি তো! কাবুল বাজার ব্যবসাপাতির বড় জায়গা।

এবার শাহজাদা চেহেল-জিনার পুব দিককার বুরুজ নিশানা করে কয়েকটা ভারি কামান বসালেন। দারা জাফরকে কামান দাগার ভার দিলেন। ক'দিন বাদে কী হল—দারা জাফরকে সরিয়ে সে-ভার ডোগরা রাজপুত রাজা রাজরূপকে দিলেন। ব্যাপারটা জাফর ভাল মনে নিলেন না। তিনি যেন আগের চেয়ে অনেক গুটিয়ে গেলেন। তাঁর জাত-দুশমন ইজ্জত খাঁয়ের মুখে হাসি আর ধরে না।

বিশাল ফৌজ, অঢেল লোক-লশকর কামানের পর কামান—শাহজাদার যেন হিসেবের কোনও পরোয়া নেই। তিনি খোলাখুলিই বলতে লাগলেন—রাজা রাজরূপ জবরদস্ত লড়াকু। তাতে যার যার মন ভার হবার হল। দারা ওসব ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি একদিন সকালে রাজরূপের সওয়ারও এক ধাক্কায় পাঁচশো বাড়িয়ে দিলেন।

রাজরূপ পাহাড়ি লড়াইয়ে চোস্ত। ভার পেয়েই তিনি কাজে নেমে পড়েছেন। তোপ দাগার আগে পাহাড় বেয়ে ওঠা সেপাইদের নিয়ে তিনি রাতে রাতে কঠিন পাহাড়ের সুবিধার জায়গাগুলো বেছে বের করতে লাগলেন। রাজা রাজরূপের জন্মশত্রু রাজা মান গোয়ালিয়ারি। তিনিও বসে নেই। একটু একটু করে গোয়ালিয়ারি শাহজাদার কান ভারি করতে লাগলেন।

দারা অস্থির হয়ে পড়লেন। একদিকে লাগানি-ভাঙানি। আরেকদিকে লোক-লশকর লাগিয়ে চেহেল-জিনা দখল করতে গিয়ে সবকিছু হাবারার ঝুঁকি। এই দুইয়ের ভেতর পড়ে শাহজাদা দিশেহারা।

ওদিকে রাজরূপের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাঁর ছেচল্লিশজন

সেপাই পাহাড় বেয়ে উঠতে গিয়ে খতম আর ঘায়েল প্রায় দেড়শো। পাহাড় বেয়ে উঠতে গিয়েই এই দশা। কিন্তু রাজরূপের মন ভেঙে যেতে লাগল। তিনি লক্ষ করলেন, শাহজাদা তো আর আগের মতো তাঁর কদরদারি করেন না। বরং তাঁকে দেখলে শাহজাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

যা থাকে কপালে—এই ভাব দিয়ে রাজরূপ চেহেল-জিনায় হামলা করবেন ঠিক করলেন। হামলার দিনক্ষণ ঠিক করে রাজরূপ তাঁর বাঁ দিকের আর ডানদিকের মোর্চার সর্দারদের সব বললেন। এরপর শাহজাদার সায় পেতে তাঁকেও বললেন। অমনি দারার হুকুমে জ্যোতিষীরা এল। তারা ছক কষে বিচার করে জানাল—সময়টা অশুভ। কয়েক ঘড়ি পিছিয়ে হামলা করা হোক। সেইমত সব ঠিক করলেন রাজরূপ। দুপাশের সর্দারদের তৈরি থাকতে বললেন।

কিন্তু রাজরূপের ভাগ্যটা ভাল নয়। ওইদিনই শাহজাদার পেয়ারের জাফরের এক ভাই অনেকদিন রোগে ভুগে মারা গেল। দারা মত্ত করলেন—দিনটা খুবই অশুভ। তিনি হামলার হুকুম বিলকুল বাতিল করে দিলেন। রাজরূপ আর কী করেন। মোর্চায় বসে নিজের হাতের আঙুল কামড়াতে লাগলেন। তাঁর এগিয়ে যাওয়া সেপাইদের ফিরে আসতে হুকুম দিলেন। বড় হামলার আগে এগিয়ে থাকা লোকজনের এই ফেরা বড় কঠিন। পাঁচজন সেপাই খতম হল। ঘায়েল কুড়ি।

ক'দিন বাদে শাহজাদার খাস মজলিশে রাজরূপের কথা উঠতেই দারা ভীষণ রেগে গেলেন। চেঁচিয়ে বললেন, এটা একটা নিমকহারাম। বুঝদিল! রাজরূপের মোর্চা রাজা মান গোয়ালিয়ারির হাতে তুলে দাও। রাজরূপ এখন যাবে জাফরের মোর্চায়। খেদমত কাকে বলে জাফর তাকে ভালমত শেখাবে।

সবাই তোষামোদ করে চলেন না। কাজী আফজল শান্ত গলায় বললেন, রাজরূপের ওপর বে-ইনসাফি হচ্ছে। রাজা রাজরূপকে সরানো ভুল হবে।

আফজলের কথায় শাহজাদা খানিক থামলেন। এ যাত্রায় রাজরূপ দারুণ বে-ইজ্জতির হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

মাস খানেক পরে রাজরূপ জাফরের মোর্চায় বদলি হলেন। শাহজাদা শেষমেষ বদলি করেও মনে মনে বুঝলেন, রাজার ওপর বে-ইনসাফি হচ্ছে। তাঁকে পাঁচ হাজার তনখা ইনাম দিয়ে বললেন, শেষ হাজি-বুরুজের একেবারে তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যেতে পারবেন?

রাজা রাজরূপের মন ভেঙে গেছে। আগের সেই রাজরূপ আর নেই। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, হজরত। চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—যদি পারেন তো আরও পাঁচ হাজার তনখা ইনাম পাবেন।

এবার শাহজাদা দারা রাজপুত মনসবদার বল্লভ চৌহানকে হুকুম দিলেন, চেহেল-জিনা মোর্চায় যান।

বল্লভ চৌহান সিধে বললেন, আমরা ময়দানের লোক। পাহাড়ি নই। পাহাড়ের লড়াইয়ের কায়দা আমরা জানি না।

রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন শাহজাদা।—বেটা বেতমিজকে জাফরের মোর্চায় নিয়ে যাও।

চোবদার শাহজাদার হুকুম মতো বল্লভ চৌহানকে জাফরের কাছে নিয়ে চলল।

ওরা খানিক যেতে-না-যেতেই শাহজাদার রাগ পড়ে এল। তিনি ওদের ফিরতে বললেন। চৌহান শাহজাদার সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন।

শাহজাদা বললেন, আপনি দেবী সিং বুন্দেলার থানার ভার নিন। দেবী সিং যাবেন রাজা রাজরূপের জায়গায়—চেহেল-জিনা মোর্চায়।

দুপুরের চড়া রোদে খাড়াই চেহেল-জিনা পাহাড় যেন শাহজাদা দারাশুকোর দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

॥ একশো ॥

আফগান আসমানে রোদ যনই চড়া হয়ে উঠছে—নীচের পাথর, জমিন—সবই যেন ফুটতে শুরু করে দিয়েছে গরমে। মুঘল ফৌজের ভিস্তিওয়ালারা হেলমন্দ ছেঁচে জল তুলে নিয়ে গিয়েও সেই গরমের হাত থেকে কাউকে বিশেষ স্বস্তি দিতে পারছে না। না জানোয়ার—না ইনসানকে। পাহাড়ি পথ ধরে খানিক ছুটেই সওয়াররা ঘোড়াকে বসিয়ে দিচ্ছে। মুখে ফেনা উঠে আসা ঘোড়াকে কে ছোটাবে?

সারা দুনিয়া থেকে কান্দাহার যেন আলাদা হয়ে পড়েছে। সারা দুনিয়া একরকম—কান্দাহার আরেকরকম। কিল্লা ঘিরে মুঘল ফৌজের ঘেরাও দিনের বেলায় দেখার মতো। নানান জাতের ঘোড়া—তাদের বাহারি জিন-বলগা। আলিসান গম্ভীর বেহদর হাতির পাশেই অস্থির উটের কাতার থেকে এই গলা উঁচু জানোয়ারদের বুক চেরা আওয়াজ। বাবা ওয়ালিদরওয়াজার মুখোমুখি ছোট মহাবত খাঁয়ের ভারি কামানের নল কিল্লা তাক করে বসানো। মাশুলি দরওয়াজার সামনে মীর্জা রাজা জয়সিংহের রাজপুত বন্দুকচীরা আড়াল-সুড়ঙ্গে নেমে তাদের বন্দুকের লম্বা সলতে রোদে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছে। পাছে সময়মত না গায়েরই পসিনায় তা ভিজে থাকে।

যেদিকটা দেখা যাচ্ছে না—তা হল কিল্লাকে তাক করে উত্তর পুবে রুস্তম খাঁ জুজিব ফৌজ সাজানো। দুই পাহাড়ের মাঝের নাবি জায়গায় তাঁর মসনবের ধ্বজে পতাকা পত পত করে উড়ছে। এদিকটায় আসমানে তাকালেই পাহাড়ের পর পাহাড়। দিনের বেলায় সে-সব পাহাড়ের খাড়া দিকটা ধোঁয় ধোঁয়া—সুদূরে লাগে কিন্তু দুই পাহাড়ের মাঝের ঢাল জুড়ে সারাটা জায়গা গত বর্ষার জল খেয়ে ঘাসে ঢাকা। এখন অবশ্য সে-ঘাস ঘোড়ার ক্ষুরে, হাতির ধামসানো পায়ের চাপে, কামানের টানাগাড়ির চাকায় চাকায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে পাথুরে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। পশ্চিমের দিককার পাহাড় ঘেঁষে ঘোড়সওয়ারদের আস্তানা। একেবারে শেষে। আর কিল্লার মুখোমুখি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে খনকরা। তাদের ওপর কিল্লা থেকে কোনওরকমের আচমকা হামলা রুখতে পাহারা সেপাই। এই পুরো মনসবের মনসবদার রুস্তম খাঁ জুজির নিজের তাঁবু ঘোড়সওয়ারদেরও পেছনে—আরেকটা ছোট পাহাড়ের ঢালে। সেই ঢাল সিধে চলে গেছে হেলমন্দ অব্দি। বলা যায় ফাঁকা প্রান্তর। শুধু তার একটা পাশে জঙ্গি হাতিদের ঠান্ডা, সযুত রাখতে কয়েকটা গাছতলা বেছে নেওয়া হয়েছে। গাছ বলতে কান্দাহারের ওপর দিয়ে জালালাবাদ ছুঁয়ে যেসব ইরানি তুরানি বণিক-ব্যাপারী যুগের পর যুগ যাতায়াত

করে—সময়ে সময়ে তাদেরই লাগানো ছায়া ধরা সব গাছ—ঝাঁকড়া মতো। তাদের ফল খেয়ে খেয়ে পাখিরাও আমের গাছের গজিয়ে ওঠার কারণ হয়েছে। যেমন আর কি হয়ে থাকে আকাশের নীচে মাটিতে।

সেই আকাশে এখন এই আফগানি প্রান্তরে রোদ উঠি উঠি। পশ্চিমের পাহাড়টার পেছন থেকে লাল চেলি হয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। গাছতলায় আবছা আঁধারে হাতিরা মগ্ন চোখে ভোরের জলখাবারে ব্যস্ত। তার ভেতর দেখা গেল—দুটি যেন হলদে তীর হয়ে অসম্ভব বেগে দুটো আরবি ঘোড়া ছুটে গেল। প্রান্তরের পূব থেকে পশ্চিমে।

ডানদিকের ঘোড়ার নওজওয়ান মনসবদার রুস্তম খাঁ জুজি—বহু কষ্টে তাঁর পাশের ঘোড়ার সওয়ারকে ডান হাত প্রায় বুকে নিয়ে নিজের কোলে তুলে নিলেন। তাঁর বাঁ হাতে ঘোড়ার বলগা। হাতিদের ভৈ আর মেঠের দল আতংকে তাদের চোখ প্রায় বুজে ফেলল।

সওয়ার তুলে নেওয়া ঘোড়াটা অন্ধের মতো একটা গাছের মোটা গুঁড়িতে গিয়ে সিধে মাথা ঠুকে গিয়ে ছিটকে পড়ল। অমন ছুটন্ত জানোয়ার ওই বেগে গিয়ে হলুদ রেণু রেণু ফুল ছড়ানো মোটা গুঁড়ির বারিষ গাছটায় গিয়ে ধাক্কা খেয়েই শূন্যে চার পা তুলে চেঁচিয়ে উঠল মরণ-যন্ত্রণায়। একেবারে বুক থেকে উঠে আসা চিৎকারে ভোরবেলার আবছা অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। নিজের ঘোড়া আরও খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে শান্ত করে তবে রুস্তম খাঁ জুজি বারিষ গাছতলায় এলেন। ততক্ষণে তাঁর ডাকাবুকো দু'চারজন আহেদিও ছুটে এসেছে। ঘোড়ায় বসেই মনসবদার বললেন, পাগল হয়ে গেছে! খতম করে দাও—তারপরই যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটলেন রুস্তম খাঁ।

এতক্ষণে যেন রানাদিল দম পেল। সে বলে উঠল, তাই বলে খতম করতে বললে—?

—না বলে উপায় নেই। নয়তো ভীষণ যন্ত্রণা পাবে জানোয়ারটা—

রুস্তম খাঁয়ের কথার ভেতর ফটফট করে পর পর দুটো গুলির আওয়াজ। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে রুস্তমের কোলে রানাদিলের আধখানা পায়ের দিকটা ঘাগরা সমেত ঘোড়ার পিঠে ঝুলছে। গুলির আওয়াজে রানাদিল চোখ বুজে ফেলল। ও তোমায় কতদিন পিঠে নিয়ে ছুটেছে—

—তা ছুটেছে রানা। কিন্তু আজ তোমায় ও আরেকটু হলে সাবাড় করে দিত।

—দিলে বেশ হত! কেন তুমি আমায় ওর পিঠ থেকে তুলে নিলে?

—ও কথা বলতে নেই রানা। —কথা বলতে বলতেই খুব অনায়াসে ঘোড়া থেকে নামলেন রুস্তম খাঁ। নামার সঙ্গে সঙ্গে রানাদিলকেও প্রায় বুকে করে নিলেন।

মাটিতে নেমেই রানাদিল নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। নিয়ে বলল, এবার আমি চলে যাব।

—না। আমি তোমায় যেতে দেব না। মোটে এই ক'দিনে তুমি যা আমায় দিয়েছ রানা—

—আঃ! চুপ করো। আমি শাহজাদা দারাশুকো—তোমাদের সিপাহ-

সালারের শাদিশদো বেগম। —বলতে বলতে রানাদিল দেখল—দূরে দাঁড়ানো রুস্তমের ঘোড়া চড়া রোদে অস্থির [illegible] মাথা নামাচ্ছে—ওঠাচ্ছে।

—তুমি আমার রানা।

—সে হয় না রুস্তম। এই হিন্দুস্থানে বসে তুমি যেসব কথা বলছ তা যদি শাহজাদার কানে যায়—নেহাত আমি তুমি নাচনেওয়ালির জালসাজিসে তোমার সঙ্গে ঘুরছি-ফিরছি—তাই কেউ চিনে ফেলে আমাদের কথা পাঁচ কান করতে পারছে না—নইলে এসব যদি উনি জানতে পারতেন—তাহলে—

—তাহলে কী?

—তোমার মাথাটি হারাতে হত।

—আমি রানা স্মারনা থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলাম কয়েকজন বণিকের সঙ্গে। আলেপ্পো হয়ে। নেহাত বালক ছিলাম তখন। বড় হলাম হিন্দুস্থানে। নিজের শক্তিতে—সাহসে শাহী ফৌজে মাত্র একুশ বছর বয়সে আহেদি হয়েছিলাম। তারপর তো মনসবদার।

—জান রুস্তম। শাহজাদাও বলেছেন—তুমি জানবাজ লড়াকু।

—চলো। আমরা পালিয়ে যাই।

—এতসব ফেলে?

—হ্যাঁ। তুমি তো আছ। তোমায় তো পাব রানা। এই ফাঁপা মনসবি দিয়ে কী হবে!

—কোথায় পালাবে।

—এত বড় হিন্দুস্থানে আমাদের জায়গা হবে না?

—না। শাহী কাসিদরা ঠিক খুঁজে বের করবে রুস্তম।

—এত বড় দুনিয়া রয়েছে রানা। কোথাও নিশ্চয় জায়গা হবে আমাদের। আমি ফের নসিব ফেরানোর লড়াইয়ে নামব। তুমি পাশে থাকবে রানা।

—যেখানেই আমায় নিয়ে যাবে রুস্তম—মুঘল শাহীর পহেলা শাহজাদা সেখানে পৌঁছে যাবেন। —বলতে বলতে রানা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না—কেন তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। এ-জল কেন আমার চোখে? আমি কী তাহলে দু'জন রানাদিল? আমার মন নতুন নতুন জয় করার মানুষ খুঁজে ফেরে। আমার আরেক মন কোনও গোটানো পাপড়ির ফুল-বীজে গিয়ে চুপ করে কোমল-নরমে তার ভেতরকার ভীরু ভালবাসায় ডুবে যায়।

—তাঁর সঙ্গে আমি লড়াই দেব রানা। আমি রুস্তম খাঁ জুজি।

—ভুলে যেও না রুস্তম। তিনিও শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। তাঁর পিছনে মুঘল শাহীর তাবত ফৌজ।

—লোকটা মেয়েলি। এতখানি বয়স হল। আওরতপনাহ যায়নি আজও। বুড়ো। ও বুড়োর সংগে তোমায় থাকতে হবে না। তুমি চলে এসো রানা—বলতে বলতে দু'হাত উঁচু করে রুস্তম খাঁ রানাদিলের দিকে তুলে ধরলেন।

—তোমার বয়স কত হল রুস্তম খাঁ জুজি?

রানাদিলের গলার স্বরে কেমন খটকা লাগল রুস্তমের। তবু তিনি বললেন, একত্রিশ।

—তোমার চেয়ে বেশি বড় তো নন। বছর সাত আটের। মেয়েলি বলেও তাঁকে আমার মনে হয়নি। কেতা-সহবত মেনে চলা মানুষ তো খুব চেঁচামেচি—হাম্বিতাম্বি করতে পারেন না। তাঁদের সহবতে আটকায়।

—ডরপোক। ভীরু! ভীষণ ভীরু।

—তিনি এখানে নেই। তাঁর সামনেই তোমার এসব বলা ভাল।

রানাদিলের কথা শুনতে শুনতে রুস্তম খাঁয়ের বুকের ভেতরটা গুমগুম করে উঠছিল। রানা পাশে থাকলে আমার এত সাহস, এত জোর আসে কোত্থেকে? আর যেই ভাবি—সে আমার পাশে নেই—অমনি মনে হয়—আমার কিছু নেই। মাত্র এ ক'দিনেই? রুস্তম খাঁ বললেন, শাহজাদার সামনাসামনি ওসব কথা বলার মানে একটাই রানা।

রানাদিল রুস্তমের চোখে তাকাল। কী?

—হয় তাঁর সঙ্গে সিধে লড়তে হয়—খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

—সাহসী, ইজ্জতদার ইনসান তো তাই-ই করে থাকেন রুস্তম।

—তার মানে নিজের শেষদিনকে ডেকে আনা। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি—আর অমনি রাজপুত আহেদিরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

—তুমি জানবাজ লড়াকু। লড়াই দেবে।

—আল্লাতালার দেওয়া এই প্রাণটুকু হারাতে হবে তাহলে।

—ওঃ! তাহলে জানবাজেরও ডর আছে! জানের জন্যে ডর। তাহলে কে ডরপোক রুস্তম?

থতমত খেয়ে গেলেন রুস্তম খাঁ জুজি। বললেন, জান পরোয়া ইনসান সবাই রানা।

—জান-পরোয়া? বল—ডরপোক!

—হ্যাঁ। আমিও ডরপোক।

—তাই বল।

—হ্যাঁ। তাই বলছি রানা। হয় তাঁর সঙ্গে সিধে লড়ে জিততে হয়। নয়তো তাঁর হাতে মরতে হয়।

—হ্যাঁ। তাই-ই তো। জীবনও তো এসপার—নয়তো উসপার। একথা সত্যি আমি তাঁর কাছে বড় অবহেলা পেয়েছি।

—তিনি তোমার কিমত বোঝেননি। তোমার কদর করেননি। সে বুদ্ধি শাহজাদা দারার নেই। সারাদিন হাজি, যাদুকর, ফকির নিয়ে মেতে আছেন।

—এখানেও?

—হ্যাঁ। তাঁর তাম্বুতে জিন—'দেও' নামানোর হাজির কেরামতি চলছে খবর পাই।

—তোমায় তো তিনি ইজ্জত দিয়ে থাকেন। তোমার সিপাহ-সালার তিনি। তাঁকে তুমি বল না কেন রুস্তম?

ওকথায় গেলেনই না রুস্তম। তিনি বললেন, আমি তোমার কদরদার। আমি তোমার কিমত বুঝি রানাদিল। তুমি মাত্র এ ক'দিনে আমাকে কী দিয়েছ আমি

জানি না। তোমার পায়ের ঘুঙুর—নাচের ভাও আমায় অন্যরকম করে দিয়েছে রানা। তোমার কিমত আমিই দিতে পারি। তুমি চলে এসো রানা। —বলতে বলতে ফের তাঁর দু'খানি হাত রুস্তম রানার দিকে তুলে ধরলেন।

সেদিকে না তাকিয়েই যেন খুব মন দিয়ে তাঁবুর উদুর মোটা খুঁটির গুঁড়ি দেখতে দেখতে রানাদিল বলল, শাহজাদাকে তুমিই বলতে পার রুস্তম—

আপনা আপনিই রুস্তম খাঁয়ের বাড়িয়ে দেওয়া দু'হাত ফের নিজের জায়গায় ফিরে এল। কোনও কথা না বলে তিনি সিধে রানাদিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। কোনওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রানার ঠোঁট দু'খানি নিজের ঠোঁটে আগাগোড়া দখল করে শ্বাসে, গন্ধে ভরাট করে ফেললেন রুস্তম। অনেকক্ষণ ধরে। রানাদিলও পিছিয়ে থাকল না। দু'জন দুজনকে সমানে সমানে অধিকার করে ফেলছিল।

রুস্তম খাঁয়ের একটু আগেই মনে হচ্ছিল—আমি সর্বস্ব হারিয়েছি। তাই তাঁর এগিয়ে দেওয়া হাত দু'খানি হতাশ হয়ে নিজের নিজের জায়গায় ঝুলে পড়েছিল। এখন নিজের বুকে রানার বুকের ওঠাপড়া শুষে নিতে নিতে তোলপাড় দশায় রুস্তম খাঁয়ের মনে হল, আমি হারাইনি। হারাইনি। রানাদিল আমার। শুধু আমার। সে শুধু আমাকেই ভালবাসে।

ঠিক তখনই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানাদিল বলল, তুমিই শাহজাদাকে বলতে পার—এটা লড়াই। হাজির কেরামতি নয়। একমাত্র তুমিই পার।

রানাদিলের একথায় রুস্তম খাঁয়ের সব গুলিয়ে গেল। তিনি বুঝতেই পারছেন না, রানা আসলে কার? নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, রানা! তুমি কে? তুমি কার?

রুস্তমের মগ্ন চোখে তাকিয়ে রানা বলল, এটা লড়াই—এটা জেতার লড়াই।

—এ লড়াইয়ে জয় তোমাদের হবে না রানা।

—তুমি বলছ রুস্তম?

—হ্যাঁ। আমি বলছি। জাহানাবাদে বাদশার মবারকে জং-কি-ময়দান থেকে যেসব খবর—আরজদস্ত পাঠানো হচ্ছে—বাহাদুরির খবর—সে সবই ঝুটা।

—ঝুটা?

—হ্যাঁ। ঝুটা।

—শাহজাদা জানেন?

—না। শাহজাদাকে বোঝাচ্ছে সব মতলববাজ—না-লায়েক সব ছুপা রুস্তম! —তাদের বাহাদুরির বানানো সব কহানি। আর সেসব কহানি জরুরি ডাকে কাবুল লাহোর হয়ে জাহানাবাদে পৌঁছচ্ছে। মিছে বাহাদুরির ওপর শাহজাদা খেলাত দিচ্ছেন। বকশিস করছেন। সওয়ার বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এ লড়াইয়ে জয়ের মুখ দেখব না আমরা। দেখতে পারি না রানাদিল।—এ কী? কোথায় চললে? কোথায় যাচ্ছ রানা?

—লাহোরে ফিরে যাব।

—কী করে যাবে। যেও না। সারাটা রাস্তার বাঁকে বাঁকে তোমার জন্যে সব বাঘ ওৎ পেতে বসে আছে! ফৌজের ফেরারি সেপাইরা গুলি খাওয়া শের বলতে পার। তারা তোমায় দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না।

—বলছ। তাহলে আমাকে দেখলে মরদদের একটা টান হয়?

—হ্যাঁ। যেও না রানা। থাকো। আমি তোমার কিমত বুঝি। আমি তোমার কদরদার। এভাবে কেন বেঘোরে জানটা হারাবে? আমি তোমায় মাথায় করে রাখব। তোমায় অবহেলা করার মতো বোকা আমি নই। আমি দিল আর জান দিয়ে তোমায় চাই।

—এই তো এ ক'দিন রাখলে। কী সুন্দর কাটল আমাদের। এবার যাই—।

যাই কথাটা যেন সারা প্রান্তর জুড়ে গড়িয়ে গেল। রুস্তম খাঁ জুজি একজন ইজ্জতদার মনসবদার। জং-কি-ময়দানেও শাহী মনসবদার আড়াল-আবডালের পরোয়া না করে নাচনেওয়ালি—গানেওয়ালি রেখে থাকেন। এই অবস্থায় সারাটা হামলায় রানাদিল রুস্তম খাঁয়ের শিবিকার সঙ্গিনী হয়ে থাকলেও কোনও অসুবিধে ছিল না। রানার মুখের 'যাই' কথাটি রুস্তমের বুকের ভেতর সব খাঁ-খাঁ করে দিল পলকে। রুস্তম বললেন, যাবেই?

—হ্যাঁ রুস্তম।

—তাহলে তোমার সঙ্গে চারজন ঘোড়সওয়ার দিই। তারা তোমায় লাহোর অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসুক।

—না। তার দরকার নেই। ভুলে যেও না—আমি আগ্রার রাস্তায় ভাসতে ভাসতে বড় হয়েছি। সারাটা রাস্তাই তো রসদ জোগানদার বনজারা চৌধুরীদের পাব। তুমি বরং আমায় একটা জিনিস দাও।

—তোমাকে আমার না দেবার কিছুই নেই রানা। একবার মুখ ফুটে বলো।

—একটা টগবগে তুর্কি ঘোড়া দাও আমায়। দিব্যি তার পিঠে চড়ে চলে যাব।

—ব্যস। আর কিছু নয়?

—ওতেই হবে।

সকালটা খানিকক্ষণের ভেতর সিসে হয়ে জ্বলতে লাগল। তার ভেতর রানাদিল যখন মনসবি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে পাকা সওয়ারের কায়দায় রুস্তমের দেওয়া বাছাই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল—তখন তাকে চেনাই যায় না। ঝোলানো আঙরাখার নীচে ঘাগরাটি এমন করেই পাকিয়ে নিয়েছে রানা—মাথায় পরচুলাটি এঁটে বসেছে কান ঢেকে—দেখে যে কেউ বলবে কাঁচা বয়সের তুখোড় কোনও আহেদি।

মনসবদার রুস্তম খাঁ জুজি তাঁর তাঁবুর হাতায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—স্বপ্নের মতো তাঁর ক'দিনের সঙ্গিনী তুর্কি ঘোড়াটার পিঠে দূরে চলে যাচ্ছে। গাছতলায় গাছতলায় হাতিরা তখনও তাদের জলখাবার খাওয়ায় বিভোর। পদাতীরা কুচ করে চলেছে। এবার ওরা সুড়ঙ্গ খোঁড়ায় ব্যস্ত খনকদলের সামনে পাহারা বদলাবে।

দূরে পশ্চিমি পাহাড়টার তেরছা হয়ে পড়া ছায়ার ভেতর রানাদিল বলগা টেনে রুস্তমের দিকে কয়েক পলকের জন্যে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। তার চোখের সামনে কিল্লা কান্দাহার সামান বুরুজ। সব কিছু বিফল করে দেওয়ার মতো খাড়াই পাথুরে দেওয়াল। রানাদিল দেখল, আকাশে ছায়া দেবার মতো কোনও মেঘ নেই। এতদূর থেকে রুস্তমের চোখ দুটি আলাদা করে দেখা যায় না। অবয়বে তিনি এখন আভাস মাত্র।

সব কিছু একসঙ্গে দেখতে পেয়ে রুস্তম খাঁয়ের মনে হল, এ লড়াই বৃথা। এর কোনও মানে নেই। ফাঁকা। ফাঁকা। তার চেয়ে অনেক বেশি করে মন ভরাট হয়ে যায় একটি জিনিসে—যখন রানাদিলকে বুকে চেপে তার বুকের ওঠাপড়া নিজের বুকে টের পাওয়া যায়। তার নিঃশ্বাসের গন্ধে মনে হয় সারাটা দুনিয়াই বুঝি এমন খুশবুদার। দূরে কোথায় গোলা ফাটল। রুস্তম খাঁয়ের সুগন্ধী ভাবনা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল।

ততক্ষণে সেই জাল আহেদিকে নিয়ে তুর্কি ঘোড়াটা মিলিয়ে গেছে।

এমনি করে ঘোড়া দাবড়ানোর রানাদিলের হাতেখড়ি শাহজাদা দারাশুকোর কাছে। সাবেক রাজধানী আগ্রায়। যমুনার চরে। রানি-হাভেলির পেছনে। রানা যতই এগোয় ততই তার মনে হয়, সব ইনসানই এই দুনিয়ায় আলাদা আলাদা কিসমের হয়ে থাকে। কেউ লড়াইয়ের কথা ভাবে। কেউ বা ভাবে দখলের কথা। একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ নিজের করে পেতে চায়। সাজাতে চায়। আমি আর রুস্তম এ ক'দিন দু'জনে দুজন বিভোর হয়ে ছিলাম।

রানাদিল যাবে মুলতান। সেখান থেকে লাহোর। তারপর সে হিন্দুস্থানের ভেতর হারিয়ে যেতে চায়। তার উলটোদিকে থেকে রসদ নিয়ে বনজারাদের গো-গাড়ি চলেছে—সারি সারি। পথ না পেয়ে রানাদিলকে মাঝে মাঝে নেমে পড়তে হচ্ছে সেই সারির ভেতর। কত মানুষের ঘাম, হাড়ভাঙা খাটুনি। তারপরেও নাকি এ লড়াই জয়ের মুখ দেখবে না। সবই বিফল?

হঠাৎ রানাদিল তার ঘোড়ার মুখ ফেরাল। সূর্য এখন মাথার ওপর। মুখের কষ বেয়ে ঘোড়ার ফেনা। একবার ভাবল, থামি। নাঃ! যতটা পারি ফিরে যাই। দিনে দিনে। এত মানুষের এত কষ্টের পরেও? শাহজাদা! এটা লড়াই। এটা যুদ্ধ। আপনি কী করে ফকিরদের কেরামতিতে ভুলে আছেন? ডুবে আছেন? মরদ বিভোর হয় দখলে। আওরতে। লড়াইয়ে। আপনি তো কামিল-ইনসান। পূর্ণ মানুষ। তাই তো আপনি মনে করেন। সেজন্যই ঈশ্বরে বিভোর। তাহলে?

বাইরে সারা কান্দাহার দুপুরের রোদে ঝাঁ ঝাঁ দশা। কিন্তু তাঁবুর ভেতর শাহজাদা দারা ছায়া করে আসা ঠাণ্ডায় এক যোগীর মুখোমুখি বসে এখন। তিনি যেন গোলা, বারুদ, লোক-লশকর তোপখানার ওপর আর ভরসা করতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছে—অলৌকিক কিছু ঘটে যাক—যাতে কিল্লা-কান্দাহার ফতে করে তিনি জয়ের মুকুট মাথায় দিয়ে জাহানাবাদ ফিরে যেতে পারেন।

লাহোর থেকে কান্দাহার রওনা হওয়ার সময়েই মুঘল ফৌজির সঙ্গে রয়েছেন মোল্লারা। তাঁরা জয়ের প্রার্থনা জানিয়ে সারাটা রাস্তা আগাগোড়া দোয়া-দরুদ পড়ে আসছেন। যাতে কিনা আল্লাতালা নিজেই মুঘল ফৌজকে কান্দাহারে জয়ী করেন।

তুকতাক মন্ত্র-তন্ত্র জানা ওঝারাও সঙ্গী হয়েছে মুঘল ফৌজের। এদের ভেতর এই যোগীকে অনেক খাতির তোয়াজ করে সঙ্গে এনেছেন শাহজাদা দারা। সতেরো হাজার হাওয়াই তোপ দেগেও যখন কিল্লা কান্দাহারের দেওয়াল এতটুকু ধসানো গেল না। তিনি উদগ্রীব হয়ে যোগীর কাছাকাছি আরও এগিয়ে এলেন। বললেন, বাবা ইন্দ্রগীর! আপনি যে বলেছিলেন—আপনি চাল্লিশটি

'দেও'-র মালিক। ওরা আপনার হুকুমে ওঠে বসে। তা এবার ওদের ডেকে কিল্লার দেওয়াল ভাঙার হুকুম দিন।

কান্দাহারের বিরাট দুর্গ-প্রাকার দেখে শাহজাদার সাত দিনে কিল্লা ফতে করার স্বপ্ন খান খান হয়ে গেছে। তোপ দেগেও দেওয়াল ধসাতে অনেক সময় যাবে। তার চেয়ে—

শাহজাদা দারার অনুরোধ মানেই হুকুম। সে হুকুমে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না ইন্দ্রগীর। গায়ের তাপিমারা খিরকার ঢোলা হাতা দিয়ে কপালে ঝুলে পড়া জটা পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। কোমর থেকে কম্বল নামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রগীর সিধে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে চিলম্-চিমটে নিয়ে সোজা কিল্লা-কান্দাহারের গায়ে জল ভর্তি নালার সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

কিল্লার সামান-বুরুজ থেকে ইরানি পাহারা হাঁক দিল, কৌন হ্যায়? জটা-কম্বলে ঢাকা মানুষটার সাহস দেখে ইরানিরা তো থ। ব্যাপারটি কী জানতেই তারা চেঁচিয়ে হাঁক দিল। না-হলে গুলির নিশানা না-হয়ে ইন্দ্রগীরের অতটা এগিয়ে যাওয়া হত না।

ইরানি পাহারাকে কিছুমাত্র সমীহ না করে ইন্দ্রগীর জবাব দিলেন, আমি শাহজাদার পিয়ারের লোক। এই কেল্লার ভেতরে গিয়ে বুরুজের ওপর উঠে বসে এক ছিলিম তামাক টানব।

ইরানি পাহারা পথ ছেড়ে দিল। যোগী ইন্দ্রগীর ভেতরে ঢুকলেন।

তারপর আর কোনও সাড়া নেই। একদিন গেল। শাহজাদা দারা হয়তো স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—ইন্দ্রগীরের চল্লিশ 'দেও' কান্দাহারের দেওয়াল ভাঙছে।

একদিন খুব ভোরে শাহজাদা তাঁবুর বাইরে এসে দেখলেন, কিল্লা পাহারার চারজন ইরানি সেপাই পালিয়ে আসতে গিয়ে মুঘল ফৌজের হাতে ধরা পড়েছে। শাহজাদা ওদের বাঁধন খুলে দিতে হুকুম করলেন।

ছাড়া পেয়ে এক ইরানি সেপাই জানাল, যোগী বাবাকে কিল্লার সর্দারের সামনে হাজির করা হয়। যোগীর কথা মতো তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিল্লার সব জায়গা দেখানো হয়। বুরুজের ওপর বসে তাঁকে তামাক খেতেও দেওয়া হয়েছিল। দিনগুলো সেখানে তাঁর ভালই যাচ্ছিল। হররোজ এক সুরাই শিরাজি আর দো-বেলা ইরানি কোপ্তা।

কী যে বদ-খেয়াল চাপল যোগীবাবার। তিনি মুঘল শিবিরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাতেই কিল্লার সর্দারের সন্দেহ হল—হয়তো যোগীবাবা মুঘল ফৌজের কাসিদ—গুপ্তচর।

সর্দারের হুকুমে যোগীবাবার হাত-পা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাঁকে শিকঞ্জা দেওয়া হল। তক্তাচিপায় যন্ত্রণায় অধীর হয়ে যোগীবাবা হুড়হুড় করে সব স্বীকার করলেন।

তাঁর শাস্তি হল—ভিস্তিতে জল ভরে আখা দুর্গে সারাদিন জল তোলো। জল তুলতে তুলতে যোগীবাবার শিরদাঁড়া বেঁকে যাবার দশা।

শুনতে শুনতে শাহজাদার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সবার সামনেই তিনি তা মুছলেন।

সন্ন্যাসী-ফকিরের কেরামতিতে ইরানিদেরও বিশ্বাস কারও চেয়ে কম নয়। পালিয়ে আসা ইরানি সেপাই বলল, ইরানের সর্দার যোগীবাবাকে ডেকে বললেন যাদু করে হিন্দুস্থানি ফৌজকে যদি কান্দাহার থেকে ভাগিয়ে দিতে পার তো তোমায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—হুজরত। কী আর বলব। ইরানিরা বড় কঠিন মানুষ। ক'দিন পরে যোগীবাবাকে জামরুদশাহী পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যোগীবাবা সাবাড়।

শুনতে শুনতে শব্দ করে শাহজাদা দারা দু'হাতে নিজের দুই চোখ ঢেকে ফেললেন। তিনি যেন এতক্ষণ সব দেখতে পাচ্ছিলেন। এক ছুটে তিনি তাঁর শাহী লাল তাঁবুর ভেতর ছুটে এলেন।

বাইরে ভোবের কান্দাহার। ভেতরে বিশাল এক হেরে যাওয়া যেন তাঁবু জুড়ে অন্ধকাব সেজে আছে। শাহজাদা জানেন—এখন যদি আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াই তো আমার দিকে তাকিয়ে কিল্লার জবরদস্ত পাথুরে দেওয়াল নিঃশব্দে হাসবে। এই কিল্লা আমার আব্বা হুজুর হিন্দুস্থানের শাহেনশা শাহজাহান বাদশার চোখের বালি। বারবাব চারবার। হিন্দুস্থানের ফৌজ এসে এই কিল্লা-কান্দাহারের দুয়ারে এসে মাথা খুঁড়ল। তবু দুর্গ আজও উদ্ধার হয়নি।

বাইরে পাহাড়ে পাহাড়ে—পাহাড়ের কোলে কোলে ফৌজ, কামান, জানোয়ার মোতায়েন। তবু কিল্লা-কান্দাহার টলেনি। আমি কি লড়াই করতে এসে আল্লাতালার কাছ থেকে দূরে সরে যাইনি?

সেই লড়াইয়ের এই পরিণাম।

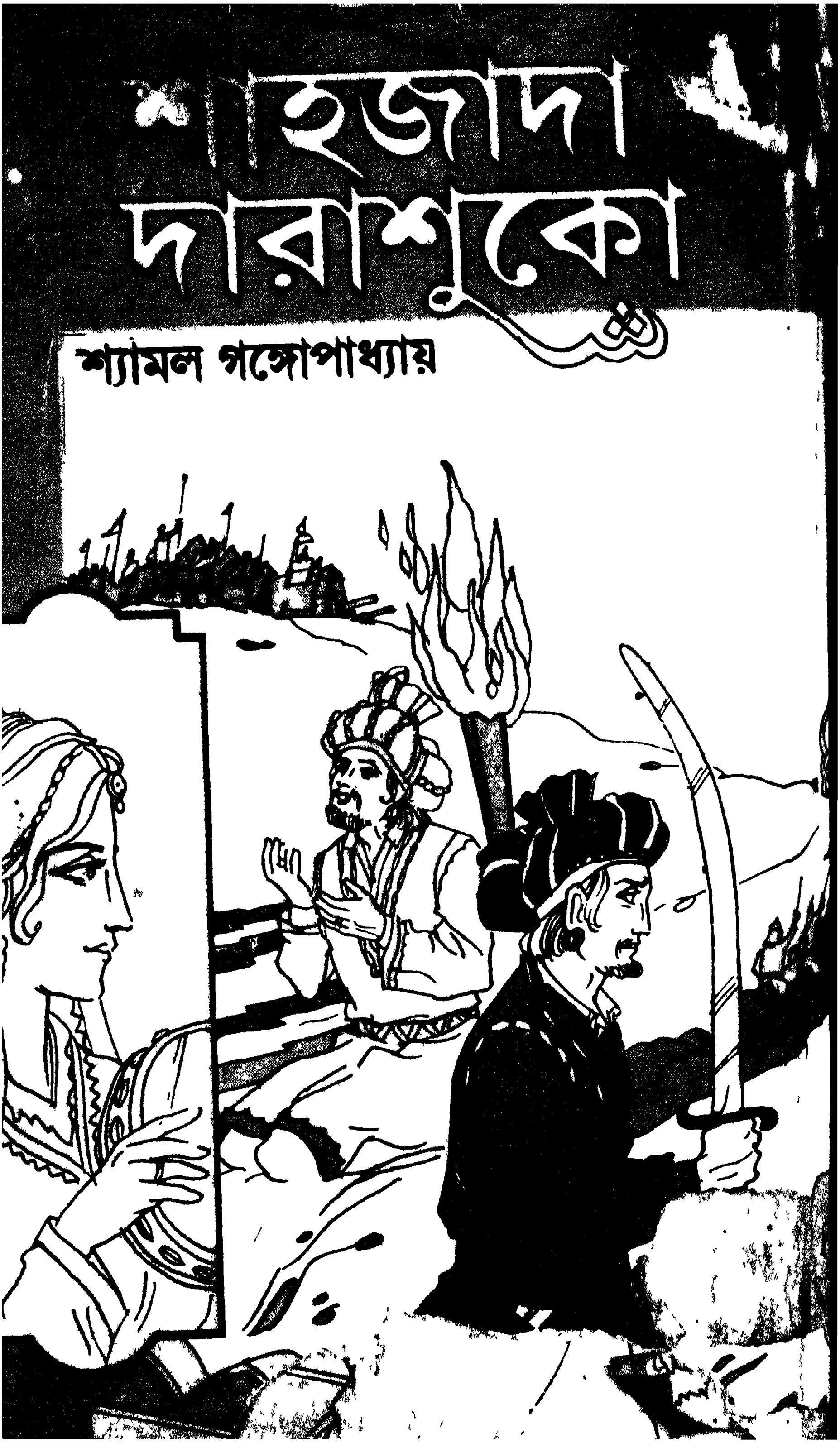
আমার দিকে তাকিয়ে আছে সারা হিন্দুস্থান। কান্দাহারে আমি হিন্দুস্থানের সিপাহ-সালার। মুঘল দরবারে যেসব বিদেশী ইলচি হাজির থাকেন—তাঁবাও এই লড়াইয়ের পরিণাম জানার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন। এই অবস্থায় আমি কি খালি হাতে ফিরে যাব?

শাহজাদা দারা ফের তাঁর তাঁবুর বাইরে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝলেন, এই যে লোক-লশকর—এত যে মানুষজন তনখা পেয়ে ঘোরাঘুরি করছে—এদের কেউই লড়াইয়ের পরিণাম নিয়ে ভাবছে না। সে দায়িত্ব তাদের নেই। জয় হলে হিন্দুস্থানের জয়। মুঘল শাহীর জয়। হার হলে স্রেফ শাহজাদার হার। মহম্মদ দারাশুকোর হার। হেরে ফেরার পথেও বাকি সবাই তনখার দাম, আশরফি বুঝে নেবে। গুনে নেবে। আমি একা মুখ কালো করে ফিরব।

ওঃ। কান্দাহার। কান্দাহার! তুমি তোমার কোন মুখ দেখাবে? সে মুখ জয়ের? না, হারের?

শাহজাদা দেখলেন, পুবের পাহাড় টপকে সূর্য তার জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। এবার সারা দুনিয়া ঝাঁ-ঝাঁ করে জ্বলতে থাকবে।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥


শাহজাদা
দারাশুকো
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়